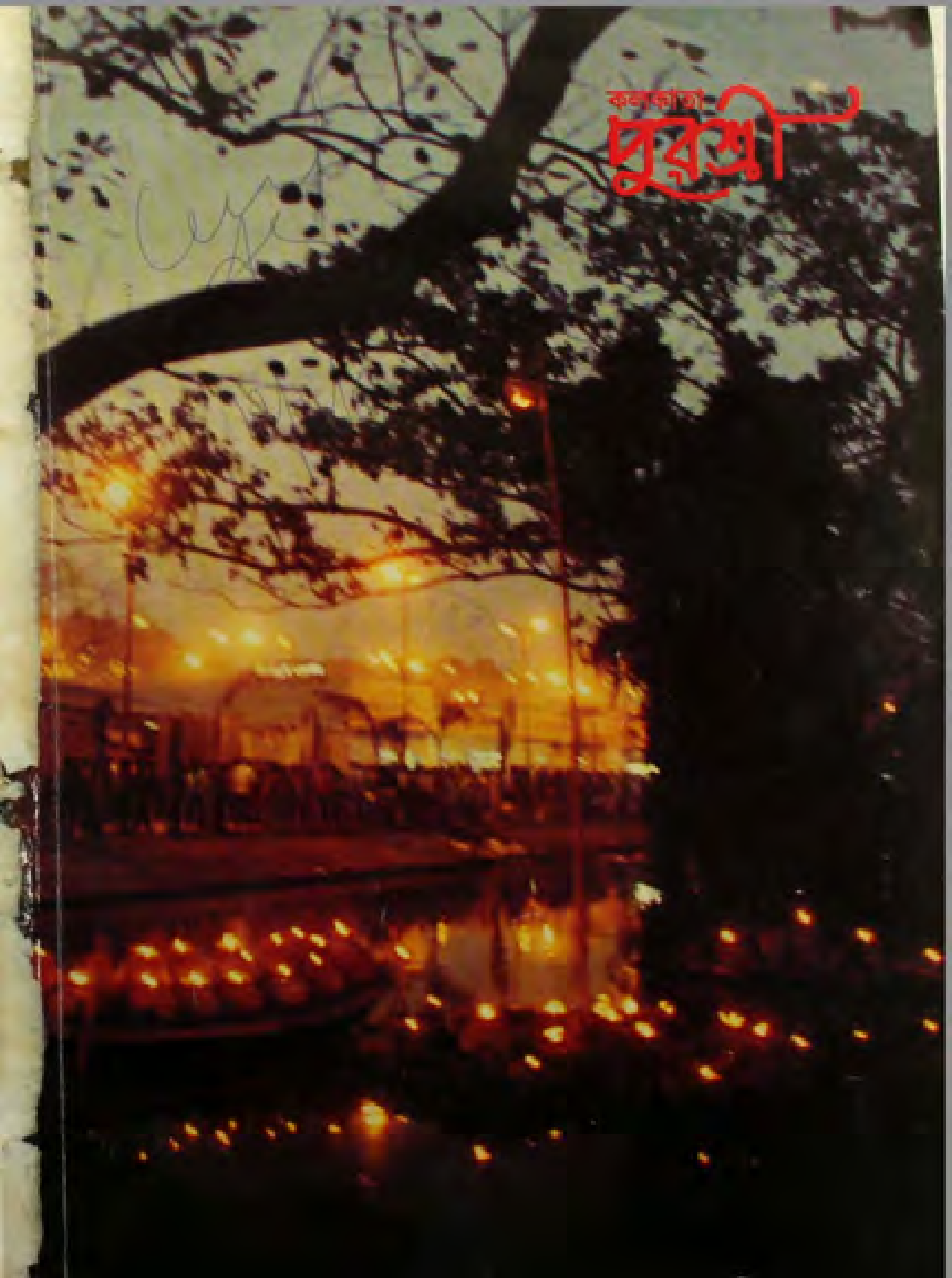
কলকাতা
পুরশ্রী

আবেদন

প্রকৃতির করাল গ্রাসে গুজরাট বিপর্যস্ত। ভূপৃষ্ঠের ওলটপালটে লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহীন। ইতিমধ্যেই মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে কয়েক লক্ষ অসহায় মানুষের। বিশ্বিত হয়েছে সড়ক, রেলপথ, যোগাযোগ ব্যবস্থা। কোনরকমে সেখানে চলছে অবশিষ্ট প্রাণের স্পন্দন টিকিয়ে রাখার আকুল প্রচেষ্টা। সমগ্র আন্তর্জাতিক দুনিয়া এই চরম বিপদে গুজরাটের অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে ত্রাণ ও অর্থ সাহায্য নিয়ে। বিভিন্ন রাজ্য সরকার, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিও এগিয়ে এসেছে এ কাজে। আর্তত্রাণে ঝাঁপিয়ে পড়ার ক্ষেত্রে কলকাতাবাসীর রয়েছে দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য ও সুনাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এবারও তা বজায় থাকবে। বিভিন্ন সমাজসেবী সংস্থা, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়িক সংগঠন, সরকারি-বেসরকারি কর্মীবৃন্দ ও সর্বস্তরের নাগরিকদের কাছে আমার আবেদন, গুজরাটের এই সংকটময় পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত ত্রাণসামগ্রীর গড়ে তুলতে যুক্ত হতে দান করুন। আর্তের মুখে হাসি ফুটিয়ে সার্থক হয়ে উঠুক কলকাতার মহান ঐতিহ্য। অর্থ ও দানসামগ্রী পাঠানোর ঠিকানা :

মেয়রস্ রিলিফ ফান্ড, কলিকাতা পৌরসংস্থা,
৫ এস এন ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৩

সুব্রত মুখোপাধ্যায়
(মহানাগরিক)

কলকাতা

পুরশ্রী

বইমেলা বিশেষ সংখ্যা

১৪০৭

কলকাতা পুরশ্রী

কলকাতা পৌরসংস্থার মাসিক মুখপত্র

জানুয়ারি, ২০০১ । সংখ্যা ১

প্রধান সম্পাদক — রতন মিত্র
সহযোগী — অরুণকুমার রায়, পলাশ বসু ও অরুণ চৌধুরী
প্রচ্ছদ চিত্র — পাপন ঘোষ
অন্যান্য ছবি — পলাশ ঘোষ ও সুব্রত কীর্তি
কৃতজ্ঞতা — দেশ পত্রিকা ও বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা

প্রকাশক
বিশেষ আধিকারিক
তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ, কলকাতা পৌরসংস্থা
হগ বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ১ হগ স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৮৭
দূরভাষ ২৪৮-০২৫৯, ২৪৮-৫৪৭১ / এক্সটেনশন

P 10,716

মুদ্রক
বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০১২

দাম ১৫ টাকা

বিষয়সূচি

সম্পাদকীয় * ১

বইমেলা * অমলা কাঞ্জিলাল

কলকাতা পুস্তকমেলা বাংলার মর্যাদার উৎসব * চিরঞ্জীব

শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর ও বাংলা মুদ্রণ * আনন্দ ধর ১৬

বাঙালীর সাহিত্যচর্চা সাধনা-বই-বইমেলা * পীযূষকান্তি রায় ২৩

বাংলা প্রকাশনার সেকাল ও একাল * রামমোহন মুখোপাধ্যায় ২৮

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় বইমেলা বই * ডঃ তাপস বসু ৩৭

বাংলা গ্রন্থচিত্রণ : একটি রূপরেখা * অবনী রায়চৌধুরী ৪৪

কলকাতার অন্বেষণ : বইমেলা * কালিদাস ভাঞ্জরা ৫২

প্রসঙ্গ : কলকাতা বইমেলা ও লিটিল ম্যাগাজিন মেলা * সুজিত পাল ৫৮

বইমেলা ২৩ বছরে * অমল সেন ৬২

কলকাতা বইমেলা পাঠকের চোখে * দিপ্র সেন ৬৫

কলকাতা বইমেলা প্রকাশকের চোখে ৬৯

বিশ্ব-এর অধিনায়ক শেখ মুজিবুর রহমান

সম্পাদকীয়

ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র কলকাতায় অনুষ্ঠিত বার্ষিক বইমেলা বর্তমানে কলকাতার সাংস্কৃতিক জীবনের অঙ্গ, অহংকার ও গৌরব। সেকারণেই কলকাতা পৌরসভা নাগরিক জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের পাশাপাশি সীমিত ক্ষমতায় বিগত কয়েকবছর ধরে অংশগ্রহণ করে আসছে এই মেলায়। প্রত্যেক বছরেই বইমেলাকে ঘিরে প্রকাশ করে থাকে বিভিন্ন বিশেষ সংখ্যা। এবারের বিষয় বইমেলা।

গত ২৫ বছর ধরে চলে আসা কলকাতা বইমেলার বিভিন্ন দিক এবং বাংলা সাহিত্যের মুদ্রণসংক্রান্ত নানাবিধ প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে বিভিন্ন প্রবন্ধরাজিতে। লিখেছেন বিশিষ্ট সাংবাদিক, গবেষক, অধ্যাপক, প্রকাশক, লিটিল ম্যাগাজিনের কর্মীবৃন্দ। আমরা এঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। লেখাগুলিতে প্রয়োজনীয় তথ্যের পাশাপাশি আছে বইমেলা ঘিরে যে উৎসবের রেশ, তার ব্যঞ্জনার তাৎপর্য। সব মিলিয়ে এই বিশেষ সংখ্যাটি যদি পাঠকের কাছে উপযোগী বলে গণ্য হয় তাহলে আমাদের উদ্যোগ ও পরিশ্রম সার্থক হবে।

কলিকাতা পৌরসংস্থা
BPB
Techmed
IN

বইমেলা

কমল ভট্টাচার্য

বইমেলার বয়েস আমার বয়েসের অর্ধেকের চেয়েও কম। প্রথম যখন কলকাতা বইমেলা শুরু হল, তখন আমাদের সাংবাদিকতা জীবনের ভৈরোঁর। একটানা দেশ সাপ্তাহিক পত্রিকায় অনেকদিন এবং দুবছর। আমি যুগান্তরের প্রতিনিধি হিসাবে মেলায় হাজির হয়েছিলাম, আগাম খবর জানতে। মেলা বিশেষ করে বইমেলা, সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা তখন কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গে পাঠকদের বড় একটা ছিল না। তবে প্রথমে গুরুত্ব পেয়েছিল প্রথম বইমেলা লিখিত, কিন্তু মানুষেরই টানে। তখন ছিল বইমেলা বইয়ের মেলাই। সর্বজনীন উৎসব বা পারিবারিক উৎসবে পরিণত হয়নি। মেলা ছিল মেলার মত। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে বইমেলা ক্রমশ লক্ষ লক্ষ মানুষকে টানতে থাকে। বইমেলা মানেই হয়ে দাঁড়ায় কলকাতার গৌরব। না, তা এখন আমি এই শহরে লিখিছে পড়া। আসলে বইমেলা মানেই লেখক, পাঠক ও প্রকাশকদের মহোৎসব। সেই উৎসব ক্রমশ ছড়িয়ে গেছে শহরের পরিধি ছাড়িয়ে অনেক দূরে। গত ২৫ বছরে কলকাতা বইমেলা লেখক, পাঠক ও প্রকাশকদের পাশাপাশি রাজ্যে, রাজ্যে সাধারণ মানুষের নিয়ে উৎসব হয়েই দাঁড়িয়েছে। অন্যান্য বইমেলাকে ঘিরে ব্যস্ততা, উন্মাদনা, পড়ুয়া, পাঠক, প্রকাশক, লেখক, কবি, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, ছুটি, ছুটির দিনে, রাজনীতিক সবাই উৎসবে মেতে ওঠেন। বইমেলা মানেই হয়ে দাঁড়ায় শিক্ষিয়ে হওয়া। তাই বইমেলা যেমন মেলা বই যেমন নয়। বইমেলা শুধু অনেক বইয়ের প্রদর্শনীও নয়। তাই সর্বস্তরের মিলন মেলা। বইমেলায় মেলা বইয়ের প্রদর্শনীর সঙ্গে সঙ্গে মেলা চত্বরে ঘিরে পড়ে পাঠকের আনাগোনা এবং নিন কয়েকের মধ্যেই দুরূহ, মেলাটি যেমন লক্ষের আসেটি, তেমন কবিরে উচ্চস্বরে কবিতা পাঠ, আলোচনার টেবিলে আলোচনা, তেমন টেবিলে টেবিলে, তেমনি মানুষের ভিড়ে মানুষের ধাক্কা, প্রেমিকের হাত ধরে প্রেমিকা, কবির সঙ্গে টু, পুরো-জমা নিয়ে হৈচৈ সবকিছু মিলিয়ে মানুষের এই মেলা হয়ে ওঠে। আর নিশ্চিন্তে হাজির হয় কলকাতা

১৯৯১ সালের বইমেলা

বইমেলায়। আরও সোজা করে বললে বিভিন্ন নবীন প্রকাশকরা বইমেলা নিয়ে আসে উৎসবের জোয়ার। বইমেলা পরিচালনার কমিটির প্রবীন কর্মীরা বিগত বছরে দেখেছি, মেলার প্রথম দিন দুপুরে ঘণ্টানেই কাটিয়েছেন। বিগত বছর সংঘের পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স বিল্ডিংয়ে কর্তারাও একইভাবে হাপত্যেশ হয়ে ঘুরে বইমেলায়। বিশেষ করে মেলার আগের বিশেষ ভূমিকা রাজ সরকারের। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী পোড়া থেকেই বইমেলায় যেভাবে দীর্ঘক্ষণ কাটান তা না দেখলে বোঝার উপায় নেই। মেলার এই আকর্ষণীয় কমিটিমেন্ট বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে ঘিরিয়ে আনে তাঁর বাণিজ্য ও সাহিত্যিক সত্তাকে।

বইমেলার সঙ্গে বাঙালির সম্পর্কে ২৫ বছর হলেও, বইয়ের সঙ্গে তাঁদের প্রেম-ভালবাসা বহু পুরনো। গোড়াতেই বইমেলা সম্বন্ধে পাঠিয়ে দিয়েছিল অবশ্যিত বাঙালির সাংস্কৃতিক অভ্যাসের অঙ্গ হয়ে ওঠার বহু বছর আগে থেকে না থেকেই তার পরিধি বেড়েছে থাকে। ক্রমশ তার প্রসার ছড়িয়ে পড়ে প্রতিবেশী রাজ্য ও বাংলাদেশে। বছর সংক্ষেপে হয়েই বইমেলা হয়ে ওঠে কলকাতার অহংকার। ইন্ডিয়ান পাবলিশার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান কর্মকর্তা ব্রুইস ব্রাডলে কলকাতা বইমেলায় এসে বলেছিলেন, "of all areas requiring priority aid, it is only books which are left so much to private charity. Inspite of the efforts of the World Bank and UNESCO, public aid for Worldwide book provision, for the massive worldwide campaign against illiteracy is remarkably tiny. Secondly it is important to establish the terms on which a truly international trade in books can be maintained. Thirdly, it is possible to use the 'run on' economics of book production, and the ability of countries like India to manufacture books at lower costs, to support books provision in developing countries.

জেনেভার ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশিং অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট অ্যালব্রু এইচ. নেইলি কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আরভন বুকসের এডিটর-ইন-চিফ মিটার মেয়ার অথবা বিদেশ থেকে আসা নামী মানের বহু প্রকাশকরা এসে একবাক্যে বলেছেন, যে আমেরিক কলকাতার বইমেলায় তা ফ্রাঙ্কফুর্টেও নেই। আসলে মানুষের মেলা ছড়িয়ে যায় বইয়ের পরিধি। এই উৎসবকে ঘিরে তা সাহেব প্রকাশকরা কল্পনাও করতে পারেন না। কলকাতা বইমেলায় এবার

বইমেলার আগের দিনের দুপুরের ভাবনিরত পাঠকের ভিড়

ফাইল ফটো থেকে বইমেলার মূল গেট এমনটাই

অষ্টম বছরে বইমেলায় গেছিলাম। আট বছরেই অনেক পরিবর্তন। ভিড় উপচে পড়ছে। কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীর মেলা বইমেলা ঘিরে। মনে হয় যেন বইয়ের নেশায় আটক হয়ে রয়েছেন হাজার হাজার মানুষ। ঘরানায় একবার দেখা হয়েছিল এক লেখিকার সঙ্গে। জানালেন, প্রতিবারই আসেন। সেবারও। মেলা উঠবার আগে প্রতি বছর এই সময়ে। আর এক সুবেশ তরুণ, সুপুরুষ তরুণী। দুজনেই তো দুজনেরই। বই কিনেছেন একগাদা। দুজনে ভাগাভাগি করে। দুজনেই, দেখছেন, পড়ছেন, পড়ার জন্য কিনছেন। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কোথা থেকে আসছেন? সপ্রতিভ উত্তর, 'পাটনা থেকে'। পাটনা? উত্তর, অবাক হচ্ছেন? পাটনা কেন, হায়দ্রাবাদ, জামালপুর, রাঁচি থেকে দল বেঁধে অনেকে আসি প্রায়

খুশী তাঁরা তাই বিশ্বিত। কারুকার বলে গেছেন, সুযোগ পেলেই আসব।

প্রতিবার কলকাতার বইমেলায়। কাল ফিরব। দেখুন না। বাংলা অভিধানের বয়স, বলেছেন, কোলা দেখিয়ে। কেউ কেউ হয়ত বলবেন, বইমেলায় সব পাগলেরা যায়। কী লিখেছে আমাদের বইমেলা? সত্যি বলতে কি, এর উত্তর জানা নেই। কিন্তু একফোঁটাও না ভেবে বলা যায়, মানসিক টনিক, অক্সিজেন খোরাক বইমেলা। তাই বইমেলায় মানুষের মেলা। প্রতি বছর মেলায় মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। বেড়ে চলেছে ক্রয়ক্ষমতাও। কয়েকজন মানুষ যা একটি সংগঠনের উদ্যমে শুরু করা বইমেলা সাধারণ মানুষকে নাড়া দিয়েছে। সবাই পড়ুয়া নন। যারা মেলায় আসেন, সবাই তাঁরা বইয়ের লেখকও নন। কিন্তু তবু দলে দলে মানুষ আসেন বইমেলায়। কারণ বইমেলা থেকে সরে থাকা যায় না। মেলা যত বড় হচ্ছে, ততই এই টান বাড়ছে মানুষের। কারণ বইমেলায় ইটিহাঁটি বাঙালি জীবনে গর্বের। তাই শহর ও গ্রামের হাজার হাজার মানুষ প্রতীক্ষা করে থাকে, কবে শুরু হবে বইমেলা। মেলা পড়িয়ে যায় কলকাতাকে কেন্দ্র করে নয়, আজ আন্তর্জাতিক মেলার চরিত্রেই। বইমেলা আজকাল হয়ে উঠেছে আন্তর্জাতিকতার আনন্দের উৎসব। ঘরে ঘরে বাঙালি জীবনে আজ হয়ে দাঁড়িয়েছে বইমেলা। কিনুক, না কিনুক মানুষ বইমেলায় যাবেই। বইমেলা আজকের বাঙালিদের বেঁচে থাকার সঞ্জীবনী। বইমেলা মতবিনিময়ের মিলনকেন্দ্র। বাঙালির আত্মপ্রকাশের সুবর্ণতম স্থান। ১৯৭৫ থেকে ২০০১ এই দীর্ঘ পরিক্রমায় সেই ধারা সমানে চলে আসছে। কোন ক্লান্তি নেই। সারা বছর মানুষ জেগে থাকে মেলার অপেক্ষায়। প্রবাসের এই টানের কথাই মেলায় এসে বলেছিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, জানাক মেলিনা। এই একটা মেলাই পারে সবাইকে জানাতে। মানুষ দলে দলে তাই আসে প্রবাসের টানে।

কলিকাতা পুস্তকমেলা : বাংলার মর্যাদার উৎসব

চিরঞ্জীব

স্কুলে পড়ার সময় রচনা লিখতে হোত বাঙালির সবচেয়ে বড় উৎসব — শারদোৎসব নিয়ে। ষষ্ঠী থেকে বিজয়ার ওই মেলার পাঁচ দিনের—বিসর্জন পর্যন্ত। বাঙালির ও বাংলার ধারণা মনে হোলো পার্থেনের মতো এটিই সবচেয়ে বড়। পুজো হিন্দুদের হলেও সব ধর্ম ও জাতির অংশগ্রহণ দেখা যায়। এখন হোলি ইদে, বড়দিনে হিন্দুরাও একইভাবে বুলন্দশহর ও ক্রিস্টিনদের মতো মিলেমিশে একাকার। এখন বাংলার মতো এখন বাংলাও নাকি এখন এমনই হলছে। হোলো পার্থেনের মূলত অতিরিক্ত বাংলাদেশই। এখন হোলো বাংলা খুড়ি। আর দুই বাংলাতেই পার্থেন একটি বেড়ে নিয়েছে। হয়েছে প্রোপ পার্থেন। এই প্রোপদের পার্থেনটি কী—যাটি থেকে জানি অনেকের জানতে কৌতূহল হয়। কোনও পরীক্ষাতেও যদি এর জন্যে যা লিখতে হয় বাংলার দীর্ঘতম পার্থেন নিয়ে রচনা, তা যে হবে বইমেলা—'কলিকাতা পুস্তকমেলা'। এ নিয়ে বিতর্ক নেই। 'পুজো কোনটার' মতো তবে কখনও শক্তিশালী 'পুস্তক মেলাদের' দাবি ওঠে আশ্চর্য হবো না।

গত অনেক বছর কলকাতা বইমেলায় বইয়ে বইয়ে ঘুরে নানা বয়সের নারী-পুরুষের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি অনেকে সারা বছর ধরে টাকা জমান জানুয়ারির শেষ বুধবার থেকে ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় রবিবার ১২ দিনের এই মেলায় কেনাকাটার জন্যই। কেনাকাটার একটাই হিসিবে তা হল বই। জমা টেনা থাকলে অনেকেরই বইপাড়া, কলেজ স্ট্রিট থেকে ১০ বা ২০ হাজার কলিশনে বই কেনা যায়। কিন্তু ১০ হাজার কলিশনে যা কম দামে পেলেও পার্থ স্ট্রিট-এসপ্লানেড লোকের বয়সের এই মেলা থেকে কেনার অন্তত তার অনেকগুণ অপার আনন্দ হোল তুলনাহীন। এ অবশ্যিত। এ ডিজিটাল টেকনলজি। বলা হোতে পারে এ অন্যরকম মহিমা। প্রবীন জানি অনেক দিনকে বুলেটের মধ্যে গ্রীষ্মে দেখে একবার জিজ্ঞাসা করি, আপনার তো কষ্ট হচ্ছে। জবাবে বললেন, কষ্ট ! বছরে এই কটা দিন এখানে আত্মীয়জন নিয়ে আসি। এখানে পুরোটাই নিয়ন্ত্রিত আবহাওয়া। এ ঘুলোর ধূসর নেই।

বছর সাতেক একটি বাচ্চা মেয়ের কথা জিজ্ঞেসই তুলতে পারি না। তার মোজাপুরির পর পরিচিত এক জীবনে যখন আসি। মেয়েটি মেলি মনে টানা হাঁটছে জানছে, জানছে। জিজ্ঞেসই বাড়ি গিয়ে না ওর ওই বইটা না নিলে। জানতে চেয়ে ? আমার প্রশ্নের জবাবে সে বলল, না ওই বইটা পেয়ে না ওই। ওকে বলি ভালো হোয়ার আছে। ও অবশ্য পেল। ফোনে আনলো মাকে। বললেন, অনেক বই কিনেছি। সবই ওর। আজ সব পুঁজি ফুরিয়েছে। এখান থেকে ট্যাক্সি করে নিয়ে যাব, তারপর অন্যত্র। যা আছে আর নেওয়া নেই আজ। বলি ওর ধরচ করতে পারবেন। টোটাল টুকে ১৫ হাজার। ভদ্রমহিলা বলছে : ওসব জানি না দুই বুতের বাঁ চাই-ই আমার। ওর দাম ২৫ টাকা। কারা আমাদের দিয়ে ঘুরপথে পড়লাম। ১৫ টাকা নিয়ে প্রকাশক দলাইকে বললাম, নিন না একটি স্পেশাল কলিশন। তিনি কথা রাখলেন। বললেন, এদের জন্যই তো বইমেলা। মেয়েটি বাবার গালে দিয়ে গাঢ় বুঝলো। খেলায় খুশি। বলল, ছোট্ট পরের বছর আবার আসবো। তুমি থাকবে তো !

১৯৭৬ থেকে গত বছর ১০০০ পর্যন্ত ২৫ বছরে এমন কত ঘটনা টানার কথা বলা যায়। জার্মানির ডুসলডর্ফ থেকে প্রজাপোলাম হাড় অবধি

এ সংখ্যা আনন্দ-বাজার পত্রিকা। ১৯৭৯। মূল্য ছোট ইলেকট্রনিক্স নয়।
এর সঙ্গে ছাপা হচ্ছে না।

পুরনো অক্ষর আমাদের দুর্লভ পুস্তকের মতো। যেমন আমাদের ছাপাইয়ের ফর্মাগুলো (সেগুলোই পুরনো)।

বইমেলায় ঢোকা যাবে। পুরনো অক্ষর এখন ফুটপাথে বইমেলায়, এখানেও দুই। ইচ্ছে থাকলে তো অবশ্যই বই কেনা যায় না ভালোবাসা যায়। বাংলাদেশ থেকে যেসব টেস্ট ডিরেক্টরির সঙ্গে আমাদের আলাপ ৩/৪ বছর আগে হলো থাকলে, কিন্তু বইমেলায় পুরনোপত্রের মতো এমন বাংলার ফেরিওয়ালা দেখা মিলবেই। নিউ ইয়র্ক, নিউ জার্সি, মন্ট্রিয়েল, ভাঙ্কুভার, শিকাগোর বাঙালিদেরও দেখা মিলবে এই পুস্তক উৎসবে। এ শুধু বইমেলা নয়। চিত্রশিল্পী ভাস্কর্যেরও মিলন মেলা। এসবই এর প্রধান। আড়াই-তিন দশক এদেশে পশ্চিমবঙ্গের লিটল ম্যাগাজিনের মেলা দেখা যেত। বার্ষিক এই মেলার সূচনায় অনেক বন্ধুর নাম আমার ওপরে প্রশংসাক্ষরে হয়েছে। এমনিতে একুশে ফেব্রুয়ারি ঘিরে প্রায় এমনটি দেখা যায়—আলপনা পুস্তিকা, পত্রিকা। প্রথম দেখক আবেদনিক সংস্কৃতিকুমার ঘোষকে দেখেছি নানা জনকে লিটল ম্যাগাজিন থেকে চয়ন করে বেরুতে। এজন্যে কৃতিত্বের পুরো প্রশ্নটিই করেছেন তিনি। অনেককেই তিনি কবি প্রে-র এলিজি হয়ে আত্মপ্রকাশের করে পড়তে দেননি।

এখন কয়েকটি স্টল বিভিন্ন ধরনের লিটল ম্যাগাজিনের। সাধারণ পুঁজি নিয়ে, নিজের রোজগার থেকে কতিপয় এঁরা নিজস্ব রুচির ও অভিরুচির কড়ি অনুযায়ী এইসব পত্রিকা বের করেন নতুন নতুন চিন্তায় ও অভিরুচে। মফস্বল থেকে অত্র পত্রিকা বের হয়, তার কিছু নমুনা মেলে লিটল ম্যাগাজিনের পাতাবিলিয়নে। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ কী নেই। পা-গল্প থেকে বের হচ্ছে মেয়েদের জন্য পৃথক পত্রিকা ছেলেদেরই পরিমাণিক। পৃথক জনবাহনের পত্রিকা, পত্রিকা অনলিমিটারের, বিজ্ঞানেও। ঘোষা হচ্ছে প্রয়োজনের মানুষ তত্ত্ব সংরক্ষণ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ জন্যই ঘোষ তত্ত্ব শিক্ষার জন্যের জন্য সর্বত্র অবশ্যপায় করতে বলেছিলেন।

'কলিকাতা পুস্তকমেলার' ভিন্নধর্মিতা শুরুতে আজকের নয়— ১৯৭৬ থেকে। বইমেলার শুরুর বছরেই। বিশ্বের প্রেষ্ঠ ১৮টি বইমেলার অন্যতম হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে একে জেনিভার ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স অ্যাসোসিয়েশন। এ নিয়ে তেমন বাংলা নয়, সারা ভারত গর্ব করতে পারে। এটা ঠিক—আয়তনের দিক থেকে এক নম্বরে জার্মানির ফ্রাঙ্কফার্ট বুক ফেয়ার। কিন্তু সেখানে কোনও বই পাঠকের জন্যে সরাসরি বিক্রির ব্যবস্থা নেই। বই দেখে অর্ডার দিলে বই যেতে অনেক পরে। প্রথমবারের মতো নানা দেশের প্রকাশকদের ও পাইকারী ক্রেতাদের ভিড় কলকাতার প্রতি এই পক্ষের দেখায় হয় না। কলকাতার মতো জনসমাগম (২০০৯এ ছিল ১২ লক্ষ) ও সরাসরি এত বিক্রি পৃথিবীর কোনও বইমেলাতেই দেখা যায় না। বাঙালনী বিশ্বের প্রতি-মতামতের মোলও এদিক থেকে অনেক বিশিষ্ট।

বাংলার মানুষের বুদ্ধি এখনও কোনও কোনও ক্ষেত্রে বোধ হয় অক্ষিনষ্ট। তিন দশক আগে থেকে বিমলকুমার এর প্রতি বছর অন্তর যাচ্ছেন ফ্রাঙ্কফার্ট বইমেলায়। কলিকাতা পুস্তকমেলার ধারণাটা এখান থেকেই আসে। তাতে ফ্রাঙ্কফার্টের মতো নয়, এখানে পাঠকরা আসবেন, বই দেখবেন ও কিনবেন।

বিমলবাবু তাঁর ভাবনা প্রথম বৌদ্ধ মেন প্রবীর দাশগুপ্তর কাছে। উদ্যোগ পেলেন অনেকের কাছে। পুস্তক ব্যবসাটি সমিতি নয় এটা। কলকাতে ঘটি ক্লাব থাকার সত্ত্বেও। কেউ কেউ বলেন

প্রথম অধিবেশন বইমেলার প্রথম দিনটিতে দেখা

'দেখা যাক না।' কিন্তু অধিকাংশই মহাশান্তি 'না' করে দেন। প্রকাশকদের প্রশ্ন, আদৌ এ সবে কী হবে? নামী প্রকাশকদের অনেকেই এর থেকে দূরে ছিলেন। 'কলিকাতা পুস্তকমেলা'র পরিকল্পক বিমলেন্দুবাবু ও প্রদীপবাবু। ১৯৭৪-এ প্রতিষ্ঠা হল দ্য পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স লিমিটেড। তখন সভাপতি সুশীল মুখার্জি, সহসভাপতি সুস্মিতা সরকার ও কোষাধ্যক্ষ প্রবীর দাশগুপ্ত। সদস্য ১৪ জন। কিন্তু প্রথম পুস্তক মেলার আগে নতুন কার্যকরী নির্বাচন হল। সভাপতি প্রীতীশ কুণ্ডু, সচিব অরুণ আনন্দবাজার ও কোষাধ্যক্ষ অরুণ বসু। মেলার দায়িত্বে নিযুক্তভাবে উপস্থিত করেন প্রেসিডেন্সি হল অব ইন্ডিয়ার পুত্রোদা অধ্যক্ষ ঘোষও।

প্রীতীশ অলকাতার কোনও পত্রের সম্পাদক, ঘোষও নামে মেলা—প্রকাশনী। ১৯৭৫-এর প্রথমেও বহু সংস্কৃতি সংস্থানের ছিল প্রকাশ। কিন্তু ধীরে ধীরে তা বন্ধ হয়ে গেল নানা কারণে। ১৯৭৬-এ পুস্তকমেলার সূচনার আগেও আশঙ্কা ছিল এর হয়তো স্থলস্থায়ী হবে। কয়েক বছরের মধ্যে উঠে যাবে। ৯ মার্চ বিড়লা আকাদেমির পশ্চিম দিকে ৫৪টি বইয়ের স্টল নিয়ে প্রথম 'কলিকাতা পুস্তকমেলা'-র উদ্বোধন করলেন রাজ্যপাল এ এল ডাঙ্গাং। সব মেলায় যা হয়, এখানেও তাই। প্রথম দিন স্টল তৈরিই হয়নি। রাজ্যপাল যখন উদ্বোধন করছেন, তখনও অনেক স্টলে পেরেক ঠোকাঠুকির শব্দ। বই মাটিতে পড়ে, কাঠামো তৈরি হচ্ছে। কিন্তু দর্শক অনেক। তিন দিনের মধ্যে মেলা একেবারে তৈরি। দর্শকও প্রচুর। অভূতপূর্ব সাড়া। বই দেখা ও কেনার জন্য এত ভিড়!

অভাবও ছিল। কলকাতার কোনও ভাল বইয়ের দোকান নেই কোথায় গিয়ে বই দেখা যায়, বই বেছে কেনা যায়। একটিই ছিল এসপ্লানেডের কে পি বাগচির দোকানের অন্দরে খানিকার। তাও সব ইংরেজি বই। বইমেলায় সবরকম বই। ছোটদের, বড়দের, সকলের। গল্প, প্রবন্ধ, ডিটেকটিভ, উপন্যাস—সব কিছু। একটি চত্বরে এরের মধ্যে ৯—৫। ১৫৫ প্রকাশক। অধিকাংশ বাঙালির। সংবাদপত্র গোষ্ঠিগুলি বিপুল প্রচার পেল। দ্য স্টেটসম্যান বিশেষ ভূমিকা নেয় এর প্রচারে। প্রায় প্রতিদিনই মিউজিক অ্যাটাচির ছবি সঙ্গে ছবি। আর কোনও সংবাদপত্র এমনটি করেনি।

এরপরই সুশীল মুখার্জি আর বিমল ঘর তোলেন ধর্মতলার বইমেলায়। সঙ্গে কিছু ছবি 'কলিকাতা পুস্তকমেলা'-র। কলকাতার অধিকাংশ বইমেলার ছবি ও তথ্য ধরা থাকে। বিমলবাবু সঙ্গে নেন কিছু বাংলা বইও। পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স লিমিটেড স্টলের পাশে বাংলা বই থাকবে। ওখানকার বাঙালিরা এসে বলবেন, হোটেলে আসুন কিনে নেবেন। সব বই-ই বিক্রি হয়ে গেল। বিদেশে বাংলা বইয়ের আকর্ষণে ওরাও বিস্মিত। এরপর বিক্রিতে নিজে অংশ নিল ওয়ার্ল্ড বুক কোম্পানি। নিজের স্টল বিক্রিতে করে পেল সেরা পুরস্কার। উদ্যোক্তা নিজে কর্তৃপক্ষ। ১৯৭৭-এ স্টলের সংখ্যা বাড়ে। দর্শকও প্রচুর। মেলা থেকে সিদ্ধান্ত হল ১৯৭৮ এর জন্য বড় কোনও জায়গা চাই। পাওয়া গেল রবীন্দ্র সদনের পশ্চিমদিকের গোটা অঞ্চলটা। তৃতীয় বর্ষে স্টল ১১২। বিক্রি বাড়ার সঙ্গেসঙ্গেই খুশি। বইমেলা উঠে যাওয়ার কোনও আশঙ্কাই রইল না। কেবল বই হলেও চলবে না। সঙ্গে চা, কফি, ঠান্ডা পানীয়, জলখাবারও চাই। ওরাও অনেক নিয়েছিলেন। ইতোমধ্যে বইমেলায় তিন বার্ষ হয়ে গিয়েছে, জানুয়ারি শেষ সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় রবিবার পর্যন্ত।

প্রতি বছর বইমেলা হয়, আর চাহিদা বাড়ে। এই কদিন শহরে এমন ভূমে বিভিন্ন পাদাপাদনে যে দুর্গাপুর, কর্মজনা, কৃষ্ণনগর, কলগী, আসানসোলবাসী থেকেও ক্রেতা ও পাঠক আসছেন।

প্রাঙ্গণে সমবেত ১৯৯ প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতার প্রাণবন্ত প্রচার

১৯৮৩-তে বইমেলার পরিসর আরও বেড়ে গেল। রবীন্দ্র সদনের পশ্চিম প্রান্তের সঙ্গে জুড়ে নেওয়া হল বিড়লা অ্যাকাডেমির পশ্চিমের জায়গাটিও। এবার স্টল ২৮৫টি। কিন্তু হঠাৎ শোকের ছায়া নেমে এল।

বইমেলার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক আনন্দবাজার পত্রিকা গ্রুপের প্রধান সম্পাদক অশোককুমার সরকার একটি বই প্রকাশ করে হঠাৎ প্রয়াত হলেন। কিন্তু এর পরের বছর থেকে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে শুরু করেন নানা দেশের পণ্ডিত ব্যক্তিদের এনে অশোক কুমার সরকার স্মৃতি বক্তৃতামালা'-র।

হিন্দি শাখাতে মহাদানে আমরা এতদিন রাষ্ট্রনৈতিক সম্মেলন বা সভা দেখেছি। কিন্তু বইমেলা হল ১৯৮৪-তে প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতাদের ৩৬৩টি স্টল নিয়ে। বইমেলার ইতিহাসে নতুন সংযোজন। এত বড় খোলা জায়গা তো এই কেন্দ্রবিন্দুতে নেই। সরকার তাই এখানেই অনুমতি দেয়।

১৯৮৪ তে প্রথম অশোককুমার সরকার স্মৃতি বক্তৃতা দিতে এলেন যুক্তরাষ্ট্র থেকে জেরোম থার্স্টন হার্লি। বিষয় 'দ্য ফ্যালেন্স অফ সিকিউরিটি'। ১৯৮৫ তে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রেমনাথ বৃন্দাসনের বিষয় 'ফলানার অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনালিজম'। ১৯৮৬ তে যুক্তরাষ্ট্র থেকে এসে ডরলিউ ব্রাডফোর্ড ডিউবি 'দ্য ইন্সটিটিউশন অব দ ইউনিভার্সাল বুক পাবলিশার্স সিস্টেম'-এর উপস্থাপনায় বলেন, মুদ্রণ প্রকাশনা শেষ হবে না, হতে পারে না। বই ও পত্রপত্রিকার মতো কম খরচে মনরোপযোগী মাধ্যমের তার বিকল্প নেই। ১৯৮৭ তে জেনিভার ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম মহাসচিব মে এ কৌথোভেরী বলেন, যাঁরা প্রজ্ঞা ও তথ্য থেকে বঞ্চিত তাঁরা কখনোই সভ্যজীবী হতে পারেন। বইপত্রিকা প্রকাশকদের অনেক দায়িত্ব। তারতের জরুরী অবস্থার সময়ে প্রেস সেন্সরশিপের তিনি তীব্র নিন্দা করেন।

১৯৮৮ তে আনন্দ মুদ্রণ-এর প্রধান সম্পাদক ও পেঙ্গুইন গ্রুপের কর্মাধ্যক্ষ পিটার মেয়ার 'ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশিং' সম্পর্কে বলেন, তারতের সাহিত্যের সমৃদ্ধ হয়েছে চলচ্চিত্র, ক্রিকেটের ও পলিটিকীর অবদান থেকে। বিশ্বের সেরা ১০ দেশের মধ্যে তারতের প্রকাশনকের স্থান। ইংরেজি বই প্রকাশনায় তারতের স্থান যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রর পরেই।

আমাদের দেশের প্রকাশনার উজ্জ্বলিক প্রসঙ্গে করেন ১৯৮৯-এ ব্রিটিশ পাবলিশার্স অ্যাসোসিয়েশনের কর্মাধ্যক্ষ ব্রাইস হডজেস। এ দেশেরই অশোক সেন এসেছেন ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স অ্যাসোসিয়েশনের কর্মপরিষদে। জানান তখন তিনি কীভাবে তারতকে তুলে ধরেছেন। আর আলফ্রেডার বিষয় ধর তো প্রতি বছর আমন ও আমেরিকা যেতেন ভালো বই নিয়ে। তাঁরই প্রয়াসে ভালফাবেট বইমেলা ফ্রাঙ্কফার্টের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে। তাঁর বিষয় ছিল 'দ বুক ইন্ডাস্ট্রি'।

এই বক্তৃতামালা ও অন্যান্যতা পৃষ্ঠপোষক আর৩ মর্টন থেকে ১৯৯০-এ এলেন জেনিভার ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আন্দ্রে মিশেল লিখি। 'পাবলিশিং রিসপনসিবিলিটি অ্যান্ড লিটারেসি' সম্পর্কে তাঁর লিখিত প্রবন্ধপাঠের উদ্যোগে বলেন, আপনারা জেনে খুশি হবেন না। যুক্তরাষ্ট্রের আমেরিকা থেকে তারতে পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতক কলেজে পড়া ছাড়ে ৪৫ ছাত্রছাত্রী। শিক্ষার পদ্ধতি এখনও সেকেলে নাম নেমে। সুতরাং মানুষকে জ্ঞান ভাণ্ডার উপহার দেবেন প্রকাশকরা। নতুন নতুন চিন্তাধারায়। তিনি সতর্ক করে দেন জাতীয়তাবাদের নামে ক্ষুদ্র স্বার্থ আদায়ের নিয়ে। ধর্মের মৌলবাদীরা বিশ্বকে ধ্বংসের দিকে। তাই সমাজ চেতনা তোলার দরকার। তাঁর ভিক্ষাস্ত পর ১৫০ বছরে আমরা একটুও এগিয়েছি কী ? কুড়ির পরেই ছাদ নিচে হয়ে অশিক্ষাকে দূর করবে।

১৯৯২-এ নরওয়ের শিক্ষাবিদ লিসবেথ স্টুরি ইক্লিনস টু পাবলিশ অ্যান্ড ডেমোক্রেসি' বিষয়ে বলেন, কেবল বইয়ের সংখ্যা মুদ্রণের সংখ্যা বাড়লেই শিক্ষা বিস্তার হয় না। সাধারণ মানুষ শিক্ষালাভ করছে কিনা দেখতে হবে। ১৯৮০-র দশকের মাঝামাঝি সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৫,০০০ টাইটেল ছাপা হয়, মুদ্রণ সংখ্যা ৫০০ মিলিয়ন। কিন্তু তার অধিকাংশই অর্থনীতি, এঞ্জেলস ও লেনিনের মতবাদ নিয়ে। পাঠকরা প্রসঙ্গ

এক এক সময়ে হাজারে হাজারে লোক মেলায় জমায়েত হয়ে থাকত

ছুঁয়েও দেখেনি। বলেন, ওদেরও পাখাওয়ালা মতো তৈরি হয়ে নীলের দেশে নিয়ে-যেতে।

১৯৯৯ সালের 'দে ডিপার্চার' পত্রিকায় এন্থিনিস্টিক ডিরেক্টর জাঁ নিরো হিন্দি-ইণ্ডিয়ানেটির আলোকপাত সম্বন্ধে জানান যে তিনি ওয়ার্ড ইজ রোমান্টি ফাইনালি কাউন্টস'।

১৯৯৫ বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিক কুলদীপ নিং-এর সভাপতিত্বে আয়োজন হল 'ফেয়ারগ্রাউন্ড ফটস অন কুলদীপ অ্যান্ড পাবলিসিটি'। ১৯৯৫-৫ তি এর মাসখেয়ে-ত 'হোল অ্যান্ড রেসপনসিবিলিটি অব প্রিন্টিয়া টু মা ফেয়ারগ্রাউন্ড, ১৯৯৬ অশোকতলাল মিত্র-র সভাপতি সোসাইটি অ্যান্ড লিটারেচর' এবং ১৯৯৭ সালে ইতিহাসের 'এ ডে টু লুক ফরওয়ার্ড টু' উদ্যোগ। এছাড়া কেন বিদেশের বিশিষ্টরা আসেন বিভিন্ন সময়ে নানা বিষয় নিয়ে। ১৯৯৭ এর ২৯ জানুয়ারি তসলিমা নাসরিন জাতক সেমিনার বলেন, বই রক্ষার জন্য লড়াই করুন। বই হল জীবন। নিজের দেশের অধিকাংশ মত। সেটা যদি রোগাক্রান্ত হয় সেই রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। তিনি বৈদ্যুতিন মাধ্যমের বিরুদ্ধেই জেহাদ ঘোষণা করেন।

পুস্তক মেলার আর একটি আয়োজন 'বিষ'—নূন আলমা। ১৯৯১৫ সালে নিয়ে এর সূচনা। তারপর প্রতি বছর এক একটি রাজ্য বা দেশকে 'বিষ' করা হয়। ফ্রান্সে, গড়িলা, ত্রিপুরা, অস্ট্রিলিয়া, ব্রাজিল, পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, ফ্রান্স। ১৯৯৭-এর বিষ ছিল ফ্রান্স। মেলার উদ্বোধন পশ্চিমের পেয়েছি ছিল আইসেল টিমারহয়ের আসনে। বাসনিক জাতক সেমিনারকে আনা হয় ফ্রান্স বিষ বলেই। কিন্তু ১৯৯৮-এর ৩ ফেব্রুয়ারি বিকালেই অগ্নিকাণ্ডে মেলার মেদিনিয়াতন ফলেই পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ৪৭১টি স্টলের মধ্যে রেহাই পায় ১৫৯টি। ভস্মীভূত লিটল ম্যাগাজিনের ১১৫টি স্টলের। পুড়ে যায় ৩২টি বিদেশি স্টল। তার মধ্যে ছিল ফ্রান্স ও বাংলাদেশের। এছাড়া ছিল বিটেন, আমেরিকা, জার্মানি, ব্রিটেন ও পশ্চিমবঙ্গের।

যাবতীয় ব্যক্তি পরীক্ষা হল অগ্নিকাণ্ডে পুস্তক মেলার। কারণ ছিল কলকাতার বইমেলা আর হবে না। পাবলিসার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ডের বর্তমান সচিব অমাপ শাহ বলছিলেন, সাধারণতোই তাংশটি তলে ঢেউ বলি না তাহা সরকার বিশেষ করে ওপর ও সাংস্কৃতিমন্ত্রী বুদ্ধদেব কট্টাচার্য আসছেন। সবকার বিনামূল্যে জিনিসিনের জন্যে স্টল বানিয়ে দিল। সেদিনার ভস্মীভূত বইমেলা আবার জাগা তুলে দাঁড়ানো গুরুত্বার বোঝা গেল 'বই পোড়ে না'। বিদেশে ব্রুকি সেদিন এখানে থাকলে হয়তো বলতেন 'এগেন ইটস্ রিসেলিটি'।

পোড়ার পর প্রথমে ঘোষণা করা হয় ৭ থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি নতুন জায়গায় বইমেলা হবে। কিন্তু তা বাড়িয়ে করা হয় ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

বইমেলা পুড়ে যাওয়ায় সারা বিশ্বের প্রকাশ মাধ্যমে গুরুত্ব পেল। কিন্তু এ কেন পাশে বয়। মানুষের স্মরণে এর স্থান গভীর থেকে গভীরতর হোল।

১৯৭৯ থেকেই পুস্তক মেলার শিল্পীদের আনাগোনা শুরু হয়। তাঁরা আসতেন বসে ছবি আঁকতেন। বিক্রিও হোত। তখন শিল্পীদের ভিড় ক্রমশ বাড়তে থাকে। বিদেশ থেকেও একবার ফ্রান্সে গিয়ে পারিসে বইমেলা দেখেন। ১৯৯৫ থেকে শুরু অনুকরণে কলকাতায় বইমেলার পৃথক জায়গায় ও তরুণ শিল্পীরা তাদের শিল্পকর্ম প্রদর্শনের সুযোগ পান। এখন এদের ওখানের নানা অনুষ্ঠান, আলোচনাচক্র। প্রতিদিন ভিড়ে ঠাসা।

শুরুতে থেকেই ছিল মেলার ডিরেক্টরি। এখন থাকার অংশগ্রহণকারীদের তালিকা, শিল্পের বর্ণমূচি এবং বিশ্ব প্রবন্ধ। ১৯৮১-তে সংযোজিত হল পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত বইয়ের তালিকা। এখন এর কলেবর এতটাই যে ফেব্রুয়ারির ডিরেক্টরির চাইতে বেশি ওজন। হাজার পৃষ্ঠার বেশি এই বইয়ে কোন লেখকের কী বই, কোন সালে ছাপা, দাম কত, কে প্রকাশক সবই আছে। ডিরেক্টরির দামও বেশ সস্তা। ১০০ টাকায় এত সুন্দর ছাপাকে ছাপা, বাঁধাই দেওয়া যায়। হ্যাঁ, বিজ্ঞাপন আছে প্রচুর। তাহলেও এমন সুলভে। প্রশ্ন জাগে তাহলে প্রকাশকরা কেন বইয়ের দাম কম করে ছাপা করেন।

১৯৭৬-এ তরুণকান্তি মেলাতে প্রথম অংশগ্রহণের পর বিগত বছরের পরাজয়ে লিন্ড বাংলা বইয়ের নিজস্ব মেলা করেছে লন্ডন, আমেরিকার নিউইয়র্ক, বস্টিয়ন, নিউ ইয়র্ক ও নিউ জার্সিতে। কেন ঘটিনা ছিল। কিন্তু অনেক বছর পর মেলা আর

কুমোর পোড়া এলে অনুষ্ঠান ঘরে ফেরেন প্রতিবার

কেবল বাংলা বই নিয়ে মেলা করলে লাভ হয় না। খরচ ওঠে না। বিশ্বের পরামর্শে প্রকাশকরা নীতি বদলেছেন। তারা এখন রপ্তানি করছেন বাংলা বই। শারদীয় সংখ্যাগুলির চাহিদাও বেড়েছে। এদিকে এসে গিয়েছে ইন্টারনেট। ওর মাধ্যমেই অনেকে অর্ডার পাচ্ছেন। কলকাতার কয়েকজন প্রকাশক তো তাদের বই নিয়ে পৃথক ওয়েবসাইটও খুলেছেন। তাতে লেখকের নাম, বই সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, প্রচ্ছদ সবকিছুই রয়েছে। বিদেশে বাংলা বই রপ্তানিতে ইন্টারনেট নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। ই কমার্স চালু হলে তো একুশটি কোচাকেনা হয়ে যাবে। নির্বিঘ্ন হলে বই পৌঁছতে যা একটু সময় লাগবে।

কলকাতা বইমেলার শাখা প্রশাখা গত কয়েক বছরে এখন কেবল পশ্চিমবঙ্গের জেলা বা মহকুমা শহরে নয়। কলকাতার এখন পাড়ায় পাড়ায় বইমেলা শারদোৎসবের পর থেকেই। পাড়ে ব্লক স্তরেও বইমেলা। দর্শকের অভাব নেই, কেনাকাটাও ভাল। পাঠকরা দেখছেন। দেখে দেখে কিনছেন। নিয়ে, টৈতে, ভাবনিনে এখন আর বই দেওয়ার নেওয়ার সেই নিশ্চিন্ত মহলেও। ফলে টেলটি বইয়ের বইয়ে কেন কয়েক বছর বইপাড়া অন্ধকার ছিল। সর্বত্র বইমেলার প্রসারে এখন আবার অনেক দেখা মিলেছে। তবুও কলকে পিকিয়ের সংখ্যা, তাদের আর বৃদ্ধির অনুপাতে বেশি বাড়েনি।

বইমেলায় দর্শক বেশি, বেচা কম— এ অভিযোগ অনেক প্রকাশকের। হয়তো ঠিক। কিন্তু মেলায় এসে ১২ দিনে একেবারে খালি হাতে ফিরে যান ? বইয়ের প্রতি ভালবাসাবোধেই তো তাঁরা আসেন। বড়রা না কিনলেও নাতী পোতিরা তো কেনে। অনেক ঘরে বইয়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জাগানোও তো কম কথা নয়। সকলকে বোঝাতে হবে গুরু ও রবীন্দ্রের রচনা না আটোকিক জন্তু নয়— বই হল সারাজীবনের বন্ধু, এমন খেরাপি আর কিছুতে মেলে না। টিভি নামক বোকাবাক্সের আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান ছেড়ে ১২ দিন শীত, বৃষ্টি, ধুলো উপেক্ষা করে ঠেলা যে লাখে লাখে আসছেন এ কী অর্থের দ্বারা মাপা যায় ! কলকাতা বইমেলার স্টল আর পৃথিবীর যে কোনও শহরের চলিতে পারে, কিন্তু স্টলের ডেকরেশন, বিদ্যুৎ খরচ ও আনুষঙ্গিক সব কিছুর সমন্বয়ের বিচিত্র অর্থ হিসেব কষলে হয়তো লোকসানের ছবি মিলবে। কিন্তু মেলার রোল তো সবার বছর চলে। গত বছর গিল্ডের ২৫ বছর পূর্ণ হয়েছে। একদিন থেকে এই ২৫ বছর মেলার সঙ্গে যুক্ত থাকার সাফল্যের জানাচ্ছেন সাংবাদিক প্রবীণ পাল, অলোকরঞ্জনী মেলা ঐতিহ্যী, কিন্তু সমস্যা বলেন ওঁর ও সব পেটেন্সমাকে। খুব ভাল লাগল।

এই রচনার পালিসার্স আরও বুক সেলার্স গিল্ডের গত ২৫ বছরের চলার পথের অনেক কথাই হয়তো বলা হল না। কিন্তু তাদের নিরপেক্ষভাবে সাধুবাদ জানাবেই হবে। তারা কোনও সঙ্কীর্ণ রাজনীতির শিকার হননি। কোনও গোষ্ঠীরও অনুচরী হেলনে চলে না আজও। কয়েক মাস আগে তাদের স্থায়ী ঠিকানা হয়েছে কলেজস্ট্রিটের লেনে। ওরা ভবানী দত্ত লেন ছেড়ে চলে যাবে ওখানে। এছাড়া কলকাতা তথা কেন্দ্রের পাশে সৈনিক ভবনে হবে একটি স্থায়ী ছোট প্রদর্শনশালা। কিন্তু আর কতদিন প্রতি বছর অস্থায়ী টিনের ছাউনির নিচে পাঁচ শতাধিক স্টলের 'কলিকাতা পুস্তকমেলা' চলবে ? ছেড়ে না দিয়ির প্রশ্নটি মহানগরের মতো স্থায়ী কিন্তু। সকলেই খুশি হবেন। মর্যাদা বাড়বে নিশ্চয়ই। বিশ্ব বাণিজ্যে কলকাতা হবে বইয়ের গেটওয়ে। নানা ভাষায় আরও অনুবাদ হোক বাংলা বই। বিদেশি প্রকাশকরাও বাঙালি লেখকদের সঙ্গে হাত-এ হাত রাখুন। কে বলতে পারে আগামী সাল থেকে পর্যটকরা আসবেন না দলে দলে 'কলিকাতা পুস্তক মেলায়' ? বাংলার এই মর্যাদায় উৎসবে ?

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বাংলা মুদ্রণ

আনন্দ ধর

প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে সুশিক্ষা ছড়িয়ে দেবার যে প্রচেষ্টায় তাঁকে আজীবন ব্রতী থাকতে দেখা গেছে, তার সূত্রপাত হয়েছিল তাঁর ছাত্রজীবনেই। সংস্কৃত কলেজের ছাত্র থাকাকালীন তিনি বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনায় হাত দিয়েছিলেন। ১৮৪৭ সালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে তিনি যোগ দেবার পর তাঁর এই কাজ আরও ত্বরান্বিত হয়। ১৮৫০ সালে তাঁর 'বর্ণপরিচয়' প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়। এর পর ১৮৫১ সালে 'বর্ণপরিচয়' দ্বিতীয় ভাগ এবং ১৮৫৫ সালে 'ঋজুপাঠ' প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। এই বইগুলি বাংলা ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে যুগান্তর এনে দিয়েছিল। বিদ্যাসাগরের আগে বাংলা ভাষা শিক্ষার জন্য যে সব বই ছিল, সেগুলি ছিল অত্যন্ত কঠিন। বিদ্যাসাগর সেগুলিকে সহজ করে তুলে ধরেন। তাঁর বইগুলি ছিল ছোটদের উপযোগী। তাঁর বইয়ের ভাষা ছিল সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল। তিনি বাংলা বর্ণমালাকে নতুন করে সাজিয়েছিলেন। তাঁর আগে বাংলা বর্ণমালায় ৫০টি বর্ণ ছিল। তিনি সেগুলিকে কমিয়ে ৪৯টি করেন। তিনি ঋ, ঌ, ৡ, ঃ, ঁ, ৎ, ং, ঽ, ঀ, ঢ়, য়, ৠ, ঌ, ৡ বাদ দিয়ে দেন। তিনি ক্ষ, জ্ঞ, শ্র, ত্র, ঙ্ক্ত, ঙ্ক্ষ, ঙ্ক্ষ্ণ, ঙ্ক্ষ্ম, ঙ্ক্ষ্ম্য, ঙ্ক্ষ্ম্র, ঙ্ক্ষ্ম্র্য, ঙ্ক্ষ্ম্ল, ঙ্ক্ষ্ম্ল্য, ঙ্ক্ষ্ম্ব, ঙ্ক্ষ্ম্ব্য, ঙ্ক্ষ্ম্ব্র, ঙ্ক্ষ্ম্ব্র্য, ঙ্ক্ষ্ম্ল্ব, ঙ্ক্ষ্ম্ল্ব্য, ঙ্ক্ষ্ম্ল্ব্র, ঙ্ক্ষ্ম্ল্ব্র্য, ঙ্ক্ষ্ম্ল্ব্র্য্য, ঙ্ক্ষ্ম্ল্ব্র্য্য্য, ঙ্ক্ষ্ম্ল্ব্র্য্য্য্য, ঙ্ক্ষ্ম্ল্ব্র্য্য্য্য্য, ঙ্ক্ষ্ম্ল্ব্র্য্য্য্য্য্য, ঙ্ক্ষ্ম্ল্ব্র্য্য্য্য্য্য্য, ঙ্ক্ষ্ম্ল্ব্র্য্য্য্য্য্য্য্য, ঙ্ক্ষ্ম্ল্ব্র্য্য্য্য্য্য্য্য্য, ঙ্ক্ষ্ম্ল্ব্র্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য, ঙ্ক্ষ্ম্ল্ব্র্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য, ঙ্ক্ষ্ম্ল্ব্র্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য, ঙ্ক্ষ্ম্ল্ব্র্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য, ঙ্ক্ষ্ম্ল্ব্র্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য, ঙ্ক্ষ্ম্ল্ব্র্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য, ঙ্ক্ষ্ম্ল্ব্র্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য, ঙ্ক্ষ্ম্ল্ব্র্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য, ঙ্ক্ষ্ম্ল্ব্র্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য, ঙ্ক্ষ্ম্ল্ব্র্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য্য, ঙ্ক্ষ্ম্ল্ব্র্য, ঙ্ক্ষ্ম্ল্ব্র্য, ঙ্ক্ষ্ম্ল্ব্র্য, ঙ্ক্ষ্ম্ল্ব্র্য, ঙ্ক্ষ্ম্ল্ব্র্য, ঙ্ক্ষ্ম্ল্ব্র্য, ঙ্ক্ষ্ম্ল্ব্র্য, ঙ্ক্ষ্ম্ল্ব্র্য, ঙ্ক্ষ্ম্ল্ব্র্য, ঙ্ক্ষ্ম্ল্ব্র্য, ঙ্ক্ষ্ম্ল্ব্র্য, ঙ্ক্ষ্ম্ল্ব্র্য, ঙ্ক্ষ্ম্ল্ব্র্য, ঙ্ক্ষ্ম্ল্ব্র্য, ঙ্ক্ষ্ম্ল্ব্র্য, ঙ্ক্ষ্ম্ল্ব্র্য, ঙ্ক্ষ্ম্ল্ব্র্য, ঙ্ক্ষ্ম্ল্ব্র্য, ঙ্ক্ষ্ম্ল্ব্র্য, ঙ্ক্ষ্ম্ল্ব্র্য, ঙ্ক্ষ্ম্ল্ব্র্য, ঙ্ক্ষ্ম্ল্ব্র্য

অক্ষরের অনেকেই সন্তুষ্ট নন। বাংলা মুদ্রণ ও সঙ্গে সঙ্গে বাংলা অক্ষরের সমস্যা তাঁকে বিশেষ ভাবিয়ে তুলেছিল। জলোভাষা শিক্ষার প্রসার ও মুদ্রণের জন্যকে সহজ ও বিজ্ঞানসম্মত করার জন্য তিনি স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণগুলির সংস্কার করেন এবং তাদের একটি অভিনব ক্রম প্রস্তাব করে 'বর্ণপরিচয়', প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ যথাক্রমে ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ এপ্রিল ও ১৪ জুন প্রকাশ করেন। 'বর্ণপরিচয়' প্রকাশ বাংলাভাষা-সাহিত্য তথা মুদ্রণের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। এর ফলে বাঙালির ভাষা যেমন একটি নির্দিষ্ট ক্রম পেয়েছিল, বাংলা হরফও তেমনই একটি প্রমিত বা স্টান্ডার্ড রূপ লাভ করতে পেরেছিল। বর্ণপরিচয়ে তিনি মোট ৫২টি বর্ণ প্রস্তাব করেন স্বরবর্ণ ১২টি, ব্যঞ্জনবর্ণ ৪০টি। তাঁর আগে গঙ্গাকিশোর প্রচলিত ছিল মোট ৫০টি বর্ণ, স্বরবর্ণ ১৬টি, ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৪টি। জলোভাষায় দীর্ঘ-ঈকার ও দীর্ঘ ঊকারের প্রয়োগ না থাকায় বিদ্যাসাগর এই বর্ণ পরিত্যাগ করেন। তা ছাড়া সন্ধিতে স্বরে-ব্যঞ্জনের যেখা হয়, অনুস্বার ও বিসর্গ স্বরবর্ণ হিসাবে পরিগণিত হতে পারে না। সে জন্য এই দুই বর্ণকে তিনি স্বরবর্ণ থেকে সরিয়ে ব্যঞ্জনবর্ণ তালিকায় স্থানান্তরিত করেন। আর চন্দ্রবিন্দুকে এক স্বতন্ত্র বর্ণ হিসাবে তিনি গণ্য করেন। ক ঙ চ ঞ এই তিন ব্যঞ্জনবর্ণ, পদের মধ্যে অথবা পদের শেষে বসলে, ঙ ঞ ণ হয়; এগুলি অর্ধস্বর বলে ধ্বনিত হতে থাকে। কিন্তু যখন আজার ও উচ্চারণ উচ্চারণের পরস্পর ভেদ আছে, তখন এইগুলিকে স্বতন্ত্র বর্ণ হিসাবে উল্লেখ করাই উচিত। এই যুক্তিতে বিদ্যাসাগর এই তিনটি বর্ণকেও স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনবর্ণ বলে নির্দিষ্ট করেন। 'ক্ষ' ও 'হ্ম' মিলে 'ক্ষ' হয়, সুতরাং এটি সংযুক্ত বর্ণ। তাই পূর্ব প্রচলিত 'ক্ষ' অসংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ পদমধ্যে পরিবর্তিত হয়। বাংলাভাষার উচ্চারণের ত, ৎ, এই দ্বিবিধ রূপ প্রচলিত আছে; দ্বিতীয় রূপটিকে বলা হয় 'খণ্ড-ত'।

ইত্যাদি। ঈশ্বর, ঊরু, প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দ লেখার সময় খণ্ড-ত-এরই ব্যবহার হয়ে থাকে। সুতরাং এটিকেও বিদ্যাসাগর ব্যঞ্জনবর্ণ তালিকায় যুক্ত করেন।

বিদ্যাসাগর নতুনভাবে নতুন ছাঁচে অক্ষর তৈরি করান। তাঁর কর্মকুশলার ভিত্তিতে যে বাংলা যুক্তাক্ষর তৈরি হয়েছিল তা বিদ্যাসাগর সাঁট নামে পরিচিতি লাভ করে। অবশ্য লক্ষণীয়, বাংলা অক্ষরের সংখ্যাধিক্যের যে সমস্যা তা এতে মেটেনি। বিদ্যাসাগরের সংস্কারে বাংলা অক্ষরের মোট সংখ্যা বরং বেড়েছিল।

প্রসঙ্গত বাংলাভাষা শিক্ষা ও বাংলা মুদ্রণ সহজতর করার জন্য ক্রিশ্চিয়ান নলেজ সোসাইটির একটি পত্রিকা জন মার্শম্যানের ভাবনা ও প্রয়াসের কথা এখানে উল্লেখ্য। ফুলপাঠ্য এই প্রকাশনায় দীর্ঘকাল যুক্ত থেকে তিনি বাংলোভাষায় প্রয়োগপদ্ধতিতে যে সব অনুবিধার সম্মুখীন হন তারই পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দের ২৭ ফেব্রুয়ারি বিদ্যাসাগরকে লেখা একটি খোলা চিঠিতে বাংলা অক্ষর সংস্কারের কয়েকটি প্রস্তাব করেন। তার মধ্যে উচ্চারণচিহ্ন, বর্ণ-সংযোজনের সমস্যা (পৃ-ত, পৃ-ত প্রভৃতির একটি রূপ প্রচলিত), ব্যঞ্জনের অন্তর্নিহিত স্বরধ্বনিচিহ্নের প্রয়োগ-চিহ্ন (আরবিতে যাকে 'বিরাম' বলে উল্লেখ করেছেন) ব্যবহার নির্দেশ (হেমন্ত মল, ভত) এবং সংযোগচিহ্ন যুক্তাক্ষর বর্জন অর্থাৎ হলন্ত (আরবিতে যাকে 'বিরাম') চিহ্নের সাহায্যে যুক্ত-ব্যঞ্জন ভেঙে সরলীকরণ। শেষোক্ত প্রস্তাবের উদাহরণ হিসাবে তিনি জানান 'চিক্কণ' হতে পারে চিকণ, তেমনই চিন্তা—চিনতা, বন্ধু—বনধু, উল্কা—উলকা, রশ্মিনী—রশমিনী। তিনি প্রবণতা ও-কলা, ও-ফলা প্রভৃতি কয়েকটি চিহ্ন বা কিছু কিছু যুক্তবর্ণ (যেমন, 'ক্ষ') রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। আরবিতে বলেছেন, প্রস্তাবিত সংস্কারের ফলে বাংলাভাষা লেখা, ছেপা, পড়া ও শেখা সহজ হবে, ফলে যাতে বাংলা হরফের পুনর্গঠন সহজ হতে পারে তার ব্যবস্থা করা যাবে। এই প্রস্তাবের উত্তরে বিদ্যাসাগরের বক্তব্য কি ছিল জানা যায়নি। সেদিন তাঁর সংস্কার প্রস্তাবও কার্যকর হয়নি। কিন্তু এর প্রয়োজনীয়তা আজ নতুন করে স্বীকৃত হতে চলেছে। পরবর্তিকালে বন্ধুর কাছে এই চিঠিতে মার্শম্যান সুস্পষ্টভাবে বলেছিলেন : "Though the proposal may now be treated with ridicule, its adoption is a mere question of time."

বর্ণ সংস্কার প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় উল্লেখ্য, বিদ্যাসাগর তাঁর বর্ণপরিচয়ে প্রতি বর্ণের নিচে ছবির (যেমন : ক-এর সঙ্গে কলসের, খা-এর সঙ্গে আনারসের) যে বিশেষত্বটি গভীরভাবে নজর দিয়েছিল তা নয়, সেদিন তা আলোড়ন শিক্ষা ও প্রকাশনের জগতে তুমুল আলোড়ন এনেছিল।

এ ছাড়া বিদ্যাসাগরের আর একটি যে বড় পরিচয় তা হল তিনি ছিলেন একাধারে প্রকাশক, পুস্তক-বিক্রেতা ও ছাপাখানার মালিক বা মুদ্রণ-ব্যবসায়ী। ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সঙ্গে যৌথভাবে পটলডাঙায় ৬২ নং আমড়াতলি স্ট্রিটে সংস্কৃত প্রেস (বা যন্ত্র) নামে একটি

কথামালা

KATHAMALA

EXEMPLARY AND INSTRUCTIVE

BIOGRAPHY

ISHWAR CHANDRA VIDYASAGAR

SECOND EDITION.

চরিতাবলী।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত।

দ্বিতীয় বার মুদ্রিত।

CALCUTTA:

THE SANSKRIT PRESS.

College Square No 1

Printed And Published

ছাপাখানা স্থাপন করেন। নীলমণির কুশেপাতায়ের কাছ থেকে ৬০৲ টাকা ধার করে একটি পুরনো কাঠের প্রেস ও ছরফ কিনে এই ছাপাখানার কাজ আরম্ভ করেন। এই প্রেসে ছাপা প্রথম বই কাশীনাথের 'হাস্যার্ণব' (১৮৪৭) মুক্তারাম বাবুর গলির মুখে পুরি আলুরদমের দোকান। এর আগে বিদ্যাসাগরের নিজের লেখা প্রথম বই 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭) ওল্ডফোর্ডের প্রসিদ্ধ হোরেস হেম্যানের মুক্তারাম বাবুর ছাপা হয়। তাঁর পরবর্তী বই 'আখ্যানমঞ্জরী ইতিহাস' (১৮৪৮) ছাপাতে দিয়েই নিজের ছাপাখানা স্থাপনে তিনি উদ্যোগী হন। পরবর্তীকালে (১৮৫৯) বিদ্যাসাগর এই সংস্কৃত প্রেসের সম্পূর্ণ মালিক হন। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি এর দুই-তৃতীয়াংশ অংশ হাজার টাকায় রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও কালীকিঙ্কর ঘোষকে বিক্রি করে দেন। এই প্রেস থেকে তাঁর নিজের ও অন্যদের সম্পাদনাকৃত বই এবং অন্যের বিভিন্ন সংস্করণের হাজার হাজার কপি ছাপা হয়েছে। 'বর্ণপরিচয়' বছরে ৫০ হাজার কপি করে বিক্রি হয়। বিদ্যাসাগরই সর্বপ্রথম বাংলাভাষায় বেতনভোগী হয়ে সংস্কৃত পুস্তক ছাপবার ব্যবস্থা করেন।

প্রেসের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি (১৮৫৫) স্থাপন করেন। সেখানে সংস্কৃত প্রেসে ছাপা সকল বই বিক্রির জন্য মজুত থাকত। এ ছাড়া অন্যের প্রকাশনগৃহ পরিদর্শনে বিক্রির জন্য সেখানে মজুত হত। ফলে তাঁর বইয়ের ব্যাপক ইতিহাস জমে ওঠে। শুধু মুদ্রণশালা বই মুদ্রণ-প্রকাশন-বিক্রয়ের তাঁর মালিক পড় পাঁচ পাঁচটি প্রতিষ্ঠানে তিন চার হাজার টাকা।

জীবনচরিত।

সংস্কৃত ও ইংরেজী পুস্তক অনুসারে

কলিকাতা।

বোধোদয়।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত

কলিকাতা।

এইভাবে তখনকার বাংলার কর্মক্ষেত্রেই প্রকাশন সংস্থার মালিক হন বিদ্যাসাগর। বাংলা পাঠ্যপুস্তকের চাহিদার বিদ্যাসাগরের একচেটিয়া অধিকার ক্ষুণ্ণিত হওয়ায় স্কুল বুক সোসাইটি প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে। কলেজ স্ট্রিট পাড়ার আধুনিক বইয়ের দোকানেরও পথপ্রদর্শক ছিল বিদ্যাসাগর। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যাসাগর প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে তাঁর ডিপজিটরির স্বত্ব ত্যাগ করেন। পরে ডিপজিটরি থেকে সকল বই তুলে নিয়ে ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বৃদ্ধবয়সে তিনি ২৫ নং সুকিয়া স্ট্রিটে 'সংস্কৃত যন্ত্র' নামে একটি নতুন বইয়ের দোকান খোলেন। তখন থেকে বিদ্যাসাগরের নিজের ও কলিমপ্রিটের বইগুলি এই দোকান থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। তিনি মাত্র দুখানি বই এম. কে. লাহিড়ী কোম্পানিকে বিক্রি করেছিলেন।

প্রাক্‌আধুনিক বাংলা মুদ্রণজগতে সবচেয়ে ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরূপে তাঁর বিদ্যাসাগর উপাধিরও কারণ অনুসন্ধান করা দরকার। তিনি তাঁর শিক্ষার আদর্শ কার্যকর করার জন্য নিজেই কাজে অগ্রসর হয়েছিলেন। শিক্ষা বিস্তারের জন্য গ্রামে গ্রামে নানা বই রচনা করেছেন, ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করে নিজেই তা চালিয়েছেন, আবার তা বিক্রির জন্য বইয়ের দোকানও স্থাপন করেছেন। শিক্ষার প্রসার ছাড়াও অর্থনৈতিক সাফল্য লাভও যে এতে সম্ভব তাও তিনি দেখিয়েছেন। এইভাবে তিনি অধিকাংশ বাংলা বইয়ের ব্যবসায়ের ভিত্তি স্থাপন করে যান।

বাঙ্গালীর সারস্বত সাধনা-বই-বইমেলা

শ্রীসুবকান্তি রায়

উনবিংশ শতাব্দীর অন্তপ্রহরের মুহূর্তে এক আধুনিক যুগের উন্মেষ-ক্ষণের লগ্নে বাঙ্গালীর সারস্বত সাধনার উজ্জ্বল দীপ্তি সমগ্র ভারতবর্ষের বুদ্ধির জগৎকে আলোকিত করে ছিল। ইংরেজ শাসনের প্রতিদানে অবশ্যই আমরা পরাধীনতার শৃঙ্খলকে বরণ করে নিয়েছিলাম। কিন্তু সে সময় বুদ্ধির জড়তার জটা—পুরো দেশের বুকে যে নব-চেতনা সঞ্চার বুদ্ধিমুক্তির আন্দোলনের একটা ঝঞ্ঝাও বয়ে গেছিল তা অনস্বীকার্য। এ সাধনার প্রথম পরিচ্ছেদে রামমোহনকেই আমরা স্মরণ করি।

বাঙ্গালী জাতির আধুনিককালের সারস্বত সাধনার আলোচনার সূত্র ধরে আমাদের বলতে হবে তার জীবনে আন্দোলনের এ বেগপ্রবাহ কোন আকস্মিক বিষয় নয়। এর একটা প্রবাহ পটভূমি অবশ্য হলেও সহজে বিশ্লেষণে ছিল তার জাতীয় চরিত্রে যুগে যুগে প্রতিফলিত হতে। তবু সামগ্রিক ভাবে প্রায় সহস্র বছরের ঐতিহাসিক শাসনের কারণে মাটির তলার শাবনি ঘাসটির পুষ্টিশোষকতা আর সহজলভ্য আয়তনের চর্চায় মূল বিষয় ছিল সহজবর্ত, বহুবিস্তৃত জনসমাজের নয়।

প্রথমার্ধ (মুসলমান নিকটবর্তী পূর্ববর্তী ও সমবর্তী নবীন বঙ্গবাসী মুসলমান) ও আর্যাবর্তের পরিচিতির বহু যুগে প্রায় প্রহরান্তে অবহিত বঙ্গদেশে আর্যজ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষার প্রসার ঘটেছিল বহু বিলম্বে। কেন-ব্রাহ্মণের আর্য অধিকার প্রায় ভারতকে ত্রেতা পুরীতে লেখানো নানা আছেন। তার প্রধান কারণ ছিল প্রায় বঙ্গবাসীর ভূগোল তারা আর্য ভাষী হাদের নিজস্ব অধীন। কেন কোন আর্য-ঋষি—এ দেশকে 'যম ধুর দেশ' বলে আখ্যায় করেছেন। অনেকে আবার এ দেশের মানুষকে অসুর প্রকৃতির নিশিষ্ট করেও আখ্যা দিয়েছেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এ দেশ অসুরের দেশ বলে বর্ণিত, তারার ঔপায়ন রামায়ণে বলা কালে এ দেশ ম্লেচ্ছদেশের দেশ বলে উল্লেখ করেছেন। ক্রমে আর্য ভাষা ও সংস্কৃতির বিস্তার হতে থাক কথাল প্রায় আয়তে। তবে পণ্ডিতদের মতে তা কথোনীয় আর্য ভাষা ও সংস্কৃতি নয়। তা ছিল হুবহুত আলোচনীয় আর্যদের ভাষা ও সংস্কৃতি তারা 'বহিরার্য' নামেও অখ্যাত। তারা ছিলেন অবৈদিক আর সে কারণে যজ্ঞকর্মে বিরোধী 'অবজ্ঞ'। পণ্ডিতরা বলে থাকেন ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলের অনার্যভাষা, উহার ভাষাতত্ত্বের আধিপত্য হতে পৃথক ছিল। এ অবৈদিক প্রভাব অবশ্যম্ভাবী ও সংস্কৃতির পথ অনুসরণ করে ক্রমশ উত্তর ও মধ্যভারতীয় আর্যভাষা প্রাধান্যে বিস্তার লাভ করেছিল। এ কারণেই কেন-বেদান্ত এমন কি ধর্মশাস্ত্র ও ধর্ম সূত্র এবং অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার, এই সঞ্চয়ে বাঙ্গালী জাতির নিজস্ব কিছুতে পৌঁছেছিল। এ আত্মাবলম্বী আবহমানের পরিচয়ের বিশেষ মধ্যভারতীয় সমাধীনতা, বলিষ্ঠ আর্থবহতা, নৈতিক আত্মসুস্থতার। ক্রমে আর্য ও অনার্য নর-নারীর ক্রমশ মৌল, মৈত্রী ও প্রাক্তন ধর্মের পঞ্চপুটে আমাদের লোকের সঙ্গে সঙ্গে আর্যভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে মিলাত হয়ে গেল। কিন্তু তার পূর্বেও বাঙ্গালী জাতির সারস্বত সাধনার একটি ধারা গড়ে উঠেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু তার কোন নিদর্শন আজ আর লভ্য নয়, কারণ এসব রক্ষা করে একবার হয়ে থাকা কালে পৌঁছে দেওয়ার বাহন ছিল তালের লিপি। সহস্রবর্ষ পরে নিয়ন্ত্রা তা আয়ত্ত করতে পারেন নি। আর্য আগমনের পরেই, পণ্ডিতরা খ্রিস্টের জন্মের অন্তকাল পূর্বে বলে স্থির করে থাকেন। বাঙ্গালীর পঞ্চম আর্য ও

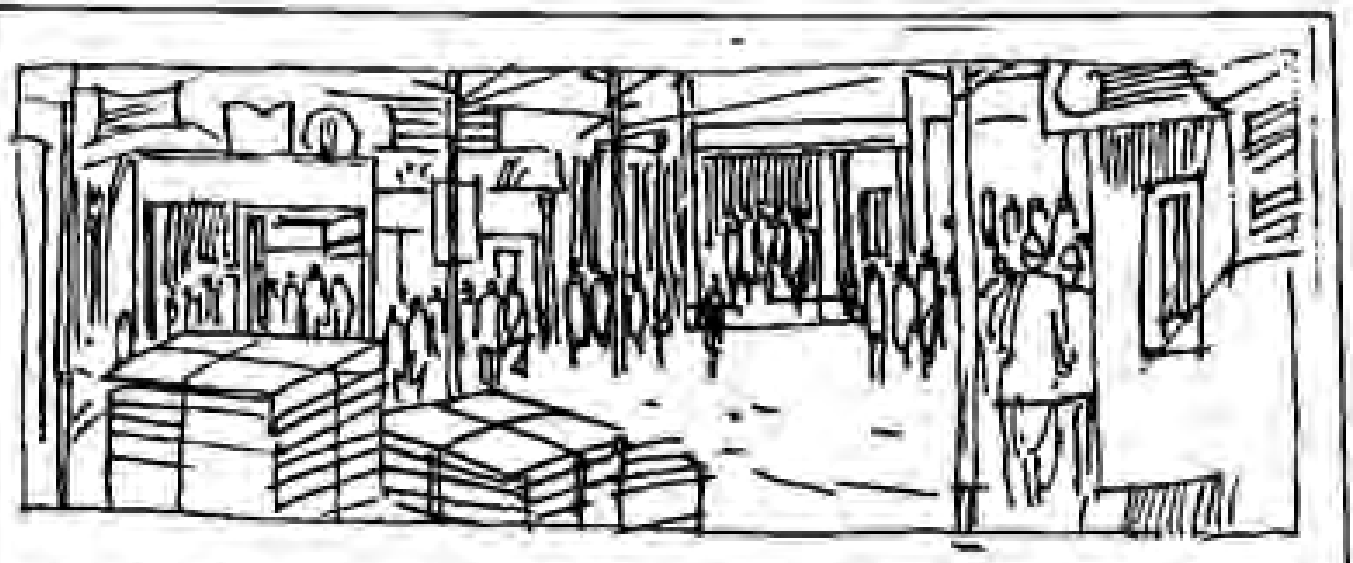

আবেগের অপরিণত মনিষ্ঠাগুলি। এই কথা তাদের সমস্যা এবং চরিত্রিক নৈশিষ্ট্য। তাদের ধর্ম ভাবনা, আনন্দময়, বুদ্ধিবাদ ও যুক্তিবাদ। সম্ভবত এ কারণেই ঐতিহ্যগত স্থানে এ জাতির মধ্যে বুদ্ধি গ্রহণ যুক্তির ভাবনা প্রবল আকার ধারণ করেছিল। তাই লক্ষণীয়, গৌড়া শাস্ত্রজ্ঞানীদের নৈয়ায়িকদের পাশাপাশি স্বাধীনচেতা শাস্ত্রজ্ঞানেরও সমাবেশ ঘটেছিল বঙ্গদেশে। তিব্বতীয় পাণ্ডিত্যের রূপান্তরের আলোচনায় বাঙালীর সংস্কৃত সাধনায় কোন আঞ্চলিক ব্যাপার নয়। বলতে পারি উপযোগী পরিবেশে তা ছিল বাঙালী জাতির সুপ্তশক্তির নব-প্রকাশ।

ভারতবর্ষের আর্যদের ধর্ম যা ক্রমে হিন্দুধর্ম বলে পরিচিত হলো, তা কেন নির্ভর। অথচ লক্ষণীয়, বাঙালীর প্রাচীন সংস্কৃত সাধনায় বেদ ও বেদের চর্চা তেমন বিশিষ্ট স্থান লাভ করেনি। বৌদ্ধধর্ম বাঙালীর জীবন অধিকার করেছিল তা নিঃসন্দেহ। গৌতমবুদ্ধ যে ব্রাহ্মণ অস্বীকার করে এ জীবন থেকে নিবৃত্তির মধ্যের এক নূতন পথের সন্ধান পেয়েছিলেন তা ছিল মুক্তি নির্ভর এক চৈতন্য। তাঁর বাণী ছিল সমস্ত বিশ্বের মানুষের মধ্যে সাম্যবোধের প্রথম বাণী। লক্ষণীয়, বুদ্ধের এ ধর্ম বাঙালীর সংস্কৃত সাধনায় এক বিশেষ স্থান লাভ করেছিল। তাছাড়া এমন নয় যে শাক্য শ্রমণ গৌতম বঙ্গদেশেরই সন্তান ছিলেন। প্রতীচ্য ভাষায় তাঁর ধর্ম প্রচারে তাঁরা বুদ্ধদেব এসেছিলেন বলে জোর গলায় বৌদ্ধ সাহিত্য গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। চীনা পরিব্রাজক হুয়ান চোয়াঙও বলেছেন বুদ্ধদেব পুণ্ড্র বর্ধন, সমতট ও কর্ণসুবর্ণে এসে ধর্ম প্রচার করেছিলেন। এতে— সন্দেহ, তাঁর বাংলাদেশে আগমন ঐতিহাসিক সত্য বলে মনে করেন না পণ্ডিতরা। সে যাই হোক্, অশোক অনেকের পূর্বেই বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে লাভ করেছিল। প্রতিষ্ঠিত সর্বজনগ্রাহ্য ধর্ম-দর্শনের বিরুদ্ধে তার বলিষ্ঠ প্রতিবাদ বঙ্গবাসীর মনকে বিশেষভাবে নাড়া জাগিয়েছিল। তাই লক্ষ্য করি ইতিহাসের এ পর্বে বঙ্গদেশে গড়ে উঠেছিল অগণিত বৌদ্ধ বিহারসহ শীঘ্র যার নাম বহির্ভারতের বৌদ্ধবিহারগুলী চেলেস্থলিতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। এসব মাধ্যমেই বৌদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতির পরীর মধ্যে শাস্ত্র-পাঠনের ব্যবস্থা ছিল। তা নিয়ে বৌদ্ধ শিক্ষাচার্যগণ অনেকে মহাযানী, বজ্রযানী, মন্ত্রযানী, সহজযানী গ্রন্থ রচনা করেছিলেন সংস্কৃত, অপভ্রংশ ও প্রাচীন বাংলা ভাষায়। হুয়ান চোয়াঙ অশোকের স্মৃতি বিজড়িত স্তূপ দেখতে পেয়েছিলেন বঙ্গদেশের পুণ্ড্রবর্ধনে, সমতটে, কর্ণসুবর্ণে ও তাম্রলিপ্তিতে। পঞ্চম শতকে তাম্রলিপ্তিতে এসে চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন ও পুঁথিসমূহ নকল করে নিয়ে গিয়েছিলেন। সপ্তম শতকে হুয়ান চোয়াঙ অঞ্চলে, পুণ্ড্রবর্ধনে, কামরূপ, সমতটে, তাম্রলিপ্তি এবং কর্ণসুবর্ণে এসেছিলেন। তিনি এসব জনপদের অধিবাসীদের জ্ঞানস্পৃহা ও জ্ঞান চর্চার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এসব অঞ্চলেই তিনি বিহারে সব বৌদ্ধ বিহার ও অন্যান্য বৌদ্ধ প্রধানদের অবস্থানরত দেখেছেন। বলাবাহুল্য নবম্বিদ্যালয়ের সঙ্গে অষ্ট-নবম শতকের বাংলার জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষার বিশেষ-যোগসূত্র গড়ে উঠেছিল। সমসাময়িক কালের তাম্রলিপ্তির জ্ঞানপীঠের সুখ্যাতি চীনা পরিব্রাজক ই-ৎসিং-এর প্রবল বৃদ্ধশ্রদ্ধাও বর্ণিত। এই বৌদ্ধ প্রধান নিম্ন বাংলা বহুর তাম্রলিপ্তিতে অবস্থান করে সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করে বৌদ্ধধর্মশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। তাওলিন নামে অপর এক বৌদ্ধ প্রধান তিন বছর তাম্রলিপ্তিতে অবস্থান করে সংস্কৃত শিখে সর্বাস্তিবাদ নিকায়ে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। ইৎ সিঙ ৬৭৫ খ্রিস্টাব্দে তাম্রলিপ্তিতে এসে তাঁর সঙ্গে একাদশবার পো-সো-হো-বিহারে হুয়ান-চোয়াঙ-এর সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি এই বিহারে সংস্কৃত ভাষা ও শব্দবিদ্যা চর্চা করেছিলেন। এ ছাড়াও অনেক চীন বৌদ্ধ পরিব্রাজক বাংলার বৌদ্ধ বিহারগুলিতে এসে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা

P, 10, 716

করেছেন। এখন বিহার ও সারনাথসহ নালন্দা ছিল এক একটি আবিদ্যালয়। সেখানে বৌদ্ধধর্ম ছাড়াও ব্যাকরণ, দর্শনশিল্প, জ্যোতিষ, চিকিৎসাবিদ্যা, চতুর্বেদ, ন্যায়শাস্ত্র, সাংখ্য, ত্রিপিটক, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদি পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা ছিল। চুয়ান চোয়াঙ-এর বর্ণনা অনুযায়ী সে সময় আলাদা আলাদা মন্দির ঘিরে প্রায় দশটি বিহারের অস্তিত্ব ছিল।

অতীশের কালে বাংলার বৌদ্ধ জগৎ ও সমাজ নিয়ে আমরা কিছু আলোচনা করেছি। তিনি ছিলেন সমতটের রাজপরিবারের সন্তান। জন্মস্থানের ব্যাপারে বিভিন্ন সূত্রে পরিচয়ের পর তিনি বজ্রযোগিনীর দিব্য লাভ করেন এবং আচার্য বর্মপালের তত্ত্বাবধানে তন্ত্রসাধনা শুরু করেন। বৌদ্ধধর্মের সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয়গুলোর তিনি গভীর জ্ঞান লাভ করেন। তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ও জীবনচর্যার কঠিনতা দূর-দূরান্তে বিস্তৃতি লাভ করেছিল। মাত্র তিন বছর বয়সে গুরুর আহ্বানে তিনি অখিল ভারত থেকে আগত এক ব্রাহ্মণ আচার্যের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে তাকে পরাজিত করলে তাঁর প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পায়। তাঁর বিজয়ের গল্পটি হচ্ছে মগধের রাজা তাঁকে একটি প্রশ্নের সমাধান দিতে ডাকলে পুরোহিত দিতে চাইলে তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও তা গ্রহণ করে এই অপবিদ্যার এক বিষয়ে নিপুণ ও তার উদ্ধারকারকদের অপেক্ষায় করেন। দীপঙ্কর ফিরে আসলে মহাবিহারের আচার্য পদে বৃত হয়েছিলেন। তাঁর সময় এই মহাবিহারের আবাসিক প্রজ্ঞাদের সংখ্যা ছিল এক সহস্র। দীপঙ্কর ছিলেন সমন্ত শাস্ত্র ও সূত্রে সুপণ্ডিত। চুয়ান চোয়াঙ তাঁর নিজস্ব হোমোসত্ত্ব অধ্যয়ন করে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

জন্মসূত্রে এক ব্রাহ্মণী বৌদ্ধ আচার্য ছিলেন দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান (অতীশ)। তাঁর জন্ম হয়েছিল পূর্ব ভারতের (বর্তমান বাংলাদেশ) বিক্রমপুরে। আনুমানিক ৯৮০ খ্রিস্টাব্দে গৌড়রাজ পরিবারে তাঁর জন্ম। পশ্চিম ভারতের কলমেরি বিহারে ভ্রমণ শুরুর পিছনে তিনি বৌদ্ধ জগতে শীক্ষা লাভ করলে তাঁর নামকরণ হয়—তত্ত্বজ্ঞান সন্ত। কলমেরী বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষদের অনেকেই পড়ুয়ের মধ্য অনেক হইল দূরে আরও এক বিজ্ঞানকর আচার্যবিদি। মনস্কারণে তার পরিচালক অবস্থায় ছিল প্রায় এক হাজার বছর। পরে শাসনের বিভীষ পদকে ইতিহাস ধারা তার খুনরোদ্ধার করা হয়েছে। তিনি যখন যখনে এসমস্তপূর্ব বিহারে মহাযানিক আচার্য নীলমজিত্রের নিকট শীক্ষা গ্রহণ করলে তাঁর নামকরণ হয়—দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। তাঁর সারাজীবন সাধনার দৃষ্টান্ত এক কথায় বিস্ময়। এ দীর্ঘ সাধনা হাতে দীর্ঘ তপস্যায় টেনে নিয়ে গেছে দেশ-দেশান্তরে। অবশেষে বহুঁশাল কঠিন আঘাত হয়ে তিনি বিক্রমশীলা মহাবিহারের মহাচার্য পদে বৃত হন। এ সময়েই তিব্বতের বৌদ্ধ রাজার নিকট থেকে তিনি এখানে যাওয়ার নিমন্ত্রণ পান। প্রথমে প্রত্যাখ্যান করলেও তাঁকে তিব্বতে যেতেই হল। তত্ত্বজ্ঞান ছিলেন বিক্রমশীলা মহাবিহারের অধিনায়ক। তিন বছর পরে পণ্ডিত দীপঙ্কর বিক্রমশীলা মহাবিহারের ফিরে আসবেন এই শর্তে তিনি তাঁকে তিব্বতে যাওয়ার অনুমতি দেন। কারণ ছিল, বিহারের ভিক্ষু সংঘ নানাবিধ নৈতিক ও মানসিক দৈহিকতা শিকার হয়েছিল। তাদের শাসনে রাখার মতো ক্ষমতা একমাত্র দীপঙ্করেরই ছিল। তাঁর তিব্বত যাত্রার প্রাক্কালে বজ্রাসন বিহার থেকে বলেছিলেন: অতীশ না ফিরলে ভারতবর্ষ অন্ধকার। এর বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা তাঁরাই হবে। তাঁহার অনুপস্থিতিতে এই সব প্রতিষ্ঠান শূন্য হইয়া যাইবে। চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, ভারতবর্ষের দুর্দিন ঘনাইয়া আসিতেছে। অনাগত দুরদৃষ্ট দৈন্য ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতেছে, আমি অন্তরঙ্গ চিকিৎ দেখ রহিতেছি। তবুও আশীর্বাদ করিতেছি, তুমি, অতীশ ও তোমাদের সন্তীয়রূপ লইয়া তোমাদের ফিরে যিরিয়া যাও, সমস্ত প্রাণীর কল্যাণের জন্য অতীশের দেহ ও কর্ম নিয়োজিত হউক। (ডঃ নীহাররঞ্জন রায় কর্তৃক উদ্ধৃতিত বাঙালীর ইতিহাস—দ্বিতীয় খণ্ড)। বিনয় ধর, তিব্বতে দীপঙ্করী অবস্থান (দ্বিতীয় বিদ্যালয়)। বিনয় ধর, দীপঙ্করী পণ্ডিত পাটলিপুত্র, পণ্ডিত ভূবিপাল এবং অপরাজিতরক্ষ ভূমিসংস্কারে সঙ্গে নিয়ে দীপঙ্কর নেপালের পুর্বাঞ্চলের পথে তীব্রযাত্রিমুখে যাত্রা করলেন। যাত্রাপথে তাঁরা ধূবার জন্য কয়েক মাসের বিশ্রাম করেছিলেন, পাটলিপুত্রের বৃদ্ধ ঘটিল। নেপালরাজ জনস্তকীর্তির সঙ্গে দীপঙ্করের সাক্ষাৎ হলে তাঁর পুত্র পদ্মগর্ভ তাঁর নিকট বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে তীব্রযাত্রার পথে তাঁর সহযাত্রী হলেন। তীব্রতের সৌহার্দে রাজপরিবারে দীপঙ্করকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তীব্রতের সর্বত্র ভ্রমণ করে তিনি মহাযানী বৌদ্ধধর্ম প্রচার করলেন। দীর্ঘ তের বছর তীব্রতে অবস্থানের পর ১০৫৩ খ্রিঃ এখানেই তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁর জীবনের সারসংক্ষেপ লিপি করতে গিয়ে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন, 'চরিত্রে, পাণ্ডিত্যে, প্রতিভায়, অন্যান্য পরিমাপ দীপঙ্কর সমসাময়িক ভারতের ও ভারতবর্ষের অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। পূর্ব ভারত ও তীব্রতের মধ্যে যোগাযোগ সিলমোহর রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারই মধ্যে দীপঙ্করের নাম সর্বাগ্রে এবং সকলের পুরোভাগে আসীন।' দীপঙ্করের বিদায় গ্রহণ করার মুহূর্তে রাজপুত্র নেপাল দুর্দিনের যে আশঙ্কা করেছিলেন তা কিন্তু অক্ষরে অক্ষরে সত্যরূপে প্রতিপন্ন হয়েছিল। দীপঙ্কর ১৭৭ খানি মৌলিক গ্রন্থ বা অনুবাদ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তীব্রতীয়রা আজও অতীশ দীপঙ্করের প্রতি শ্রদ্ধাবনত, বুদ্ধের পাশেই তাঁর মূর্তির সংস্থাপিত হয়। তা ছাড়া লক্ষ করেছিলাম প্রায় তিন বছর পূর্বে পাকিস্তান এর লাহোরে পুরু পরবে অবস্থিত বৌদ্ধ মন্দির পরিদর্শনের সময় ওখানকার সাধারণ লোকের সঙ্গে কথা বলে। একাদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙালী জাতির সাহসিক সাধনায়

সিলেটী নাগরী লিপিতে ছাপা পৃষ্ঠা

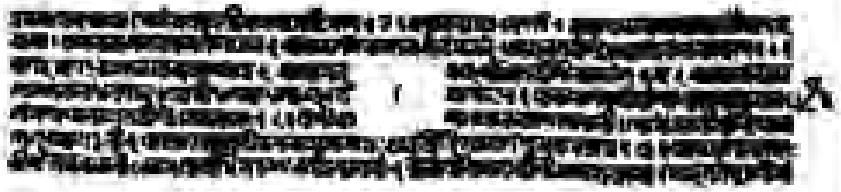

ঈশপকথাতত্ত্বের একটি পৃষ্ঠা

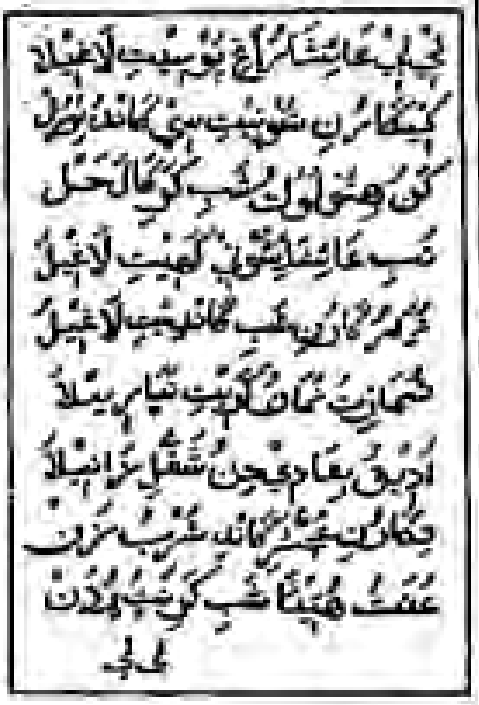

আরবী লিপিতে ছাপা পৃষ্ঠা

অক্ষরের গড়ন, ঈশপতত্ত্বের পুঁথির প্রতীক হয়ে অপেক্ষা করেছিল এক নবযুগের সূচনার জন্য।

পুঁথি

বাঙলার সাধনার বিশেষ ঐশ্বর্যসমৃদ্ধ হলো মুক্ত বুদ্ধি, মুক্ত পরিবেশ, শাস্ত্রীয় বাক্সর্বস্বতা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অবাধ আদান-প্রদান ও মনোযোগ। আর প্রধান বাহন হলো তার হাত দ্বারা লিপিবদ্ধ হয়ে উঠবার আগে এ লিপিবদ্ধ ভাষাকেই হলো বই। মুদ্রাযন্ত্রের আবির্ভাবে এক যুগান্তকারী ঘটনা এক্ষেত্রে। বঙ্গদেশে মুদ্রণযুগের সূচনা হয়েছিল ইংরাজ ও অন্য ইউরোপীয় বণিকদের আগমনের সূত্রে। যে সঙ্গে এসেছিল কারুক। শাসনতন্ত্র জাতিসমূহের আগমনের সঙ্গে সূচনা হলো আধুনিক যুগের, সঙ্গে এল ছাপাখানার কল, ছুরা হরফ, তার বিদ্যা ব্যবস্থা ও সংবাদপত্র। এ মুদ্রাযন্ত্র ও ছাপাখানার কলের কারণে পুস্তক প্রকাশনার সাধারণে শিক্ষার বিস্তার সহজ হলো আর আরম্ভ হলো পুঁথির। আমুর নূতন করে উদ্ভূত হলো এ আধারটির দ্বারা বিশেষ জানার জন্য। এসব কারণেই ব্রাহ্মণেরা মাতৃভাষায় তাঁর ধর্ম অনুষ্ঠান কর্ম ও বিধি মূল ভাষা দ্বারা এগিয়ে আসতে দেখেছিলেন ছাপার কলে এই পুঁথি প্রকাশনের কাজে হাত দেন। তিনি 'নিমাই-চরিত আখ্যান' নামে বাংলা ভাষায় এক পুস্তিকাও প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর এসব মহৎ কর্ম করার পিছনে কেলোলার্স ও ফিলিপ সাহেবের প্রভাবে সেরেম্পুরলেখনে কাজ করার সময় ঘটিত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণই দেখতে হবে। সাধনার সাধনা আত্মসন্তোষ লাভের জন্য নয়। এ সাধনার বিনিময়ে ভাষাসেবীরা লাভ করে অন্ধকারে আলোর সন্ধান, মুক্তির আশ্বাস। এ সাধনার একটা বাস্তবসম্মত দিক রয়েছেই আছে।

আধুনিক যুগে বাঙলার ভাষার জন্যে এমন আয়োজনের সূত্রপাতের ছিল ছিন্ন ব্যাপক যার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৮১৭ খ্রিঃ। এ অঞ্চলের শিক্ষক হিসেবে ডিরোজিও (১৮০৮-১৮৩১—২৬-১২-১৮৩১) ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে যোগদান করেন। সাধারণ আংলোসাক্সনের বর্ণবীজিয়ারা প্রায় সবাই ছিলেন তাঁর শিষ্য। ছাত্রদের বিশেষে পরিচালনা করার প্রতিযোগে ২৩-৪-১৮২৯ তারিখে তাঁর অপসারণ হওয়ার পর হলে তিনি ২৩-৪-১৮২৯ তারিখে তার ডিরোজিওর পরামর্শে এই অঞ্চল থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ডিরোজিওর শিক্ষার ফলে ছাত্রদের মধ্যে নূতনের সন্ধান করার মানসিকতা কি প্রবল আকার ধারণ করেছিল তার এক নিদর্শন মিলবে পেয়ারের 'একু আর বিলন' বইখানির বিষয়ের ইতিহাস। কলকাতায় এক আমেরীয় পুস্তক বিক্রেতা আমেরিকা থেকে বইখানির একশত কপি আমদানী করে প্রতি কপি ১ টাকা মূল্যে বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞাপন দিলে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে তার এমন চাহিদা ছিল যে ১ টাকা মূল্যের বই ২ টাকায় বিক্রয় হয়ে গেল। অনেকে তাও পেল না। তার পরেই বইখানির বঙ্গানুবাদ এক বাংলা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই সম্বন্ধে ডলটেয়ার বলেছিলেন Books ruled the world or at least these nations (ie) which have a written language, the others do not count. নবনব জ্ঞানের আকর পুস্তক পাঠের উদ্যমের অনুরূপ ছাত্র-স্বাধীন ও বন্ধুত্বের সম্পর্কগুলিকে আবিষ্ট করে রেখেছিল। তার এক আর নিয়েই কলীনত্বের বুদ্ধি ও বুদ্ধি ছাড়া বৈজ্ঞানিক পুস্তিকাদিতে সংরক্ষিত হিতার কলের মনস্বিকতা সেই দিন জন্ম

৬ যীশু খ্রীষ্ট মহিমার বর্ণনা

৪১ শূলদণ্ডের উপর তোমরা যাঁহাকে ঝুলাইয়াছিলে তিনি মৃত্যু হইতে পুনরুত্থিত হইয়া যে ঈশ্বর আমাদের পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর তিনি তাঁহাকে মহিমান্বিত করিয়াছেন। ৪২ কিন্তু তোমরা যাঁহাকে ঝুলাইয়াছিলে তিনি ঈশ্বরের মনোনীত ব্যক্তি। ৪৩ তোমরা তাঁহাকে হত্যা করিয়াছ। তোমরা তাঁহাকে মৃত্যুর হাতে তুলিয়া দিয়াছিলে। কিন্তু ঈশ্বর তাঁহাকে মৃত্যু হইতে পুনরুত্থিত করিয়াছেন। ৪৪ দায়ূদ স্বর্গে যান নাই। কিন্তু তিনি বলিয়াছিলেন,

'প্রভু আমার প্রভুকে বলিলেন,
আমার ডানদিকে বস,
৪৫ যতক্ষণ না আমি তোমার শত্রুদের
তোমার পায়ের তলায় রাখি।'

৪৬ অতএব ইস্রায়েলের সমস্ত লোক নিশ্চিতরূপে জানুক যে, ঈশ্বর যীশুকে প্রভু ও খ্রীষ্ট করিয়াছেন। তোমরা যাঁহাকে ক্রুশে দিয়াছিলে ঈশ্বর তাঁহাকেই প্রভু ও খ্রীষ্ট করিয়াছেন।

৪৭ লোকেরা এই কথা শুনিয়া অন্তরে অত্যন্ত ব্যথিত হইল। তাহারা পিতর ও অন্য প্রেরিতদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভাইসকল, আমরা কি করিব?"

৪৮ পিতর তাহাদিগকে উত্তর দিলেন, "তোমরা প্রত্যেকে মন ফিরাও এবং তোমাদের পাপের ক্ষমার জন্য যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তিস্ম গ্রহণ কর। তাহা হইলে তোমরা পবিত্র আত্মাকে দান হিসাবে পাইবে। ৪৯ এই প্রতিজ্ঞা তোমাদের জন্য, তোমাদের সন্তানদের জন্য এবং যাহারা দূরে আছে তাহাদের সকলের জন্য। প্রভু আমাদের ঈশ্বর যতজনকে ডাকিবেন তাহাদের সকলের জন্য এই প্রতিজ্ঞা।"

৫০ পিতর আরও অনেক কথা বলিয়া তাহাদিগকে সাবধান করিলেন। তিনি তাহাদিগকে অনুরোধ করিলেন, "তোমরা এই দুষ্ট লোকদের কাছ হইতে নিজেদের রক্ষা কর।"

৫১ পিতরের কথা যাহারা বিশ্বাস করিল তাহারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করিল। সেদিন প্রায় তিন হাজার লোক বিশ্বাসী হইল।

৫২ তাহারা প্রেরিতদের কাছে শিক্ষা লাভ করিতে লাগিল। তাহারা একসঙ্গে বাস করিত। তাহারা একসঙ্গে খাবার খাইত। তাহারা একসঙ্গে প্রার্থনা করিত।

৫৩ যীশুর শিষ্যেরা প্রত্যেকে ভয়ে ভয়ে থাকিত। প্রেরিতেরা অনেক আশ্চর্য কাজ ও অলৌকিক চিহ্নকাজ করিতেন।

৫৪ যাহারা বিশ্বাস করিয়াছিল তাহারা সকলে একসঙ্গে থাকিত। তাহারা সবকিছু সকলের সঙ্গে ভাগ করিয়া লইত। ৫৫ তাহারা তাহাদের সম্পত্তি ও জিনিসপত্র বিক্রি করিয়া যাহার যতটা প্রয়োজন ততটা লইত। ৫৬ তাহারা প্রতিদিন একসঙ্গে মন্দিরে যাইত। তাহারা বাড়ীতে একসঙ্গে রুটি ভাঙিত। তাহারা আনন্দ ও সরল হৃদয়ে খাবার খাইত। ৫৭ তাহারা ঈশ্বরের প্রশংসা করিত। সমস্ত লোক তাহাদিগকে ভাল চোখে দেখিত। প্রভু প্রতিদিন তাহাদের সঙ্গে যাহাদিগকে রক্ষা করিতেছিলেন তাহাদিগকে তাহাদের সঙ্গে যোগ করিতেন।

পিতর ও যোহন খোঁড়া লোককে সুস্থ করেন

৩ ১ একদিন বিকাল ৩টার সময় পিতর ও যোহন মন্দিরে প্রার্থনা করিতে যাইতেছিলেন। ২ সেই সময় লোকেরা একজন লোককে বহন করিয়া আনিতেছিল। সে জন্মাবধি খোঁড়া ছিল। লোকেরা প্রতিদিন তাহাকে মন্দিরের সুন্দর নামক দরজার কাছে বসাইয়া রাখিত। সেখানে সে ভিক্ষা করিত। ৩ সে পিতর ও যোহনকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেখিল। সে তাহাদের কাছে ভিক্ষা চাহিল। ৪ পিতর ও যোহন তাহার দিকে তাকাইলেন। পিতর বলিলেন, "আমাদের দিকে তাকাও।" ৫ সেই লোকটি তাহাদের কাছ হইতে কিছু পাইবে বলিয়া আশা করিল। ৬ পিতর বলিলেন, "আমার কাছে সোনা বা রুপা নাই। কিন্তু আমার যাহা আছে তাহা তোমাকে দিতেছি। নাসরতের যীশু খ্রীষ্টের নামে তুমি হাঁটিতে আরম্ভ কর।" ৭ পিতর তাহার ডান হাত ধরিয়া তাহাকে উঠাইলেন। তখনই তাহার পা ও গোড়ালি শক্ত হইল। ৮ সে লাফাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং হাঁটিতে আরম্ভ করিল। সে পিতর ও যোহনের সঙ্গে মন্দিরে প্রবেশ করিল। সে হাঁটিতে, লাফাইতে এবং ঈশ্বরের প্রশংসা করিতে লাগিল। ৯ সমস্ত লোক তাহাকে হাঁটিতে ও ঈশ্বরের প্রশংসা করিতে দেখিল। ১০ তাহারা তাহাকে চিনিতে পারিল। সে সুন্দর নামক দরজার কাছে ভিক্ষা করিত। তাহারা বুঝিতে পারিল যে, তাহার প্রতি যাহা ঘটিয়াছে তাহা অলৌকিক ঘটনা।

পিতর লোকদের কাছে কথা বলেন

১১ সেই লোকটি পিতর ও যোহনের সঙ্গে থাকিতে থাকিতে সমস্ত লোক বিস্ময়ে পূর্ণ হইয়া শলোমনের বারান্দা নামক স্থানে তাহাদের কাছে দৌড়াইয়া আসিল। ১২ পিতর তাহা দেখিয়া লোকদিগকে বলিলেন, "ইস্রায়েলের লোকেরা, তোমরা এই লোকটির জন্য আশ্চর্য হইতেছ কেন? আমরা নিজেদের ক্ষমতা বা ধার্মিকতা দ্বারা এই লোকটিকে হাঁটিতে সমর্থ করিয়াছি, এমন মনে করিয়া তোমরা আমাদের দিকে তাকাইতেছ কেন? ১৩ অব্রাহামের ঈশ্বর, ইসহাকের ঈশ্বর, যাকোবের ঈশ্বর, আমাদের পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর তাঁহার দাস যীশুকে মহিমান্বিত করিয়াছেন। তোমরা যীশুকে শত্রুদের হাতে তুলিয়া দিয়াছিলে। পীলাত যীশুকে মুক্তি দিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, কিন্তু তোমরা পীলাতের সম্মুখে যীশুকে অস্বীকার করিয়াছিলে। ১৪ তোমরা সেই পবিত্র ও ধার্মিক ব্যক্তিকে অস্বীকার করিয়াছিলে। তোমরা বলিয়াছিলে, তোমাদের জন্য একজন খুনীকে মুক্তি দিতে। ১৫ তোমরা জীবনদাতাকে হত্যা করিয়াছিলে। কিন্তু ঈশ্বর তাঁহাকে মৃত্যু হইতে পুনরুত্থিত করিয়াছেন। আমরা এই বিষয়ের সাক্ষী। ১৬ যীশুর নামে বিশ্বাস করিয়া এই লোকটি সুস্থ হইয়াছে। তোমরা সকলে তাহাকে দেখিতে পাইতেছ। যীশুর নামে এবং যীশুর মাধ্যমে আসা বিশ্বাস এই লোকটিকে সম্পূর্ণ সুস্থ করিয়াছে।

১৭ "ভাইসকল, আমি জানি যে, তোমরা এবং তোমাদের নেতারা না বুঝিয়া এই কাজ করিয়াছিলে। ১৮ ঈশ্বর তাঁহার সকল ভাববাদীর মাধ্যমে পূর্বেই বলিয়াছিলেন যে, খ্রীষ্ট কষ্টভোগ করিবেন। ঈশ্বর এই কথা পূর্ণ করিয়াছেন। ১৯ তোমরা তোমাদের পাপের জন্য মন ফিরাও এবং ঈশ্বরের কাছে ফিরিয়া আইস। তাহা হইলে তোমাদের পাপ মুছিয়া ফেলা হইবে। ২০ তাহা হইলে প্রভুর কাছ হইতে সতেজকারী সময় আসিবে। তিনি যীশুকে পাঠাইবেন। যীশুই খ্রীষ্ট হইবার জন্য তোমাদের জন্য মনোনীত ব্যক্তি। ২১ স্বর্গ অবশ্যই যীশুকে গ্রহণ করিবে। যীশু সেখানে থাকিবেন যতদিন না ঈশ্বর সবকিছু পুনঃস্থাপন করেন। ঈশ্বর বহুদিন পূর্বে তাঁহার পবিত্র ভাববাদীদের মাধ্যমে এই বিষয়ে বলিয়াছিলেন। ২২ মোশি বলিয়াছিলেন, 'প্রভু ঈশ্বর তোমাদের ভাইদের মধ্য হইতে আমার মতো একজন ভাববাদী তোমাদের জন্য উত্থাপন করিবেন। তোমরা তাঁহার সকল কথা শুনিবে। ২৩ যে কেহ সেই ভাববাদীর কথা শুনিবে না, সে ঈশ্বরের লোকদের মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন হইবে।' ২৪ শমূয়েল এবং তাঁহার পরে যে সকল ভাববাদী আসিয়াছিলেন তাঁহারা সকলে এই সময়ের বিষয়ে বলিয়াছিলেন।

২৫ "তোমরা ভাববাদীদের সন্তান। ঈশ্বর তোমাদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে যে চুক্তি করিয়াছিলেন তোমরা তাহার অংশ। ঈশ্বর অব্রাহামকে বলিয়াছিলেন, 'তোমার বংশধরের মাধ্যমে পৃথিবীর সকল জাতি আশীর্বাদ পাইবে।' ২৬ ঈশ্বর তাঁহার দাসকে উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি প্রথমে তোমাদের কাছে তাঁহাকে পাঠাইয়াছেন। তিনি তোমাদিগকে আশীর্বাদ করিবেন। তিনি তোমাদিগকে মন্দ কাজ হইতে ফিরাইবেন।"

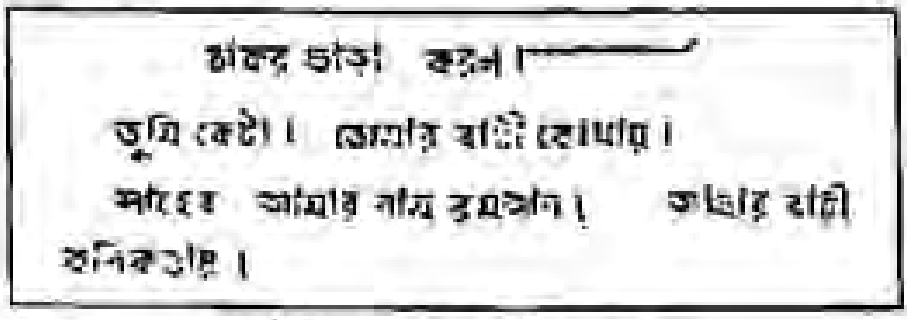

রেবার্ন কলেজকে ছাত্র-ছাত্রীদের অঙ্কন

শর্মিষ্ঠার এক অনন্য সেলফপ্রের স্মৃতি। তাঁর মেঘনাদকে সৃষ্টির পথে ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের এক পত্রে বন্ধু রাজনারায়ণকে লিখছেন.....Let me hear what favour the glorious son of Ravana find in your eyes. He was a noble fellow, and, but for that scoundrel Vivishan, would have kicked the monkey, army into the sea. By the bye, if the father of our Poetry had given Ram human companion, I could have made a regular Iliad of the death of Meghnad. প্রথম পর্ব শেষ করে বন্ধুকেই আবার লিখেছেন ....It is my ambition to engraft the exquisite grace of the Greek mythology on our own. রাজনারায়ণকে একই প্রসঙ্গে আবার লিখেছেন—You must try and see what you can do with the enclosed. As a reader of the Hamoure Epic, you will no doubt be reminded of the fourteenth Iliad.... শর্মিষ্ঠা ও কৃষ্ণকুমারীলেখার এমন অনন্যসাধারণ সমালোচক বন্ধুর সঙ্গলাভ রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারও জীবনে ঘটেনি। আধুনিক যুগে বাঙালী জাতির সামগ্রিক সাধনার ইতিহাসে মধুসূদন এক উজ্জ্বল নায়ক। আমার বিশ্বাস, তাঁর যে দারিদ্র্য ও বিষয় বিদ্বান্নি ভাবজগতে জীবনের অঙ্কন ব্রত তার ছিল তাঁর সাধনারই অর্ঘ্য। বন্ধু রাজনারায়ণকে লেখা ২৪-৪-১৮৬০ তারিখের এক পত্রে তিনি লিখছেন Tilottama will be published soon in the shape of a Volume. Perhaps, you don't know that it is in four books. Jotindra Mohun Tagore, at whose expense the work is being Printed, (for I am as poor as a good poet ought to be !) এত দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যেও তাঁর মনে ছত্রিশটি সর্গ শেষ করে কবি বন্ধুকেই—সম্ভবত মনোমোহন ঘোষকে বলেছিলেন—ফিল্টন যত্ন করে বিশ্বাস করেছিলেন, আমি ও একদম তা বলিনি। অর্থাৎ কিনা তা না হলে কবি মধুসূদনের 'অমিত্র ছন্দ' সম্পূর্ণ হবে না। রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ করে পড়ে তখন তিনি বলেন

> কত মধু পাই হায় পান করি,
> পাখি যে কুলের মালা।

এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্র প্রতিভার শক্তির সন্ধান করেন তিনি একদল বাঙালী জাতির গুরুগোছা বর্ণনের সাধনী বা একমাত্র পরীক্ষা পাশের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়নি। তিনি একদল আমাদের প্রতিনিধির পরিচিতি মহাজন। সমাজ জীবনসাধন করেও তাঁর পক্ষ শরিকের জীবনদূতে সাধনার যে শরিকের বোধ পোক্ষন তার এক অসাধারণ বাণীর বাহ শরিকের বক্ষবাণীর নিকট অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে। একার অত্যাধুনিক আর এক বাঙালী জ্ঞান তাপসের মধ্যে উদ্ভব করে মধ্য কাল তাঁর সাধনতত্ত্বের বিষয় আলোচনা করার মতো যৌক্তিক ক্ষমতা আমার নেই। তবে তাঁর অসাধারণ ইন্দিয়ের একটি উদাহরণ মাত্র দেব। তিনি আমেরের মতো অনুবাদে বেদ অধ্যয়ন করেন নি। দীর্ঘ একযুগ বা তারও বেশী সময় বেদের ভাষ্য করে বৈদিক আলোচনায় তা অধ্যয়ন করেছেন। বৈদিক ছন্দ সম্বন্ধে তাঁর একখানি গবেষণামূলক পুস্তিকা আছে। এ সাধনার সাধনপীঠ মাত্র হল প্রীতিবর্তী বেদ। অথচ সেদিন ইতিহাস কাহেনে এমন মানুষটির ইতিহাসের সঠিক মাপজোখ করার অধিকার আজ কিনা তা নিয়ে কিছু অবশ্যই এক তুলনায় : ইতিহাসে এম এ পাশ করা বা অধীতে হওয়া বা ইতিহাস পড়ানোই ঐতিহাসিক হওয়া বা হয় না তা কি আজ বিশ্বাস করেন ? আমেরকার ইতিহাস চর্চার প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিরা কেউই ইতিহাসের অধীতে ছিলেন না। হিরোডট বিশ্ব, থিউসিডি, তানিয়েল, হিরেশন তাঁরা সবাই ছিলেন আমলাতন্ত্রের সরকারি চাকুরে। স্যার যদুনাথ সরকারও ছিলেন ইংরেজির ছাত্র। রমেশচন্দ্র দত্ত ও ছিলেন বিশুদ্ধ অর্থের একজন গবিত কুল শিক্ষক ছাত্র। এ প্রসঙ্গে বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার কথাও মনে পড়ে। তিনি তখন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর সঙ্গের এক তরুণ ইতিহাসের অধ্যাপক, তখনও ডক্টরেট হননি, একদিন সন্ধ্যালাপের মিত্র তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে অধ্যাপক সাহা তাঁকে তাঁর গবেষণার বিষয় সম্বন্ধে জানতে চাইলেন। তা শুনে নিজের বাড়ির আক্ষ থেকে একখানি বই এনে তাঁর হাতে দিয়ে তা পড়ে দেখতে বললেন। গবেষণীক্ষণের এ তথাকথি অধ্যাপক ঐতিহাসিক মেঘনাদ সাহার মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতিতর্পণ করতে গিয়ে বলেছিলেন তাঁর জীবনের বইখানি পড়ে তাঁকে আজ অনেকটি সাহায্য করেছিল। অবশ্য বলি, অধ্যাপক—বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার গবেষণার বিষয়ে কিছু মত প্রকাশ করে তাঁর পরিচিতির এক টীকিল তাঁকে বলেছিলেন, তিনি তাঁদেরকে যেমন তত্ত্ব দেখেছেন চাইতি। মেঘনাদ সাহা যেন নাম

আছে এক প্রবল নিষেধ যার দেখানে উঁকি দিয়েছিলেন, তাঁদের কিন্তু প্রকাশের ইতিহাসে হয়তো তেমন চিহ্নিত স্থিতি নেই।

বাঙালী মহিলার এ অবহেলিত সৃষ্টির দেওয়ার অর্থে বাঙালীর সংস্কারমুক্ত মানসের আত্মপ্রকাশ পরের উনবিংশ শতাব্দীতে স্ত্রী শিক্ষাদোলনের উজ্জীবনের হিসেবে লিখিত, অর্ধ লিখিত, এবং লিখিত, এমন কি ছাপার বাঙালীকেও বই পড়ার নেশা গ্রাস করেছিল। সমগ্র দক্ষিণেশ জুড়ে তখন মেয়েকে জীবনের সঙ্গী করে নেওয়ার জন্য মধ্যবিত্ত পরিবারে প্রতিযোগিতা একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিল। এ পরিবারে মেয়েদের উচ্চশিক্ষা শতাব্দীতে উৎসাহদাতা হয়েছিল। এ পরিবারে পাশ্চাত্যশিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত মেয়েদের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। আমার দুবা বয়সে দেখেছি সেন স্ট্রীটের এক বাড়িতে একজন ডক্টর শিক্ষিত বয়োবৃদ্ধ বাড়িতে নিয়মিত লাইব্রেরী থেকে মেয়েদের বই পড়তে দেওয়ার। তিনি পেশায় ছিলেন ডেন্টিস্ট, ছাপাদের সম্পূর্ণে নেয়াই এর উপর ভর্তুরি দেখিয়ার মতো কর্তব্যপরা অবসরে জীবনে তার বই পড়া ছাড়া অন্য ব্যাপার ছিল না।

ক্রমে বাঙালীর জীবনে ছাপা বই পড়ার অভ্যাস বিচিত্র রূপে এক কলল। এর কারণ এক গবেষণার বিষয় অবশ্য সমাজের স্তরে স্তরে দেশের মানুষের আর্থিক অবস্থা পূর্বাপেক্ষা অনেক ভাল হয়েছিল। পূর্বে বিশেষ বই উপহার দেওয়ার একটা সৌখিন প্রথা ছিল, আজ আর তা চোখে পড়ে না। পাঠাগারগুলির অবস্থাও সেরকমই, বই আছে, পাঠক নেই। অনেক পাঠাগার ও উঠেই গেছে। একটি কুলের সঙ্গে যুক্ত থেকে অনেক লক্ষ করেছি, সেকালের পাঠাগারে যা নিত্যে আসে মাত্র ৬/৭ জন সভ্য/সভ্যা অথচ ছাত্রের সংখ্যাবৃদ্ধি আজ, পাঠাগার সেকালের থেকে আর ৫ গুণ-র দর্শকে সর্বদা গম্ গম্ করে।

সমবিলিতভাবে বাঙালীর পুস্তক পাঠের প্রতি এমন নির্মম উদাসীনতার কারণ কি তা নিয়ে সামান্য সন্ধান আমাদের নয়।

(১) গোড়া থেকেই জীবনে আর্থিক প্রতিষ্ঠা অর্জনের আশায় এখন বুদ্ধিমান অভিভাবকরা ছাত্রীর জন্য ছাত্র/ছাত্রীদের মা-বাবারা বেশী উৎসাহ দেন। ফলে ছাত্রের পক্ষে পাঠ্য বহির্ভূত কোন পুস্তক পড়া অত্যন্ত দুরূহ হয়। সাধারণ জ্ঞানের জন্য শুধু কুইজ কন্টেস্ট প্রতিযোগিতা বই পড়ে কোই বিশেষ ভাবনা বই পুস্তকের মধ্যে লাভ করা সম্ভব, পরীক্ষায় পাশ তা নিয়েই চলে যায়।

(২) বিলাসের পরিবর্তে শিক্ষাক্রম পরিবর্তন ও বিজ্ঞান ভিত্তিক হওয়ায় ফলে পরীক্ষায় পাশ এবং ভাল ফল লাভের জন্য পাঠ্য বিষয়ের উপর বেশী জোর দিতে হচ্ছে বাধ্য হয়। এ কারণেই অনেক আনন্দ লাভের জন্য বইয়ের বই পড়ার প্রতি স্বাভাবিক ঝোঁক আগের তুলে গেছে।

(৩) দৈনিক পরিবহনের ভাবনা অতীতের বাঙালীর জীবনে এনেছে এক নূতন উজ্জীবনার ঢেউ। নব প্রজন্মের পিতা-মাতারা তাদের সবেধন নীলমণিদের মনোরঞ্জনের জন্য সর্বদা মনোযুগ্মকর খেলা - সামগ্রীর উপহার কাইনের জন্য উন্মুখ। সব সময় তাদের বইয়ের জগতের আড়ালে থাকতে তৎপর। নিজেদের জীবনের ভাল লাগার রাগারঙ্গার বড় বেশী ছাপানো ঘটে এখন সন্তানদের জীবনে। ফলে ছাত্রীদের কোন কটি রোধ অর্জন করতে তারা অনেক ক্ষেত্রেই অক্ষম হয়ে পড়ে। ছাত্রী কখনোকিতে পাঠ্য বহির্ভূত পুস্তক পাঠের আনন্দ লাভের আকাঙ্ক্ষা থেকে অনেকেই তারা বঞ্চিত।

(৪) মূলপন্থি অন্যান্য আমোদের পাঠাভ্যাসের চরম শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর দ্বারা কিছু উপকার অবশ্যই সাধিত হচ্ছে, কিন্তু অপকারের তালিকাটি সে তুলনায় অসম্ভব দীর্ঘ। এক ভয়ঙ্কর কুফলিপূর্ণ ভোগবাদী জীবনের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে এ যন্ত্রটি এখন ঘরে ঘরে এক অসংস্কৃতির পরিবেশ সৃষ্টি করছে। পুস্তক পাঠে অনীহা অসংস্কৃতির এক ভয়ঙ্কর লক্ষণ, কারণ পড়ার জন্য প্রয়োজন মনোযোগ ও

অন্তর্মুখী সৃষ্টি। চরিত্রচিত্রণে তোপের চুড়োটির মতো তা কখনো বড় সহজে ধাপার নয়। পক্ষ তা উপন্যাস পাঠিয়েছেন আমাদেরকাগজি এখন প্রধান তা খুবলেখনের পথীর দেখেছেই অভ্যাস হয়ে সেটি আমরা। পড়ে আর কে সময় নষ্ট করে: প্রাথমিক শরীক্ষায় প্রথম স্থান নম্বর পাওয়া একটি মেয়েকে বেথুনের মতো একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম সে 'পথের পাঁচালী' পড়েছে কিনা। উত্তরে সে বলেছিল পথীর তার সঙ্গে খণ্ড-মুখুর্জের পরিচয় হয়েছে। অন্য এক সময়ে স্বাতি, পনর বিদ্যায় পারদর্শিনী ইংরেজি স্কুল বলতে পারেনআ এক আধুনিককে আলোচনাচ্ছলে 'পথের পাঁচালী' সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করাতে তিনিও একটি উত্তর দিয়েছিলেন। আরও একটু অগ্রসর হয়ে সাহসে করে এই বইখানির রচয়িতার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করায় তিনি অবজ্ঞাবিজড়িত স্বরে উত্তর দিয়েছিলেন— সরতাজির ছাত্র। এরপর অন্যত্র নিষ্প্রয়োজন।

(৫) সব মেয়েই অবশ্য নয় তোপের উপর চাপিয়ে দেওয়া অন্যায়। শিক্ষিত দুর্ঘ সম্প্রদায়ের জন্যে সাধারণভাবে পাঠ্য বইগুলি পুস্তক পাঠের প্রতি অনীহার একটি প্রধান কারণ হওয়ায় মেয়ের সমস্যা। এর ফলে একটা গভীর হতাশার জগৎ সৃষ্টি করার ফলে সুলক্ষণে ভাবনা হচ্ছে হবে সম্ভবত জন্য দায়ী করবে অন্যরা। সাহিত্য পাঠের ওকালত অভিভাবকের বিদ্যালয়গুলি থেকে বিদায় নিয়েছে। এ বিষয়ে শিক্ষক মহাশয়দের দায়িত্ব সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করা আমার পক্ষে ধৃষ্টতার পরিচায়ক হলেও মনে হচ্ছে পারে। তবুও সময় থাকতে একটু আলুন বিষয়টি নিয়ে।

তিন

ধরাজনে বিদ্যালয়ের মূল উদ্দেশ্য, কথায় কথায় এক্সপ্লোসিভ আর ইনফরমেশন টেকনোলজির যোগাই নিয়ে বর্তমান প্রজন্ম সাহিত্য, ইতিহাস ও দর্শনকে হেয় দৃষ্টিতে দেখে। অনেকে মনে করে তা সময়ক্ষয়কারক। উপভোগের বাসনা ও বাস্তবদৃষ্টিতে অবশ্য সত্যের কোন পরিত্যাগ করে পুস্তক পাঠের মনোযোগাকে আনন্দ লাভ করার সময় দেওয়ার। এর সঙ্গে একটি আবেগও সততাও যুক্ত রয়েছে। তাহলে প্রত্যুষের মাঝে লোভ ও লোপের স্পৃহা বাড়ে। কল্পনা শক্তির উপাদান বৃদ্ধি পায়। মহৎ হৃদয়ের সাধনা করার শক্তি লোপ পায়। আজ মহৎ হৃদয় হলে সৌন্দর্য পাঠকদের, ইতিহাস দর্শন পাঠ একান্ত আবশ্যক। উপনিষদের কথা ছেড়েই দিলাম, তোপ হৃদ মহাভারত রামায়ণের সমান সাহিত্যের মধ্যেও যে ভেদ রয়েছে—তাহত্ত্ব নয়, কেবল কল-কল-ধ্বনিতে সাহ করার দুরাকাঙ্ক্ষা।

এখন বাংলাদেশে বইয়ের বাজারে অভ্যন্তরে বড় প্রথা। উপভোগ্য সামগ্রীর বিক্রয়-ধারী আপাতীয় বক্তব্যে ছাপ, পাঠ পরিচ্ছন্ন বইয়ের বিক্রি প্রকাশকাজক। ছাই প্রকাশক নূতন লেখকদের বই প্রকাশ করতে সর্বদা অনীহা প্রকাশ করেন। বিশাতুলের সংখ্যাও খুবই দুটিনেই। প্রকাশকদের একমাত্র উদ্দেশ্য যেন মুনাফা অর্জন করা, সেটি যদি উত্তাটি। মনে করেন না প্রকাশকদের দুষে ওকালতি করছি। বিষয়টি এক গভীর জটিল, সমস্যা বড় গভীরে।

তবুও পুস্তক প্রীতির যে পরম্পরার অধিকারী আমরা, তা পুনরুজ্জীবনের জন্য নিছুতলে ওবে যে গুপ্ত প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে, সেজন্যেই, তারই প্রতিফলন এ বইমেলায়। এখানে তরুণী, বহু ক্রেতা-বিক্রেতাদের আগমনবলাবলে। একজনের বইমেলা যেন প্রত্যেকটি এক নূতন উৎসবের রূপ নিয়েছে। সার্বিক অবক্ষয়ের লক্ষণ চারিদিকে। মূল সাংস্কৃতিক পরিবেশ বাঁচিয়ে রাখার জন্য কলকাতা বইমেলা এক মহান প্রচেষ্টা। পাঠক এখানে পছন্দমতো বই কেনার সুযোগের মাধ্যমে গড়ে তুলতে সক্ষম সুস্থ বই পড়ার পরিবেশ। লাইব্রেরি ও জ্ঞান প্রতিষ্ঠান মনোযোগে সৃষ্টি বিশেষজ্ঞদের ডাকণ করতে হবে। এটাই শাশ্বত বাণী। যা উপেক্ষা করে যা লাভ হয়, তার পরিণামে দেখে দেখে জন্য নেয় হিতাহিতের বিবেচনা। আমরা যেমন বৃদ্ধি থেকে মুক্তি চাই। অন্যদিকে এ কারণেই, আসুন, অন্যকে সুস্থ করে গড়ে তুলতে আমরা সীমিত পরিসিস্থিতির প্রথমেই হতাশা সম্ভব ঝিলিয়ে আনি আমরা বই পড়ার অভ্যাস। প্রীতির বন্ধুত্বের সৃষ্টি হিসেবে একে অন্যকে উপহার দেই বই—ভাল বই। অন্যান্যের মেঘ কাটানো সম্ভাবের অগ্রগতি হলেও শিল্প-সংস্কৃতির অবোগতি অবশ্যম্ভাবী।

বাংলা প্রকাশনার সেকাল ও একাল

জগমোহন মুখোপাধ্যায়

ইংরেজের আমলে ভারতে যাদের প্রথম এসে কলকাতা ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে হাতে টুলিয়ে যে পাকাকটি পেয়েছিল, সেটা কিন্তু বস্তুতান্ত্রিক কৃতি বছরের বেশি হয়ে উঠতে পারেনি। কেরী, ওয়ার্ড ও মার্শম্যান শ্রীরামপুরে মিশন প্রেসের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে। সেই সঙ্গে বাংলার প্রথম কলেজ শখিকুল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সুযোগ্য শিক্ষা পঞ্চানন কর্মকার ও তাঁর জামাতা মনোহর কর্মকারের হুগলি থেকে এসে শ্রীরামপুরের দলে যোগ দেওয়ার পর, বছর না ঘুরতেই কলিজের সেই প্রতিষ্ঠা নিশ্চয়ই হয়ে গেল। পরাধীন পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্থানিত শ্রীরামপুর মিশন প্রেস বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনে নবযুগের সূচনা করেছিল।

শ্রীরামপুর মিশন প্রেস বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনে বিপ্লবাত্মক ঘটিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু শুরু থেকে পনেরো বছর টাইপ না হওয়ায় বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন ব্যবসায় পরার ওপর থেকে পায়ে পায়ে পৌঁছে গেল অষ্টাদশ শতকের শেষে বাংলার রাজধানী কলকাতায়, এবং উনিশ শতকের সত্তরদশকের আগেই পরে কলকাতায় বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন ব্যবসায়ের প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠল।

সেকালে ধারের 'বেটিং' বলা হত, তার অর্থাৎ পরমাণের কেনার লোকেরা যখন যেখান মুদ্রণ ও প্রকাশন ব্যবসায় লাভজনক এবং পেশা হিসাবে বিভিন্ন লোকের অর্থাগম প্রতিফলন হয়, তারাও ক্রমশ এই ব্যবসার প্রতি আকৃষ্ট হল। এদের পরিপূরক ছিলেন শ্রীরামপুর মিশন প্রেসেরই একজনীয় কম্পোজিটার পঞ্চানিশোর ভট্টাচার্য। পঞ্চানিশোর এই ব্যবসার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে। তবে তার প্রথম প্রকাশন তারতন্ত্রের 'অন্নদামঙ্গল' যথাযথ সম্পাদনার পর কলকাতার মেরিস প্রেস থেকে ছাপা হয়ে প্রকাশিত হতে সময় লেগেছিল আরও দু'বছর। ছাপা সিদ্ধান্ত ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'অন্নদামঙ্গল' শুধু বাঙালির প্রকাশিত প্রথম বাংলা বই নয়, প্রথম বাংলা শক্তির গ্রন্থ। পঞ্চানিশোরের 'অন্নদামঙ্গল' প্রকাশন ছিল পরীক্ষামূলক। 'অন্নদামঙ্গলে'র ব্যবসায়িক সাফল্য তাঁকে বহু হাজার রাহের সাহেবিয়ার বাংলা শেখাবার প্রেস স্থাপন ও আরও কয়েকটি বই প্রকাশে উৎসাহ জুগিয়েছিল। পঞ্চানিশোর একাধারে ছিলেন কম্পোজিটার, লেখক ও সাংবাদিক। সুতরাং নিজের প্রেস থেকে বাঙালি পরিচালিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণ' (১৮১৮) প্রকাশনার কৃতিত্বও পঞ্চানিশোরের।

মুদ্রণ ও প্রকাশন যে ব্যবসায়িক হতে পারে, তা প্রথম দেখালেন পঞ্চানিশোর। সেকালের কলকাতার কলম পরের (ব্রোক টাউন), অর্থাৎ উত্তর কলকাতায় ১৮২০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে দেশ কিছু বাঙালি পরিচালিত মুদ্রণ ও প্রকাশন ব্যবসা শুরু হয়ে গিয়েছিল। প্রেসগুলো ছিল প্রধানত আহিরীটোলা, শোভাবাজার, জিনপুর অঞ্চল থেকে শুরু করে শিয়ালদা পর্যন্ত। সিমলাপুর, বটতলার অঞ্চলেও কয়েকটি প্রেস ছিল। এসব অঞ্চলে প্রকাশিত বই সংগ্রহকরা পটলডাঙার বই নামেই পরিচিত ছিল। পটলডার বই-এর প্রথম সূচনা করেছিলেন বিশ্বনাথ দেব। ক্রমে ক্রমে ঐ অঞ্চলে অন্যান্য প্রেসগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেই সব প্রেস থেকে বই ছাপা ও বিক্রি একসঙ্গেই চলত। তখনও শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার হয়নি। পাঠ্যপুস্তকের যে পক্ষ চাহিদা ছিল, ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত কলেজটি স্কুল বুক সোসাইটি সেই চাহিদা পূরণ করত। অথচই সেকালের কলিজিক হিন্দুসমাজে প্রকাশনা সাফল্যলাভের প্রধানতম বই ও পত্রিকার ওপর নির্ভর করতে হত বেশি।

চার্লস্ উইল্কিন্স্

জন ফ্রাঙ্কলিন হ্যালহেড

আর ছিল অশ্লীল সাহিত্যের বাজার। দেশী প্রকাশনা সংস্থাগুলো থেকে ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে যে তিরিশটি বই প্রকাশিত হয়েছিল, তার মধ্যে পাঁচটা ছিল অশ্লীল সাহিত্য—অনুপাতিক হিসেবে সংখ্যায় কম নেহি, এবং তৎকালীন সমাজে তার গ্রাহকেরও অভাব ছিল না। অভাব ছিল উপযুক্ত লেখকের, অভাব ছিল বিভিন্ন বিষয়ের ওপর লেখা বই-এর এবং সর্বোপরি অভাব ছিল সুরুচিপূর্ণ পাঠকের। তবে প্রথম দিকের মুদ্রণশিল্পের এক বড় পৃষ্ঠপোষক ছিল তখনকার দিনের 'প্যাম্ফলেট ওয়ার' বা পুস্তিকাযুদ্ধ। উনিশ শতকের প্রথম দিকে বহু ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তার পক্ষ বিপক্ষ দলগুলি তাদের নিজ নিজ বক্তব্য জনসাধারণের কাছে উপস্থাপিত করত মুদ্রিত পুস্তিকার মাধ্যমে। বাংলা ছাপা ও মুদ্রণের এই অনুশীলন ও পরিশীলন পরবর্তীকালে মুদ্রণ ও প্রকাশনের দ্রুত অগ্রগতির পথ সুগম করে দিয়েছিল।

একদিকে রক্ষণশীল ধর্ম, অন্যদিকে পাশ্চাত্যের শিক্ষা ও সংস্কৃতির অভিঘাত। এই টানাপোড়েনের মধ্যে জেন্টালীর প্রথম আমলে সমাজ ছিল আলোড়িত এবং অস্থির। কলকাতায় বাঙালি সমাজের হিতৈষীদলের শুরু হয়েছিল ১৮৪০-এর দশকে। এঁরা ইয়ংবেঙ্গল দলের অনেকেই পরিণত বয়সে তাঁদের দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছিলেন দেশীয় ঐতিহ্যের দিকে। সেই সময় থেকে সুরুচিসম্পন্ন পাঠকসমাজ গঠনে তত্ত্ববোধিনী সভা এবং 'তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা' (১৮৪৩) একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। 'তত্ত্ববোধিনী'র কল্যাণে এক শিক্ষিত ও প্রগতিশীল লেখক সম্প্রদায়েরও সৃষ্টি হয়েছিল—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, প্রমুখ লেখকদের নতুন নতুন চিন্তাধারা তৎকালীন সাহিত্য-মননশীল পাঠকসমাজকে আকৃষ্ট করেছিল। 'তত্ত্ববোধিনী'-র পাঠকগোষ্ঠী ব্রাহ্ম সমাজের শীমানা অতিক্রম করে আপামর শিক্ষিত বাঙালি সমাজে বিস্তৃত ছিল। উত্তরকালে অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১৮৫৩-১৯১৭) তাঁর 'শিক্ষা গুরু' গ্রন্থে 'তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা' সম্বন্ধে লিখেছিলেন, 'কবির টানে না হউক, তত্ত্ববোধিনীর ভাষার মায়ায় অনেকেই তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য ছিলেন। অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর—ভাষাশিল্পের দুটী ধারা তত্ত্বপূর্ণ লেখক, তত্ত্ববোধিনীতে নিয়মিতরূপে লিখতেন। তত্ত্ববোধিনীতে প্রত্নতত্ত্ব, শাস্ত্রতত্ত্ব, বিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা এই সকলের নিয়মিত আলোচনা হইত। ধর্মসংশ্লিষ্টেরা সাহিত্যানুরাগী সকলেই তত্ত্ববোধিনীর একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। একদল একটি পত্রিকা মাসিকরূপেই সমাজের কতটা পরিবর্তনের সাহায্য করেছিল।

এই 'তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা' মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের (১৮১৭-১৯০৫) অনুকূলে ও দৃষ্টিসরণী মতন অক্ষয়কুমার দত্তের (১৮২০-১৮৮৬) নিষ্ঠাবান সম্পাদনার প্রকাশিত হতে শুরু করে তত্ত্ববোধিনী সভা থেকে। পত্রিকা ছাড়াও তত্ত্ববোধিনী সভার বাংলা প্রকাশনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কিছু কাজও দেখেছিল, যেমন অক্ষয়কুমার দত্তের 'ভূগোল', ভবশঙ্কর দবের রচনার 'চুনক' বা প্রথম ব্রহ্মসংগীত সংকলন (১৮৫৩)।

বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত যন্ত্র বা সংস্কৃত প্রেস তিরাশিটিরও (১৮৪৭) থেকে প্রকাশিত উচ্চ রুচিসম্পন্ন বই তৎকালীন প্রকাশনার অবস্থা অনুকূল বলে মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছিলেন বাংলা গদ্যের প্রথম 'যথার্থ শিল্পী', সেই বিদ্যাসাগরও আধুনিক বই-পাড়ারও প্রথম নাবিক। অনেক দিক দিয়ে অক্ষয়কুমার উচ্চমানের বই প্রকাশ করেও যে ব্যবসা করা যায়, তা তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন সংস্কৃত প্রেস তিপজিটরী প্রতিষ্ঠা করে। এই সব অনুকূল আবহাওয়ার মধ্যে ১৮৪০-এর দশকের প্রথম থেকে বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন ব্যবসাতে এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছিল।

বেন্টাঙ্কের জেনারল কমিটি অফ পাবলিক ইন্সট্রাকশন ১৮৪৩-৪৪ অব্দের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন সম্বন্ধে যে-সব তথ্যসমৃদ্ধ পরিসংখ্যান সংগ্রহ করেছিলেন, সেগুলি উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের মুদ্রণ ও

HICKY'S
BENGAL GAZETTE;
OR THE ORIGINAL
Calcutta General Advertiser.

প্রকাশন ব্যবসায়ের শুরু মুদ্রণের ইতিহাস যথেষ্ট জটিল। বাংলা বই-এর সংখ্যা ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে ছিল ৯০টি বই, ১৮২২ থেকে ১৮২৯ কালপর্বে প্রকাশিত হয়েছিল মাত্র ২৮টি বই। সেই সংখ্যা ১৮৩০-৩৪ পর্বে দাঁড়িয়েছে ছিল ২৪১টিতে। শুধু সাহেব ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে রংপুরবর্তী গ্রন্থ বাট বছরের মধ্যে প্রকাশিত বই-এর যে তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন, সেই তালিকার বই-এর সংখ্যা ছিল ১৪০০. গ্রন্থ সব বইগুলি কারুকৃক মুদ্রণোপযোগে প্রতিষ্ঠিত তৎকালীন উইলসপাড়া বাপ্তিস্ত মিশনারিদের (বর্তমান উইলসপাড়া জারুকৃক সাধারণ গ্রন্থাগার) সংগ্রহে ছিল। শুধু সাহেবের পরবর্তী হিসেবটি ১৮৪৭-৪৮ খ্রিস্টাব্দের (বাংলা সন ১২৫৪)। সংখ্যাটির মধ্যে দেখা যায় যে তালিকায় শহরে প্রেসের সংখ্যা ছিল ৪৬, প্রেসগুলো বেশির ভাগই ছিল ছাপা খানির মালিক, বইবিক্রেতা ছিল না, কিন্তু তার চেয়েও চেয়েও ছাপা বই প্রকাশনার এক বিরাট ক্ষমতা তখন বোঝা উঠেছিল। বিষয় থেকে আরও জানা যায় প্রকাশনার বিষয়বস্তুর শুরু পরিবর্তন। ঐ তালিকায় প্রকাশিত ৩২৫টি বই-এর মধ্যে ছিল নাটক—৮, জীবনী ও ইতিহাস—১৯, খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কীয়—৮, হিন্দু পরিচয়ক—৮৪, পাঠ্যপুস্তক—৪৬, পদ্য উপন্যাস—২৮। শুধু সাহেব এই বিষয়টিতে প্রতি প্রেস থেকে প্রকাশিত বই (টাইটেল), প্রতি বই-এর মুদ্রণ সংখ্যা, প্রতি কপির দাম, প্রভৃতি প্রয়োজনীয় তথ্যসহ একটি পরিসংখ্যান সন্নিবিষ্ট করেছিলেন। যেমন শুধুকৃক যেন ছেপেছিল ২৭টি বই, ৮৪, ২৫০ কপি, তার মধ্যে ছিল ফিলাসাপরের 'অর্থ শরিচয়' প্রথম ভাগ (নবম ও দশম সংস্করণ), ২৪ পাতা, আট তিন পয়সায়, ১৫০০০ কপি, 'অর্থ শরিচয়' দ্বিতীয় ভাগ (ষষ্ঠ ও সপ্তম সংস্করণ), ২৪ পাতা, আট তিন পয়সা, ১৯,০০০ কপি, 'কথামালা', ৭৮ পাতা, দশ পয়সা, ৪০০০ কপি। ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস থেকে বিভিন্ন ভাষা প্রকাশিত বই ছিল ৬৪টি, ৫৫,০০০ কপি প্রকাশিত ভাষার মধ্যে ছিল 'বাংলাদেশ' (৮ম সংস্করণ) ৩৬ পাতা, এক আনা, অন্যান্য বইগুলির মধ্যে ছিল হানা মার্শম্যান সাহেবের 'পত্নী সাহেবের পত্রিকা'—গ্রামে গ্রামে ঘিরে ধর্ম প্রচারের কাহিনী—১৪২ পাতা, দু'আনা। মিশনে মার্শম্যানের প্রথম বই 'দৃষ্টান্তমালা ও অন্যান্য বিষয়ক' প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে। শিল্পুরের অধিকা সরকার প্রেসে ছাপা হয়েছিল রাজা রামমোহন রায়ের (১৭৮৪-১৮৬১) 'গীতিকথা' প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশ থেকে বইটির মুদ্রণ সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল লক্ষাধিক কপিতে। এই ১৮৪৭-৪৮ খ্রিস্টাব্দের হিসেবটিতেই পাওয়া যায় ছি হোলরিড (প্রেস থেকে প্রকাশিত টেকচাঁদ ঠাকুরের (প্যারিচাঁদ মিত্র, ১৮১৪-১৮৮৩) 'আলালের ঘরের দুলাল', ১৮০ পাতা, দাম আট আনা, ১০৫০ কপি। অনেক প্রেসই অনাদায় বই-এর সঙ্গে পত্রিকা ছাপত, আবার পত্রিকার বিক্রি ও লাভালাভে বুঝি বেশি ছিল। সম্পূর্ণ তালিকাটি দেখে বেশ বোঝা যায় বাংলা প্রকাশনা ক্ষেত্রে একটি শুভ পরিবেশের সূচনা হয় উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। সব থেকে বেশি ছাপা হয়েছিল শিক্ষামূলক বই, ১,৪৪,৩০০ কপি, তার বেশি ছিল ধর্মবিষয়ক বই ও নীতিগল্প। বাংলা প্রকাশনার প্রায় সমকালীন ইতিহাসে আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই হচ্ছে, দীনবন্ধু মিত্রের (১৮৩০-১৮৭৩) 'নীলদর্পণ', প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকা থেকে ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে কালীপ্রসন্ন সিংহের (১৮৪০-১৮৭০) 'হুতোম পাঁচার নক্সা' (১৮৬২), ছাপা হয়েছিল শুভদ্ব প্রেসে এবং মাইকেল মধুসূদনের কয়েকটি কাব্য ও নাটক।

পরবর্তী দশকগুলোতে বই প্রকাশন সংস্থা বা প্রেসের সংখ্যার উর্ধ্বগতি অব্যাহত থাকলেও প্রপতিশীল লেখক গোষ্ঠীর বই প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। প্রথমত প্রকাশকরা ব্যবসায়িক স্বার্থে পাঠ্যপুস্তক ছাপাতেই আগ্রহী ছিল বেশি। আর দ্বিতীয়ত প্রকাশকরা পাণ্ডুলিপির একেবারে টাকা দিয়ে কিনে নিতেই

সংবাদপ্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

সমাচারচন্দ্রিকা

সমাচার দর্পণ।

বিশ্বকোষ।

মূল্য সৌজন্যমূল্য কিংবা সমমূল্যের বিনিময়ে বাঙালমাত্র যেকোনো বিষয়ের বিশেষজ্ঞ-মূল্য নয়ে ৫ বছরের জন্যে আমোদিনী। কেবল অসমর্থ মুদ্রণযন্ত্রের কর্মচারীরা প্রতিশ্রুতির পুরস্কারস্বরূপ বিনামূল্যে মুদ্রণযন্ত্রটিকে ব্যবহার করতে পারবেন।

করে। এই এলাকায় হিন্দু ও প্রেসিডেন্সি কলেজ ছিল। ঐ অঞ্চলেই অবস্থিত হিন্দুস্কুলের স্থাপিত হয় ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে। তার সঙ্গে মিশনারীরা অঞ্চলে প্রথম কয়েকটি মূল্য অবৈতনিক প্রতিষ্ঠান চালাত, স্বাভাবিক ভাবেই প্রকাশন ব্যবসা উত্তর কলকাতা থেকে একদলের বইপাড়া অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হয়ে ওঠে। অনেকগুলি নতুন নতুন প্রেস ও প্রকাশন সংস্থা এবং বই-এর দোকান গড়িয়ে উঠতে লাগল। এলগিন স্ট্রীটপাড়ায়ের মোক্ষদা মেডিকেল লাইব্রেরি (হিন্দু হোস্টেলে যার সূত্রপাত) স্থাপিত হয়েছিল বৌবাজারে, ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে। তখন মুদ্রিত গ্রন্থ ব্যবসায়ের নামডাক ছিল—মেডিকেল লাইব্রেরি ও আলবার্ট লাইব্রেরি। আর ছিল এস সি আঢ্য। কলেজ স্ট্রিটে প্রথম বড় বই-এর দোকান এস কে লাহিড়ী অ্যান্ড কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন (১৮৮৩) রমানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র শরৎকুমার লাহিড়ী (১৮৫৯-১৯১৯)। এই প্রতিষ্ঠানের পশ্চাতে বিদ্যাসাগরের অনুপ্রেরণা ছিল। তাঁর ভাগ্নে ও সহকর্মী রমানন্দ লাহিড়ীর ছেলে উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় এবং তৎকালীন বিশিষ্ট নাগরিকদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। এস কে লাহিড়ী রবীন্দ্রনাথেরও কিছু বই প্রকাশ করেছিল। ব্যবসায়ে সততা ও বিনয়ের জন্যে শরৎকুমারের বই ব্যবসায় খুবই উন্নতি করেছিল।

উনিশ শতকের শেষ দিকে অন্যান্যদের, যেমন আলবার্টের বইয়ে প্রকাশন সংস্থা ছিল এলবার্টোরে ডিক্সনজি ঘোষ (১৮৪৪-১৯২৮) প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়ান প্রেস বা ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস। ডিক্সনজি ঘোষ ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ইন্ডিয়ান প্রেসের। প্রথম প্রচেষ্টায় তিনি প্রকাশন জগতে প্রবেশ করেন। তিনি ছিল শহরের পোয়ার দিকে একতারায় একটি শাখাও প্রতিষ্ঠা করেন। বন্ধু জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 'বাংলা ভাষার অভিধান', দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ীর 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর' প্রভৃতি ১৯০৮ থেকে ১৯২২, অর্থাৎ বিশ্বভারতী প্রথম বিভাগ প্রতিষ্ঠার পূর্বকাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের বহু বই প্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে এবং সেই দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস নিজেকে আলবার্টো করে গেছে। এই সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের কবিতা গ্রন্থের কয়েকটি সোনার বাংলা আজও গ্রন্থ-পাঠকদের মনের মধ্যে আছে। প্রবাসী প্রেসের প্রথম মুদ্রণপাত এলাহাবাদে, প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্রখ্যাত সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। প্রবাসী পত্রিকাটি কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়। উনিশ শতকের শেষার্ধের আরও বেশ কিছু প্রকাশক তাঁদের প্রকাশন কার্যালয় এখানে, যাদের নাম উল্লেখযোগ্য—যেমন এ সি সেন, মেসার্স চক্রবর্তি। অতিসাম্প্রতিকালে এ টি সেন সুপরিচিত। এ টি সেনের সঙ্গে সেন লাইব্রেরি কুটির (১৯২৫) সমকালেই উল্লেখ্য।

শিশু সাহিত্যের দাদুকল্প যোগীন্দ্রনাথ সরকারের (১৮৬১-১৯০৭) সিটি বুক সোসাইটি, এবং উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর (১৮৬৩-১৯১৫) ইউ রায় অ্যান্ড সন্স প্রতিষ্ঠা উনিশ শতকের শেষ দশকেই। উপেন্দ্রকিশোরের প্রথম দুটি বই 'ছেলেদের রামায়ণ' ও 'মহাভারত' যোগীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেছিলেন। সিটি বুক সোসাইটির আনুকূল্যে ঘুচে গিয়ে যোগীন্দ্রনাথের শিশু সাহিত্যে সর্বাধিক প্রাণ ও সমারোহ লাভে বহী প্রকাশ। তাঁর অনেকগুলি বিখ্যাত 'হাসিখুশি', 'ছড়া ও ছবি', প্রভৃতি সব বইগুলির প্রকাশক সিটি বুক সোসাইটি, এবং বইগুলি দীর্ঘকাল ধরে অনেকের ঘরে সযত্নে রক্ষিত আসছে। সেকালে প্রকাশিত, চুরু ও প্রচুর মুদ্রণে ইউ রায় অ্যান্ড সন্স (১৮৯৪) মুদ্রণ ও প্রকাশন জগতে যুগান্তর এনেছিলেন। 'টুনটুনির বই', 'তলি পাইন ও বাঘা বাহিন' প্রভৃতি বইগুলি নিজের চিত্রসহ অনন্যতা লাভ করেছে। উপেন্দ্রকিশোরের অক্ষয় কীর্তি শিশুপাঠ্য পত্রিকা 'সন্দেশ' (১৯১৩)—যদিও প্রকাশনা বন্ধ থাকলেও বর্তমানে নবপর্যায়ে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। উপেন্দ্রকিশোরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র

মুখোপাধ্যায় (১৮৮৭-১৯৫৩) বসুমতীর প্রথম যুগের অন্যতম কর্ণধার। গ্রন্থ-প্রকাশক, মুদ্রাকর, চিত্রকর ও লেখকরূপে প্রতিষ্ঠা। তাঁদের একটি চিত্রশালা গড়ে তিনি বসুমতীর গৃহে রেখেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র হিরণ্ময় রায় চিত্রশালার ছবিগুলো পাতিয়ে সযত্নে বাঁধিয়ে ও প্রকাশনা জগতে বিশেষভাবে সুপরিচিত। ছিন্নোপ্রকিশোরের জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে পুনঃপ্রকাশিত 'ত্রয়ী গল্পিকা ও বাঙ্গা বাইবেল'-এর আকর্ষণীয় প্রচ্ছদের শিল্পী সাহাজিৎ রায়।

উনিশ শতকের বাংলা প্রকাশন ভারতীয়ের বসুমতী সাহিত্য মন্দির একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় খুব সামান্য অবস্থা থেকেই কর্মজীবন শুরু করে ধীরেধীরে একটি বই-এর সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। এবং তিনি তাঁর সঞ্চয় থেকে সেকালের প্রসিদ্ধ বই 'সচিত্র ভারত' প্রকাশ করেন। ক্রমশ বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং 'সাপ্তাহিক বসুমতী' (১৮৯৬) প্রকাশ শুরু করেন। পরবর্তীকালে ছাপাখানার ১৮৯ বউবাজার স্ট্রিটে বসুমতী প্রেসের স্থানান্তরিত হয়। পরে 'দৈনিক বসুমতী' (১৯১৪) এবং 'মাসিক বসুমতী' (১৯২৫) প্রকাশিত হয়। এসব কর্মকাণ্ড ছাড়াও মূলত মূল্যে গ্রন্থ উপহার এবং উনিশ শতকের শিক্ষিত সাহিত্যিকদের গ্রন্থাবলী সুলভ মূল্যে বাঙালি সমাজের হাতে পৌঁছে দিয়ে বসুমতী তাঁর বাঙালিকে বিশদ চিনের সাহিত্যিকদের সঙ্গেই নবীনের ঘটালি, বাংলার ও বাংলার বাইরের প্রবাসী বাঙালি সমাজে একটি বৃহৎ সাহিত্যরসজ্ঞ পাঠক সমাজেরও সৃষ্টি করেছিল। গ্রন্থাবলী প্রকাশের ক্ষেত্রে 'বঙ্গবাসী' (১৮৮৩) এবং 'হিতবাদী'ও (১৮৯১) সুপরিচিত। অবশ্য গ্রন্থাবলীর সার্বিক সাফল্যের প্রকাশের কৃতিত্ব বসুমতী সাহিত্য পরিবারের।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে প্রতিষ্ঠিত প্রকাশকদের মধ্যে এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স (১৯১৭) নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত সর্বাধুনিক পাঠকের রুচির বই প্রকাশের বিশেষজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছে। এম সি র ভূমিকা এক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ। এম সি র প্রতিষ্ঠানের প্রথম দিকের প্রকাশনা (১৯১৭-২১) প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন, "এম সি সরকার তখন সবে ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার প্রকাশিত বইগুলি ছাপা ও বাঁধাইয়ের দিক দিয়া বিশেষ উন্নত ছিল না।" কিন্তু এই সময়ের মধ্যে প্রকাশিত বইগুলির মধ্যে 'শরৎ' (১৯১৮) এবং 'পূর্ণিমা' (১৯২০) এম সি-র মতো প্রথম সারির সাহিত্য সেবকদের লেখা রাজশেখর বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, শিবরাম চক্রবর্তী প্রমুখ বিশিষ্টজনের উল্লেখ্য। অবশ্যই বলা যায়, বুদ্ধদেব বসুর বিবাহ বইগুলির প্রকাশকও এম সি।

বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে। প্রকাশের রবীন্দ্রনাথের নবপর্যায়ের বই-এর প্রকাশ ও পুরনোকার বইগুলির পুনর্মুদ্রণের জন্য। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও, বিশ্বভারতীর গ্রন্থন বিভাগের স্বাভাবিক কর্তৃ বন্ধুদের সাহায্যেরও ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন, অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, বিশেষজ্ঞ নির্মলকুমার বসু এবং যিনি আজীবন রবীন্দ্রভাবনায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। সেই পুলিনবিহারী সেন। বিশ্বভারতীর সহজ সরল অথচ আভিজাত্যে প্রকাশনা শুধু রবীন্দ্রগ্রন্থ প্রকাশেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। বিদ্যার অনুবিদ্ধান করার সঙ্গে শিক্ষিত মনের রেখা জাগ্রত করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। লিখিয়া সংগ্রহ গ্রন্থমালা—ভারতীয় ও বহির্ভারতের বিশেষজ্ঞদের রচিত

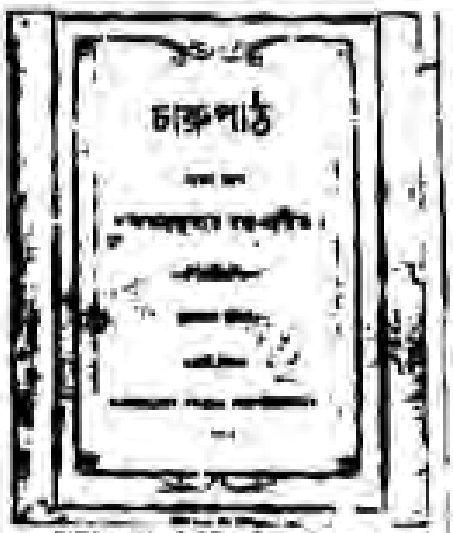

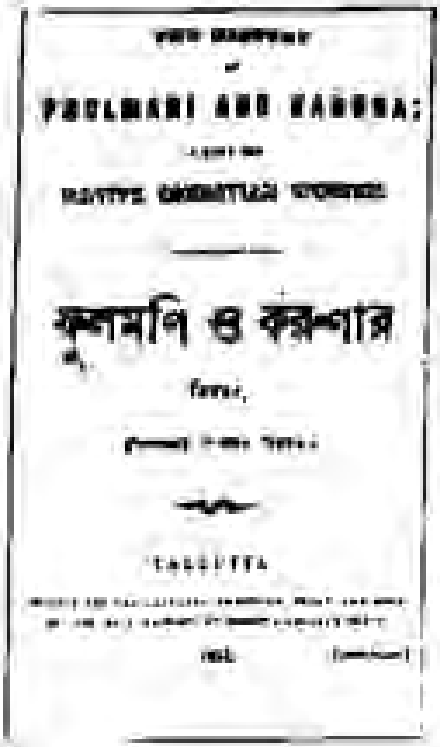

PHULMANI AND KARUNA;

ফুলমণি ও করুণার

জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় সকল শাখার ১৩৪টি বই এই গ্রন্থমালার ঘুক্ত হয়েছে। ছাড়া ; ইন্দ্রনাথের পরিকল্পনাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা'। এছাড়াও আছে 'পঞ্চানন্দ গ্রন্থমালা' 'সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থমালা' প্রভৃতি। বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতে উদ্যোগের প্রকাশন ধারা আজও সমভাবে চলে আসছে।

ব্যক্তিগত ভাবনা বা সাহিত্যিক গোষ্ঠীর নিজেদের লেখা প্রকাশ সহজসাধ্য করতে এরূপ অনেক প্রকাশনা সংস্থা স্থাপিত হয়েছিল। উনিশ শতকে পাদ্রিশিরোমণি, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি লেখকগণের জন্য অনেকেই উদ্যোগ করা হয়েছে। বিশ শতকে এস সি. লিঙ্কস্যারদী ছাড়াও উদ্যোগী আমাদের ডে ও মধুসূদন বেদ-এর দেবসাহিত্য কুটির, গজেন্দ্রকুমার মিত্র ও সুধাকান্ত ঘোষের মিত্র ও ঘোষ, সাগরময় ঘোষ-এর পনিবঞ্জন ডে'স বা বঙ্গল পাবলিশার্স, মনোজ বসুর বেঙ্গল পাবলিশার্স, কল্লোল গোষ্ঠীর কল্লোল পাবলিশার্স, কবিতা গোষ্ঠীর কবিতা ভবন প্রভৃতি। যুদ্ধ পূর্বকালে বাজারটির কারণে প্রতিষ্ঠিত আরও অনেক প্রকাশক উদ্যোক্তাদের ভেতর কি এক লাইব্রেরি এ মুখার্জি মধুসূদন। কলেজে অধ্যাপনা বিদেশকালের উদ্যোক্তাদের ভাগ্যের সিলেটি প্রেস (১৯১৪) বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন ব্যবসায় ১৩শ. একটি প্রকৃত 'শিল্প' অলঙ্করণ ও মুদ্রণে ঘিলানের মেরি প্রকাশ করেছিল। সিলেটের শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন তখনকার কালের উদীয়মান শিল্পী সতীন্দ্রকি রায়—সিলেটি-এর পুঁথিচরকলির উপেন্দ্রকিশোরের 'টুনটুনির বই' এবং আরও অনেক বই-এর প্রচ্ছদ শিল্পী ছিলেন সতীন্দ্রকি।

ইন্দ্রনাথের, মৃদুলের আর বিভূতিভূষণ, জীবনচেতন সেন, প্রমুখ বয় বিদ্যায় সাহিত্যিকদের প্রচারের দৃষ্টিনন্দন প্রকাশনার দ্বারা সিগনেট একটি দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছে। একালে বেলিয়াঘাটার শেলের মোড়ে অনেক শারদলিপার্ণ বই-এর অন্তরঙ্গতা নিয়ে বেশ সাজানো। এই প্রবন্ধে সব কালো প্রকাশন সম্ভার উল্লেখ সম্ভব নয়, তবে, পাঠ্যপুস্তক ও জনপ্রিয় সকল বিষয়ে বাংলা প্রকাশনা ক্ষেত্রে বইপড়ার ছোট বড় সকল প্রকাশনা সংস্থাই আজ বাঙালি পাঠক সমাজের নিরঙ্কুশভাবে স্বীকৃত।

বাংলা প্রকাশনার ইতিহাসে পত্র-পত্রিকার ভূমিকাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলা প্রথম মাসিক পত্রিকা 'দিগ্দর্শন' (এপ্রিল ১৮১৮) এবং প্রথম সংবাদপত্র সমাচারদর্পণ (মে ১৩, ১৮১৮) প্রকাশনার কৃতিত্ব শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের। এর অল্পদিন পরেই হোরেসহ্যান্ড হিন্দুস্থানি যন্ত্রালয় থেকেই প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়েছিল গঙ্গাকিশোরের 'বাঙ্গাল গেজেটি' (১৮১৮)। রামমোহন রায়ের সঙ্গে মিশনারীদের ভাবসংঘাতের ফলে ১৮২১ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল 'ব্রাহ্মণ সেবধি' এবং 'সম্বাদ কৌমুদী'। প্রথম দিকে রামমোহন ও দ্বিতীয় উদ্যোগীদের বিরোধে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদিকায় 'সমাচারচন্দ্রিকা' (১৮২২)। 'সম্বাদ কৌমুদী' ও 'সমাচারচন্দ্রিকা' মূলত ধর্মবিষয়ক বিবাদ বিতর্কের জন্যই ব্যবহৃত হত। পরবর্তীকালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা' (১৮৪৩) তৎকালীন শিক্ষিত ও প্রগতিশীল পাঠক সমাজে খুবই সমাদৃত হয়েছিল।

বাংলার প্রথম সচিত্র সাময়িক পত্রিকা ভাগীরথীর শিলিগুড়ির সেপ্টেম্বরটি প্রকাশিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' (১৮৫১)। পরি সাহেবের ১৮৫০-৫৪ বর্ষের বিবরণীতে ছিল মোট ১৯টি পত্র-পত্রিকা, ১৮৫৭-৫৮ বর্ষের বিবরণীতে ছিল

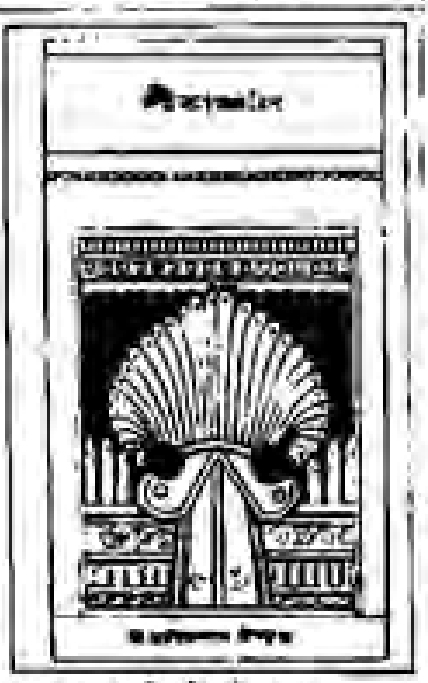

১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত এই পত্রিকাগুলির প্রথম ৫৭টি বছর-পঞ্জিকা প্রকাশিত হলেও, ১৮৫৮ পর্যন্ত পত্রিকাগুলি টিকে থাকতে পারেনি। এই সময়ের শিক্ষাবিস্তারের সহায়তায় প্রকাশিত হয়েছিল 'সোমপ্রকাশ' (১৮৫৮)। পত্রিকাটি প্রকাশন, বিচার প্রভৃতি অনেক বিষয়ে সমালোচনা প্রকাশ করে সাংবাদিকতায় এক নতুন ধারার সৃষ্টি করেছিল। স্ত্রী-শিক্ষার জন্য দুটি পত্রিকা 'বামাবোধিনী' এবং 'অবলাবান্ধব' প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬৩-৬৪ সালে। উনিশ শতকের শেষ তিন দশকে প্রকাশিত শত-পত্রিকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২), অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'সাধারণী' (১৮৭৩), 'ভারতী' (১৮৭৭), 'বঙ্গবাসী' (১৮৮১), 'হিতবাদী' (১৮৮৩) প্রভৃতি। ব্রাহ্মসমাজ প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকা 'ধর্মতত্ত্ব' প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে।

বঙ্গভঙ্গের শিক্ষিত মুসলিম সমাজ ও হিন্দু অর্থবান ব্যক্তি প্রেস স্থাপন করে পত্রিকা প্রকাশনা শুরু করেছিলেন—এঁদের মধ্যে উল্লেখ 'ইসলাম প্রচারক' (১৮৮৭), মুর্শিদাবাদ 'হিতৈষী' (১৮৮৯), উত্তরপাড়া পাক্ষিক পত্রিকা' (১৮৯৬), রাজেন্দ্রলাল মুস্তফির 'প্রত্নতত্ত্ব প্রকাশিকা' ১৮৮৩), যশোহরের 'অনুসন্ধান পত্রিকা' (১৮৮৮) প্রভৃতি। এই 'অনুসন্ধান পত্রিকা'ই পরে ইংরেজী সৈনিকে রূপান্তরিত হয়ে দীর্ঘকাল ধরে প্রকাশিত হয়ে এসেছে। 'সাধারণী' মুদ্রণ থেকে প্রকাশিত হলেও, সাহিত্য পত্রিকা হিসেবে পরবর্তীকালের শিক্ষিত সমাজের সুপরিচিত ছিল।

ঊনিশ শতকে অন্তরালে বিভিন্ন সাহিত্যিক গোষ্ঠী সৃষ্টির মূলে যাঁদের নিজস্ব পত্রিকার প্রকাশিত হয়—প্রথম শ্রীপুরী প্রকাশিত 'সমাচার' (১৯১৮), কলাল গোষ্ঠীর 'কলাল' (১৯২৬), যোগানন্দ দাস, অশোক চট্টোপাধ্যায় এবং সাম্প্রতিকাল সময়ের 'শনিবারের চিঠি' (১৯২৭), বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' (১৯৩৫) প্রভৃতি। তবে এর বহু আগে সর্বসাধারণের মুখপত্র বাঙালি পাঠক সমাজকে অভিজ্ঞতার স্তরে বেশেষিক ত্রিমাসিক পত্রিকা—প্রবাসী (১৯০১), ভারতবর্ষ (১৯১৩), এবং 'বসুমতী' (১৯২৪)। বাঙালি নিম্ন সমাজে ত্রৈমাসিক 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'ও (১৯৪৩) বিশেষভাবে সমাদৃত হয়ে আসছে।

'সমাচার প্রভাকর'-কে বাংলার প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র বলা যেতে পারে—প্রথমে সাপ্তাহিক পত্রিকারূপে প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে, প্রকাশিকার জন্ম থেকে মাত্র ১৪ জুন ১৮৩৯ থেকে। একালের জনপ্রিয় বাংলা দৈনিকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'আনন্দবাজার পত্রিকা' (১৯২২) এবং 'যুগান্তর' (১৯৪৭)। সাময়িক পত্রিকাগুলির মধ্যে পরে পঞ্চাশ বছরেরও অধিককাল ধরে বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যিক সৃষ্টিতে 'প্রবাসী' পত্রিকার ভূমিকা বাঙালি পাঠক সমাজের সুবিদিত। স্বাধীনতার পর থেকে কয়েকটি দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকার সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষভাবে মহিলাদের জন্যের

A

DICTIONARY

OF THE

BENGALEE LANGUAGE,

IN WHICH

THE WORDS ARE TRACED TO THEIR ORIGIN

AND

ENGLISH EXPLANATIONS GIVEN AT LARGE

VOL. I.

By W. CAREY, D. D.

SERAMPORE:

1818.

কেন কয়েকটি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এই ছোট প্রবন্ধে সকলের উল্লেখ করা সম্ভব হল না।

প্রকাশনা ক্ষেত্রে কেন কয়েকটি নিম্ন ও বিশেষ শ্রেণীর সাময়িক পত্রিকারও উল্লেখযোগ্য। উনিশ শতকের প্রথম দিকে এর বিশেষ প্রয়াস দেখা যায়নি। বিদেশী প্রভাব-মুক্ত প্রথম শিশুপাঠ্য সাময়িক পত্রিকা কেশবচন্দ্র সেনের 'বালকবন্ধু' (১৮৭৮)। তার পরবর্তীকালে এসেছিল 'সখা' (১৮৮৩), জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর 'বালক' (১৮৮৫), নিবারণ পণ্ডিতের 'মুকুল' (১৮৯৪)। বিশ শতকে মহীন্দ্র উপেন্দ্রকিশোরের প্রতিষ্ঠিত 'সন্দেশ' (১৯১৩)। পত্রিকাটি প্রকাশের সঙ্গেই বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। 'সন্দেশ' সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল (১৯২৩), এখন নবপর্যায়ে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। 'সন্দেশ' প্রথম বন্ধ হওয়াতে, সেই অভাব পূরণ করতেই বেন মুখোপাধ্যায় সাহারঞ্জনের 'মৌচাক' প্রকাশিত হল (১৯২০)। শিশুসাথী' (১৯২২), 'খোকাখুকু' (১৯২৩), রামধনু' (১৯২৭) প্রভৃতিও কয়েক বছর শিশুপাঠ্য সাময়িক পত্রিকা হিসেবে জনপ্রিয়তা লাভ করে এসেছে। একালের পাক্ষিক 'আনন্দমেলা' শিশু ও কিশোর পাঠ্য পত্রিকাগুলির মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ঘরে ঘরে পরিসংস্থান দিয়ে না দেখালেও একথা জনতীকার্য যে উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বাংলা প্রকাশনার ক্ষেত্রে যে উর্ধ্বগতি শুরু হয়েছিল সে গতি আজও প্রবহমান। বিশ শতকের প্রথমার্ধে বছরে গড়ে বই প্রকাশিত হয়েছে ১,২৫০-এর মত। দেশ বিভাগের পর সাময়িক কারণেই প্রকাশন সংখ্যা নিম্ন মুখী দেখেছিল। জনজীবন একটু স্থিতিশীল হতেই সেই উর্ধ্বগতি আবার ফিরে এসেছে, এবং ১৯৮৩-৮৪-তে প্রকাশিত বই-এর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৮৭২টি। তবে সংখ্যা বৃদ্ধিই প্রকাশনা ক্ষেত্রে অগ্রগতির একমাত্র মান নির্ণায়ক নয়। বাংলা প্রকাশনায় শিল্পোন্নয়ন সফল করে তোলে সাহিত্য। বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা প্রভৃতি দেশ ও জাতি গঠনমূলক বই-এর সংখ্যাবৃদ্ধি প্রকাশন জগতের অগ্রগতির একটি বিশেষ সূচক—আজকের উন্নত দেশগুলির প্রকাশকরা সেই ইঙ্গিতই দিয়ে আসছে। অবশ্য, চিত্তবিনোদনের জন্য বই-এর প্রয়োজন আছেই, তবে অন্যান্য বিষয়ে গ্রন্থ প্রকাশে উৎসাহিত করার দায়িত্বও প্রকাশকদের। আর এই গতি ও প্রগতির মূলে ছাপা মুদ্রণপদ্ধতির সহায়তায় করে প্রযুক্তিবিদ্যার ও গবেষণামূলক বইগুলি দ্রুত প্রকাশ করে পাঠকদের হাতে তুলে দেবার জন্যও প্রকাশকদের সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

আজকাল বাংলা প্রকাশনার মধ্যে ঘুন ধরে নিয়েছে কিছু পচনের দোষদুষ্ট কাহিনী, আর যাদের বিজ্ঞাপনে পাবে কেবল 'প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য', বা 'অষ্টাদশোর্ধ্বে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য', বা দেখে প্রশ্ন জাগে—বাংলা প্রকাশনা কি আবার নতুন করে নিম্নমুখে ফিরে যাচ্ছে? অবশ্য কলো মেঘের কোলে রুপালী রেখার মত কিছু প্রকাশক প্রশংসনীয় ভাবে ভাল বই প্রকাশ করে আমাদের আশার আলো এনেছেন—সাহিত্যিক পাঠকসমাজও বইগুলি আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করেছে। গ্রন্থপরিষদের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন, তাঁদের দায়িত্ব সুনির্বাচিত গ্রন্থের মাধ্যমে সুস্থ নাগরিক-মন গড়ে তোলা। গ্রন্থপরিষদের এই গতির দায়িত্বের ভাগীদার কী প্রকাশকরাও নন।

বাংলা প্রকাশনা জগৎ এখনো আর একটি অপরাজেয়ের ক্ষুব্ধ গোষ্ঠী মধ্যে নয়—অনুন্নত অঞ্চলে পড়েছে আন্তর্জাতিক প্রকাশন জগতের ঘুন প্রোতের সঙ্গে। বাংলা বইতে ISBN (International Standard Book Number) সংকেত সংখ্যা ব্যবহার বাংলা প্রকাশনার আন্তর্জাতিকতাই প্রমাণ করেছে। আমাদের জাতীয় জীবনে বই কতখানি ঘুন অধিকার করে আছে তার সব থেকে বড় প্রমাণ মহীমেলাগুলো। প্রথম কলকাতা মহীমেলায় (১৯৭৬) দর্শক সংখ্যা ছিল এক লক্ষ পনের হাজার, বই বিক্রি হয়েছিল পনের লক্ষ টাকার মত। এর পর বছরের মেলি আগে, যখন প্রথমবারে দর্শকের সংখ্যা ছিল পনেরো মত্র দিনেরজন, সেবারে ৩২২টি বই-এর প্রায় দু' লক্ষ কপি ঘুন দেখে বেচাকেনার ক্ষেত্রে সব মানুষ আশ্বস্ত হয়েছিলেন যে, বাংলা বই-এর বাজারের সবে উন্নতি হয়েছে, সামনে রয়েছে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। গৌরবের বিষয় যে আজ বাংলা বই-এর প্রকাশনা সেরা দশটি ঘুনিয়ার ভাষার পর্যায়ভুক্ত।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় বটতলার বই

ড. তাপস বসু

মধ্যযুগের (১৩৫১—১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দ) শেষের থেকে মেলিয়ে আধুনিক যুগের সূচনা (১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ)। হয়েছিল প্রধানত পাঁচটি কারণে— (ক) আনুগত্য সর্বজনীন পরিবর্তে ভক্তি-শ্রদ্ধার উপস্থাপনা। (খ) দেব-দেবী নির্ভরতার—প্রাধান্যের পরিবর্তে পুরোপুরি জীবন নির্ভর হয়ে ওঠা। (গ) গদ্যের পরিবর্তে পদ্যের ওপর জোর দিয়ে সাহিত্যের পদ্যবিমুখ বিস্তার। (ঘ) ফরাসডাঙা পদ্যের অনুসরণে জনরুচির প্রবন্ধ নিরন্ধ সহ সাহিত্যের জনানো হাজার হাজার পুঁথির পরিবর্তে একটি প্রন্থের অসংখ্য সংখ্যা প্রকাশ। যেটি সহজে সকল বিষয়ে গ্রন্থ ও সাময়িক-সংবাদপত্র-পত্রিকার প্রকাশে মনুষ্যের পাঠভাবনা বৃদ্ধি, আর তারই সূত্রে জ্ঞানগর্ভ, নবজাগরণ।

নদিয়ের অবসন্ন রাজকরকলে লেখা দেওয়ার পর রাজকার্য পরিচালনার স্থলে সাগরের ওপার অর্থাৎ ইংল্যান্ড থেকে ফোরাস কর্মীদের আলোচনায় নিয়ে আসা হল। বুশিলাবাদের পতনের পর কলকাতা-নবাবী হয়ে উঠেছিল আসল তথা ভারতবর্ষের রাজধানী। কলকাতাকে কেন্দ্র করেই একদিকে উচ্চশ্রেণির ইংরেজ রাজকর্মচারী, অন্যদিকে লর্ড কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩) সূত্রে প্রজা শোষণের অর্থে বাংলাদেশের নব্য জমিদারেরা এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নব্য গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গে যুক্ত থাকা 'বাবু' সম্প্রদায়ের অভিজাতে জনুরেখা ইঙ্গ-বঙ্গ সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিলেন। যদিও এই সংস্কৃতির দিগন্তরালটি জুড়ে ছিল—ইংরেজি সাহিত্য, সংস্কৃতি, দর্শন। তাই সাগর পারের ফোরো হাওয়ায় কলকাতার অভিজাত মনুরেখা ইংরেজ রাজকর্মচারীদের পাশে খানিকটা সংস্কৃতির হলেও—হাই জনসেন না। ইংরেজি-সাহিত্য-সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে বুদ্ধিজীবী গাঙ্গুলিরা যেন খানিকটা অনুপ্রাণিত হলেন। সেই অনুপ্রেরণা থেকেই বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি মনুষ্যের গতী পেরিয়ে আধুনিকতার মুকুর করল।

আসলে ইস্টইন্ডিয়ান জ্বাক পড়ার পরই জাহাজগুলি শুধু এদেশ থেকে মশলা আর তুলিন নিয়ে ইংল্যান্ডে পৌঁছে যেতনি। সেখান থেকে পরে এনেছিল পাশ্চাত্য সাহিত্য-সংস্কৃতির নীর্ঘ সমৃদ্ধির নিদর্শন। তাই তো আমরা পেয়ি সক্রেটিস থেকে শেক্সপিয়র, হোমারেরার—ক্রমে মেঘনাদবধকাব্যের থেকে শেষ—ছিল, যেখান প্রমুখের সাহিত্য সংস্কৃতি ও দর্শনের মূলাবনে প্রকাশিত ঐতিহ্যবাহী গ্রন্থগুলি শৌঁছে দিয়েছিল কলকাতা সহ ভারতের বিভিন্ন নগরীর কলরে। প্রিন্স দ্বারকানাথ, রাজা রামমোহন, ডিরোজাওর থেকে মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ পর্যন্ত সকলেই পাশ্চাত্য সংস্কৃতির পাশাপাশি ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন অর্থাৎ প্রাচ্য সংস্কৃতির, যা ছিল দীর্ঘকাল অন্ধ তমোনিশার ঘোমটাতলে ঢাকা ছিল সেই ঘোমটাটি সরিয়ে তাতে ফোরোজন অবগাহন। যেটি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মেলবন্ধনে ভারতবর্ষ যেমন একদিকে খুঁজে পেয়েছিল তার হারানো সত্তার পূর্ব দিগন্তকে অন্যদিকে আরও করেছিল পশ্চিমী সংস্কৃতিকে। এই সময়ের মধ্য দিয়েই জাগরণ-নবজাগরণ, সাক্ষাৎ-রেনেসাঁর দীর্ঘায়িত প্রসারণ, যা ছিল আজও প্রবহমান।

॥ ২ ॥

এবার খোলা বাংলাদেশের পত্রিকাদির পরিমার্জিত সাহিত্য-সংস্কৃতিগুলি ও চর্চার কথা। এই চর্চা ও গ্রন্থাদি শুরুটা কিন্তু পত্রিকাদির ছিল না। বরং তা ছিল—এরই ঔপনিবেশিক অর্থাৎ

বিদ্যুৎচমকের স্বীকারোক্তি ছাপা পাঁচালীর একটি পৃষ্ঠা

আইপোট: রাইচরণ পাঁচালির ছবি

অ-পরিশীলিত। অনেকটা, অসমাজিতও বটে। তবুও ইতিহাসের নিরিখে আধুনিক কালের সূচনা-র পরিশীলিত পরিমার্জিত সাহিত্য সেখা হবে এটা জানাও ছিল। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অভিজ্ঞতাকে ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ বর্জন শেষ জীবনের অষ্টাদশ কেরোসিন ভারতচন্দ্রই শুরু হয়ে গেছে প্রবলভাবে মুদ্রিকিত ঔপনিবেশিক মধ্যযুগের সাহিত্যের পরিণতি এবং মুদ্রিকিত। ভারতচন্দ্রের ছন্দটি বজায় রাখতেছিলো বিদ্যা, খেলিব, পাঁচালী, অবিশ্যক, ঘটোপন ইত্যাদি। প্রতিভার ছুতো নয়ে বিদ্যাকে ভারতচন্দ্র বা রামপ্রসাদ না আসার—না আসার স্বপ্নাবলম্বন এতদেরই পূর্ণ হয়েছিল আর রামপ্রসাদ ছাড়া আর সকল কবির পরবর্তনশীল রচিত হয়েছিলো উনবিংশে শতাব্দীর। কোনো কোনো শতাব্দীর পরে পাঁচালী, কবিগানের আগমি তাই দেখেছে অন্যায়ে।

শতাব্দীর কবিতাদের সমস্যাহার চালিত উইলকিন্সের আসো সুবহ নির্মাণ করার শতাব্দী ১৭৭৮ ইংরেজিতে প্রকাশের সাহেবের 'A Grammar of the Bengali language' প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে কি না বাংলা ব্যাকরণ ইংরেজি ভাষায় রচিত হয়েছে পাশাপাশি উদাহরণসমূহ বাংলা হরফে ছাপাও হয়েছে দুটিয়ে। বাংলা হরফে ছাপা এটিই প্রথম গ্রন্থ।

এই গ্রন্থটি প্রকাশের পরপরই একদিকে বাংলা মুদ্রণ শিল্পে যেমন উজ্জ্বলের হাওয়া বয়ে গেলো তেমনি লক্ষ্য করা গেলো কোম্পানি ইংরেজ কার্যকর্তাদেরও অন্যান্য ভাষা-সাহিত্যের পাশাপাশি গুরুত্বের সঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার পরিধি বিস্তার করে নিয়ে যেতে উইলকিন্সের অনেক প্রতিষ্ঠা হল ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে। যেতে ইতিহাসের অনেক গবেষক লেখকেরা মনে করেন—উইলকিন্সের কেরী, রামমোহন মুখোপাধ্যায়, হরিমোহন মিত্র, গোলোকনাথ শর্মা, রামকিশোর তর্কচূড়ামণি, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, হলহেডের বাই এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও রামরাম বসু। এঁদের রচিত গ্রন্থগুলি অধিকাংশে ক্ষেত্রেই অনুবাদ নির্ভর। তবে মৌলিক গ্রন্থও ছিল। আমরা সংক্ষেপে গ্রন্থগুলির নাম উল্লেখ করছি লেখকদের ক্রম অনুসারে 'কথোপকথন', 'ইতিহাসমালা', 'রাজাবলি মৃত্যুঞ্জয় রায়ের চরিত্রের', 'ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট', 'হিতোপদেশ', 'হিতোপদেশ' (২) পরমার্থসঙ্গ কৌমুদী, 'জ্ঞানচন্দ্র কৌমুদী', 'রোমক ইতিহাস', 'শুকের পরীক্ষা', 'অভিন্ন নিয়োগন', 'রাজাবলি', 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' আর 'লিপিমালা'।

এরই পাশাপাশি শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন খ্রীষ্টান ধর্মগ্রন্থগুলির কথার উদ্যোগ নিয়ে একদিকে কৃষ্ণিবাসী রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত এবং ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' যেমন ছাপলো, তেমনি ছাপলো বাইবেলের অনেক নিউটেস্টামেন্টের কথা। এই ধারাটি বহু

ছাপার অক্ষরে—হিন্দু ধর্ম স্থান নয়। হিন্দু ধর্মের ভিত্তি অনেকটাই অলীক। তা যেমন প্রতিপন্ন করা, অন্যদিকে খ্রীস্টান ধর্ম প্রচারে শ্রেষ্ঠ সহায় এবং সহায়ের নিরিখে সাজাও, তাই এই খ্রীস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করার জন্যে বাইবেলের অনুবাদ এবং তা বিনামূল্যে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিতরণ। ফলের বিষয় নবা শিক্ষিত হিন্দু যুবকেরা পরবর্তীকালে খ্রীস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছিল বটে কিন্তু সংখ্যায় খুবই কম। বৃহত্তর জনগোষ্ঠী খ্রীস্টান ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারেনি কারণ বাইবেল পড়ার মতো শক্তি অর্থাৎ নিরক্ষর—অন্ধ জনমানুষের কাছে মুদ্রিত বাইবেল পৌঁছোনোর তার সঙ্গে তাদের সংযোগ গড়ে ওঠেনি। জোর করে বা হিন্দু সেন্টিমেন্টের প্রভাবের সামনে না দিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মধ্য দিয়ে খ্রীস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করার কাজটি কিন্তু অব্যাহত ছিল। এরকম আগরের ওপর থেকে এসেছিল সুচতুর পত্রিকা। আলোকপ্রাপ্তার তাগিদের কথা—এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। শ্রীরামপুর মিশন ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্য নিয়েই দুটি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করেছিল, প্রথমটির নাম দিগ্‌দর্শন (১৮১৮)—এটি ছিলো মাসিক, দ্বিতীয়টি 'সমাচার দর্পণ' (১৮১৮)—এটি ছিলো সাপ্তাহিক। বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে এই পত্রিকা দুটির প্রকাশ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ—সেকথা অস্বীকার করার উপায় নেই। এরই পথ ধরে পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয়েছে অসংখ্য সাময়িক পত্র-পত্রিকা। যা কিনা কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু ধর্মকে বিদায় করে ব্রাহ্ম ধর্মসমাজের জন্ম, সতীদাহ প্রথা রদ, বিধবা বিবাহ চালু, বহু বিবাহ প্রথা রদ ইত্যাদি সমাজ সংস্কারের বিষয়টিকে যেমন প্রাধান্য দিয়ে জনমতকে সংগঠিত করেছে, সেই সঙ্গে খ্রীস্টান ধর্ম প্রচারকদের বিরুদ্ধে আক্রমণের মোকাবিলা ধর্মের শাশ্বত রূপটি উদ্ঘোষণে মনীষীদ্বয়কে অভিনন্দিত করে তুলেছে। সেই সূত্রে বাংলা প্রবন্ধ নিবন্ধ-সমকথা, রম্যরচনা সর্বোপরি গল্পিক-উপন্যাস-গল্প ইত্যাদিকে সাময়িক পত্রগুলি বুকে ধারণ এবং লালন-পালন করেছে। ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে বাংলা গল্প হয়ে উঠেছে—সলাকেরা। এইসব সাময়িক পত্র পত্রিকার আয়ুষ্কাল দু মাস থেকে একশো বছর।

খুব্রেনা ঔরেনা: এদের ছবি অনায়াসেই সংগ্রহ

মুদ্রণের পাশাপাশি এসে পড়ে মুদ্রণালয়ের অর্থাৎ ছাপাখানার কথা। চার্লস উইলকিন্স এবং পঞ্চানন কর্মকারের উৎসাহদাতায় কলিকাতার ফুটস্তার প্রথম বাংলা হরফ মুদ্রণের ঐতিহাসিক মুহূর্তের পর ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় স্থাপিত হয়েছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রেস, এই প্রেসের তত্ত্বাবধানে ছিলেন—চার্লস্ উইলকিন্স। জানিয়ে রাখা ভালো—ভারতবর্ষের প্রথম সংবাদপত্র জেমস্ অগাস্টাস হিকি সম্পাদিত 'বেঙ্গল গেজেট' (ইংরেজি সাপ্তাহিক) এই বছরেই

( )

পৃ

পুরাণ জানিতে	to know an old story
পুরুক	wearinefs
পুরি	houfe and home
পুরিতে	to fill up, to fluff
পুরিত	full, filled up
পুর্ণিমা	full moon
পুর্হইতে	to be filled up
পুরান জ্বর	an intermitting fever
পুরী	a bolfter
পুরুষ	a man
পুরুষাঙ্গ	the penis
পুরুষকার করিতে	to make a preſent, [beſtow upon
পুর্ণরূপে	ſufficiently
পুর্ণহইতে	to be ſatisfied
পুঁছিতে	to cleanſe, wipe off

আক্ষরের ইংরাজীর বাংলাদি বোর্ডেরবাদি (১৮৯৮।৭ এবং পৃষ্ঠা

প্রকাশিত হয় এবং তা ছাপা হয় ইংরেজি হরফে। অবশ্য তার আগেই পরবর্তীকালে খ্রিস্টান মিশনারিরা নিজেরাই ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ছাপাখানা থেকে কেরি সিদ্ধু মুদ্রণকাল এই প্রকাশিত হয়েছে। অবশ্য তার অনেক বেশির ভাগটাই প্রকাশিত সংস্কৃত। ধর্মতলায় ফ্রিডম প্রেসে পরবর্তীকালে আর কোনো ভালো গ্রন্থ ছাপা হয়নি। তবে ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে ধর্মতলায় শ্রীরামপুর ছাপাখানার কিছু প্রতিনিধির পর তাদের নিজস্ব প্রেসে ছাপিয়েছেন লিটি টেস্টামেন্টের বাংলা অনুবাদ আর অন্যান্য গ্রন্থ ছাপা হয়েছিল সেই গ্রন্থগুলির কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। সেই গ্রন্থগুলির অনেক লেখকের গ্রন্থগুলির বেশির ভাগ সাময়িক কালের অন্যান্য ছাপাখানা থেকে ছাপা হয়। লেখকের উল্লেখযোগ্য ছাপাখানা—মুক্তারামবাবুর লেন 'মিশুরুনী প্রেস' (১৮০২), 'কলি প্রেস' (১৮০৪), 'সংস্কৃত প্রেস (১৮০৫) । 'ফরিস ব্যাপ্ত কোম্পানি' (১৮১৫), 'কালকাটা বুক সোসাইটির নিজস্ব প্রেস (১৮১৭), 'আর্মেনিয়ান স্ট্রিট হার্ড লিপস প্রেস' (১৮২৪) 'শিবপুর মিশন প্রেস' (১৮২২)। এছাড়া 'বেঙ্গলি গেজেটি প্রেস', 'সংবাদ চন্দ্রিকা প্রেস' 'সংবাদ কৃপাকর প্রেস', 'রত্নাবলী প্রেস,' 'সংবাদ তিমির ছাপাখানা', 'বঙ্গদূত প্রেস', 'সংবাদ প্রভাকর প্রেস', অন্যান্যের মধ্যে কলেজের জোড়াসাঁকো, বহুবাজার, নিমতলা, শিমলা, জোড়াসাঁকো বটতলা, বাঁশতলা, পোস্তাবাজার, নিমতলা, ঘুনেবাড়ুলি ইত্যাদি স্থানে প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানা বিভিন্ন সময়ে। সাময়িক পত্র ছাপা ও প্রকাশের ক্ষেত্রে এদের ভূমিকা ছিল প্রধানত উল্লেখ। বটতলার বই এইসব ছাপাখানা থেকে ছাপা হয়েছে। তবে এদের মধ্যে অনেকগুলিই আর বটতলার ছাপাখানা।

॥ ৩ ॥

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ও উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উন্মেষ-বিকাশ ও প্রতিষ্ঠার অভিনবত্বে আমরা যখন উল্লেখ করে এসব বটতলার ছাপাখানা ও ছাপানো বই প্রসঙ্গে আলোচনায় যেতে উদ্যত।

বটতলার বই কথাটি আমাদের মনের মধ্যে অনেকগুলি ভাব-ধারণার জন্ম দেয় কারো কাছে ঘৃণ্য—নীচু মানের বই। আবার কারোর—যাদুঘরালয়ের বই কিংবা ঐতিহাসিকের তথ্য কথার মতো গোপনে পড়বার বই ইত্যাদি। আসলে প্রথম ধারণাটি বেশি গুরুত্ব পেয়ে যায় বটতলা নামের ক্ষেত্রে। উনবিংশ ও শেষ কলকাতার উনবিংশে শতাব্দীর মধ্যকালে বটতলার বইয়ের ছাপা ও প্রকাশের নিজস্বতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বটতলা ছাপাখানার উদ্যোক্তা হয়েছিল ১৮১৮-তে বিশ্বম্ভর দেবের প্রতিষ্ঠান। তিনি তাঁর জানবাজারের বাড়িতে একটি প্রেস বা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করে কম খরচে ভাল-মন্দ হরফে-নানান ধরনের বই প্রকাশে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন পোস্তাবাজারের কাছাকাছির অধিবাসী। তাঁর ছাপাখানার প্রেসের সাহায্য পেয়েছিলেন অনেকে। তিনি ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে আবতারচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' নামে একটি

১৮২০ খ্রীস্টাব্দে মহারাজ জগন্নারায়ণ ঘোষালের সংকলিত বৃহৎ গ্রন্থ 'কল্পদ্রুমিকান বিলাস' প্রকাশ করেছিলেন। বিরাট গ্রন্থটি ফুলস্কেপ সাইজের প্রায় চারশো পাতার বই। অক্ষরও বেশ বড়। ১৮২৪-এ কবিকঙ্কন মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্য অনুযায়ী 'চণ্ডীর পুরক' এই ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। এই বইটি সম্পাদনা করেছিলেন রাজকবি বিদ্যালঙ্কার। বইটিতে পাঁচটি পূর্ণ পৃষ্ঠার ছবি আছে। ছবিগুলি কাঠের অর্থাৎ সীসার ব্লক থেকে ছাপা। সম্ভবতঃ এই গ্রন্থটিই ছিল এই প্রেসের ছাপা শেষ গ্রন্থ। এর পরে আর কোনো গ্রন্থ ছাপা হয়নি। আমরা বটতলার বই সম্পর্কে যে কথা বলেছি—সে কথাটি আর একবার স্মরণ করবো তা হলো অল্পদামে বা কম দামে অধিকাংশ, অধিকাংশের মানুষের কাছে মুদ্রিত পুস্তক পৌঁছে দেওয়ার জন্যই এইসব ছাপাখানা স্থাপিত হয়েছিল। প্রথম ছাপাখানা বা প্রেস অথবা মুদ্রণালয় যেহেতু বটতলা অঞ্চলে স্থাপিত হয়েছিল—তাই বটতলা নামটি প্রধান্য পেয়েছে। বাংলাদেশের জীবনযাত্রায় বটগাছ এবং বটতলার একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। বটতলা হল সাম্প্রতিক কালের উত্তর কলকাতার বিধান সরণী ও চিত্তরঞ্জন এভেনিউ-এর সমার্থবাচী স্থান। বটতলা নামটি অন্যতলায় রূপান্তরিত হয়েছে। এই নামে ফরাসী থানা ও বিদ্যালয়ও আছে।

বটগাছ ফলপ্রসূ নিজে থেকেই গজিয়ে ওঠে, তারপর বৃহৎ আকার ধারণ করে। আপন প্রয়োজনে যার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা—সেই সঙ্গে বৃহৎ বটগাছের নিচে বসে মানুষের আরাম ও রুজি রোজগারের বিষয়টি গুরুত্ব পাওয়ায় মূলে বটতলার বই একদিকে নানা জনের কাছে যেমন পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব যেমন নিয়েছিল তেমনি গুরুত্ব নিয়েছিল কম দামের প্রতিও। দাম কম রাখতে গিয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছাপার অক্ষরটি ঝাটিয়ে—সেই সঙ্গে ভালো কাগজের পরিবর্তে নিম্নমানের কাগজে সচিত্র বইগুলি ছাপা হয়েছে। এছাড়া বিষয় বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে ধর্ম বিষয়ক বই যেমন প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি সামাজিক নানা সমস্যা কিংবা অতি চলতিক, যৌন-জীবন-আশ্রিত বইও ছাপা হয়েছে। এই বিষয় বৈচিত্র্যের কারণও কিন্তু বহু মানুষকে আকৃষ্ট করা। বিশ্বনাথ দেব ১৮২০-তে বটতলা বই ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ছাপতে শুরু করেন। বিশ্বনাথ দেবের ছাপাখানা স্বল্পকালের মধ্যে বন্ধ হওয়ার কারণ তিনি মুদ্রণটির পরিচয় দিতে ভাল কাগজ ও ভালো অক্ষরে, ভাল বই ছাপতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু অত্যধিক খরচ পড়ে যাওয়ায় অল্পকালের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়। বিরাট পার্থক্য দেখা দেয়—তাই ক্রেতাসাধারণের মুখ চেয়ে এই ছাপাখানা বন্ধ হয়ে যায়।

১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাবু ছজুরাম প্রেমচন্দ্র পর্যন্ত তাঁর প্রেসটির 'সমাচার চন্দ্রিকা' প্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই প্রেসটিও উল্লেখ যোগ্য ছিল। অনেকের ধারণা বিশ্বনাথ দেবের প্রেসটি হোগলা ভবানীচরণ কিনে নিয়েছিলেন। ভবানীচরণ কিন্তু বিশ্বনাথ দেবের মতো রক্ষিণীল ছিলেন না। তাই বটতলার বই বলতে যে নিকৃষ্ট মানের এবং অশ্লীল বিষয়ের বই হয়ে থাকে তার উৎপত্তিতে প্রধান ব্যক্তিদের

বিদ্যাপতি পদের প্রথম একটি পৃষ্ঠা

[illegible]—কলিকাতা অমরকোষ (১৮৫০), সংবাদ বিলাস (১৮৫৫) সংবিধি বিলাস (১৮৫৮) এই তিনটি গ্রন্থ। তাঁর প্রেস থেকে সমাচার চন্দ্রিকা এবং সাপ্তাহিক পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। সমাচার চন্দ্রিকার পৃষ্ঠায় আমরা ছাপাখানা সম্পর্কিত যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়েছি, তাঁর ছাপাখানার নাম ছিল বটতলার বটিয়াপোতে প্রত্যক্ষ কোনো যুক্তির সম্পর্ক নেই। উত্তরকালে সেই যুক্তির সম্পর্কটা আবিষ্কার করে উপেন্দ্রকিশোর—সুকুমার সিনহার 'ছাপার কথা' (১৯৬১-৬২) এবং সোমেন্দ্রনাথ বসুর 'ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ' ইত্যাদি গ্রন্থে। শেষের গ্রন্থ দুটি রচিত হবার আগে পর্যন্ত জানা ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক শেষ হবার আগেই বটতলা অঞ্চলকে কেন্দ্র করে ছোট্টো-বড় অনেক ছাপা প্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। বিশ্বনাথ মুখিপাড়া, কুমোরটুলি, সোনাগাছি, অহিরীটোলা, গরানহাটা ও পটুয়াপাড়া ইত্যাদি স্থানে। একটা সময়ে আমার চিৎপুর রোডের দু ধারে বাহুড়ের ঝাড়ের মতো গজিয়ে উঠেছিলো বটতলার প্রেস। এই সমস্ত প্রেসগুলি থেকে ইংরেজদের গ্রন্থ প্রকাশের আগে যে সুযোগ ছিল তা এখানকার পরিশীলিত অধিবাসী ছাপাখানার আগে বটতলার অবস্থানকে ধরিয়ে গরীবের জীবনকে ধরেছিল। সেই সঙ্গে ছাপাখানার কাগজের কাটতি বেড়েছিল।

নিবুদ্ধি মানুষের হাতেও সব ক্ষেত্রে যে মহান গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তা নয়। ধর্মগ্রন্থ ছাড়াও এর সঙ্গে ধর্মগ্রন্থ মিশতে গেছে। আর তাদের সেই ছাপিয়ে পুরাণের বর্ণিত নিয়েছিল বটতলার ছাপাখানাগুলি, যেমন শ্রীরামপুর মিশন বা অন্যান্য উচ্চ মানের মুদ্রণালয় থেকে প্রকাশিত ধর্মগ্রন্থগুলি তেমন সহজে সাধারণ মানুষের ছিলো না, তাই বটতলায় সস্তা কাগজে, সস্তা প্রেসে ছাপা বইয়ের সমাদর দিন দিন বেড়েই চলেছিল। বটতলার বইয়ের দাম খুব কম ছিল—তার কারণ শুধু কম দামী কাগজ আর কম ছাপার খরচ বলেই নয়—প্রতিষ্ঠানগত আর অন্যান্য না থাকায় তাঁরা কম লাভে বই বেচে বেশী মানুষের কাছে পৌঁছে দিতেন। এছাড়া লাভের প্রত্যাশা তাঁরা খুব একটা করতেন না। শেষে যখন বটতলার ছাপা বইয়ের ক্ষেত্রে লাভ-লোভের বিষয়টি প্রধান হয়ে দেখা দিল—তখনও কিন্তু প্রকাশকদের মধ্যে তা ছিলো সীমাবদ্ধ।

এখানের বিশিষ্ট অনুষ্ঠের ধারণা—বটতলার বই মানে রাশিকৃত ফুলের ছাপার ওপর তার দাঁড়িয়ে থাকা। এ ধারণা কিন্তু ঠিক নয়। এ প্রসঙ্গে আশাবাদ সুকুমার সেন জানিয়েছেন—'পুরনো বটতলার বই অতি বিরল হয়ে পড়েছে। আমি অবশ্য পনেরো বছর আগেও সস্তায় সংগ্রহ করতে পেরেছি।' এ কথা জোরের সঙ্গে বলাই যে, সে সময়ে যত না দামী প্রেসে ছাপা বইয়ের তুলনায় বটতলার ছাপা বইয়ের মূল্যবৃদ্ধি হয়ে কম ছিলো। সুকুমার সেনের অভিজ্ঞতায় যে অসত্য নয়—তা আমরা দেখ কয়েকটি বটতলার বই-এ প্রত্যক্ষ ভাবে খুঁজতে পেয়েছি।

বিষয়ের দিক থেকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে রীতিমত নতুন পেরিয়ে গেছেন বটতলার ছাপাখানা ও বটতলার ছাপা বই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একটি

কিতাব কালচার ফোরাম
ফিনাব কাল্চিজ ফোর্টবলিয়ম
বুক কালেজ ফোর্টবলিয়ম

[illegible] [illegible] [illegible] [

বাংলা গ্রন্থচিত্রণ : একটি রূপরেখা

মানসী রায়চৌধুরী

বিদেশে বিশেষ করে ইউরোপে মুভেবল টাইপ দিয়ে বই ছাপা শুরু হয় ১৪৫৪ বা ১৪৫৬ খ্রিস্টাব্দে। এদেশে প্রথম মুভেবল টাইপ ব্যবহার করে বই ছাপা শুরু হয় ১৭৭৮ সালে। হ্যালহেড সাহেবের 'এ গ্রামার অব দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ'। ছাপাখানা ও ছাপার আরিশকীরান অবশ্যের দেশে এসেছে বিদেশ থেকে। সেই সঙ্গে এসেছে বুক ডিজাইনের ধারণা। বুক ডিজাইন বলতে বইয়ের কাগজ, মলাট, বাঁধাই, প্রচ্ছদ, ছবি, বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, বই শুরুর নামপত্র ও অন্যান্য প্রাথমিক বিষয়গুলিতে ব্যবহৃত হরফের বৈচিত্র্যের সামঞ্জস্য, বইয়ের ভিতরে হরফ-পরিচ্ছন্নতার আলো, তার চারপাশে ছাড়া জায়গা আর সব মিলিয়ে যে পরিবেশ তৈরি হয়, প্রযুক্তিবিদ্যা ও অলঙ্করণের ব্যবহার ইত্যাদি।

ছাপাখানা আসার আগে এদেশে পুঁথিপত্র, নথিপত্র, সরকারি নকশা, মানচিত্র ইত্যাদির প্রতিলিপি করা হত একান্তভাবে হাতের কাজ। এ ব্যাপারে হরফের শ্রী-ছাঁদ, ছাড় বা মার্জিন, ছবির ব্যবহার, হরফের ব্যবহার ইত্যাদির নিজস্ব পদ্ধতি ও নিয়মকানুন ছিল।

পঞ্চানন কর্মকার হলেন প্রথম দেশীয় কারিগর যিনি সাহেবদের কাছে কাজের অর্ডার, অক্ষর ঢালাই করা ও ছবি ছাপার জন্য প্রয়োজনীয় ব্লকে কাটারও কাজ শেখেন। এদেশে সর্বপ্রথম যাঁরা ব্লক কাটতেন তাঁরা একাধারে ছিলেন চিত্রকর ও ব্লক এনগ্রেভার। পঞ্চাননের ছাত্রদের ছেলেরা ১৮৪১ সালে স্থাপিত 'চন্দ্রোদয়' নামে একটি প্রেস চালাতেন। এঁদের ছাপা চিত্রিত শঙ্খিকার জন্য ছবির ব্লক নিকেরাই কাটতেন।

আমরা সচিত্র বাংলা বইয়ের প্রথম সাক্ষাৎ পাই ১৮১৬ সালে। বইটি গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য প্রণীত 'ভাষাতন্ত্রের 'অন্নদামঙ্গল' বইটিতে দু'খানা ছবি আছে। 'অন্নদামঙ্গল' প্রকাশিত হবার পর অনেকগুলি সচিত্র বাংলা বই প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে ১৮১৮ সালে রাধামোহন সেন প্রকাশিত 'সংগীততরঙ্গ' বইয়ে ছটি কপার প্লেট এনগ্রেভিং আছে।

কলকাতা বুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮১৭ সালে। সোসাইটি প্রকাশিত বইগুলিতে পাওয়া যায় বহু চিত্রাঙ্কনের আঁকা ছবি। উনিশ শতকের প্রথম তিন দশকে ছাপা বাংলা বইয়ের চিত্রণের ক্ষেত্রে উল্লেখ্য ব্যাপার হল

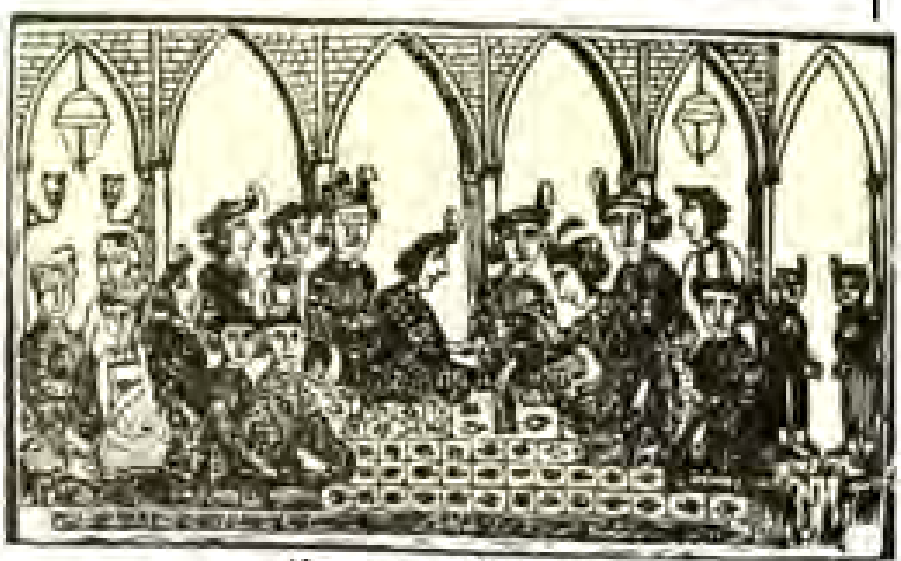

উনিশ শতকের গ্রন্থচিত্রণ: ১৮৪৬

'আইকন ইলাস্ট্রেটেড' বইয়ের প্রচ্ছদ : মোড়ল পেঙ্গুইন ও তার সঙ্গিনী

পুরস্কৃত ২৭ ডিসেম্বর, ২০০০

সংখ্যার সংযোজন

পুরস্কৃত ২৭ ডিসেম্বর, ২০০০ সংখ্যার ১১ পৃষ্ঠায় 'ইঁদুরের পার্টি' শীর্ষক সংবাদে অনবধানতাবশত একটি শব্দ মুদ্রণ পড়ে গেছে। এজন্য আমরা দুঃখিত। ছবিতেই শেষ লাইন দুটি সংযোজিত হলে হবে। পৌষলাভের বিনোদন অনুষ্ঠানে ইঁদুরদের অংশগ্রহণ অনুমোদন করা হয়নি।

—সম্পাদক

ঠাকুরমা'র ঝুলি

শিল্পী: দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার

সেনী দেখি সোমদত্ত উঠিল তখন।
হুড়াহুড়ি মহা যুদ্ধ করে দুই জন॥

তবে সেনী মহা কোপে ধরে তার চুলে।
দেখিয়া হইল হাস্য সভা সকলে॥

কোপে ধরি চড় মারে বক্ষের সমানে।
এক চড়ে দন্ত ভাঙ্গি পড়ে খানে খানে॥

তবে সভে উঠি গহা নিবারণ কৈল।
অভিমানে সোমদত্ত দেশেরে চলিল॥

সভা মধ্যে সোমদত্ত পাইয়া অভিমান।
তপস্যা করিতে বলে করিল পয়ান॥

দ্বাদশ বৎসর সেই কৈল অনাহারে।
একচিত্তে সোমদত্ত সেবে মহেশ্বরে॥

তপস্যায় বস হইল দেব দিগম্বর।
বৃষভে চড়িয়া আইল বলের ভিতর॥

শিব বলে বর মাগ সুনহ বাজন।
এত বলি সোমদত্তে তাকে পঞ্চানন॥

খাঁন

[illegible] [illegible] [illegible] [

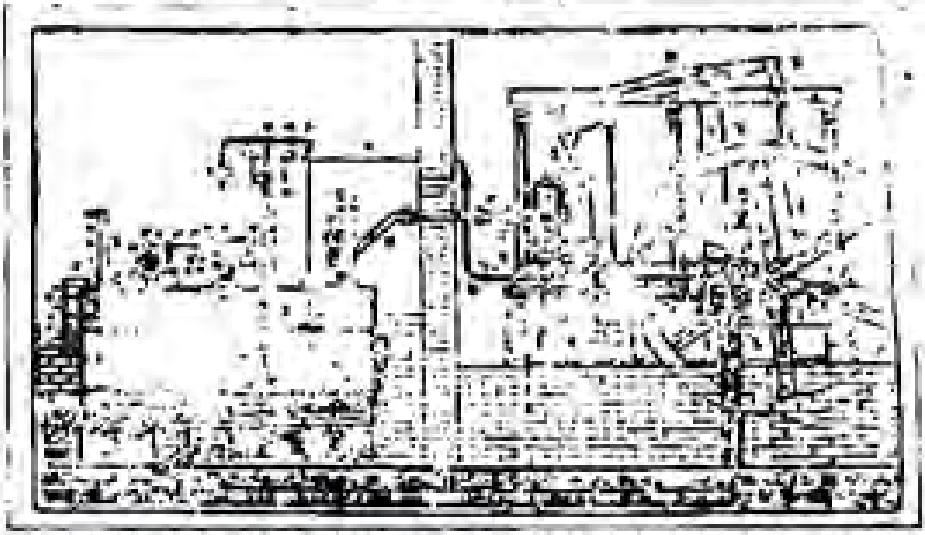

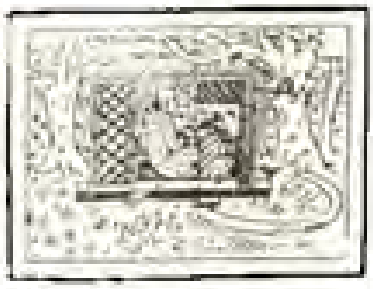

[illegible]

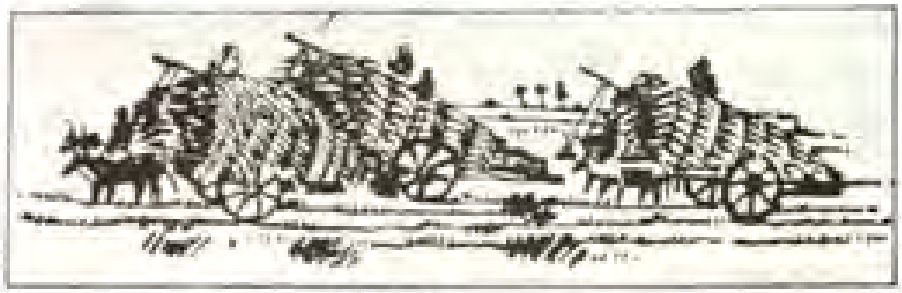

[illegible]

শকুন্তলা [illegible]

'আবর্জনার ঝেঁপ' : [illegible]

ঋতুরঙ্গশালা'। এর প্রচ্ছদ-নামকরণ রবীন্দ্রনাথ আর সেই প্রচ্ছদকে চিহ্নিত করলেন শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু। প্রচ্ছদ থেকে শুরু করে শেষ পাতা পর্যন্ত এই বইটির এমন একটি ভারসাম্য রয়েছে, বাংলা গ্রন্থচিত্রণে যার তুলনা খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রথমেই নজর কাড়ে বইয়ের পুষ্পসজ্জা। ভিতরে কবিতাগুলির বিষয় অনুসারে পাতায় পাতায় অলঙ্করণ। কোথাও পরিপূরক করা হয়েছে অতি পরিচিত দৃশ্য—কাঁধে বোঝাই গোরুর গাড়ি সার বেঁধে চলেছে, রিক্ত প্রান্তরের মধ্য দিয়ে। সমস্ত অলঙ্করণই সৃষ্টি হয়েছে সরু ও মোটা তুলির অনায়াস ও অমোঘ টানে।

প্রথম সংস্করণের মলাট

বইয়ের আর এক অসামান্য গ্রন্থচিত্রণ হল 'সহজপাঠ'। প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ ও আংশিক তৃতীয় ভাগ। পাঠ্য-পুস্তকের প্রাথমিক পর্ব পুরোপুরি বজায় রেখেও শিশু শিক্ষার বইয়ের চিত্রবস্তু কতখানি শিল্প মূল্যমণ্ডিত হতে পারে তার অবিস্মরণীয় নজির রেখে নন্দলাল বসুর 'সহজপাঠে'র গ্রন্থচিত্রণে। 'সহজপাঠ' প্রথম ভাগের চিত্রকর্মে তিনি ব্যবহার করেছেন লিনোকাট ছবির কৌশল—সাদা-কালোর আশ্চর্য জাদু। আবার দ্বিতীয় ভাগে এসে নন্দলাল অঙ্কনরেখার শ্রীময় সরল ও ভাস্কর্য সৌন্দর্যযুক্ত চিত্র এঁকেছেন।

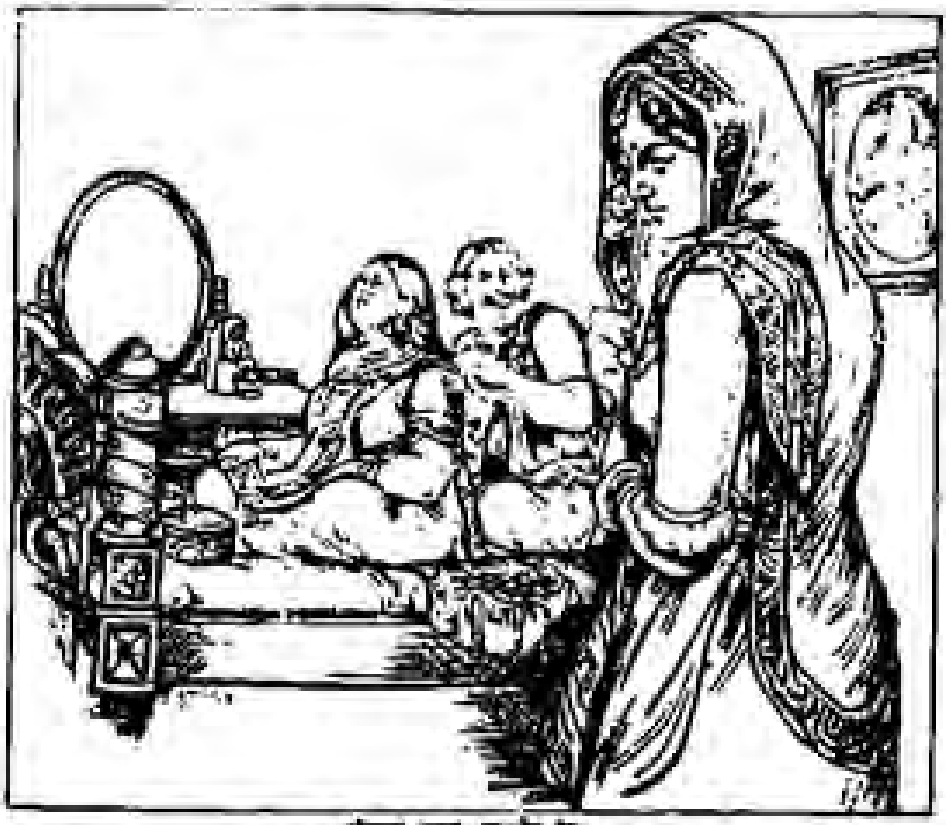

পঞ্চানন কর্মকার, সুকুমার চিত্র

১৯২৫ থেকে ১৯৪৩ সালের মধ্যে যাঁরা বাংলা বইয়ের প্রচ্ছদচিত্রণের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন শৈল চক্রবর্তী, প্রফুল্ল রায়, সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর সে, প্রমুখ। তাঁদের যোগদানের ফলে প্রচ্ছদ ছবি, বিশেষ করে ওষধ বৈজ্ঞানের ছবির জন্য প্রসিদ্ধ।

চল্লিশের দশক থেকে বিজ্ঞাপন সংস্থা বা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সির কাজকর্মের বেশ কিছুটা রদবদল হয় এসেছে। কমার্শিয়াল আর্টিস্টদের বেশ চাহিদা হয়। এই দশকেই আমরা দেখতে পাই কমার্শিয়াল আর্ট বা প্রচারিক চিত্রকলার ক্ষেত্রে এক নতুন মোড় যার উদ্ভব হয় তৎকালীন বিজ্ঞাপন সংস্থার কর্মরত আর্টিস্টদের প্রচেষ্টায়।

এই দশকে বাংলা প্রকাশনার ক্ষেত্রে বুক জ্যাকেট ও গ্রন্থচিত্রণের ব্যাপারে যে কয়জন শিল্পী বিশেষভাবে সন্ধান নিয়েছেন তাঁদের পুরোধা ছিলেন সত্যজিৎ রায়। এই সময়েই বাংলা প্রকাশনার ক্ষেত্রে কলাভবন পথপ্রদর্শক ডি কে গুপ্তের

[illegible]

নেতৃত্বে শিল্পটে ব্লকের আবির্ভাব। শিল্পটে ব্লকের প্রবর্তনিদের বহু অনবদ্যে-বেওয়া বইয়ের ডিজাইনার হলেন সত্যজিৎ রায়। এক্ষন থেকে শুরু করে নামপত্র, ডিতরের পাতার অলঙ্করণ বিন্যাস, অলঙ্করণ, প্রচ্ছদচিত্রণ সব কাজেই তাঁর অনন্যতা। বাংলা প্রকাশনার জগতে আধুনিকতা এনেছেন সত্যজিৎ রায়।

সত্যজিৎ রায় বিজ্ঞাপন সংস্থায় যোগ দেন ১৯৪৭ সালে আর এ কাজ ছেড়ে [illegible] অবধি [illegible] করেন ১৯৪৮-৪৯। সুকুমার রায়ের লেখা 'পাই পাই', 'অবাক পাই', 'পাগলা দাশু' বইগুলিতে, 'আম আঁটির ভেঁপু', 'পরশপাথর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ', জীবনানন্দের 'জলপাই রাঙের', 'অবলা সেন', অবনীন্দ্রনাথের 'রাজকাহিনী', 'ভিন্ন অবতেটের ঘুমাবনের', 'মনুষ্যখেকো বাঘ' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রচ্ছদ ও গ্রন্থচিত্রনে সত্যজিতের অসাধারণ প্রতিভার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। পরে ১৯৬১ সাল থেকে 'সন্দেশ' পত্রিকা নতুন করে শুরু হলে আমরা সত্যজিৎকে একাধারে সাহিত্য ও চিত্রকলের মৈত্র ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখি।

সত্যজিতের সমসাময়িক আরেক একজন শিল্পী হলেন মাখন দাশগুপ্ত। অতিন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের 'মেঘে' ও

[illegible]

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শকুন্তলা' বইতে তাঁর সবল চিত্রকর্ম আমাদের মন টানে।

ত্রিশ থেকে পঞ্চাশের দশকের অন্যতম শক্তিমান গ্রন্থ চিত্রকরের মধ্যে আছেন সমর ঘোষ, শৈল চক্রবর্তী, সুধীর মৈত্র, সতীশ সরকার প্রমুখ।

ত্রিশ শতকের গ্রন্থচিত্রকরদের জগৎ ছিল কলিকাতা, চিৎপুর বা কলকাতার আশেপাশে সীমাবদ্ধ ; সেই সঙ্গে তাদের চেতনায় ছিল তৎকালীন ঔপনিবেশিক অলঙ্করণের ধারা সম্পূর্ণ রূপে প্রভাবিত। পরবর্তীকালের শিল্পীদের ক্ষেত্রে বিশ্বের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ যা তাদের মূলের দিককে প্রসারিত করেছে। তার প্রকাশ আমরা দেখেছি তাঁদের কাজে।

[illegible] থেকে (১৯৭৪)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

অতিন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত — বাংলা বইয়ের বিজ্ঞাপন : শত শতকে

রঞ্জনা ঘোষালী — দুই শতকের গ্রন্থচিত্রন

পরিতোষ সেন — ভিন্ন সত্যজিৎ রায়

শিল্পী: সুপ্রিয় চক্রবর্তী

'ঠেলুদা আর খোকা': সরাসরি রঙ

শিল্পী: শৈলা চক্রবর্তী

শিল্পী: সমীর সরকার

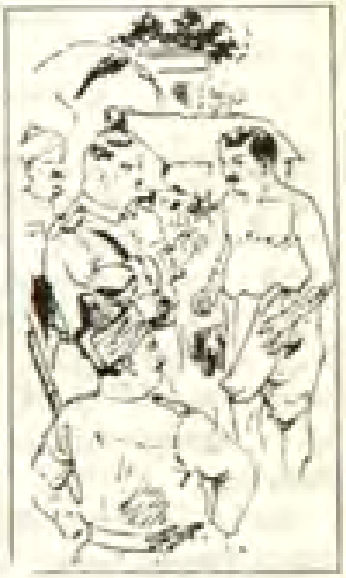

শিল্পী: সমর দে

শকুন্তলা: মানস বন্দ্যোপাধ্যায়

'বহুরূপী' ও 'আমপাতির ঠোঙ্গা': সরাসরি রঙ

কলকাতার অহংকার : বইমেলা

কালিদাস হাজরা

সময়টা ছিল ১৯২৭ সাল। জার্মানির 'লাইপজিগ' শহরে প্রথম বইমেলার আয়োজন থেকেই, ব্যাপকভাবে—১৯৪৯ সালে ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে বড় আকারের বইমেলার যাত্রা শুরু হয়েছিল। আসলে পঞ্চদশ শতাব্দীর থেকেই পশ্চিম দুনিয়ায় বইমেলার আয়োজন চলছিল বিভিন্নভাবে।

তাৎপর্য, যা হবার তাই হল,—অর্থাৎ ইংল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স প্রভৃতি স্থানে বিশ্ব বইমেলা শুরু হয়ে যায়—একে অপরের দেখাদেখি... সেই সব বিশ্ব বইমেলাগুলিতে ভারতীয়, তথা কলকাতার বুদ্ধিজীবী বাঙালি ও অন্যান্যরা প্রকাশকরাও সামিল হয়ে অংশ নিতে বিশ্বের দরবারে—কলকাতা ও কলেজ স্ট্রিটের ঐতিহ্যের ধারাকে অক্ষুণ্ণ রেখেছিল, যা আজও কলকাতার গৌরব।

আধুনিক চিন্তাধারায় ভারত, তথা কলকাতা কয়েকটি ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে, তাই আধুনিকতম ক্ষেত্রগুলি যে কোন দেশের হয়ে থাকে, তবে তা হল—শিল্প-সংস্কৃতির বড় অঙ্গ হিসাবে কলকাতার বুকে নতুন শতাব্দীর (২০০০) ২৪তম বইমেলা।

শিক্ষার উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে জীবন যাত্রার নানা প্রশ্ন জাগে আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিয়ত, প্রকাশনাগুলিরাজ্যের ব্যাপক হারে হোলো, তাই তাদের দীর্ঘদিন

পাঠাসূচি থেকে, মনের খোরাক, বইয়ের লেখকদের সংকীর্ণ পরিসর থেকে কিশোর বইমেলার যুক্তাঙ্গনে খুঁজে পেতে চায় তার অজানা—উত্তরগুলি।

তার বাস্তব রূপায়ণ পশ্চিমবঙ্গে ঘটে গেল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার জনমানসে নতুন সংস্কৃতির পরিমণ্ডল গড়ে তোলার জন্য কয়েকটি কর্মসূচি গ্রহণ করেন, তা হল, (১) বইমেলা, (২) গ্রন্থাগার আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করা, আরও বই ও পাঠাগার একে অপরের পরিপূরক।

তাই আজকাল অর্থ সংকোচে পশ্চু গ্রন্থাগারগুলিকে সতেজ সুস্থ করে তোলার অভিপ্রায় নিয়ে বিভিন্ন মহকুমাতেও। যেমন উলুবেড়িয়া, মেদিনীপুর, নতুন নতুন গ্রন্থাগার ও মেলা। সেগুলি নতুন কর্মসূচিতে প্রকাশ করা হয়,—সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি, শুধু উচ্চ বা শহরে শ্রেণীর ও মধ্যবিত্তদের মানসিক চাহিদা পূরণের বা, চিত্তবিনোদন সামগ্রী হিসাবে চিন্তা করলে চলবে না। তাদের কাজ হবে—(ক) জনসাধারণের শিক্ষা ও সংস্কৃতির মান উন্নয়ন, (খ) জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে জ্ঞান ও তথ্যের পরিবেশন, প্রভৃতি গুরুত্ব সহকারে গ্রন্থাগারগুলিকে বাজার ও বিভিন্ন

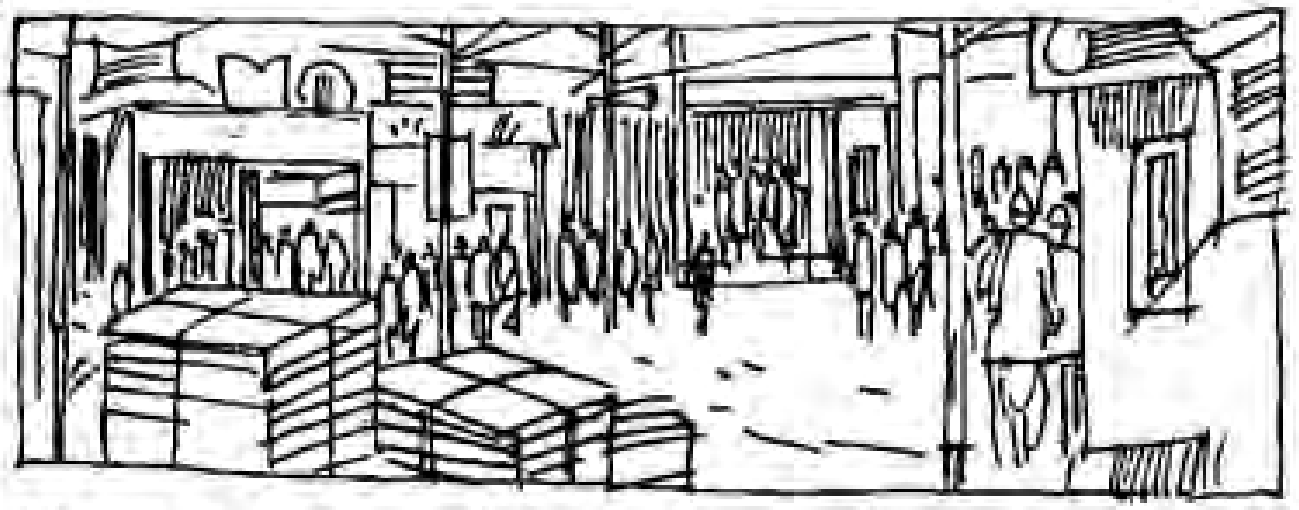

কর্মসূচির আওতায় গ্রন্থাগারকে নারিয়া ও অবহেলিত, অল্প শিক্ষিত ও নানা সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়া। এটা কেবল মুখের কথা, কাজের কথা।

বই থেকে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মসূচির প্রত্যেক প্রস্তাব পেশ করেছি বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন, (১) বাজার বইয়ের প্রকাশনার ক্ষেত্রে সবচাইতে উপযোগী প্রকাশন, (২) বইমেলা, বই কেনা, মানের উপযোগী প্রকাশন, (৩) গ্রন্থাগারের চাহিদা অনুযায়ীই বই প্রকাশ, সংগ্রহ ও বিশেষভাবে বইমেলা থেকে সুলভ মূল্যে বই কেনা। শেষ পর্যন্ত তার সঙ্গের গ্রন্থাগার পশ্চিমবঙ্গে বলিল,—ঈদসূচি বইমেলার কথা নিয়ে।

২

বস্তুতপক্ষে একদিকে আজকের বইমেলা আর্থনিক ব্যবসাক্ষেত্রে তুলে ধরে তুলেছে, অন্যদিকে মানের আকাঙ্ক্ষার—প্রতিটির সমস্ত দিকটি ধরিয়েছে। এই দিকটি মেলার বিভিন্ন রূপ—বিভিন্ন ধরনের নানা সূচির, নানা প্রকারের, অনেকের আকারবৃদ্ধিসহিয়ার নানাও। পাঠকের সঙ্গে প্রকাশকের, লেখকের কথা—কবি, সাহিত্যিকের, প্রকাশকদের সঙ্গে পাঠকের মুখোমুখি আলাপ-আলোচনা, কর্মচারীর এক বড় সম্পদ ও উচ্চ সাংস্কৃতিমানের শক্তিরূপ। আজকেই আধুনিক সমাজের একদিনকেন্দ্রিক হল—আজকের বইমেলা ; অর্থাৎ বিজ্ঞানের যন্ত্র সভ্যতার যুগে এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় পাওনা।

ঠিক এইভাবে পশ্চিমবঙ্গের জনজীবনে প্রেই পার্বণের সঙ্গে গ্রোকজনের পার্বন হিসাবে জনজাতার বইমেলা সকলের প্রিয় হয়ে উঠেছে।

৩

বিশেষ বইমেলাগুলি

১৯৭৫ সালে বই-এর আধারে সাংস্কৃতিক চেতনার উন্মেষ বা বিকাশ বইমেলার কল্পিকা নিয়ে সেই দিন থেকে রয়েছিল রাজধানী কলকাতায় প্রথমে বইমেলা। উদ্যোক্তারা ছিলেন পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স সিভিলের ১৪ জন সদস্য নিয়ে। বর্তমানে তাঁদের সদস্য সংখ্যা প্রায় ৪০-এর কাছাকাছি। উদ্যোগের উদ্যোক্তা ছিল বই ছাপান ; প্রচার ও প্রসার ঘটানো। বস্তুতপক্ষে তখন বই কেনার তেমন ভাল সেকাল ছিল না, সেখানে শহরের কলিকাতায় বই-এর আকাশে বিকাশ করতে পারছেন না, গ্রন্থাগার বিভাগের পারছেন না, তাই পাঠকের কাছে মনে হত নানা ছিল, ও সংকট। আসল কথা মনের মত বই না পেয়ে আক্ষেপ করতেন। সেদিনের এই আক্ষেপ থেকেই যে চিন্তা-ভাবনার প্রথা সৃষ্টি হয়েছিল—সেটাই কলকাতায় বইমেলার জন্ম নিয়েছে।

১৯৭৬, ১লা মার্চ প্রকাশ্যে পেশ করি বিড়লা অ্যাকাডেমির বিশাল বিকে প্রথম কলকাতার বইমেলা, উদ্যোগে করেছিলেন,—রাজ্যপাল, এ এল ডায়াস প্রথম বইমেলায় অংশগ্রহণকারী প্রকাশকের সংখ্যা ছিল মাত্র ৫৪ জন। এরপরে শুরু হল প্রতি বছরের বইমেলার কর্মসূচি।

১৯৭৭

শুরু হল মধ্যগগনে দ্বিতীয় বইমেলা। মেলার উদ্বোধক ছিলেন বসুরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৯৭৮

তৃতীয় বইমেলা। স্থান ছিল রবীন্দ্রসরোবরের বিশাল বিকের মাঠে। উদ্বোধন করেন—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং ১১৫ জন প্রকাশক অংশ নিয়েছিলেন। এই বইমেলা থেকেই কলকাতার ও পশ্চিমবঙ্গের মানুষের আগ্রহ বাড়তে থাকে।

১৯৭৯

শুরু হল চতুর্থ কলকাতার বইমেলা, এই মেলার বৈশিষ্ট্য ছিল যে—পাঠক ও প্রকাশকের উদ্যোগে, উদ্বীপনা থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নতুন করে শিক্ষা-ভাবনার প্রসার ঘটান।

১৯৮০

এলো পঞ্চম কলকাতার বইমেলা। ২০ ডিসেম্বর বিশ্ব পার্থিবার নিয়ম উপলক্ষে দিনের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে আজকাল সংবাদপত্র—"বাঙালীর প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতার সভা" শুরু করল,—

বইমেলার এই মেলায় পাঠকের ভিড়

"পশ্চিমবঙ্গ পুস্তক মেলা" উদ্বোধন করেছিলেন তৎকালীন মন্ত্রী। এই মেলার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল,—বইয়ের ব্যাপক প্রচার ও আগ্রহ সৃষ্টি, তার জন্য বই প্রেমিকদের সঙ্গে, বঙ্গের পাঠাগারগুলি, যেন বইমেলা থেকে সুলভ মূল্যে প্রকাশিত বই কিনতে পারে। এই মেলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রাজ্য সরকার।

১৯৮১

আবার ছাব্বিশদল নিয়ে কলকাতার বুকে শুরু হল, ৬ষ্ঠ বইমেলা। উদ্বোধক ছিলেন সদ্য ভারতের নোবেল জয়ী তাঁর অবদান নেন। অবশ্য তখন তাঁকে অবাঙালিবিদি হিসেবেই পেয়ে দেশের সকলেই খুশি হয়েছিলেন।

১৯৮২

শুরু হল ৭ম কলকাতা বইমেলা, উদ্বোধন করেছিলেন প্রফুল্ল চন্দ্র। গতবারের তুলনায় প্রকাশক ও পাঠকের সংখ্যা গেল বেড়ে। ওই মেলা থেকেই পুরোপুরি স্বাধিত্ব পেল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ওই দায়িত্বে ছিল ১০-১১ বছর। তারপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে—আর দুটি মেলা নয়, কলকাতার বুকে যৌথভাবে একটি মেলাই করা হবে। পরিচালনার ভারও দিল্লি-এর কর্তৃপক্ষ, নামকরণ হবে,—"কলকাতার বইমেলা" ধীরে ধীরে ছড়িয়ে তা পড়ল পশ্চিমবঙ্গের ১৮টি জেলায়।

১৯৮৩

এলো ৮ম বইমেলা। বৈশিষ্ট্য ছিল—এবার রবীন্দ্রসদনের উল্টোদিকের ময়দান ছেড়ে বিড়লা তারামণ্ডল পর্যন্ত গেটি ময়দানে বইমেলার আয়োজন হয়েছিল। শুধু তাই নয়—২৮৪ জন প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা পসরা সাজিয়ে তুলেছিলেন। ফলে মেলার মর্যাদা অনেক যেমন বেড়েছিল তেমনি প্রকাশকগণ লাভও করেছিলেন, উদ্বোধক ছিলেন, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

১৯৮৪

শুরু হল ১৭ বইমেলা। সেবার কলকাতার বইমেলা "অলচিল রিপোর্ট গ্যারেড গ্রাউন্ডে। উদ্বোধক ছিলেন : মুখ্যমন্ত্রী আনন্দ। স্টলে-গ্রহণকারী প্রকাশক ও পুস্তক সংস্থার সংখ্যা ছিল, ৩৮৩ জন। পূর্বের তুলনায় এই মেলায় ভীড়ও গেল আরও বেড়ে।

১৯৮৫

এবার আবার মেলা ফিরে এলো পূর্বের জায়গায়। শুরু হল ১৩ম বইমেলা, উদ্বোধন করেছিলেন—রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। ছোট-বড়

প্রকাশকের সংখ্যা এই মেলায় বৃদ্ধি পায়।

১৯৮৬

বিপুল উৎসাহ নিয়ে শুরু হল ১১তম বইমেলা। মেলা উদ্বোধন করেছিলেন—সুনন্দা ভাদুরি। ক্রেতা ও বিক্রেতাদের সংখ্যা গেল বেড়ে।

১৯৮৭

কলকাতার বুকে আবার দেখা দিল ১২তম বইমেলা। পূর্বের তুলনায় মেলার আয়তন প্রকাশক ও পাঠকের সংখ্যা বিগুণ হল, মেলা উদ্বোধক ছিলেন—অমীন বাসবন্তু।

১৯৮৮

এল কলকাতার বুকে ত্রয়োদশ বইমেলা। এই মেলার উদ্বোধক ছিলেন—রাজা রামান্না। মেলার আয়োজন ও উৎসাহ পূর্বের তুলনায় অনেক বেড়ে ছিল, যা উল্লেখযোগ্য।

১৯৮৯

১৪তম বইমেলার উদ্বোধক ছিলেন—আন্দ্রে লেভিন। বইবিপণি থেকে কিনু কিনু প্রকাশক ও পাঠকের সংখ্যা বাড়তে থাকে। জনসাধারণ উল্লেখযোগ্য।

১৯৯০

১৫তম কলকাতার বইমেলা শুরু হল। উৎসাহ ও উদ্দীপনায় ছিল না কোন ভাটার টান। পর বছরের মতো সাংস্কৃতিক জীবনে বইমেলা এনেছিল নতুন জোয়ার। মেলা উদ্বোধক ছিলেন অমীয়া চট্টোপাধ্যায়।

১৯৯১

কলকাতার স্মরণীয় বইমেলার বছর। ষোড়শ, অর্থাৎ ১৬তম কলকাতার বইমেলা এই মেলার স্থানের পরিবর্তন ঘটিল। অর্থাৎ পার্ক স্ট্রিটের ক্রসিং-এর কাছে ফিরে এলো। এই মেলায় পূর্বের তুলনায় অংশগ্রহণকারী প্রকাশকদের সংখ্যা পূর্বের তুলনায় বেড়ে গিয়েছিল। শুধু তাই নয়, বইপ্রেমী, পাঠক, লেখক ও প্রকাশকদের প্রত্যাশা গেল আরও বেড়ে। মেলার উদ্বোধক ছিলেন বি ডি নাগচৌধুরী।

অষ্টাদশ মেলার অন্যতম আকর্ষণ ছোটদের আসর

আরম্ভ এই মেলায় একটা বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়েছিল, তা হল বইয়ের জন্য পদযাত্রা। সেদিন সকালে কলকাতার সবাইকে অবাক করে দিয়েছিল। কলকাতার সড়কে বইয়ের জন্য পদযাত্রায় অংশ নিয়েছিলেন কয়েক হাজার মানুষ। মিছিলে ধ্বনিত হল, বই পড়ুন, বই কিনুন ইত্যাদি। বইপ্রেমিকদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন সাহিত্যিক, কবি, শিল্পী, শিক্ষক ও প্রগতিশীল মানুষেরা। উদ্বোধন করেছিলেন ফেডারেশন-এর বিদায়ী সভাপতি পূর্ণচন্দ্র পাত্রমেল, এবং বক্তিদের মেলপ্রিয় পার্ক হয়ে পদযাত্রা মিলিত হয়েছিল বইমেলা প্রাঙ্গণে।

১৯৯২

বইপ্রেমিক মানুষ ভুলতে পারল না বইয়ের জন্য পদযাত্রা। কলকাতা সহ বিভিন্ন মানুষ সামিল হল বই মিছিলে। পরে উঠল সংস্কৃতির মেলবন্ধন। শুরু হল বৃহৎ এলাকা জুড়ে ১৭তম বইমেলা। মেলা উদ্বোধন করেছিলেন অরুণ কর। প্রতিদিন বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসত বিভিন্ন শ্রেণীর সাহিত্যিক, কবি, প্রবন্ধকার, নাট্যকার, শিল্পীরাও বিভিন্ন সমস্যের ও সাহিত্যের আড্ডায় অংশ নিতেন। বড় বড় প্রকাশকদের সঙ্গে ছোট ছোট প্রকাশকরাও অংশ নিলেন। বইপ্রেমিকরা পেলেন নতুন স্বাদ।

১৯৯৩

বইমেলার উৎকর্ষের শ্রীবৃদ্ধি, ক্রেতা-বিক্রেতা ছড়িয়ে পড়ল। কলকাতার বইমেলার জন্য প্রকাশকদের আগ্রহ সবচেয়ে বেশি আকার জন্য প্রসার বেড়েছিল এটাই বড় প্রশ্ন। যাই হোক বিপুল উৎসাহ নিয়ে ১৮তম বইমেলার উদ্বোধন করলেন—মৃণাল সেন।

১৯৯৪

এলো ১৯তম কলকাতার বইমেলা। বিপুল আয়োজন নিয়ে বিপুল সংখ্যক লোক কলকাতার বইমেলার ময়দানে উপস্থিত হলেন প্রথম দিন। ১৯তম মেলা উদ্বোধন করেছিলেন ইউ আর অনন্তমূর্তি। পূর্ববর্তের তুলনায় ক্রেতা, বিক্রেতা ও পাঠকের সংখ্যা অনেক বেশি হওয়ায় পরিচালনার ব্যাপারে অনেক বেড়ে গিয়েছিল। দেখা দিয়েছিল নানা অসুবিধা। তবুও শান্তিপূর্ণভাবে সমাপ্ত হয়েছিল সেই মেলা। কোন পাঠক কোন অভিযোগ করেননি। উল্লেখ যে বহু নবীন ও প্রবীন লেখক বই প্রকাশ করেন এই কলকাতার বইমেলায়। এটা কলকাতার বইমেলার একটি নতুন বৈশিষ্ট্য।

১৯৯৪

বইমেলার এক গৌরবময় সাল। জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে, বিপুল উদ্দীপনা নিয়ে ২৮তম কলকাতার বইমেলা উদ্বোধন হল। মেলা উদ্বোধক ছিলেন—রঘুনাথ গোস্বামি। পৌরাণ্য যে, কলকাতার জন্মলগ্নে এসে বইমেলায় অসম্ভাবনার, আজ কলকাতায় বইমেলার সর্বদিক দিয়ে শ্রীবৃদ্ধি দেখে। শুনে, রাজ্য সরকার প্রায় ৪০ হাজার বর্গফুট এলাকা জুড়ে মেলা করার অনুমতি দিয়েছিলেন সিদ্ধান্তে। ৪১৫ জন বই প্রকাশকের সঙ্গে, আটত্রিশ ১২০টি স্টলে আগন্তুক সংখ্যা অনেক নিয়ে কলকাতার বইমেলাকে সার্থক রূপ দিয়েছিল সেদিন। এছাড়া মেলা প্রাঙ্গণে হাজির হয়েছিল সেদিন। এছাড়া মেলা প্রাঙ্গণে হাজির হয়েছিল নানা শ্রেণীর জাতীয় ও নানা রাজ্যের ও বিদেশি পাঠকের ভোজন।

উল্লেখ্য যে বই বছর, অর্থাৎ ১৯৯৩ সালে "বাঙালি প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতার সভা" নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আলো বইয়ের মেলার আয়োজন করেছিলেন। উদ্বোধক ছিল, (১) বই কিনুন, (২) বই পড়ুন, (৩) বই উপহার দিন, (৪) বই উপহার নেবার অভ্যাস নিয়ে আসুন। এসব নতুন চিন্তাধারা। বই মেলা, এবারে, বইমেলার এক অনুষ্ঠ পরিবেশ করিয়ে ১৯৯৬ সাল থেকে একটানা বইমেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অর্থাৎ, সুস্থ পরিবেশ নিয়ে আসে।

১৯৯৬

২১তম কলকাতার বইমেলা উদ্বোধন করলেন রাজ্যপাল বাগচী। বছর বছর বইমেলার চেহারা বৃদ্ধি পাচ্ছিল, বোঝা যায় সাংস্কৃতিক জীবনে বইমেলা এনে দিয়েছে নতুন দিশা। বই মেলা কর্তৃপক্ষ সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক দিকগুলির সঙ্গে সঙ্গে, শিক্ষার দায়িত্বটিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য বই-পড়াকে যেমন ও প্রাথমিক উপকরণ হিসাবে বেছে নেন। বই মেলার সঙ্গে যুক্ত করলেন নানা বিষয়ের ওপর সভা, সেমিনার, আলোচনা, সাহিত্য ও নানা আকর্ষণীয় বিষয়। ৩০০-এর অধিক প্রকাশক এই মেলায় ভাগ নেন। এছাড়া একেবারে কলকাতার বইমেলাকে স্বরণ করে রাখার জন্য প্রকাশ করলেন 'মেমরি অফ বইমেলা' উদ্বোধন রাজ্যের প্রকাশিত গ্রন্থের সন্ধান মতে এক নজরে পাওয়া যায়। এখানেই বইমেলার সার্থকতা।

২১তম বইমেলার সঙ্গে, পাশাপাশি ছোটদের লিটল ম্যাগাজিনগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্মরণ করে, সংস্থাগুলিকে আবেদন করা হয়।

আসল কথা হল—২১তম বইমেলার বৈশিষ্ট্য ছিল যে, আগামী দিনে শিল্প সংস্কৃতির অগ্রগতির বাহক এই অঙ্গন প্রজন্মকে প্রতিনিধি না করলে ভবিষ্যতে থাকবার, সে কথা মিছা করে নিশ্চয় কর্তৃপক্ষ চিত্রলিপিদের লিটল ম্যাগাজিনের পাশে আনা হয়েছিল। তার প্রতিফলটি ঘটল নানা শ্রেণীর লিটলের নতুন প্রতিভাকে বিকশ করার জন্য লিটলের নতুন মঞ্চ তৈরি করা হয়, যাতে লিটলের প্রায় ও শহরের কথা সাহিত্যিক, কবি, প্রবন্ধকারের মত বিষয়বস্তুর আলোকে প্রকাশ করতে পারেন।

১৯৯৭

জানুয়ারি মাস। শেষ সপ্তাহ, শুরু হল ২২তম কলকাতার বইমেলা। বিরাট আয়োজন নিয়ে উদ্বোধন করলেন জ্যোতি বসু।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে ২টি খবর তা হল, (১) '৯৭-এর মেলা বিশ্বের একমাত্র আন্তর্জাতিক বইমেলা হিসাবে স্বীকৃতি পায়, কলকাতার বইমেলা, যে কলকাতার বর্তমান বয়স হল ৩১০ বছর। (২) মেলার বন্ধ দিনে অর্থাৎ ৩ ফেব্রুয়ারি বিকালে এক ভারসাম্য আয়োজন মেলায় ৮০ শতাংশ মতন ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়। সে দিনের বই কিনা পুরিবীর কাছে হয়েছিল লজ্জা।

অনুষ্ঠানপূর্ব বিশ্ব সংস্থের রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় আমাদের ভূমিকাকে স্মরণ করে নিয়ে, মুক্তির দিনের আগেই নজরুলমঞ্চের ছোট্ট আঙিনায় কলকাতার বইমেলা।

মেলার বই প্রেমিকদের চাহিদা, আগামে মেলা পুরোছে, বই পড়ার ইচ্ছা ও প্রবণতা পুরোছে কি ?

মেলার মেলার নতুন সম্বর এলো ঘুরে। মেলা ছিল ১৯৯৮ সাল। আবার নতুন উদ্দীপনা নিয়ে কলকাতার বুকে শুরু হল ২৩তম বইমেলা। উদ্বোধক ছিলেন আমেরিকা মুখ।

রবিও নানা বিধিনিষেধ ও জটিলতা ছিল, তবুও প্রতিবেশ বজায় রাখতে ও নিয়ন্ত্রণের জন্য বৃদ্ধি করা হল মেলা প্রাঙ্গন, যার আয়তন ২ লক্ষ ৫০ হাজার বর্গফুট। প্রকাশকের সংখ্যা ৪০০ ছাড়িয়ে।

১৯৯৯ সাল।

স্মরণীয় হল সহস্রাব্দী কলকাতার বইমেলা ও সংস্কৃতি জগৎ। সময়টা ছিল ২৭ জানুয়ারি, আজ এটাই ছিল শতাব্দীর শেষ ও ২৪তম বইমেলা। উদ্বোধন করেছিলেন সাধনপুর মুখার্জি। এছাড়া বিশেষ কতগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল—

(১) থিম (Theme) হিসাবে চিহ্ন করা হয়েছিল, 'আলোকপ্রকাশে লক্ষ রেখে'।

(২) ওপার বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এসেছিলেন।

(৩) সহস্রাব্দি ও মেলেনিয়াম মোট ৫০টি বাংলাদেশি প্রকাশনা মেলায় অংশ নিয়েছিলেন।

(৪) এছাড়া কলকাতার বইমেলায় স্পেনদেশ প্রথমবার অংশ নিয়েছিল।

(৫) প্রথম তৈরি হয়েছিল ইন্টারনেট পাবলিশিং, সেখানে প্রতিদিন সাহিত্যের আড্ডা, দেশি-বিদেশি শিল্পীর সমাবেশ ঘটেছিল, অংশ নিয়েছিলেন বহু সাংবাদিক।

(৬) যথেষ্ট ভিড় এড়াবার জন্য টিকিট কাউন্টারের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছিল।

(৭) মেলার আগ্নেয়াস্ত্রধারী প্রহরীর সংখ্যা দ্বিগুণ করা হয়েছিল।

(৮) হাওড়ার নোঙরে জাহাজ আসার প্রতি ঘণ্টা-কামানধ্বনি-পূর্বক একটি প্রবেশ পথ তৈরি করা হয়, পুলিশটি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের থেকে।

উল্লেখযোগ্য বিষয়ের সমাবেশে, মেলায় সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়েছিল।

৫

১৯৩৩

শতাব্দীর প্রথম কলকাতার বইমেলা শুরু হয়। অর্থাৎ ২৫তম বইমেলা। পুরাতন কালবাদায় সবে সব ধারাবিদ্ধ ঘুর করে সমাজের ক্রমবর্ধমান স্তরে শিক্ষার বাহন হিসাবে বইমেলা সর্বজনীন রূপ নিল। দ্বিতীয়ত, প্রকাশকের সংখ্যা, পাঠকের সংখ্যা ক্রয়ক্ষমতার তুলনায় অনেক বেশি বৃদ্ধি পেল। নির্বাচিত বিষয়ের পরপর ছোট ছোট নানা ধরনের লিটল ম্যাগাজিনের পত্র-পত্রিকার সমাবেশ উল্লেখযোগ্য। শেষ দিন পর্যন্ত ভিড় ছিল।

১৯৩৪

২৬তম কলকাতার বইমেলা শুরু হয় জানুয়ারি ৪৩ জানুয়ারি। এবার Theme বা বইমেলার মূল বিষয়বস্তু হলো—'ভারতবর্ষ' মেলা উদ্বোধন করলেন—বার্টনপার্ক থেকে আর নয়াদালান। কলেজই ও মেডিকেলটির মেলার উপলক্ষে হয়ে 'ইন্ডিয়া হো'।

তৈরি হচ্ছে 'ইন্ডিয়া দিন পাবলিশিং। এই পাবলিশিংয়ে ভারতের কৃষি ও সংস্কৃতির প্রকাশটি হবে। এছাড়া ঐতিহাসিক বই এবং রবির মাধ্যমে প্রাচীন ভারতের পরিচয়ের সম্পর্কে ধারণা থাকবে।

বাংলাদেশ সহ মোট ৫৭৫টি প্রকাশনা মেলায় অংশ নেবেন। ৮ লক্ষ বর্গফুট এলাকা নিয়ে বইমেলার আয়োজন।

মেলার বিভিন্ন প্রবেশ দ্বারগুলিকে, দেশের বিভিন্ন ঐতিহাসিক (ঐতিহ্যবাহী) স্থানীয়ের আদলে ছোট্ট সাজান হবে। এটাই হবে নতুন শতাব্দীর কলকাতার সার্বজনীন বিশ্বমেলা বইমেলার।

৫

কলকাতার বইমেলার বিশেষ খবর ১৯৮৩

কলকাতা বইমেলার একটি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ দেখার সময় প্রকাশ ঘন আনন্দবাজার পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক অশোককুমার সরকার।

মেলা কর্তৃপক্ষ আয়োজন করলেন (১৯৮৪ সাল থেকে) অশোককুমার সরকার স্মারক বক্তৃতার। উদ্দেশ্য সেখানে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য দেশ-বিদেশের শীর্ষস্থানীয় প্রকাশক ও সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ জানান হবে।

৬

আশা করা যায়, একবিংশের ২৬তম বইমেলা সব বাধাবিঘ্ন দূর করে, বিশ্বমানের সম্মানীয় আসন পাবে।

আজ, বিশ্বের বহুরকমের অভিজ্ঞতা নিয়ে বলা যায়, সব ক্ষেত্রেই আমরা কিছু কিছু সাফল্য লাভ করেছি। আজ, বিশ্বের বহুরাজ্যে অনেকক্ষেত্রেই আমরা রয়েছি কলকাতা সকল প্রতিযোগী, যেমন—সাহিত্যে, অর্থে, সৌন্দর্য সাধনায় বাংলার মুখের অক্ষুণ্ণ। ইতিমধ্যেই আমরা পেয়েছি—রবীন্দ্রনাথ, অমর্ত্য সেন, জগদীশচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ, সত্যজিৎ, রবিশঙ্কর, মাদার টি প্রতিষ্ঠা, সি সি সায়েন্সের ও সৌরভ গাঙ্গুলি প্রমুখদের। আজেই ডাক্তার, ডাক্তারী, কবি, লেখক, শিল্পী ও অন্যান্যদের মহাশাখাদের সব বিশ্ব পরিবেশ আজকের বইমেলায় নিয়ে পাবে, এমন আশা করা যায়। শিল্পটি যদি ভবিষ্যতে সম্পাদ হয়, তবে শতাব্দীর প্রথম থেকেই চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। কি আছে শিল্পের আজও বেশি করে বইমেলায় আনা যায়।

এক সময়ে অশোককুমার সরকার স্মারক বক্তৃতাগুলি

	সাল	বিভিন্ন বক্তাদের নাম
১।	১৯৮৪	জেমস আর্নল্ড ফ্রাই
২।	১৯৮৫	ডোনাল্ড ক্যাম্প
৩।	১৯৮৬	মধু রাও ফোর্ড উইল
৪।	১৯৮৭	ফ্রে এ জর্জিয়ার্ডসেন্ট
৫।	১৯৮৮	পিটার ব্রেনার
৬।	১৯৮৯	— ক্রাইস্ট বাজলি
৭।	১৯৯০	— আনন্দমিলি
৮।	১৯৯১	— জনস লি.
৯।	১৯৯২	— মিলমত স্টুডে
১০।	১৯৯৩	প্রীত মিত্র
১১।	১৯৯৪	ধ্রুবজ্যোতি মিত্র
১২।	১৯৯৫	শীতলাথ ভালোচেরা
১৩।	১৯৯৬	— এম কে আনন্দন
১৪।	১৯৯৭	— আনু ইসলাম
১৫।	১৯৯৮	— মেহিদি মিলান

প্রসঙ্গ : কলকাতা বইমেলা ও লিটল ম্যাগাজিন মেলা

সুজিৎ পাল

আধুনিক প্রযুক্তি আজকের পৃথিবীকে ক্রমবর্ধমান হিসেবে শাসিত করেছে। কম্পিউটার, ইন্টারনেট কাজেকর্মে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের সংবাদ, বইয়ের খবর, বিভিন্ন তথ্যাদি আদান-প্রদান করছে মুহূর্তমধ্যে। সেখান থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি আংশিক বা পূর্ণ বই হোক তার প্রিন্টআউটও নেওয়া যাচ্ছে। মানুষ আজকে পৃথিবীর কোন প্রান্তে আছে সেটা বিষয়ে নয় আধুনিক প্রযুক্তির কল্যাণে। ঘরে বসেই বই বা সংবাদপত্র বা লাইব্রেরির মাধ্যমে পাঠ শুরুত্ব হারাচ্ছে বই, সংবাদপত্রের ইন্টারনেট সংস্করণের জন্য। এমতাবস্থায় আজ নিজের ঘরের টেবিলে উপবিষ্ট ইলেকট্রনিক্স বিভিন্নতার দৌলতে।

তাহলে প্রশ্ন এটাই, তাহলে বইয়ের প্রয়োজন কি একেবারেই ফুরিয়েছে, তখন আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর কাছে ইন্টারনেট অনেকক্ষেত্রেই যাবতীয় পঠন-পাঠন সমাধানযোগ্য নয়। আমার প্রয়োজনীয় বইয়ের যাবতীয়ভাবার জন্যও পঠন-পাঠন যাবতে হয়। প্রয়োজনীয় বই আর পাঠক—এই যুগল সংযোগের জন্য বইয়ের প্রদর্শনী প্রয়োজন। বইমেলা ঠিক এই জায়গে বিশ্বটি সমাধানের কাজ করে, পুরোপুরি নয়।

পৃথিবীতে বিশ্বে বৈচিত্র্যের অভাব নেই। অভাব নেই সে বৈচিত্র্যপূর্ণ বিষয়ের উপর লেখার মানুষেরও। লেখকের লেখা আর ছাপার অন্তর প্রতিযোগিতা চলছে মুদ্রণযন্ত্রে আবিষ্কারের দিন থেকে আজ পর্যন্ত। এই প্রতিযোগিতার শেষ হবে না প্রতিয়াতেও। মুদ্রণযন্ত্রের ক্রমবিকাশ বই ছাপার অভাবনীয় উন্নতি করেছে। এই ক্রমবিকাশ কতগুলি কার্যকরণ নির্ভর, পাঠকের আগ্রহ, রুচি নির্ভর। যে কারণেই মুদ্রণ বিকাশের মধ্যে দিয়েই হোক তার সঙ্গে বই বিক্রয়ের কোনও সম্পর্ক নেই। কোনও গাণিতিক পদ্ধতি নেই যা দ্বারা বিক্রয় করায়। উপযুক্ত বিপণন ব্যবস্থার মাধ্যমেই বইয়ের বিক্রয় বাড়তে পারে। তা ছাড়াও বইয়ের প্রদর্শনকাল, আত্মিক সৌন্দর্য বইয়ের বিক্রয় বাড়ায়। তবে সবচেয়ে অনিশ্চয়তার জায়। আগে থেকে অনুমান করা যায় না কোন বইয়ের কতটা বিক্রয় হবে। তবে বই জহুরিরা পাণ্ডুলিপি পড়ে বই কতটির প্রকাশ আগাম বোঝ, সেটাও সকলক্ষেত্রে অনিশ্চিত। বই ছাপানো ও বই বিক্রয় এই দুটো কাজই সহজ সরীকরণে ফেলা যায় না। আজকের ভাঙা কয়ের যুগে সুলভ বিপণন ব্যবস্থা বিশ্বটি সরলীকরণের চেষ্টা চালাচ্ছে এবং কিছু মাত্রায় সফল। মানুষের মনস্তত্ত্ব আজকের অবাক, যার ফলে পাঠক যা চেয়েছে কি কিনবে, কেন কিনবে মূলে খবর সমস্যার। আজ বিজ্ঞাপন মানুষকে কিছুটা প্রভাবিত করছে। তা সত্ত্বেও মানুষ বিজ্ঞাপনের সত্যাসত্য যাচাই করে তবেই ক্রয় করছে। এই সত্যাসত্য যাচাইয়ের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা চাই। এটা সম্ভব প্রদর্শনীর মাধ্যমে। আমার বইয়ের উৎপাদন ব্যয়, প্রচারের খরচ, লেখকের প্রাপ্য, অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ এবং তার উপর লভ্যাংশ যোগ করে বইয়ের মূল্য নির্ধারণ হয়। এই সমস্ত কারণে বইয়ের উপযুক্ত বিপণন প্রয়োজন।

বিপণনের মধ্যেই প্রদর্শনীর সূত্রপাত হয় পাশ্চাত্যে। গুটেনবার্গের জীবিতাবস্থাতেই ১৪৬৪ সালে ফ্রাঙ্কফুর্টের একটি মেলা প্রসঙ্গে বইয়ের প্রদর্শনী শুরু হয়। সে সময়ে মুদ্রকই ছিলেন প্রকাশক। প্রাথমিক পর্যায়ে হয়তো একজন মুদ্রক-প্রকাশক অন্য একজনের মুদ্রণ-নৈপুণ্য আগ্রহ করতে আসতেন। বইও বিক্রয় করতেন। পরবর্তীকালে শুরু এই প্রদর্শনী বা বইমেলা নির্দিষ্ট সময়ে অনুষ্ঠিত হয়। মেলা লাইপজিগ-এ প্রতিবছরই হয়।

বইমেলার দিনটি ফ্রাঙ্কফুর্টের একটি পথের পাশের দৃশ্যের মতোন

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিভীষিকার বিস্মৃতিলোকে বইমেলা বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৪৯ সাল থেকে আবার ফ্রাঙ্কফুর্টে বইমেলা নতুন উদ্যমে বসছে। এটাই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বইমেলা। এমন কোনও দেশ নেই যারা এই মেলায় অংশগ্রহণ করে না। প্রথমদিকে বইমেলায় বই কেনার চেষ্টা হত। ক্রমে এই মেলার প্রকৃতি বদলে গিয়ে আন্তর্জাতিক বইমেলার (International Book Fair) রূপ নেয়। প্রতি বছর অনুষ্ঠিত এই বইমেলাকে সঠিক অর্থে মেলা না বলে ট্রেড ফেয়ার বলাই ভাল। যাঁরা প্রকাশনা ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত তাঁদের জন্যই এই বইমেলা। সাধারণ পাঠকের কোনও যোগ নেই এই বইমেলার সঙ্গে। এখানে কোনও বই বিক্রির ব্যবস্থা নিয়ম নেই। এখানে নানা ধরনের rights-এর লেনদেন হয়। এই মেলায় সাধারণ দর্শক থাকতে পারে, কিন্তু কোনও খুচরা ক্রেতা থাকবে না।

এই বইমেলার ঢেউ এসে লাগল কলকাতায়। মূলত বিশ্বায়নের সমস্যার কথা ভেবেই এই বইমেলার সৃষ্টি। প্রকৃতিগত দিক থেকে ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলার সঙ্গে কলকাতা বইমেলার তফাৎ পরিলক্ষিত হয়। আন্তর্জাতিক বইমেলা প্রকাশনা ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত যাঁরা তাঁদের মেলা, আর কলকাতা বইমেলা প্রকৃত অর্থে পাঠকের বইমেলা। ফলে পাঠক রুচির সঙ্গে প্রকাশকরা পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায়। সর্বোপরি এই মেলা লেখক, পাঠক, প্রকাশকের বইমেলা।

১৯৭২ সালকে আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ হিসাবে চিহ্নিত করে বলা হয়েছিল— 'যুদ্ধ নয় বই'। বইয়ের একটি পাতাও পড়তে পারেন না এমন মানুষের সংখ্যা পৃথিবীতে প্রায় অর্ধেক। এই সমস্ত মানুষের জন্যও চাই বই—এটা ছিল অন্যতম উদ্দেশ্য। এই সময়েই কলকাতার মানুষ দেখেছিল বড় আকারে বইয়ের প্রদর্শনী। অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস-এ এই বিরাট প্রদর্শনীর আয়োজন করে ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট। ঘটনা এই প্রদর্শনীর শুরু হয়েছিল এর আগের বছর অর্থাৎ ১৯৭১ সালে। পাঠকের চাহিদা আর বই বিক্রয়ের নতুন বাজার দেখে বিপণন সমস্যা জর্জরিত কিছু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন প্রকাশক ও পরিবেশক একটি সমিতি গড়ার উদ্যোগ করেন। এভাবে ১৯৭৪ সালের এপ্রিল মাসে পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ড নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়। এই সংস্থাই বইমেলা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ১৯৭৬ সালে বইমেলা করার কথা গিল্ড সকল প্রকাশককে জানালেন। সেদিন গিল্ডের সিদ্ধান্তে অনেক প্রকাশকই সহমত হলেন না। তাঁদের যুক্তি ছিল বই সেই অর্থে ভোগ্যবস্তু নয়, যা নিয়ে মেলা বসানো যেতে পারে।

কিন্তু নিজের সিদ্ধান্তে অটল থেকে নানা তরফ বাদ-বিসম্বাদ এড়িয়ে বইমেলার আয়োজন করল। ১৯৭৬

সালের ৫ মার্চ বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামের বিপরীতে ময়দানের ছোট মাঠটিতে দশ দিনের প্রথম কলকাতা বইমেলা অনুষ্ঠিত হল। উদ্যোক্তারা সেদিন পেয়েছিলেন আশাতিরিক্ত সাড়া। তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন—এভাবে প্রতি বছরই কলকাতা বইমেলা করা হবে। প্রথম বছর কলকাতা বইমেলায় এক লক্ষেরও বেশি লোক এসেছেন, বই কিনেছেন প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার। তখন থেকে ঝরঝরিত বকুলে মাসে ফেলা পার্থিবের মতো একটি পার্বণে পরিণত হয়েছে কলকাতা বইমেলা। এই বছর সেই বইমেলা ২৬ বছরে পা দিল।

১৯৭৬ সাল আরও কিছু কারণে বিশেষ কারণ বহন করে। ১৯৭২ সাল থেকে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিশ্ব গ্রন্থমেলা। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই মেলায় প্রথম অংশগ্রহণ করে ভিন্ন ১৯৭৬ সালে। বিদেশের মাটিতে করে এই বছরই বাংলার প্রকাশকরা প্রথম আন্তর্জাতিক বইমেলায় অংশগ্রহণ করে। ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলার অনুকরণে পৃথিবীর সব দেশে এখন বইমেলা হচ্ছে। কিন্তু কলকাতার মতো এমন প্রাণবন্ত বইমেলা পৃথিবীর কোথাও নেই। আজ কলকাতা বইমেলা অফুরান্ত জনপ্রিয়। এই জনপ্রিয়তা এবারে এবারে করে এসেছে। নানা সমস্যা কাটিয়ে আজ কলকাতা বইমেলা পৃথিবীর সেরা বইমেলাগুলোর মধ্যে স্থান করে নিয়েছে।

কলকাতা বইমেলার সাফল্য দেখে ১৯৮০ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগেও আর একটি গ্রন্থমেলার আসর বসছে কয়েক বছর। বইমেলা আয়োজনের অভিজ্ঞতা জেলার জেলায় ছড়িয়ে গেছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে বইমেলা করে কতটা গ্রন্থ-অনুরাগ বাড়ল? বইমেলা এখন একটা লাভজনক ব্যবসায়িকতা নয় কি? 'খুকুর ঘর আলা' এই কথাটাও কতটা প্রযোজ্য বইমেলার ক্ষেত্রে বা বইমেলাগুলো কতটা উপকার করছে প্রকাশনা শিল্পের? বইমেলা প্রসঙ্গে আজ নানা প্রশ্ন উঠছে বিভিন্ন মহলে।

বইমেলার আজ যেমন ভারতের বিভিন্ন প্রকাশক অংশগ্রহণ করছেন, ঠিক তেমনই বিদেশি প্রকাশকরাও অংশগ্রহণ করছে। বইমেলায় প্রকাশকরা সরাসরি নিজের বই বিক্রয় করছেন। এতে সরাসরি পাঠক-প্রকাশক যোগাযোগ হচ্ছে। আগে সমস্ত আয়োজন-প্রয়োজন এই বই নিয়ে। কিন্তু বর্তমানে পাঠক বা প্রকাশক কোনও পক্ষেরই সে রকম আগ্রহ বা উৎসাহ বইমেলা ঘিরে নেই। বইমেলার আয়োজকরা অনেক হিসাব করে পা ফেলছেন, ঠিক তেমনই আমন্ত্রিতরাও। ফলে পাঠক-ক্রেতারাও আগ্রহ হারাচ্ছে। প্রকাশক নিজের জন্যই চিন্তায়। চড়া মূল্যে স্টল নেওয়ার ফলে অংশগ্রহণকারীদের সমস্ত খরচ-খরচা তুলে মোটা লাভের দিকে তাকিয়ে। ফলে প্রকাশক বা বিক্রেতারা অনেক আগে উপর আরোপন করেন। যেমন ছোঁড়া বই পাঠিয়ে দেওয়া। আগে বইমেলাকে বলা হত 'এগজিবিশন-কাম-সেল', এখন বলা হয় 'সেল, শুধু সেল'। নিছক কিছু প্রকাশক বইমেলাতে আসেন 'পাইকেরি এক্সিলেন' ইংরেজি বই নিয়ে। সে সব বই প্রকাশ বা বিক্রয়ের ব্যাপারে তাঁরা কোনও দীর্ঘমেয়াদি ভোগাক্কা করেন না। ফলে কলকাতার কিছু পরিবেশক তাঁরা নিয়ম মেনে বই আনান বিদেশ থেকে, তাঁরা পড়েন অসুবিধায়। আবার দেখা যায় একই প্রকাশকের বিভিন্ন বই বিভিন্ন স্টলে পাওয়া যায়। এতে অবশ্যই বা প্রকাশক-পাঠক মিলিত হওয়ার প্রধান জায়গা সমস্যা হচ্ছে।

কলকাতা বইমেলা আজ সব দিক থেকেই বেড়েছে। সেই সঙ্গে বেড়েছে নানা সমস্যা। নিছক কর্তৃপক্ষের কিছুটা দূরদর্শীতার অভাবে ১৯৯৭ সালের বইমেলার বিশ্বাসটা আগুন লাগে। পুড়ে যায় মেলার দুই-তৃতীয়াংশ স্টল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাহায্যে সেই মেলা আবার শুরু হয় কয়েকদিনের মধ্যেই। একটি মেলা পুড়ে যাওয়া এবং সেই পুড়ে যাওয়া মেলার পুনর্গঠন এক বিস্ময়কর ঘটনা। এই ঘটনা কলকাতা বইমেলাকে এক অনন্য বৈশিষ্ট্য এনে দেয়।

কিন্তু কর্তৃপক্ষকে কলকাতা বইমেলার গুণগত উন্নতিকল্পে আরও সচেষ্ট হতে হবে। মেলার স্টল বণ্টন থেকে শুরু করে মেলার সুষ্ঠু পরিচালনা সমস্ত দিকেই নজর দিতে হবে আরও ভালভাবে। বইমেলা পুড়ে যাওয়ার পর প্রত্যেক স্টলের ইনসিওরেন্সের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এটা একটা ভাল দিক।

এখন বইমেলায় ঘাবার স্টল আগের চেয়ে অনেক বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে। আগের আমলে স্টল সজ্জা ছিল সাদামাটা ধরনের। কেউ সেন্টার দিচ্ছে, কেউ ঝুলোশ টি দিচ্ছে। এরই ভেতর লক্ষ্য করা যাচ্ছে সেই সময় স্টলে ভিড় অনেক স্টল পাঠক-শ্রোতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আজ বইমেলা যেন একটা শিল্পমেলার আয়োজন। বইয়ের স্টলের তুলনায় আয়তনগত দিক থেকে কিছু কেন্দ্রিকের স্টলে ভীড় বেশি। এই সমস্ত সজ্জা বিনোদনের দিকে যে ঝুঁকে গিয়ে যদি উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া হয়তো আগামীর লক্ষ্যে ভবে বইমেলার প্রকৃত মূল্যায়ন।

প্রসঙ্গ লিটল ম্যাগাজিন মেলা

সমকালীন বইমেলার প্রথম থেকেই লিটল ম্যাগাজিন স্টল বসেছে। তখন লিটল ম্যাগাজিনের জন্য ট্রেনিল স্পেস বরাদ্দ ছিল। লিটল ম্যাগাজিনের নাম করে যে সময় বিভিন্ন বিষয়ের উপর বই থাকত। যেমন রাজনীতি, বাজারমাল, জোতিষশাস্ত্র ইত্যাদি। আস্তে আস্তে অনিলিল ম্যাগাজিনগুলোকে আলাদা দেওয়া বন্ধ হয়। তবু পরের দিকে প্রকাশনালয়ের মতন কিছুদিনও আধিপত্য হয়েছে লিটল ম্যাগাজিন স্টল থেকে। কোনও ধরনের ম্যাগাজিন সেই সময় মান্য সাহিত্যের মাপে পর্যন্ত বিক্রয় হয় লিটল ম্যাগাজিন স্টল থেকে। ১৯৮৩ সালের আগে বইমেলা কর্তৃপক্ষ লিটল ম্যাগাজিনের কোনও পরিচয় দিত না। তাদের ঠিকমত ব্যবস্থা ছিল না। ১৯৮৭ সালের ১ জানুয়ারি লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরির উদ্যোগে লিটল ম্যাগাজিন কর্মীরা মিলিতভাবে একটি মিছিল করেন বিভিন্ন দাবি নিয়ে। দাবিগুলির মধ্যে ছিল—লিটল ম্যাগাজিনের জন্য আলাদা পরিচয় দিতে হবে, খোলামেলা আয়গায় ব্যবস্থা, আলোর ব্যবস্থা, বইটেকে লিটল ম্যাগাজিনের কথা বলার ব্যবস্থা করতে হবে। এই দাবিগুলির মেনে নেওয়া হলেও লিটল ম্যাগাজিন আজও অবহেলিত বইমেলায়।

> ধ্যান ভাঙ্গি সোমদত্ত দেখিল মহেশ।
> বিভূতি ভূষন অঙ্গ জটা ভার কেশ ॥
>
> সভা মধ্যে সেনী মোরে অপমান কৈল।
> জতেক ভূপতিগন বসিয়া দেখিল ॥
>
> শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আদিখন্ড পৃ. ৪২

অবহেলিত, উপেক্ষিত লিটল ম্যাগাজিনকে আলাদা মর্যাদা দেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির উদ্যোগে ১৯৯১ সাল থেকে রবীন্দ্র সদন, নন্দন, বাংলা আকাদেমি সদনের আয়তনে লিটল ম্যাগাজিন মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। লিটল ম্যাগাজিন মেলার আগে পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি গ্রামের প্রতিষ্ঠা দিবসে উপলক্ষে সংপুরীয় লিটল ম্যাগাজিন আকাদেমির সামনে নিজেরাই বিক্রয়ের ব্যবস্থা করত। কিন্তু এতে লিটল ম্যাগাজিন কর্মীদের শ্রমিক ঘোচা গেলেও বিক্রির বইয়ের হিসাব নিয়েও কেউ আসত না। ফলে এই দিবসে আগ্রহ ক্রমান্বয়ে স্বাভাবিক ভাবে কমতে থাকে। এই সমস্ত কারণ, লিটল ম্যাগাজিনের আলাদা মর্যাদার সমস্ত দিকে লিটল ম্যাগাজিন মেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

১৯৯৩ সালে লিটল ম্যাগাজিন মেলায় ভিড়ের অধিক লিটল ম্যাগাজিন অংশগ্রহণ করেছিল। এ বছর সেই সংখ্যা পাঁচশোর কাছাকাছি। এ বছর এইমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১১ জানুয়ারি থেকে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত। লিটল ম্যাগাজিন মেলার বর্ণাঢ্য সমাপনের বিভিন্ন বিক্রয় খুবই সামান্য। কোনও স্টল পাঁচদিনে ১৩০ টাকার বই বিক্রয় করে। খুব বেশি বিক্রয় হলে সেই টাকাটা পৌঁছায় ১৪০০ টাকার কাছাকাছি। তবু লিটল ম্যাগাজিন কর্মীদের উৎসাহের অন্ত নেই। তাদের সহযোগের আনুকূল্যে এই ধরনের ছোট পত্রিকাকে উৎসাহ দেওয়ার উদ্যোগের পৃথিবীর কোনও নেই হয়ত। আমরা আগামীর আমরা এরকম একটা সুযোগ পাব।

লিটল ম্যাগাজিন মেলাকে কেন্দ্র করে পাঠচক্রের জন্য একটি ছোট পত্রিকার প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রদর্শনীতে মুখ্যতঃ লিটল ম্যাগাজিন থেকে ৩৩ রকম ছাড়া বেরোনো লিটল ম্যাগাজিন স্টল পায় বিভিন্ন বিষয়ের উপর ভিত্তি করে। মেলা উপলক্ষে মেলা প্রাঙ্গনে একটি মুক্তমঞ্চ থাকে, সেখানে অনুষ্ঠিত হয় কবিতা পাঠ, গল্প পাঠ।

মুক্ত মঞ্চের অনুষ্ঠান নিয়ে লিটল ম্যাগাজিন কর্মীদের ক্ষোভ তৈরি হচ্ছে কর্তৃপক্ষের উপর। মুক্ত মঞ্চে যারা কবিতা বা গল্প পাঠ করেন তাঁদের অনেকেই অলিখিতিক পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। কেউ কোনও বিখ্যাত কবির কবিতা চুরি করে নিজের নামে পাঠ করেন। অনেকের লেখা উপযুক্ত মানের নয়। মুক্ত মঞ্চে পাঠ করলে একটি আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়। লিটল ম্যাগাজিনের প্রকৃত কর্মীদের ক্ষোভ এইখানেই—যেন পাইয়ে দেওয়ার প্রবণতা। তারা নতুন প্রকৃত অর্থে যারা লিখছেন তাঁদের সুযোগ দেওয়া হোক। না হলে গল্প করে দেওয়া হোক মুক্ত মঞ্চের অনুষ্ঠান। প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ প্রকৃত লিটল ম্যাগাজিন কর্মীদের সঙ্গে আলোচনার বসে ঠিক করুন কিভাবে আর্থিক ইতরিত করা যায় লিটল ম্যাগাজিন মেলায়। একটু দেখবারটি অনোযোগ দেখান কর্তৃপক্ষ।

বইমেলা ২৬ বছরে

তন্ময় সেন

বই, কিতাব, Book—আঞ্চলিক থেকে জাতীয়, জাতীয় থেকে আন্তর্জাতিক। দুই থেকে তিন ও চার অক্ষরের এই শব্দটির শক্তি অসীম। নতুন সময়। সহস্রাব্দ থেকে সহস্রাব্দ। শতাব্দী থেকে শতাব্দী। বছর থেকে বছরে। এমন সন্ধি সময়ের সাক্ষী থাকার সুযোগ আমরা পেলাম। ভাগ্যবান আমরা নিশ্চয়ই। ক্রোড়পতি হওয়ার চেয়েও এই সময়ের ১০০ কোটি তারুণ্যের সংযোগ করতে পারেন আর-এর। দুঃখ, বই দিয়েই কথা শুরুটা। এই নতুন সহস্রের প্রান্তে 'ইবুক', 'কিন্ডেল' এবং 'নেক্সাস'। অসম্ভব গতির জীবনে। হাঁটা চলবে না। দৌড়াতে হবে। সব কিছুই হাতের মধ্যেই চুকিয়ে ফেলতে হবে। শুধু প্রযুক্তির সময়। মোবাইলে সিরিয়ালে কিংবা ইন্টারনেটের পর্দায় চোখ রেখে অনেকক্ষণ কথা। শিক্ষককে অভিনন্দন আর স্মৃতির বাসিন্দা না করে। রোদ-বিরোধ-ঝড়-ডাক জানার প্রয়োজন নেই—ঘরে আলোকুলেটরে। মোহাম্মদ টিপেই অনলাইন। বই পড়া অনেই সময় নষ্ট। তথ্য প্রযুক্তি যন্ত্রের পর্দায় সব তথ্যই লাইব্রেরি অভিধান। কিন্তু না জেনেই সব জানতা হওয়ার সময় এটা। বিজ্ঞান ও বিদ্যুতিনে আমরা এই সময়কে শত্রুর হতে দেবে না। এবং দেবে না।

তবুও বই বড় প্রিয় ধন। তার কোনও বিকল্প নেই। এই নতুন সময়ে '২৬তম বইমেলা'। কলকাতা ময়দানে অতিরিক্ত আগমনের জন্যও ছোট বইপ্রেমিদের তাড়নায় মেলার এলাকা আকারে আরও বড় হয়েছে। বইয়ের সংখ্যা বেড়েছে নিশ্চয়ই। বইমেলার জনপ্রিয়তাকে কোনদিন ঠেকা আরতে পারবে না বৃষ্টিপ্রবৃত্তি কোনও মেলা। বইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক হৃদয়ের বড় গভীর। পুরোই অন্তরঙ্গ। হাতে কিংবা চোখে।

নতুন শতাব্দী বা সহস্রাব্দের ২৬তম বইমেলার স্লোগান ছিল "ভারত"। ৩১-এ জানুয়ারি থেকে ১১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বইমেলা হবে। থাকবে 'ফিকশন', ও 'মনোর্ট'। 'বুকস ইন প্রিন্ট হলে' থাকবে প্রতিটি বিষয়ে প্রকাশিত বইয়ের প্রদর্শনী। দেখা যাবে, মোরা আছে বি বি সি ওয়ার্ল্ড সার্ভিস, ব্রিটিশ, বাংলাদেশ, আই এস ও, ফ্রান্স, পাকিস্তান এবং আরও অনেক অনেক দেশ—শুধু বই আর বই।

বইমেলায় কোন প্রবেশ পথ দিয়ে

বইমেলায় বিদেশি ভাষাভিত্তিক স্টলগুলোর বিষয় বৈচিত্র্য লক্ষণীয়

মেলা এখনো শুরু হয়নি ঠিক তবে, তবু মেলা প্রাঙ্গণের ছবিতে এই

প্রবেশ করব ? চারটি তোরণ থাকছে। 'ভারত', 'ব্রিটেনিয়া', 'জাতীয় গ্রন্থাগার' এবং 'শতাব্দী'। এই চারটি তোরণ দিয়েই ঢুকতে এবং বেরোতে পারব। প্রতিটি প্রবেশ পথে সাহায্য করার জন্য থাকবে স্বেচ্ছাসেবক ও পুলিশ। ঘুলো উড়বে না। পৌরসভা চেষ্টা করবেন নিয়মিত জলের গাড়ি জল ছড়াবে। কিন্তুদিন মাথায় তার কী ঢুকেছে কৈতব নিয়েও আমাদের পরিত্রাণকে কেড়ে নিতে পারবে না। সারা বিশ্বে ক্রমশ বই ছাপার সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। জনপ্রিয় চাহিদা বাড়ছে। তার জোগানকে ঠিকমতো রাখতে নতুন নতুন কাগজের কারখানাও বসছে। কেন দুর্ভিক্ষ হলে মানুষের পাঠস্পৃহা কীরকম হয়ে যাচ্ছে। জানুয়ারি মাসেই ১১ থেকে ১৫—পাঁচদিন ধরে 'লিটল ম্যাগাজিন মেলা'—এ স্টলের সংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দর্শকের সংখ্যাও বেড়েছে। কই বিক্রিও বেড়েছে। সেই সংখ্যাটি এখনও জানতে পারিনি। তবুও ভাল লাগে লিটল ম্যাগাজিন মেলা তার মাত্র তিন বছর বয়সেই সে যদি ভরা যৌবনে পৌঁছে যায়। তাহলে ছাব্বিশ বছরের 'বইমেলা' তার তারুণ্যের জোয়ারে ফুলে ফেঁপে সাগরের যৌবনই তো প্রকাশ করবে।

আগেই বলেছি বইমেলায় এলাকা বিস্তৃত হয়েছে। তবে তার আনুপাতিক হারে স্টলের সংখ্যা বাড়ছে না। স্টলের সংখ্যাও গতবছরের তুলনায় কিছু বেড়েছে। তাই মনে হয় এবার বইমেলার পথে একটু হাঁটতে লাগবে। স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েরা (টিন এজ) একদিন আর নন্দন-সদন চত্বরে যাবে না। এই বইমেলাই হবে তাদের বৃন্দাবন। তারা তাদের আগামী দিনের সৃষ্টি রোমাঞ্চনের কুলিতে কিছু রোমাঞ্চের রসদীয় রসদভার রচনা করবে অনুজদের যৌনক। হয়তো দেখা যাবে একটু নিরালায় কোনও একজনী যুবকের করতল টিক আলিঙ্গনে নিত্ত— শঙ্খবাহক যত্নে সেতারে-সরোদের ঝুলাবন্দীতে মেতে উঠেছে রাগ 'কামোদ'। এবং এ সবেরই এপাশে-ওপাশে-সেদিকে-এদিকে অনেক-দে'ঞ্চ-এ মুখার্জী-দীপা-প্রমা-রূপা... এরকমই ৬০৩ স্টলে পড়ুয়া পাঠকের কৌতূহলী চোখে অভিপ্রেত জ্ঞানার্জনের জন্য আবাধ্য।

লিটল ম্যাগাজিন তথা ছোট পত্রিকা তথা সমান্তরাল পত্রিকার জন্য নির্দিষ্ট রাখা ১৬০টি স্টলে। রক্তমাংসে, আনন্দবাজার, চৌরঙ্গীবাজার, এখন সর্বজন, থিয়েটার এখন, বিষয়মুখ, এবং মুখোমুখি, বিজ্ঞান, আমাদের জন্য...আরও অনেক স্টলে আগামী দিনের পাঠকের, কবি, নাটককার সহ আমাদের কলমকর্মীর উচ্ছল দৃষ্টিকে আগামী পৃথিবীর বুকে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করার সেই বিশেষণী তীব্র আবেগের রূপায়েণায় নতুন সূর্যের সেই ভোর স্বপ্ন।

মেলায় থাকছে 'নাটকঘর'—বাংলা নাটকের নাট্যজনেরা তাদের না-পাওয়ার কিছু ধন আহরণ করবেন নাট্যশপ্ত কিংবা

বাঙালির শুধু এই খেলা নয়, এরপর ঘরে ঘরে ক্যারম পেশাদার ক্যারম ক্লাব

ছাড় কিংবা ক্যাফেটেরিয়ার নির্বাচিত সংগ্রহ থেকে। হয়তো এরই সামনে শোনা যাবে কিছু মজাদারি, ঘরোয়া গল্প এবং আরও কিছু যা আমাদের হৃদয় ও মনকে কিছু সময় ধরে যায়। এরই কিছু দূরে রমার্ড-এর পাশে আলোকিত চিত্রীর ভীড়ে দেখা যাবে অরুন মল্লিককে—যে শুধু সাধারণের দেওয়া যে কোনও 'আর্থ'—থেকে সৃষ্টির সৃজনে রেখে চলেছে সূর্যোদয়ের সেই রঙ।

বিশ ফুট স্টল এবং সিলিল ম্যাগাজিন টেবিলের প্রতিষ্ঠিত প্রচ্ছদ লেখক এবং আগামী দিনের সমস্তকে যারা নিজেদের অনবদ্যনে প্রোজ্জ্বলিত প্রোডেকর্ম সংগ্রহে বিভোরিত করবেন তাদের অনেক ধারায় পাঁচমেশালি অনুভবে পাওয়া যাবে ৫০টি স্টলের প্যাভিলিয়নে। একটি আলোনে কিংবা প্রশ্ন এখানে সন্নিবেশে রাখার ইচ্ছেটাকে প্রকাশ করি। ১৬০টি টেবিল এবং ৫০টি স্টলের প্যাভিলিয়ন—মোট ২১০টি ছোট পত্রিকার প্রকাশনাকে একটি ছাতার তলায় কিংবা একটি এলাকুরে রাখতে পারলে ভাল হত।

তরুণ কলমচেতে পার পৃথিবীর অনেক দেশকে। প্রোবল ভিলেজ তথা বিশ্বায়নের একটি চেহারা আমরা স্পষ্ট দেখতে পাব। আলো করার ক্লাস, টিলি, কিউবা—এসবের আমাদের মেধা ও হৃদয়কে নান্দনিক কুশলতায় ঋদ্ধ করবে।

বাঙ্কসহ অডেটোরিয়ামটি ১২ দিনের ঠৌদ্ধ সংখ্যক এই বাঙালির পার্বণটিকে আলোচনা, সংবর্ধনা, আবৃত্তি এবং সংগীত ও নাটক বক্তৃতার সমৃদ্ধ হয়ে থাকবে বসন্তরের মতো।

আরেকটি জরুরি প্যাভেলিয়ন থাকছে। ফার্স্ট-এইড সহ প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র এবং খাদ্যসেবিয়া সংক্রান্ত জন-সচেতনতার জন্য জরুরি স্টল।

বাঙালি জীবন স্বাস্থ্যসচেতন। স্বাস্থ্যের স্টল বা পসরা থাকছে ৬৫ থেকে চল্লিশটি। থাকছে মেডটে 'ফুড পার্ক'-এর অন্তর্গত। এটি একদমের নতুন সংযোজন। শিশুউদ্যান সহ থাকছে সাধারণের জন্য ছোট ছোট পার্কের বরনীয় আয়োজন। অনুসন্ধান কেন্দ্র থাকছেই।

এমন উৎসব কারালিরাই পালন করতে পারে। বাঙালির এই অনন্যের মিলটি ১৫ দিনের হলে ভাল লাগত। মেলা অবশ্যরে খাদ্য-পানীয়ের দাম যদি নাম্য মহের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ধার্য করা হয় তবে ভাল লাগবে। এই মেলা প্রাঙ্গণটি শহরের এমন স্থানে অবস্থিত—যেখান থেকে মেলাশেষে বাস বা রিকশায় বা পাতাল রেলেও ওঠা এক বিড়ম্বনা। ট্রাফিকীর মতো বিশাল রাজধানী শহরে ইপ্রয়া বড়ই বিপদজনক। মেলা সংগঠকের কাছে অনুরোধ—পরিবহন মন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে মেলা শেষে নিয়মিত বিশেষ কয়েকটি রুটের বাস যদি মেহেরু-পাশদেশ থেকে রাত সাড়ে নটা পর্যন্ত যাত্রা শুরু করে তাহলে জনসাধারণ সত্যিই উপকৃত হবেন।

সংযোগ মাধ্যম বা বিনোদন মাধ্যমে 'নাইক'-এর মতো 'জাস্ট দু ইট' নয় যতই সহজ ও মনোরঞ্জনাত্মক হোক বইয়ের কোনও বিকল্প নেই। বই মানুষের প্রথম প্রেম।

বইমেলা : পাঠকের চোখে

বিশ্ব সেন

বইমেলায় বিভিন্ন পাঠকের বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা আছে। মেলার মাঠে কত ধরনের ঘটনা ঘটে তা নিয়ে রম্যরচনা লেখা যায়, কলম লেখা যায়, কলকাতার কড়চা বা আয়নার তুলে ধরা যায়। বই কেনা আর না কেনা নিয়েও ঘটনা ঘটে বিস্তর। আসলে বইমেলায় পাঠক বা দর্শক সাধারণের রয়েছে বিভিন্ন প্রবণতা। কারুর ভালবাসা বা কারুর অনুযোগ গা জানানো সে তর্কে না গিয়েও বলা যায় বইমেলার চরিত্র অন্য আর দশটি মেলার থেকে স্বতন্ত্র। কলকাতার প্রাণের মৌচাক বইমেলার সর্বত্র। চেষ্টা চলেছে প্রাণচঞ্চলতা ভরা মেলায় যেন পাঠক-লেখক-প্রকাশকের মিলন ঘটানোর।

বইকেনার ব্যাপারে রবীন্দ্রসংগীত, সলিল চৌধুরির গান, রবিশঙ্করের সেতার, শম্ভু মিত্রের আবৃত্তির মতো আলোকিত বইয়ের ক্যাসেটগুলি যেখানে মনে হয় এত বই, এত ধরনের বই যে ক্রেতা নাড়াচাড়া করে তারা যেখানে একটু আলাদা। যাদের নিয়মিত বই কেনার অভ্যাস আছে, যা বইমেলার আকর্ষণে অনেকটা পড়ে উঠেছে বলে আমি মনে করি, তাদের প্রত্যেকের বাড়িতে গত পঁচিশ বছরে অন্তত কম করে দেড়শো / দুশো বইয়ের লাইব্রেরি গড়ে উঠেছে। পঁচিশ বছর আগে যে শিশু বাবা-মার হাত ধরে মেলায় আসত আজ সে প্রেমিকার সঙ্গে আসে। আজকে তার ঠেকানায় যৌবন টলমল করছে। ছোটবেলার হাবোল-তাবোল-এর সঙ্গে পেরিয়ে সে আজকে নিজের পছন্দসই বই নিজেই বেছে নিতে পারছে।

এই বেছে নেওয়ার শুরু থেকেই পাঠকের চাহিদা পড়ে ওঠে। প্রতি বছর মেলায় যে ধরনের বাংলা বই বেশি বিক্রি হয় তার ভিত্তিতেও অবশ্যই উপন্যাস ও

চেনা মুখে পাঠক খুঁজছেন প্রিয় লেখা

পক্ষ। কিন্তু লক্ষণীয় গবেষণাধর্মী ও ভাল প্রবন্ধ গ্রন্থের সংখ্যা কিন্তু আশানুরূপভাবে বেড়েছে। প্রকাশনা জগতের একশ্রেণির প্রকাশক সস্তা প্রবন্ধের বই বার করার দিকে ঝুঁকে দিয়েছেন।

বইমেলায় কলকাতার প্রকাশকদের পাশাপাশি দিল্লি থেকে এলাহাবাদ থেকে এবং অন্যান্য রাজ্য থেকেও প্রকাশকেরা অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাও যোগ দিতে শুরু করেছে। কলকাতার বইমেলার উদ্যোক্তাদের কাছে এই ঘটনা আনন্দের বিষয় হলেও সাহিত্যের একনিষ্ঠ পাঠকের কাছে কিন্তু উদ্বেগের কারণ হয়েছে। নিম্নির অধিকাংশ প্রকাশক টেক্সট বুক বিক্রির ব্যাপারে বেশি উৎসাহী। যদিও এই বইগুলি কলকাতার অনেক বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের খুবই কাজে লাগছে। টেক্সট বুক ছাড়াও বিভিন্ন গোয়েন্দা কাহিনী, থ্রিলার জাতীয় বই আছেন। বইগুলির কাটতিও খুব কম নয়। মধ্যবিত্ত পাঠকদের বই কেনার বাজেট নির্দিষ্ট থাকে, তার মধ্যে যদি এই সব বই কেনাতেই অধিকাংশ খরচ হয়ে যায় তবে বাংলা সাহিত্যের ভাল বই কিনবেন কি ভাবে? অথচ বইমেলার উদ্দেশ্যই হলো বই নেড়েচেড়ে, বিষয় পছন্দ করে কেনা—যে সুযোগ সাধারণ অবস্থায় যেন বইয়ের দোকানে ক্রেতারা পান না।

সাধারণত অনেক স্ট্রিট পত্রিকা প্রকাশকেরা বই বিক্রেতাদের ২৫ শতাংশ, কোন কোন প্রকাশক সংস্থা ৩৩; থেকে ৪০ শতাংশও ছাড় দেন। অথচ বইমেলায় ছাড়ের পরিমাণ মাত্র ১০ শতাংশে। বাংলা বইয়ের ক্ষেত্রে বইমেলা চলাকালীন ছাড়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করলে যেমন একদিকে পাঠক আরও বেশি বই কেনার দিকে ঝুঁকবেন সঙ্গেই নেই অন্যদিকে যে সব পুস্তক-বিক্রেতারা সরাসরি পুস্তকের প্রকাশনার সঙ্গে জড়িত নেই তারা অনুপ্রাণিত হবেন। তাছাড়া বইমেলায় ইদানীং দেখা যায় একই বই বিভিন্ন স্টলে বিক্রি হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে পাঠক সমাজ যদি প্রকাশনা সংস্থাগুলির কাছ থেকে আরও একটু উদারতা আশা করেন তা কি অযৌক্তিক হবে? পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধি হলে লাভবান হবেন প্রকাশকেরাই এবং লেখকও নতুন করে লিখতে উৎসাহী হবেন। পাঠক, লেখক ও প্রকাশকের প্রকৃত সংযোগসাধনে এই ভূমিকা পালনের ক্ষেত্র বইমেলাই হতে পারে।

বইমেলার প্রবেশ দ্বারে একটি স্টলের সামনে ভিড় জমেছে

অনেকে অভিযোগ করেন মেলায় খাবারের দোকান, চা-কফির এত দোকান কেন ? বইমেলা মনের খিদে মেটায় কিন্তু পেটের খিদে না মিটলে মন চাঙ্গা থাকে না তাছাড়া প্রতিটি বইয়ের স্টলে যে সব কর্মচারীরা মেলা চলাকালীন প্রতিদিন আনুমানিক প্রতিজন করেন তাদেরও খাবারের ব্যবস্থা এই দোকানগুলি থেকে হয়। ফলে খাবার বা পানীয়ের দোকান থাকা প্রয়োজনীয়।

গত কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে মেলা কর্তৃপক্ষ নিউজ প্রিন্ট বা ছোট প্রকাশকদের প্রতি নজর দিচ্ছেন। তাদের একটি স্টলের তলায় আসার চেষ্টা করছেন। এই চেষ্টা যত দ্রুত হয় তত ভাল কারণ এক-একটি ট্রেডিশনে পাঁচ-ছটি পত্রিকা মিলে তাদের নিজেদের কারণে বই-ই সমানভাবে সামনে আনা যায় না। সত্যিকারের তলায় যা তাদের তলায় সবাই জায়গা নিলেও সবাই সমান গুরুত্ব পায় না।

মেলার মধ্যে স্টল চিহ্নিতকরণ বিশেষ জরুরি। অনেকেই মেলার মধ্যে তাদের কাঙ্খিত বইয়ের দোকান খুঁজে পেতে পরিশ্রম করেন, সময় অনেকটাই বয়ে যায়। টিকিট কাউন্টার থেকে মেলার ম্যাপ বিক্রি করলে বোধহয় পাঠক-দর্শকেরা এক নজরে মেলার মাঠে প্রবেশের সময়েই সমস্তটা অবগত হতে পারবেন।

বইপাড়ার বই প্রকাশের পুরনো রীতি বদল হয়েছে। এখন বইমেলার নতুন বাংলা বই প্রকাশ হয়। অনেক প্রকাশকই পুজো সংখ্যার ছাপা উপন্যাসগুলিকে বই আকারে প্রকাশ করেন। এতে পাঠকের কাছে নতুনত্ব কিছু থাকে না। প্রয়োজন পাঠকের রুচিশীল অনুযায়ী ভালমানে মান বজায় রেখে বই প্রকাশ। তাড়াহুড়ো করে প্রকাশ করার ফলে অনেক সময়ে বই-এ ছাপার ভুল, বা অন্যান্য ত্রুটি থেকে যায় এদিকেও নজর দিতে হবে।

আসলে প্রত্যেক বছরেই প্রকাশকেরা নতুন নতুন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হন। সেগুলিকে ব্যবহার করে যদি প্রত্যেকবারের সমস্যাগুলিকে মুছিফেলার চেষ্টা থাকে তবে প্রত্যেক বছরের বইমেলাই নব নবরূপে প্রাণে খুশির ঢেউয়ের আনতে পারে। আর বই যারা পড়ে তারা সারা বছরই পড়ে, হয়ত তাদের মধ্যে কেউ কেউ সারা বছর বই কেনে না, মেলায় কেনে। বইমেলার সার্থকতা তখনই পূর্ণ বিকশিত হবে যখন বইমেলায় আগত দর্শকের অন্তত মুষ্টিমেয় মানুষ বই কেনার কথা ভাববেন। কারণ প্রকাশকেরাই বলেন যে সংখ্যক মানুষ আসেন তার শতকরা ৫ থেকে ১০ জন মাত্র বই কেনেন। বই কেনা বাড়লেই, সুস্থ সংস্কৃতিবান রুচিবান প্রজন্ম আমরা আশা করতে পারি।

এই ধরনের বুথ-এখন

এই ধরনের বুথ-এখন কোথাও নেই

বুথের সঙ্গে কথা বলার ব্যবস্থা

কলকাতা বইমেলা : প্রকাশকের চোখে

সচ্চিদেন্দ্রনাথ রায়
(মিত্র ও ঘোষ)

বইমেলা গত পঁচিশ বছরে ছোট থেকে ধীরে ধীরে বড় হয়েছে। এই সময়ে দেশের যা পরিবর্তন হয়েছে তার ছাপ তো বইমেলায় পড়বেই। অনেকে বলেন, খাবারের স্টল বেশি, বাজে পড়ায়, ভিড়টা বাড়ে না। আমরা এযাবৎ খেয়েছি ঘুগনি। আমাদের যদি পাঁচশ একটি জায়গা মেলার জন্য থাকত তাহলে এ সমস্যা থাকতো না। জল নিষ্কাশিত হিসাবে হয় কিন্তু সে তো আমাদের আগে, পরে আমাদের পায়ে পায়ে ঘুগনি ফেড়ে যায়। আর খাবারের স্টল রাখতে হয় কারণ সমতল থেকে যারা মেলায় আসছেন তাঁরা খাবেন কোথায় বা কফীহাউস বা খাবেন কোথায় ? এর আগে একবার ঘুর্ণিঝড় ঘটে গিয়েছে তারপর থেকে যে সাবধানতা নেওয়া হয়েছে তাতে ঘুর্ণিঝড় ঘটার আশঙ্কা কমে গেছে।

যে ধরনের বই আগে প্রকাশিত হত তার থেকে বর্তমানে বিষয় বৈচিত্র্য অনেক বেড়েছে। আগে শুধু পাঠ্য-টীকা-ব্যাসের ওপর জোর দিতাম, এখন ভ্রমণ কাহিনী, স্মৃতিকথা, কবিতাবই শিশুদের বই, ক্যালেন্ডার, টেবল ক্যালেন্ডার, বই বিভিন্ন ধরনের বই আমরা প্রকাশ করি। এটা সম্ভব হয়েছে এই মেলার জন্যে। বইমেলায় গিয়ে আমরা যে ধরনের পাঠকের সম্মুখীন হয়েছি, তাদের চাহিদা অনেক কম হলে ঠকতাম। তাদের চাহিদা মেটাই।

প্রত্যেক যে বইটা প্রকাশ করেন তার সম্বন্ধে তাঁকে প্রচারধর্মী হতে হবে বই পড়ুন বা না পড়ুন। তার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে জানতে হবে, খবরা রাখতে হবে। এখন অনেক প্রকাশককে দেখা যায় কেমন কেমন করে বই ছেপে দিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু প্রকাশক সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত পুরোনো মানুষ ছিলেন তাঁরা সে প্রকৃতির মানুষ ছিলেন না। প্রফুল্লচন্দ্র রায় সম্বন্ধে লিখতে, সমাজসেবার ব্যাপার আছে। লোকসেবার ব্যাপার আছে, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মতো মানুষেরা প্রকাশনায় ছিলেন। এ জায়গা ভুলে গেলে শুধু ব্যবসার মতো— ছেলেরা ব্যবসা, কাপড়ের ব্যবসা, তেলের ব্যবসার মতো চলতে থাকবে না। আমরা অনেকজন প্রকাশক এখনও এই ব্যবসাকে সমাজসেবার অঙ্গ হিসেবেই মনে করি।

আমাদের এই বইপাড়া কলেজ স্ট্রিট-মেডিকেলের কেন্দ্রস্থল। পশ্চিম প্রান্তিকি স্ট্রিট, বঙ্কিম স্ট্রিটস, গোট এসপ্লানেড হয় ছিল প্রেসিডেন্সী কলেজ, সংস্কৃত কলেজ, হিন্দু স্কুল—ডিরোজিও, রামমোহন, বঙ্কিম, বিদ্যাসাগর সবাই এখান থেকেই আলোকপ্রাপ্ত হয়েছেন। তাই এখানে যেন আমরা জন্ম কিছু ভাবতেই পারি না।

আজকাল জেলায় জেলায় যে সমস্ত বইমেলা হচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে বইয়ের প্রথম পাতাটা কেবল কম পাতা ছাপিয়ে দাম ধার্য করে দেওয়া হচ্ছে। এতেলে অসুবিধাতে পড়ে বিভিন্ন জেলার মেলা কমিটিগুলি। কিন্তু বছর বছর একই মেলা কমিটি আসছে বিভিন্ন জেলা-তাঁরা দেখা দিচ্ছে। বাঁকুড়া বইমেলা যেটা এতদিন অবধি শনিবার ছিল সেখানেও এবারে গোলা ঘটেছে। এই সমস্যা সমাধানের উপায় হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী পুরুলেন ভট্টাচার্যের কাছে প্রস্তাব রেখেছি যা হলে সমস্ত মেলা কমিটি নেতৃত্বে আসছক কমিটি করা।

কলকাতা বইমেলার ভিত্তিটা হয় তলেতলে ইতোমধ্যে প্রস্তুত হয়ে। আর কয়েকটি দুর্বলতার ঘরে যেমন আমাদের সংস্কৃতি, অনশন, দেশ-এ তাকাই ভিড় হয়। সংখ্যার দিক থেকে আলো বইয়ের বিক্রি বেশি। আমরা কয়েক বইয়ের নাম

১৯৯৫ সালের বইমেলার শুরুর দিনের দৃশ্য

যে কোন ভাষার বই এমনকি হিন্দি ভাষার বইয়ের থেকেও কম। যেসব ইংরেজি প্রকাশনা সারা বছরে তাদের পুরনো স্টক এখানে বিক্রি করে যেগুলি তারা ছাড়ের পরে কেনে সেগুলিকে মুদ্রিত দামে বিক্রি করার জন্য তাদের লাভও প্রচুর থাকে।

বিজেন্দ্রনাথ বসু
(ডিপার্টমেন্ট, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড)

বইমেলায় তো বই বিক্রি করতেই যাই। তবে মূল লক্ষ্যটা কিন্তু অন্যরকম। আনন্দ পাবলিশার্সের সব বই পাঠক-পাঠিকা হাত দিয়ে নেড়েচেড়ে দেখবেন তাঁদের পছন্দ-অপছন্দ সরাসরি প্রকাশ করবেন, তাঁদের চাহিদা জানাবেন— এটাই তো বড় পাওয়া। যাঁদের জন্য বই, সেই পাঠককে হাতের নাগালে পাওয়া, পাঠককে পড়তে পারাটাই প্রকাশকের বড় পাওনা। পাঠকের এই চাহিদা বুঝেও তো অনেক বই প্রকাশের পরিকল্পনা করা হয়। বাংলা প্রকাশনায় ইলাস্ট্রেটিং যে বিষয়বৈচিত্র্য বেড়েছে, সেটা কিন্তু বইমেলার জন্যই।

পাঠক চাইছেন বিষয়ভিত্তিক বই, তার চাহিদা হয়তো কিছুটা বেড়েছে, কিন্তু সব মিলিয়ে বিক্রিত বইয়ের সংখ্যা বাড়েনি, কমছে। বই বিক্রি প্রতি বছরই ১৫-২০% কমছে। তার অন্যতম কারণ বইয়ের দাম বাড়ছে, প্রকাশকরাও নিরুপায়। বছরে চারবার কাগজের দাম বাড়ছে, লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে বিজ্ঞাপনের খরচ। তুলনামূলকভাবে বাংলা বইয়ের দাম অতটা বাড়ানো যায় না। পাঠকরা বেশি দাম দিয়ে বাংলা বই কিনতে অভ্যস্ত নন। অথচ মেলায় বহু বিদেশী প্রকাশক-বিক্রেতা অংশ নেন। বাংলা বইয়ের তুলনায় ইংরেজি ও বিদেশী ভাষার বইয়ের দাম পাঁচ-ছ গুণ বেশি, তবু তো সেসব বই বিক্রি হয়। তাই বলে বিদেশী প্রকাশকদের উপস্থিতিতে বাংলা প্রকাশকদের আপত্তি কোনো ক্ষতি হয় না, কারণ বাংলা বইয়ের পাঠক বাংলা বইই কিনবেন। কিন্তু বইমেলায় অনেকে আসেন নিবিষ্ট বাজেট নিয়ে। সেসব ক্রেতা প্রথমেই ইংরেজি বা বিদেশী প্রকাশনার স্টলে ঢুকলে আর বাংলা প্রকাশনার স্টলে ঢোকার সুযোগ খুব একটা পান না। বিদেশী প্রকাশনার মান নিঃসন্দেহে খুব ভালো। কিন্তু এটা বাংলা প্রকাশনাকে খুব একটা প্রভাবিত করে না। কারণ কলেজ

বইমেলার একজন ব্যস্ততম বিক্রেতার শেষ পলক দেখা

স্টলের অধিকাংশ প্রকাশকই প্রকাশনার দায় নিতে কিছু ভাবেন না। তাই বিদেশী প্রকাশকদের কাছ থেকে যেটুকু শেখার, তা বাংলা প্রকাশনা নিতে পারছে না।

ইদানিং বইমেলায় বেশি ভোগে পড়ছে কয়েকটি বড় প্রকাশনার বই বিভিন্ন স্টলে বিক্রি হচ্ছে। প্রকাশক হিসেবে আমার খুশি হওয়ার কথা যে, আমাদের বই বিক্রি হচ্ছে। ভিড় ঠেলে যাঁরা আমাদের স্টলে আসতে পারছেন না, তাঁরা অন্তত আমাদের বইটা পেয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু বইমেলার পক্ষে এটা ক্ষতিকর দিক। পৃথিবীর অন্য কোনো আন্তর্জাতিক মানের বইমেলায় এমন হয় না। বইমেলারও একটা সৌন্দর্যের দিক আছে। বইমেলা তো শুধু ব্যবসার জায়গা নয়, অন্যও তাই হয়ে যাচ্ছে।

বইমেলার আমার খারাপ লাগে— অব্যবস্থা, ধুলো, মাঠ নোংরা, একঘেয়েমো। খাওয়ার জন্য পক্ষ বেশি। আর টয়লেট ব্যবস্থাও ভালো করা দরকার। আর এ সবই সুষ্ঠুভাবে সম্ভব, যদি মিছি না চাকাদুর্গ-এর মতো কলকাতা বইমেলার একটা স্থায়ী জায়গা হয়। সরকার যদি উদ্যোগী হয়, সেটা হওয়া কঠিন নয়।

এবারের বইমেলায় প্রকাশনার সব বছরের মতোই, গল্প-উপন্যাস-কবিতা-প্রবন্ধ সবই থাকবে। এখনও পর্যন্ত বাংলার উপন্যাসের চাহিদাই সবচেয়ে বেশি। ছোটদের বইয়ের ক্ষেত্রেও উপন্যাসই বেশি চলে। আর ছোটদের বই বড়রাও পড়েন। এসব বিষয় মাথায় রেখেই বইমেলার প্রস্তুতি চলছে।

চন্দনা দত্ত
ডিরেক্টর, শিশু সাহিত্য সংসদ

কলকাতা বইমেলায় বড় প্রাপ্তি অসংখ্য মানুষের কাছে সরাসরি সবচেয় বই নিয়ে পৌঁছে যাওয়া। বইয়ের বিজ্ঞাপনের এত ভালো জায়গা তো আর হয় না। এই সুযোগটাকে - কাজে লাগাতে চাই। পাশাপাশি বই বিক্রি তো আছেই। তবে বইমেলায় এখন পরিবেশক এবং পুস্তক বিক্রেতাদের ভিড় এত বেশি, প্রকাশকদের আসল উদ্দেশ্য নষ্ট হয়। কেউ কেউ দু-চারটে বই প্রকাশ করেই স্টল নিয়ে পুস্তকবিক্রেতার কাজ করেন। পুস্তকবিক্রেতারা অনেকেই দশ শতাংশের বেশি কমিশন দেন, তাই মানুষজন তাঁদের স্টলেই বেশি ভিড় করেন। আর এতে পাঠকের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ, পাঠকের আগ্রহ-চাহিদা জানবার সুযোগটাই নষ্ট হয়, হারিয়ে যায় বইমেলার উদ্দেশ্য। নষ্ট হয় বইমেলার চরিত্র। বিষয়টাকে হাল্কাভাবে না নিয়ে শিশু কর্তৃপক্ষের গুরুত্ব সহকারে ভাবা উচিত।

গত কয়েক বছরে আমাদের বইয়ের পাঠক কমেছে বলে তো আমার মনে হয় না। বই বিক্রির সংখ্যাটা প্রায় একই রকম আছে। প্রকাশনার বিষয় ও মানের

প্রতি যত্নশীল হবার চেষ্টা করি। আবাসের লক্ষ্য থাকে ভালো বই প্রকাশ করা। আর বেশি, ভালো বই মানুষের চোখে পড়লে, এখনও তা মর্যাদার সঙ্গেই মানুষ কেনেন। শুধু কেনেন না, সঙ্গে পড়েন। এ প্রসঙ্গে বলি, অন্যান্য সমস্ত মেলার মতো কলকাতা বইমেলাতেও 'বিক্রয়কেন্দ্র আধারের' ধারণা উচিত। প্রতিদিন এক-দু' ঘণ্টা করে আলাদাভাবে এই সমস্ত নির্দিষ্ট জায়গায় পড়তে পারলে ভালো হয়।

আর মেলায় কি খারাপ লাগে? গত ক'বছর মেলার মধ্যে কেউ কেউ ত্রুটিপূর্ণ বই প্রকাশ করে চলেছেন। এ নিয়ে প্রতি বছরই হইচই হচ্ছে, কিন্তু ওইসব নিম্নমানের বই প্রকাশ বন্ধ হচ্ছে না। খাবার স্টল বন্ধ বেশি। খারাপ লাগে, কফি হাউসগুলিকে এক কোণায় ঠেলে দেওয়া হয় বলে। কফি হাউসগুলিকে একটু চোখের সামনে রাখলেই ভালো। আর মুক্তস্থ ছিন্ন প্রিন্ট হলকে বইমেলায় তো খুঁজেই পাওয়া যায় না, ওটিকে মাঝমাঠে রাখা দরকার।

বিশ্বাস ভট্টাচার্য
পরিচালক-অংশীদার,
সারস্বত লাইব্রেরি

সেই ১৯৭৮ সালে বাংলায় বইমেলা আন্দোলনের সূচনা। তখন থেকেই বইমেলা আন্দোলনের সঙ্গে আছি। তারপর ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে নিজস্ব। ১৯৭৯ সালে শুরু হয়েছে কলিকাতা পুস্তকমেলা। বইমেলার আসল লক্ষ্যটিই হল মানুষের কাছে বই পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করা, মানুষকে বই-মুখী করা। এই বিজ্ঞাপনের যুগে অনেক বাংলা প্রকাশকেরই নিয়মিত বিজ্ঞাপন দেওয়ার সামর্থ্য হয় না, বইমেলার এই বিজ্ঞাপনের কাজটিই বড় করে হয়। এর রেশ থাকে সারা বছর। ইলেকট্রনিক মিডিয়ার দাপটে বিনোদনের জন্য বইপড়া (মহিলা ও বয়স্ক পাঠক) কমেছে। প্রয়োজনের তাগিদে যেটুকু বই পড়া দরকার, সেটা অবশ্য বেড়েছে। স্কুলিক বইয়ের বিক্রি বাড়ছে। এখন ছেলেদের বইও প্রয়োজনভিত্তিক। ছেলেদের জনপ্রিয় চরিত্রগুলি, এমনকি খেলুড়াও ফেল।

বইমেলায় বিদেশী প্রকাশকদের অংশগ্রহণে বাংলা প্রকাশনারও লাভ হচ্ছে। তাঁদের কাছ থেকে নতুন নতুন বিষয়ভাবনা বাংলা প্রকাশনায় জারিত হচ্ছে। বিদেশী প্রকাশনা দেখে বাংলা প্রকাশনার মানও বাড়ছে।

কলকাতা বইমেলা প্রকাশক ও পুস্তকবিক্রেতাদের যৌথ প্রয়াস। তবে প্রকাশকরাও ঢালাওভাবে পুস্তকবিক্রেতা হয়ে উঠলে মেলার সৌষ্ঠব তো নষ্ট হবেই। এ বিষয়টা নিয়ে কর্তৃপক্ষকে ভাবতে হবে। অতবড় মেলায় ত্রুটিটাক কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি থাকতেই পারে, কিন্তু তা নিয়ে বইমেলার মধ্যে বিক্ষোভ মিছিল করা বইমেলার সংস্কৃতিকে নষ্ট করে। অথচ ইদানিং এমন প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এ বিষয়ে সকলেরই সতর্ক হওয়া উচিত। পানীয় জল এবং টয়লেট ব্যবস্থা আরও ভালো করা উচিত। আর ভাবা উচিত স্টলবিন্যাস ও মেলার 'লে-আউট'

বইমেলার প্রবেশদ্বারটি অবশ্য শেষবার এটি অবে হয়েছিল মুক্তমঞ্চের কাছাকাছি

নিয়ে। মেটির পাশেই বিশাল পুলিশ ব্যান্ড। এর পাশে ছোট ছোট চার-পাঁচটা স্টল। পুলিশের উর্দির ডেকরেটর সেপাই স্টল ঢাকা পড়ে যায়।

শমিত সরকার
রিপোর্টার, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড

কলকাতা বইমেলায় বই বিক্রি প্রথম আশা হলেও পাঠকের মুখোমুখি হওয়াটাই প্রকাশকের বড় পাওয়া। পাঠকের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে প্রকাশক তাঁর প্রকাশনার একটা মূল্যায়ন করতে পারেন। বইমেলায় চত্বরে ঘোরে মনে হয়, বইয়ের চাহিদা বেড়েছে। ইলেকট্রনিক মিডিয়ার আগ্রাসন সত্ত্বেও বইয়ের চাহিদা বেড়েছে। বইমেলায় বই বিক্রির সংখ্যাও বেড়েছে, অন্তত আমাদের প্রকাশনার ক্ষেত্রে তাই বলে। গল্পগুচ্ছ, প্রবন্ধের বই, ছোটদের বইয়ের চাহিদা বেশি।

ইংরেজি ও অন্যান্য বিদেশী প্রকাশনার অংশগ্রহণে বাংলা প্রকাশনার জটিল কোনো প্রশ্নই নেই, বরং লাভই হয়। তুলনামূলক প্রতিযোগিতায় ভালো প্রকাশনার মান বাড়ছে। অন্যের তুলনায় প্রকাশনা সৌকর্যও বেড়েছে।

ইদানিং বইমেলায় কম প্রকাশক মোবাইল পুস্তকবিক্রেতার মতো আসা আসছেন। এটি হওয়া উচিত নয়। বইমেলায় প্রকাশকদের স্টলে পাঠকরা সরাসরি এসে পাঠকের মন থেকে অনেক কিছু জানা যায়, দেখা যায়, যা আগামী প্রকাশনার জন্যে জরুরি। মোবাইল পুস্তকবিক্রেতাদের কাছ থেকে বই বিক্রি হলে প্রকাশক পাঠক-মন থেকে বঞ্চিত হন। সেটা নিশ্চয়ই কোনো প্রকাশকের প্রত্যাশা হতে পারে না। বইমেলা প্রতি বছর বড় হচ্ছে, আরও সুন্দর হচ্ছে, নতুন নতুন পরিকল্পনা হচ্ছে। বইমেলার শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকুক, এই কামনা করি।

দুর্মুখি চট্টোপাধ্যায়
কর্মাধ্যক্ষ, সমরায়ণী

বইমেলায় শুধু বই বিক্রি করার কথা মনে হয়, সেটাই করেন না। মেলায় ঘুরতে গেলে বইয়ের প্রচার ও প্রসার। বইয়ের জন্যে মানুষকে টেনে আনা, মানুষের হাতে বই ধরিয়ে দেওয়াটাই হলো বইমেলার আসল লক্ষ্য। গত কয়েক বছর ধরে বইয়ের ওপর ক্রেতাদের আগ্রহ আসছে। বই বিক্রির সংখ্যাটাও বাড়ছে। তবে বৈদ্যুতিন মিডিয়ার মাধ্যমের নেশা কম্পিউটারের নেশার আক্রমণ একদিন ঘটিয়ে যাবে। অনুভূতির আবার বইয়ের কাছেই ফিরতে হবে। বইয়ের মতো এমন অনবদ্য নিত্যসঙ্গী আর কেউ হতে পারে না। শুধু বৈদ্যুতিন মাধ্যমের নেশাটা কাটানোর জন্য বই নিয়ে শুধু বইমেলায় নয়, সারা বছর ধরেই বইয়ের কাটতি খুব জরুরি। শুধু প্রকাশক নন, এ ব্যাপারে সবার সচেতন হওয়া দরকার। এখনও পর্যন্ত মেটিদের বইয়ের চাহিদাই সবচেয়ে বেশি। তিনবছর আগেকার থেকে পাঠক বেড়েছেন।

বইমেলায় বিদেশী প্রকাশকদের অংশগ্রহণে বইমেলায় মর্যাদা আরও বেড়েছে। ভালো প্রকাশনা একটা সুস্থ প্রতিযোগিতার মুখে পড়ে নিজেকে আরও উন্নত করার চেষ্টা করছে। বাংলা বইয়ের পাশাপাশি বিদেশী প্রকাশনার সমাহারেই তো আন্তর্জাতিক বইমেলাতে এর জনপ্রিয় আসছে। অবশ্য, কলকাতা নিজেও তো আন্তর্জাতিক শহর।

সম্প্রতি বইমেলায় অনেক প্রকাশকই পুরুক বিক্রেতাদের মতো আচরণ করছেন, এতেই বই বিক্রির স্টলে ঘুরছে। এমনটা কাম্যিকর নয়। একজন প্রকাশকের বই তাঁর নিজস্ব স্টলেই থাকুক। যে-সব প্রকাশক মেলায় অংশ নিচ্ছে পারেন না, পুরুক বিক্রেতারা তাঁদের বই রাখুন। এ বিষয়টি বিশ্ব কর্তৃপক্ষকে আমাদের অনুরোধ করি।

এত বড় মেলার প্রবেশদ্বারেই গোলকধাঁধার মতো ঘুরতে দেখি। বইমেলার যে ছোট্ট আগ দিদি করা হয়, তা থেকে কিছু বোঝাই যায় না। এলাকাগত ভাগ করা উচিত। এত বড় মেলায় এত পাঠকের সমাগম কেন ? কিছু মানুষ বইয়ের জন্যে যান, না খেয়েই যান—কখনও কখনো সেই কারণটা বোঝা যায় না।

শঙ্করীকুমার নায়ক
পরিচালক, পুলক

বইমেলায় বই বিক্রি করে অংশগ্রহণের তেমন কোনো লাভ হয় না। অবশ্য বিজ্ঞাপন, স্টল সাজানো, মেলায় অন্যান্য সব মিলিয়ে খরচ-খরচের খুব একটা হেরফের থাকে না। কিন্তু বইমেলা থেকে বড় প্রাপ্তি হলো পাঠকের সঙ্গে প্রকাশকের সরাসরি যোগাযোগ। পাঠকদের কাছ থেকে অনেক নতুন ধারণা পাওয়া যায়, ইচ্ছের তালিকা তৈরি হয়। এই চাহিদার হাত ধরেই গত কয়েক বছরে বাংলা প্রকাশনারও একটা নিজস্ব পরিবর্তন হয়েছে। কে-কোনো বিষয়ে হালফিলের বইয়ের চাহিদা বেড়েছে। তবে সংখ্যার মধ্যপাতে বই বিক্রির পরিমাণ প্রায় একইরকম। বেচাকেনা হয় ঠিকই কিন্তু বইয়ের পাঠক কমছে, তা কিন্তু নয়। বিদ্যালয় সাহিত্যের পাঠক কমলেও গবেষণামূলক বই, জনের চাহিদা পূরণকারী বইয়ের পাঠক বাড়ছে। সেই দিক থেকে ছোটদের বইয়ের চাহিদা বাড়ছে।

ইদানিং বইমেলায় অনেক বিদেশী প্রকাশক অংশ নিচ্ছেন। এতে বাংলা বইয়ের বিক্রি কম কাজে। বিশেষত তাঁরা নির্দিষ্টির বাজেট নিয়ে বইমেলায় আসেন। তাঁরা প্রথমেই ইংরেজি বা অন্য ভাষার স্টলে ঢোকেন আর বাংলা বইয়ের স্টলে তেমন সক্রিয় হয় না। তাই শুধু বাংলা বইয়ের জন্য আলাদা একটি বইমেলা করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিচ্ছে। বিদেশী প্রকাশকদের থেকেও বাংলা প্রকাশনার মান কিন্তু তেমন কমছে না। বাংলা

১৯৯২ সালের প্রথম দিকে নির্মাণাধীন অবস্থায়

প্রকাশনায় উপযুক্ত প্রয়োগবিদ্যার অভাব—তা কিন্তু নয়, আসলে পাঠকরা বেশি দাম দিয়ে ভালো বই কিনতে চান না, অথচ একটি পৃষ্ঠাসংখ্যার ইংরেজি বই পাঁচ গুণ দামে রাজপথে বিক্রি হয়।

বইমেলায় পুস্তকবিক্রেতাদের তিন ধরনের। তাদের ঠিক আগের জন প্রকাশকদের পুস্তকবিক্রেতারা কয়েক হাজার বই রাখছেন। কিন্তু এতে প্রকাশকদেরই ক্ষতি হচ্ছে। তাঁরা সরাসরি পাঠকের কাছে পৌঁছুতে পারছেন না। এতে বইমেলার আসল উদ্দেশ্যটাই বিঘ্নিত হচ্ছে। এছাড়া বইমেলায় রকমফের বাড়ছে। ফলস্বরূপ ভিড়ে প্রকৃত পুস্তকপ্রেমীরা বঞ্চিত হচ্ছেন। নিয়ম করা উচিত, বইমেলায় ঢুকলেই অন্তত একখানা বইও কিনতে হবে।

প্রসূন বসু
সম্পাদক

কলিকাতা পুস্তক মেলা যাকে আমরা সংক্ষেপে বলি কলকাতা বইমেলা। আমাদের এই মেলাকে নিয়ে নানান লোকের নানান অভিমত আছে। মেলার প্রথম থেকে এর সঙ্গে জড়িত থেকে, আমার মনে নানা জিজ্ঞাসার উদয় হয়। এই মেলাটা যখন শুরু হয়েছিল, রবীন্দ্রসদনের উল্টোদিকে যখন মেলাটা হত, বাজারে একমাত্র ট্রিগেরের সরধানে হয়েছিল। তখন এতো জনসমাগম হতো না কিন্তু পাঠকের খুব উপস্থিতি লক্ষ্য করতাম। ফলে তখন আমরা একটু বেশিমাত্রায় সারা বছর অনেক স্টল পাড়ায় যে বই বিক্রি করতে পারি না অর্থাৎ তুলে ধরতে পারতাম না, অথচ জনপ্রিয় বই সেগুলো পাঠক বেশি কিনত এবং মুদ্রণসংখ্যার দিকে তারা আসতেন, বই সেগুলোকে দেখতেন।

এরপর আস্তে আস্তে মেলা যখন বৃহৎ রূপ ধারণ করলো তখন লাক্ষ করলাম পাঠকের সংখ্যা কমছে, লেখকের সংখ্যা বাড়ছে। এখন বইমেলায়, আমার নিজস্ব অভিমত, শতকরা দুটি ভাগ পাঠক আর আসি ভাগ লেখক। অনেকে বলবেন বই বিক্রি বেড়েছে। আমি বলব বই বিক্রি অঙ্কে বেড়েছে, সংখ্যায় বাড়েনি। অবশ্য বইয়ের দাম তখনকার তুলনায় কম ছিল বেড়েছে এবং ক্রমশ কমছে। এখন তাহলে উপায় পাবে এত বই প্রকাশ করেন কেন? তার উত্তরে বলা যায় আগে পালা বিশেষে ছাপলে নববর্ষে বইপাড়ায় ঘুরবার আগায় ছিল এখন সেটা বইমেলার জন্যে তোলা আছে। বছর বইপাড়ায় তেমন নিয়মিত কেনাকাটা নেই।

তাহলে এর উত্তরে আপনি কি এই বইমেলার বিরোধী। নিশ্চয়ই আমি এই চরিত্রের বইমেলার বিরোধী। আমি চাই পাঠকের বইমেলা। লেখকের বইমেলা চাই না। বিদেশের যে বই মেলা হয়, আমি নিজে কয়েকবার বিদেশে বইমেলায় গেছি, সেখানে হয় বইয়ের আলোচনা। সেখানে কলিরাইট বিক্রি হয়, যাঁরা আসেন তাদের প্রকাশকের সঙ্গে কথাবার্তা হয়, চুক্তি হয়। কিন্তু কলকাতা পুস্তক মেলা একমাত্র মেলা যেখানে প্রত্যক্ষভাবে পাঠকের সঙ্গে আলিঙ্গন হয়। ফলে সেখানে পাঠকের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রকাশক তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করতে পারবে অর্থাৎ পাঠক কি চাইছে, তার চাহিদাটা কি সেখানে যদি এর ভিত্তি হয় তাহলে আসল উদ্দেশ্য কিছুটা সাধিত হবে।

মেলা কর্তৃপক্ষ অবশ্য খুব এ ব্যাপারে নজর দিচ্ছেন।

সেটা ঠেকে, চলুক কিন্তু ঠিক পথে আসতে হবে। উপরে চাকচিক্য থাকলেও ভিতরে ভিতরে ক্ষয় হচ্ছে। এর জন্য প্রকাশক সংগঠন, লেখক সংগঠন, পাঠককে সচেতন হতে হবে, সব দিকে সকলকে নজর দিতে হবে।

জয়দেব ঘোষ
পরিচালক, অভেদ পাবলিশিং হাউস

কলকাতা বইমেলার আকর্ষণগুলোর লক্ষ্য করি—বই বিক্রি এবং বইয়ের প্রচার। গত কয়েক বছরে শিক্ষামূলক বইয়ের চাহিদা বাড়ছে, বাড়ছে কুইজ বা খেলা জাতীয় বইয়ের চাহিদা। গল্প-উপন্যাসের চাহিদা কমছে। তবে আমাদের প্রকাশনার ধনির্ণাটিত ক্ষেত্রে গল্প সিরিজের চাহিদা আজও একই রকম রয়েছে।

কলকাতা বইমেলায় এখন অনেক বিদেশী প্রকাশক আসে নেন, তাদের কাছে বইয়ের বিক্রি প্রকাশিত হয় বলে আমাদের মনে হয় না। কারণ আমাদের

বইয়ের আলাদা পাঠক আছেন। তবে কম্পুসেক্টেরা, যাঁরা বইমেলায় বই কেনেন আবেগ হিসেবে, তাঁরা বিদেশী বইয়ের স্টলে ঢুকলে আর বাংলা বইয়ের স্টলে নাও আসতে পারেন। কলকাতা বইমেলায় একটা প্রতিযোগিতার আবহ থেকে কি না জানি না, ভালো বইয়ের প্রকাশনার মান ক্রমশ বাড়ছে।

গত কয়েক বছর ধরে একই প্রকাশকের বই বিভিন্ন স্টলে বিক্রির চল শুরু হয়েছে ভালোই তো। যেসব প্রকাশকের স্টলে প্রচণ্ড ভিড় হয়, তাঁদের বই পাঠকরা অন্য স্টল থেকে পেয়ে যান। তাই প্রকাশকদের তুলনায় বইমেলায় পুস্তকবিক্রেতাদের ভিড় বেশি হচ্ছে। তবে এরকম চলতে থাকলে বইমেলার চরিত্র নষ্ট হতে বাধ্য। তাই এ বিষয়ে বইমেলা কর্তৃপক্ষকে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলা উচিত।

বইমেলার পরিসর বাড়ছি বেড়েছে অনেকখানি। কিন্তু মাঠে স্টল-বিন্যাস খুব একটা সময়োপযোগী হয় না। এমন কিছু জায়গায় স্টল দেওয়া হয়, যেখানে মানুষজন একেবারেই যেতে পারেন না। বইমেলায় স্টল-সজ্জার পুনর্বিন্যাস হওয়া দরকার। আর স্টল-বণ্টনে লিটল্ ম্যাগাজিনের জন্য আলাদা প্রকাশনা দেওয়া হয়। একটি আন্তর্জাতিক মানের মেলায় এই পক্ষপাতিত্ব কী আদৌ শোভনীয়? বিষয়টি বইমেলা কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখতে পারেন। আর একটি প্রস্তাব আছে— 'বাংলা প্রকাশনার ভবিষ্যৎ' বিষয়ে আগামী বইমেলায় একটি সেমিনারের ব্যবস্থা হোক।

প্রবীরকুমার সাহা
পরিচালক, লিটিরাম

বইমেলায় বহু মানুষকে একসঙ্গে পাওয়া যায়, তাই বইয়ের বিজ্ঞাপন ও প্রচারের বড় জায়গা হল এই বইমেলা চত্বর। গত কয়েক বছর ধরে বইয়ের চেহারার রদবদল তো হয়েছেই। নতুন লেখকদের গল্প-উপন্যাস বিক্রি হয় না; সবাই চান নামী লেখকদের উপন্যাস। তবে এর মধ্যে চাহিদা বেড়েছে কবিতা সিরিজ আর সংকলনের। শীতমশালি সংকলনে একই মলাট অনেক লেখককে পাওয়া যায়। আর এইসব সিরিজের বইমেলার প্রতি বছরই বই বিক্রির সংখ্যাটা অল্প কিছু হলেও বাড়ছে।

সম্প্রতি একই বই মেলার অনেক স্টলে পাওয়া যায়। এটা তো একটা ভালো দিক। বিশেষত যাঁরা বিজ্ঞাপন দেখে বই কেনেন, তাঁরা অযথা দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে প্রকাশকের কাছে যাবেন কেন? আর বই ফ্লেক্সেচেরে দেখে বইয়ের ভালো-মন্দ বিচার করে যাঁরা নতুন নতুন বই খোঁজেন, তাঁরা তো প্রকাশকের কাছে যাবেনই।

বইমেলার মাঠে বড় স্টলের সামনে ছোট ছোট স্টল সাজিয়ে দেওয়া হয়, এটা অবশ্যই নয়। মেলার ভেতরে রাস্তা আরও পরিষ্কার হওয়া উচিত। এখানে ওখানে খানাখন্দ থাকে। এ সব সমস্যার সমাধান হয় যদি বইমেলার জন্য একটা স্থায়ী কাঠামো তৈরি করা যায়। সমস্ত প্রকাশক বন্ধুদের এ বিষয়ে উদ্যোগী হওয়া উচিত। সরকারও কী এ বিষয়টা ভাববেন?

३०८) महात्मा फुले चौक बाजार, औरंगाबाद (महा)

রুচিশীল ও মনের মত বিভিন্ন স্বাদের বই পেতে হলে কলকাতা পৌরসংস্থা প্রকাশিত বই পড়ুন

ছোটদের জন্য

আমাদের দিনোদপত্র

আমাদের সুভাষচন্দ্র

সাধারণের জন্য

মুক্তির সংগ্রাম ও কলকাতার পাঠ

C. M. Gazette C. V. Raman Birth Centenary Issue

C. M. Gazette Anthology Number 1924-1947

C. M. Gazette Netaji Birthday Com. Vol. Cent. eve-tribute

C. M. Gazette Netaji Centenary Issue

Calcutta-a set of Pictures

Calcutta at a Glance

কলকাতা সম্বন্ধে বিশদ জানতে হলে তথ্যসমৃদ্ধ পুস্তিকা নিয়মিত পড়ুন

উল্লিখিত বইগুলি কলকাতা পৌরসংস্থার তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ এবং রেকর্ড বিভাগের কাউন্টারে সারা বছর পাবেন।

তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ

১, হল স্ট্রিট, হল বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০ ০৮৭

কারুশিল্প, প্রযুক্তিবিদ্যা কৃষ্টি
এই তিন কলকাতার সৃষ্টি

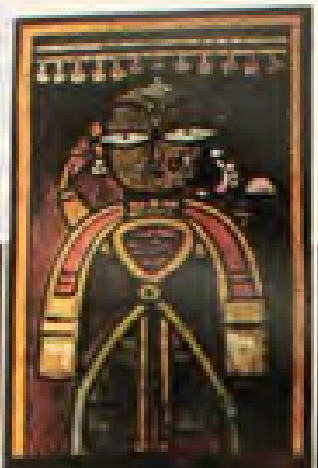

কালী মন্দির
পরেশনাথ মন্দির
মহাবোধি সোসাইটি
নাখোদা মসজিদ
আর্মেনিয়ান গির্জা
ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল
রাজা রামমোহন রায়
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
যামিনী রায়ের ছবি
নোবেল জয়ী অমর্ত্য সেন
দ্বিতীয় হুগলী সেতু

অনেক সম্প্রদায় অনেক সংস্কৃতি
অনেক সাহসে গড়ে উঠেছে এই শহর

কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

কলকাতা
দূরশ্রী
থ্রীর থ্রীর থ্রীর থ্রীর

বন্যাদুর্গত মানুষের সাহায্যে
মেয়রের ত্রাণ তহবিলে
মুক্ত হস্তে দান করুন

মেয়রস রিলিফ ফাণ্ড
কলিকাতা পৌর সংস্থা
৫ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড
কলিকাতা-৭০০ ০১৩

কলকাতা

পুরশ্রী

স্টার থিয়েটার বিশেষ সংখ্যা

১৪০৭

কলকাতা পুরশ্রী

কলকাতা পৌরসংস্থার বাংলা মুখপত্র

মার্চ, ২০০১ [ ] সংখ্যা ৫

প্রধান সম্পাদক — অনুপ মিত্র

সহযোগী — অমলকুমার লাহা, পলাশ রায় ও অরূপ চৌধুরী

প্রচ্ছদ চিত্র — সুধাংশু পাল

অলঙ্করণ সূচি — পলাশ ঘোষ ও মনোমোহন গাঙ্গুলী

কৃতজ্ঞতা — দেব পণ্ডিত, পল্লিশ্রী নার্সারী অ্যাসোসিয়েশন, হিরণ্ময় ঘোষ, প্রশান্ত পণ্ডিত, কাশফুরী মিউজিয়াম সোসাইটি

প্রকাশক
বিশেষ অধিকারিক
তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ, কলকাতা পৌরসংস্থা
৪র্থ বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ১ ম্যাঙ্গো লেন
কলকাতা-৭০০ ০০১
দূরভাষ : ২২৬-০৩৩০, ২২৬-০৪৭১ / এক্সটেনশন :

মুদ্রক
নবপত্রী কর্পোরেশন লিমিটেড
১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০ ০১২

দাম : ১৫ টাকা

বিষয়সূচি

সম্পাদকীয় * ৫

কলকাতা পৌরসভা কর্তৃক স্টার থিয়েটার অধিগ্রহণ * সুধীর মুখোপাধ্যায় □ ৭

পরাধীন ভারতবর্ষে স্টার থিয়েটার ধর্ম ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের স্রষ্টা * অরুণ ঘোষ □ ১০

স্টার অধিগ্রহণ নিয়ে কলকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের অভিমত * রামকুমার চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখার্জি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলিপ মুখার্জী, তরুণকুমার, সুবেন্দ্র ভৌমিক, পি সি সরকার, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় চিত্রাবলি কর, পরিমোষ সেন, তরুণেন্দু চট্টোপাধ্যায়, সুনিত্রা মুখোপাধ্যায় পি কে মল্লাবাজী, শিপ্রা মিত্র, গীতা দে, ছিপ্র দাশগুপ্ত, বিশ্বু ভৌমিক □ ১৪

স্টার থিয়েটার * সবিত্রী চট্টোপাধ্যায় □ ২০

স্টার থিয়েটার এবং বাংলা নাটক * অরুণ সি দাস □ ২২

স্টার থিয়েটার—বাংলা থিয়েটারের ঐতিহ্য * মহুয়া চৌধুরী □ ২৫

নাটকের হার পরিবর্তন * প্রফুল্ল পালিত □ ২৭

স্টার : অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ * চিত্তরঞ্জন ঘোষ □ ২৯

স্টারের বিজ্ঞাপন সেকাল ও একাল * প্রফুল্ল পালিত □ ৩৫

স্টার থিয়েটারের কথা * দেবনারায়ণ গুপ্ত □ ৩১

বাংলা নাট্যশালার উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক স্টার থিয়েটার * সন্ধ্যা বন্দ্যোপাধ্যায় □ ৩৭

নটীকণ্ঠ গিরিশচন্দ্র ও স্টার থিয়েটার * প্রভাতকুমার দাস □ ৩৯

স্ত্রী বিনোদিনী ও স্টার থিয়েটার * দেবা দে □ ৪৬

স্টার থিয়েটারের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী-প্রযোজনা * মানসী রায়চৌধুরী □ ৭৩

১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর

প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলার জাতীয় নাট্যশালা।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর বাংলার জাতীয় নাট্যশালা স্টার থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই থেকে আজ পর্যন্ত বাংলার নাট্যশালার ইতিহাসে স্টার থিয়েটার এক গৌরবময় অধ্যায় রচনা করে আসছে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে 'বিল্বমঙ্গল' নাটকের অভিনয় দিয়ে স্টার থিয়েটার নতুন করে তার জীবনযাত্রা শুরু করেছিল। সেই থেকে আজ পর্যন্ত স্টার থিয়েটার বাংলার ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হয়ে বাংলার নাট্যামোদী জনসাধারণের সেবা করে আসছে।

॥ স্টার থিয়েটারের একমাত্র স্বত্বাধিকারী শ্রীললিতকুমার মিত্র ॥

● আর মাত্র আর ক'দিন অপেক্ষা করিলেই ●

স্টার থিয়েটার

বাংলার নাট্যশালার এক একটি যুগান্তরের সূচনায় বহুবার নাট্য-সাধনার অনুপম কীর্তিতে যুগান্তরের অক্ষয় রেখা রচিয়ে যার অনির্বাণ আলোকবর্তিকাকে প্রজ্জ্বলিত করে তুলেছে—

বাংলাদেশে চলচ্চিত্রের নির্বাক যুগে যিনি এক্সিস সর্বপ্রথম দি ব্রিকেন্স্ নামক ছবিতে ইংরেজ এই স্টার থিয়েটারেই শুরু করেছিলেন।

বাংলার ঐতিহ্যদীপ্ত নাট্যশালা হিসেবে স্টার থিয়েটার অনন্য

একদিকে বিচিত্র রসের ও বিষয়ের নাটকাবলী—অন্যদিকে রঙ্গ-সৌষ্ঠব ও আলোক সম্পাতের সাধুনিকতা—দুয়ের সমন্বয়ে নাট্যরূপের পরিকল্পনা ও রূপায়ণে নিয়ত যত্ন—আমার সহযোগী সহকর্মীদের আন্তরিকতাপূর্ণ সাহায্য নাট্যামোদীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্রাজ্ঞীতি—যে কোন জাতীয় কার্যে মুক্ত হস্তে অর্থ সাহায্য প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সর্বজনপ্রিয় স্টারের নাট্য-সাধনার অগ্রগতি অব্যাহত।

অভিনেতৃবৃন্দের শ্রীযুক্ত শ্রীমতী ● শ্রীযুক্তা ● শ্রীমতী ● শ্রীযুক্ত ● শ্রীমতী ● অভিনয় শ্রীমতী ● শ্রীযুক্তা ● শ্রীমতী ● কণ্ঠসঙ্গীতে : শ্রীমতী : শ্রীযুক্তা : অর্ধ-শতাধিক প্রভৃতি নাটকগুলির মাঝে স্টারের নাট্য সাধনার ধারা বিচিত্র।

● স্টার থিয়েটারে নতুন যে কোন নাটকের নামে জড়িয়ে থাকে নতুন আশা ●

তাই নাট্যামোদী জনসাধারণের প্রিয় নাট্যগৃহ

স্টার থিয়েটার

৭৯।১।১৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৪

● টেলিফোন : ৫৫—১১৬৮

স্টার থিয়েটারের নিজস্ব বেতার কেন্দ্রের ঘোষণা

সম্পাদকীয়

অতি সম্প্রতি কলকাতা পৌরসংস্থা স্টার থিয়েটার অধিগ্রহণ করে পুনর্নির্মাণ শুরু করেছে। কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের নাট্য ঐতিহ্যে স্টার থিয়েটারের ভূমিকা ইতিহাসস্বীকৃত। কলকাতার সাংস্কৃতিক জগতে স্টার থিয়েটারকে ভগ্নদশা থেকে মুক্তিদানের চেষ্টা স্বাভাবিকভাবেই আলোড়ন তুলেছে। এই ঘটনাকে স্মরণ রেখে আমাদের নিবেদন এই বিশেষ সংখ্যার।

স্টার থিয়েটারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের পাশাপাশি গিরিশচন্দ্র, নটী বিনোদিনী প্রমুখের সঙ্গে স্টার থিয়েটারের সম্পর্ক নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন গবেষক-লেখকেরা। স্টার থিয়েটারের বিজ্ঞাপন নিয়েও রয়েছে একটি মূল্যবান নিবন্ধ। অভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও অভিনেতা সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতানির্ভর দুটি লেখা। কলকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা স্টার থিয়েটার অধিগ্রহণকে কী চোখে দেখছেন তা অক্পটে ব্যক্ত করেছেন। স্টার থিয়েটার পুড়ে যাওয়া মাত্র নাট্যকার চিত্তরঞ্জন ঘোষ একটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এখানে সেটি পুনর্মুদ্রিত হল। পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্তের লেখাটি পুনঃপ্রকাশের অনুমতি দিয়েছেন এইজন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

এই সংখ্যাটি নাট্যপিপাসু, জিজ্ঞাসু পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে আমাদের উদ্যোগ ও পরিশ্রম সার্থক হবে।

নটরাজ শিশিরকুমার ভাদুড়ী

কলকাতা পৌরসভা কর্তৃক স্টার থিয়েটার অধিগ্রহণ

সুধীর মুখোপাধ্যায়

দেড় থেকে দু বছরের মধ্যে বন্ধ হয়ে যাওয়া স্টার থিয়েটার চালু হবে জানালেন মহানাগরিক সুব্রত মুখোপাধ্যায়। এই উপলক্ষে ১১ ফেব্রুয়ারি সকালে বিডন ভবন থেকে শুরু করে এক পদযাত্রা এসে শেষ হয় স্টার থিয়েটারে। পদযাত্রায় অসংখ্য মানুষজনের মধ্যে মহানাগরিক, মেয়র পরিষদের সকল সদস্য ছাড়াও ছিলেন মাধবী চক্রবর্তী, সুনন্দন সেন, তাপস পাল, বীনাক্ষী চৌধুরী, সুস্মিতা মুখার্জি, তরুণকুমার, বীণা দাশগুপ্তা, অরু সেনগুপ্ত, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজিত পাঁজা, প্রাক্তন মেয়র কমল বসু, বিধায়ক সঞ্জয় বক্সি, সাধন পাণ্ডে, সাংসদ সুদীপ ব্যানার্জি, বিধায়কদ্বয় শীতলনাথ গাঙ্গুলি, চেয়ারম্যান অনিল মুখার্জি, বরো চেয়ারম্যান সলিল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

স্টার থিয়েটারের সামনে হাজার হাজার সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে মহানাগরিক জানান, স্টার থিয়েটার চালু করার চেষ্টা

স্টার থিয়েটার কর্মপ্রাঙ্গণ ঘিরে সাংস্কৃতিক আন্দোলনে ঘোষণাপত্রিক হয়ে উঠেছিলো। ছবি অমলা মেহর পরিবার সৌজন্যে।

কেউ করতে পারছে না। টাকা কোনও সমস্যা নয়। দরকার ছিল উদ্যোগ গ্রহণের। এরপর স্টার থিয়েটার অধিগ্রহণের নোটিশ জারি করা হয়। স্টার থিয়েটার নিয়ে রাজ্য সরকারের উদাসীনতার কথা বললেন সাধনী চক্রবর্তী, দীপালী গোস্বামী, সুমিত্রা মুখার্জি।

কলকাতা পৌরসংস্থার উদ্যোগে স্টার থিয়েটার আবার নতুন করে তার পুরনো ঐতিহ্য নিয়ে উজ্জীবিত হতে চলেছে। কলকাতা পৌরসংস্থা পুড়ে যাওয়ার বহু বছর পর স্টার অধিগ্রহণ করে প্রাথমিকভাবে তার পুনরুদ্ধারের কাজও প্রায় শেষ করেছে। পুড়ে যাওয়ার পর থেকে সেখানে এক জমাটের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল কেওলি পরিষ্কার করেছে পৌরসভা। তাই ২৭ ফেব্রুয়ারি শুধু স্টার থিয়েটার-এর মধ্যে এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে মহানাগরিক সুব্রত মুখোপাধ্যায় ঘোষণা করে দিলেন মার্চের ৭ তারিখে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন চেয়ারম্যান। শিলান্যাসের দিনই পুড়ে যাওয়া পুরানো ফুলিয়মান আবার উপরেই, শহরেরই বিভিন্ন নাট্য সংস্থা মিলেমিশে লিটিল থেস্পের একটি নাটক মঞ্চস্থ করবে। সেইজন্য মহানাগরিক ২ কোটি টাকার অনুদান ঘোষণা করেছেন বলে জানান। ঐতিহাসিক স্টার থিয়েটারের পুনরুজ্জীবনের জন্য মোটামুটিভাবে ১/১০ কোটি টাকা খরচ হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে মেয়র বলেন, স্টার থিয়েটারের পুরনো কাঠামোটি বজায় রেখেই থিয়েটার হলটি নির্মাণ করা হবে। তিনি এ ব্যাপারে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সাহায্য চাইবেন।

তিনি জানান প্রখ্যাত স্থপতিদের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছেন এবং সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

শতাব্দীর প্রাচীন স্টার থিয়েটার পুনর্নির্মাণের ব্যাপারে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করায় শুধু শিল্পী বা সাংস্কৃতিক জগতের মানুষ নয়, পৌরসভার এই সিদ্ধান্তে খুশি আমজনতাও। রামকৃষ্ণদেবের আশীর্বাদধন্য এই প্রেক্ষাগৃহ পৌরসভা অধিগ্রহণ করায় কলমতনির্বিশেষে সকলেই পুর কর্তৃপক্ষকে অভিনন্দন জানিয়েছে। প্রতিবাদনের শতাব্দীর প্রাচীন স্টার থিয়েটার কলকাতা তথা বাংলার ঐতিহ্য ও অহংকারের প্রতীক। এই কথা মনে রেখেই পৌরসভা এই উদ্যোগকে সফল করতে এগিয়ে এসেছে। পৌরসভার এই উদ্যোগকে বাস্তবায়িত করতে শিল্পী ও সাংস্কৃতিক জগতের তারকারা সহযোগের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। বাদুকর পি সি সরকার, অভিনেতা লিলি চক্রবর্তী, নবনা দাস, গীতা দে, অভিনেতা অরুণকুমার ও যাত্রা জগতের অলোকরূপ সৃষ্টিকারী

স্টার থিয়েটার পুনর্নির্মাণ পর্যন্ত বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হবে। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় বেসরকারি সংস্থা বাংলাদেশ, মহানগরীর দুই মুখ্যমন্ত্রী, অন্যান্যের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী ও উপ-মহানগরিক প্রিয়তোষ মুখোপাধ্যায়।

নাট্যকর্মী বীণা বাগচীসহ অনেকে কলাকুশলী পৌরসভার এই উদ্যোগকে সফল করতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

পৌরসভার পরিকল্পনা অনুযায়ী শতাব্দীর এই প্রাচীন প্রেক্ষাগৃহের নীচে ও উপরে কোন কিছু নির্মাণকার্য করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রেক্ষাকক্ষের নীচে নির্মাণ করা হবে পার্কিং প্লেস, পার্কিং প্লেসের উপরে থাকবে রঙ্গমঞ্চ। রঙ্গমঞ্চের দোতলায় থাকবে শপিং কমপ্লেক্স। শপিং কমপ্লেক্সের ভাড়া বিক্রি করে যে অর্থ সংগৃহীত হবে তা দিয়ে প্রেক্ষাগৃহের উন্নয়নের কাজে লাগানো হবে। প্রেক্ষাগৃহের কাজ দ্রুতভাবে শেষ করতে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে পৌরসভা সাহায্য চাইবে। এই সমস্ত দিক থেকে পৌরসভা আশাতীত সাহায্য পাবে বলে পুর কর্তৃপক্ষের আশা। পুরো পরিকল্পনাটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত করবার জন্য ইতিমধ্যে স্থপতি চলর্স কোরিয়া'র সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন।

স্টার থিয়েটারের পুনর্নির্মাণের জন্য আপাতত দু' কোটি টাকার তহবিল নিয়ে কাজ শুরু করেছে। বেলঘরিয়া মহকুমা মহাকরণের নিজের বেতন থেকে ১৫ হাজার টাকা দিয়েছেন প্রেক্ষাগৃহ পুনর্নির্মাণের জন্য। বিভিন্ন সংস্থা বা শিল্পীগোষ্ঠী এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছে। বৃদ্ধমঞ্চীন ভিত্তিতে শুরু হওয়ার কাজ দ্রুতভাবে সঙ্গে শেষ করতে পারলে আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে প্রেক্ষাগৃহে নতুন করে নাটক মঞ্চস্থ করা সম্ভব হবে বলে আশা প্রকাশ করা হচ্ছে। বাঙালির গর্বের এই সম্পদকে এবং তার পুরনো ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে দিতেই এই মহৎ প্রয়াস শুরু করেছে পৌরসভা। শুধু স্টার থিয়েটার নয়, থিয়েটার পাড়ার অন্যান্য নাট্যশালাকে পুনরুজ্জীবন ঘটাতে উদ্যোগী হবে পুর কর্তৃপক্ষ। পৌরসভার অধিমে বলা আছে—শহরের কোনও ঐতিহ্যবাহী ভবন সংস্কার না হলে বা ভবনের মালিক কোনও উদ্যোগ না নিলে পৌরসভা নিজেই এর দায়িত্বভার নিতে পারে। প্রয়োজনে মালিকানা ভবনের মালিকদের সঙ্গে এখনকার দিনে সরকার সমবায়ে উদ্যোগী হতে পারে। শতাব্দীর প্রাচীন এই পুরো হওয়া স্টার প্রেক্ষাগৃহ এতদিন অবহেলায় অনাদরে পড়েছিল। সংস্কারের পর স্টারের পুনরুজ্জীবন ঘটানোর উদ্যোগে সমাজজীবনে একটা ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করবে। কলকাতা পৌরসভার এই উদ্যোগ শিল্পী ও কলাকুশলী মহল থিয়েটারপ্রেমী উপকৃত হবে সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। নাট্যামোদী বিশিষ্ট ব্যোম বক্সী নিজস্ব ভিটে পড়ে থাকতে দেখেছিলেন স্টার থিয়েটার। এর পর বহু অনুরোধ করা হয়েছিল এই নাট্যমন্দিরের উপর। ১৯৯১ সালে 'ঘটক বিদায়' নাটক অভিনয়ের সময় নাট্যমন্দিরটি পুরো গিয়েছিল। ১০ ফেব্রুয়ারি স্টার থিয়েটারকে পুর কর্তৃপক্ষ অধিগ্রহণ করে।

পরাধীন ভারতবর্ষে "স্টার থিয়েটার" ধর্ম ও সংস্কৃতির পুনঃজাগরণের প্রতীক

অরীন ঘোষ

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে আটের দশকে স্টার থিয়েটার রঙ্গমঞ্চের জন্ম তখনকার বাঙালি সংস্কৃতি পুষ্ট সমাজ ব্যবস্থায় একটা পরিবর্তন আনতে বিরাট ভূমিকা পালন করেছিলো। সাম্রাজ্যবাদীরা যেন দেশের শাসন ক্ষমতা দখল করেই শুধু সন্তুষ্ট হলো। তারা সে দেশের শাসন ক্ষমতা চিরতরে কায়েম রাখতে সেই দেশের ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যেও অনুপ্রবেশ করে এবং ধীরে ধীরে তাকে গ্রাস করার চেষ্টা করে। যা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি করার চেষ্টা করেছিল।

সেই সময় আমাদের সামাজিক অবস্থার ছিল—সাহেবরা তখন হিন্দু ধর্মের নিন্দা করে, রাজপথের ওপর পরমহংস তত্ত্ব সাধারণ হিন্দুরা অনুভব করতে পারে না, পাদ্রীরা হিন্দুদের এতগুলি ঠাকুরদেবতাদের নিয়ে বাঙ্গ বিদ্রূপ করতো তো বটেই, রাজারা এবং নব্যশিক্ষিত হিন্দু সমাজরা এই সব পুতুল পুজায় ঘোর বিদ্বেষী। তখন শিক্ষিত সমাজরা হিন্দু ধর্মকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনে করে নাস্তিকতার আস্বাদন শুরু করায় হিন্দুরা অনেকখানি গুটিয়ে গিয়েছিল. সেই কারণে অন্যদিকে ও অশিক্ষিত হিন্দুরা পূর্ব সংস্কার বিসর্জন দিয়ে নূতন কি আকারে ধরবে তা বুঝতে না পেরে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল। তাই সেই সময় "স্টার থিয়েটার" নামক রঙ্গমঞ্চ গড়ে ওঠার পেছনে ব্যক্তিগত ত্যাগ, মান অভিমান, কলহ ও কলঙ্কের সব ইতিহাসই তুচ্ছ, যদি সামগ্রিক পটভূমিকায় এর বিচার করা যায়। এর কর্মকুশলী ও পরিচালকরা অবশ্য জানতেন না যে এই স্টার থিয়েটার রঙ্গমঞ্চ অবলম্বন করে তারা কতটা সমাজ পরিবর্তনে অংশগ্রহণ করে যাচ্ছেন। কারণ তখন "স্টার থিয়েটার" রঙ্গমঞ্চ গিরিশ ঘোষ রচিত ও পরিচালিত "দক্ষযজ্ঞ", "ধ্রুব চরিত্র", "জনা প্রহ্লাদ", "নলদময়ন্তী" ও "চৈতন্যলীলা" নামক অসাধারণ জনপ্রিয় হয়ে ওঠা নাটকগুলির মধ্য দিয়ে সাধারণ হিন্দু সমাজ ফিরে পেল তাদের বংশানুক্রমিক বিশ্বাস।

আগে থিয়েটার দেখতে আসত শিক্ষিত উচ্চশিক্ষিত, শিক্ষিত ধনী সম্প্রদায় আর মাতাল-লম্পটের আনাগোনা। কিন্তু এইসব নাটকগুলি স্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হবার সাথে সাথে ছুটে আসতে লাগল মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত, এমনকি গ্রাম থেকে ছুটে আসতে লাগল দলে দলে মানুষ। এইসব নাটকই রামায়ণ-মহাভারত আর হিন্দু পুরাণের কাহিনী এবং তাতে ভক্তিরসেরই প্রাধান্য। গিরিশ ঘোষের নাটকগুলিতে সাধারণ হিন্দু সম্প্রদায় যেন আত্ম-আবিষ্কার করতে লাগল। একটা বক্তৃতার চেয়ে একটি শিক্ষামূলক নাটকের শক্তি অনেক বেশি। গিরিশ ঘোষের নাটকগুলিতে যুক্তিবাদ ঢাকা পড়ে গেল প্রবল ভক্তিবাদে। তারা প্রকাশ্যে নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দিতে সঙ্কোচবোধ করত—সেদিন তারা সকলের চোখ খুঁজানো আলোয় জগতের সঙ্গে হিন্দুত্বের জয়ঢক্কায় যেন নব বলে বলীয়ান হয়ে উঠল, ঠাকুর-দেবতায় যেন সব কিছু জীবন্ত হয়ে উঠল।

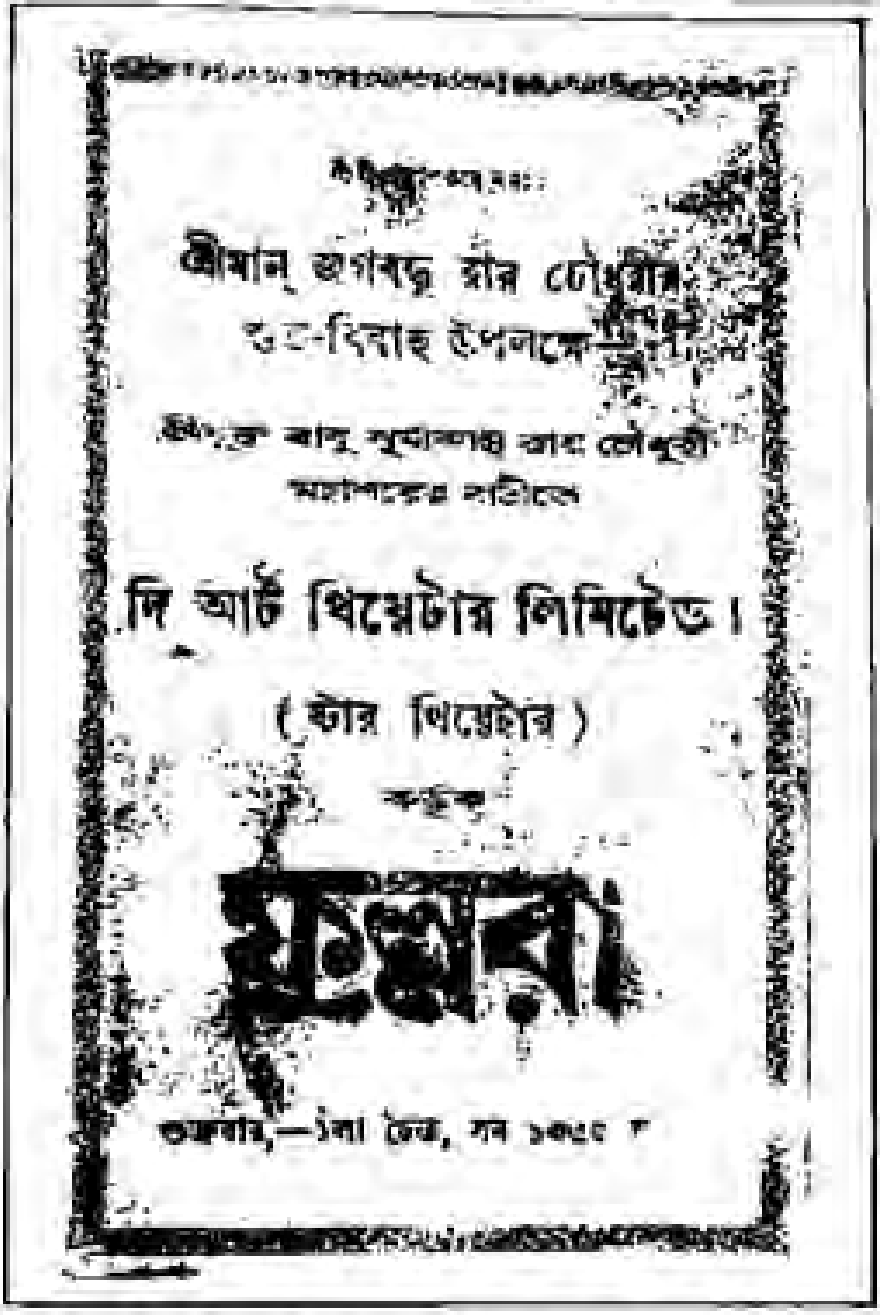

যাঁরা এখন অধিকাংশে মানুষই এসব, উপনিষদে পড়েননি বা কখনো চোখে দেখেননি, সেই সময় বেদ-উপনিষদ-গীতা প্রচারকারে শাখারাই আসলে প্রায়। বর্ষীয়ানের অধিকাংশ হিন্দুদের অতীত প্রায় জানাই, নিছক হিন্দু পরিবার ছাড়া ইতিহাস বা উচ্চারণের দর্শন সম্বন্ধে অধিকাংশেরই কোন ধারণা নেই, সেই সময় গিরিশ ঘোষের অভিনয়ের নাটকগুলি যেন জাতের অতীত গৌরবের একটা করে অধ্যায় তুলে ধরছে। তাই নাটক দেখতে এসে তাঁর গিরিশ-অনুরূপলাল-বিনোদিনীর অভিনয় দেখে না, তারা দেখতে পায় জীবন্ত শিব, বিষ্ণু, ভক্ত ধ্রুব, ভক্ত প্রহ্লাদ, চৈতন্যদেব ও শতিপরায়ণা জনকরাজাকে, যাঁরা সব হিন্দুদের আদর্শ।

"হাঁর থিয়েটার"-এর সমস্তের গৌরবজনক অধ্যায় ও যাদের নাটকের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনাকাল হল "চৈতন্যলীলা" নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার সময়।

১৮৮৪ সালে ২ আগস্ট তারিখে "চৈতন্যলীলা" নাটক প্রথম মঞ্চস্থ হয়। বিরিশ ফুলের বহিত ও নিবেদিত এবং "চৈতন্যলীলা" ছবিতে বিনোদিনী অভিনয় সমৃদ্ধ এই নাটক কথা আলোর চমৎকার অভিনয়ের মেলায় হয়। শুধু অভিনয়ে না, সেই সময়কার থেকে মানুষ ছুটে এসেছিল "হাঁর থিয়েটারে" চৈতন্যলীলা নাটক দেখতে। সেই সময় এই নাটকের গান ও সংলাপ লোকের মুখে মুখে ঘুরেছিল, হিন্দু সমাজ যেন আবার নতুন করে জাগছিল। হাঁর থিয়েটারে মঞ্চে চৈতন্য ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গের মধ্যে যেন আবির্ভূত হয়েছেন।

দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ ঠাকুর তাঁর ভক্তদের নিয়ে এই নাটকের অভিনয় করে ঐ থিয়েটার দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এক ধর্মান্ধ কাহিনীকারের লেখা সাধক যাদের কৃত্রিম ভাষা-ভাষায় গান লেখা—এ এক অদ্ভুত প্রস্তাব। সেখানে অভিনয়ের মধ্যেও কলহরক্ষ ভোগী-ভক্ত-শূন্য-মাতাল থাকে, তার থেকেও ভয়ঙ্কর, নারীরা সব বেশ্যা এবং নাটগুলির চরিত্রগুলির কোন বালাই নেই। তখন নাটকার ও পরিচালক গিরিশ ঘোষ প্রথাত মাতাল বলে পরিচিত। কোম্পানির প্রতি কৃপার দেখের গণ্যমান্য অনেকেই তখন থিয়েটার বর্জন করেছেন, এমনকি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তিনি নারীদের প্রতি ভক্তিতে সব কালের হিন্দির বেশ্যাদের নারীবৃত্তি অবলম্বন করার ব্যাপারে সহানুভূতি দেখাতে পারেননি। কেশবচন্দ্র সেন ও শিবনাথ শাস্ত্রীর দল এইসব থিয়েটার দেখা অতি পাপ বলে মনে করতেন, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুর তো তখনো সন্ন্যাসী নন, তিনি বলে থাকতে হবে। তিনি এই বেশ্যা অভিনয় দেখে নারীদের ঘৃণা করলেন না, তিনি বললেন আমি তাদের মা আনন্দময়ীরূপে দেখব।

১৮৮৪ সালের ২১ ডিসেম্বর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ "হাঁরে" "চৈতন্যলীলা" অভিনয় দেখতে এলেন। নটীশ্রেষ্ঠা বিনোদিনী নাট্যাঙ্গনের তখন গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় ভাবে

করার নরক। সেই নরকে পা দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, দেখলেন 'চৈতন্যলীলা', বাংলার নাট্যরূপের মৌলিক পরিবর্তনের সূচনা হল।

অভিনয়ের পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শিল্পীদের সঙ্গে দেখা করলেন, বিনোদিনীর মাথায় উপর হাত দিয়ে পাপ দেহকে পবিত্র করে বললেন 'মা তোমার চৈতন্য হোক'।

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে অল্পকাল সংযোগ রাখতে স্টার থিয়েটারের সঙ্গেই সংযোগ। এই সংযোগ থেকেই তার প্রভাব সারা রঙ্গমঞ্চের ছড়িয়ে পড়ে। বিনোদিনীকে তিনি মানুষের মর্যাদা দেন শিল্পীর সম্মান দেন। সেই সম্মান পায় মঞ্চের সকল শিল্পী। শুধু অভিনেত্রী, নয় অভিনেতারাও অনেকে 'পাপ'—সঙ্গে ঘৃণিতা থেকে উত্তীর্ণ হন এমনকি দর্শকদেরও পর্যন্তরে বলবার মতন কথা যে, তারা নটী—তারা দেখতে যাচ্ছেন না, যাচ্ছেন ধর্ম—কথা করতে। নির্দেশক ও মালিকরা এই ধর্ম সঙ্কীর্তন বাড়িয়ে যেতে লাগলেন। স্টার থিয়েটার প্রতিষ্ঠাপনে বড় হরফে ঘোষণা করতে লাগল—Soul-Dissolving Hari Sankirtan.

বিডন স্ট্রিট থেকে যখন স্টার থিয়েটার কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট বা বর্তমান বিধান সরণীতে উঠে এল তখনও এই রীতি বজায় থাকল। ১৮৮৮-র ২৪ মে বর্তমান স্টার থিয়েটারের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অমৃতলাল বসু গিরিশ ঘোষ রচিত কবিতা পাঠ করলেন—'হিন্দু প্রাণ কোমলতাময়, ধর্মপ্রাণ শ্রেষ্ঠ পরিচয়—ধর্ম রাখিবে।'

অবশ্য অন্তরঙ্গলিকরণে সেদিন নাটকের— নট ও নটী—পরিচালকদের অগোচরে সমাজ—সংস্কৃতি ও ধর্মকে রক্ষা করতে 'স্টার থিয়েটার' যার একটি সাধারণ রঙ্গালয় হবার কথা ছিল, সেই দিকে পদক্ষেপণ অল্প মাত্রা শুরু হয়েছিল—সে এই পর্বে পাপ রঙ্গালয়। সাধারণ রঙ্গালয় হয়ে গেল ধর্ম রঙ্গালয়। অনেকের কাছেই তখন হিন্দু—ধর্ম—জাতীয় প্রায় সমার্থক হয়ে গেল।

অভিনেত্রী বিনোদিনীর একটি পোজ

পরবর্তীকালে স্টার থিয়েটার গৌরবের পালকে আরও উজ্জ্বলতা সংযোজন করেন পথিক স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতার স্টার থিয়েটার পদার্পণ। ১৮৯৫ সালে শিকাগো ধর্মসভা থেকে ফিরে আসা দিগ্বিজয়ী বীর সন্ন্যাসীকে সংবর্ধনা জানানো হয়েছিল এই স্টার রঙ্গমঞ্চে। ১৮৯৮ সালে ১১ মার্চ স্বামী বিবেকানন্দ স্টার থিয়েটারে এক নাগরিক সভার আয়োজন করেছিলেন, উদ্দেশ্য—মিস মার্গারেট নোবেলকে কার্যকরীর সঙ্গে পরিচয় করানো। সেদিন স্টার থিয়েটারে উপস্থিত বিশিষ্ট নাগরিকদের সামনে প্রারম্ভিক ভাষণ দিয়ে স্বামীজী বলেছিলেন—

'ইংলন্ড আমাদের একটি উপহার দিয়েছেন—মিস মার্গারেট নোবেল'। এরপর ভগিনী নিবেদিতা বক্তৃতা রেখেছিলেন, তার বক্তব্যের বিষয় ছিল—Influence of the Spiritual Thoughts of India in England.

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের স্বাধীনতা আন্দোলনে স্টার থিয়েটারের ভূমিকা ছিল উজ্জ্বল। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনে বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার দিনে প্রতিবাদ স্বরূপ শোক দিবস পালন করতে ওইদিন অভিনয় বন্ধ রাখা হয়।

ষষ্ঠেন্দ্র গুহ রায়

রাজসিংহ

এরপর দীর্ঘ পত্রালিকায় বঙ্গদেশে ছয় সম্প্রদায়ের এমন কোনো একটির সেই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্তিতে ঘটে উঠছিল উপস্থিতি ঘটেনি। বিভিন্নজাত থেকে বিশিষ্টজনের এবং এলাকার উচ্চবর্ণের সংখ্যা তিন চতুর্থের তাদের অধিকাংশ সমিতিতে ঘটেছে এই ঘটনা। অভিনেত্রীদের ক্ষেত্রেও বিনোদিনী থেকে আশুবালা এবং এক্ষেত্রের সবিত্রী-সুত্রিতারা এই ভাষায় ব্যবসায় সমিতি। পত্রালিক সংবেদনের প্রতীক এই নাট্যমঞ্চিক বঙ্গসংস্কৃতির ও সামাজিক সম্মোহনের ঐতিহ্যের আবহ বাহে ১৮৯৩-তে ১২ অক্টোবর তারিখে অভিনয়ে সম্পূর্ণ কর্মীভূক্ত হয়। স্টার কাজে ইওয়ার পর বই-পাড়ার হকাররা কলকাতা বুদ্ধিজীবিরা বিবৃতি দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী এলেন ঘরবাড়ির বিবৃতি দিলেন। সেইদিন পর্যন্ত স্টারে অভিনয় করে যাওয়া আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রযোজনা পরিচালকের যেন্দ্রনাথ অভিনেতা কর্মীভূক্ত স্টার থিয়েটারকে দেখতে আসার প্রয়োজন বলে একলেনই না টিকিট বিবৃতি দিয়ে বললেন যে স্টারে নিয়ে তারবিহি না তারবিহি অভিনয়ের নাটিকটা কোন স্থলে এখন অভিনীত হচ্ছে। অভিনয়ে কর্মীভূক্তর পর বিবৃতির লড়াই, প্রতিযোগিতার জন্যায় ছেলে নিয়ে পত্রালী প্রতীম, আমাদের প্রধান প্রতীয় ভারকারাজির স্মৃতি কথা, রঙ্গ নাট্যের দীর্ঘদীন 'স্টার থিয়েটার' অভিনয় অভিনয়ে অবহেলের পরেছিল বিগতে কল অবশ্যে। আমরা কিন্তু নাট্যপ্রেমী মানুষ প্রত্যন্ত নাটিকরে, রঙ্গনা থিয়েটারের কর্মীবার শ্রীগণেশ মুখোপাধ্যায়কে সভাপতি করে ১৯৯১ সালে ২২ নভেম্বর স্টার থিয়েটারের 'সাপ্তাহিক সভা' আয়ুন করে 'স্টার থিয়েটার পুনর্নির্মাণ কমিটি' গঠন করেছিলাম। বিগত কল বন্ধের ধারে ছাড়া সরকার, পুরসভা এবং অভিনেতা অভিনেত্রীদের সরকার কর্তৃপক্ষের কাছেও স্টার থিয়েটারের জন্য কারোর ঘুম ভাঙানো যায়নি, বলিব ১৯৯২ সালে তৎকালীন কেন্দ্রীয় তথ্যমন্ত্রী স্বর্গীয় সাহেব শ্রীমতিভূষণ শীলা কেন্দ্রীয় সরকারি দল পাঠিয়ে স্টারের সমস্ত বিষয়গুলি খতিয়ে দেখে স্টার পুনর্গঠনে মাত্র তিন কোটি টাকার পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য যৌথ উদ্যোগে এই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। এই নিয়ে নট-নটী, বুদ্ধিজীবি, অভাবুকলী, মন্ত্রী—অনেকের সমাবেত অনোভাবের ঘুলা—ছাই উঠে উঠে তখন আমি মৃত্যুর উপক্রম তখন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু তাতে জল ঢেলে দিলেন। স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, সরকারি অধিগ্রহণের কোন প্রশ্নই ওঠে না, কারণ স্টার থিয়েটারের সম্পত্তিকার নিয়ে আইনগত জটিলতা আছে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে স্টারে কোন আইনগত জটিলতা ছিল না।

গুপ্তধনের অধিক মালিক এবং এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক (যার কাছে এই জমি বন্ধক রেখা হয়েছিল ১৯৩৩ সালে) ছাড়া আর কোন প্রকৃত আইনগত দাবিদার ছিল না।

এর ফলে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্তে পৌঁছান, কারণ সেই কেন্দ্রীয় সরকারের অধিক মাত্রার সালকলনের সম্পর্কের উপর অনেকটা নির্ভরশীল ছিল।

কিন্তু নতুন সমস্যাকে কেন্দ্রে নতুন জোট সরকার ক্ষমতা আসতেই আমরা ছুটে গিয়েছিলাম সাংস্কৃতিক মন্ত্রক অভিনেত্রী কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বানার্জির কাছে। তিনি আমাদের আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে সরাসরি টাকা সরকারকে দান দিয়ে স্টার থিয়েটারের জন্য কিছু করা সম্ভব নয়। কিন্তু সাহায্যই অনাকলো পুরসভার নির্বাচন, পুরসভায় ফিরে আসার এক অবস্থায় আমরা তাঁকে জানাই ছবি দিচ্ছি, আমরা স্টার থিয়েটারকে চেষ্টা করবই।

মমতা বানার্জির সেই প্রতিশ্রুতিকে সামনে রেখেই অনাকলো পুরসভায় নতুন বোর্ড গঠিত হতেই ছুটে গিয়েছিলাম অনাকলোর নতুন মহানাগরিক শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায়ের কাছে, তিনি আমাদের তথ্যমন্ত্রী থাকার সময় প্রয়োজনে বহুবার কাছে যাত্রা ও নাট্য শিল্পকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন।

মাননীয় মহানাগরিককে আমরা জোরালো সঙ্গে বলেছিলাম যে স্টারে কোন প্রতিবন্ধকতা জটিলতা নেই। তিনি বুঝেছিলেন এবং যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে এক মুহূর্ত দেরি করেননি এই সাংস্কৃতিকপ্রেমী মানুষটি। এর পরের ইতিহাস আপনাদের সকলেরই জানা।

২০০১ সালে ৯ ফেব্রুয়ারি স্টার থিয়েটারে পুরস্কার অভিনেত্রী নোটিস ঝুলল। ১১ ফেব্রুয়ারি স্টার থিয়েটার পুনর্নির্মাণ কমিটির তাকে গণ পদযাত্রায় অভাবুকলী, রাজনীতিবিদ শ্রীত্রিদিব, বুদ্ধিজীবি সহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের উপস্থিতিতে গাজার হাজার মানুষের মশাল হাতে নিয়ে বিনোদ মোহের বাড়ীর সামনে থেকে মহানগরীর পথকে উজ্জল করে আমাদের পড়ল স্টার থিয়েটারের সামনে। মানুষ আনন্দে আপ্লুত যে স্টার আবার পুনর্গঠিত হবে।

এই মহালগ্নের মহাযজ্ঞ সম্পূর্ণ হল গত ৭ মার্চ ২০০১ সালে স্টার থিয়েটারের নব ভবনের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে। এই নতুন ভবনের শিলান্যাস করলেন মাননীয়া রেলমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বানার্জি এবং অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করলেন মাননীয় মহানাগরিক শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায়। বঙ্গ সংস্কৃতির এই মহান তীর্থ নাট্য শীঠকে আবার জমজমাট প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বাংলার সাংস্কৃতিপ্রেমী ও সমস্ত মহাজন মানুষ সমবেতকল্পে আজ শ্রীমতী মমতা বানার্জি ও শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায়কে আন্তরিক সম্মানের সঙ্গে স্মরণ করবেন।

স্টার অধিগ্রহণ নিয়ে কলকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের অভিমত

গত ১০ ফেব্রুয়ারি কলকাতা পৌরসভার পক্ষ থেকে স্টার থিয়েটার অধিগ্রহণের এক বিজ্ঞপ্তি স্টার থিয়েটারের দেওয়ালে আটকে দেন মহানাগরিক সুব্রত মুখোপাধ্যায়। এর পর ৭ মার্চ কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী মাননীয়া মমতা ব্যানার্জি স্টার থিয়েটার পুনর্নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এই উপলক্ষে এক অনুষ্ঠান ওই দিন অনুষ্ঠিত হয়। স্টার থিয়েটার অধিগ্রহণ কলকাতার বুদ্ধিজীবীদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল। এই উপলক্ষে বিশিষ্ট কিছু মানুষের অভিমত এই প্রতিবেদনে রাখা হল। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন ও অনুলেখন করেছেন শুভেন্দু রায়।

—সম্পাদক

রামকুমার চট্টোপাধ্যায় (বিখ্যাত গায়ক)

এটা ছিল 'থিয়েটারপাড়া'। একদিকে তখন ছিল মনমোহন থিয়েটার, ছিল 'মিনার্ভা'। ছিল 'নাট্য নিকেতন' আর ছিল 'স্টার'। কিন্তু কলকাতা তথা বাঙালিদের মনে 'স্টার' নামটার একটা আলাদা মনন, আলাদা ঐতিহ্য ছিল। এটার সঙ্গে অন্যগুলো মিলত না। এই 'স্টার' যখন বিডন স্ট্রিটে প্রথম নির্দিষ্ট হয়, তখন গিরিশ ঘোষের পরিচালনায় 'চৈতন্যলীলা' নাটক দেখতে 'ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব' এসেছিলেন। পরে 'স্বামী বিবেকানন্দ' অনেক এসেছেন এখানে। এই 'স্টার' নামটার প্রতি বাঙালিদের দুর্বলতা অনেকদিনের। সেটা এইভাবে পুরো অতীতজুড়ে এবং দীর্ঘদিন ধরে এইভাবে পড়ে থাকতে সাংস্কৃতিমনস্ক বাঙালিরা মনস্কুণ্ণ ছিলেন।

কলকাতা কর্পোরেশন সেটাকে অধিগ্রহণ করায় আমার বাঙালির মনে এক 'স্বাধীন আনন্দের' সূচনা হয়েছে। আমরা আলো দেখতে পাচ্ছি 'স্টারের' পুনর্জীবনের। যদিও বর্তমানকার দিনের মতো অডিয়েন্স-অডিয়েন্সী এখন আর নেই, হয়তো বা অতীতের মতো করে আর গড়েও তোলা যাবে না। বিখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্বদের Oil Painting ছিল সেখার মতো। সেগুলো সবই পুড়ে গেছে। আরও অনেক কিছুই ছিল যা আর পাব না। নতুনভাবেই যদি গড়িত হয়, তবুও ওই 'স্টার' নামটাই লোকেদের মনে একটা রোমাঞ্চের অনুভূতি জাগাবে।

মাননীয়া মেয়র ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অসংখ্য ধন্যবাদ এমন একটা সিদ্ধান্ত নেবার জন্য। অনেক লোকই আমায় জানিয়েছেন 'স্টার' যদি আবার পুনর্গঠিত হয়, তাহলে বাঙালির কাছে এ এক বড় পাওয়া এই শতাব্দীতে।

মাধবী মুখার্জী (অভিনেত্রী)

পুজো আসার আগে স্টারের শেষ নাটক ছাড়ি অভিনয় করেছিলাম। নাটক 'ঘরের বিদেশ'। সৌম্যিত্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় টীমওয়ার্কে জমজমাট হয়েছিল নাটকটি। রবি ঘোষ, তরুণকুমার, শ্রীলা মজুমদার এবং আরও অনেকে ছিলেন এই নাটকে। ঠিক পুজোর মুখে, বোধ হয় মাসীর দিন রোহে এই নাটকের প্রযোজকদ্বয় অনুপকুমার ও রমাপ্রসাদ আমায় ফোন করে জানালেন যে, স্টার পুড়ে গেছে। আমি গিয়ে যেটা দেখলাম সেটার সঙ্গে বোধ হয় একমাত্র পাহাড়ি এলাকায় বনের সঙ্গে তুলনা করা চলে। 'চারদিকে কেবল যায় না সেই দৃশ্য। এমনটি জানা যায় না। যাই হোক আমরা কয়েকজন মিলে মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে Appointment করলাম স্টার নিয়ে কথা বলার জন্য। সেদিন আমাদের Appointment ছিল সেদিন আমরা গিয়ে শুনলাম যে, মন্ত্রিমশাই একটু আগেই বেরিয়ে গেছেন বিশেষ কাজে। খুব অবাক হলাম। যাই হোক এর পরে আর একদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ওনার বাড়িতে দেখা করে ওনাকে সব কথা খুলে বললাম। উনি আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে একটা টাইম করিয়ে দিলেন। আমরা গেলাম। আমরা ওনাকে বললাম যে, রাজ্য সরকার যদি স্টারের জমিটি লজ্জ নেন, তবে আমরা হল তৈরির চেষ্টা করতে পারি। উনি সব কিছু খুব মন দিয়ে শুনলেন। কোনও কথা বললেন না। সেদিন এই বৃষ্টির মধ্যে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলাম। বুদ্ধদেববাবুও সেদিন ছিলেন সেখানে। আমরা বলেছিলাম, আমরা যাঁরা অভিনয় করি তাঁদের দিন ঠিক চলে যাবে, কিন্তু যাঁরা কর্মী তাঁদের কি হবে ? বুদ্ধদেববাবু বললেন, এঁদের তার 'অভিনেতৃ সংঘ' নেবে। বলা বাহুল্য, অভিনেতৃ সংঘ কিছু তার নেয়নি। এই প্রতিক্রিয়াশীল সরকার চালানো।

গত ন-দশ বছর ধরে যাঁরা আমার মতো অনেকেই আসার চেষ্টা করে গেছি কিন্তু একটা জায়গায় ছিলেন। বিশেষে যখন যেটি তখন ওখানকার প্রবাসী বাঙালিরা প্রশ্ন করেছে, কেন আমরা কিছু করছি না স্টারকে পুনর্নির্মাণের ব্যাপারে। ওরা এটাও বলেছিল যে, আপনারা যদি 'স্টার' বানানো শুরু করেন, আমরা প্রতিটি ইটের জন্য ৫০০০ টাকা করে দেব।

যাই হোক, তখনকার রাজ্যপাল শ্যামল সেনের সঙ্গে নিয়ে বলেছি আমাদের ইচ্ছার কথা। উনি খুব ভাল ব্যবহার করেছেন। ছবিটি অনুপকুমারও খুব চেষ্টা করেছিলেন। এরপর অজিত বাঁড়ুজ্যে বলেছিলেন যে, আপনি তো ঠাকুরের 'অভিনয় করছেন 'নটী বিনোদিনী' নাটকে। নটীদের কষ্টটা তো আপনি বুঝতে পারছেন। পারেন না কিছু করতে নটীদের জন্য ? উনিও বললেন চেষ্টা করব।

অবশেষে মুখ্যমন্ত্রী দেখা হওয়ার পর ওনাকে বললাম কিছু একটা করতে। উনিও বললেন চেষ্টা করবেন। কিন্তু বিধান সভায় বাজেট পেশ করার দিন আমাদের ডেকে পাঠালেন। তখন, ওনার মুখে শুনে আমরা তো অবাক। উনি বাজেট পেশ করার পরে বলা কথাটা যে সাংবাদিক উনি আমাকে করে দেখবেন তা প্রথমে ভাবিনি। প্রথমে লজ্জায়, তারপর হিস্টিরিয়ার ব্যাপার—তখন মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীবাবুর এটা ঐকান্ত প্রতিক্রিয়া ছিল না। আমার ধারণা, এই জন্য তখন মুখ্যমন্ত্রী, তখনকার কালচার ও তথ্যদপ্তরে দেখিয়েছিলেন আমাদের সাথে একটা দৃষ্টিভঙ্গি রাখবেন।

অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় (বর্ষীয়ান অভিনেতা)

'স্টার'-এর সঙ্গে আমার সম্পর্ক উনবিংশের। আমার অভিনয়জীবনের শুরুতেরে মুখের সমস্তটাই 'স্টারে কেটেছে। মনে হয় যেন আজকে বিশে আমার 'স্টার'। কি মহান ইতিহাস জড়িয়ে আছে এই রঙ্গমঞ্চের। বিনোদিনী দেবী অবশ্য জায়গায় টাকাটি করে, মহিলাদের টাকা এবে দিয়ে এই স্টারের জমি কিনতে সাহায্য করেছিলেন। অবশ্যকলকাতার দিনে এটা ভাবা যায় ? আমরা সব অভিনয় করে গেলাম এই রঙ্গমঞ্চে। পরে কাঁটা দিয়ে ওঠে সেই সব দিনের কথা মনে করতে বা বলতে গেলে। এটা তো আমার কাছে এক 'পীঠস্থান'।

তাই যেদিন কর্পোরেশন শুনলাম 'স্টার' পুড়ে গেছে, সেদিন মনে হয়েছিল আমার নতুন করে 'আত্মহত্যা' হলো। তার পরে এই কদিন/এগারো বছর ধরে তো অনেক কথাই শুনলাম। কিন্তু সবই ওই 'কুমিরের কান্না'।

তাই এখন যখন দেখছি আমার নতুনভাবে 'স্টার'কে গড়িয়ে তোলার জন্য 'মেরকলাহের' নিজে এগিয়ে এসেছেন, তখন এই আনন্দ আমার প্রকাশ করতে পারব না। এর থেকে বড় কাজ আমার কাছে আর কিছুই হয় না। কোনও প্রশ্নই ওঠে না এ নিয়ে। সঠিক পদক্ষেপ।

এই জন্যই ঘরীরের যদি আমাদের কোনও কাজে প্রয়োজন হয়, আমি রাজি। অসংখ্য ধন্যবাদ 'মেরকে'কে। ধন্যবাদ 'আনন্দবাজার গ্রুপ'কে। পরিশেষে, পুরনো দিনের ঐতিহ্য নিয়ে গড়ে উঠুক 'স্টার' থিয়েটার।

লিলি চক্রবর্তী (অভিনেত্রী)

'স্টার' থিয়েটারের কথা আমার একটা আলাদা দুর্বলতা আছে। আমার নাটকে প্রথম আত্মপ্রকাশ এই স্টারেই 'মেয়েলী' নাটকে। ছবি বিশ্বাস, কমল চৌধুরী, সাবিত্রীদি এবং আরও অনেকে ছিলেন এই নাটকে।

যেদিন 'স্টার' পুড়ে গেল, সেদিন মনে হয়েছিল একটা আত্মীয়বিয়োগ হল। তারপর অনেকেই অনেক কথা বলেছেন, কিন্তু কিছুদিন হয়েছে, কিন্তু শেষ আশাটা কেউই করে ওঠেননি।

তাই যখন কলকাতার মেয়র বললেন যে, স্টারকে অভিনয়ের জন্য আমার নতুন করে গড়া হবে—তখন প্রথমেই আনন্দ পেলাম। এটা একটা দৃষ্টিনন্দনের কাজ হবে বলে বিশ্বাস করি। ওনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

অরুণকুমার (অভিনেতা)

সেদিন রাতে বাড়ি ফিরে খাওয়াদাওয়া সেরে শুতে শুতে একটু বেশি রাতই হয়েছে। হঠাৎ ফোনের দিকে ফোনের আওয়াজে ঘুমটা ভেঙে গেল। যে খবরটা শুনলাম, তাতে মনে হল 'কিন্নরকণ্ঠের' কথা যেমন আমার মুখস্থ, তেমনি ওর সুরও। ১৯৬১ সালের অক্টোবর মাস, স্টার খুলে গেল। মঞ্চের সঙ্গে ছুটে গেছিলাম। তাদের একেবারে কাছ ঘেঁষিনি না। আমার সঙ্গীত শিক্ষক বিনয় এটাকে প্রথম দেখি এখানে। এখন সেটা জাদুঘর। একতলা যে মেকআপরুমটা সেটা আগে এখনও, ছাদে ওঠার সিঁড়ি দিয়ে নেমেছি, ছবিগুলি গায়ে আছে। 'শ্রীরঙ্গম' নামে আরেকটি থিয়েটারের গেট আমাদের পুরনো বাড়িটার। কাল ওখানে নাটক করেছেন, আমার দুটি সুরকার করেছি, আমিও গুনগুন নাটক করে নিজেকে বলা যায় করেছি। কত বড়ো-বড়োদের মূর্তিবিজড়িত এই 'স্টার' থিয়েটার। তাদের শ্রীরঙ্গমের অভিনেতারা এই থিয়েটার।

বুদ্ধি এটা যখন খুলে গেল, তখন বাবার আপিসে ফেরা, ফেরারপথ (?) এবং তাঁদের নিজস্ব 'অফের খুঁ' রঙ্গমঞ্চের মতো অনেক মিটি অফে ফেলল, কিন্তু Consistent কথা কেউই বলল না।

অত বড় বাড়ি হাত শুধু ফেরেনি, কিছুই কি করা যায় না ? বিটির সময়ে যখন শ্যামবাজারের রাস্তা দিয়ে আসতাম তখন দেখতাম, যেন শ্রীরঙ্গম ছাড়া পেয়ে 'থিয়েটারপাড়া'। নাটক না হয়ে 'রঙ্গমহল' ছাড়া পেরা হচ্ছে বিয়েবাড়ির জন্য, 'বিশ্বরূপা' ছেড়ে 'চুনটি বাড়ি' হচ্ছে—ভাবা যায় এটা ?

এমন সময় হঠাৎ একদিন সুরত মুখার্জি বললেন, স্টার নিয়ে একবার একটা কিছু করব। প্রথমে একটা Mass Rally হল। তারপর ডিস্ট্রিবিউটরদের ছাপল হল। আমি বললি, মুরতবাবু এবং মমতা ব্যানার্জি ছিলে যে সবু প্রস্তাবটার সূচনা করেছেন—সেটা বাস্তবায়িত হলে বলেই আমার বিশ্বাস। শুধু বিশ্বাস নয়, এটা ঘটবেই।

ঠাকুর বলেছিলেন, বিভিন্ন ঘোড়ায়—"ওরে নাটক কর, ওরে সেরেসিনে হয়"—সেই সোনালিকাকে বাঁচানোর জন্য, স্টারকে বাঁচানোর জন্য বাঁচের প্রত্যেকটির সাধুবাদ জানাই।

মুরোত্তম ভৌমিক (লেখক ও সাংবাদিক)

'স্টার' থিয়েটারের অধিগ্রহণ সম্পর্কিত যে খবরটা শুনছি, সেটা যদি শেষ পর্যন্ত হয় তাহলে এটা বাংলা নাটকের পক্ষে নিশ্চয়ই মঙ্গলজনক পদক্ষেপ। স্টারের মতো ঐতিহ্যপূর্ণ একটা রঙ্গমঞ্চকে যদি কলকাতা পৌরসভা অধিগ্রহণ করে আবার পুনর্নির্মাণ করে, তাহলে সেটা সাধুবাদ জানানোর মতো কাজ। বাংলা পেশাদার থিয়েটার এরা অনেক উত্থানপতনের মধ্যে। উত্তর কলকাতার পেশাদার নাটক আবার অতীতের গরিমা ফিরে পাবে। এরা পাশে আমার জোরার আসবে নতুনভাবে নাটক স্টারের হাতছাড়া। কলকাতা পৌরসভার মেয়রকে আমার আন্তরিক প্রতিনমস্কার জানাই এমন একটা কাজ করার জন্য। কাজটি সফল হোক—এটাই আমার বাসনা।

পি সি সরকার (জুনিয়র)

স্টার থিয়েটারের ইতিহাস ঈর্ষণীয় সমৃদ্ধ। এটা যখন খুলে হয়, তখন সবচেয়ে বেশবানী, বিশেষ করে বাঙালিরা যেভাবে সাড়া পেয়েছিলেন। আমিও কটি পেয়েছিলাম খুব ছোটবেলাতেই। বছর কয়েক আগে যখন এটা আর বিক্রি প্রতিষ্ঠানটির হাতে তুলিল। আজ যখন আবার নতুন করে স্টার খেলে উঠতে চলেছে—তখন একজন সৃষ্টিশীল মানুষ হিসেবে, বাঙালি হিসাবে আমি খুবই খুশি।

তবে আমরা অনেক আশাই শুরু করি, কিন্তু শেষ করি না। লক্ষ রাখতে হবে যে, কাজটা যেন শেষ করা যায়। থিয়েটার হলকে সাজিয়ে তোলা বা রাখা অবশ্য কাজ নিশ্চয়ই, কিন্তু আমার মনে হয় তার থেকেও বড় কাজ শিল্পীদের বাঁচিয়ে রাখা। মুখ্য শিল্পীদের বাঁচানো। এটার দিকেও নিশ্চয়ই কলকাতা পৌরসভা নজর দেবে।

আশার এই জনুবিধা—এটাও আমাদের। এগুলোও সবদিকে ভাবতে হবে। সব মিলিয়েই তো একটা শিল্পের পরিবেশ গড়ে ওঠে। সব শেষে কলকাতা পৌরসভাকে অভিনন্দন জানাই এমন একটা পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

'স্টার' থিয়েটার যে কলকাতা পুরসভা অধিগ্রহণ করেছে, তা আমি কাগজে পড়েছি। অধিগ্রহণ ব্যাপারটা যে কোথেকে আসে। তার পরে অডিট-অডিট, মালিকানা ইত্যাদি আরও কতদূর আছে। সে সবের সুষ্ঠু সমাধান না হলে অধিগ্রহণের কাজটি কখনই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় না। তবে একথা ঠিক যে কলকাতার এই মুহূর্তে একটা জনবহুল অঞ্চলে 'স্টারের' মতো এক প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী সৌধ এতদিন বন্ধ অবস্থায় পড়ে আছে—এটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা। সৌধটিকে কেবল প্রতিষ্ঠান বা ফেলে আবার নতুনভাবে খুলতে চাইছেন—এটা একটা ভাল প্রচেষ্টা। কিন্তু এই অবস্থাটা কতদিন থাকবে বা এটাকে নতুনভাবে শুরু করতে গেলে যে নিরলস প্রচেষ্টা থাকা দরকার সেটা সবার থাকবে কিনা, বা হলে হয়তো এটা আবার পরিত্যক্তই পড়ে থাকবে। এ বিষয়ে বাঁদের অভিজ্ঞতা অনেক তাঁদের সামনে দেখেছি বলেই ভয় পাই।

স্টার থিয়েটারের নাটকে একটা বর্ণাঢ্য বিনোদনের ব্যাপার থাকত। নতুন নতুন কথা প্রযুক্তি যে হত নাটক নিয়ে তা নয়।

আই আমাদের যৌথনকলে 'স্টার' থিয়েটারে যে নতুন করে কিছু একটা করেছিল তা মনে হয় না। কিন্তু কর্মক্ষ টানছে। নটিক ভালো। বেশির ভাগই নিশ্চয় অভিনেতা-অভিনেত্রী নিয়ে।

'স্টার' থিয়েটার শুরু হবার আগে শর্ত একটাই হবে এসেছে। সেই জনপ্রিয়তা কিন্তুটা ম্লান হলেও একেবারে 'ইলেকট্রনিক মিডিয়া'র দিন শুরু হয়ে গেছে। টিভি, কেবল টিভি, সিনেমার দাপটে নাটক কিন্তুটা হলেও শিল্প হটিয়ে রাখা হল। এটা কিন্তু ওই যৌথিন নাটি জনগণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এমনকী যে বয়োপাসা প্রাক-পঞ্চাশে ভরিয়ে রাখতে আগ্রহও কিন্তুটা তাটা পড়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গেই সব পালটাচ্ছে। থিয়েটার সাজানোর ব্যাপারে কোনও প্রশ্নই হলে, বিশেষ করে এটা একটি যে ওল্ড প্রশ্নটা তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু টাকার অভাবে এবং জনগণের সচিত্রভাবে পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে নাটকের ধারাটি কিন্তু নীচে টিনে ওকিয়ে আসছে। এখনও ঠিক তাটা প্রকট না হলেও, হচ্ছে। তাই নাটককে বাঁচিয়ে রাখার কথাও ভাবতে হবে। 'স্টার' থিয়েটারকে অভিপ্রেত করার পরের আজটা কিন্তু আরও বাধাসঙ্কুল। অনেক মানা আসবে। সবকিছুর পরেও আজটা হলে বাঁচিয়ে রাখবে। ওভেচ্ছা জানিয়ে রাখলাম উদ্যোক্তাদের।

চিত্রাময়ি কর

স্টার থিয়েটারকে বাঁচানোর দরকার আছে। কিন্তু তার মধ্যে যেন কোনওরকম দলীয় কোপন না থাকে।

আমার যখন ন বছর বয়স, তখন আমি স্টারে প্রথম নাটক দেখি "প্রফুল্ল"। তখন স্টারের রমরমা রীতিমতো। এটা একটা ঐতিহ্যপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। সকলে মিলে চেষ্টা করে এটাকে আবার গড়ে তোলা উচিত।

তবে একজন স্বাধপ্রেমিকী হিসাবে বলতে চাই পড়া হয় যেন ঠিক বাগের শিল্পীটিকে বজায় রেখেই। কেননা এটা ছিল উনবিংশ শতাব্দীর এক নিদর্শন। ওটার পরিবর্তন করলে স্টারের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে। শুভেচ্ছা জানাচ্ছি পুরসভাকে।

পরিতোষ সেন (চিত্রশিল্পী)

এই দিনের একটা ঐতিহ্যপূর্ণ প্রতিষ্ঠানকে আবার গড়ে তোলার প্রচেষ্টাকে আমি সমর্থন জানাই। পুরনো অনেক কিছুই আমরা হারিয়েছি, যাচ্ছি। কিন্তু সেগুলো না করলে ভবিষ্যতের দিকে চলা যায় না, যায় না। এই ধরনের প্রচেষ্টা যা বাঙালির মনস্তাত্ত্বিকতাকে জানে বাঁচিয়ে রেখে, বিশেষ করে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালির শিক্ষা-সংস্কৃতি-কৃষ্টি—তা রক্ষণাবেক্ষণে এগিয়ে আসে। আমার পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা এই উদ্যোক্তাদের প্রতি।

শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় (অভিনেতা)

অভিপ্রেত করার পরে যদি সত্যি সত্যিই আবার 'স্টার'কে পুনর্গঠিত করা সম্ভব হয়, তাহলে তার থেকে ভালো আর কিছুই হতে পারে না। তবে 'যদি' কথাটা এখানে ব্যবহার করলাম এই জন্য যে 'স্টার'-কে নিয়ে এত অতীতি জড়িয়ে আছে যে, সেগুলোকে জড়িয়ে এসে 'স্টার' পুনর্নির্মাণ করাটা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। তবে একথা ঠিক যে নতুন প্রায় 'স্টার' আবার তৈরি হোক। এ নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই। অন্তত আমার নেই। এ কাজটা যেন ব্যবসাদের হাতে না যায়। যেটা হবার প্রচুর সম্ভাবনা আছে। কেননা যে সমস্ত অতিনি অভিনেতার জন্যে আজকের তাঁরা কেউই খুব সুবিধের লোক নন। এটা তাঁরাই আগ্রহ সত্য। সুতরাং কাজটি ব্যবসাদের হাতে চলে গেলে নাটকের কোনও উপকার হবে না। তাই পুরসভা অন্তত পক্ষে যদি সবকিছু করেলা তিনিয়ে এটিকে বাস্তবায়িত করতে পারেন, তাহলে তাঁরা নিশ্চয়ই জনগণের মনে জায়গা করে নেবেন।

সুস্মিতা মুখোপাধ্যায় (অভিনেত্রী)

আমি জীবন খুশি। যাতে নাটকের কর্মীদের জন্য 'স্টার' আবার তৈরি হোক। সমস্যাকে ঘিরে আসুক পুরনো দিনের জমজমাট্টা যাঁরা এখনও বেঁচে আছেন। 'স্টারের' পুরনো কর্মীদের যে কয়েকজন এখনও আছেন এখনি, তাঁর সহযোগিতা হোক। ইতি ছুটুক তাঁদের অভাব-পরিস্থিতির মুখ। ধন্যবাদ জানাই জনগণা পুরসভা ও তার 'মেয়র'কে। 'স্টার' আবার তার পুরনো গরিমা ফিরে পাক।

পি কে ব্যানার্জি (ফুটবলার)

বাঙালির ঐতিহ্য রক্ষার ক্ষেত্রে ঠিক কাজ করেছেন পুরসভা। অনেকে অনেক কথাই বলবেন। কিন্তু বাঙালির এই ঐতিহ্যপূর্ণ রঙ্গালয়কে বাঁচানোর জন্য যে কোনওভাবেই সবাইকের এগিয়ে আসা উচিত ছিল। সেটা সুব্রতবাবু করেছেন। এক এক করে তো আমরা সবই হারাচ্ছি ক্রমশ। আগে সেগুলো বাঙালির নিজস্ব ছিল, তার অনেক কিছুতেই আমরা আজ নিষিদ্ধে। বাঙালির নাটক এক সময় সারা ভারতবর্ষ জুড়ে প্রভাব ফেলেছিল। এমনকী স্বাধীনতা যুদ্ধেও পরোক্ষভাবে প্রভাব ফেলেছিল বাঙালির নাটক। সেই ভালো নাটককে ফিরিয়ে আনার জন্য, রঙ্গালয়কে বাঁচিয়ে রাখার জন্য পুরসভার এই প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানাই।

নিভা মিত্র (অভিনেত্রী)

আমরা যখন স্টারে অভিনয় করেছি, তখন স্টার মানে 'বাঙালি', আর বাঙালি মানেই 'স্টার'। দারুণ আড্ডাবাজ সেইসব দিন। জীবন মানুষের সঙ্গলাভে যেমনই আনন্দময় হোক না কেন, কোনও শিল্পীর জীবনের এই থেকে বেশি কিছু চাওয়ার থাকতে পারে না। আমার বাবা রোজ দিন কিংবা আগে, তারপর আমরা স্টারে যাব। তবে এবার 'অনিল' হবে। বড়দা বলেছে। তবে অভিনয়ের ইচ্ছা যে হয়নি, তা নয়। সব শিল্পীর-ই ইচ্ছা থাকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অভিনয় করার। কিন্তু সময়ের সঙ্গে মানিয়ে নিতেই হয়। তাই নতুন দিনের নতুন প্রজন্মের কাছের মঞ্চ ছেড়ে আমরা আমাদের অতীত মিনার্ভাকে ফিরে পাব। 'স্টার' পুড়ে যাবার খবর শুনে চোখের জল আটকে রাখতে পারিনি। ছিল-এর দিন বাবারাজারা বন্ধ ছিল। নিজের বাড়ি আর 'স্টার'কে কখনও আলাদা ভাবিনি। তাই সব সময়ই ভাবতাম যে আগে 'স্টার' আবার হবে কি না। কলকাতার আবার হো ? শেষ না হলে কিছুই বলা যায় না। তাই যখন শুনলাম যে পুরনো 'স্টার'কে অভিনয় করেছে, তখন আবার পুরনো দিনের সেই আনন্দ আবার ফিরে এল মনে। যাঁরা করছেন তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই, পরিকল্পনার সফল করার জন্য। তবে সঙ্গে এটাও অনুরোধ জানা যে ছাদটার যাতে, সেদিকটার একটা ব্যবস্থা যেন হয় তখন। কেননা ভালো নাটকের ইতিহাসে সেদিনটার অবদানও কম নয়।

গীতা দে (অভিনেত্রী)

'স্টার' থিয়েটার যে আবার Renovate হয়ে নতুনরূপে তৈরী হবে, তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। 'স্টার' পুড়ে যাবার পর আমি বহুবার অতীত মোহের মনে ওখানে গেছি। তার একটা টান ছিল না আজো এখনও স্টারের প্রতি। শুধু 'স্টার' নামে নয়, 'অপেশাদারের নাটকের' প্রতি। এই সমিতিকে ভোলবার নয়। শিল্পী-লেখক-খেলোয়াড়-নেতা—সব ধরনের লোকেদেই। যে সমিতিরই শিল্পী হবে, তার একটা আলাদা টিমওতো থাকবেই। আমিও তাই, তার আর ছুটি পেলি বিশেষ যাই, মেতে ওঠেছিলাম ওদের কাজে। মিটিং-এ অংশগ্রহণ করেছি। তাই আবার 'স্টার'কে পেয়ে ফেলা যায়। আমি তখন ভেবেছিলাম, ঠাকুরের অনুকূলচন্দ্রের শতবার্ষিকী এই স্টেজ পুরনো কি জানে ?

'স্টারে' অভিনয় করতে করতেই মেলবন্ধনের ওপরের কথাটি, অর্থাৎ ছিলাম ২৩৩ রাজের থিয়েটারের ইতিহাসে। 'মিনার্ভা' পুড়ে যাবার পর গোকিল সেন তার কাছ থেকে লীজ নিয়ে নতুন বাড়ি তৈরি হল স্টারের। উনিই নিয়ে এলেন অমরের ওপরে। তখন স্টারে যা কিছু পেরিয়ে যেতে থিয়েটার হত। টিকিট পেতে হত। এই সময়ে ছিলেন দুর্গাদাসবাবু, মিস লাইট, ইন্দুবালা।

অভিনয় থিয়ে সমালোচনা করার পর হল 'সাজাহান'। উপেন, সাধিনী, সরযূবালা, তুলসীবাবু, শ্যাম লাহা, অনুরূপকুমার ইত্যাদিদের নিয়ে ১৯৪৩-এ। দুবার-দুপুর টিকিট নাটক। আমি তখন শ্রীরঙ্গমে কাজ করি। স্টার থিয়েটার নতুনভাবে Renovate হল। এ সি হল। এর পরে হল নাটক 'নীলাম্বর'। তার একটা পর্ব—রাজলক্ষ্মী। এতেই আমি প্রথম অভিনয় করি 'অন্নদা' চরিত্রে। নটাচার্যকে ছেড়ে আসতে চীরণ কষ্ট হয়েছিল। উনি আমার অভিভাবক। তাদের ঘরে অভিনয় শিখিয়েছেন, ১৯৪৬-এ। প্রেমাংশু বসু কি চীরণ সাহেবেরিয়া করেছিলেন তা জানা যায় না। অভূতপূর্ব সাফল্য পেল 'রাজলক্ষ্মী'। এই আমার শুরু 'স্টারে'। সম্পূর্ণ আর্থিক কারণেই 'শ্রীরঙ্গম' ছেড়ে 'স্টারে' এসেছিলাম। এর পরে আরও কথা, আরও স্মৃতি। সব বলতে গেলে একটা বই হয়ে যাবে।

দেবব্রত মুখোপাধ্যায় যে পরিকল্পনা নিয়েছেন 'স্টার'কে আবার গড়ে তোলবার জন্য, তার জন্য আগের থেকেই জানাই। তবে এটা নতুন কিছু নয়। উনি এর আগে বহুবার কলকাতার থিয়েটার ও শিল্পীদের জন্য, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের আর্থিক সাহায্যের জন্য, যা করেছেন—তা সবাই জানেন। তাই তখনও এখনও আমাদের আশা-ভরসা অনেক। আশা করি আবারও নতুনরূপে গড়ে উঠবে 'স্টার'। আমরা ফিরে পাবো আমাদের শীতাতপ, বসিবার, ড্রেসিংরুমের সেই চিরি জায়গাগুলো।

বীণা দাশগুপ্তা (অভিনেত্রী)

স্টার থিয়েটার মানে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের জীবনের এক পুনরাগমন। এক মহিমার। যেটা যেদিন পুড়ে গেল সেদিন জীবনটা অর্থহীন হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম সবাই, মিলে আবার গড়ে তোলা হবে 'স্টার'কে। কিন্তু তা হয়নি। তার পরে যখন শুনলাম যে কলকাতা পুরসভা এটিকে এসেছেন এটাকে আবার তৈরি করতে—তখনই রোমাঞ্চিত হয়েছি। যদি সত্যিই হয়—তাহলে কলকাতা পুরসভার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে বাংলা নাটকের ইতিহাসে। আমরা ফিরে পাবো আমাদের প্রাণকে। 'স্টার' আমার জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। অমি যখন 'নটী বিনোদিনীর' চরিত্রে অভিনয় করতে করতে শুনলাম 'আমরা এই থিয়েটারের নাম রেখে স্টার থিয়েটার'—তখন কী যে হয়েছিল তা বলে বোঝাতে পারবো না। বিনোদিনীর জন্যই স্টার থিয়েটার। আর সেই চরিত্রে অভিনয় করছি আমি স্টারে দাঁড়িয়েই। অদ্ভুত অভিজ্ঞতা।

আমার এই স্টারেই আমাকে দেবতা হয় 'রাজলক্ষ্মী' ও পরে 'বীজের ফল' শরৎ সাহিত্যের পরে। কত স্মৃতি আছে

ওই স্টারে। আমার সাজানো বাঁটুলদা 'স্টার'।

ওখানকার যারা কর্মচারীরা ছিলেন, তাদের কথা ভেবেই আবার এটা গড়ে তোলা উচিত। ওরা ভীষণই কষ্টে আছেন। কেউ ফুল বেচেন, কেউ ফটো বিক্রি করছেন। কেউ কেউ ভাড়াও পেয়েছেন। স্টার তৈরি হলে ওনাদের পরিবার বাঁচবে। এটা যে কত বড় আশীর্বাদ, কত বড় মহৎ কাজ হবে তা জানা যায় না।

'স্টার'কে গড়ে আবার সেখানে নতুন নতুন নাটক, নতুন নতুন পালা তৈরি করতে হবে নতুন প্রজন্মের জন্য। বাঁচিয়ে রাখতে হবে নাটককে তাদের মধ্যে। ছেকে আনতে হবে গুণ-শিল্পীদের। যারা এখনও কর্মক্ষম। কাজ পেলে তারা বাঁচবেন, তাদের পরিবার বাঁচবে। এটাও আমাদের দায়িত্ব।

একটাই অনুরোধ পুরসভার কাছে। নতুন স্টারের যেদিন উদ্বোধন হবে, সেদিন যেন আমাকে পুরো 'মটি বিনোদিনী'টাই অভিনয় করার সুযোগ দেওয়া হয়। এটাই হবে আমার প্রাপ্তি।

নিমু ভৌমিক (অভিনেতা)

অভিপ্রায় হয়েছে শুনে আমার ভীষণ ভালো লাগছে। আমি খুবই খুশি। পশ্চিমবাংলার ২০০ বছরের বাংলা থিয়েটারের আজ প্রায় অবলুপ্তির পথে। কিন্তু কেন হবে ? বাঙালী নাটক-পাগলা জাত। এমনই ওখানকার মানুষ যে, কোনও হল পুড়ে যাচ্ছে, কোনও হলে বিয়ে বাড়ি ভাড়া দেওয়া হচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি। এটাতো কোনও সুস্থ সংস্কৃতির লক্ষণ নয়। ১৯৪৯ সালে আমি প্রথম 'স্টারে' নাটক দেখতে যাই। মহেন্দ্র গুপ্তের 'চন্দ্রগুপ্ত'। তারপরে ওখানে বহু নাটক করেছি। স্টার থিয়েটার পুড়ে যাবার পর অনেকে অনেক কথা বলেছেন, কিন্তু কেউ-ই এটাকে কিন্তু করে উঠতে পারেননি। এতদিন পরে সুব্রতবাবু যে চেষ্টা করলেন এটা অভূতপূর্ব। মানবিকতার দিক থেকে এটি একটা গুপ্ত প্রক্রিয়া, অসাধারণ প্রচেষ্টা। আমি এর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। আমি জানি সুব্রতবাবু এটা পারবেন। শিল্প-সংস্কৃতি নাটকের প্রতি ওঁর টান অবিসংবাদিত। তার পরিচয় উনি অনেক কাজকর্মে দিয়েছেন। এবারও দিলেন। ওঁনার আন্তরিকতা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আমাদেরও এগিয়ে আসা উচিত ওঁনার পাশে সর্বশক্তি নিয়ে। 'স্টার' খোলা মানে বাঙালির কাছে এক মন্দির খোলা। সেখানে বাঙালির সব কিছুর পরিচয় পাওয়া যায় বা যাবে।

স্টার থিয়েটার

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দের আশীর্বাদ-বিজড়িত ও পদধূলিধন্য স্টার থিয়েটার বাংলা তথা ভারতীয় নাট্য ইতিহাসে এক ঐতিহ্যশালী নাটমঞ্চ। নটগুরু গিরিশচন্দ্রের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার অনলস প্রচেষ্টা এবং নটী বিনোদিনীর আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে একদিন গড়ে উঠেছিল এই থিয়েটার। স্টার থিয়েটারের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল বহু উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে। সে সময়ে অভিনেতা, অভিনেত্রীদের অভিধা ছিল নট-নটী, সমাজে অপাংক্তেয় ছিলেন তাঁরা।

পান্নাজী নাটকে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

স্টারে নটগুরু গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলা' নাটক দেখতে এসেছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ সপার্ষদ। শ্রীচৈতন্যের ভূমিকায় নটী বিনোদিনীর অভিনয়ে অভিভূত হয়ে মঞ্চের অভ্যন্তরে দেখতে গেলেন বিনোদিনীকে এবং মাথার উপর হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন। সেই আশীর্বাদের মধ্য দিয়ে সমগ্র নাট্যসমাজ পেল সামাজিক স্বীকৃতি। এ স্বীকৃতি ঐতিহাসিক। তারপর সামাজিক মর্যাদায় নট-নটীর বদলে অভিধা হল অভিনেতা, অভিনেত্রী।

এই স্টার থিয়েটারেই আর একটি স্মরণীয় ঘটনার উল্লেখ করা যায়—যা অলৌকিক বলা যায়। হঠাৎই স্বামী বিবেকানন্দ এলেন শুরুভাই গিরিশের

শাপমোচন নাটক অভিনেতাদের সঙ্গে বিশ্বজিৎ

নাটক দেখতে। হাউস ফুল। একটি সিটও খালি নেই। গিরিশ বললেন—আজ হবে না, আর একদিন এস। বিবেকানন্দ একটু মনঃক্ষুণ্ণ হয়েই ফিরে গেলেন। এদিকে প্রদর্শনীর সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পরও নাটক আরম্ভ হচ্ছে না, দর্শক অধৈর্য। যান্ত্রিক গোলযোগে প্রথম যবনিকা বা ড্রপসিন উঠছে না। বেশ কিছুক্ষণ অতিক্রান্ত হয়ে গেল। কলাকুশলীরা প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছেন। এমন সময় গিরিশের কিছু একটা মনে হল। উত্তেজনায় একজনকে ডেকে বললেন— ওরে শিগগির নরেনকে ফিরিয়ে নিয়ে আয়। শ্যামবাজারের প্রায় কাছাকাছি থেকে নরেনকে ফিরিয়ে এনে একটা আলাদা আসনে বসিয়ে দেওয়া হল প্রেক্ষাগৃহে। নরেন বসতেই সরসগতিতে ড্রপসিন উঠে গেল।

নাটক দেখতে এসে একটা রূপোর টাকা প্রদর্শনীর বক্ষিণা দিয়েছিলেন ঠাকুর, মথুরবাবুর হাত দিয়ে। গিরিশ সেই টাকা শ্রদ্ধাভরে রেখে দিয়েছিলেন থিয়েটারের সিন্দুকে। আমি যখন স্টার থিয়েটারে অভিনয় করি তখনও দেখেছি সেই টাকা পবিত্রভাবে রাখা আছে। স্টার থিয়েটারে যোগদানে আমি 'শ্যামলী' নাটকে। তারপর 'পরিণীতা', 'শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মী' ও 'প্রেমের' নাটকে অভিনয় করেছি।

শ্যামলী নাটকের প্রথম রজনীর অভিনয়ে মঞ্চের পাদপ্রদীপের সামনে দিয়ে যখন পা বাড়ালাম তখন যোগাক্ষ অনুভব করলাম এই ভেবে, এই সেই স্টার থিয়েটার। নাটককার গিরিশচন্দ্র, নটী বিনোদিনী থেকে কত নটী-প্রতিভার স্পর্শ এসে উপস্থিত হয়েছি। 'শ্যামলী' ইতিহাস সৃষ্টিকারী নাটক। স্টার যখন শ্যামলী মঞ্চস্থ করার সঙ্কল্প নিল তখন পেশাদারি মঞ্চের মহাপুরোধারা। অনেক শুভাকাঙ্ক্ষীরা আশঙ্কা করেছিলেন থিয়েটার বন্ধ করে দিয়ে নাট্যশালাকে অন্য ব্যবসায় রূপান্তরিত করার কথা। কিন্তু শ্যামলীর অভাবনীয় বাণিজ্যিক সাফল্যে আবার উজ্জীবিত হয়ে উঠল পেশাদারি থিয়েটারগুলি। এ যেন রক্তহীন মৃতপ্রায় শরীরে নবরক্ত সঞ্চারিত হল।

শ্যামলী নাটকে যোগ দেবার আগে মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করে দেশ-বিদেশের বহু জ্ঞানী, গুণী নাট্যবিশেষজ্ঞের প্রশংসাধন্য হয়েছি। লন্ডন টেটেজের নাট্যবিশারদ স্যার উইলিয়াম আরচেল এবং সমর সিটিজেন ব্রুনহাইল্ড পল্সবির, আইরিশ সাংস্কৃতিবিদ এইচ এম কর্টিনিনার, রুশ সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদল—এঁরা স্টার থিয়েটারে শ্যামলী নাটক দেখে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে গেছেন।

স্টার থিয়েটার, 'শ্যামলী' নাটক, বিশ্বজিৎ হয়ে যাচ্ছে আমার অভিনয় জীবনের সঙ্গে। শ্যামলীকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য বাড়ির নামও দিয়েছি 'শ্যামলী'।

যেদিন ঘুম থেকে উঠে শুনলাম স্টার অগ্নিদগ্ধে ছাই হয়ে গেছে, বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। যখন বিশ্বাস হল তখন অনুভব করছিলাম শরীরেরই কোনও অঙ্গ পুড়ে যাওয়ার অসহ্য জ্বালা যন্ত্রণা। সব জ্বালা যন্ত্রণা ভুলে আনন্দিত হয়ে উঠলাম আনন্দের পৌরপ্রধান সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের স্টারকে নতুন করে গড়ে তোলার মহান উদ্যোগের খবরে। ধন্যবাদ, সাধুবাদ অবশ্যই প্রাপ্য। তবু ধন্যবাদ বা সাধুবাদ জানিয়ে হাত সারলে চলবে না, সাহায্যেরও হাত বাড়িয়ে এই উদ্যোগে সামিল হতে হবে কলকাতার নাট্যরসিকদেরই নয়, সমাজের সর্বস্তরের মানুষের।

স্টার থিয়েটার এবং বাংলা নাটক

বরুণ সি. দাশ

বাঙালি জীবনে বিনোদন বলতে তখন ছিল কথকতা, যাত্রাপালা, পাঁচালী, তরজালড়াই ইত্যাদি। নাটকের চর্চা এদেশে হয়েছিল, সংস্কৃত ভাষার সুবর্ণযুগে, কালিদাসের সময়ে। এরপর কয়েক শতাব্দী অন্ধকারে কাটিয়ে পর আমাদের বাঙালি জীবনে আবার নাট্যচর্চার সূত্রপাত ঘটেছিল ইংরেজদের সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক সূত্রে। তখন এদেশে সাধারণ বা পেশাদার কোনও রঙ্গমঞ্চই ছিল না। আর ইংরেজরা তখন রঙ্গমঞ্চ ছাড়া চলতেই পারত না। সেমিনার, আলোচনা সভা, নাচগান, নাটকের জন্য রঙ্গালয় ওদের খুব দরকার হত। শিল্প বিপ্লবের পরিণতিতে ইউরোপ তখন সামন্ততান্ত্রিক অভিজাত্য মুছে ফেলে নাগরিক আভিজাত্য গড়ে তুলছে এবং ওই আভিজাত্যের অন্যতম প্রকরণ হল থিয়েটার হল। ইংরেজরা তাই কলকাতায় এসে বাসস্থানের সঙ্গে সঙ্গে একটি থিয়েটার হলও গড়ে তুলেছিলেন অধুনা জি পি ও-র কাছে।

১৭৫৬ সালে সিরাজদৌল্লা সেনাবাহিনী নিয়ে ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত ওই রঙ্গালয়টি দখল করেছিলেন। সিরাজদৌল্লার সেনাবাহিনী ওখান থেকে কামান দেগে উড়িয়ে দিয়েছিলেন ইংরেজ স্থাপিত প্রথম দুর্গ ও গির্জাটি।

সন্ধি হবার পর নবাব মুর্শিদাবাদে ফিরে গেলে ইংরেজরা অধুনা লায়ন্স রেঞ্জে, (অধুনা মহাকরণের) পেছনে গড়ে তোলেন কালকাটা থিয়েটার। তখনকার দিনে ওই রঙ্গালয়টি গড়ার খরচ পড়েছিল এক লক্ষ টাকা এবং অভিজাত ইংরেজদের চাঁদায় ওই টাকা জোটানো হয়েছিল।

এরপর কিছু দেশীয় ভাগ্যান্বেষী গেরাসিম লেবেদেফ বাংলা শিখে এদেশে স্থিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বেঙ্গলি থিয়েটার। সেটা ছিল ১৭৯৫ সালের ২৭ নভেম্বর। কিন্তু ওই প্রয়াস সফল হয়নি কারণ চলু থিয়েটারের মালিকরা ব্যবসায়িক কারণে ওই প্রয়াসে আগুন জ্বেলে দিয়েছিলেন এবং লেবেদেফের প্রাণনাশের ব্যবস্থা করেছিলেন। শেষে লেবেদেফ পালিয়ে দেশে ফিরে যান।

এইভাবে কলকাতায় নাট্যচর্চা বেশ জমে উঠছিল। কিন্তু স্থানীয় মানুষরা তাতে বিশেষ অংশ নিতে পারছিলেন না। ইংরেজদের প্রযোজিত 'ওথেলো' নাটকে নামভূমিকায় প্রথম যে বাঙালি অভিনয় করেছিলেন, তাঁর নাম বৈষ্ণবচরণ আঢ্য। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বাঙালিরা থেকে গেলেন দর্শক।

কিন্তু ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হলে বাঙালিরাও থিয়েটার চর্চায় সাহসী হলেন। নাটকের প্রতি অনুরক্ত বাঙালি প্রসন্নকুমার ঠাকুর নারকেলডাঙার শুঁড়োর বাগান বাড়িতে খুললেন হিন্দু থিয়েটার। ওখানে অভিনয় শুরু হল সংস্কৃত নাটকের ইংরেজি অনুবাদ। প্রথম বাংলা নাটক অভিনীত হল ১৮৩৫ সালে, শ্যামবাজারের নবীন বসুর নিজস্ব রঙ্গালয়ে, নাটকটির নাম 'বিদ্যাসুন্দর'। ওই 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকে মঞ্চস্থ করতে গিয়ে অভিনেত্রী সংকটে পড়তে হয়।

পেয়ে পরিচালনার এই অবস্থা সামাল দেয়। তারাসুন্দরী তুরমুণী ও চন্দ্রকুমারীর ভূমিকায় তাঁরা অভিনয় করেছিলেন, তাঁরা এসেছিলেন পরিচারাপল্লী থেকে। এইভাবে কলকাতায় বাঙলা নাটক চলা এবং রঙ্গালয় স্থাপনের প্রয়াস শুরু হয়েছিল। অনেকগুলি রঙ্গালয় গড়েও উঠেছিল তারার বন্ধও হয়েছিল।

এই সব রঙ্গালয়গুলি বাঙালি নাট্যরসিক যেমন স্বাগত জানিয়ে ফেরত পাবেনি—একমাত্র স্টার থিয়েটার ছাড়া। মনে রাখা দরকার, বাঙালি অভিনেত্রীদের আবির্ভাবের পূর্বে মহিলাদের ভূমিকায় পুরুষরাই অভিনয় করতেন। সেদিন সমাজপ্রতিষ্ঠার ফলে শিক্ষিত ভদ্রঘরের মেয়েরা এক্ষেত্রে পরিচিত হলেও নাট্যচর্চা এক সম্ভ্রান্তদের মুখরক্ষার অযোগ্য নাগরদেরই রঙ্গভূমি অধিকার করেছিল। হয়তো নাটকের ভাষাভঙ্গি, রঙ্গরসাত্মক ধরণের পরিচয়ণের পক্ষে সম্ভব ছিল, তাছাড়া লক্ষ্মীমণি-সরীসুন্দরী বাঙালি গৃহবধূ বা সম্ভ্রান্তবংশের বাঙালি কন্যাদের এর সম্ভব ছিল না। এই অভিনয়ের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে বাণিজ্যিক অভিনয়ের ক্ষেত্রে যাঁরা আসতেন তাঁরা বেশির ভাগই চরিত্র বদ্ধ না করে আসতে পারতেন না। কোনরূপ এরকমেই ফলকাতিতে অভিনেত্রী হলেও বিনোদিনী বাংলা নাট্যরঙ্গের যে অবদান রেখে গেলেন তা নাট্যপ্রেমীদের মনে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে রইল—দর্শকদের মনোরঞ্জনে সার্থক হলেও সাধারণের সংস্কৃতির প্রসার ঘটাতে নটী বিনোদিনীর মতো অধিকারীর অবদান আর কেউই রেখে যেতে পারেননি। নটী বিনোদিনীকে খুশি করার জন্য গুরুমুখ রায় স্টার থিয়েটার স্থাপন করলেও এই থিয়েটারের নাম বিনোদিনীর নামে করা যায়নি, কারণ সর্বাঙ্গসুন্দরীর ঐতিহ্যমণ্ডিত ভারত ইতিহাসে একজন পতিতার পতিতাকে অঙ্কে রাজকীয় রেখে গেছে? কিন্তু থিয়েটারের নাম বিনোদিনীর নামে না হলেও স্টার থিয়েটার থেকে বিনোদিনীর প্রথম অভিনয় মুছে ফেলা যায়নি। বাঙালি আজও এই অকৃতজ্ঞতার কথা ভোলেনি।

স্টার থিয়েটার

[পরিচালনা: বিনোদিনীর আবেদন]

ফোন : ২৮৮১ ● ফোন : ৩৪-১১-৩৪

অভিনয় দর্শকের কর্তৃপক্ষ কাম্যনয়।

নটী বিনোদিনী নিজেই গড় অভিনেত্রী ছিলেন, না হলে তৎকালীন প্রায় ৮০ টাকা দেনে এই থিয়েটার গড়ে দেবার কেন? না বন্ধুকৃষ্ণদেবই বা ৫৫ হাজার টাকা দেনার দেখে সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন কেন?—অভিনয় থেকে বন্ধুকৃষ্ণের বিনোদিনীকে এমনভাবে আকৃষ্ট করেছিলেন এই আশীর্বাদ বিনোদিনী আজ পেয়েছিল। রঙ্গালয় গড়ে উঠবার পর এর ট্রাডিশনের হয়েছিল, বাকি জীবন তিনি আর অভিনয় করে কর অনুরূপকে আকৃষ্ট করেননি, সাধনের পূর্ণতার জীবনের দিয়ে গিয়েছিলেন। যেমন কালক্রমে শরীর সুস্থিতা দেন এবং অভিনয় বিসর্জিত দেবার নির্বাসিত জীবন কাটিয়েছেন।

স্টার থিয়েটারের প্রতিষ্ঠার পর এর মালিকানা অনেকবার বদলেছে—কখনও এর মালিক হয়েছে ক্লাসিক, কখনও মনোমোহন, কখনও এমারেল্ড।

ক্লাসিক যখন স্টার থিয়েটার অধিগ্রহণ করেন তখন এর কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেন দুজন এর কর্তৃত্বভার গ

পরিচালিত প্রযোজনা 'স্টার' থিয়েটারে হয়ে উঠেছিল রঙ্গরসপ্রিয় বাঙালির প্রধান বিনোদন কেন্দ্র। কলকাতার বাণিজ্যকেন্দ্রীয় স্টার থিয়েটারের উদ্বোধনের সময় সাতটি নাটকের নাম ছিল, 'আবুহোসেন', 'আলিবাবা'—ইত্যাদি।

অমৃতলালদের নাটক প্রযোজনে অভিনেতাদের ভূমিকা বদলের প্রবণতা দেখা দিয়েছিল এবং তাঁরা তা নিষ্ঠাভরেই প্রয়োগ করেছিলেন। 'আলিবাবা' নাটকে মর্জিনার চরিত্রে কুসুমকুমারী এবং আবদল্লার ভূমিকায় বুদ্ধদেব বসুর অভিনয় দর্শকদের অভিভূত করেছিল। পরবর্তীকালে এই দুই ভূমিকায় যদু ভট্ট এবং সাধনা বসু অভিনয় করেন। সাধনা বসুর মঞ্চে আসা তখনকার যাবতীয় নাটকের অভিনেত্রীদের রূপসজ্জা ও পোশাকে। এর আগে পর্যন্ত থিয়েটারের নারী চরিত্রেরা প্রকৃতপক্ষে নারীদের দ্বারাই পরিচালকের তৈরি। কিন্তু প্রাক্‌স্বাধীনতা ইতিহাসের সূত্রে বাঙালি নারীরা অন্তঃপুরচারিণী থাকবার বদলে বহির্মুখী হওয়া শুরু করলেন—বাংলা রঙ্গালয়ে তাদের ঢেউ এসে লাগল। বাংলা নাটকে প্রথম অভিনয়ের যে মেয়েটি অভিনয় করেছিলেন, সেই সাধনা বসু ছিলেন, ছেলের সেজের নায়কী। সাধনা বসু ছাড়াও ভোলানাথের চাঁদবদন বাড়ির অভিনয়ে নারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন যদু। এই সময় থেকেই সাংস্কৃতিকমনস্ক বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা বুঝতে শুরু করলেন যে, থিয়েটার শুধু হাবলদ্বিক বিনোদনের জন্য নয়—সামাজিক বিবেকের কাছে প্রশ্ন করতে এবং কালপরিসরের জন্যও এর দরকার আছে। সুতরাং পড়ে উঠল 'আলেখ্যটি আর প্রেক্ষাগৃহ'—যেখানে অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা জড় হতে লাগলেন প্রভূত অভিনয় এলাকাই এক পেশা হয়ে চরিত্র মূর্তনের এক আবহাওয়া তৈরি করে এবং নারীসাধিকারীর ভাবার 'আড়ষ্টতা' সহজে ঠিক মেলে না মেলে।

স্টার থিয়েটার সম্বন্ধে যত কথা হলেও এই থিয়েটারটি রঙ্গমঞ্চসংস্কারের পথপ্রদর্শক এবং তাদিনিকের নাট্যচর্চায় বিশেষ ঐতিহ্য গড়ে তুলেছিল। প্রায় পেরুনো বছর অতিক্রম করার পর এই রঙ্গালয়টি জরাজীর্ণ ও পরিত্যক্ত হয়ে থাকে বেশ কিছু দিন। এর জমীয়া খুলি অসম্ভবরকার মধ্যে কাটিয়েছেন ফলন। গত ১০ মার্চ এই থিয়েটারটি অলকার ডিজিটিসিপাল কর্পোরেশনের উদ্যোগে নতুনভাবে নির্মাণ শুরু হয়েছে। নতুন এই থিয়েটারে সেই বিনোদিনীর অভিনয়েই পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হবে, না তাদিনিকের নাট্যচর্চার নতুন দিশা ও দিশার ধারণা করা হবে—তা ঠিক করবে আগামী দিন এবং আগামী প্রজন্ম।

স্টার থিয়েটারের মালিকানায় কয়েকজন *

সাল	নাম	পরিচয়
১৮৮৩	ওপুধ বার	একী সাহারাড়ি ব্যবসায়ী
১৮৮৩	অমৃতলাল বসু ও অন্যান্য অভিনেতা	বিশিষ্ট নাট্যকার, অভিনেতা ও অর্ধাংশক।
	অমর দত্তগার	একী, নাট্যমোদী শ্রেণি হলেন।
	গিরিশচন্দ্র মল্লিক	কুর্ণ বণিক সমাজের বিশিষ্ট একী বাড়ি ও বহু সম্পত্তির মালিক শ্রেণি হলেন।
	জগদেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	রঙ্গমঞ্চের প্রতিবেশী বাড়ি শ্রেণি এবং ম্যানেজার হলেন।
(১৯০৩ স্টার থিয়েটারের অন্তর্ভুক্তির পর)		
১৯৩৮	শলিলকুমার মিত্র	অভিজাত পরিবারের সন্তান। শ্রেণি ও প্রশাসনিক ম্যানেজার হলেন। আধুনিকীকরণের মূল দ্রষ্টা।
	রঞ্জিত দিবারাস	রঞ্জিতমল স্কাউন্ডেশন , চলচ্চিত্র প্রযোজক ও সিনেমাহলের মালিক

*প্রধু অংশের ভিত্তিতে রচিত

স্টার থিয়েটার—বাংলা থিয়েটারের ফিনিক্স

মহুয়া চৌধুরী

এখন আমরা যাকে স্টার থিয়েটার বলে জানি, আদতে স্টারের সূচনা কিন্তু সেই হাতিবাগান অঞ্চলের কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটে নয়। ১৮৮৩ সালের ২১ জুলাই ৬৮ বিডন স্ট্রিটে গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'দক্ষযজ্ঞ' নাটক দিয়ে শুরু হয়েছিল স্টারের যাত্রা। মাত্র ৪ বছরের আয়ুষ্কালে (১৮৮৩-১৮৮৭) প্রায় ২০টি নাটক এখানে অভিনীত হয়। এই স্টার নির্মিত হয়েছিল গুর্মুখ রায়ের অর্থে। এর নির্মাণের সঙ্গেই নটী বিনোদিনীর আত্মত্যাগ জড়িয়ে আছে। এখানে অভিনীত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটকের মধ্যে 'সীতার বনবাস', 'সধবার একাদশী', 'চৈতন্যলীলা' ইত্যাদি বিখ্যাত। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব 'চৈতন্যলীলা' দেখতে এই স্টারেই পদার্পণ করেছিলেন। এই আদিপর্বের স্টারেই, বিনোদিনী দাসী তাঁর শেষ অভিনয় মঞ্চস্থ করেন 'বেল্লিক বাজার' নাটকে। বস্তুতপক্ষে, নটী বিনোদিনী ভূষিত হয়েছিলেন, 'মুন অফ্ স্টার কোম্পানি' অভিধায়।

সুতরাং বাংলা নাটকের এক গৌরবময় পর্বের সঙ্গে স্টারের যাত্রাপথ শুরু। কিন্তু এর সঙ্গে জড়িয়ে ছিল নানা উত্থান-পতন। ঠিক চার বছর পরেই ৩১ জুলাই ১৮৮৭ গোপাললাল শীল স্টার থিয়েটারের জমি কিনে নিলেন। ৬৮ বিডন স্ট্রিটে সূত্রপাত হল গোপাললাল শীলের নতুন থিয়েটার এমারেল্ড থিয়েটার।

এদিকে ১৮৮৮-র ২৫ মে সূত্রপাত হল আজকের স্টার থিয়েটারের। উদ্বোধন রজনীতে অভিনীত হয় 'নসিরাম' নাটক। এতে অভিনয় করেন অমৃতলাল বসু, অমৃতলাল মিত্র, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, ত্রিপেন্দ্রনাথ মিত্র, স্ত্রী চরিত্রে ছিলেন, কাদম্বিনী, গঙ্গামণি ও তারাসুন্দরী প্রমুখ। ১৮৮৯ সালে গিরিশ ঘোষ এমারেল্ড থিয়েটার ছেড়ে স্টার থিয়েটারে যোগ দেন। মিনার্ভা থিয়েটারের ম্যানেজার হবার পূর্ব অবধি (১৮৯২) গিরিশ ঘোষ এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মতান্তরের কারণে গিরিশ ঘোষ পুনরায় মিনার্ভা ছেড়ে স্টারের 'ড্রামাটিক ডিরেক্টরের' পদ গ্রহণ করেন ১৮৯৬ সালের ১৫ এপ্রিল। স্টার সূচনাপর্ব থেকে গিরিশ ঘোষের মৃত্যু (১৯১২), পর্যন্ত প্রায় ১০০টি নানা ছোট বড় বাংলা পুরনো নাটক এবং কয়েকটি হিন্দি নাটক মঞ্চস্থ করে। ১৯২৩ সালে 'আর্ট থিয়েটার লিমিটেড' স্টার থিয়েটার মঞ্চে আসে।

আর্ট থিয়েটার লিমিটেডের ম্যানেজার ছিলেন অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং সেক্রেটারি ছিলেন প্রবোধচন্দ্র গুহ। স্টার রঙ্গমঞ্চে এঁদের যাত্রা শুরু হয় অপরেশচন্দ্রর 'কর্ণার্জুন' নাটক দিয়ে। এই সময়ে স্টারে অভিনয় করছেন অহীন্দ্র চৌধুরী, নরেশচন্দ্র মিত্র, নির্মলেন্দু লাহিড়ি। এখানে আরেকজনের কথা বলতে হয়, তখনও অখ্যাত কিন্তু

অজিত গাঙ্গুলি ও নির্মলকুমার

শরৎচন্দ্রের বহুল পঠিত ও জনপ্রিয় নায়ক দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়। এই নায়ক চরিত্রে তিনি বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। কৃষ্ণের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়। রাধার ভূমিকায় হলেন বহু অভিনেত্রী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকায় এবং কখনো ভূমিকায় অভিনয় করেন নিরুপমা গঙ্গোপাধ্যায়। 'কর্ণার্জুন' একদিনেই ২৯৭ বার অভিনীত হয়েছিল। এই থিয়েটারের অন্যতম কৃতিত্ব আলোর সর্বপ্রথম একাঙ্ক নাটক বলে অভিহিত 'দুর্যোধন রায়' প্রযোজনা। এছাড়াও এঁরা করিমগঞ্জ, শরৎচন্দ্রের কয়েকটি উপন্যাসের নাট্যরূপ প্রযোজনা করেন। এঁরা আরও প্রযোজনা করেন, রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা ও চৈতালী', 'চিরকুমার সভা', 'নিবেদন অভিনয়' ইত্যাদি ইত্যাদি।

কেমন লাগছে নেই, স্টারের এই সময়কাল এক যৌবনবতীর অবস্থা। 'আই' থিয়েটার লিমিটেডের পরে বিশির অনুপুরী বছর তিনেক তাঁর দল নিয়ে এখানে ছিলেন। এছাড়া ত্রিনেত্র পরেই মলিক-পক্ষের সঙ্গে আলোচনা হেতে তিনি স্টার থিয়েটার ছেড়ে দেন।

এরপর স্টার থিয়েটারের নতুন লেসি হন সলিলকুমার মিত্র। তাঁর সময়কালে মিত্র ৩৩ বছর স্টারের এক যুগের দুখ। এখানে ঘনিষ্ঠতাপূর্ব দুখ থেকে, ১৯৫৩ পর্যন্ত পরিচালক হিসাবে ছিলেন যতেন্দ্র গুপ্ত। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে সলিলকুমার, যতেন্দ্র গুপ্ত সহ সেই আমলের সব শিল্পীকে ছাড়াই করে নিয়ে আসেন চিত্র ও মঞ্চের খ্যাতনামা সব শিল্পীদের। দেবনারায়ণ গুপ্ত নলিনীরঞ্জনকে এবং শিশির মল্লিক এবং যামিনী মিত্র পরিচালিত নতুন নাটক 'শ্যামলী' প্রথম অভিনয় হল ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের ১৪ অক্টোবর। এই সময়ে স্টারকে ফুলবেরার মতো পরিচয় করেছিলেন অহু সেন। ছবির জগতে সহ সকল যাবার সলিলের জগতের নিয়ন্ত্রণকারী নায়ক উত্তমকুমার এই নাটকের সূত্রে স্টার থিয়েটারে যোগ দেন। দুবছরেরও বেশি সময়কাল তিনি এই নাটকে অভিনয় করেছেন। শেষপর্যন্ত শেষমেশ সবকে ফেলে যেবার এই নাটকেই উত্তমকুমার তাঁর প্রথম ও শেষ অভিনয় করেন। তাঁর সহশিল্পী ছিলেন রবি বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়।

মৈথিলির স্বাস্থ্যের কারণে মঞ্চাভিনয় থেকে বিরত থাকার পর, অপর কিংবদন্তী অভিনেত্রী ছবি বিশ্বাস ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে স্টার থিয়েটারে যোগ দেন। ওই একই বছরে 'সাহিত্য নাটক অকাদেমী' তাঁকে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর সম্মান দেন। এই সময়েই স্টারের নাট্যকার-নির্দেশক হিসাবে যুক্ত ছিলেন দেবনারায়ণ গুপ্ত। তাঁর অনবদ্য শেক্সপিয়র প্রথম প্রকাশ ঘটে 'হ্যামলেট' নাটকের মাধ্যমে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে প্রযোজিত এই নাটকটির ৪৯৭টি প্রদর্শনী হয়েছিল। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ৩ এপ্রিল সলিলকুমার মিত্র প্রযোজক হিসেবে যোগ দেন বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনিকে নিয়ে। এরপর দু-শতক স্টার থিয়েটারে বিভিন্ন দল ছাড়া নিয়ে অভিনয় করতে থাকে। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের ১৫ অক্টোবর সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের 'অটিক থিয়েটার' চলাকালীন অবস্থায়ে এক বিপর্যয়কর আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় আমাদের এক ঐতিহ্যবাহী থিয়েটারের এক সুবর্ণময় ঐতিহ্য।

কিন্তু নিয়তির এই পরিহাস সত্ত্বেও নিশ্চয়ই সেই ছাই থেকে আবার নতুন স্টার নিয়ে আসবে তার গর্ব, ঐতিহ্য এবং সাংস্কৃতিক প্রজন্মান্তর। সাম্প্রতিক বিপর্যয় ঘটলেও কলকাতা সৌভাগ্যের স্টারকে অধিকারের মাধ্যমে একবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই ইতিহাস নিলেন এক থিয়েটারের নবযুগ আনয়নের। জাতির ঐতিহ্য যেমন প্রতিফলিত হয় থিয়েটারে, থিয়েটারের উজ্জ্বল আলোকে জাতির থাকে জনমনের ইতিহাসে। তাই রঙ্গমঞ্চের মৃত্যু হয় না, স্টার পুড়লেও পোড়ে না।

নাটকের চার পথিকৃৎ

প্রশান্ত পালিত

বাংলা নাটকের ইতিহাস, বাংলার সংস্কৃতির এক উজ্জ্বল পরিচয়। অতীতের যে কয়েকজন প্রতিভাবান নাট্যকার জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে এসে সফল নাটকের রচয়িতারূপে আত্মনিবেদন করেছিলেন, তার মধ্যে বেশ কয়েকজন আজও আমাদের কাছে শ্রদ্ধেয় ও স্মরণীয়। নাটকের কাহিনী, গতি, প্রকৃতি ও দর্শকের সম্পূর্ণ বদল হয়েছে। শুধু বদল হয়নি নতুন নতুন নাটক সৃষ্টির সামাজিক প্রেরণা .....।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ : ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দের ২৮ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় গিরিশচন্দ্রের জন্ম হয়। বাবার নাম নীলকমল ঘোষ। গিরিশচন্দ্র প্রবেশিকার পাঠ পর্যন্ত পড়াশোনা করে বিদ্যালয় ত্যাগ করেন। তারপর চার বছর বাড়িতে গভীর অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। প্রথমে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হয়ে বাগবাজারে একটি থিয়েটার দল গঠন করেন এবং 'সধবার একাদশী' নাটকের অভিনয়ে তিনি নিমচাঁদের ভূমিকা গ্রহণ করেন। কিছুকাল পর ন্যাশনাল থিয়েটার নাম হয়। এই থিয়েটারে টিকিট বিক্রয় আরম্ভ হলে গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে আর সম্পর্ক থাকে না। কিন্তু পরে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি অবৈতনিকভাবে যোগদান করেন। পরে ১০০ টাকা বেতনে অধ্যক্ষের কর্মভার গ্রহণ করেন। নাট্যশালার সঙ্গে যুক্ত হবার পর থেকেই তিনি নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন এবং সর্বসমেত ৭০ খানি নাটক, প্রহসন, গীতিনাট্য রচনা করেন। তাঁর রচিত নাটকগুলি নাট্যজগতে যুগান্তর উপস্থিত করে। গিরিশচন্দ্রের মতো অভিনেতা আজও নাট্যজগতে বিরল। তাঁর মতো সুনিপুণ অভিনেতা আমাদের দেশে খুব কমই জন্মগ্রহণ করেছেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভক্ত ও শিষ্য গিরিশচন্দ্র ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে পরলোকে গমন করেন। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে গিরিশচন্দ্রের প্রথম নাটক 'দক্ষযজ্ঞ' স্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রখ্যাত কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্ম হয় ১৯ জুলাই, ১৮৬৩। সুকণ্ঠ গায়ক ও বীণিকার পিতার প্রভাবে তিনি অল্প বয়সেই গায়করূপে পরিচিত হন। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজিতে এম এ পাশ করার পর সরকারি বৃত্তি-সহ কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য বিলাত যান। অল্প বয়সে কাব্য রচনা করে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কবিতাই রচনা করেন। তাঁর রচিত প্রহসন, কমেডি, ফার্স ও হাস্যরসাত্মক রচনাবলি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। জীবনের শেষ দশ বছর প্রধানত নাটক রচনায় মনোনিবেশ করেন। পৌরাণিক, সামাজিক ও ঐতিহাসিক ইংরেজি সবরকম নাটক রচনাতেই দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। স্বদেশী আন্দোলনে ভিন্নের যে অভিনব জাতীয়তা ঘটেছিল তিনি তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর রচনার মধ্যে 'চন্দ্রগুপ্ত', 'সাজাহান', 'মেবার পতন' ও 'প্রতাপ সিংহ' সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। দ্বিজেন্দ্রলাল ১৭ মে, ১৯১৩ সালে লোকান্তরিত হন। দ্বিজেন্দ্রলালের রচিত 'রানা প্রতাপ' ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ২২ জুলাই স্টারে প্রথম অভিনীত হয়।

রাজকৃষ্ণ রায় ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দের ২১ অক্টোবর রাজকৃষ্ণ রায়ের জন্ম হয়। কবি ও নাট্যকাররূপে তিনি অল্পের খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাঁর রচিত কয়েকখানি নাটক, উপন্যাস, কাব্য প্রভৃতির মধ্যে 'প্রহ্লাদ চরিত্র', 'নরমেধ যজ্ঞ', 'লায়লা মজনু', 'হিরণ্ময়ী', 'কিন্নরী', 'সংস্কৃত রামায়ণ ও অযোধ্যাকাণ্ডের পদ্যানুবাদ' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি বঙ্গসাহিত্যে বিশেষ পরিচিত। তাঁর আগে এত বই খুব কম লেখকই রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত নাটকগুলির মধ্যে 'প্রহ্লাদচরিত্র', 'নরমেধ যজ্ঞ' ও 'লায়লা মজনু' স্টার রঙ্গালয়ে অভিনীত ও প্রশংসিত হয়েছিল।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রখ্যাত নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ ১২ এপ্রিল ১৮৬৩ সালে খড়নহে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে রসায়নশাস্ত্রে এম এ পাশ করার পর প্রেসিডেন্সি অ্যাসোসিয়েট ইলিটিউশনে অধ্যাপনা শুরু করেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই সাহিত্যচর্চায় আগ্রহী হন। অভিজ্ঞানের ছদ্মে রচিত 'ফুলশয্যা' নামে প্রথম কাব্যগ্রন্থটি প্রথম উচ্চমানসম্পন্ন বাংলা নাটক বলে বিশেষ প্রশংসা অর্জন করে। তাঁর রচিত 'আলিবাবা' (১৮৯৭) প্রথম রসোত্তীর্ণ সফল নাটক। ঐতিহাসিক পটভূমিতে তাঁর রচিত নাটকগুলির মধ্যে 'রঘুবীর', 'বঙ্গের প্রতাপাদিত্য', 'আলমগীর' ও 'নন্দকুমার' দেশাত্মবোধের জাগরণে সহায়তা করেছিল। তাঁর রচিত দুখানি পৌরাণিক নাটকের মধ্যে 'ভীষ্ম', ও 'মহলায়রাণ' রঙমহলে অসীম সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের ৪ জুলাই ক্ষীরোদপ্রসাদ পরলোক যাত্রা করেন।

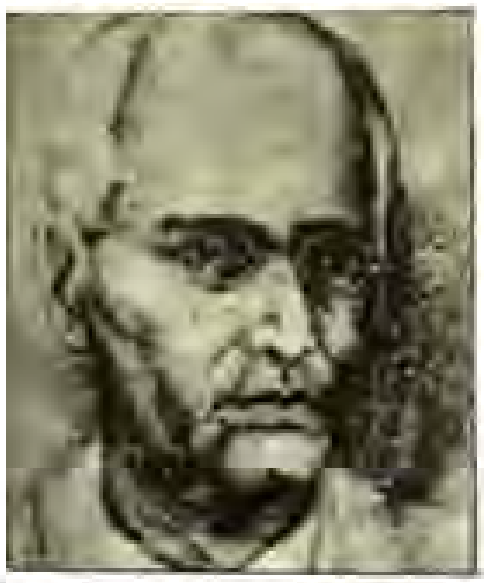

স্টার: অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

"থিয়েটারে উন্নতি করতে হলে কী করব?" এক নবীন অভিনেতা এই প্রশ্নটি করেন দিশারূপ অভিনেতা অর্ধেন্দু চৌধুরীকে।

অর্ধেন্দু চৌধুরী বললেন, "ধরুন করে কাজ দেবে, ধরুন করে দাম দেবে।"

"কী রকম?"

"হঠাৎ দেখলে থিয়েটারে আগুন ধরে গেছে। তখন তুমি কী করবে?"

"আগুন নেভাবার চেষ্টা করব।"

"একদম ও চেষ্টা করবে না।"

"সে কী? কেন?"

"এ আগুন কোথা থেকে এল? তুমি জান না। তারার ইলিশির কথা ধরতে পারে। এ অভিজ্ঞতা যেকোনও হয়, তাই বা তুমি কী করে জানবে? সেক্ষেত্রে উপকারের জন্য করতে গিয়ে মালিকের ক্ষতিও তুমি করে ফেলতে পারো।"

অভিনেতাটি দুঃখিত হলে, "তাহলে আমি কী করব?" "সোজা চলে যাবে উলটো ফুটপাথে। নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে নয় দেখবে।"

"কী দেখব? চোখের সামনে—"

"পুড়লো যা নিবলো। আগুনের জন্য শেষ হয়ে গেল।"

"তখন তুমি কী করবে?"

"আর আমার কী করবার আছে! বাড়ি চলে যাব।"

"একদম না, বাড়ি যাবে না।"

"তাহলে কোথায় যাব? ফুটপাথেই দাঁড়িয়ে থাকবো কী করে?"

"না। তখন তুমি থিয়েটারের মালিকের কাছে যাবে। গিয়ে জিজ্ঞেস করবে, স্যার, আজ কি থিয়েটার হবে?"

"অর্থহীন এ প্রশ্ন।"

"তিনি যদি বলেন—না, হবে না—তখন বাড়ি যাবে। জিজ্ঞেস করবে এই জন্যে, মালিক যদি পরে বলেন, থিয়েটার আমার জন্যে আর পড়ুক, আমি অভিনয় করতুম। না জানিয়ে চলে গিয়ে অভিনয় বন্ধ করলেন তুমি, তোমার 'অ্যাবেন্স' নিতে হবে। তাই মালিকের কাছে অনুমতি নিয়ে তবে বাড়ি যাবে। নইলে প্রেমার ঘাড়ে অ্যাবেন্সের ভার চাপতে পারে। এটা মনে রাখতে বলছি।"

হয়তো নিছক গল্পই। হয়তো অর্ধেন্দু চৌধুরীর পেশাগত অভিজ্ঞতার বিষয়ে এটি একটি রস-আখ্যান। যদি তাই হোক, তবে আগুন লাগার ঘটনাটি অর্ধেন্দু তুললেন। নিশ্চয়ই বিষয় সংকট বোঝাতে। থিয়েটারে, মঞ্চে আগুন লাগে। ছবিটি কল্পনাপ্রসূত। কেন আগুন লাগতে পারে তার কিছু ইঙ্গিত দিয়েছেন অর্ধেন্দু চৌধুরী। কিন্তু এ আলোচনায় আমরা যাব না। এটা বিশেষজ্ঞদের আলোচ্য। সম্প্রতি বন্ধ হয়েছে স্টার। কলকাতার পেশাদারি থিয়েটারের মুকুটমণি।

স্টারের ইতিহাসের সূত্রপাত ১৮৮৩-তে। ন্যাশনাল থিয়েটারের [illegible] কয়েকজন নাট্যশিল্পী। ক্রমে এর মালিকানা চলে যায় অন্যদের হাতে। ১৮৮৩-তে মালিক ছিলেন প্রতাপ জহরি।

এই বাড়িটার সঙ্গে শিল্পীদের সম্পর্ক ভাল ছিল না। বিবাদটা চলছে এসে বিনোদিনীকে কেন্দ্র করে। অনুষ্ঠানের জন্যে বিনোদিনী দুটি নিয়েছিলেন। প্রধান ভূমিকা দুটির মধ্যে নিতে রাজি হলেন না "মহিলা কেরা ? তোমরা তো কাদ মেরি নিয়া।" বিদ্রিশ-অনুগত বিনোদিনীকে বিদায় করতে এতটা করলেন। একজন ধনী ব্যবসায়ীর পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি একটি থিয়েটার করে দেবেন। তবে তিনি বিনোদিনীকে একঘরকারে হান। বিনোদিনী তখন একজন খ্যাতকর্মা অভিনেত্রী। তাঁর অভিনয় ত্যাগ করতে চান না বিনোদিনী। গিরিশ গণিকার সঙ্গে যে একনিষ্ঠ সাধকের চিত্রকে গুরুত্ব দেবেন। তাছাড়া বিনোদিনীর মনে এটির নাম হবে 'নি' থিয়েটার। পৃষ্ঠপোষক থিয়েটার করে দিলেন। বিনোদিনীর চরণামৃতের উপর উঠল স্টার, 'নি' থিয়েটার নয়। স্টার প্রতি-প্রত্যুষে ন্যাশনালেরই কার্বনকপি। উত্তরসূরি। প্রথম শিল্পী ও কর্মীরা প্রায় একই। বড় পার্থক্য মালিকানায়। পত্তনের সময় ন্যাশনাল ছিল শিল্পী ও কর্মীদের। স্টার হল একজন অভিনেতার। থিয়েটারে অনাত্মীয় নটী-সোদপুর এক অভিনেত্রী। নটী-যোগে মালিক বা পৃষ্ঠপোষক ধরা পেশাদারি থিয়েটারের ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে আজকেও।

স্টার নামের একটা পূর্বসূত্র আছে। ১৮৮৩-র ৬ ডিসেম্বরটি 'চাকর বধ' অভিনয়ের পর গিরিশচন্দ্র সকলে প্রতাপ জহুরির ন্যাশনাল থিয়েটার ছেড়ে আসেন। তার 'দক্ষযজ্ঞ' নিয়ে স্টারের যাত্রারম্ভ ঘটে ১৮৮৩-র ২১ জুলাই। দুয়ের মধ্যে মাত্র পাঁচ মাসের ব্যবধান। এই সময়ে অর্থাভাব হল তৈরি হচ্ছিল। গিরিশচন্দ্র তখন আলমবাজার স্টার কোম্পানি নামে একটি জল পড়ে বেঙ্গল থিয়েটার হল-এ কয়েকটি নাটক করেন। এই স্টার নামটিই প্রতাপজির 'নি' নামটিকে হটিয়ে দেয়। স্টার জন্মাবার আগেই তার নাম গিরিশ সংগঠনে একরকম ঠিক হয়েই ছিল।

বাগবাজার থিয়েটারের জন্মলগ্নে একটা জাতীয় আবেগ কাজ করেছিল। 'ন্যাশনাল' নামের উপযোগী হবে না বলে ন্যাশনাল থিয়েটারের পত্তন-র সময় গিরিশ বিধুর করেছিলেন। স্টারের আগে প্রায় সব থিয়েটারের নামই জাতীয় আবেগের একটা ছাপ থাকত। ন্যাশনাল, বেঙ্গল, গুরিয়েন্টাল, গ্রেট ন্যাশনাল ইত্যাদি। স্টার এই ধরনের ব্যতিক্রম হোলো। এই সময় থেকে থিয়েটারের নাম হয় এমারেল্ড, টীন, মিনার্ভা, ক্লাসিক, রঙ্গালয়, সিটি, কোহিনুর, আর্ট থিয়েটার, মিত্র, প্রাণ, ফাউন, কর্নওয়ালিস,

নরেশ মিত্র

এম্পায়ার, রঙমহল, নাট্যনিকেতন, ছবিঘর ইত্যাদি। নামের মধ্যেই পরাধীনতার একটা ছাপ আছে। তবে আমাদের ন্যাশনালও পুরো ন্যাশনাল নয়।

নাম নিয়ে আমাদের থিয়েটারের ইতিহাস বেঙ্গলে একটা বড় সৃষ্টিছাড়া 'নরেশ বেঙ্গল থিয়েটার'। জাতীয় সূত্র মেনে আগে নাম ছিল, বেঙ্গল থিয়েটার। ১৮৯০-এর ৭ জানুয়ারি মহারানী ভিক্টোরিয়ার বড় ছেলে প্রিন্স অলবার্ট ভিক্টরের অন্তর্ধানের জন্যে ঘণ্টের মাঠে বেঙ্গল থিয়েটার 'শোকসভা' অভিনয় হোয়। তারপর থেকে এই নামের আগে যোগ করে 'রয়াল' জনতাটা 'রয়াল' অর্থাৎ 'রয়ালিস', আমরা ন্যাশনাল। জাতীয় বোধে উদ্দীপ্ত কিন্তু আমরা রাজভক্ত, নরমপন্থী, আমরা সংবেদিক, কিন্তু বিদেশি শাসক-রাজার প্রতি অনুগ্রহে নত।

গিরিশরা ভেবেছিলেন নিজেদের একটা থিয়েটার। অর্থাৎ শিল্পী ও কর্মীদের থিয়েটার। কিন্তু একজন অভিনেত্রীর জন্য মালিক হওয়ার কথা ওঠে, তখন তিনি তা সমর্থন করতে পারেন না। ছলে ও কৌশলে সে-প্রস্তাব বানচাল করে দেন। অর্থাৎ গণিকা অভিনেত্রী ঠিক 'নিজেদের নয়'। যদিও কথাটাই 'পর' অর্থে বলা হয়েছে বিনোদিনীর লেখায় ছত্রে ছত্রে তার প্রমাণ আছে। অর্থাৎ রঙ্গীয় বাড়ি পরের ধুলো দিলেই আমরা 'রয়াল'। কিন্তু একজন অভিনেত্রী অন্ন-বাসে-বাস দিলেও সে 'বাইরের লোক' বা 'পর'। গিরিশ গণিকা নিয়ে অভিনয় করার পক্ষে অনেক কথা বলেছেন। এই সব দেখে মনে হয়, তাঁদের নিছক স্বার্থে, প্রয়োজনে, প্রমুখ হিসেবে তাঁদের মূল্য দিতে নয়।

পত্তনীন দেশের মধ্যবিত্ত প্রয়াসের শীর্ষবিন্দুতা নিয়ে বাগবাজার থিয়েটার, তার 'ন্যাশনাল' থিয়েটার, স্টারও এই পথেরই পথিক। কিন্তু গিরিশ প্রমুখ 'ন্যাশনালের' বিখ্যাত শিল্পীরা অনেকেই স্টারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাই গোড়া থেকেই স্টার সম্পর্কে অনুগ্রহের প্রবণতা ছিল বেশি। প্রযোজনা পুরণ না হলে ক্ষোভ বা দুঃখ প্রকাশ করত। পুরণ হলে খুশি হয়। স্টারকে তারা অনেকটাই নিজেদের মনে করত। এই ফিরে ফিরে স্টার যথার্থই 'ন্যাশনাল'। নামে ন্যাশনালের কাছ থেকে সরে গেলেও ন্যাশনাল থিয়েটারের স্বত্ব তারা প্রথমের স্টারেরই রয়েই দেখত।

অল্পের বছরের মধ্যেই 'অনুসন্ধান' পত্রিকা (১৫ শ্রাবণ ১২৯৭) লিখল "আজকাল থিয়েটারের বাজারে স্টার থিয়েটারের খাতিই নামডাক। কারণকে কলাকে চারিদিকে সুখ্যাতির ছড়াছড়ি। আর সেইজন্যই, স্টার থিয়েটারে কোন নিন্দু অভিনয় হইয়ে গুনিলেই লোক আর ঘরে

না—তিনি তাঁর সমস্যাই অভিনয় দেখিয়ে তুলবেন।"

আমার কিন্তু মনে হয় এই 'অনুসন্ধান' পত্রিকাতেই (৩০ সেপ্টেম্বর ১৮৯০) লেখা হয় "স্টার থিয়েটারের অন্তরঙ্গ খুলিয়া।" তারা স্টারের উপর অনেক আশা ভরসা করেছিলেন। কিন্তু সে-আশা এখন নিচ্ছে না। ফ্রি-শোর ও অভিনয়-লোপ দেখে তাঁরা ক্ষুব্ধ। সাংবেদিক আশঙ্কান্বিত হয়েছেন, মেয়েদের বারবার আসরে নামা কেলেঙ্কারির কথা তুলেছেন।

এখানে যে সব লোকের কথা বলা হয়েছে, তা অন্যান্য থিয়েটারেরও ছিল। হয়তো বেশিই ছিল। কিন্তু স্টার সম্পর্কে অন্যান্য সংবাদ অনুযোগ। সেই সংবাদ মনোযোগেই পরিচয় এটা। সাময়িক কোনও কারণে খুব রুষ্ট 'অনুসন্ধান' পত্রিকার সম্পাদক। কিন্তু এই বিরুদ্ধ সমালোচনার শুরু 'আলা-উদ্দিন'-র কথা নিয়ে। আর এ কথায় এই সত্যে ঘরে রাখবার যে 'স্টারের বড়ই নামরাক' ইত্যাদি শনিরপ্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছে 'অনুসন্ধান'ই পাওয়ার মাত্র দু মাস আগে।

বাংলা থিয়েটারের সূচনায় নীলদর্পণ, উপেন্দ্রনাথ দাসের শরিফ এবংনিয়ে 'ন্যাশনাল' তার কিছুটা ছিল। (অন্যান্য আরও অবশ্য ছিল)। ১৮৭৬-এর আগে নানা কারণে এই 'ন্যাশনাল' তারের একটা বিশ্লেষণ করা যায়। ১৮৭৬ সালে নাটি নিয়ন্ত্রণ আইন হয়। এর পরে 'ন্যাশনাল' বিষয়টা বাদ পড়ে, ইংরেজ বিরুদ্ধ নাটা-বিশ্লেষণ লিখিত হয়ে পড়ে। ক্রমে ঝোঁক বাড়ে পৌরাণিক দিকে। এই পুরাণ-চর্চা তখনো ভারত-সন্তানী নয়, তখনো হিন্দুত্ব-সন্তানী। ধারণা নয় তখনো, তখনো অপৌরাণিক। 'মুক্তির' তারে রক্তির দিকে ঝোঁক নেই। কর্মিক প্রায় সবই হিন্দু। তাই বিক্রি ভাল, ব্যবসা ভাল। তাছাড়া তখন হিন্দু-পুনরুজ্জীবনের শরৎ হাওয়া লেগেছে। তার প্রভাবও পড়ল মঞ্চে। এবং স্টারেও।

স্টারে অভিনয় দেখতে এলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। নটী-সাধিকা-প্রেমু নাটী জগতকে তখন পৌরা বাঙালিরা মনে করত নরক। সেই নরকে পা দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। দেখলেন টৈতন্যলীলা। অভিনয় দেখার পরে বিনোদিনীর সঙ্গে দেখা করেছেন। বিনোদিনীর আবার উপর হাত দিয়ে 'মাকে হৃদয়ে পবিত্র' করে বলেছেন, "মা, তোমার চৈতন্য হোক।" বিনোদিনীর ওঁকে মনে হয়েছে 'পাতকীতারণ পতিতপাবন'. পরে অন্যান্য দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ দেখেছেন প্রহ্লাদ চরিত্র, বিল্বমঙ্গল চরিত্র, দক্ষযজ্ঞ।

অমৃতলাল বসু

শ্রীরামকৃষ্ণের মঞ্চের সঙ্গে সংযোগ রাখতে স্টারের সঙ্গেই সংযোগ, এই সংযোগ থেকেই ওঁর প্রভাব নানা রঙ্গমঞ্চেই ছড়িয়ে পড়ে। বিনোদিনীকে তিনি মানুষের মর্যাদা দেন, শিল্পীর সম্মান দেন। সেই সম্মান পায় অনেক সকল শিল্পী। শুধু অভিনেত্রী নয়, অভিনেতারাও অনেকে 'পাপ'-সমের হীনতাবোধ থেকে উত্তীর্ণ হয়। এমন কি কর্তৃপক্ষেরও পরিবর্তে বলবার মতো একটা কথা হল যে, তারা নটী-নায়ক দেখতে যাচ্ছে না, যাচ্ছে ধর্ম-চর্চা করতে। বিদেশিক ও বাঙালিরা সংকীর্তন শুনতে ভেঙে পড়লেন। স্টার থিয়েটারে যাত্র হয়ারে ঘোষণা করতে লাগল Soul-dissolving Hari Sankirtan.

কর্মাধ্যক্ষলাল স্টার থিয়েটারের উদ্বোধন হল ১৮৮৮-র ২৩ মে তারিখে। উদ্বোধনসঙ্গীতে অমৃত বসু লিখিত একটি কবিতা গাইও করলেন। "হিন্দুধ্রুপ কোহিনুরাকার / ধর্ম প্রাণ ভোরে পরিচয়—/ ধর্ম বাসনার।" জাতীয় রঙ্গালয় হওয়ার কথা ছিল যার, সেই নিজের প্রসঙ্গেপে যার যাত্রা শুরু, সে এই পর্বে পরে বসলাতো। জাতীয় রঙ্গালয় হয়ে গেল ধর্ম রঙ্গালয়। অনেকের কাছে 'হিন্দু' ও 'জাতীয়' প্রায় সমার্থক হয়ে গেল।

এত ধর্ম-সংকীর্তন অবশ্য অনেকের পছন্দ হচ্ছিল না। সমসাময়িক নাটকে 'সরস' (২২ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৮) অভিযোগ হল পাক্ষিক 'অনুসন্ধান' পত্রিকা লেখে "স্টার রোশনাই সহর ভুলিয়া—লোকের রুচির প্রতি লক্ষ্য করিয়া নাটক চিত্রের উৎকর্ষ দেখাইতে অগ্রসর হইয়াছেন...। ধর্মের ঢেউ, হরিবোলের ধুম এখন কিছু অধীকৃত হইতে চলিল।... এ অভিনয়ে সমাজের মহতেই উপকার হইবে তাহিবয়ে কোন সন্দেহ নাই।" (সাহিত্য-সাময়িক-চরিত্রমালা—৪৭)। স্টারের কাছে এই পত্রিকা ধর্মের ঢেউ বা হরিবোলের ধুম চায় না। চায় সমাজ-উপকারী নাটক। এবং সেটাই 'লোকের রুচি', এঁদের মতে।

স্টারের স্বাধীনতীতি ছিল। আমার ইংরাজ প্রীতিও ছিল। ১৯০৪ সালের ৬ সেপ্টেম্বর বঙ্গভঙ্গের সরকারি ঘোষণার দিন শোক-পালন করে অভিনয় বন্ধ রাখা হয়। ২৪ ডিসেম্বর বিদেশি দ্রব্য বর্জন বিষয়ক নাটক 'সাবাস বাঙালি' অভিনীত হয়। অবশ্য বাজেয়াপ্তিতে স্টারের ভয় ছিল না। ১৮৯২ সালের ১৬ জানুয়ারি মহারানি ভিক্টোরিয়ার পুত্র ডিউক অফ এডিনবরা ডিউকের মৃত্যুতে 'জাতীয় শোক' পালন করে অভিনয় বন্ধ রাখে। ২০ জানুয়ারি তারিখে বিজ্ঞাপনে জানায়, 'শক সেন্স দি কুইন' অর্কেস্ট্রার বাজানো হবে এবং দর্শকেরা যেন সবাই তখন থিয়েটারে থেকে সম্মান জানায়। ১৮৯৭-এর ২১ জুন

করিয়া নিরিশবাবুকে 'ইংরাজ কুটিলী' অভিনীত হয়। মিনার্ভা থিয়েটারের পঞ্চমবর্ষের পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নাট্যের আনন্দ উৎসব।

এই জাতীয় অনুষ্ঠানটিই ও হিন্দুধর্ম প্রীতির সঙ্গে যুক্ত ছিল প্রত্যক্ষভাবে বিনোদ। 'সরলা' থেকেই একটা পৃষ্ঠায় দিই। 'ভারতী' পত্রিকায় (অগ্রহায়ণ ১৩০৩) মিনার্ভা থিয়েটারের অভিনীত 'সরলা' সম্পর্কে একটি আলোচনা বেরোয়। "নিরিশ বাবুর পঞ্চকন্যা নাটক থিয়েটারের পক্ষগণ সর্বতোভাবে অনুকরণ করিয়াছেন।... অনুশোচনা হয় যে একের ত্রুটি অন্যের সংশোধিত হইল না কেন ?" এই ত্রুটির মধ্যে প্রথম একটি অভিনয় চিত্র রয়েছিলেন। 'ভারতী'-র সমালোচক বলছেন, "পরিত্রাণ শেষে যখন বাটে গিয়া উত্তীর্ণ হয়, তখন সে নিজের দীনা অবস্থার করে, তখন আর তাহাকে কিছুতেই মানানো করা যায় না। প্রাণপণে বিলুপ্ত করিতে গিয়া যখন অভিনেত্রীরা পদোন্মাদ পাদক্ষেপকে তাঁহাদের চিত্তকে পরি পরিমাণে নিহিত এবং দীর্ঘশ্বাসে দীর্ঘশ্বাস প্রভৃতির নিহিত চলনকে উচ্চ কণ্ঠে অনুবাদ করিয়াছেন, বিলুপ্ত জলিয়াস যখন তাহাকে স্পষ্ট উচ্চারণে মনে মোকদ্দমা করিয়াছেন, প্রতি রাত্রি দর্শকমণ্ডলী আমোদের জন্য এই ইসি টিপার অনুসরণ করিতেছেন, তখন তাঁহারা নিজের বর্ণাশুদ্ধি নিজে পালাতে করিতেছেন। তখন কালাকালপরে হিন্দু নাগরেরা অধিবাসী হলে বিলুপ্তাক্ষর হলে 'ধ' তৎ সৎ' পদ উচ্চারণ করেন তখন কি একেবারেও তাঁহাদের আক্ষেপের কারণ থাকে না ? পত্র পত্র বিশ্ব অপ্রাণ কালে বলিয়া ইহা শুনিয়া যদি একদিনের জন্যও কি অন্তরে প্রবেশ করে নাই ?"

নাটকীয় প্রয়োগক্ষেত্রে সীমা অনেক সময় চমৎকার 'অভিনয়'-গুণের অবতারণা করে অভিনয়ের ছন্দের ঢেউ তোলে। কখনো উপর আসনে বসে কখনো দাঁড়িয়ে, ও কিংবা (দক্ষিণে) অঙ্গে প্রত্যুষীয় পাত্রের উপরে অবতরণের নৃত্য, পাশির পোশাক ছুলে নিয়ে আকাশে ওড়া (নাটকীয়ই), পিয়ানোর (বৃষকেতু) প্রভৃতি দেখানো হত। অনেক অঙ্কে এই জাতীয় কৌশল কৃত্য বিশ্লেষণ দেখানো হয়েছে।

অভিনয়ের ক্রমবিকাশের অভিনয় ইতিহাস বিশ্লেষণের সাহায্যে দৃষ্টিগোচর হয়। ন্যাশনাল থিয়েটারের 'মেঘনাদ বধ' অভিনয়ের প্রসঙ্গে 'ভারতী' পত্রিকায় বাসনার নাট্যশালা সম্পর্কে এবং তাদের অভিনয় ইতি সম্পর্কে এই মন্তব্য করে "অমৃতের নাট্যশালার একটা বড় আশ্চর্য দেখিতেছি, কতকগুলি ইংরাজ ছাত্রের আবশ্য

হরি ভিখারী

হইয়াছে, কিন্তু যেমনের বয়ঃ দেখিয়াছিলাম আজো তাহাই দেখিতেছি, ইহার আর উন্নতি হইল না। যাঁর বল অভিনয় করিতে হইলেই তাঁহারা চিৎকার করিতে থাকেন, কখন বল হইলেই তাঁহারা নিস্তব্ধ টানিয়া টানিয়া বিকৃত অস্বাভাবিক স্বরে কাঁদিতে থাকেন, হাস্যরসের অবতারণা করিতে হইলে বিবিধ অসম্ভব অঙ্গভঙ্গি করিয়া বিকৃত কণ্ঠে যে কত প্রকার ভাঁড়ামি করিতে থাকেন তাহার অন্ত নাই। যাঁর চলার পরীর অভিনয় যে কিরূপ তাহা তাঁহারা জানেন না। তুলির চলন আস্ফালনই তাঁহাদের আদর্শ। তাঁহারা যখন চিৎকার, অভিনয় করিতে থাকেন, তখন তখন বলের অতিরিক্তার ঘূর্ণে অঙ্গভঙ্গি উল্টা এমন বিপরীত ভোগ হয় যে, তাহা আর বলিবার নহে, আর তাঁহারাও না করিলেও যে হাসাইবার সহায় উপায় আছে ইহা কি তাঁহারা এ পর্যন্ত বুঝিবেন না ? কিন্তু দর্শকমণ্ডলীরই বা কিরূপ বিচার ? নাটকের যদি কোন বীর প্রাণপণে তার কণ্ঠে চিৎকার করিতে পারিলেন, যদি কোন লোকোত্তর ব্যক্তি দুই তিনটি কথা বলিয়া সোজা হইয়া মূর্ছা যাইতে পারিলেন, তবে আর রক্ষা নাই, করতালির পর করতালি রঙ্গভূমির অন্তর্ধান হয়ে অপেক্ষাও আমাদের বিরক্ত করিয়া তোলে। দর্শকমণ্ডলীর রুচির উপর অভিনেতার এবং অভিনেতাদের অভিনেতার উপর দর্শকমণ্ডলীর রুচির উন্নতি নির্ভর করে সত্য এবং নাট্যশালাধ্যক্ষেরা বলিতে পারেন যে দর্শকদের যাহা ভাল লাগে সেই অনুসারেই তাহাদের কার্য করিতে হইবে। কিন্তু ইহা তাঁহারা নিশ্চিত জানিবেন যে, ভাল অভিনয় হইলে দর্শকদের সন্তোষজনক হইবে না ইহা অসম্ভব। যদি দর্শকদের রুচি একই বিকৃত হইয়া থাকে, তবে তাঁহাদের দেখেই হইয়াছে এবং তাঁহাদেরই দ্বারে তাহার সংস্কারের ভারও আছে। ...মেঘনাদের চরিত্র যদিও সুন্দর সংগতভাবে অভিনীত হইয়াছিল কিন্তু প্রমীলা চরিত্র তেমনি জঘন্য। প্রথমত সে যাহাই বলুক না কেন, তাহার মুখের ভাবের কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় না, কি এক প্রকার হাসি, তাহার মুখে সর্বদাই লাগিয়াছিল। দ্বিতীয়ত সে অত দৌড়াদৌড়ি করে কেন বুঝিতে পারিলাম না। সে ছুটিয়া রঙ্গস্থলে প্রবেশ করে এবং ছুটিয়া রঙ্গস্থল হইতে প্রস্থান করে....। রাবণের অভিনয় ভালো হয় নাই। সেখানে সখীকে সম্বোধন করিয়া কি সুন্দর 'ভাল আছি পরিচয়' ইত্যাদি তাহার প্রতি ছত্রে ছত্রে ঔষধ উপদেশের ভাব প্রকাশ রহিয়াছে, করিয়েছেন, সে স্থলে রাবণ

এমন চাহারার সঙ্গে বিলাস করিয়াছিলেন যে তাহা অভিনয় বিশ্লেষকদের দৃষ্টিও এড়াইয়া যাইতে পারিত।" যোগেনের অভিনয় সম্পর্কে অন্যান্য অভিনেতার এমনি অভিমত যে তাহাই আশ্চর্য!"

ন্যাশনাল থিয়েটারের এই অভিনেতার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ অতি অভিনয় এবং সংযমের অভাব। একে দুহাতে কিছুটা কমিয়ে উঠতে পেরেছিল স্টার। স্টারের 'প্রফুল্ল' প্রসঙ্গে 'ভারতী' ও 'বালক' পত্রিকার (কার্তিক ১২৯৬) বলা হয়েছে যে আট দশ বছর আগের অভিনয় ছিল 'অত্যন্ত রগরগে'। দর্শকরা যাঁদের প্রকাশ করতেন 'টিংকার গার্জনে' বেহেড মাতিসুরে বিনিয়ে বিনিয়ে কথা বলত। সমস্যাই ছিল 'অস্বাভাবিক'। এখন আগের চেয়ে কিছুটা ভাল, তবুও এখনও যোগেশ (অমৃত মিত্র) অভিনয়ের জায়গায় 'অতি অত্যন্ত টিংকার' করে, 'সাধারণ ভাষাতেই' মনের আবেগ অধিক প্রকাশ পায়, তা এঁরা এখনও জানেন না। জগদম্বিনী (হিরাঝিনি) সবচেয়ে ভাল। অভিনয় 'স্বাভাবিক'। 'কিন্তু জগদম্বিনী বাঙ্গালাদেশের স্ত্রীলোক হইয়া একবার রাগরাগিনী সহকে, একবার কম্পাউণ্ডারের সুর—বলা নাই কহা নাই কখন কি দিয়ে ইয়া একটু কেমন খেয়াল।" অন্যান্য মেয়েদের অভিনয়ের প্রসঙ্গে করেন বলছেন 'কিছু লিখিয়া কহা বড় দায়'

'ভারতী' ও 'বালক' পত্রিকার 'চৈতন' নাটকের প্রসঙ্গে কথা হয়েছে। লিখেছেন : "অভিনয় প্রীতি হইয়াছি।" সবচেয়ে ভাল পূর্ণিমায় অহী ও ধরণীর অভিনয়। "অহীর পরিহাসচ্ছলে যথার্থ উক্তিগুলি সুন্দর অভিনীত হইয়াছিল। চৈত ও জগদম্বার অভিনয় উত্তম হইয়াছে। গঙ্গামণি ও তাঁহার সখীও মন্দ হয় নাই। আহেরীগণের নৃত্য ও সঙ্গীত সুন্দর হইয়াছিল।" কিন্তু "বৃদ্ধ বৃন্দাবনির মধ্যে একটিও ঐতিহাসিক বৃদ্ধ নাই, কেবল কতকটা অস্বাভাবিক কম্পকম্প দেখা গেল বিন্দুবাসীর পাগলিনীর অভিনয় একটু অতিরঞ্জিত মনে হইল।"

স্টারে 'বুদ্ধদেব চরিতে'র অভিনয় দেখে 'ভারতী' ও 'বালক'-এর সমালোচক 'বিশেষ সন্তুষ্ট' হয়েছেন। সমস্তেরই ছাড়িনয় বিশেষতঃ প্রভা গঙ্গোপাধ্যায় ও নিরুপমার অভিনয় 'আশাপেক্ষা অতি সুন্দর হইয়াছিল। এ প্রকার বিষয়ের অভিনয় সমাজের পক্ষে প্রকৃতই মঙ্গলজনক।" সমালোচক সমাজের কথাটা বিশেষভাবে স্মরণ করেছেন।

'ভারতী' ও 'বালক'-এর সমালোচক স্টারে 'হাম্বির' দেখেননি। কিন্তু বলেছেন, "স্থানে স্থানে মুক্তকচির অভাব লক্ষিত হয়।

নাট্যকার দেবী

অশ্লীল কথাগুলি না বলিলেই ভাল হইত।" অর্থাৎ ভালো মঞ্চের ভাঁড়-মোর খুড়ো কাটিয়ে উঠতে পারেনি স্টার।

বাংলা মঞ্চে তিনি নাটকের প্রথম অভিনয় করেন স্টার। তেজচন্দ্রনি রাজলক্ষ্মীদের ঠাট্টা করেছেন। তবে তাঁর মৃত্যুতে স্টার বন্ধ থাকে এবং তাঁর স্ত্রীকে অর্থ সাহায্য করা হয়। এই উদার সৌজন্য স্টার দেখিয়েছে। যেন বাংলা থিয়েটারের প্রতিনিধি তারা, বাংলা থিয়েটারের পক্ষ থেকে এই সব পত্রিকা পালন করেছে তারা।

অনেকগুলি রবীন্দ্র-নাটকের প্রযোজনা করেছে স্টার। অবশ্য রবীন্দ্রনাথকে অবতরণ অনুপ্রেরণায় করেছে স্টার। দ্বিজেন্দ্রলাল রচিত 'আনন্দবিদায়' স্টারে নাচিয়েছিলেন তরুর দত্ত।

বিডন স্ট্রিট স্টারের প্রতিষ্ঠার মূলে সবচেয়ে-বড় কর্মকর্তা বিনোদিনীর। কিন্তু সেখানে কাজ করার তাঁর শক্তি ছিল না। প্রতিষ্ঠাপনে স্টারের গঠনে বিনোদিনীর বিশেষ আর্থিক ও অন্যবিধ সহায়তা ছিল। কিন্তু বিনোদিনীর শক্তি ছিল না সেখানে। তাঁর সব নাটক সেখানে করা হয়েছে। কিন্তু স্টারে তিনি যেন সর্বদাই অন্যায়ী। এই আসছেন, আবার চলে যাচ্ছেন, আবার আসছেন। বিনোদিনীর মানসিক দুর্বলতার কথা, কিন্তু তাঁকে বঞ্চিত করা হয়েছে। নিরিশেরও মানসিক দুর্বলতার কথা। কিন্তু তিনি মানসিকতা ফেরেছেন বেশ্যায়। তাঁর দুজনেই যেন একাধারে মানসিক এবং অ-মানসিক। নৈতিক দিক থেকে মানসিক, অর্থনৈতিক দিক থেকে তা নয়। অহীন্দ্রও তা নয়। আমরা অবশ্য দোষ-গুণের বিচারে যাচ্ছি না। কিন্তু এ কথা সত্য যে মানসিক বা অ-মানসিক যে কোনও একটা হলে অন্যদের সঙ্গে সম্পর্কে কম ভুল পাওয়ার। কিন্তু একাধারে মানসিক এবং অমানসিক হলে সম্পর্ক জটিল হয়ে পড়ে। ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা বাড়ে। দুই ক্ষেত্রেই তা দেখেছে।

স্টার প্রযোজনায়-নির্দেশনায় কাজ-যাঁরা সহায়তা পায়নি বিনোদিনীর। স্টারের মূলের নিরুপমা নিলির অকালমৃত্যু তাঁর নবনাট্য মন্দির পর্বে (১৯০৬-৭৭) মাত্র কয়েক বছর ছিলেন স্টারে। তাঁর কর্মজীবনে তেমনই স্টারের ঘটিয়ে। দুই যুগের দুই প্রজন্মের বিশেষ অনুকূলতা না পেয়েও স্টার কিন্তু অনবদ্যই উজ্জ্বল। গোপাললাল শীলের কাছে স্টার কর্তৃপক্ষ বাড়ি বিক্রি করেছিল, কিন্তু গুডউইল বিক্রি করেনি। এ তাঁদের দীপ্ত অহংকার নয়। সত্যি একটা গুডউইল তাঁর সৃষ্টি করেছিলেন। তাই বাংলা নাট্যমঞ্চের দুই যুগসন্ধিক্ষণের অনুকূলতা না পেয়েও তাঁরা

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় উৎপলকুমার

থিয়েটারে এক নয়ন। এ এক প্রাপ্তির ঘটনা।

প্রথম দিকে প্রশাসনকে ঘরে রেখেছিলেন অমৃতলাল বসু। দ্বিতীয় পর্বে অপরেশ-প্রবোধ জুটি। নির্বেশনায় পরিচিত ছিলেন অপরেশ-কবীন্দ্র প্রমনাথ। সিনিয়রকুমারের আলোর কারুকাজ যখন ছিল অলবিয়ারে জুটি থিয়েটারের (স্টার) হাতে নবরূপের উন্মোচন হয়েছিল। এই দুই সিনিয়রকুমারের নামে ছিলিত, কিন্তু সিনিয়রকুমারের প্রতিস্পর্ধী থিয়েটার জুটি থিয়েটার (স্টার)। এই অবস্থা দীর্ঘজীবন বজায় ছিল।

তৃতীয় পর্ব সলিল মিত্রের প্রশাসনে সমৃদ্ধ। দক্ষ, ভদ্র। কর্মীদলের কিন্তু কারো কাছে নাক গলাননি। তাঁর সঙ্গে যাঁরা কাজ করেছেন তাঁরা সকলেই তাঁর প্রশংসায় মুখর। কর্মী-শিল্পীদের বেতনক্রম, প্রভিডেন্ট ফান্ড গ্র্যাচুইটি— এ সবই তিনি প্রবর্তন করেছিলেন। এবং এ সব এই একবারই ঘোষণা হয়ে বাংলা থিয়েটারে হয়েছিল, হয়েছিল স্টারে।

এঁর দীর্ঘ প্রশাসনকালে পর পর দুজন নির্দেশক প্রশাসনের কাজ করেছেন। মনোজ মিত্র ও বেতারকুমার মিত্র। মনোজবাবু সৌখিনিক ও ঐতিহ্যিনিক নাটকেই বেশি করেছেন। ব্যক্তিগত সম্পর্কে তিনি নির্মলেন্দু-অনুরাগী। অভিনয় ক্ষেত্রে শিশির-অনুসারী। এই দুইয়ের মধ্য দিয়ে তাঁর যাত্রা। বেতারকুমার শুধু করেছেন সামাজিক নাটক। অনেকগুলি তার মধ্যে আধুনিক উপন্যাসের নাট্যরূপ। মধ্যবিত্ত বাঙালির সঙ্গে সেন্টিমেন্ট তাঁর প্রধান উপজীব্য।

সলিল মিত্রের পরে মালিক হলেন রঞ্জিতকুমার আলোকচিত্র। তিনি নির্দেশকও। তবে নাটক নয়, সিনেমার ক্ষেত্রে। তবে তাঁর সম্পর্কেও একটি কথা বলবার আছে। তিনি মঞ্চে আসেননি। তবে সলিল মিত্র প্রবর্তিত শিল্পী-কর্মীদের অনেক সুযোগ-সুবিধা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। তাঁর আমলেই মালিক-কর্মচারী বিরোধে অনেক দিন স্টার বন্ধ থাকে। অভিনেতাদের সময় নির্দেশক ছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

সেখানে কাজ করেছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরী সম্পর্কে একটি গল্প দিয়ে। সেখানে নবীন অভিনেতার মুখে শেষ প্রশ্ন ছিল "আজ কি অভিনয় হবে স্যার ?" যদি তিনি বলেন 'হবে না', তবে অভিনেতা বাড়ি যাবেন। পক্ষের অভিনেতা বাড়ি ফিরে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারেন। তিনি নিশ্চিন্ত যে তাঁর ওপর 'অ্যাবসেন্ট'-এর দাগ টানা হচ্ছে না। কিন্তু বাস্তবে শিল্পী-কর্মীরা অতটা নিশ্চিন্ত হতে পারেন না। তাঁদের আতঙ্ক ঘুরতে থাকবে পরের প্রশ্ন "আজ কি শো হবে, স্যার। ...পরশু...তরশু ...অন্তে ?"

এই প্রশ্ন আজ স্টারের শিল্পীদের কর্মীদের। সাধারণ বাঙালিরও। সবার।

সৌমিত্র, মাননীয় দেখা করেছিলেন রাজ্য সরকারের প্রতিনিধির সঙ্গে। সেখানে কোনও আনুকূল্য পাওয়া যায়নি। একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আশা দিয়েছিলেন। কিন্তু সেটা এখনও পর্যন্ত মৌখিক কথা মাত্র। আর্থিকভাবে কিছু হয়নি। প্রোমোটার আছে। তারা হল রাখতে রাজি। কিন্তু তারা লাভি জমি নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করবে। শিল্পীদের দৃষ্টি সরে আছে। তারা ঐক্যবদ্ধ কোনও কর্মসূচি রাখতে পারেনি। এ ছাড়াও আছেন জমির মালিক। আছেন দেনদার, সাব-দেনদার। সকলেরই কিন্তু স্বার্থ আছে। দাবি আছে। আছে অন্য দিকে আইনের বেড়াজাল। এর মধ্যে দুত, তাৎক্ষণিক স্টারে অভিনয়ের আঁচ লাগছে শিল্পীদের, কর্মীদের। ঐতিহ্যিনিক স্টার কি চিরদিনের মতো ছাই হয়ে যাবে ? নাকি পুরাণের ফিনিক্স্ পাখির মতো ছাই থেকে পুনর্জীবন লাভ করবে ? অথবা পুরাণের পুনর্জন্ম আর হবে না ? এই প্রশ্ন আজ সকলের সামনে। কিন্তু উত্তর দেবে কে ? বাংলার বন্ধু কিছুই এখন ভরসা। স্টারও কি সেই পথ নেবে ? দীর্ঘ কষ্টসাধ্য তার যাত্রা। এই অগ্নিপরীক্ষা তার প্রথম নয়। কলকাতা কালোবাজারে ফিরিয়ে যাচ্ছে দৈনিক একটি একটি করে, বেসরকারি অভিজ্ঞতায় নতুন যেন থিয়েটার হল হওয়া এখন অসম্ভব। যেগুলি আছে তারাও যে কোনও মুহূর্তে থাকবে না। এমন সময় স্টারের মঞ্চের দীপ্তি নিবে গেলে তা গোটা বাঙালি জাতির পক্ষেই হবে মর্মান্তিক। কিন্তু স্টারকে বাঁচিয়ে তোলার কার্যকরী কোনও উদ্যোগ এখনও দেখা যাচ্ছে না, এ কথা গভীর দুঃখের সঙ্গেও কঠিন সত্য। এই উদ্যোগ কে নেবে ?

[প্রসঙ্গত : উল্লেখ্য]

'স্টার'র বিজ্ঞাপন : সেকাল ও একাল

প্রশান্ত পলিত

স্টার থিয়েটারের প্রতিষ্ঠার কাল থেকেই শুরু হয়ে যায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার। অভিজাত ও শিক্ষিত সমাজে রঙ্গালয়ের কথা পৌঁছে দিতে হবে। কলকাতার বাসিন্দারা নাটকের প্রতি অনুরাগী এবং তাঁরাই নাটকের পৃষ্ঠপোষক। নির্বাক ও সবাক ছায়াছবির সূচনার পরেও নাটকের খুলা কিছুমাত্র ম্লান হয়নি। নাটককে জনপ্রিয় করতে এবং অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের প্রচার অভিযান চালাতে স্টারের তুলনা হয় না। থিয়েটারের আয়ের পাঁচ শতাংশ খরচ করা হত বিজ্ঞাপন ও প্রোগ্রাম প্রকাশ করে। শুরুতে দৈনিক সংবাদপত্রে এবং সাপ্তাহিক ও মাসিকপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া চালু হয়। তবে ইংরেজি সংবাদপত্রে বা সাপ্তাহিক কোনও কাগজে স্টার থিয়েটারের বিজ্ঞাপন খুব বেশি চোখে পড়ে না। ইংরেজি পত্রপত্রিকায় বাংলা নাটকের সমালোচনাও খুব কম প্রকাশিত হয়েছে। স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে নাটকের রমরমার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিযোগিতাও বহুলাংশে বেড়ে যায়। ফলে ব্যবসায়িক কারণে নিয়মিত বিজ্ঞাপন ও প্রচার ব্যাপকভাবে প্রসারলাভ করে।

বিভিন্ন কালের কয়েকটি নির্বাচিত দিনের পত্রপত্রিকা থেকে বিজ্ঞাপন এখানে পুনঃ প্রকাশ করা হল। বিজ্ঞাপনগুলি অনুধাবন করলে তখনকার রীতিনীতি, আঙ্গিক, ভাষার ব্যবহার প্রচারের গুরুত্ব ও চরিত্র সহজেই অনুমান করা যাবে। অযথা ভাষান্তর বা অনুবাদ করলে মূল বিজ্ঞাপনটির চরিত্র ক্ষুণ্ণ হতে পারে। তাই যথাযথ ঐতিহাসিক বিজ্ঞাপনগুলি দিয়ে, তখনকার সামাজিক ইতিহাসের কিছু পরিচয় খুঁজে বার করার প্রচেষ্টা বোধ করি অবান্তর হবে না। স্টার থিয়েটারের ইতিহাস অনুসন্ধানে বিজ্ঞাপনগুলি মূল্য উপাদানরূপে চিহ্নিত হতে পারে....।

STAR-MELA

BABOO GOORMOOKH ROY

Sunrise, [illegible] p.m.

Babus & Ghosts Are Present.

DAKSHA YAJNA

THE DEATH OF SATI

The largest and most comfortable Theatre
Mechanic and Magical Wonders!!!
Musical Director, Professor Nancy Madhuri Sikdar.

বিগত ছিন্ন মীয় থিয়েটারের উদ্বোধন উপলক্ষে স্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রকাশ বিজ্ঞাপন—১১ জুলাই, ১৮৮৩। বিজ্ঞাপনে ঘোষণা করা হয়েছিল বিজ্ঞাপনে ঐতিহাসিক নাটক 'দক্ষযজ্ঞ' দিয়ে হবে শুরু। নাটক পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন কেদারনাথ চৌধুরী।

A RECEPTION

GRAND GALA NIGHT

for the reception of

BABOO SURENDRO NATH BANERJEE

at the

"STAR THEATRE"

BEADON-STREET.

On Friday, the 17th August 1883.

UNPRECEDENTED AND HIGHLY SENSATIONAL

WONDERS OF NECROMANCY,

MYSTICAL FEATS OF SPIRITUALISM,

INGENIOUS & MECHANICAL AUTOMATA,

Never before witnessed in India,

AND VARIOUS

OTHER MYSTERIES WILL BE GIVEN

BY THE

ARYAN CONVERSING SOCIETY,

IN AID OF

"THE NATIONAL FUND".

Doors to open at 7-30 p.m.

MEDALS & PAMPHLETS

Two dozen of Medals and Jubilee Pamphlets

To be distributed at the

STAR THEATRE,

On Wednesday and Thursday, the 16th & 17th instant.

Thursday, the 17th February at 9 p.m.

JUBILEE SONG

BRAHMO BEHAGAT

BRIHA KATOO

WONDERFUL DECAPITATION,

Pantomime Bellick Bazaar,

G. C. GHOSH, Manager.

১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দের ১৭ ফেব্রুয়ারির স্টেটসম্যান পত্রিকায় এই বিজ্ঞাপনটি ব্যবহৃত হয়েছিল। মহারানী ভিক্টোরিয়ার অনেকের ২৫ বছরের পূর্তি উপলক্ষে সুলভ মেডেল ও জুবিলি পুস্তিকা বন্টন করা হয়েছিল মঞ্চে বিভোর অভিনেত্রী একবার 'আহা' বিনোদিনী। এর সঙ্গে ছিল জুবিলি উপলক্ষে বিশেষ গানের অনুষ্ঠান। 'বিলাতফেরত', 'মেডিক ডাক্তার', 'বিলাত বিভ্রাট' ও 'বৃদ্ধকেলু' প্রহসনাভিনয়। পুলিসের অনুমোদনের সঙ্গে পরিচালনাটি ছিল বিনিময়ের মেয়াদ...।

বাঙালি পুরোনো ঐতিহ্যের অনুসরণে অনুষ্ঠানে আরম্ভিক হয়েছিল এক বিজ্ঞাপনের, ১৭ আগস্ট, ১৮৮৩। বিজ্ঞাপনটির ঘনঘন পুনরাবৃত্তি। অনুষ্ঠান ৭.৩০ বিজ্ঞাপনটি উদ্দেশ্য ছিল। প্রায় অর্ধ জনতার উপস্থিতি দেখে অবাক হয়ে গেল সকল দিক। এই বিজ্ঞাপনটি স্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

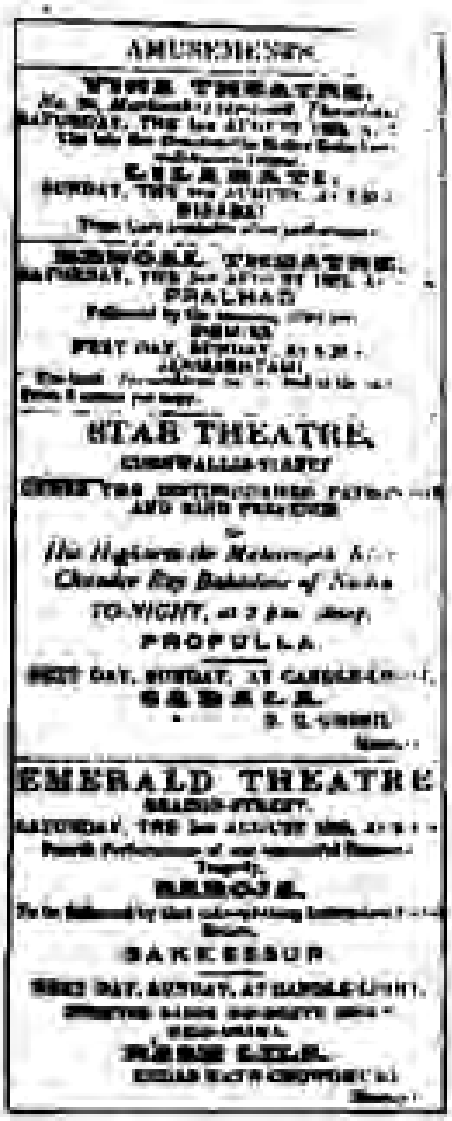

AMUSEMENTS.

STAR THEATRE.

CORNWALLIS-STREET.

TO-NIGHT,

PROFULLA.

EMERALD THEATRE

CORNWALLIS-STREET.

SATURDAY, THE

PRAHLAD

SUNDAY,

PRAHLAD

BARRISTER

MONDAY,

PRAHLAD

ষ্টার থিয়েটার ও আলফ্রে থিয়েটারের বিজ্ঞাপনটী কেবল সংবাদপত্রের রবিবারের সংখ্যায় তিনের প্রতিযোগিতা বন্ধ করা যায়। রবিবারের রাত্রে অভিনয় রাত্রে নাট্যশালায় কেবল ভিন একখানা ছাপান আমোদের। সাময়িক ও পৌরাণিক নাটক দেখার জন্য তখন প্রতিদিন রাত্র প্রায় বিভিন্ন রবিবারে সাধারণ লোক ভিড় করত। নাটকের বিজ্ঞাপন বিজ্ঞাপনের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার ফলে সংবাদপত্রগুলি অনেক গ্রাহকের জন্য একটী বিশেষ মূল্য সংরক্ষণ করতে বাধ্য হয়েছিল।

ষ্টার থিয়েটার ও মুক্ত থিয়েটারের পরিচালন নতুন করে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠা করবার উদ্দেশ্যে প্রকাশ করেছিল। এই দ্বিতীয় থেকে অভিনয় সম্বন্ধে কৃষ্টির আলোচনা নতুন রকমের বিশেষ বিজ্ঞাপন সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হয়। কিন্তু বিশেষ নতুন কিছুর দেখবার জন্য কলকাতা প্রভৃতি ইংরাজ ও বাঙালী দর্শক এই পরিবর্তিত কলকাতার দৃশ্যের ও অভিনয় দেখবার জন্য বিশেষভাবে ভাল ভাল অভিনেতা পাই।

THE NEW "STAR"

A new [illegible] for the production of plays in the vernacular [illegible] recently been opened in Cornwallis-street, [illegible] the corner of Grey-street. The building is a distinct [illegible] improvement on anything in the shape of a native play [illegible] that exists in Calcutta, and is worth the inspection of European visitors. The cost of erecting it has been [illegible] we learn, over a lakh-and-a-half of rupees, and it has [illegible] capacity for an audience of 1,500 people. All the requirements of a modern theatre appear to have been met [illegible] proper measures taken to secure the safe exit of the audience in case of alarm. The approach and entrance are handsome and effectively illuminated with minute pavement [illegible] suggestive of incandescents electric lighting. The staircases are tastefully picked out with plants and softly carpeted. The base of the house is occupied by several [illegible] secure seats, and a pit, while the first floor comprises a tier of private boxes and dress circle comfortably [illegible] with chairs and divans, for Oriental patrons who like to take their drama in the national posture. The Royal Box is decorated in Parisian style, while the boxes the zenana [illegible], with a private [illegible] approach, occupies the whole of the second floor. A [illegible] chandelier sets off the rich adornment of the ceiling, [illegible] dress circle, and the footlights effectively illuminate the [illegible] proscenium. Upstairs are [illegible] smoking-rooms for European visitors, in which, [illegible] interval of the play, they may find mental refreshment [illegible] another kind among the pages of *The Mahratta*, *Indian Mirror* or the latest sensation of Gaboriau [illegible] upon the tables; or, if preferred, the interval may be [illegible] devoted to contemplating the portraits of Eliza [illegible] Miss Bessie Palmer, Connie Gilchrist, or Mrs. Beere [illegible] Tree which adorn the walls. The entrance hall [illegible] bronze medallions of Shakespeare, Byron, and Michael Angelo.

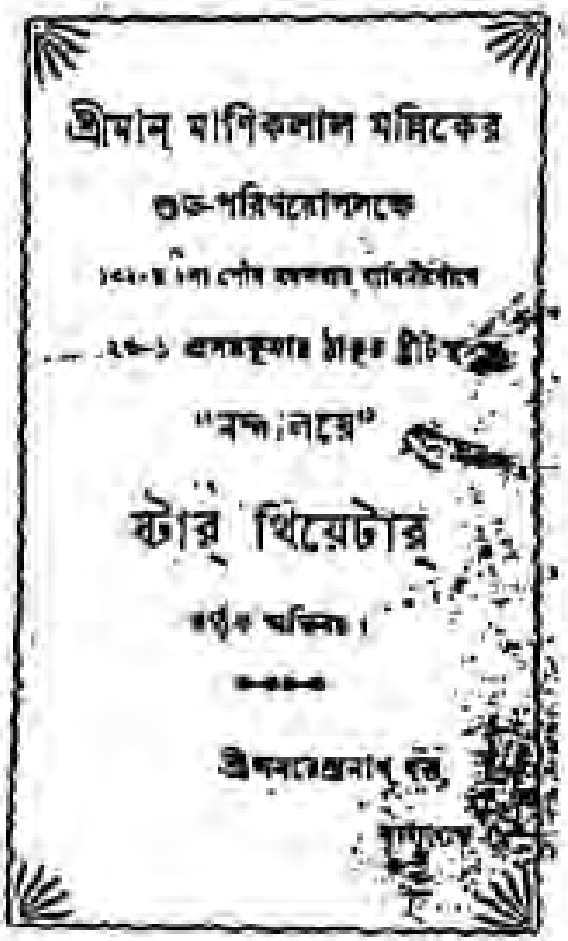

ব্যক্তিগত জীবনে অভিনয় করা ও প্রযোজনা করা ছাড়াও অমরেন্দ্রনাথ দত্তের অন্যতম কৃতিত্ব তাঁর থিয়েটারের সিনিয়র এক্টর পরিবেশন করেছিলেন। রঙ্গালয়ের বাইরে গিয়ে অভিনয়ে উৎসাহদান তাঁদের সিনিয়রদের ও কর্তাব্যক্তিদের একটি অভিনয় পরিকল্পনা এনে দেয়। এই ভাবে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন আমরা আমাদের বিশ্বিত করে তোলে... । প্রথম পৃষ্ঠিকার প্রথম পাতাটি এখানে মুদ্রিত করা হল

১৪ ডিসেম্বর, ১৯১৪

কৃষ্ণকান্ত ওরফে অভিনয় কৌশলে পৃষ্ঠিকাটী ছাপাতে যখন তেমন নিম্ন জাতীয় নেতৃবৃন্দের সমালোচনার মিথ্যা অপবাদ প্রচার করেন, তখনি 'সম্পাদকীয় আসরে প্রকাশ' বলায় প্রেক্ষ টীকায় তাঁর থিয়েটারের সাফাই গাওয়া

৭ ডিসেম্বর, ১৯১৫, অমৃতবাজার পত্রিকা

[illegible]

আলোচ্য ছবিতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছেন [illegible]

ষ্টার

আজ সোমবার হইতে ও শুক্রবার ।।

আজ — বেলা ৪টায়

কপালকুণ্ডলা

[illegible]

আজ — সন্ধ্যা ৬টায়

বিজয়নগর

[illegible]

আজ — বেলা ৪টায়

কপালকুণ্ডলা

[illegible]

রঙ্গনগর—গত হইতে আরম্ভ

১। জন্মাষ্টমী ২। মাতৃসেবা

৩। বিজয়নগর (বর্ণিকা সংস্করণ)

৪। মহারাজা নন্দকুমার

৫। কপালকুণ্ডলা

বিগত ৪ঠা শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসবে বিশেষত্ব আনা হয়েছে ১৯ শ্রাবণের অনেকাংশে পরিবর্তে পরপর শ্রীকৃষ্ণদেবের ৩ খানি। কিন্তু তার মধ্যে দুইখানার নাটকের বিজ্ঞাপন এবং সম্বাদটী উপলক্ষে ১টি অভিনয় অবশ্যই অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে

[illegible] ৪ আগস্ট, ১৯৪১

ষ্টার থিয়েটার

● বন্দে মাতরম্ ●

১৭৫৭ !!!

পলাশীর আম্রকুঞ্জে যাহার যে দশা তার বিশ্লেষণে—

১৯৪৭

১৫ই আগষ্ট !!!

স্বাধীনতা-সূর্য্য !!!

স্বাধীন আকাশের নীচে আমরা যেন আমাদের অধিকারের প্রশ্ন করি।

● জয় হিন্দ ●

— আজ বেলা ২টা ও ৬টায় —

৪। শতবর্ষ আগে

শনি ৪।৫, ২টায়—"ঘরে বাইরে"

শনি, রবি ৬টায়—"মহারাজা নন্দকুমার"

আগামী ১৫ আগষ্ট, ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পরিকল্পনার প্রকাশিত শীঘ্র বিশেষত্বের বিজ্ঞাপন। সেখানে নন্দকুমার, শিবরাত্রি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক নাটকের অভিনয় সম্ভব হয়। বিশেষত ও প্রচুর আনন্দে এই নাম অভিনয় সুরু হয়ে যায়। আজকের দর্শকের সহানুভূতিপূর্ণ আন্তরিক সেবার ইচ্ছা রাখিয়াও—[illegible]

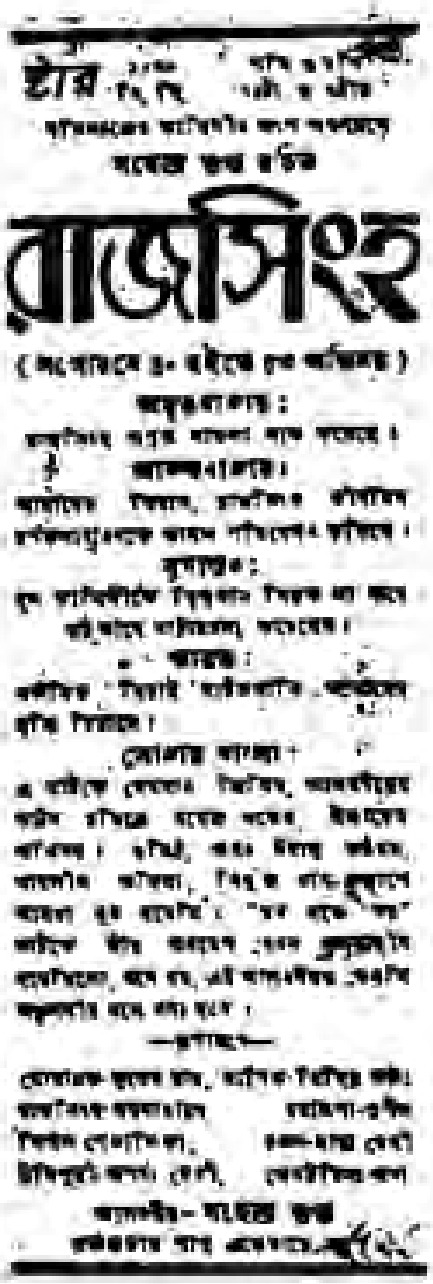

রাজসিংহ

তাপসী

ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তর কাহিনী অবলম্বনে রবীন্দ্রসঙ্গীত-সমৃদ্ধ 'তাপসী' চিত্রের বিজ্ঞাপনে অত্যাধুনিকতার প্রয়ত্ন প্রতিফলনা। ভাষা লিপির অবলম্বনে পরিকল্পিত হয়। রবীন্দ্রসঙ্গীত বিশেষজ্ঞ অমলি সেনগুপ্তের সংগীত পরিচালনায় পরিচয় ছিলেন। নটনটী তালিকা প্রকাশিত হয়নি এবং অধিক জানিনীয় ছিলেন। 'তাপসী' ফেলুনীর মধ্যে নিশ্চয় পাবিয়া আছে।

স্টার থিয়েটারের কথা

দেবনারায়ণ গুপ্ত

স্টার থিয়েটার পুড়ে যাবার পর পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি নাট্যকার ও নির্দেশক দেবনারায়ণ গুপ্তকে অনুরোধ করে 'স্টার থিয়েটারের কথা' নামে একটি পুস্তিকা লেখান এবং প্রকাশ করেন। স্টার থিয়েটার সম্বন্ধে স্বল্প পরিসর বিশিষ্ট এই ইতিবৃত্ত ভবিষ্যতের মানুষের কাছে অতীব মূল্যবান। পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির সৌজন্যে পুস্তিকা থেকে কিয়দংশ প্রকাশিত হল —সম্পাদক

বিশ্বের নাট্যসাহিত্য বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে ইংরেজ আমলে ১৮৭২ সালে কলকাতায় প্রথম পাবলিক থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। এ থিয়েটারের নাম ছিল 'ন্যাশনাল থিয়েটার'। তারপর ১৮৭৩ সালে ১৬ আগস্ট বেঙ্গল থিয়েটার, আর গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার হয়েছে এ বছরই ৩১ ডিসেম্বর। এর আগে প্রথম ন্যাশনাল থিয়েটারের অবলুপ্তি ঘটে। তাই পরবর্তীকালে গিরিশচন্দ্রের আমলে 'গ্রেট' শব্দটি তুলে দিয়ে শুধুই 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নামকরণ করা হয়। সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে ১৮৮৩ সালে ৬৮ নং বিডন স্ট্রিটে 'স্টার থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতাপ জহুরির মালিকানায় ন্যাশনাল থিয়েটারে নট-নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ যোগদান করেন। গিরিশচন্দ্রের দক্ষ পরিচালনায় স্টার থিয়েটারের প্রভূত উন্নতি হয় কিন্তু প্রতাপ জহুরির দুর্ব্যবহারে গিরিশচন্দ্র সদলবলে ঐ থিয়েটারের ছেড়ে চলে যান।

এই সময় রাজস্থানের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত যুবক গুরমুখ রায় মুসাদ্দি একটি রঙ্গালয় স্থাপনে এগিয়ে আসেন। ইতিপূর্বে ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রায় প্রতিটি নাটকেরই অভিনয় তিনি দেখতেন। বিনোদিনীর রূপে তিনি এতই আকৃষ্ট হন যে গিরিশচন্দ্র, বিনোদিনী প্রমুখ অন্যান্য শিল্পীরা ন্যাশনাল থিয়েটার ছেড়ে দেবার পর, বিনোদিনীকে কাছে পাওয়ার শর্তসাপেক্ষে গিরিশচন্দ্র প্রমুখ শিল্পীদের কাছে একটি নতুন থিয়েটার করার প্রস্তাব দেন। গিরিশচন্দ্র, দানু নিয়োগী, অমৃতলাল প্রমুখরা বিশেষ উৎসাহ বোধ করেন এবং বিনোদিনীর কাছে গুরমুখ রায়ের প্রস্তাব সম্পর্কে অকপটে জানান। কিন্তু বিনোদিনী সে সময়ে যাঁর অধীনে ছিলেন সেই জমিদার পুত্রটির সঙ্গে প্রতারণা করতে অস্বীকার করেন। এর কিছুদিন পরে গিরিশচন্দ্র প্রমুখ যাঁরা বিনোদিনীকে গুরমুখের প্রস্তাবে রাজি করানোর চেষ্টা করছিলেন তাঁরা বিশ্বস্তসূত্রে খবর পান যে জমিদার পুত্রটি দেশে গিয়ে বিবাহ করেছেন। এই খবরটি বিনোদিনীর কানে তুলে তাঁরা বলেন 'সে যদি ঘর বাঁধার প্রস্তাব করেও তোমার সঙ্গে প্রতারণা করে, তাহলে তুমিই বা গুরমুখকে প্রত্যাখ্যান করতে যাবে কেন ?' এরপর বিনোদিনী কথাটির সত্যাসত্য জানবার

জন্য সময় নিয়ে কবির পুত্র জ্ঞানেন্দ্র পাবের সম্প্রতি অভিনয়ের পুরাটি মেপে রিপোর্ট করেছেন। প্রথমে বিনোদিনী গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল প্রমুখদের প্রস্তাবে রাজি হন না—পরে তাঁরা তাঁকে বুঝিয়ে বলেন—থিয়েটারের নাম হবে তোমারই নামে 'বি থিয়েটার'। তখন তিনি রাজি হন। পরে অবশ্য থিয়েটারের নামকরণ করা হয়েছিল 'স্টার থিয়েটার'। সে প্রসঙ্গে আমরা পরে বিশদভাবে আলোচনা করব। শেষ পর্যন্ত বিনোদিনী গুরুমুখের অভিনেত্রী হয়ে রাজি হন। গুরুমুখ বিনোদিনীকে কাছে পাওয়ার পর গিরিশবাবুর পরিকল্পনা মতো জমিটি নিজের নামে রেজেস্ট্রি করে নেওয়া হয় এবং একটি কমলালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। নাম দেওয়া হয় 'স্টার থিয়েটার'।

অনেকে আপত্তি তুলেছেন, আমার স্টার থিয়েটার খুলে আমাদের পরও বলেছেন বিনোদিনীকে নাকি গিরিশবাবু, অমৃতলাল প্রমুখরা প্রবঞ্চিত করেছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে এ কথা মনে হলেও এর মূলে একটি কারণ আছে। সে কারণটি হল এই, রঙ্গালয়ের নিজে কারামালা নিয়ে এবং সম্প্রদায়ের অভিনয় জমাটি নির্ভরযোগ্য ছিল। তার ওপরে সে সময়ে তুমি 'স্টার থিয়েটার' নাম না দিয়ে কোনও অভিনেত্রীর নামে দেওয়া হয়, তাহলে অনেকেই থোপরে থিয়েটারের ছায়াও মাড়াতেন না। কিন্তু এর আগে ও ছাড়ে পরা অনেকে নাম 'বি থিয়েটার' না হয়ে স্টার হওয়ায়ে বিনোদিনীর মুখের সীমা ছিল না। আপাতদৃষ্টিতে মেনে নিলেও সমবর্তীদের কাছ থেকে এ ব্যবস্থার আজীবন মনে রেখেছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি 'আমার কথা'-র লিখেছেন, 'আমি মনের আমি নাই যে উহাতে হলনা ছাড়া আমার নজির এমনভাবে অমনং ব্যবস্থাই করিবেন। কিন্তু এই টাকার স্বার্থ ত্যাগ করিয়ে আমার যে ক্ষতি বা হইয়াছিল তাঁহাদের এই ব্যবহারে আমার অভিমান মনোকষ্ট হইয়াছিল বলিয়া এ সম্বন্ধে আর কখন কাহাকেও কোনও কথা বলি নাই, কিন্তু ইহা ভুলিতেও পারি নাই, এই ব্যবহার বরাবর মনে ছিল।' যাই হোক, শেষ পর্যন্ত 'স্টার থিয়েটার' নামেই কমলালয়টি পরিচিতি লাভ করে।

প্রথমে বিনোদিনী মনে নিলেও আমার শেষেও গিরিশবাবুর ওপর কিন্তু তাঁর কোনও অভিমান ছিল না। তাঁর 'আমার কথা' গ্রন্থের এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, 'এক মনে অভিমান হইলে একটি গ্রন্থি থাকে, আমারও পর সহজ দোষ ছিল। কিন্তু অনেকেই আমার বড় স্নেহ করিতেন, বিশেষত রঙ্গমঞ্চের গিরিশবাবুর স্নেহমিশ্রিত আমার প্রতিভার একটু বেশি প্রত্যুত্তর করিত; সেই জন্য দোষ আমারই অধিক হইত। কিন্তু আমার অভিমান অনেকটা উপেক্ষার জন্য সকলেই, প্রকাশ করিতেন এবং দোষ ভুলিয়া আমার প্রতি স্নেহের আরও অধিক বিকাশ পাইত। আমি তাঁহাদের সেই অমায়িক স্নেহ কখনও ভুলিতে পারিব না।'

আমার এক জায়গায় লিখেছেন

'গিরিশবাবুর সঙ্গে আমার কোন অসদ্ভাব, মন অভিমান কখ প্রায়ই চলত। তিনি আমার অত্যধিক আদর দিতেন, স্নেহ দিতেন। অভিমান তাই বড় পেয়ে উঠতেছিল, তাকে আমি তাঁর সঙ্গে অসদ্ভাব করতাম, কিন্তু তার জন্য তিনি আমার একটি দিনের জন্য প্রথম কোনও কাজ অটিনি যাতে তাঁর এতটুকু ক্ষতি হয়।'

যাই হোক, অবশেষে স্টার থিয়েটারের বাড়ি তৈরি হয়ে গেল। এই সময় প্রতাপ জহুরি নাগপাল থিয়েটার চালাতে না পেরে বাড়ির একটা অংশ ভাড়া দিতে শুরু করেন। এই সুযোগে স্টার থিয়েটার সেজন্যে দিনে নিয়ে নিজেদের বাড়ি তৈরির কাজে লাগিয়ে দেন। এইভাবে স্টার থিয়েটারের পুনর্নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেল ১৮৮৩ সালের ২১ জুলাই অমাবস্যায়। গিরিশচন্দ্রের 'দক্ষযজ্ঞ' নাটক দিয়ে স্টার থিয়েটারের দরোজা খুলে দেওয়া হল। এতৎসম্পর্কে The Indian Daily News 21 July-1883 তারিখে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনটি তুলে দেওয়া হল

Grand Opening Night

STAR THEATRE, Beadon Street

Proprietor Baboo Goormukh Roy

Saturday, 21st July

Baboo G. C. Ghose's New Drama

DAKSHYA YAJNA

Everything Grand and Wonderful

G. C. Ghose, Manager

অভিনয় করেছিলেন দক্ষ গিরিশচন্দ্র, মহাদেব অমৃতলাল মিত্র, সতী বিনোদিনী ইত্যাদি। এরপর ১১/৮ তারিখে গিরিশচন্দ্রের 'জনা প্রহিত', ২৯/৮ তারিখে গিরিশচন্দ্র 'রাবণের চনবাস' অভিনীত হয়। এ নাটকটি ইতিপূর্বে প্রতাপ জহুরির নাগপাল থিয়েটারে প্রথম মঞ্চস্থ হয়েছিল। ২৩/১ তারিখে হয় 'সীতার বনবাস'। এটির আগে নাগপাল থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়েছিল। ২৪/১০ তারিখে অমৃতলালের 'তাজের উপর বাটিপাড়ি,' ১৩/১২ তারিখে গিরিশচন্দ্রের 'নল দময়ন্তী' অভিনয় হয়। এই সময়ে গুরুমুখ রায় সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক ভাড়ায় স্টার থিয়েটারের ঘর ছাড়তে বাধ্য হন। সেই সঙ্গে বিনোদিনীর সম্পর্কও মধুর হয়ে ওঠে। ১৮৮৪ সালের শেষের দিকে গুরুমুখ রায় 'জনা সম্প্রদায়' ভেঙে দেন। ১১ হাজার টাকায় বিনিময়ে অমৃতলাল মিত্র, পাঁচকড়ি দে, হরিপ্রসাদ বসু ও অমৃতলাল বসুকে স্টার থিয়েটার বিক্রি করে দেন। থিয়েটার ছেড়ে দেবার সময় 'স্টার থিয়েটারে' বিনোদিনীরও কিছু স্বত্ব থাকে গুরুমুখ রায় তা মেনেছিলেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল প্রমুখেরা বিনোদিনীর বিদায় ও নতুন শিল্পী নিয়ে দেখাতে যে থিয়েটারে এখন লোকসানই বেশি। তখন বিনোদিনীর মতো কয়লোকের ছেলের থিয়েটার করতে এসে পথের ভিখারি হয়ে গেছে। বিনোদিনী থিয়েটারের মালিক হলে লোকসানের দায়ভার কখন

'চৈতন্যলীলা' নাটকে অভিনেতার ভূমিকায় নটীসম্রাজ্ঞী তারাসুন্দরী

করা কষ্টকর হবে। এমনকি ভদ্রাসনটুকু চলে গেলে পথে দাঁড়াতেও হতে পারে। বিনোদিনী ছেলেমানুষ বলেই বিষয়ের গুরুত্ব বুঝতে পারছেন না। তখন বিনোদিনীর মা ও বিধিমা থিয়েটারের স্বত্ত্ব ত্যাগে রাজি হন। যে থিয়েটার বিনোদিনীর মুখলা নির্মিত সেখানে তাঁর স্বত্ত্বও রইল না।

অতঃপর উপরোক্ত চারজন স্টার থিয়েটারের মালিক হলেন। এদের আমলে ১৮৮৪ সালের ২৯/৩ তারিখে মঞ্চস্থ হল গিরিশচন্দ্রের 'কমলে কামিনী', ২৬/৪ তারিখে গিরিশচন্দ্রের 'বৃষকেতু', ও 'হীরার ফুল' এবং অমৃতলালের 'চাটুয্যে বাঁড়ুয্যে, ৭/৬ তারিখে গিরিশচন্দ্রের 'শ্রীবৎস-চিন্তা' এবং ২/৮ তারিখে গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলা'। চৈতন্যলীলা' নাটকটিকে বাংলার নাট্যজগতের land-mark বা বিকৃটিক বলা যেতে পারে। কারণ এই নাটকের অভিনয়ের পর সারা বাংলাদেশে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। বহু জ্ঞানী-গুণী-পণ্ডিত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তি এই নাটকের অভিনয় দেখতে আসেন। গিরিশচন্দ্রের নাট্য রচনাশৈলী ও বিনোদিনীর চৈতন্য-এর ভূমিকায় অভিনয় দর্শক মানসে বিশেষভাবে রেখাপাত করে। পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব এই নাটকের প্রশংসার কথা শুনে ২১ সেপ্টেম্বর অভিনয় দেখতে আসেন এবং অভিনয় দেখতে দেখতে সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। জনৈক ভক্ত ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করেন—'কেমন দেখলেন' ? উত্তরে পরমপুরুষ বলেন, 'আসল নকল এক দেখলাম'। পরে বিনোদিনীকে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বলেন—'মা, তোর চৈতন্য হোক'। রামকৃষ্ণদেব সেই থেকে নাট্যজগতের আরাধ্য দেবতা হিসাবে পূজিত হচ্ছেন। এই ঘটনার পর দর্শকসংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পেতে থাকে—তেমনই

স্টার থিয়েটারের সুনাম বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই বছরের নাটক হল ২২/১১ তারিখে নিত্যনিরঞ্জনের 'সুখের প্রদীপ' ও অমৃতলালের 'বিবাহ বিভ্রাট'।

১৮৮৪ সালের ১৩/১ তারিখে অক্ষয় হল নিত্যনিরঞ্জনের 'নিবাই সন্ন্যাস', ২৫/৩ তারিখে বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী' (নাট্যরূপ নিত্যনিরঞ্জন), ২৬/৪ তারিখে মহীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' (নাট্যরূপ নিত্যনিরঞ্জন), ৪৩/৫ তারিখে নিত্যনিরঞ্জনের 'প্রহসনরঙ্গ', ১২/৯ তারিখে নিত্যনিরঞ্জনের 'বুদ্ধদেব চরিত'।

১৮৮৬ সালের ১২/৬ তারিখে অক্ষয় হল নিত্যনিরঞ্জনের 'নিষ্কলঙ্ক ঠাকুর' ২৩/১২ তারিখে নিত্যনিরঞ্জনের 'বেহিক বাজার'। এটাই বিনোদিনী অভিনীত শেষ নাটক।

১৮৮৭ সালের ২১/৫ তারিখে অক্ষয় হল নিত্যনিরঞ্জনের 'রূপসনাতন'। এই বছর ৩১/৭ তারিখে গিরিশ স্ট্রিট স্টারের শেষ অভিনয় 'বুদ্ধদেব চরিত' ও 'বেহিক বাজার' নাটকের অভিনয় দিয়ে। ১৮৮৩ সাল থেকে ১৮৮৭ সাল পর্যন্ত স্টার থিয়েটারে মোটের মোট ৫০টি নাটক অভিনীত হয়। ১৮৮৬ সালের প্রথম মাসে সারদাসুন্দরীর শরৎপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখবার কথা এবং এই বছরেই বিনোদিনী থিয়েটারের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে মাত্র ২৪ বছর বয়সে পারলৌকিক জীবনে প্রবেশ করেন।

গিরিশ স্ট্রিট ৩১ জুলাই ১৮৮৭ সালে স্টার থিয়েটারের শেষ অভিনয়ের পর কলকাতার বিখ্যাত ধনী শোভাবাজার শীল থিয়েটারের অর্ধেক কিনে নিয়ে স্টার থিয়েটারকে বাড়ি খালি করার নোটিশ দিলেন। নিরীহ দুঃখাং ভাবে জলে পড়ে গেলেন। অনেক তালেগোলের পর নিত্যনিরঞ্জনের সঙ্গে শোভাবাজার শীলের চুক্তি হল—৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) টাকার বিনিময়ে তাঁরা বাড়িটি খালি করে দেবেন কিন্তু স্টার থিয়েটারের নামটি তাঁদেরই থাকবে। তাঁরা এই টাকার অন্য কোথাও বসবাস প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করবেন। শোভাবাজার শীল থিয়েটারের বাড়িটি দখল নিয়ে তার নাম দিলেন 'এমারেল্ড থিয়েটার'।

গিরিশ স্ট্রিট ছেড়ে উৎখাত হয়ে স্টার কোম্পানি শহর ও শহরতলির টাকা সংগ্রহের জন্য অভিনয় করতে লাগলেন এবং ভাড়াতে বসবার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালাতে লাগলেন। হঠাৎ একটা সুযোগ এসে গেল। চালেঞ্জকুক লেন ও তাঁর বাড়ির জমি থেকে বহিবাগানে প্রায় ৫০ কাঠা জমি কেনা হল ২৭,০০০ (সাতাশ হাজার) টাকায়। এদিকে শোভাবাজার শীল নতুন বাসায় এসেছেন প্রতিষ্ঠা করে তার ম্যানেজার করলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরীকে। কিন্তু তিন মিনিট শোভাবাজার হয়ে দাঁড়াল থিয়েটারে। তখন শোভাবাজার শীল থিয়েটারকে থেকে বাসকরার প্রস্তাব দিলেন তাঁর থিয়েটারে শোভাবাজারের জন্য। নিরিশচন্দ্র প্রত্যাখ্যান করলেন। শোভাবাজার শীলের অনেক অনুরোধ উপরোধের পর ঠিক হলো— শোভাবাজারকে এককালীন বোনাস হিসাবে ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা, এবং মাসোহারা, নাটকার ও অভিনেতা হিসাবে মাসে ৩৪০ টাকা মাসিক পেতেন। তবুও নিত্যনিরঞ্জন রাজি হন না, পরে স্টার থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষকদের জোর রাজি হন। শোভাবাজার শীলের দেওয়া বোনাসের টাকা থেকে ১৯,০০০ (উনিশ হাজার) টাকা ট্রাস্টিবাগানের জমিতে নতুন পৃষ্ঠপোষকের জন্য তাঁর বন্ধুদের হাতে তুলে দিলেন।

নাট্যশালার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হল, কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হল—অমৃতলাল বসু হলেন ম্যানেজার। ১৮৮৭ সালের ৩০ ডিসেম্বর 'দি ষ্টেটসম্যান' পত্রিকায় সংবাদ বেরুল "...স্টার থিয়েটার, ৭৬/৩ কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট (গ্রে স্ট্রিটের কাছাকাছি) তাঁদের নবনির্মিত ভবনে অনতিবিলম্বে কার্যারম্ভ করবে।

—ম্যানেজার অমৃতলাল বসু

বিজ্ঞাপন দেওয়া হল

OUR HUMBLE DEBUT
At the New Building
STAR THEATRE
Cornwallis Street. 1888
OPENING NIGHT
Friday, the 25th and Saturday,
26th May at 9 p.m.
Sunday, the 27th At Candle Light
NEW DRAMA NASIRAM
Price of Admission

Royal Box (to seat 5)	Rs.	10
Box (to seat 4)	Rs.	14
Box (to seat 2)	Rs.	8
Dress Circle	Rs.	4
Orchestra Stall	Rs.	3
Stall	Rs.	2
Pit	Rs.	1
Gallery	Rs.	0
Zenana (to seat 4)	Rs.	10
Zenana	Rs.	2

Tram car will run after the close of performance from the Theatre to the Bow Bazar Crossing. Fare-Six Pice. Tickets can be secured at once from the Box Office.

Amritlal Bose.
Manager

অমৃতলাল বসুর অভিনয়—নতুন অভিনয়ের পরিচালনা, অভিনয়, নির্দেশকের এবং অভিনয় করেছেন—'State Railway Service-এ কর্মরত জ্যেষ্ঠভ্রাতার বিরুদ্ধে এবং বসু ভাইদের নামে, আদালতে নিয়ে যাবেন বলে অভিযোগ করেছেন Messrs P. C. Miller & Co.'

নতুন স্টার থিয়েটারের প্রথম নাটক 'সেবক' রচিত 'কালীপ্রসন্ন'। এই 'সেবক' কিন্তু নিত্যনিরঞ্জনই অভিনয় করেন। তখন তিনি শোভাবাজার শীলের কাছে চুক্তিবদ্ধ থাকায় অন্যনামে নাটক

লিখতে পারেন নি। এ অবশ্যই রাত্রিবাসরে স্টার থিয়েটারের যাত্রা শুরু। অভিনয় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্টার থিয়েটারেরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে—বৈদ্যুতিকরণ, আধুনিকীকরণ, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রভৃতি. তবুও এই সেদিন পর্যন্ত স্টার যেন পথের বাঙালীপনা সহজিয়া কলা ধরে রাখে ঐতিহ্য বহন করে আসছিল।

আমার ফিরে আসি স্টারের নাটকের প্রসঙ্গে। 'আলীবাবা' - এরপর ২১/৯ তারিখে মঞ্চস্থ হল প্রাক্তনমন্ত্রী পঞ্চানন্দবাবুর 'জলিয়ে' উপন্যাস অবলম্বনে 'সরলা' (নাটকরূপ : অমৃতলাল)। এই সময় শোভন শীল এদেরকে থিয়েটার জন্য লোভনে লিজ নিলেন, ফলে গিরিশচন্দ্র চুক্তিমুক্ত হয়ে স্টারের জন্য নাটক লিখতে শুরু করলেন।

১৮৯৯ সালের ২১/৪ তারিখে অভিনীত হল তাঁর মৃণালকান্তী নাটক 'প্রফুল্ল', ৭/৯ তারিখে 'হারানিধি' এবং ২৪/১২ তারিখে রসরাজ অমৃতলালের 'কাঞ্চনবাবা'।

১৮৯০ সালের ২৩/৭ তারিখে গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্য', ১৩/৯ তারিখে গিরিশবাবুর 'মলিনা-বিকাশ', ২৩/১২ তারিখে অমৃতলালের 'বাবুলালা', ২৪/১২ তারিখে গিরিশচন্দ্রের 'মহাপূজা' প্রভৃতি মঞ্চস্থ হল।

গিরিশচন্দ্রের দ্বিতীয়া স্ত্রী সুরতসুন্দরীর মৃত্যুর পর তাঁর শিশু-সন্তানটি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ে। কোনও ঔষধ চিকিৎসায় কোনও ফল না হওয়ায় অভাগ্যের পরামর্শে তিনি তাঁকে নিয়ে বায়ু পরিবর্তনের জন্য মধুপুরে যান। এদিকে থিয়েটারে অনুপস্থিতির জন্য স্টারের স্বত্বাধিকারীগণ তাঁকে কর্তৃপক্ষের পত্র লেখেন। এই পত্র পাঠানো হয় যে সময়কার অফিসরনিক সম্পাদক মন্মথনাথ ভাদুরির পরামর্শে। এ সম্পর্কে গিরিশচন্দ্রের জীবনীকার অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এক জায়গায় লিখেছেন—'যে গিরিশচন্দ্র অন্তরঙ্গে অনেক করিয়া একদিন স্টার-এর জন্য নাটক লিখিয়া দিয়াছিলেন, যে গিরিশচন্দ্র পাঁচ বছরের জন্য নিজেকে বিক্রয় করিয়া ষোল হাজার টাকা স্টারকে দিয়াছিলেন—স্টার থিয়েটার সেই গিরিশচন্দ্রকে বরখাস্ত করিয়া চিঠি পাঠাইলেন।'

১৮৯১ সালে গিরিশচন্দ্র স্টার থিয়েটার ছেড়ে দিলেন। এই সময়ে গিরিশবিহীন স্টারে অভিনয় হল—৭১/৩ তারিখে অমৃতলালের 'সাবাস আমরা', ১৩/৪ তারিখে রাজকৃষ্ণ রায়ের 'নায়কের স্বপ্ন', ২২/৮ তারিখে 'বিলাপ', ৫/১২ তারিখে রাজকৃষ্ণ রায়ের 'সরলা-মঙ্গল', ২৪/১২ তারিখে অমৃতলালের 'সাবাস বাহাদুর'। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অন্যপ্রসঙ্গকে গ্রহণ করে রচিত হল 'বিদ্যাসাগর'।

১৮৯২ সালে রাজকৃষ্ণ রায়ের 'অনাথিনী' (২৬/১১), ও 'অভিমন্যু' (২৪/১২), অমৃতলালের 'কালাপানি' ২৪/১২ তারিখে মঞ্চস্থ হয়। এই বছরেই স্টারে প্রথম গিরিশ নাটক মঞ্চস্থ হল 'কৃষ্ণ বিকাশ' (৯/৮)।

১৮৯৩ সালে অমৃতলালের 'বিবাহ বা বিষম বন্ধন' (২৬/৮), রাজকৃষ্ণ রায়ের 'মেবারের অরেঞ্জজীব' (২৩/১২), গিরিশচন্দ্রের নাটক 'রাম রহিমের' (গিরিশচন্দ্রের 'দীয়ার বরবাদ এই গিরি কলমসে') অভিনীত হল।

১৮৯৪ সালে অমৃতলালের 'বাবু' (১/১), নৃত্যগোপাল কবিরত্নের 'অবতারলীলা' (৪/৮), বঙ্কিমচন্দ্রের 'মন্ত্রশক্তি' (নাটকরূপ অমৃতলাল), অমৃতলালের 'একাকার' (২৪/১২) মঞ্চস্থ হল।

১৮৯৫ সালে গিরিশচন্দ্রের 'অযুধ' (১৩/৭, পুনরাভিনয়), মৃত্যুগোপাল কবিরত্নের 'স্ত্রী-বুদ্ধি' (৯/১০) পরিবেশিত হল।

১৮৯৬ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' (নাটকরূপ অমৃতলাল) ১১ জানুয়ারি মঞ্চস্থ হল। এই বছরের এপ্রিল মাসে গিরিশচন্দ্র আবার ফিরে এলেন স্টারে। কর্তৃপক্ষরা তাঁকে আসতে বলায় তিনি বলেন যে তাঁকে ডাকা হবে না। তখন কর্তৃপক্ষ তাঁকে নাট্যাচার্য ও নাট্যশিক্ষালয় করে রাখা করে নিলেন। মঞ্চস্থ হল তাঁর রচিত নাটক 'আলাপাহার' (২৬/৬)।

১৮৯৭ সালে মঞ্চস্থ হল অমৃতলালের 'বৌমা' (১/১), এবং 'চীনক ঝুবিলি' (২১/৬), 'শাবাস-প্রফুল্ল' (১১/৯), 'আশ্চর্যকথন' (১৮/১২), পরের নাটকগুলি গিরিশচন্দ্র রচিত। মহারানী ভিক্টোরিয়ার সিংহাসন লাভের ষাট বৎসর পূর্তি উপলক্ষে রচিত হয় 'হীরক জুবিলি'।

১৮৯৮ সালে লেখা শিল অমৃতলালের 'হরমা বিয়াটি' (১/১)। এই বছরের মে মাসে ছেলের জন্য সাহিত্যিকভাবে স্টার থিয়েটার বন্ধ থাকে এবং এই সময়ে গিরিশচন্দ্র স্টার ছেড়ে চলে যান। পরে মঞ্চস্থ হল অমৃতলালের 'হলিডেস্ক' (১৩/৯) এবং অমৃতলালের 'বাবু' (২৯/১০) সঙ্গে নিয়েছি দেখা।

১৮৯৯ সালে নৃত্যগোপাল কবিরত্নের 'মুক্তকেশীর' নাটকের বাংলা 'অবতারলীলা' নামে অভিনীত হয় (২৬/৮)। অমৃতলালের 'সাবাস্ আমিন' (২৩/৯), ডি এল রায়ের 'বিরহ' (৪/১১) যথাক্রমে মঞ্চস্থ হল।

১৯০০ সালেই স্টার থিয়েটারে গ্যাস বাতির পরিবর্তে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করা হয়। বৈদ্যুতিক আলোয় প্রথম নাটক অমৃতলালের 'আশ্চর্য বন্ধু' (২৮/৪), অমৃতলালের 'কৃপণের ধন' (২৯/৫)। রাজকুমার রায়চৌধুরীর 'বিজয়লক্ষ্মী' (১৯/৮), মনমোহন বসুর 'প্রণয় পরীক্ষা' (১০/১১), দ্বিজেন্দ্রলালের 'ত্রাহস্পর্শ' (২৪/১২) এবং অমৃতলালের 'বাবুকলী' (২৩/১২) মঞ্চস্থ হল।

হাতিবাগানে স্টার থিয়েটার গড়ার পর থেকে নাটকের সেঞ্চুরিলাভ অর্থাৎ ১৮৮৭ থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত প্রায় ৬২ খানা ছোটবড় ভালো নতুন নাটক বা ১৪/১৬ খানা পুরনো এবং কয়েকটি গিরি নাটকের মঞ্চস্থ হয়েছে।

অবশ্য আমি স্টার থিয়েটারের নাটকের কথায়। ১৯১০ সালে মনমোহন গোস্বামীর 'ধর্ম বিপ্লব' (২৯/৩), জগদেন্দ্রনাথ মিত্রের 'বিশ্বমিলন' (৩/৩) 'ভরপাতাল' (৪/১২) মঞ্চস্থ হয়। এই

মঞ্চে অভিনয় পুরনো নাটক 'আবীরকিরণ', 'অশ্রুসরোবরা', 'ঈশ্বরিচি', 'মুখোশধারিণী', 'অহীন্দ্র ঠাকুরদি', 'মেরী ক্রীসমাসটী', 'বিবাহ', 'জন্ম', 'নীরজাক্ষ', 'শঙ্খচূড়', 'বৃন্দাবিনী' ইত্যাদি প্রভৃতি নাটিকাগুলির মতো মঞ্চে অভিনীত হয়।

১৯১৪ সালে বাঙালার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আত্মপুরী' (১/১), অমরেন্দ্রনাথ অধের 'মত ভাটোনাসি' (৩৩/৪), রবীন্দ্রনাথের 'মিলি' গল্প অবলম্বনে 'অকলঙ্ক শশী' (প্রতিভা রায়লাল বন্দ্যোপাধ্যায়) এবং অমরেন্দ্রনাথ মতের 'অভিনেত্রীর জন্ম' (১৩/১২) মঞ্চস্থ হয়।

১৯১৫ সালে অমরেন্দ্রনাথ অধের 'প্রেমের জেলখানা', রায়লাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মেসোমাই', ফণীভূষণী মৈত্রীর 'অন্ধ জগৎ' (৩/২) ভূপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আমার মা' (২১/৪) জলধর সেনের 'রাজা চন্দ্রশেখর' (২১/৮), প্রবীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'ভাত উপাখ্যান' (১৮/৯), হরিসাধ বসুর 'বসু মহাশয়' (৯/১০), 'দি মার্টিন আন্ড জেনিস'-এর ভূপেন বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত নাট্যরূপ 'শঙ্খবালা' (৪/১২), ভূপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পৌলমীয়ী' (৮/১২) এবং মনমোহন গোস্বামীর 'ঘটনাচক্রের ফোরজ' (১৩/১২) অভিনীত হয়।

১৯১৬ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি অমরেন্দ্রনাথ মঞ্চ পরিচালনা করেন। এই বছরে মঞ্চস্থ হয়েছিল ভূপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অকলঙ্কিনী' (১১/৩), যোগেশ বসুর 'যোগেন্দ্রলাল' (৮/৪), 'বাঙাল মেজ' (৩/৪) 'জল ছাড়ে' (১৪/৬), প্রবীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আত্মদানী' (৭/১), 'প্রায়শ্চিত্ত' (৪/১১), মনমোহন গোস্বামীর 'সাধনা', গৌরীর মুখোপাধ্যায়ের 'সাধনা' (২৪/১২) প্রভৃতি।

১৯১৭ সালে নতুন যোগ দিলেন অমরেন্দ্রলাল হালদার। তাঁর সময়ে অভিনীত হয় নারায়ণ বসুর 'কুলবধূ' (২১/১), যোগেশ বসুর 'যেমন সাজা' ও 'রাগের মেলা'।

১৯১৮ সালে অমরেন্দ্রবাবু নিউ্রিয়েটার ত্যাগ করে স্টার থিয়েটারের শিক্ষক হিসাবে যোগ দিলেন। এই বছরে মঞ্চস্থ হয় হারাধন মুখোপাধ্যায়ের 'রূপজেবী' (১১/১), অক্ষিমচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে 'মৃন্ময়ীর ঘড়' (১৯/১)। এই বছরের মাঝামাঝি অভিনীত হল প্রবীর লাহা কাহিনী 'বিবাহ মেলা' (নাটক ভূপেন বন্দ্যোপাধ্যায়), ভূপেনবাবুর 'বিলাবন্দী' (১/৯), প্রবীর চট্টোপাধ্যায়ের 'আহত অভিমান' (২/১১)। এই বছরে অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় স্টার থিয়েটারের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন।

১৯১৯ সালে মঞ্চস্থ হল পেশুলিয়েরের 'ওথেলো' (অনুবাদ : যোগেন্দ্রনাথ বসু) ৮/৩, নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মুখের মত' (৩০/৩), ক্ষীরোদপ্রসাদের পুরোনো নাটক 'নিরাজী', অমরেন্দ্রনাথের 'উলসী' (১৭/৫), এবং 'দু-দুখো সাপ' (৯/৮), ভূপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বৈবাহিক' (২৪/১২) এবং যোগেশ বসুর উপন্যাস অবলম্বনে 'স্বীকৃত প্রভাত' প্রভৃতি।

১৯২০ সালের এপ্রিল মাসে অমরেন্দ্রনাথ স্টার থিয়েটারের যোগ দিলেন। মঞ্চস্থ হল 'রাজীবলোচন' (২২/৬), যোগেশ বসুর 'কৃষ্ণকুমারী' (১২/৬), অমরেন্দ্রনাথের 'বিচারক' (২৭/৮)।

১৯২১ সালে অমরেন্দ্রনাথের 'বাসবদত্তা' (১৪/১), ক্ষীরোদপ্রসাদের 'মমতাময়ী' (২/৪) এবং অমরেন্দ্রনাথের 'অহংকারের যোগ' (৪/১১) মঞ্চস্থ হয়।

১৯২২ সালে নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সরলা জায়ক' (১/৭), অমরেন্দ্রনাথের 'অনাথ' (১১/৮) এবং ওই নাটিকাবেরই 'কুলমা' (২০/৯)।

১৯২৩ সালে অমরেন্দ্রনাথ বেশকিছু বিশিষ্ট অভিনেতাকে হারান। এরই সন্ধিক্ষণে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন—এদের মধ্যে ছিলেন কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের ম্যানেজার), শরৎচন্দ্র ঘোষ (মনিলিটার), কৃষ্ণচন্দ্র মিত্র (শিল্পপতি), নির্মলচন্দ্র (মনিলিটার ও জার্নাল মেজর), এবং হরিপদ চট্টোপাধ্যায় (ওকালতি চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্সের অংশীদার)। নাম দেওয়া হল 'আর্ট থিয়েটার লিমিটেড'। ম্যানেজার হলেন অমরেন্দ্রনাথ এবং সেক্রেটারি প্রবোধচন্দ্র গুহ। ডিরেক্টর অভিনীত হল শরৎচন্দ্রের 'পরীনায়ক'। ভূপেনবাবু ভাগলপুর থেকে এখানকার সন্ধানানায় তিনজন শিল্পীকে—হিমাংশু চক্রবর্তী, প্রবীর চৌধুরী ও ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়কে আনালেন। নরেশ মিত্র, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসীলাহিড়ী (পরে), মনোরমা, নিভাননী, কৃষ্ণবন্দিতা, শিপ্রাবরালা প্রভৃতি বিশিষ্ট শিল্পী যোগী আর্ট থিয়েটারকে সমৃদ্ধ করলেন। এই বছরে ৩০ জুন আর্ট থিয়েটারের পরিচালনাধীনে স্টারে অভিনীত হল সে যুগের ইতিহাস সৃষ্টিকারী নাটক প্রযোজনা অমরেন্দ্রচন্দ্রের 'কর্ণার্জুন'। 'কর্ণার্জুন' নাটিকাটি স্টার থিয়েটারে তিন শতাধিক রজনী একটানা অভিনীত হয়ে নতুন নজিরের সৃষ্টি করে। এর ১০০তম রজনী হয় ২৪ মে ২৪,২০০তম রজনী ৪ আগস্ট ১৯,২০০তম রজনীর উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ২৮ ডিসেম্বর ২৩ তারিখে। তারপরের ২৪ ডিসেম্বর মঞ্চস্থ হল প্রথম বাংলা একাঙ্কিকা 'দশের ডাকে' ভূমির ডাক'।

১৯২৪ সালে অমরেন্দ্রনাথের 'ইরানের রানী' (১১১) অভিনীত হল।

১৯২৫ সালে প্রযোজনা ক্ষীরোদপ্রসাদের 'গোলকুণ্ডা' (৪/২), রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা' (১৮/৭), নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জলকুমারী' (৩/১২), রবীন্দ্রনাথের 'পূরাপ্রবেশ' (৫/১২), অমরেন্দ্রচন্দ্রের 'মন্দিরী' (২৩/১২) এবং নরেশ সেনগুপ্তের 'অভিনয় মেজে'।

১৯২৬ সালে রবীন্দ্রনাথের 'বলীকরণ' (১০/১) এবং 'বিবাহ অভিপ্রায়' (১৬/৪), অমরেন্দ্রচন্দ্রের 'শ্রীকৃষ্ণ' (১৪/৫), গৌরীন্দ্রনাথের 'সাধ টাকা' (৭/৭), রবীন্দ্রনাথের 'গোগাবোধ' (২৩/৭), অমৃতলালের 'অবাকজলপান' (১০/১১) এবং অমরেন্দ্রচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' (২৪/১২) মঞ্চস্থ হয়।

১৯২৭ সালে রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' (১৩/৪), ও 'পরিত্রাণ' (১৯/৯) অপরেশচন্দ্রের 'মেবার পতন' (৩/১২) এবং 'পুষ্পাঞ্জলিরা' (২৮/১২) উপন্যাসিত হল। এই বছর আর্ট থিয়েটার মনমোহন থিয়েটার-ভাড়া নিয়ে দুপক্ষে দুটো বাংলাদেই চালাতে লাগলেন। আর্ট থিয়েটারের অন্যতম মনমোহনে মঞ্চস্থ হল অপরেশচন্দ্রের 'ঐশ্বরাস্ত্র' (১/৭)। অন্যত্র বছরের 'চাঁদ সওদাগর' (১৮/৯), শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'আবরীন' (২৩/১২)। এছাড়াও অনেকগুলি পুরোনো নাটক অভিনীত হয়। ১৯২৮ সালের জুন মাসে আর্ট থিয়েটার মনমোহন অঞ্চলের স্থায় ছেড়ে দেন। কারণ হিসেবে 'একশো বছরের বাংলা থিয়েটার' গ্রন্থের লেখক নিশির বসু লিখেছেন

> "...স্টার ও মনমোহন একই রাস্তা দিয়ে হওয়ায় নির্ধারিত টিকিট বিক্রেতাদের অভিনয়ে (অনেক সময় একই দিনে) অসুবিধা হতে হয়। দুই মঞ্চে অভিনেতার এই টানা-পোড়েনের ফলে নট-নটীরা ক্রমাগতই অসন্তোষ প্রকাশ করতেন এবং সে কারণে তাঁদের এবং পরিচালকের পক্ষে সর্বশক্তি নিয়োগ করে রঙ্গালয়ের নাট্য প্রযোজনার নিজেদের নিজস্ব ধারা ঠিক ঠিক অনুসরণ করা ক্রমশই অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। ফলে, মনমোহন থিয়েটারের স্বর্ণযুগীন প্রযোজনার যান প্রতিষ্ঠার পর্যায়ে পৌঁছায়নি। সুযোগ পেলে কোনও কোনও পত্র-পত্রিকা এসবের সমালোচনা করেছে, আর্ট থিয়েটারের এখন আর এক সঙ্গে দুটো রঙ্গালয় চালানো উচিত নয়।"

নাট্যকার নিশিরকুমার ভাদুড়ী ১৯০১ সালে আদেশিকা থেকে ফিরে এসে বিভিন্ন মঞ্চে অভিনয় করার পর নাট্যমন্দিরের পক্ষ থেকে স্টার থিয়েটার লিজ নিয়ে ১৯০৩ সালের শেষের দিকে নিজ পুরনো নাটকের পুনরাভিনয় করালেন 'মোহান্ত' (২৮/১২) 'পাষাণের অজ্ঞাতবাস' (২৯/১২), 'বিজিয়া' ও 'মৌচাক ভাঙা' (৩০/১২), 'রাজাকৃষ্ণ' এবং 'বিভিন্নাভি'।

১৯০৪ সালে শচীন্দ্রনাথের 'বিরাজ বৌ' (নাট্যরূপ নিশির ভাদুড়ী ২৮/৭), সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সুরধা' (২৭/৯), মন্মথ রায়চৌধুরীর 'অভিমানী' (১১/১১), শচীন সেনগুপ্তের 'মনের মানুষ' (২৪/১১), শচীন্দ্রনাথের 'নিজাম' (১৪/১২) মঞ্চস্থ হয়।

১৯০৫ সালে সরোজকৃষ্ণ রায়ের 'শ্যামা' (২৮/১), শচীন্দ্রনাথের 'পুরনারী', 'অজন্তা' নামে এবং জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 'রীতিমতো নাটক' (১১/১২) অভিনীত হয়। নিশিরকুমার ভাদুড়ী এ নাটক রচনায় সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নাট্যকার হিসেবে তাঁর নামও প্রচারিত হয়েছিল।

১৯০৬ সালে মঞ্চস্থ হয় রবীন্দ্রনাথের 'গোড়াযোগ' (২৪/১২) এবং দ্বিজু পুরনো নাটক।

১৯০৭ সালে অনেকগুলি নতুনিনের অভিনয়ের পর মন্ত-নাট্যমন্দির স্টার থিয়েটার ছেড়ে চলে যায়। নিশির ভাদুড়ী তাঁদের থিয়েটারে নতুন পুরনো মিলিয়ে প্রায় ১০ খানা নাটক মঞ্চস্থ হয়। এরপর মনমোহন-মোক্ষদাদের জন্য নিউ স্টার থিয়েটার বন্ধ থাকে। ওই বছরের ৪ আগস্ট স্টার থিয়েটার ভাড়া নিয়ে ঘোষণা করলেন, তাঁরাই দেবা নাটক 'গৌরাঙ্গমুন্দর' (৪/১০)। এই সময় বিডন পার্ক বিশ্বসিংহের জন্যে স্টার থিয়েটারের লেজি হলেন। স্টার মঞ্চে জন্ম নিল 'লেটেস্ট অঙ্কের ফিল্ম সিনিমেটো'। এদের প্রযোজিত নাটক হলেন গোবর্ধনের 'বিদ্যাপতি' (১৭/১১), অন্নদাচরণ খাস্তগীর 'অভিশপ্তিকা' (২৫/১২) এবং হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের 'রাজপুরিণী' (৪৩/১২)।

১৯০৮ সালে মঞ্চস্থ হল শচীন সেনগুপ্তের 'কামেরে লক্ষী' (১২/৩) বিডন পার্ক স্টার থিয়েটার ছেড়ে দিয়ে 'নিউ ডিমেন্ট' থিয়েটারের উপেন্দ্রকুমার মিত্রের সুযোগ্য পুত্র সলিলকুমার মিত্র স্টার থিয়েটারের নতুন লেজি হলেন। তাঁর সুষ্ঠু পরিচালনাধীনে স্টার থিয়েটার ২৯ মার্চ ০৮ থেকে ৩৫ মার্চ '২১ পর্যন্ত টানা ৩৩ বছরের স্বনাম এক গৌরবময় ইতিহাস রচনা করে। মিনার্ভা থেকে স্টারে এসে প্রথমে মিনার্ভার চলতি নাটক 'দর্পহরণ' নিয়ে শুরু করে 'পাতাটীর্থ', 'শিবাজী' প্রভৃতি নাটকগুলির পুনরাভিনয় হয়। পরিচালক ছিলেন সলিল মিত্রের মামাতো ভাই কালীপ্রসন্ন ঘোষ। এরই পরিচালনাধীনে নতুন নাটক মঞ্চস্থ হল মন্মথ রায়ের 'চক্রশালী' (৩/৩), সুধীন্দ্রনাথ রাহার 'বাংলার মেয়ে' (১০/৯) এবং অমিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সাধুসের'।

১৯৫০ সালের শেষের দিকে পরপর দেশ অনেকগুলি নাটকের ঘোষণার পরও সলিলবন্ধুর অসুখ হল মনোমোহনের মতো স্টার থিয়েটারের স্বত্ব নিয়ে পারলেন না। তাই এই বিপর্যয়। এবার তিনি সর্বস্বান্ত হয়ে হাতে তুলে নিয়ে প্রথমেই নজর দিলেন পুরনোকালের কাজে। অনেকদিন অভিনয় বন্ধ রেখে প্রায় ৬০ হাজার টাকা ব্যয়ে আধুনিক রুচি অনুযায়ী আমূল পুর সংস্কার করলেন তিনি। মনোমোহনের আমলের সব অভিনেতা-অভিনেত্রীরাই ফিরে এসে যোগদান করলেন। তাছাড়া পরিচালক এলেন ছিরি ও মঞ্চের মালী নতুন শিল্পীগোষ্ঠী। এঁদের মধ্যে ছিলেন উপেন্দ্রকুমার, অমর গাঙ্গুলী, রবি রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপকুমার, শ্যাম লাহা, সন্তোষ সিংহ, বিভূতি ভট্টাচার্য, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী, সন্তুদাস, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, রেবা দেবী, রমা দেবী, শেফালী প্রমুখ শিল্পীরা। যুগ পরিচালক হলেন শিশির মল্লিক ও কামিনী ছিরি, নাটকের আমি। একদিকে পুরনোকালের ও নিজ নির্বাচিত চরকিতে নতুন সেনের তত্ত্বাবধানে মুর্তিমান রঙ্গমঞ্চের নিযুক্তিকার্য চলতে লাগল, অন্যদিকে আমি নিরুপমা দেবীর বিখ্যাত উপন্যাস 'শ্যামলী'র নাট্যরূপ নিয়ে ব্যস্ত হলাম। নাটক ঘোষণা আর পুরনোকালের প্রায় এক সঙ্গেই শেষ হল।

১৯৫০. সালের ১৫ আগস্টের 'শ্যামলী' নাটক নিয়ে নাট্যঘরে নব পর্যায়ে স্টার থিয়েটারের শুভ উদ্বোধন হল।

এই প্রসঙ্গে 'দেশ' পত্রিকায় লেখা হল

"...নাটমন্দিরটির ডিজাইন ও বাইরে আয়নার সাজানোর কথা হয়েছে। নতুন করে বসার আসনগুলিকে আরামপ্রদ করে তোলা হয়েছে। দর্শকাসনের আলোর অনুপ্রবেশও অনেকখানিই বন্ধ করা হয়েছে। এদিকে আলোর পুনর্বিন্যাস করে মাটিতে নেওয়া হয়েছে এবং মঞ্চের শিল্পী ও কুশলীদেরও আরামের ও সুবিধার কথা পরিপূর্ণভাবে মাথায় রেখে দেওয়া হয়েছে। সেট-সেটিং নিয়েও সব আলোচনা নতুন। অতিরিক্ত ও বিচক্ষণ অলঙ্করণের এবং শিল্পীদের মনে নতুন ও উদ্দীপনাময়ের সমন্বয়ের ঘটিয়ে দেয় তোলা হয়েছে। ...সর্ব বিষয়েই বিশ্বাস পরিবর্তনের ফলেই সৃষ্টি ও অনুভূতি এগোতে পারবে না। আর এ পরিবর্তনের ব্যাপারে শেষপর্যন্ত মঞ্চকে নতুন আলোয় উদ্ভাসিত দিয়েছে, একটা উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে।" (দেশ : শারদীয়া ১৩৭৮)

'শ্যামলী' নাটকের শতরজনী উপলক্ষে রঙ্গনীয় আয়োজনের অনুষ্ঠান হয় ১৮ মার্চ, '৬৪ দ্বিশতরজনী রজনী উপলক্ষে ২৫ আগস্ট, '৬৪ ত্রিশতরজনীর রজনীর উপলক্ষে ১৩ জানুয়ারি, '৬৫ এবং চতুর্থশতরজনী রজনীর উপলক্ষে ৬ জুলাই, '৬৫ তারিখে এবং শেষ অভিনয় ১৩ নভেম্বর, '৬৫ তারিখে। শীর্ষ ২৬ মাস একটানা ৪৮৫ রজনী 'শ্যামলী' পেশাদার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় এক নতুন রজিতের সৃষ্টি করে। এক জনার কারণে (যেমন নাটিকাটি 'রঙ্গালয়ের রিকর্ডিং')।

১৯৬৫ সালের ১৪ ডিসেম্বর মঞ্চস্থ হল শরৎচন্দ্রের কাহিনীর উপন্যাস 'পরিণীতা', নাট্যরূপ দিয়েছিলেন অদ্রি, পরিচালনায় ছিলেন নির্মল মল্লিক। 'শ্যামলী' ছেড়ে যাবার আগে উত্তমকুমার স্টার থেকে নিজের নিয়োজন—তাঁর স্থানে নতুন নায়কে এলেন তরুণী অভিনেতা অনিলবরণ ও নায়িকা তরুণ মুখোপাধ্যায়। ১৯৬৬ সালের ১৪ জুলাই 'পরিণীতা'র একটানা ১৩৫তম অভিনয়ের সাথ করে সলিলবাবু আবার নতুন করে পুরোদমে মন দিলেন। মাস ছয়েক থিয়েটার বন্ধ রেখে 'শ্যামলী' নাটকের নতুন সাজ সরঞ্জাম সহ রেকাবপুরের আনুষ্ঠানিক করলেন। তারপর সুবাদে শ্রীবৃদ্ধির পরিকল্পনার আমূলপরিবর্তন অলঙ্করণ করলে হল, তারা হল শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। ১৯৬৭ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি 'দৈনিক বসুমতী'তে লেখা হল

"...প্রচুর অর্থব্যয়ে মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহের আমূল সংস্কার সাধন করেছেন স্টারের কর্তৃপক্ষ। দর্শকাসনের বসবার আসন বদলেছে, আরও আরামপ্রদ, প্রেক্ষাগৃহের অলঙ্করণ হয়েছে আকর্ষণীয়। শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ-যন্ত্র স্থাপিত হওয়ায় দর্শকদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বেড়েছে প্রচুর পরিমাণে।

'শ্যামলী'র অভিনব সাফল্য যে এঁদের দর্শকের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি আরও বেশি সচেতন করে তুলেছে এতে তার কোনো এর বিন্দুমাত্র অর্থব্যয় করতেও এঁরা বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন, এর দ্বারা এঁদের যে নিষ্ঠা ও কর্তব্যবোধের পরিচয় পাওয়া গেল, তা অকুণ্ঠ প্রশংসার যোগ্য। এঁরা যে দর্শকের কথা থেকে শুধু আমাদেরই কথাটা মনে রাখেন তা, সেই সঙ্গে এঁদের অনেকখানি নিজের এগিয়ে আসতে পারেন, এইখানেই এঁদের সততা ও নিষ্ঠা প্রমাণিত হয়েছে।...স্টার রঙ্গমঞ্চ আজ বাঙালীর গৌরবের বস্তু।"

১৯৫৭ সালের ৭ জানুয়ারি নবরূপে নব বেশে উদ্ভাসিত হয়ে আবার দর্শকদের অভিবাদন জানাল স্টার থিয়েটার। এবার সে উপহার দিল নরেশচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' (১ম ও ২য় পর্ব)। নাট্যরূপ আমার। পরিচালনা : নির্মল মল্লিক। মঞ্চ পরিকল্পনা : বটীন্দ্র সরকার (নানুবাবু)। দ্বিতীয় রজনী থেকে যোগেন রায়। সুরু সংযোজনা : দুর্গা সেন। নৃত্য পরিকল্পনা : নরহর ঘোষ। এ নাটকে স্টারে যোগ দিয়েছেন নির্মলকুমার ও শিপ্রা মিত্র। সঙ্গে নিয়মিত শিল্পীরা—অনুপকুমার, তুলসী চক্রবর্তী, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপ মুখার্জী, সুবোধ দাস, শান্তিগোপাল, অপর্ণা দেবী, নবিতা চট্টোপাধ্যায়, বেলারানী প্রমুখ। নাটিকাটি একটানা চলল ১৯৫৮ সালের ২ মে পর্যন্ত। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' লিখল

"নরেশ মেহতার অবিস্মরণীয় অনবদ্য অভিনয় মেজদাদাবাবু 'শ্রীকান্ত'র নাট্যে অপরূপ সম্পদ করেছেন সুন্দর ও সার্থকভাবে।...'অভয়া' চরিত্রে নবিতা, 'অভয়ার মা' রূপে অনুপ মুখোপাধ্যায়, 'শ্রীকান্ত' রূপে নির্মলকুমার, 'রাজলক্ষ্মী' ওরফে 'পিয়ারী বাইজী' রূপে শিপ্রা, 'ইন্দ্রনাথ' রূপে সুবোধ এবং 'অন্নদা' অনুপকুমার ঃ-র চরিত্রের পরিচয়ের আজ সার্থক অভিনয়ে মুর্ত করে তুলেছেন।"

"টেলির সাহায্যে দৃশ্য পরিবর্তন, হলঘরে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ও সাউন্ডের সাহায্যে বিজ্ঞাপন প্রচারের ব্যবস্থায় স্টার রঙ্গমঞ্চ বহু-রঙ্গমঞ্চের পথিকৃৎ হয়ে রইল।"

(দেশপত্রিকা ১৪ বর্ষ ৪৭ সংখ্যা ১৩৫৭)

'শ্রীকান্ত' নাটকের ১০০তম রজনী ২২ জুন, '৫৭ ২০০তম রজনী ১১ নভেম্বর '৫৭ এবং ৩০০তম রজনী ২২ এপ্রিল, '৫৮ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১৯৫৮ সালের ২ জুন মঞ্চস্থ হল 'রাজলক্ষ্মী', শ্রীকান্ত উপন্যাসের ৩য় ও ৪র্থ পর্ব অবলম্বনে। নাট্যরূপ আমার। পরিচালনা : নির্মল মল্লিক। মঞ্চসজ্জা ও আলোকসম্পাতে বটীন্দ্র সরকার (নানুবাবু)। শীতাতপ : যোগেন রায়। সুরকার : মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। অভিনয়ে স্টার থিয়েটারের নিয়মিত শিল্পীরা। 'রাজলক্ষ্মী' নাটিকাটি একটানা ১০৪ রাত্রি অভিনয়ের পর পরি বছর ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলে। 'লোকসেবক' পত্রিকায় লেখা হয়—

"মঞ্চসজ্জা অভিনয় এবং দৃশ্যসজ্জা চমৎকার। নাটকের পরিচালনাও হয়েছে নিখুঁত।"

নাটকের ১০০তম রজনীর উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ২৭ অক্টোবর, '৮৮।

নতুন নাটকের প্রস্তুতির জন্য দরজায় পেতে ২৪ ডিসেম্বর থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ে 'শ্যামলী' নাটকের পুনরাভিনয় শুরু। অবশ্য হয়েছিল ৩৮ রজনী—শেষ অভিনয় হয় ১৫ ফেব্রুয়ারি, '৯১।

১৯৯৯ সালের ১২ মার্চ মঞ্চোপযোগী অনুবাদ 'সৃষ্টি-দৃষ্টি' উপন্যাস অবলম্বনে 'ডাকঘরলেনে' (নাট্যরূপ ও প্রযোজনা) মঞ্চস্থ হল। এই নাটক থেকে নাট্য পরিচালনার অভিনবত্ব আমার ওপর এসে পড়ল। মঞ্চসজ্জা ও আলোকসম্পাতের দায়িত্বে ছিলেন অনিল বসু। আমি প্রথমেই নিয়ে এলাম নাটকটি শুরি ঝিকাশ এবং নায়িকার জন্যে সর্বপ্রথম সন্ধান দিয়েছে। সহযোগিতায় ছিলেন পূর্বের নিয়মিত শিল্পীরা। দীর্ঘ ন'বছর পরে মঞ্চে এসে ঝুমি ঝিকাশ এই নাটকে অনবদ্য অভিনয় করলেন। সমালোচনা প্রসঙ্গে 'দেশ' পত্রিকায় লেখা হল

> '....দীর্ঘকাল পরে ঝুমি ঝিকাশের অনবদ্য অভিনয়ের জন্যেও দেখতে হবে এই নাটক। 'দীপেনের'-এর মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং সংবেদনশীল স্ত্রীর আবহাওয়া সহজ প্রকৃতি তিনি অপূর্ব নিষ্ঠা ও কৃতিত্বের সঙ্গে রূপায়িত করেছেন। স্ত্রীর অভিনয়ের মধ্যে কয়েকটি গভীর নাটকীয় মুহূর্তের সৃষ্টি করে গেছেন।....মুখসজ্জার দিক দিয়ে নাটকটি অত্যন্ত প্রশংসার দাবি রাখে। মঞ্চে বহির্প্রকৃতির রূপ দেখানোর কৌশল এক কথায় চমৎকার। দীপেনের-এর ঘরে রামমিনি ও জলীয়দের আগমনের দৃশ্যটি খুবই সুন্দর। নাটকটির মঞ্চসজ্জা, আলোক-সূচনা ও আলোকসম্পাত বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে।'
>
> (দেশ / ৫ই ডিসেম্বর ১৯৯৯/১৮ অগ্র ১৪০৬)

'ডাকঘরলেনে' নাটকের ১০০তম ও ২০০তম অভিনয়োৎসবের অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২১ আগস্ট, '৯৯ এবং ২২ জানুয়ারি, '০০ তারিখে।

এরপরে ঘরে বসে বিদেশের জনপ্রিয় উপন্যাসের নাট্যরূপই কেবল মঞ্চস্থ হয়ে এসেছে। এবার মঞ্চস্থ হল আমার মৌলিক নাটক 'পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ', ১৯ মার্চ, ১৯৮০। নির্দেশনার ভূমিকায় অবতীর্ণ অভিনয় করেছিলেন ঝুমি ঝিকাশ। এই নাটকের সমালোচনা প্রসঙ্গে 'জনসেবক' পত্রিকায় লেখা হল

> '....পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' দেখে এই কথাটাই মনে হলো যে শাশ্বত শিল্পীর চির-পুরাতনকে ঘিরিয়ে অভিনয়ে নবীন আধুনিকের ছোঁয়া দিয়ে পরিবেশন করেছেন। আমাদের পরীক্ষায় এই নাটকের প্রযোজনা শিল্পের নাট্যরূপায়ণটির বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ধারণাকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে বিশেষভাবে। নাটকের পরিচালক যেখানে প্রয়োজন তাকে আমরা অভিনন্দন জ্ঞাপন করি....'
>
> (জনসেবক ৮ / ১৯৮০)

পত্র-পত্রিকায় সুখ্যাতি লাভের নাটকখানি টিকতে পারেনি। মাত্র ৭৬ রজনী অভিনয়ের পর বন্ধ করে দিতে হয়। নতুন নাটকের প্রস্তুতির জন্য ১৫ দর্শকে 'ডাকঘরলেনে' অভিনীত হয় ১১ জুলাই, '৯০ থেকে ৪১ জুলাই, '৯০ পর্যন্ত ১১ রজনী। এরপর ১১ আগস্ট, '৯০ তারিখে অভিনীত হল মুখোশ খোলের ভিন্নধর্মী উপন্যাস 'প্রেতপুরী'। নাট্যরূপ ও পরিচালনা আমার। এবার নায়কের ভূমিকায় এলেন বিশ্বজিৎসেনের বন্ধু প্রীতিভাজন অরুণ হাজরা। কমল মিত্র, তাপু গঙ্গোপাধ্যায়, অনুপকুমার, সান্ত্বিকী চট্টোপাধ্যায়, লিলি চক্রবর্তী (সংযোজন বাসনাতে প্রথম), বীনা পাল প্রমুখ নিয়মিত শিল্পীরা। ঘরোয়া থিয়েটারের আবহে ঘিরে শেষ তার পুরনো রীতিতে। পুরো ১৯৯১ সাল জুড়ে 'প্রেতপুরী'। নাটকের ১৭০তম, ২০০তম, ৩০০তম রজনীর উৎসব অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে ১৭ জানুয়ারি, '৯১, ২৩ জুন '৯১ এবং ১৮ নভেম্বর, '৯১ তারিখে। ১৯৯২ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি ৩৭৩তম অভিনয়ের পর 'প্রেতপুরী' বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৯২ সালের ৮ মার্চ মঞ্চস্থ হল শক্তিপদ রাজগুরুর উপন্যাস অবলম্বনে 'শেষরক্ষি' নাট্যরূপ ও পরিচালনা আমার। মঞ্চ আলোক : অনিল বসু। শীতিকার শিবপ্রসাদ রায়। অভীষ্ট কুণ্ডু সেন। অভিনয়ে বিশেষভাবে শিল্পীরা। এই নাটকটি প্রায় ৩ বছরের সঙ্গে রজনীর সংখ্যা বাড়ে। মঞ্চস্থ হয়ে গিয়েছে, সেখানেও এই নাটক 'অভিনীত', তার সঙ্গে মঞ্চস্থ হল মঞ্চস্থ আরেক যৌথপরিবার নাটক 'আরাধনা'। ২৩ ডিসেম্বর থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ে শুরু হল 'শেষরক্ষি'। ক্রমবর্ধমান ভিড়ে নাটকটি ২২০ রাত্রি অভিনীত হয়েছিল। এই নাটকের ১০০তম রজনী উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ২৫ আগস্ট, '৯২ এবং শেষ অভিনয় ৩ ফেব্রুয়ারি, '৯৫ তারিখে।

১৯৯৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি শীতের মরসুমে নাটক প্রযোজনা নীহাররঞ্জন গুপ্তের কাহিনী অবলম্বনে 'ডাকসাঁই'। নাট্যরূপ ও পরিচালনা আমার। অভীষ্ট কুণ্ডু সহযোগিতা করেছিল। এই নাটকে প্রথম অভিনয়ে করলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও মঞ্চে। সমালোচনা প্রসঙ্গে 'যুগান্তর' পত্রিকা লিখলেন—

> 'ডাকসাঁই' নাটকে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় প্রথম অভিনয়রজনীই চমকপ্রদের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়েছেন। সৌমিত্র অভিনয় চরিত্রটিকে (দীপক) একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য দান করেছে এবং সামগ্রিক অভিনয়ের দিকটিতে এই অভিনয় নিঃসন্দেহে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক।
>
> তিনখানি রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং পরিবেশ রচনায় রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সুষ্ঠু সার্থকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে নাটকটিতে। মুখসজ্জা এবং সুষ্ঠু আলোকসম্পাতের দাবি অনিল বসুর।
>
> (যুগান্তর ১৮ মার্চ, ১৯৯৩)

নাটকটি ৪৬৭তম অভিনয়ের পর ১৯৯৪ সালের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত চলে। 'ডাকসাঁই'র ১০০তম, ২০০তম, ৩০০তম এবং ৪০০তম রজনীর আয়োজনের মধ্য দিয়ে

১৪ জুলাই, '৮৩, ২৭ ফেব্রুয়ারি, '৮৪ ১৪ জুলাই, '৮৪ এবং ৫৮ নভেম্বর, '৮৪।

১৯৮৫ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি মঞ্চস্থ হল বিমল মিত্রের 'একক দশক শতক'। নাট্যরূপ ও পরিচালনা আমার। সঙ্গীত আলাদি খন্দিলার। মঞ্চ ও আলো অনিল বসু। গীত রচনা পূরবী মুখোপাধ্যায়। নৃত্য পরিকল্পনা গীতিমা দাস। ২৬৪ রাত্রি অভিনয়ের পর ১৯৯৬ সালের ১৭ এপ্রিল নাটকটি শেষ হয়। এই নাটকটি নিয়ে বিদেশনগরে দুবার আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল।

১৯৮৬ সালের ২৮ এপ্রিল মঞ্চস্থ হল 'সখী'। নাটকটি রচনা ও পরিচালনা আমার। সঙ্গীত কালীপদ সেন। আলো ও মঞ্চ অনিল বসু। গীত রচনা পূরবী মুখোপাধ্যায়। এই নাটকে নায়কের ভূমিকায় সর্বাঙ্গ সুন্দরভাবে প্রথম অভিনয় করলেন এবং নায়িকার ভূমিকায় প্রথম পুরস্কার চট্টোপাধ্যায়— সঙ্গে শহরের নিয়মিত শিল্পীরা। এই নাটকের জনপ্রিয়তা 'শাস্তনী' নাটকের রেকর্ডও ভেঙে দিয়েছিল। সমালোচনা প্রসঙ্গে 'দেশ' পত্রিকায় লেখা হল—

> '...দর্শকের দাবি এই নাটক অনন্তকাল পূর্ণ করবে। ঘটনার পর ঘটনা নাট্যকার-পরিচালক যেভাবে গড়ে তুলেছেন, তা দর্শকদের কৌতূহলকে সজাগ রাখে। পরিস্থিতি ও পরিণতি এই নাটকের মত দাবী। কোন ঘটনাই অকারণে দীর্ঘ নয় এবং নাটকটির মত অকৃপণ অভিনেতা-অভিনেত্রীরা, যাঁর মধ্যে দিয়ে নাট্যকার কল্পিত চরিত্রগুলির মধ্যে একটি বাস্তবিক ছবি এঁকেছেন। 'সখী' একটি ভালো নাটক, যার উপস্থাপনা ও উপলব্ধির দর্শকরা সানন্দে গ্রহণ করবেন।'

/দেশ ১১ জুন, ৮৬/

'সখী' নাটকের সাফল্যের ১৯৮৭ সালে আর কোনও নাটক বানাতে হয়নি। এই ১০০তম, ২০০তম ও ৫০০তম অভিনয় উপলক্ষে যথাক্রমে ২৩ নভেম্বর, '৮৯ ও জুন, '৯৭ এবং ৭ সেপ্টেম্বর, '৯৮ তারিখে। নাটকটি রচনার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে 'সুধাংশুকান্ত পুরস্কার'-এ ভূষিত করেন।

১৯৮৮ সালের ২৪ অক্টোবর শহরে মঞ্চস্থ হল 'পরিণতা'। রচনা ও পরিচালনা আমার। সঙ্গে নিয়মিত শিল্পী ও অভিনেত্রীরা এবং অতিথি চট্টোপাধ্যায়। নাটকটি ৪৫১ সন্ধ্যা চলার পর ৭ ফেব্রুয়ারি, '৯১ তারিখে শেষ হয়। এর ১০০তম ও ২০০তম রজনীর অনুষ্ঠান হয় যথাক্রমে ২৮ জুন, '৯০ এবং ১৩ সেপ্টেম্বর, '৯১ তারিখে। পুরো দুটো বছর পার করে গেল 'পরিণতা'।

১৯৯১ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি মঞ্চস্থ হল 'নীলম'। রচনা ও পরিচালনা আমার। সঙ্গে শহরের নিয়মিত শিল্পী এবং অভিনেত্রীবৃন্দ। নাটকটি ২০৪ রাত্রি চলার পর ২ জানুয়ারি '৯২ তারিখে বন্ধ হয়। শতবর্ষ বিনোদিনী-এর ইতিহাস চলচ্চিত্রে বলি ১৯৩৪ সাল থেকে এই বিনোদিনীর ভালোবাসার সলিলসমাধান ছিল। তারপর রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে মিত্র পরিবারের সম্পর্কে সেই বিশ শতকের খোড়া খেয়ে। সলিলবাবুর সঙ্গে শহরের সম্পর্ক তিন দশকেরও বেশি। সেই দীর্ঘকালের ঐতিহ্যের বন্ধন ছিন্ন করে ১ এপ্রিল, '৯১ থেকে সলিলবাবু রঙ্গমঞ্চটি তুলে দিলেন বঙ্গিম নিরঞ্জনের স্বত্বাধিকারী বঙ্গিমচন্দ্র অপারেটরদের হাতে। সলিলবাবুর বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে একটি যুগের পরিসমাপ্তি ঘটল। বঙ্গিমবাবু প্রথম প্রথম মঞ্চের শিল্পী ও কলাকুশলীদের বহাল রেখে 'সীমা' নাটকটি চালাতে লাগলেন। এই পর্যায়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা কালোত্তীর্ণের মুক্তিযুদ্ধ। এই পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গিমবাবু প্রযোজনা করলেন আমার লেখা মঞ্চ নাটক। মঞ্চস্থ হয়েছিল ৮ মে, '৯১ তারিখে। ১৯৭২ সালের ৯ জানুয়ারি সর্বাঙ্গ ১০০৫ম অভিনয়ের পর 'সীমা' নাটকটি বন্ধ হয়।

১৯৭২ সালের ২১ জানুয়ারি মঞ্চস্থ হল অশোকপুরী দেবীর 'মন্ত্রণা', নাট্যরূপ ও পরিচালনা আমার। অভিনয়ে শহরের নিয়মিত শিল্পীদের সঙ্গে অতিথিরাও ছিল। এই নাটকে মঞ্চ আলোকসম্পাতে অনিল বসু অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দেন। নাটকটি ১৮ ফেব্রুয়ারি, '৭৩ পর্যন্ত ২৬৭তম রজনী অভিনয়ের পর বন্ধ হয়।

১৯৭৩ সালের ১৮ মার্চ মঞ্চস্থ হল 'বিদ্রোহী নায়ক'। রচনা ও পরিচালনা আমার। রঙ্গমঞ্চের পঞ্চাশৎ উপলক্ষে-এর আধুনিকতম নিবেদিতায় সে যুগের নট-নাটিকার উপেক্ষনাথ মঞ্চের জীবনী অবলম্বনে। 'সুখের বিনোদিনী' নাটক রচনা ও অভিনয়ের জন্য তিনি তখনকার ইংরেজ সরকারের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন। আমার এই নাটকটিও তখনকার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'সুধাংশুকান্ত পুরস্কার' পায়। ১০৪তম অভিনয়ের পর ৩০ আগস্ট, '৭৩ তারিখে নাটকটি বন্ধ হয়ে যায়। এরপর ২০ সেপ্টেম্বর '৭৩ তারিখে মঞ্চস্থ হল শরীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অন্তরঙ্গবধূ'। পরিচালনা আমার। সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন হিরিপ্রসন্ন। ১৭৭তম অভিনয়ের পর ২৮ এপ্রিল, '৭৪ তারিখে নাটকটি শেষ হয়। ১৯৭৩ সালের গোড়ার দিকে আমার সঙ্গে শহরের সম্পর্ক ছিন্ন হয়। সেই সঙ্গে শহরের পুরাতন শিল্পীগোষ্ঠীকেও বিদায় দেওয়া হয়। এরপরিবর্তন নতুন করে গড়ি উপলক্ষে ২৫ ডিসেম্বর, '৭৩-এ মঞ্চস্থ হয়ের 'মুক্তির ডাক' মঞ্চস্থ হয়। আবার সময়ে শহরে ছোট-বড় নাট্যরূপ ও মৌলিক নাটক নিয়ে প্রায় ২০ খানা নাটক মঞ্চস্থ হয়।

১৯৭৪ সালের ৩১ মে মঞ্চস্থ হল তুষার মুখোপাধ্যায়ের 'শরিফ'। পরিচালনা : অমিয় মোষ। নাটিকা : পরিমল বিশ্বাস। ৩০৭ রাত্রি অভিনয়ের পর ২২ জুন, '৭৫ তারিখে নাটকটি বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৭৫ সালের ১৮ জুন মঞ্চস্থ হয় অমিয়ভূষণের 'কৃষ্ণকলঙ্কের উইল' (নাট্যরূপ তুষার মুখোপাধ্যায়)। প্রথম উপন্যাস ও 'কৃষ্ণকলঙ্কে'র ভূমিকায় মঞ্চের শুরু। পরিচালনা

রঙ্গিমহল কালেক্টরিয়া। ৫৪৫তম রজনী অভিনয়ের পর ২৪ জে. '৭৭ তারিখে নাটকটি বন্ধ হয়। ১৯৭৬ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর পরাধীনতার অন্ধকারবাহিনীতে 'মন্বন্তর' (নাটক নীহারঞ্জন হয়) মঞ্চস্থ হয়।

১৯৭৭ সালের ২৭ জুন অভিনীত হল অমিত মুখোপাধ্যায়ের 'সমাজ'। প্রধান উপকরণ ও অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন। পরিচালনা : রঙ্গিমহল কালেক্টরিয়া। সঙ্গীত : হিমাংশুরঞ্জন। ৪৩৭ রজনী অভিনয়ের পর নাটকটি ১২ ডিসেম্বর '৭৮ তারিখে বন্ধ হয়।

১৯৭৮ সালের ১৪ ডিসেম্বর শুরু হল তপেশ্বু পাত্রুলির 'সংগ্রাম'। নাটকটি খুবই জনপ্রিয় হয়। মাত্র ২৮ রজনীর পর ১৮ জানুয়ারি '৭৯ তারিখে বন্ধ হয়ে আবার দ্বিতীয় পর্যায়ে 'কৃষ্ণকান্তের উইল চলাতে হয়। এবারও ৭৭তম অভিনয় হয়ে ২৯ এপ্রিল '৭৯ পর্যন্ত চলে। দু'বারে নাটকটি ৬২২ রাত্রি অভিনীত হয়।

ছয়মাস বন্ধ থাকার পর চলচ্চিত্রের অভিনয় পাত্রুলির 'মানু' পালটি 'সমাধান' নামে মঞ্চস্থ করেন মেসার্স হাজরা। 'সমাধান' শুরু হয় ১৯৭৯ সালের ৪ জুলাই। সংগঠনে ঘথারীতি পূর্বতন পরিচালকবর্গ। ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৫ সাল পূর্ণ করে ১৩ মার্চ, '৮৬ সাল পর্যন্ত প্রায় ৭ বছর একটানা ১৩২৪ রজনী চলার পর নাটকটি বন্ধ হয়। ১৯৮৪ সালের ১১ নভেম্বর অমেন্দ্র গুপ্ত পরলোকগমন করেন। এই 'সমাধান' নাটকেই তাঁর শেষ অভিনয়। 'সমাধান' স্টারের সব নাটকের রেকর্ড ভেঙে এক নতুন নজির সৃষ্টি করে।

১৯৮৪ সালের ১৪ই এপ্রিল শুরু হয় নব সামাজিক নাটক অঙ্গন শ্রীবুদ্ধী চিত্রকাহিনী 'সাপের বাড়ি'র অভিনয়। এ নাটকটির তীব্রবিন চলার পর (১০৫ রজনী) ১৯৮৯ সালের ১৭ জুন বন্ধ হয়।

১৯৮৫ সালের ২৭ জানুয়ারি শুরু হল অজিত পাত্রুলির 'শাপমোচন'। ২৯১তম অভিনয়ের পর ১৩ এপ্রিল, '৮৬ তারিখে শেষ হয়

১৯৮৬ সালের ১৪ এপ্রিল শুরু হল অশাপূর্ণা দেবীর বিখ্যাত চিত্রসফল কাহিনী 'সুবর্ণলতা'। নাট্যরূপ অজিত পাত্রুলি। এই নাটকের নায়িকা ছিলেন সুপ্রিয়া দেবী। ৩৮৮তম অভিনয়ের পর ২২ নভেম্বর '৮৭ সালে নাটকটি বন্ধ হয়। এই বন্ধের আর একটি নব সামাজিক নাটক 'খেলনা' শুরু হয় ৩১ ডিসেম্বর '৮৬ তারিখে। ৭২ রজনীর পর বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৮৭ সালের ১৫ এপ্রিল শুরু হল 'ঘরে ঘরে'। ১০৭তম অভিনয়ের পর ২১ আগস্ট, '৮৭-তে নাটকটি বন্ধ হয়ে যায়। ইতিমধ্যে মাঝে মাঝে অর্ধশিবেকের শুরু হয়। থেকে যায়ন. ১৯৮৭ সালের ১ ডিসেম্বর থেকে '৮৮ সালের ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন পক্ষ থেকে স্টার থিয়েটারে 'সক-আইটি' ঘোষণা করে হলগুলিকে এক বছরে বন্ধ রাখেন। এটিও বঙ্গের ইতিহাসে একটা রক্ষিদর্শীয় ঘটনা।

১৯৮৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি শুরু হল অজিত পাত্রুলির 'চাকরী'। ৪৫৫তম অভিনয়ের পর ৩০ এপ্রিল নাটকটি বন্ধ হয়ে যায়। এটিই রঙ্গিমহলের শেষ প্রযোজনা। একাধিক নাটকে পরপর লোডশেডিংয়ের পর রঙ্গিমহলের ডেকরেটার অনুপ গুপ্ত ও ফলস সেলসম্যান তাড়া দিলেন। এঁরা প্রযোজনা করলেন 'বরযাত্রী'। এই নাটকের মাধ্যমে স্টার আবার ফিরে পেল তার ঐতিহ্যকে। পরপর রজনী উৎসবও হল, কিন্তু পুর্ণাঙ্গনাটকের ১১৭তম অভিনয়ের পর নাটকটি হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল ১৩ মার্চ '৯০ তারিখে।

১৯৯০ সালে ১৮ মার্চ থেকে প্রযোজকদলের আনুকূল্যে এলেন প্রখ্যাত নট-নাট্যকার ও পরিচালক সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর দলবল নিয়ে শুরু হল 'নরমেধ'। ইতিমধ্যে অনুপ গুপ্ত ও ফলস সেলসম্যান নিজেদের নতুন নাটক প্রস্তুত করতে লাগলেন। 'নরমেধ' নাটকের শেষ অভিনয়েই কর্তৃপক্ষ অভিযোগ আনেন — নাটকের পরাক্রম রজনীর উৎসব হল। এইসব দেখে রঙ্গিমহলের আশ্রয়ে একটি নাটক প্রযোজনা করলেন 'অমীমা প্রোডাকসন্স'। শুরু হয় ২৭ এপ্রিল, '৯০ এবং শেষ হয় ১১ ডিসেম্বর, '৯০ তারিখে ৪০৫তম অভিনয়ের পর। ইতিমধ্যে অনুপবাবু ফলসম্যানদের প্রস্তুতিপর্ব শেষ হয়ে গিয়েছে। ১৯৯০ সালের ৯ ডিসেম্বর শুরু হল 'নটের নির্দেশ'। গল্প/পরিচালনা/সঙ্গীত প্রযোজনা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। অভিনয়ে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, তাপসী চক্রবর্তী, রবি ঘোষ, শ্রীলা মজুমদার, অরুণকুমার প্রমুখ। বিষয়টি সাজানো এনে দিল এই নাটক। ১৯৯১ সালের জানুয়ারিতে ১০০তম রজনীর স্বাগতোৎসবের অনুষ্ঠান হল। কিন্তু পূর্ণাঙ্গনাটকের ৫১৬তম অভিনয়ের পর ১৯৯১ সালের ১৩ অক্টোবর সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় রাত্রি ১টার জাতকিক অভিনয়ের সম্পূর্ণ অবসান হয়ে গেল পরাধীনতা অর্থের ঐতিহ্যবাহী বিনোদনকেন্দ্র প্রেক্ষাগৃহ স্টার থিয়েটার, যার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল আমার সুদীর্ঘকালের। শুধু তাই নয়—আমার সময়ে স্টার থিয়েটারকে সাজানো হয়েছিল, নীতিতাল নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছিল। প্রেক্ষাগৃহের অভ্যন্তরে আলোকপাত করেছিলেন প্রখ্যাত শিল্পী সুধাংশু চ্যাটার্জি। শিল্পী ও কলাকুশলীদের প্রতিযোগিতা মূলক ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এক কথায় বলতে পারি, আমার সময়ে স্টার থিয়েটারে একটা গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল। যাকে আমি রিয়ে রিয়ে 'চিত্রলাক্ষ্মী' বলে পড়ে তুলেছিলাম, অজিত চেলিয়ানে নিখাদ এক রাত্রের আলোয় সেই চিত্রলাক্ষ্মী অন্তর্হিত হয়ে গেল। শুধু থেকে গেল মস্তিষ্কোপরি অবেদনাদায়ী যা আগামী আসার পথের প্রতি মুহূর্তেই পরিবর্তনের সকল করিয়ে নিচ্ছে এই সেই স্টার থিয়েটার। হলগুলি আবার নতুন করে গড়ে উঠবে কিনা জানি না। যদিও বা গড়ে ওঠে, আমার জীবদ্দশায় আমি তা দেখতে পাব না—তাই উত্তরসূরী গবেষকদের জন্যে স্টার থিয়েটারের আনুপূর্বিক ইতিবৃত্ত এই পুস্তিকায় ধরে রেখে গেলাম।

/ পরিচালক এবং কলাকুশলীর তালিকা /

বাংলা নাট্যশালার উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক স্টার থিয়েটার

সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়

থিয়েটারের সঙ্গে আগুনের অগ্নিনকুল সম্পর্ক হাজার হাজার বছরের পুরনো। ইউরোপের থিয়েটারের প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব এস্‌কাইলাসের বিখ্যাত নাটক 'প্রমিথিউস বাউন্ড' (খ্রিঃ পূঃ ৪৫৭)-এর নায়ক প্রমিথিউস অলিম্পাস গিরি থেকে দেবরাজের অমূল্য ধন আগুন চুরি করে মানবজাতির হাতে তুলে দিয়েছিলেন দেবরাজ জিয়ুসের নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে ; ফলে তাঁকে পাহাড়ের সঙ্গে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখা হয় এবং ঈগলপাখি দিনের পর দিন তাঁর যকৃৎ ঠুকরে ঠুকরে খায়। অবশেষে মহাবীর হারকিউলিসের হস্তক্ষেপে তিনি মুক্তিলাভ করেন। মানুষের দেবতা হতে এই অসম সাহসিক সংগ্রাম আজও পৃথিবীর মানুষের হৃদয়ে অমলিন। কথাটা বার বার মনে পড়েছিল ১৪ অক্টোবর ১৯৯১—যেদিন আমাদের বাংলার নাট্যপ্রেমীদের হৃদু গর্বের স্টার থিয়েটার ভস্মীভূত হয়েছিল।

খুব বেশি দিন নয়—মাত্র দুশো বছর আগে আমাদের এই কলকাতায় ১৭৯৬ সালে ভারতবন্ধু রুশ ভাষাবিদ, সংগীতজ্ঞ, নাট্যকার, নির্দেশক মেরাসিম স্টেপানোভিচ লেবেডেফের তিল তিল করে রক্ত দিয়ে গড়ে তোলা 'বেঙ্গলি থিয়েটার' ব্রিটিশ বণিক সম্প্রদায়ের ষড়যন্ত্র মঞ্চশিল্পী জোসেফ ব্যাটল-এর স্বহস্তে অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত হয়। ১৯২২ সালে গিরিশচন্দ্রের স্মৃতিবিজড়িত মিনার্ভা থিয়েটার প্রথম রাত্রিতে 'ম্যাকবেথ' অভিনয় চলাকালীন অগ্নিদগ্ধ হয়ে ভস্মীভূত হয়। এই কারণেই বিদেশের প্রায় অধিকাংশ থিয়েটারে দেখেছি মঞ্চে সামনের পর্দারও সামনে একটি 'fire curtain'-এর ব্যবস্থা থাকে যাতে মঞ্চে কোনভাবে অগ্নিকাণ্ড ঘটলে গোটা প্রেক্ষাগৃহকে বাঁচানো সম্ভব হয়। আমাদের গোড়া দেশে ব্যবসায়ীরা এসব সম্বন্ধে অর্থাৎ নগদ মুনাফা ব্যতীত অন্য সব বিষয়ে চরম উদাসীন।

স্টার থিয়েটার আমাদের বাংলা নাট্যজগতের বিশাল ঐতিহ্যের বাহক, যেখানে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ থেকে গিরিশচন্দ্র, অর্ধেন্দুশেখর, বিনোদিনী, মহেন্দ্র গুপ্ত, অমৃতলাল, ছবি বিশ্বাস, আরও অনেক বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্বদের পদধূলিতে ধন্য কর্মচঞ্চল এক থিয়েটার।

স্টার থিয়েটারের দীর্ঘ ইতিহাসের পাতা উল্টে প্রথমে দেখি ১৮৮৩ সালে গিরিশচন্দ্র ন্যাশনাল থিয়েটার থেকে যখন সরে এলেন তখন তিনি নিজস্ব নাট্যদল গঠন করে ব্যবসায়ী গুরুমুখ রায়ের সহায়তায়, বিনোদিনীর সহযোগিতায় ৬৮ নম্বর বিডন স্ট্রিটে ন্যাশনাল থিয়েটারের উল্টোদিকে প্রতিষ্ঠা করলেন স্টার থিয়েটার। ২১ জুলাই ১৮৮৩ সালে 'দক্ষযজ্ঞ' নাটকের অভিনয় নিয়ে রঙ্গালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন হল। ৩১ জুলাই স্টার থিয়েটারে শেষ অভিনয় গিরিশচন্দ্র রচিত 'বুদ্ধদেব চরিত' ও বেল্লিকবাজার'। ১৮৮৭ সালে গিরিশ-বিনোদিনীর সৃষ্ট

থিয়েটার হিল হাজার টাকায় বিক্রি হয়ে গেল। মালিকানা হস্তান্তরের ফলে থিয়েটারের নতুন নামকরণ হল 'এমারেল্ড' থিয়েটার। সমকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই থিয়েটারেই প্রথম বিদ্যুতের সাদরাদ চালু হল।

এই এমারেল্ড থিয়েটারেই রবীন্দ্রনাথের 'রৌদ্রকুরমীর ঘটি' অবলম্বনে প্রযোজিত হয় 'রাজা বসন্ত রায়' এবং ১৮৯০ সালে 'রাজা ও রানী'। এমারেল্ড চলাকালীনই ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের ২৪ মে অমৃতলাল বসু, অমৃতলাল মিত্র প্রমুখেরা মিলিত হয়ে নতুন স্টার থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করলেন ৭৪/৩ কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে।

১৮৮৯ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি গিরিশচন্দ্র গোপাললাল শীলের এমারেল্ড থিয়েটার-এর সঙ্গে চুক্তি শেষ হলে নতুন স্টার থিয়েটারের জয়যাত্রা শুরু হল। ১৮৯০ সালে এসে সেখানে যোগ দিলেন নিরীহ-চরিত্র সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ যিনি দানীবাবু। দানীবাবুর পর শুরু হল নাটক 'চণ্ড'। ১৮৯১ সালে স্টার থিয়েটার ছাড়লেন গিরিশ ; তাঁর অনুপস্থিতিতে মঞ্চস্থ হল নাটক 'বিলাস' এবং পরবর্তী সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-নির্ভর 'মহাপেশ্বর' (১৮৯৪) এবং 'বাঙ্গলিনে' (১৮৯৬)— অমৃতলাল বসুর নাটকগুলি। এরপর গিরিশচন্দ্র পুনরায় স্টারে প্রত্যাবর্তন করলে শুরু হয় থিয়েটারের গিরিশচন্দ্র-অমৃতলালের যুগান্তকারী যুগ।

স্টার থিয়েটারে ফিরে এসে গিরিশ প্রথম নাটক 'কালাপাহাড়ে' মুখ্য ভূমিকায় নিজেকে ছাড়া দানীবাবু, নগেন্দ্রবালা, নরীসুন্দরী, অমৃতলাল প্রমুখ যোগ্য অভিনেতা-অভিনেত্রীবর্গকে। স্টার থিয়েটারের ইতিহাসে এটা ছিল স্বর্ণময় যুগ।

কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতে গিরিশচন্দ্র পুনরায় স্টার থিয়েটারের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করলেন। থিয়েটারের ব্যবসায়িক স্বার্থের কথা চিন্তা করে নাটকের পাশাপাশি যুক্ত হল বায়োস্কোপ দেখানোর ব্যবস্থা। নাটকার হিসেবে গিরিশচন্দ্রের স্থান পূরণ করতে তখন এলেন তখনো নাট্যজগতের দুই বিপক্ষ নাটকার দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। ১৯০৩ সালে ১৫ আগস্ট ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য' শুরু হল ; এরপরবর্তীকালে তাঁর 'নরমেধযজ্ঞ' ও 'নন্দকুমার' নাটক দুটিও স্টার থিয়েটারেই অভিনীত হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল লিখলেন 'রানা প্রতাপ' (১৯০৩ / ২২ জুলাই)।

১৯১২ সালে ৯ ফেব্রুয়ারি গিরিশচন্দ্র শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ; উল্লেখযোগ্য যে তিনি স্টার থিয়েটারে ১৯০৭ সালে শেষ নাটক মঞ্চস্থ করেন তাঁর সর্বাধিক পঠিত 'প্রফুল্ল' নাটকটি। বলা বাহুল্য গিরিশের মৃত্যুতে বাংলা রঙ্গমঞ্চের গৌরবময় অধ্যায় ইতিহাস হিসেবে চিহ্নিত হয়ে পড়ে।

১৯২০ সালে গিরিশের জন্মশতবর্ষে আপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্টার থিয়েটারের লেসি হিসেবে দায়িত্ব নিলে নতুন যুগের পালাবদল শুরু হল। ১৯২৩ সালের ৫০ ঘণ্টা অপরেশচন্দ্রের 'কর্ণার্জুন' মঞ্চস্থ করে ঘিনোদে রাত্রি অতিক্রান্ত করে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করল এবং স্টার থিয়েটারের হারানোগৌরব পুনরুদ্ধার হল। অপরেশচন্দ্রকে ঘিরে যুক্ত হলেন নিরুপমা চক্রবর্তী, অহীন্দ্র চৌধুরী, নরেশচন্দ্র মিত্র, ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়, নিরঞ্জন লাহিড়ী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বাংলা রঙ্গমঞ্চের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতৃবৃন্দ।

১৯২৫ সালে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 'চিরকুমার সভা' নাটক মঞ্চস্থ করার প্রস্তাবে স্টার থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত হলেন। এ নাটকে মঞ্চ সফল হলেও তাঁর পরবর্তী নাটকগুলি পুনরুদ্ধার, বিসর্জন, শেষরক্ষা, রবীন্দ্রনাথ সর্বাংশে সফলতা পায়নি। রবীন্দ্রনাটক ছাড়াও এ থিয়েটারে অন্যান্য দুটি বিশিষ্ট প্রযোজনা অপরেশচন্দ্রের 'মহাশক্তি' (অনুরূপা দেবীর উপন্যাস অবলম্বনে রচিত) এবং অপরাজিতা গোপীনাথ (শরৎ চন্দ্র)।

১৯৩৩ সালে অপরেশচন্দ্রের স্টার থিয়েটারের (স্টার থিয়েটারের নতুন নামকরণ) দায়িত্ব চলে যায় অন্যের হাতে। এর পরবর্তী সময়ে নির্মলেন্দুলাহিড়ি মিনার্ভা স্টার থিয়েটারে (নব নাট্যনির্দেশনা) অভিনয় করেন সাজাহান, বিজিয়া, ঝড় (শরৎচন্দ্র অবলম্বনে) নাটকগুলিতে। ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত তিনি যুক্ত ছিলেন স্টার থিয়েটারের সঙ্গে।

১৯৪৭ সালে নতুন লেসি হিসেবে দায়িত্ব নেন বিমল পাল। এক বছর বাদে ১৯৪৮ সালে ২৯ মার্চ স্টার থিয়েটারের শিল্প নেন সলিল মিত্র। তাঁর অধীনে প্রথমে ১৯৪৮ থেকে '৫৩ সাল পর্যন্ত মহেন্দ্র গুপ্ত এবং পরবর্তীকালে ১৯৫৩ থেকে '৭১ সাল পর্যন্ত দেবনারায়ণ গুপ্ত একাধিক স্বল্পস্থায়ী প্রযোজনা করেন এই মঞ্চে। ১৯৭১ সালে বঙ্গবিজয়ের অকেজোবিয়ার ফলে দায়িত্ব পেলে মারাত্মিক ব্যবসায়িক বৈকেয়ে ফলে থিয়েটারের পুরনো ঐতিহ্য ফিরে পেতে থাকে।

১৯৯১ সালের ১৫ অক্টোবর স্টার থিয়েটার চিরতরে অগ্নিকবলে ভস্মীভূত হয়। বর্তমানে বাংলার নাট্যপ্রেমী মানুষ পরীর আগ্রহভরে স্টার থিয়েটারের পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টা পরীর আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ করছে।

অমিয় মিত্র

নটগুরু গিরিশচন্দ্র ও স্টার থিয়েটার

প্রভাতকুমার দাস

বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে সাযোগ স্থাপনে, বিশেষত নটজীবনকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে প্রথমাবধি সংশয় প্রকাশ করতেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২)। হয়তো সম্পূর্ণ নিজের কর্তৃত্বাধীন একটি থিয়েটারের কল্পনা তিনি মনে-মনে লালন করতেন বলেই রঙ্গমঞ্চের সাফল্য সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব চিন্তাভাবনা কাজ করত। নাট্য-রচনায় নিজের যোগ্যতা প্রমাণিত হওয়ার পর, বিশৃঙ্খলার দরুন ব্যবসায়িক অবনতি থেকে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারকে উদ্ধার করার জন্য লিজ গ্রহণ করেছিলেন এবং থিয়েটারের নাম 'ন্যাশনাল' হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। নিজের অভিনয় ক্ষমতা প্রমাণ করার জন্য 'মেঘনাদবধ' নাটক নির্বাচন করে নিজে 'রাম' ও 'মেঘনাদ' চরিত্রে রূপদান করেন—এই অভিনয়ের মাধ্যমেই তিনি 'সাধারণী' পত্রিকায় (১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৯) নাট্য সমালোচনার দীর্ঘ স্তরে ইংলন্ডের প্রথিতযশা অভিনেতা ডেভিড গ্যারিকের সঙ্গে তুলনীয় হন। কিন্তু দিনের বেলায় অফিসের কাজ, রাত্রে থিয়েটারের বই লেখা, রিহার্সাল দেওয়া, অভিনয় করা ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য—মঞ্চের ব্যবসায়িক দিক তাঁর নিজের পক্ষে তত্ত্বাবধান করা সম্ভব ছিল না, অন্যের উপর নির্ভর করতে হত। এ বিষয়ে তাঁর অনুজ অতুলকৃষ্ণের রূঢ় পরামর্শ শিরোধার্য করে নিয়ে—জীবনে আর কখনও থিয়েটারের অধিকারী হতে চাননি, বেতনভুক ম্যানেজার বা মঞ্চাধ্যক্ষ, নটী ও নটিকরূপে কাজ করে গিয়েছেন।

থিয়েটার দেখার জন্য অনেক সুশিক্ষিত নাট্যানুরাগীরা নিয়মিত রঙ্গমঞ্চে এলেও, তাঁরা ব্যক্তিগত জীবনে অভিনেতাদের সংসর্গ এড়িয়ে চলতেন। অভিনেতাদের পানদোষ দুর্নাম এমনই বিস্তৃত ছিল যে, সম্পন্ন পরিবারের ভদ্রলোকেরা থিয়েটার দেখার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হতেন। প্রতাপচাঁদ জহুরির সময় থেকে থিয়েটারের নানারকম পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়, প্রকৃতপক্ষে তিনি থিয়েটারকে ব্যবসা হিসেবে গ্রহণ করে, সব দিকে সচেতন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায়, ইতিপূর্বে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের বাণিজ্যিক ব্যর্থতা এমনই চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছেছিল যে থিয়েটারে দর্শক সংখ্যা বাড়ানোর জন্য 'অঙ্গুরীয়, ইয়ারিং, আয়না, রুমাল, সাবান, এসেন্স প্রভৃতি উপহার দেওয়ার প্রথা সর্বপ্রথম চালু হয় এবং গ্যালারি ও পিটের দর্শক সংখ্যা এতে বর্ধিত হয়, কিন্তু এই উপহার-প্রবর্তক যোগেন্দ্রনাথ মিত্র (ওরফে লক্ষা মিত্র) চরম হাস্যকর অবস্থার সৃষ্টি করেন 'তরমুজ, ফুটী, লাউ, কুমড়া প্রভৃতি ফল মূলাদি প্রদানে।' এই অবস্থায় থিয়েটার অবশ্য বন্ধও হয়ে যায়—এই অবস্থায় প্রতাপচাঁদ, ন্যাশনাল থিয়েটার কিনেছিলেন। পাকা জহুরত ব্যবসায়ী বুঝেছিলেন উপযুক্ত অভিনেতৃগণ কর্তৃক ভালো নাটক অভিনীত হলে থিয়েটারে যথেষ্ট অর্থাগম হয়—এর জন্য অবশ্য সুযোগ্য

পরিচালকের প্রয়োজন। থিয়েটারকে একটি লাভজনক ব্যবসার পরিণত করার জন্য তিনি রঙ্গালয়সমূহের শ্রেষ্ঠ অভি ও নাটককার গিরিশচন্দ্রকে, যেকোনোভাবে প্রলোভিত করার সর্বাত্মক প্রয়াস করেন। সাধারণ কোম্পানির মেরুদণ্ড টাকা বেতনের বৃত্ত কিশোর গিরিশচন্দ্র প্রথমে রাজি হননি, অভিনেতার কাজ করার থেকে ইতিপূর্বে যেমন থিয়েটারে এসে শিক্ষানবিশ ও ভাবশাকরণের অভিনয় প্রশিক্ষণের ট্রেনিং করবেন, এর জন্য মাসিক ভাতা থেকে কখনও অর্থ গ্রহণ করেননি, প্রস্তাবকদের কাছ থেকেও তিনি নিতে চান না। প্রস্তাব বুদ্ধিয়ে দিলেন একজনের পক্ষে দু হাতে আজ ভালো ভাবে করা সম্ভব নয়, অভিনয়ের ভার ছেড়ে দিয়ে থিয়েটারের কাজে সম্পূর্ণ নিযুক্ত হতে হবে। এজন্য মাসিক একশত টাকা বেতনের প্রস্তাবের জবাবে প্রতিভাটি সেন থিয়েটারের বেতনের মূলাধার বাড়াবে, তাঁর বেতনও সেইভাবে বাড়তে থাকবে। শেষ পর্যন্ত থিয়েটারের কাজে প্রবল বেতনভোগী হতে সম্মতি দিয়েছিলেন এইভাবে, একজন একজন শাক্ত ব্যবসায়ের অনুকূলে মনোনীত অভিনেতা-অভিনেত্রী গ্রহণ থিয়েটারের একটা সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা গিরিশ এনে তাদের নাটক অভিনয়ে নাট্যশালার ঐতিহ্যরক্ষা সাধন করতে পারবেন। তার চেয়েও বড় কথা, থিয়েটারটি সুপ্রতিষ্ঠিত হলে ভবিষ্যতে নাট্যাভিনয়কে অন্যের জীবিকা হিসেবেও গ্রহণ করতে উৎসাহিত হবেন।

অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়

প্রস্তাবপত্রের অকল্পনাবুদ্ধির জোরে নাগলাল থিয়েটার সুশৃঙ্খল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। গিরিশচন্দ্রের অবর্তমানে থিয়েটার ব্যবস্থার সামনে নতুন সম্ভাবনা খুলে গিয়েছিল। অভিনেতা হিসেবে তাঁর যে খ্যাতি, তা কলকাতায় নাট্যশালার প্রয়োজনে ও ব্যবসায়ের গুণে নাট্যোদ্যম ও নাটককার হিসেবেও তাঁকে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। ফলতঃ নাট্যশালার বহুমুখ গিরিশচন্দ্র দুইয় বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের জীবনে নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন, সে বিষয়ে অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "তাহার সময় হইতেই লোকে বুঝিল, কেবলমাত্র অভিনয় প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণেই নাট্যশালার সর্বাঙ্গীণ শ্রীবৃদ্ধি করা যায় না। নাট্যশালার পুরার প্রধান উপকরণ—ইহার প্রাণ—ইহার আত্ম—নাটক। গিরিশচন্দ্র এ দেশের নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন মনে—তিনি যত দিয়া ইহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, রক্তের জন্মাক্ষর আহার দিয়া ইহাকে পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন, ইহার জন্মাবধি জন্মাবধি হস্ত সঞ্চার করিয়া ইহাকে জনসমক্ষে করিয়া তুলিয়াছিলেন আর এইজন্যই গিরিশচন্দ্র Father of the Native Stage ইহার কৃতা, আর কেহ হোননি ছিল না। ইহা একপ্রকার অভিজ্ঞতার শূন্য থেকেরাশি অবস্থায় টলিয়েছিল, পড়িতে ছিল, ধূলায় গড়াইতে ছিল। যে অমৃতপানে আজলার নাট্যশালা এই পঞ্চাশ বৎসরেরকে বাঁচিয়া আছে, প্রকৃতপক্ষে সে অমৃতের ভাণ্ড বহন করিয়া আনিয়াছিল গিরিশচন্দ্র। বহুবছর বাঙ্গালা নাট্যশালার শিল্পকের গৌরবের অধিকারী একা গিরিশচন্দ্র।

গিরিশচন্দ্রের অধ্যক্ষতায় শুধু নাগলালের শুধু অভিনেতার বৃদ্ধি পায়নি ব্যবসায়িক সাফল্যও প্রচুর বৃদ্ধি পেয়ে থাকে এবং আজীবনকাল অন্যান্য অভিনেতাদের প্রলোভনও তার বাড়তে থাকে—লাভের অঙ্কের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নাট্য সম্প্রদায়ের অধিকারীবর্গের বেতন বৃদ্ধির পরামর্শ দিয়েছিলেন গিরিশচন্দ্র, প্রস্তাবপত্র অবশ্য তাতে অবশ্য মেনে চলেই প্রস্তাবের এই অর্থনৈতিক অনুশাসন নীতি গিরিশচন্দ্রকে খুব হতাশ করেছিল। তিনি ভেবেছিলেন অর্থপত্রের সঙ্গে থিয়েটারের সাহিত্যিক উন্নতির নিত্যে মানিক বজায় থাকবে, কিন্তু পরিচালক নানা ক্ষেত্রেই তার সংকীর্ণতার পরিচয় পাওয়া গেল। সামান্য বেতনের তারতম্য নিয়ে অভিনেতাদের বিদ্রোহ ঘোষণা হল প্রথম, সে ঘটনা আরও ঈশ্বরের কানাঘুষা পৌঁছায় তখন অভিনেতাদের জন্য বিনোদিনী বাদ দেওয়া, তাঁর অনুপস্থিতির দিনগুলিতে এক মাসের বেতন কেটে নেওয়া হয়। এরপর ঈশ্বর পক্ষের মনোনয়নের প্রকাশ হয়ে উঠলে সময় ও সুযোগ মতো এমনকি গিরিশচন্দ্র তাঁর অনুপস্থিতির দিন নাগলাল থিয়েটারের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর যাঁরা থেকে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে অমৃতলাল মিত্র, অঘোরনাথ পাঠক, নীলমাধব চক্রবর্তী, উপেন্দ্রনাথ মিত্র, কাশীনাথ, ক্ষেত্রমণি, বিনোদিনী প্রমুখ অন্যতম।

প্রস্তাব গিরিশ থিয়েটার দেখতে আসতেন যেমন প্রয়োজনে, তেমনি মাঝে মধ্যে রাত সুখদায়ি নামে এক বিত্তবান ভক্ত থিয়েটার ব্যবসায়ের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছিলেন, প্রলোভন বিনোদিনীকে পাওয়ার আশায়। ফোরমিলার কোম্পানির বেনিফিট নাইট নাম মুসলিমের পুত্র গুপ্তধন, বিনোদিনীকে পেতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে একটি মস্ত নিয়োগ সম্পন্ন করেছে, একথা জানতে পেরে গিরিশচন্দ্র শেষ পর্যন্ত বিনোদিনীকে রাজি করান। গুপ্তধন অবশ্য থিয়েটার করতে এসেছিলেন কোনও অর্থলোভে টাকা দিয়ে নিজের ব্যবসায় প্রয়োজনে নয়, তাঁর কাছে একমাত্র আকর্ষণ ছিল

বিনোদিনীকে সম্পূর্ণ নিজের করে পাওয়া। যেজন্য তিনি বিনোদিনীকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে চেয়েছিলেন থিয়েটারের পোশাকপত্রে না ফেরে দিয়ে। কিন্তু বিনোদিনী থিয়েটার ভালোবাসতেন বলে, দুদিনের ব্যবসায়ী হয়েও অর্থ লাভ নিজের প্রয়োজন তখনই তাঁর শেষ করতে পেরেছিলেন। বিনোদিনী তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন : 'তখন অমৃত মিত্র ওনিলেন, গুরুষ রায় থিয়েটার না করিয়া পঞ্চাশ হাজার টাকা অনায়াসে দিতে পারে, তখন তাঁহাদের নিকটে মাথা বিকাইল না। অন্তরে আমি যে অর্থ প্রার্থনা না করি, ইহার জন্য তাঁহার ত্রুটি হইল না; কিন্তু এ সময় তেমন তখন নিষ্ঠুরাকর্ষণ। আমি স্থির করিয়াছি থিয়েটার করিব। থিয়েটার যার প্রস্তুত না করিয়া দিলে আমি কোনও মতে তাঁহার বাধ্য হইব না। তখন আমারই উপরে বিডন স্ট্রিটে জমি লিজ লওয়া হইল এবং থিয়েটার প্রস্তুতের জন্য গুরুষ রায় অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন। ঠিক বিডন স্ট্রিটের মনস্তাপি চক্রবর্তী মহাশয়ের বাড়ী ভাঙ্গা লইয়া বিরাজমান আরম্ভ হইল, তখন একে একে নূতন পুরাতন একটার একটুকু আসিয়া যোগ দিতে লাগিলেন।'

বিডন স্ট্রিট রাস্তার উপর দিয়ে, বাগবাজারের কীর্তিচন্দ্র মিত্রের ৬৮ বিডন স্ট্রিটের খালি জমি লিজ নিয়ে নতুন রঙ্গমঞ্চ নির্মাণের কাজ শুরু হল। ন্যাশনাল থিয়েটার ছিল আটচালা ধরনের, এই প্রথম ইটের তৈরি পাকা বাড়িতে নতুন একটি বড় রঙ্গমঞ্চ নির্মাণের আয়োজন হল। বিনোদিনী লিখেছেন : 'আমি ঈশ্বরের ও অন্যদের সহিত কার্য চলিতে লাগিল। এই সময় আমরা খোলা ২/৩টার সময় বিদ্যাসাগরের নিয়া সেখানকার কার্য শেষ করিয়া থিয়েটারে আসিতাম; এবং অন্যান্য সকলে চলিয়া যাইলে আমি নিজে কুড়ি করিয়া মাটী বহিয়া দিই, যাবৎ লিটের স্থান পূর্ণ করিতাম, তখন তখন মজুরদের উৎসাহের জন্য প্রত্যেক কুড়ি দিয়ু ২টি কথা বলিয়া কার্য করিয়া নিতাম। পাঁচ পাঁচ প্রস্তাবের জন্য, হার

বিনোদিনী দাসী

শতের কার্য হইত। সকলে চলিয়া যাইলেন, আমি গুরুষবাবু আর ২/১ জন রাত জাগিয়া কার্য করাইয়া লইতাম। আমার সেই সময়ের আনন্দ কেবা কে? অতি উৎসাহে অনেক পরিশ্রম করে থিয়েটার প্রস্তুত হইল। যেদিন এর বংসরের ভিতর হইয়া থাকিবে।'

ন্যাশনাল থিয়েটারে ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের ৩ ফেব্রুয়ারি 'আনন্দ রহো' অভিনয়ের পর প্রতাপ জহুরীর সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের অনুপস্থিতীর সম্পর্ক ছিন্ন হয়। পরবর্তী পাঁচ বছরের মধ্যে তাঁদের নতুন রঙ্গমঞ্চ নির্মাণের তাজ সম্পন্ন হয়। ইতিমধ্যে বিনোদিনীকে এক মর্মান্তিক দুঃখজনক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হল, তিনি লিখেছেন : 'থিয়েটার যখন প্রস্তুত হয় তখন সকলে আমায় বলিলেন যে "এই যে থিয়েটার হইবে, ইহা তোমার নামের সহিত যোগ থাকিবে। তাহা হইলে তোমার বৃত্তান্ত পরও তোমার নামটি বজায় রহিবে। অর্থাৎ এই থিয়েটারের নাম "বি" থিয়েটার হইবে। এই কথাতে আমারও উৎসাহিত হইয়াছিলাম। কিন্তু কার্যকালে উহারা সে কথা রহেন নাই কেন—তাহা জানি না। যে পর্যন্ত থিয়েটার প্রস্তুত হইয়া খোলা না হইয়াছিল, সে পর্যন্ত আমি জানিতাম যে আমারই নামে "বাহ" হইবে। কিন্তু যেদিন উহারা রেজিস্ট্রি করিয়া আসিলেন—তখন সব হইয়া গিয়াছে, থিয়েটার খুলিবার সময়ও হইতে বাকী; আমি তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলাম যে থিয়েটারের নূতন নাম কি হইল? অমৃতবাবু প্রফুল্লভাবে বলিলেন যে "স্টার"। এই কথা শুনিয়া আমি হৃদয় মধ্যে অতিশয় আঘাত পাইয়া বলিয়া ফেলিলাম যে দুই মিনিট কাল কথা কহিতে পারিলাম না। কিন্তু পরে আত্মসংবরণ করিয়া বলিলাম "বেশ"। বিনোদিনী হয়তো ভাবলেশমি যে তাঁকে 'ছলনা করা' তাঁর সঙ্গে এমনভাবে 'অসৎ ব্যবহার' করিবেন। বলা বাহুল্য, এরকম ব্যবহার মনে রেখেও একমাত্র সান্ত্বনা তিনি নিজেই মনে-মনে খুঁজে নিয়েছিলেন, যেমন থিয়েটার তাঁর বড়ো প্রিয়, থিয়েটারকে কেন্দ্রই তাঁপনার মনে করবেন, 'আর একটি নতুন থিয়েটার তো হইল'—এই আনন্দের মধ্যে তিনি নিজের ছিন্নেক্ষা, অবহেলা ও প্রতারণাকে ভুলতে পেরেছিলেন। বিনোদিনী স্বীকার করেছেন 'মাননীয় গিরিশবাবুর মেহাশিষে আমার অভিনয় একটু বেশী প্রস্ফুট করিত।'—এ ঘটনা অস্বীকার করার উপায় নেই, যে গিরিশচন্দ্র-র অনুরোধে তিনি গুরুষের সঙ্গে থাকবার প্রতিজ্ঞাকে নিয়ে বাধা হয়েছিলেন পূর্ববর্তী প্রাক্তাশ্চাপের কথা ভুলে, যেজন্য মনে-মনে তিনি আত্মধিক্কারও ছোপ করেছেন—সেই থিয়েটারের স্বার্থই তখন তাঁর ধ্যান ও জ্ঞান হয়েছিল তাঁর নটগুরুর প্রেরণায়। গিরিশচন্দ্র তা সত্ত্বেও এরকম আচরণ করলেন কেন বুঝিতে?—সেটি এই জন্যে যে একজন ব্যবসায়ীর নামে থিয়েটার হলে প্রকল্পনীল অভিনেতৃকর্মের প্রসারোগ তৈরি হবে হলে? নাকি, থিয়েটারের অর্থনৈতিক রাজনীতি সম্বন্ধে বিনোদিনীর অভিনেত্রী প্রতিভার যথার্থ বিকাশ ঘটানোর সম্ভব হবে না। গিরিশচন্দ্র যে আজীবন তাঁর প্রাচারের কাজে প্রণত প্রতিশ্রুতি পালন করে গেলেন তিন

দানীবাবু

[illegible]

থিয়েটারের কর্তাধিকারী হতে চাননি—তার প্রধান কারণ হয়তো বিনোদিনীর এই বক্তব্যের কথা মনে মনে ভুলতে পারেননি তিনি কোনোদিন।

নামকরণ নিয়ে যখন নানা বিতর্ক ও টানাপোড়েন চলছে—তখন সমিতির ভাবে সিদ্ধান্ত নেন, ন্যাশনাল ভাঙ্গন করার পর তাঁরা যে কিছুদিন 'ন্যাশনাল স্টার কোম্পানি' নামে একটি নাট্যসম্প্রদায় গঠন করে বেলল থিয়েটারে কয়েকটি অভিনয় করেছিলেন, এখন সেই দলের মধ্য শব্দ 'স্টার' গ্রহণ করে নতুন থিয়েটারের নাম রেজিস্ট্রিকৃত হয়। স্বত্বাধিকারী : গুরুদাস রায়, ম্যানেজার : গিরিশচন্দ্র ঘোষ, সংগীত-শিক্ষক : ক্ষেত্রমোহন অধিকারী, ম্যানেজার : অমৃতলাল বসু, সহকারী ম্যানেজার : নাগেন্দ্রনাথ নিয়োগী ; কোষাধ্যক্ষ : হরিপ্রসাদ বসু। বাগবাজারের ঠিকাদার ভোলের উপর হরিপ্রসাদের একটি অভিযোগ ছিল, হিসাবপত্রে বিশেষ গরমিল, গিরিশচন্দ্রের পরামর্শেই গুরুদাস তাঁকে থিয়েটার নির্মাণকার্যে হিসাবরক্ষক পদে নিযুক্ত করেছিলেন। বিনোদিনী লিখেছেন : 'গিরিশবাবু মহাশয় নূতন থিয়েটারের উন্নতি করিবার জন্য শিক্ষা-কার্যে অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন বলিয়া নিজে সকল কাজ দেখিতে পারিতেন না। সেজন্য সুযোগ্য লোক দেখিয়া তাঁহাদের উপর এক এক বিভাগের ভার দিয়া রাখিয়াছিলেন।'

স্টার থিয়েটারের উদ্বোধনের জন্য 'দক্ষযজ্ঞ' নামে একটি পৌরাণিক নাটক লিখেছিলেন দিগিন্দ্রচন্দ্র, শিক্ষাদান শেষ হলে সেই নাটকের গ্রেম রিহার্সাল আয়োজিত হয় কার্নিসটোলা অভিনয় নাট্যমঞ্চে। প্রথম নিয়মিত বিজ্ঞাপন দিয়ে ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের ২১ জুলাই শনিবার (বঙ্গাব্দ, ১২৯০, ৬ শ্রাবণ) 'দক্ষযজ্ঞ' অভিনয়ের মাধ্যমে নতুন নাট্যগৃহের দ্বারোদ্ঘাটন হয়। 'ইন্ডিয়ান মেলি লিমিটেড' পত্রিকায় এই উদ্বোধন রজনীর বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় নিম্নরূপ

Grand Opening Night.
STAR THEATRE
BEADON STREET
PROPRIETOR : NAIKOI
GHORAKUR ROY
Saturday. 21st July At 9 P M
Babus G. C. Ghose's new Drama
DAKSGYAYAINA
Everything Grand & Wonderful
G. C. Ghosh.
Manager

প্রথম অভিনয় রজনীর প্রধান চরিত্রাভিনয়ে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁরা হলেন : দক্ষ—গিরিশচন্দ্র ঘোষ ; মহাদেব—অমৃতলাল মিত্র ; ব্রহ্মা—অমৃতলাল বসু ; ব্রহ্মা—নীলমাধব চক্রবর্তী ; বিষ্ণু—উপেন্দ্রনাথ মিত্র ; নারদ—যদুনন্দন ভট্টাচার্য্য ; নন্দী—অঘোরনাথ পাঠক, ভৃঙ্গী—প্রমোদচন্দ্র ঘোষ ; মন্ত্রী—গিরীন্দ্রনাথ ভদ্র ; সূত্রধর—প্রমোদচন্দ্র ঘোষ, মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী, অবিনাশচন্দ্র দাস (ছাত্রী) ও পরাণকৃষ্ণ শীল ; প্রসূতি—ক্ষেত্রমণি ; দুগ্ধপত্নী—গোলাপী ; ধাত্রী—মানুকালী ; তপস্বিনী ক্ষেত্রমণি, সতী—প্রীমতী বিনোদিনী প্রভৃতি। এছাড়াও যুক্ত ছিলেন কালীনাথ ভট্টাচার্য্যমহাশয়, শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, (বড়বাবু) শ্যামাচরণ কুণ্ডু, হেমেন্দ্রনাথ ঘোষাল, নিরঞ্জন ভট্টাচার্য, অমৃতলাল বসাক, রামচরণ সাহাল, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বকবাবু), তুষার কুমারী, প্রমদাসুন্দরী, বিজলবালা। প্রথম অভিনয় রজনীতে অবশ্য সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হতে পারেননি, সেজন্য 'হেরল্ডস্কোপ' (২৪-৭-১৮৮৩) পত্রিকা লিখেছিলেন : 'The performance of the play, Daksha Yajna, was eminently satisfatory, especially so as the actors and actress had not had time enough for a full rehearsal.'

ছ'দিনে নামকরণ নিয়ে যে আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল তা কিন্তু দিন, ছয়েছে, বিনোদিনী লিখেছেন 'অবশেষে জানিতে যে এই থিয়েটারটী আমাদের নিজের। আমরা ইহাকে যেমন করিয়াছি তেমনই গড়িয়া ইহার সৌন্দর্য আরও অধিক করিব। সেই কারণে সকলে জানাইল, উদ্বোধনে একজনে অভিনয়ের গৌরববৃদ্ধির জন্য যত্ন করিবেন।' উদ্বোধন দিনের অভিজ্ঞতা জানিয়ে তিনি আরও লিখেছেন : 'প্রথম দিনের সে লোকারণ্য, সেই করতালি দেওয়া লোক সব ঝুলিয়া ঝুলিয়া যেন কারা দেখিয়া আমাদের বুকের ভিতর দুর্ দুর্ করিয়া কম্পন বর্তমান। আমাদেরই সব

'দক্ষযজ্ঞ' আসরে। কিন্তু যখন অভিনয় আরম্ভ হইল, তখন দেখা গেল যে, সেই অভাবনীয় ঘটনা সত্যই সংঘটিত হইয়াছে। বঙ্গের প্রাচীন সাহিত্যিকদের সেই গুরুগম্ভীর ভাবপূর্ণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মূর্তি যখন স্টেজে উপস্থিত হইল তখন সত্যসত্যই চমক লাগিল। তাহার পর অভিনয় উৎকৃষ্ট, সে কথা লিখিয়া বলা যায় না। গিরিশবাবু 'দক্ষ', অমৃত মিত্রের 'মহাদেব' যে একবার দেখিয়াছে, সে জীবনেও তাহা ভুলিতে পারিবে না।'

'দক্ষযজ্ঞ' নাটকে, মজাদার অমৃতলাল বসু আসরে উপস্থিত হলে তাকে ঘেরে নব প্রহসনোপযোগী হাস্যরসাত্মক ও বিদ্রূপাত্মক সংলাপ রচনা করেছিলেন। কিন্তু অভিনয়কালে এরা ছাড়াও পরিচালক 'দক্ষযজ্ঞ' অতিরিক্ত দর্শক মহলে সমাদৃত হয়েছিল, অভিনেতা গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন 'ছাড়ার ঘরে দক্ষ পঞ্চাশটি—তাহা সৃষ্টি অভিনয় পড়ি লাভ করিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্রের অসাধারণ অভিনয়ে—তাঁহার অদ্ভুত ভাবভঙ্গিতে—যথার্থই যেন তাঁহাকে সৃষ্টিকর্তা (Creator) বলিয়া বোধ হইত। যে-যে দৃশ্যে তিনি রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইতেন, কর্ণকাল নিস্তব্ধের ন্যায় তাহার পার্শ্বদিকে এবং রঙ্গের ন্যায় কাহিনি দেখিয়া—যেন স্পন্দহীন হইয়া অবস্থান করিতেন।'

চলতি বছরের মধ্যে আরও দুখানি নতুন নাটক মঞ্চস্থ হয় স্টারে। পরপর তিন সপ্তাহের ব্যবধানে অভিনীত হয় গিরিশচন্দ্রের 'রুদ্র চরিত্র' (১১ জানুয়ারি ১৮৮৩), সে নাটকে তিনি স্বয়ং অবতীর্ণ না হলেও, উপেন্দ্রনাথ-অমৃতলাল, মিত্র, বিনোদ-অমৃতলাল বসু, মহেন্দ্র-উপেন্দ্রনাথ মিত্র, রুদ্র—প্রীলালাল চক্রবর্তী, নারদ—অঘোরনাথ পাঠক, ভৃগু—ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়, সুনীতি—এলোকেশী এবং সুরুচির ভূমিকায় বিনোদিনী অভিনয় করলেন। এই নাটকেই প্রথম শিবের চরিত্র সৃষ্টি করে, নাটককার চরিত্র সৃজনে অভিনবত্ব প্রয়োগ করেছিলেন। এরপর স্টার থিয়েটারে পরপর কয়েকটি পুরাণের নাটক অভিনীত হয়, সেগুলি 'রামের বনবাস' (২১-৮-১৮৮৩), 'সীতার বনবাস' (২৯-৯-১৮৮৩) এবং 'ধ্রুবের উপর অত্যাচার' (২৪-১০-১৮৮৩)—প্রথম দুটি গিরিশচন্দ্রের লেখা ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত, শেষোক্তটির রচয়িতা অমৃতলাল বসু, নাটকটি স্টেজ ন্যাশনালে প্রথম অভিনীত হয়। স্টার-এর তৃতীয় নতুন নাটক 'নল দময়ন্তী', গিরিশচন্দ্রেরই রচনা, যদিও এ নাটকের তিনি রঙ্গে উপস্থিত হননি, নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১৪ ডিসেম্বর ১৮৮৩। নাটকের নামভূমিকায় অভিনয় করেন অমৃতলাল মিত্র ও বিনোদিনী, বিদূষক অমৃতলাল বসু, ভেলিদের অধিকারীর ভূত এবং কর্কোটক হট্টোপাধ্যায়ের দুয়া শিকার নাটকটি বেশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। এই নলদময়ন্তী নাটক থেকেই কালীনাথ পূর্ণ প্রেমিক নূতন ধরনে বলে নতুন ধরনের প্রবর্তনার সূচনা করেন। মঞ্চাধ্যক্ষ অমৃতলাল বসু রঙ্গমঞ্চে প্রয়োগ নৈপুণ্যে নূতনত্ব প্রদর্শন করেছিলেন, অভিনয়কালে লিখেছেন নৈসর্গিক শিল্প-প্রকটনে দৃশ্যসজ্জার সৌন্দর্য বৃদ্ধির অভিপ্রায় গিরিশচন্দ্র নলদময়ন্তী নাটকে কমল-কোরক প্রস্ফুটনের ইহা অপরূপ অভিব্যক্তি, বস্ত্র লইয়া সহসে পক্ষীর আকাশে উত্থান ইত্যাদি কয়েকটি দৃশ্য সংযোজন করিয়াছিলেন।' পরপর কয়েকটি নাটকের অভিনয়ে যখন স্টারের সুনাম ক্রমবর্ধমান তখন, ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে রঙ্গ ব্যবসায় প্রতি অনেকটা উদাস হইয়ে পেলেন গুরুদাস এবং এর সঙ্গে 'আমাদের শ্যামের কঠোরতায়' শেষ পর্যন্ত থিয়েটারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠেন। বিপদের গিরিশচন্দ্র, তাঁর স্কন্ধের নেতৃত্ব দিয়ে গুরুদাসের অভাব নিজেদের সামলেনের কথা বললে, তিনি একবারে হাজার টাকার বিনিময়ে থিয়েটারের স্বত্ব ছেড়ে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অর্থ সংগ্রহে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে অমৃতলাল মিত্র, প্রতিপ্রদান বসু, বাসুদেব নিয়োগী করেক মাস টাকা আদায় করলেন, গিরিশচন্দ্র তাঁর 'অর্পিত স্বত্ব' অমৃতলাল বসুকেও আদায় নিয়ে—এই চারজনের নামে স্বত্ব রেজিস্ট্রি করলেন। কর্তী টাকা তাঁকে ফেরতদানের লিখনীর সুপ্রসিদ্ধ গিরিশ পাঁচ-ছ মাস বৃন্দাবনের কাছে ঋণ হিসেবে নিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য, গুরুদাস বিশ্বাস থেকে বলেছিলেন, এই থিয়েটার তাহার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, আমি তাহারই ইহার স্বত্ব দিব, অন্যত ইহার অর্থের স্বত্ব তাহার থাকিবে, নতুবা তিনি হস্তান্তর করতে সম্মত নয় বলে জানালেন। গিরিশচন্দ্র এমতাবস্থায় এই সমস্যার সমাধান করলেন বিনোদিনীর নামে বুঝিয়ে, তিনি বুঝি দিয়েছিলেন বিনোদের ও-সব ঝঞ্ঝাটে যোগাযোগ কোনোদিন থাকবে না, যোগাযোগ টাকার অত ঝঞ্ঝাটি বহিয়ে পারিবে না। আমরা আমাদের ব্যাপারটা আমাদের কাছেতেই থাকে ভাল। যোগাযোগ মেয়েকে মেলিয়া গেলে আমি কখন আমার কার্য করিব না, আর থিয়েটার করিতে হইলে বিনোদ যে একজন অতি প্রয়োজনীয়, কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। আমরা আর বলিব বোঝা বহিবার প্রয়োজন নাই।' শেষ পর্যন্ত অবশ্য বিনোদিনীর ও গিরিশচন্দ্রের প্রতি অশেষ ভক্তিবশত, এই যুক্তি মেনে নিয়েছিলেন। গিরিশচন্দ্র ভেবেছিলেন থিয়েটারের কর্মকর্তাকে স্থায়ী মুখার্জি আর্জন করতে হলে, নিজেদের সংগঠনকে সুদৃঢ়ভুক্ত করতে হলে, উপযুক্ত ব্যক্তিকে নেতৃত্বের জন্য শিক্ষা দিতে হবে। বহিরের কোনো ব্যক্তিদের সঙ্গে অভিনেতা-অভিনেত্রীর সুখ-দুঃখ, সুযোগ-সুবিধা বিষয়ে আন্তরিক সহযোগিতা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। গিরিশচন্দ্র অবশ্য এবারেও তাঁর নিজের মানসিক দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করেননি, তিনি যেমন অসুস্থতা, নাটক রচনা, শিক্ষাদান ও প্রয়োজনে অভিনয় করতেন—সেই পুরোনো ব্যবস্থাতেই বহাল রইলেন। বিনোদিনী অবশ্য স্বীকার করেছেন : এই থিয়েটারের জন্যই সুরেন্দ্রনাথের হইতে

অমৃতলাল বসু

লাগিল, গিরিশবাবু মহাশয় তাহাই অল্প আমার নানাবিধ সংশিক্ষা দিয়া কার্যক্ষম করিবার জন্য করিতে লাগিলেন।

সে সময় গড়ের মাঠে 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল এক্সিবিসন' উপলক্ষে সমস্ত ভারতবর্ষের নৃপতিগণ, দেশীয় রাজারাজড়া ও জমিদারগণ সমাগত হয়েছিলেন। দেশ-বিদেশের এই বিপুল জনসমাগমে শহর সরগরম দেখে 'স্টার' থিয়েটারও তাঁদের প্রতিদিন 'অন্নদামঙ্গল' অভিনয়ের আয়োজন করে বাণিজ্যিক দিক থেকে প্রচুর সাফল্য অর্জন করেন। অমিলাশঙ্কর পত্রোপাধ্যায় লিখেছেন : 'ফলতঃ এই এক্সিবিসন হইতে রঙ্গালয়ের ভাগ্য-পরিবর্তনের বিশেষরূপ সূচিত হইয়াছিল। থিয়েটারে একটিমাত্র প্রবেশ দ্বার থাকিত, এই সময়ে একদিন থিয়েটারে অনেক রাজা আসিয়া উপস্থিত। কর্তৃপক্ষগণ কি করিবেন—রঙ্গালয় সংস্কারে সাধারণ দ্বারগুলিতেই তাঁহাদের বসাইয়া দিলেন। রাজেন দ্বারের পূর্ণ মূল্য দিয়া সাধারণ দ্বারে বসিয়াই তাঁহারা অনেকের সহিত অভিনয় দেখিয়া গেলেন।'

নতুন বৌবাজার স্ট্রিটের 'স্টার' থিয়েটারের প্রতিষ্ঠিত হয় গিরিশচন্দ্র রচিত 'কমলে কামিনী' (২৯-৩-১৮৮৪)। এরপর পাঁচ মাসের ব্যবধানে তাঁরা পরপর প্রযোজনা করেন 'বৃষকেতু', 'হীরার ফুল', ও 'হরিষে বাদুয়ে'—এই তিনটি নাটকের প্রথম দুটির রচয়িতা গিরিশচন্দ্র, তৃতীয়টি লিখেছিলেন অমৃতলাল বসু, ছে এন মঞ্চের 'বক এণ্ড বঙ্কা' অবলম্বনে—এই তিনটি নাটক একই রাত্রে অভিনীত হয়। গিরিশচন্দ্রের প্রথম নাটকটি অবশ্য দুই অঙ্কের, আর দ্বিতীয়টি একটি 'অঙ্কয়া পিঠি হাস্য'। 'বৃষকেতু' নাটকে রঙ্গমঞ্চের উপর 'বৃষকেতু'র শিরশ্ছেদ দেখে দর্শকরা শিহরিত ও ভয়কিত বোধ করতেন। দুটিকি গান এ দুটিকি সুরের উপর গীত 'হীরার ফুল'-এর গানগুলি দর্শকরা আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। তৃতীয় (বহুবিহারী মুখোপাধ্যায়) ও রত্নি (ক্ষুদিরাম) মুখ্যভূমিকায় অভিনয় উপভোগ্য হয়েছিল। এই দুটি নাটকে গিরিশচন্দ্র না অবতীর্ণ হলেও বিনোদিনী অভিনয় করেছিলেন। পরবর্তী নাটক 'হীরার-চিহ্ন' (১৬-১৮৮৪) অবশ্য 'অন্নদামঙ্গল' প্রযোজনার কাছে খুব কিছু নূতনত্ব প্রদর্শন করতে পারেনি। কিন্তু এই পর্বে সব দিক থেকে উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা 'চৈতন্যলীলা' (২-৮-১৮৮৪)—শুধু গিরিশচন্দ্র নাটককার জীবনে নয়, বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে ভক্তিমূলক নাটক হিসেবে দর্শকালের ভেদই সৃষ্টিতে হিসেবে দর্শক সমাজে নন্দিত হয়। অমৃতলাল বসু লিখেছেন 'নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে সংকীর্তন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল, গীতে ও চৈতন্য চরিত্রের বিবিধ সংস্করণে দেশ ছাইয়া পড়িল। বিলাত-প্রত্যাগত বাঙালী সন্তানও লজ্জিত না হইয়া সগর্বে আপনাকে হিন্দু হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ভ করিল।' অমিলাশঙ্কর যথার্থই বলেছেন 'শুভক্ষণে গিরিশচন্দ্র এই নাটক লিখিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী নব্য বঙ্গ ও মুক্তিতে মস্তক বিলুণ্ঠনকারী বিজ্ঞবরকে একাসনে বসাইয়া বাঁধাইয়া দিলেন। নাট্যোদিবসে এই সময় বঙ্গবাসী জনমণ্ডলীর চক্ষে দেখিয়া অযথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করেন।' জ্ঞানেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী অভিনীত জনমানসে 'চৈতন্যলীলার' প্রভাব বিষয়ে অত্যন্ত মূল্যবান আখ্যা দিয়েছেন এই সময়ে চারিদিক হইতেই ধর্মের আলোচনা চলিতেছিল। ব্রাহ্মসমাজ তর্কযুক্তিপূর্ণ, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, থিওজফিক্যাল সোসাইটি, বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন তত্ত্ব, ব্রাহ্ম সমাজ (আদি ও নববিধান) ভিন্ন ভিন্নভাবে ধর্মের ব্যাখ্যা করিতেছিল—অথচ নিরীশ্বরবাদ ও নাস্তিকতাবাদও শিক্ষিত মন বিভ্রান্ত করিতেছিল। এই সময় থিয়েটারের চৈতন্যলীলা দেখিয়া এক নব ভাবের বন্যা প্রবাহিত হইল। অভিনয়

দেখিয়ে অনে অনে লোক ছুটিয়া আসিল। নগরে, প্রান্তরে, হাটে, মাঠে, ঘাটে, 'যাত্রিদের' রব, প্রতিবেশিনী হইল রব। রামকৃষ্ণ দেখিয়ে অবশিষ্ট কথকতা সমাধিস্থ হইলেন। বলিতে লাগিলেন আহা! আসল নকল এক দেখলাম।'

১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৮৪, অনুবাদ গ্রন্থিকের কাছে 'চৈতন্যলীলা' ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রসঙ্গে অনে হয়ে রামকৃষ্ণদেব নটিকটি দেখার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। ২১ সেপ্টেম্বর ১৮৮৪ 'মহার থিয়েটারে 'চৈতন্যলীলার' একেশবরন অভিনয় দর্শনের জন্য তাঁর পদার্পণ যত রামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। রঙ্গমঞ্চটি কয়েকজনের অবশ্যি স্পর্শে পূণ্য পবিত্রতেশে তাঁর এই ঐশীদৃষ্টি সংস্কৃতি ও ধর্মীয় পরিবেশে এক আলোড়ন এনেছিল। আলোকোজ্জ্বল নাটমঞ্চ দেখে প্রায় বালকের মতো খুশি হয়ে, অভিভূত তিনি অভিনয় দেখে একজন ভক্তকে বলেছিলেন আসল নকল এক দেখলাম। রসরাজ অমৃতলাল রামকৃষ্ণদেবের এই আগমনকে ঐশ্বরিক অশীর্বাদ হিসেবে রাখা এবং বলেছিলেন সেই প্রথম দর্শন—'নীলা অভিনেতা রঙ্গমঞ্চে শ্রীচৈতন্যদেব বেশে নর্তিয়ার ঈশ্বরসমাবেশের লীলা অভিনয় করিয়াছে তখন আমাদিগের হৃদি রঙ্গালয়কে বৈকুণ্ঠে উন্নত করিয়া নটিকশেষে একটির বিশ্বয়ের অন্য আবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব সেই অভিনয় বসিয়া দেখিয়াছেন; আমরা ধন্য হইয়াছি। দর্শন ধন্য হইয়াছে, অনুভবী ধন্য হইয়াছে !!!' অমৃতলালের চৈতন্যলীলার অভিনয় সেই ঐতিহ্য নগরপাঠে পুণ্যময় পবিত্র ঈশ্বর পরিণত হইয়াছে !!!' 'চৈতন্যলীলা' নাটকের চরিত্রলিপি স্মরণ করার মতো : জগন্নাথ মিশ্র—নীলমাধব চক্রবর্তী, নিমাই (চৈতন্য)—বিনোদিনী, নিত্যানন্দ ও শ্রীধর অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, কাশীনাথ উপেন্দ্রনাথ মিত্র, প্রতিবেশী ও লোক—অমৃতলাল বসু, শ্রীবাস অবিনাশচন্দ্র দাস, মুকুন্দ ও রামাই—কালীনাথ

নটীর প্রেমী

চট্টোপাধ্যায়, অদ্বিতীয় ও হরিদাস—অমৃতলাল পাঠক, জগাই ও বিবেক—প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, মাধাই, ক্রোধ ও কলি—অমৃতলাল মিত্র, পাষী ও তাতি—পাঁচুবাবু, কাজী—প্রসন্নসুন্দরী, বিষ্ণুপ্রিয়া—কিরণবালা, বৈষ্ণবী—শরৎকুমারী দাসী, লোক—ক্ষেত্রমণি ইত্যাদি।

'চৈতন্যলীলা'য় অভিনয়ের সূত্রে পরমপুরুষ রামকৃষ্ণদেবের 'সংস্পর্শে আসার পবিত্র স্মৃতি স্মরণ করে বিনোদিনী তাঁর 'স্মৃতিকথা'য় বলেছেন : 'জগৎ যদি আমার পূণ্যর চক্ষে দেখে, তাহলেও আমি কখনি বিশ্বাস করি না, আমি জানি যে পরমারাধ্য পরম পূজনীয় 'রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আমার কৃপা করিয়াছিলেন।' বিনোদিনী আরও জানিয়েছেন : 'এই চৈতন্যলীলা দেখার পর তিনি কয়বার থিয়েটারে আসিয়াছেন মনে নেই। তবে বহে যেন তাঁর সেই প্রফুল্লমুখী মূর্তি আজি বারবার দর্শন করিয়াছি। লাটু মহারাজের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় : 'চৈতন্যলীলা' নাটকে বিনোদিনীর নারী চরিত্রের অভিনয় দেখতে গিয়ে শেষ দৃশ্যটি তিনি রঙ্গমঞ্চ থেকে মাত্র দিয়েছিলেন। রামকৃষ্ণের সঙ্গে বিনোদিনীর নারী চরিত্রের অভিনয় দেখতে গিয়ে শেষ দৃশ্যটি তিনি রঙ্গমঞ্চ থেকে মাত্র দিয়েছিলেন। রামকৃষ্ণের সঙ্গে বিনোদিনীর সর্বশেষ সাক্ষাৎকারটি অবশ্য বোলকরে, শ্যামপুকুর বাড়িতে অসুস্থ রামকৃষ্ণকে দর্শন করার জন্য গিয়েছিলেন, কালীপদ ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাতের প্রয়োজনে হাটি-কোটি পরে। রোগক্লান্ত পরমহংসে তাই শীলা ভক্তকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করেছিলেন।

প্রথম অভিনয় দেখে এতটাই খুশি হয়েছিলেন রামকৃষ্ণদেব, নিজেই নিরিশচন্দ্রের কাছে প্রস্তাব দিয়েছিলেন আর একটি থিয়েটার দেখবার—এবং সে মত 'কই বাঞ্ছনা জানায়ার' তিনি পরমহংস দেখতে চাননি' এমনটি গিরিশচন্দ্র আটি আনা দর্শনী মূল্য ধার্য করলেও, তিনি এর টাকা দিয়ে থিয়েটার দেখেছিলেন। রঙ্গমঞ্চের প্রতি আকৃষ্ট রামকৃষ্ণ, 'স্টার' থিয়েটারেই পরবর্তী নটিক 'প্রফুল্ল চরিত্র' (প্রথম অভিনয় ২৪ নভেম্বর ১৮৮৪) ১৪ ডিসেম্বর ১৮৮৪ তারিখে অন্তিম অভিনয় দেখতে যান। ২৭ নভেম্বর ১৮৮৪ তারিখে একই রাতে অমৃতলাল বসু রচিত 'বিবাহ বিভ্রাট' নাটকটির মঞ্চস্থ হয় প্রথম। প্রসঙ্গত উল্লেখ এই দেখবার নাটক অবশ্য তিনি অনুরোধ করা সত্ত্বেও দেখতে যাননি। গিরিশচন্দ্রকে তিনি বলে ছিলেন : 'প্রফুল্ল চরিত্র'র পর 'বিবাহ বিভ্রাট', আগে পায়েস মন্ডা, তারপর সুক্তুনি পরিবেশনের মতো। অভিনয়ের পর গিরিশচন্দ্রের অনুরোধে নটীরা প্রণাম করেন, তাঁরও করুণাভাষা কণ্ঠে তাঁদের আশীর্বাদ করেন। এরকম অভিনেত্রীদের পূণ্যের সাক্ষী যাঁরা তাঁদের তিনি বলেছেন : 'সাধ্বী তিনি, এক এক রূপে।

দক্ষিণেশ্বর সাক্ষাতের সময় গিরিশচন্দ্র, রামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন : 'আমি আপনাকে দর্শন করিয়াছি, আমার কি আমার যাহা করিতে হয়, তাহা করিতে হইবে ?' ঠাকুর তাঁকে থিয়েটার করবারই প্রেরণা দিয়েছিলেন, কেননা থিয়েটারই তাঁর প্রধান কাজ। থিয়েটারের মাধ্যমেই সোনাদিকার প্রচার কর্ম সাধিত

[illegible] [illegible] [illegible]

হয় এই বিশ্বাস গিরিশচন্দ্রের মনে তিনি সঞ্চারিত করেছিলেন। রামকৃষ্ণ তাঁকে থিয়েটারের মাধ্যমেই লোকশিক্ষার প্রচার কর্ম সাধিত হয় এই বিশ্বাস গিরিশচন্দ্রের মনে তিনি সঞ্চারিত করেছিলেন। রামকৃষ্ণ তাঁকে থিয়েটার করতে বারণ করেননি, কেননা ওতে অনেকের উপকার হয়। কথামৃত পাঠ থেকে জানা যায়, স্টার থিয়েটারে ছয় মাসের মধ্যে তিনি মোট তিনটি নাটক হয়, 'চৈতন্যলীলা', 'প্রহ্লাদ চরিত্র' এবং 'বুদ্ধদেব' দেখেছিলেন। শেষোক্ত নাটকের (২৫-৪-১৮৮৫) অনুষ্ঠিত অভিনয় রজনীতে মহেন্দ্রলালও উপস্থিত ছিলেন—এবং অন্যত্র বলেছিলেন। অন্ধ কর্ণ ও পাষাণী পুলিকে দুজন করতে করে পুত্র বুদ্ধদেবকে বলিদান করলেন—ঠাকুর সেই দৃশ্য দেখে সমাধিস্থ হয়ে যান। এরপরে সমাধিস্থ মহেন্দ্রলাল উপস্থিত হন। এই সময় আশ্চর্য এক প্রশ্ন করেছিলেন তিনি : 'এটি তোমার থিয়েটার না তোমাদের ?' গিরিশচন্দ্র উত্তরে বলেছিলেন : 'আজ্ঞে আমাদের'। রামকৃষ্ণ এই উত্তর শুনে খুশি হয়ে জানিয়েছিলেন : 'আমাদের কথাটাই ভাল, আমার বলা ভাল নয়। কেউ কেউ বলে আমি নিজেই এসেছি। এসব হীনবুদ্ধি অহঙ্কারে লোকে বলে।' ঠাকুরের সংস্পর্শে গিরিশচন্দ্র আত্মঅহঙ্কার বিসর্জন দিয়ে ব্রহ্মজ্ঞানের স্বাদ পেয়েছিলেন। রামকৃষ্ণের কৃপাদৃষ্টি বলুন—তেমন কাটি গিরিশ, নিজেকে আগুনে পুড়িয়ে শুদ্ধ করতে পেরেছিলেন। শেষোক্ত অভিনয়ের দিন রামকৃষ্ণদেব 'বিবাহ বিভ্রাট'-র অভিনয়ও দর্শন করে গেছেন বলে বলে, কিন্তু তাকে সেদিন অনাকর্ষক হয়েছিলেন।

রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর গিরিশচন্দ্র 'চৈতন্যলীলা' দ্বিতীয় ভাগ 'নিমাইসন্ন্যাস' নাটকটি রচনা করেন, 'স্টার' থিয়েটারে অভিনয় হয় ১৩ জানুয়ারি ১৮৮৫ তারিখে। নিমাই চরিত্রে অভিনয় করেছেন বিনোদিনী। তিনি স্মৃতিচারণে জানিয়েছেন : 'এই দ্বিতীয় ভাগ 'চৈতন্যলীলা' প্রথম ভাগ হইতে কঠিন ও অভিনয় করিবার বড় বড় শিশু দ্বারা পূর্ণ। আর ইহাতে চৈতন্যের ভূমিকাই অধিক।' 'কঠিন ও উপদেশকারী' সংলাপ মুখস্থ করে বিনোদিনী প্রায় এক মাস যাবার যন্ত্রণায় কষ্ট পেয়েছেন। নাট্যকার অমৃতলালের মতে এই নাটক খুব আকর্ষণীয় দাবির জন্য সাধারণ দর্শকের কাছে সমাদৃত হয়নি। অবশ্য নাটকের গানগুলি দীর্ঘ হলেও বড়ই মর্মস্পর্শী হয়েছিল বলে তিনি জানিয়েছেন। রামকৃষ্ণদেব এই নাটক দেখেছিলেন বলে অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় উল্লেখ করে লিখেছেন 'খুশী মনে প্রবেশকারীন দূরে শ্রীরামকৃষ্ণের চুপ করে নিমাই ও ভক্তদলের বিদায়ের পরে 'দেখ দেখ কানাইয়ে যাবি যাবে যদি' গানটি শুনে রামকৃষ্ণদেব একদিন থিয়েটার দেখতে এসে ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়েন এবং অভিনয় দেখে গিরিশচন্দ্রকে আলিঙ্গন করেন।'

১৮৮৪-র ১২ জুন রামকৃষ্ণদেবের কইপ্রকাশের আত্মপ্রকাশ ঘটে পড়ে এবং ক্রমান্বয়ে জানা যায় তিনি মূত্রাশয়ের কর্কটরোগে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁর মৃত্যু পূর্ব এই অসুস্থ অবস্থায় গিরিশচন্দ্র 'স্টার' থিয়েটারে তিনটি নাটক মঞ্চস্থ করেন 'প্রহ্লাদ চরিত্র' (৩ জুলাই ১৮৮৪), 'বুদ্ধদেব চরিত্র' (১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৮৪), 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের ৩ জুলাই ১৮৮৪)। এই সাক্ষিত্ব এল পর গিরিশচন্দ্রের জীবনের এক তাৎপর্যপূর্ণ সময় হিসাবে চিহ্নিত। এই তিনটি নাটক পারীরিক কারণে রামকৃষ্ণদেবের পক্ষে দেখা সম্ভব হয়নি। 'বুদ্ধদেব চরিত্র' নাটকটি স্যার এডুইন আরনল্ডের 'দি লাইট অব এশিয়া' কাব্য অবলম্বনে লেখা। নাটকটি গিরিশচন্দ্র আরনল্ডকে উৎসর্গ করে ধন্য স্বীকার করেছিলেন। পরিচয়ের সূত্রে কলকাতায় এসে আরনল্ড নাটকটি দেখে 'বঙ্গ নাট্যশিল্পের উন্নতিকল্পে গিরিশচন্দ্রের যত্ন, উদ্যম ও অধ্যবসায় যথেষ্ট প্রশংসা করে যান। তাঁর প্রদত্ত পুষ্পস্তবের এক জায়গায় আরনল্ড লিখেছিলেন : 'যদি ঘরভূমির পৃষ্ঠপোষক দেশিয়া বিলাতী থিয়েটারের অধ্যক্ষেরা লজ্জিত হয়া করিতে পারেন, কিন্তু ঘটনার ভাবোদ্দীপক নাটকাভিনয় ও অভিনয় চাতুর্য দর্শনে তাঁহাদিগকে নিশ্চয় চমৎকৃত হইতে হইবে।' অবিনাশচন্দ্র আলোচ্য নাটক প্রসঙ্গে লিখেছেন :

'ক্লাসিকাল অভিনয়ে শেক্সপীয়র ও গ্রীক যেরূপ একটি প্রেরণাস্থলের উল্লাস জাগাইয়াছিল, তুলসীর অভিনয়ের সেইরূপ শক্তিমানের উৎস খুঁজিয়াছিল। এই নাটকের 'অন্ধকারে চাবি, খোকার জ্বরাই, খোকা জ্বরে আমি, খোকা কেন যাই', ইত্যাদি অংশ বীণাপাণি বিশিষ্টভাবে গানের ভঙ্গিতে করিয়া বাহিরের শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের লক্ষণটিকে দিয়াছিল। এই ছোটখাটি পরিচ্ছন্ন পরিচয়ে বিবেকানন্দ আসিয়া আবছায়া হইয়া যাইতেন।'

পরবর্তী নাটক 'বিবেকানন্দ ঠাকুর'-এর কাহিনী রচিয়া গৃহী এবং ত্যাগীদের ভাবকৃচ্ছ্রসাধনের প্রয়াস প্রকাশ করার পরিচয়। অভিনয়ের একটি অংশের কাহিনী গড়িয়াছিলেন রামকৃষ্ণদেবের তাঁর নিজের কথন রচিয়াছে। বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন : 'বিবেকানন্দ শেক্সপীয়রের ঈশপ নিয়ায়ে। আমি এমনি উপমানের প্রশ্ন কখনও শুনি নাই।' গিরিশচন্দ্র রামকৃষ্ণের আদর্শকে মুখ্যভাবে প্রতিফলিত করানোর জন্য সাধক ও পার্ষদদের চরিত্র খুঁটি খুঁটি অংকিয়াছিলেন। ফলে রামকৃষ্ণ এই নাটকটি না দেখলেও 'আমার শাকান্ন ভাল, পরশী আমার জ' জানটি তাঁর অবশ্যই প্রিয় ছিল। রামকৃষ্ণ সাধনা ও তর্ক সমন্বয়ের আদর্শ থেকেই অনুপ্রাণিত গিরিশচন্দ্র পার্ষদদের চরিত্রের রূপ কল্পনায় তাঁর অকৃপণতা চিহ্নিত করেছিলেন। 'বিবেকানন্দ ঠাকুর' নাটকে অভিনয় করেছিলেন বিনোদিনী। পরবর্তী নতুন নাটক 'বেল্লিকবাজার' গিরিশচন্দ্র লিখিত প্রথম অভিনীত হয় ৭৬ ডিসেম্বর ১৮৮৬। 'নব বিভাকর সাধারণী' পত্রিকায় (রবিবার ১২৯৩, পৃ-১৯৮) প্রকাশ সমালোচক অক্ষয়চন্দ্র সরকার এই প্রহসন সম্পর্কে লিখেছিলেন : 'বেল্লিকবাজার ছবি নিখুঁত ফুটিয়াছে। বেল্লিকবাজার অভিনয়ে কয়েই ফুটিয়া ! জীবন্ত ! রঙ্গ-কবি যে আমোদিদের মজলিস মজায় প্রবেশ করিয়া নীচে টীকনি মুল টানিয়া আমোদিদের গায় পথে পেশন করিয়াছেন, পথে পথে মাথের ধার ধারিয়াছেন, তাহা ইহাতে এত ভাবে ব্যক্ত প্রকৃতি নিয়ে দেখান হইয়াছে।' পরে মাস পরে স্টারের নতুন নাটক মঞ্চস্থ হল 'রূপ সনাতন' (২১ মে ১৮৮৭)। কিন্তু এই নাটক 'বুদ্ধদেব চরিত', 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' কিংবা 'বেল্লিকবাজার'-এর মতো দর্শক সমাদর কিছুই আকর্ষণ করেনি। দ্রুতলয় ঐতিহ্যের ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি মঞ্চ অবতীর্ণ 'ও বেল্লিকবাজার' নাটকে শেক্সপীয়রের প্রভাব অভিনয় করে নাটিকাকার থেকে বিনোদিনী চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করেন—শোনা যায়, সহকর্মীদের দুর্ব্যবহারে ক্ষুব্ধিত হয়ে বিনোদিনী এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এটাই তাঁর জীবনের অন্যতম দুঃখের যৌবুন, যে রঙ্গালয়ের জন্য তাঁর প্রাণ ও আপ্রাণ করেছেন সেখানের মঞ্চ জায়গায় স্থান নিয়েছিলেন—সেই রঙ্গালয় থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে গায়া হয়েছিলেন—বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে এর চেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা আর একটিও নেই।

এদিকে 'বেল্লিকবাজার' নাটকের জনপ্রিয়তা এমনই প্রচারিত হয়েছিল যে কলুটোলার প্রসিদ্ধ ধনকুবের অভিলাষ শীলের নাতি, নিজু বিয়েতের পর প্রকৃত সম্পত্তির অধিকারী গোপালদাস নিজেই একটি থিয়েটার প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্বুদ্ধ হন। কুটবোশিলে তিনি স্টার থিয়েটারের জমি কিনে নিয়ে গোয়ের ভদ্রলিবাহাদুরের উত্তরাধিকারীদের দেয়নি দেন। গিরিশচন্দ্র অবশ্যের পরামর্শ দিয়েছিলেন স্টারের জমি গোপালদাসকে বিক্রয় করার, কিন্তু থিয়েটারের মূলধন হস্তান্তর না করার এবং বিক্রয়ের টাকা যা পাওয়া যাবে, তার বিনিময়ে অন্যত্র জমি কিনে নতুন করে 'স্টারের' গড়ন করা। এই উপদেশ মতোই 'স্টার' থিয়েটারের ৩১ জুলাই ১৮৮৭ তারা দেখকদের রচনা 'বুদ্ধদেব চরিত' ও 'বেল্লিকবাজার' অভিনয় করে বিদায় গ্রহণ করেন। 'স্টার' থিয়েটারের এই শেষদিনের বিদায় দৃশ্য বর্ণনা করে 'সাধারণী' পত্রিকায় (১২৯৪,১৯৮ পৃঃ) অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখেছিলেন : 'বিদায়কালে মনের ভাব কিরূপে ভাষা হইতে বিলক্ষণ করিলেন: স্টার থিয়েটার কর্তৃপক্ষের সহিত তাঁর ভাবগত কোনো সম্পর্ক রহিল না। পরের মনোরঞ্জন ব্যবসায়ীর এই আত্মচিত্তের বিবরণের কথা। দর্শক-মণ্ডলীকে প্রকৃত ব্যক্তিগত বিদায়কালে প্রণাম করিতে ভুলিলেন। তিনি মর্মস্পর্শী ভাষায় অভিনয় দুঃখকাতর করে নিবেদিলেন 'শেষ দিনে রঙ্গলাল জনয়ন যেন ভরিয়া পড়িয়াছিল। রঙ্গক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা পর্বে যোগাও কখন এত জনতা হইয়াছিল বিনা সংঘর্ষে। নবীন প্রবীণ দর্শকমন্ত্র সাহ মিলাইয়া বিদায়কালে বঙ্গমঞ্চী অভিনয়ের অভিনয় বিস্তৃত দেখিলেন। অভিনয়ান্তে 'বিদায়-বিরাট' প্রণাম শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু এই স্মৃতিকালে আঁকারের যে ছবি আঁকা হয়েছে, তাহা চিত্রায় অভিনয় অভি বিদায় মঞ্চে সর্বশেষকে কথা হইয়াছিল। পর্দাটুকু করিয়া কখনও প্রকাশে আবার দেখা দিবেন, তাহার আভাস দিলেন।'

বিনোদিনী বিদায় করে যে বিরাট অঙ্কের টাকা পেয়েছিলেন, তাকে মাঁর সম্বলমাত্র ৭২-এ কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটে বাড়ি জায়গা কিনে নতুন মঞ্চ নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। রঙ্গেশ্বরকৃষ্ণ দেব ও তাঁর ভাইরা হাতিবাগানের প্রায় তিরিশ কাঠা জমি সাতাশ হাজার টাকায় বিনিময়ে বিক্রয় করেন। রঙ্গালয় নির্মাণের পরিচয় শেষের দেখে বেলগাছে গড়িয়ে কর্মরত গোপালদাস মিত্র এবং প্রতিনিধি সুর। নতুন খুঁটি পত্তন জমি নিয়ে আমন্ত্রণীয় কনেস্টিলেশন রেভারেন্ড সি সি মিত্র আসে কোম্পানি, দেড় হাজারেরও বেশি দর্শকাসন নিয়ে এই রঙ্গালয় নির্মাণের জন্যতে খুব আয়োজন হয়েছিল। গোপালদাস যে টাকা দিয়েছিলেন তা নতুন জমি ক্রয় করতে শেষ হয়ে যাওয়ায়, কর্তৃপক্ষীরা নিজেদের সংগৃহীত অর্থে শুধু নির্মাণের

রাজা আরম্ভ করেন, [illegible] মধ্যে সে টাকাও শেষ হয়ে যায়। এমন সময়, গোপাললাল তাঁর নবপ্রতিষ্ঠিত এমারেল্ড থিয়েটার খুব জমছে না দেখে গিরিশচন্দ্রকে যে কোনো প্রকারে তাঁর থিয়েটারে আনতে বদ্ধপরিকর হন। গিরিশচন্দ্র এই আমন্ত্রণে অসম্মতি জানালে গোপাললাল তাঁকে তিন হাজার টাকা বেতন এবং সঙ্গে তিনশো টাকা বেতনের প্রস্তাব দেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য এই বেতন ও বেতনের শর্ত মান্য করে গিরিশচন্দ্র পাঁচ বছরের চুক্তিতে এমারেল্ডের সঙ্গে যুক্ত হন। এই প্রস্তাব যে তিনি গ্রহণ করলেন তার পেছনে বড় যুক্তি হল থিয়েটারের নব নির্মীয়মান গৃহের জন্য আর্থিক সহায়তা করা, তিনি প্রায় বেতনের টাকা থেকে ষোলো হাজার টাকা তাঁদের দেন, এবং অন্যদিকে তাঁদের কাছে নিজের অভিলাষ ব্যক্ত করে বলেন, 'তোমরা আজ সম্রান্ত, নানা প্রেক্ষাগৃহের কর্তৃক লাঞ্ছিত হইয়া, এক্ষণে স্বীয় ইচ্ছায় স্বাধীন হইলে— আমার অনুরোধ যে সকল আজ সম্রান্ত, তোমাদের আশ্রয় গ্রহণ করিবে, তাহারা যেন কখন কোনরূপ লাঞ্ছিত না হয়।'

গিরিশচন্দ্র 'স্টারে' থিয়েটারের নতুন গৃহ উদ্বোধনের জন্য 'পূর্ণচন্দ্র' নামে একটি নাটক তাঁদের লিখে দিয়েছিলেন, গোপাললালের অনুরোধে সেটি এমারেল্ডে দিয়ে দিতে হয়, কেননা ষোল দেওয়ার পর দেখেছিলেন সেখানে একটি নতুন নাটক প্রয়োজন। 'স্টারের' উদ্বোধনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি তাঁদের একটি নাটক লিখে দেবেন। যেহেতু এমারেল্ডের সঙ্গে তিনি চুক্তিবদ্ধ, তাই 'সেবক' ছদ্মনামে তাঁদের জন্য লিখে দেন 'নসীরাম', ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মে (১৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫) শুক্রবার ফুলশয্যার দিন মহাসমারোহে সে নাটক মঞ্চস্থ হয়। অভিনয়ের পূর্বে নাট্য শিক্ষক অমৃতলাল বসু গিরিশচন্দ্র রচিত নিম্নলিখিত কবিতাটি পাঠ করেন :

হে মঞ্চেশ, পদে নিবেদন—
নির্বাসিত দুঃখেদুখে, বঞ্চিলাম অধোমুখে
বঞ্চিত বাঞ্ছিত তব চরণ দর্শন।
ঘুণ সম অর্থের ভক্ষণ
আজি ফুটে পূর্ণ আক্ষিকন
ভাগ্যত সুজন।
করে দান—করুণা প্রদান,
বাম-বশে ঘটাবারে, ভুল শোধ—তবপর
তব পুজা আশীষের ইচ্ছ অধিকার।
শক্তি হৃদি না পূরি আধার,
ধর্ম মনে বন্ধ করে হাস
ঘুরিয়ে কি ভাস ?
অভিনয় ইতিহাস কয়—
শেষ ছোঁড় নাচা মত, যে ছাড়ি সে
হাসে বড়,
প্রাপ্তি, হাসা, ঘিরহাসে, শোণিত শোষণ বহ,
বিশ্বজাল জোমলতামহ,
ধর্মপ্রাণ শ্রেষ্ঠ পরিহাস,
ধর্ম—ধরানন্দ !

'নসীরাম' নাটকের নামভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন অমৃতলাল বসু, অন্যান্য চরিত্রলিপি ছোটোলালের— উপেন্দ্রনাথ মিত্র, অনাথ নাথ-অমৃতলাল মিত্র, কাশীনাথ-অঘোরনাথ পাঠক, লক্ষ্মীনাথ-বেলবাবু, বৃন্দাবন-কালীনাথ চট্টোপাধ্যায়, বিরজা-কাননবিহারী, মাতঙ্গিনী-হরিমতী, সেবা-গঙ্গামণি এবং শান্তমণিয়া বালক চরিত্রে একটি মাত্র সংলাপ উচ্চারণ করে বহু রঙ্গমঞ্চে তারামণিকেই সর্বপ্রথম আবির্ভূত ঘটে। নৃত্য শিক্ষকতা করেছিলেন কালীনাথ চট্টোপাধ্যায়, সংগীতের পরিচয়ে ছিলেন রামতারণ সান্যাল এবং রঙ্গভূমি সজ্জিত হয়েছিল দামুচরণ নিয়োগীর। সাধারণ দর্শকরা অবশ্য নাটকটি যে ভাবে সমালোচকের সঙ্গে গ্রহণ করেননি, বরিও উদ্ভাসীন দর্শকরা খুব পছন্দ করেছিলেন। ভাবুক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাবাদর্শ নসীরাম চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছিল। অভিনয়ের দিক থেকে সার্থক না হওয়ায়, অমৃতলাল বসু কৃত নসীরামকে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' (২২ সেপ্টেম্বর ১৮৮৮) উপন্যাস ধরনের উপাদান গৃহীত হয়, 'সরলা' নামকরণে। 'অনুসন্ধান' পত্রিকা (৩০ সেপ্টেম্বর ১৮৮৮) এই নাটকের অভিনয় দেখে মন্তব্য করেছিল : 'ধর্মের জেট, ইতিহাসের ধুয় এখন কিছু ঘনীভূত হইয়ে চলিল।...এ অভিনয়ে সমাজের যথেষ্ট উপকার হইবে।'

ইতিমধ্যে এমারেল্ড থিয়েটারের

অভিনেতৃবর্গকে ঘোষণাপত্রকে ঘোষণা করেছিল, যেমন তিনি থিয়েটার পরিচালনা করুন, পুরাতন দোষ, ত্রুটিগুলি সংশোধন ও প্রকাশন নিজের দিক দেখে, শিশিরকুমার এই সুযোগে তাঁর কাছ থেকে টিকিটক্রয় করে স্টার থিয়েটারে যোগ দেন. ১৮৮৯ ও ফেব্রুয়ারি এক্সেলেন্সের শেষ অভিনয়ের পর। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দের ২৭ এপ্রিল তাঁর নতুন নাটক 'প্রফুল্ল' অভিনয়ের বিজ্ঞাপনে 'ইন্ডিয়ান মেরি বিহ্ন' পত্রিকার তাঁর ঘোষণা করেন The proprietors have great pleasure in announcing to their patrons that Baboo / Girish Chunder Ghosh has accepted the management of the theatre. The new play has been got up entirely under his directions, the manager personally superintending every detail.' 'ক্যালকাটা' পত্রিকায় এই নাটকের অভিনয়ের ছাপাবলিকভাবে তিন কিস্তিতে প্রকাশিত হয়, যা এর আগে কোনো নাটকের সম্ভব ঘটেনি। স্যাটিরোলী দর্শকরা নাটকটিকে আন্তরিক সমালোচনা সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। এরপর 'স্টার' থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয় যে ছয়টি নাটক তার মধ্যে শিশিরকুমারের অভিনয় করেনি, 'কমলেকামিনী' (৭ সেপ্টেম্বর ১৮৮৯), 'চৈতন্য' (২৯ জুলাই ১৮৯০), 'মলিনা-বিকাশ' (১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৯০) 'মায়াবসু' (২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৯০) ; বাকি দুটির অভিনয় অনুষ্ঠানের কথা, কমলকুমে 'আজব কারখানা' (১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৯০), 'হারানিধি' (১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৯৬)। শিশিরকুমারের অভিনয়ের ফলেই 'স্টার' ইতিহাসে প্রথম সাফল্যের প্রাপ্ত হয়েছে— কেননা তাঁরা নিজেদের অর্থসংস্থানের 'স্টারের' সুনাম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। এমনকী তাঁদের সেই আর্থিকসংকটের জেরেই, শিশিরকুমারকে কোনো কোনো ব্যাপারে হিসেবে করতেও দ্বিধা করেননি। শিশিরকুমারের ঈপ্সিত হারানো ফিরে আসার মধ্যে অবশ্যই '৬৩' উল্লেখ এই জন্য যে সেটিই তাঁর প্রথম প্রকৃত ঐতিহাসিক নাটক, আর 'মলিনা-বিকাশ' নামের মঞ্চে দ্বিজেন্দ্রলালের ক্ষেত্রে নতুন এক ভনভিয়োর সম্ভাবনা প্রস্তুত করেছিল। '৬৩' নাটক আর একটি কারণে বিশেষ ভাবে উল্লেখ. এই নাটকেই অমিতাভ চৌধুরীর অভিনয় দেখার জন্য প্রথম ঘিরিয়া ক্ষেত্রে বিশেষে প্রথম বসেন। '৬৩' নাটকের অভিনয়ের এমন ঘটিয়ে পড়েছিল যে, 'অমৃতবাজার' পত্রিকা (১৪ এপ্রিল ১৮৯৭) লিখেছিল 'আজকাল থিয়েটারের কারণে স্টার থিয়েটারের বাড়ি নামমাত্র। আগুনে কলকে গাড়িগুলি পুড়ানোটির হয়েছিল। আর সেই জন্যেই, স্টার থিয়েটারে কোন বিশ্ব অভিনয় এইবে শুনিলেই লোক আর ধরে না— তিনি তিনি সকলেই অভিনয় দেখিতে ছুটেন।' 'মায়াবসু' প্রকাশিত নাটিকাটিতে তাঁর গভীর বেশ অভিনয় পরিচয় নিয়েছি ছিল, সে নাটক থেকে অভিনয়ে অসীমকৃষ্ণ ঠাকুর ঘরকে এক হাজার টাকার পুরস্কার দিয়েছিলেন, শিশিরকুমার অবশ্য সে অর্থ নিতে না গ্রহণ করে অভিনেতৃবর্গের সমালয়ে বন্টন করে দেবার জন্য ব্যবস্থাপকদের হাতে অর্পণ করেছিলেন। কিন্তু মুশকিল, সেই শিশিরকুমার তাঁর অভিনয়ের কৌতুকের মধ্যে 'স্টারের'র সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এমন কী সেই পারস্পরিক মনোমালিন্য আজীবন স্থায় পরীক্ষা পরিচয়েছিল। তাঁর প্রাণপ্রতিম শিষ্য-অভিনেতাদের সঙ্গে এই বিচ্ছেদের কথাটি অপরেশচন্দ্র মুখার আখ্যা করে লিখেছেন : 'শরতের শেষে, পুজা বন্ধ হইলে বা মুখিল হইলে রাজনীতি ফিরিল হইবে হইবে, শিশিরবাবু আবার অভিনয় শিক্ষা-ক্ষেত্রে যোগ হয় তুলিয়া দিয়াছিলেন, অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যের মনের ও কল্পনার। পূর্বকার মত শিশিরবাবুর কর্তৃত্ব স্টার সম্প্রদায়ের আর ভাল লাগিল না। যে শিশিরবাবু আত্মত্যাগ করিয়া একদিন স্টারের জন্য নাটক লিখিয়া দিয়াছিলেন, যে শিশিরবাবু শত বন্ধনের জন্য নিজেকে বিক্রয় করিয়া ষোল হাজার টাকা স্যাহকে দিয়াছিলেন, স্টার থিয়েটার সেই শিশিরবাবুকেই বরখাস্ত করিয়া চিঠি পাঠাইলেন।' অবশ্য শিশিরকুমারের প্রস্থানের পর স্টার থিয়েটারে একটা দলাদলির পরিস্থিতি উদ্ভূত হয়, শিশিরকুমারের প্রতি একদল অভিনেতার ব্যবহারের প্রতিবাদে নীলমাধব চক্রবর্তীর নেতৃত্বে অভিনেতার দল, অপেরাকুঞ্জ ঘোষ, ভূতনাথ, পরিচালু, প্রবল মুখার্জী, রামলালমুখার্জী প্রমুখ পরেশোজন অভিনেতা-অভিনেত্রী স্যাহের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিউ থিয়েটার নাম দিয়ে কর্ণওয়ালিস থিয়েটারে— স্টারের শিশিরকুমার রচিত নাটকের অভিনয় শুরু করেন। এই অভিনয়ের বিরুদ্ধে স্টার এবং সঙ্গে নিউ থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ নীলমাধব এবং নাটককার শিশিরকুমার বিরুদ্ধে হাইকোর্টের মামলা করে। শিশিরকুমারের ব্যক্তি জীবন কলুষ পুত্রের চিকিৎসার জন্য অবসর বিশ্রাম, শেষ পর্যন্ত স্টার এই অবস্থার তাঁর প্রতি কিছুটা সদয় হয়ে পূর্বসংকল্পকে আলো প্রত্যাহার করতে চান। তাঁদের প্রস্তাব : শিশিরকুমারকে প্রাক্তন অবলম্বীকৃত অভিনয় একশত টাকা অবসরভাতা দেবেন, কিন্তু তিনি কোনও প্রকার বা অভিনয় থিয়েটারে কোনো প্রকার সম্পর্ক রাখতে পারবেন না। তিনি কোনো নাটক লিখলে, তার অভিনয় স্বত্ব তাঁরা উপযুক্ত অর্থ মূল্যে কিনে নেবেন। এমন যদি হয় কোনো নাটক তাঁদের অপছন্দ, তখন সেটি অন্য থিয়েটারে দিতে পারবেন, তবে এক্ষেত্রে তাঁদের প্রথমদানে দিতে, দিক্ষা দিতে পারবেন না। উপর পক্ষের মধ্যে যিনি এই শর্ত ভঙ্গ করবেন তাঁকে পাঁচ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। বিনাশর্তে আলোচনার অপরিচিতে যিনি থিয়েটার করবার বাসনা পরিত্যাগ করে, এই যুক্তিপত্র স্বাক্ষর করে নিজের ঈপ্সিত পূরণ করেছিলেন। বছর দুয়েক পরে অবশ্য 'মিনার্ভা থিয়েটার' নামে একটি নতুন রঙ্গালয়

স্থাপনার সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার পরও গিরিশচন্দ্র যে দুটি কাজ করেছিলেন, তেমনি নাট্যনিষ্ঠার কয়েক মুহূর্তের অবিবেচনাপ্রসূত মুহূর্তগুলোয় শীঘ্র ঋণের টাকার অতিপূরণ অর্থ শোধ করার জন্য লিখেছিলেন। কিন্তু মাত্র কয়েক মিনার্ভার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল, পরে তিনি নীতিকার ভাবনে সে থিয়েটারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য হন। যেদিন তিনি মিনার্ভা-ত্যাগ করেন, সেই রাত্রেই 'স্টারে'র কর্তৃপক্ষীয়গণ গিরিশচন্দ্রের বাড়িতে গিয়ে অনেক প্রস্তাব ও ভাষটি, প্রদর্শন করে তাঁকে পুনরায় 'স্টারে' যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানান। 'স্টার' থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর গিরিশচন্দ্র ম্যানেজারের পদ নিয়ে অসম্মত হওয়ায় 'মাস্টারমার্ক' হিসেবে তাঁর নাম ঘোষিত হয়—এই উপাধি তাঁর ব্যবসায়ে ইতিপূর্বে অন্য কাউকে প্রদত্ত করা হয়নি। 'স্টার'-এ যোগ দেওয়ার পর গিরিশচন্দ্র লিখলেন 'কালাপাহাড়', সেটি অভিনীত হয় ২১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৬। নাটকে টিস্তারানি নামে একটি কাল্পনিক চরিত্রে অভিনয় করেন গিরিশচন্দ্র। এইটিই ঐতিহ্যবাহী রামকৃষ্ণদেবের অনুপ্রেরণায় পর ঐতিহাসিক পাঁচ বছর অতিক্রান্ত, প্রাণিনাথচন্দ্র লিখেছেন : 'এই নাটকে অনিন্দ্য 'টিস্তারানি' চরিত্র, পরমহংসদেবের চরিত্রের আধারকে অবলম্বন করিয়া গঠিত। গিরিশচন্দ্রের প্রথম ধর্ম-জীবনে যে সুন্দর স্বপ্ন মূর্তিত হইয়াছিল, কালাপাহাড়-চরিত্রে তাহার আভাস পাওয়া যায়, এই চরিত্র শ্রীশ্রী পরমহংসদেবের প্রভাবে অনুরঞ্জিত। প্রেম, ভক্তি ও ভালবাসা যে ঈশ্বর লাভের প্রকৃষ্ট পন্থা—এই নাটকে গিরিশচন্দ্র তাহা উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। ইহার অধিকাংশে চরিত্রেরই গড়িপাত—প্রেম, ভক্তি ও ভালবাসার হাতে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ।' পরমহংস-কথিত সর্ব-ধর্ম সমন্বয়ের আভাস, চরিত্রগত নির্বিশেষে ঘনীভূতভাব এবং ঈশ্বরপ্রেম, গিরিশকণ্ঠে তাঁর অপূর্ব ঝঙ্কারের অনবদ্য তাহার বহু চরিত্রের মধ্যে নিজে প্রকাশ করেছিলেন, অভিনয় করার ইশারা রেখে নিজের খোলস ছেড়ে সম্ভোগের অনুবর্তী হয়ে গিরিশচন্দ্র তাঁর এসব নাটক লেখা করেননি, রামকৃষ্ণ ভক্তজনার নামে ধর্মীয় অনুপ্রেরণার বশে নাটক হওয়ার তিনি আসরটি ছাড়েনি।

এরপরে 'স্টার' থিয়েটারের জন্য তিনি লেখেন 'বীরু বৌ', মহারানি ভিক্টোরিয়ার ষাট বছরের রাজত্বকাল পূর্ণ হওয়ার উপলক্ষে উদ্‌যাপনে, মহারানির গুণকীর্তন করার আয়োজন নাটকের জন্য নিয়ে নাটককারের যথেষ্ট প্রীতি ও জাতীয়তাবোধ বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়। এই নাটক অভিনীত হয় ২১ জুন ১৮৯৭, তিন মাস পরে 'স্টারে' প্রযোজিত হয় 'শাহজাদা প্রভুদ' (১১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৭) এবং 'সাজাহান' (১৮ ডিসেম্বর ১৮৯৭)। শেষোক্ত নাটকটি সাম্প্রতিক, এই প্রযোজনায় নাটককার স্বয়ং ঔরঙ্গজেবের চরিত্রে অভিনয় করেন, নাটকটি ফরাসী বিয়োগান্তকের আদর্শানুযায়ী অনুপ্রাণিত। পরের বছর অমরনাথের প্রেমের অসামরীর জন্য কিছুদিনের জন্য 'স্টার' বন্ধ রাখা হয়, গিরিশচন্দ্রের সঙ্গেও কিছুদিনের জন্য সম্পর্ক ছিন্ন হয়।

এর পরেও তাঁর অভি প্রেম বজায়ের পরামর্শমতে তিনি 'স্টার' থিয়েটারে আর যেতেননি। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারি তাঁর প্রয়াণ ঘটে। প্রায় আট মাস পরে, 'মিনার্ভা' থিয়েটারে ১৮ সেপ্টেম্বর গিরিশচন্দ্রের স্মরণে একটি স্মরণসভা আয়োজিত হয়, সভাপতি অমৃতলালের অভিপ্রেরণী সভাপায় এই অনুষ্ঠান করবার অভিপ্রায় জানিয়ে অমৃতলাল বসুকে জানিয়েছিলেন : 'ঠাকুর হলে যা অন্য কোনো প্রকারে সম্ভার প্রকাশ্যভাবে আমাদের নাই ; কিন্তু আশা করি যে আপনার নাট্যমন্দিরের আঙ্গনে এই হতভাগিনীদিগকে ঘরে বসিয়া কাঁদিবার, নিজ হৃদয়কে নরজন্মু হইয়া আমাদের ঘরে ও দেবতা গিরিশচন্দ্রের উদ্দেশে প্রণাম করিবার অধিকার দিবেন না।' অমৃতলালের সভাপতিত্বে এই সভায় মুক্তাগাছার, চন্দ্রিমুখী, অমরসুন্দরী, নরীসুন্দরী ও নরেন্দ্রনাথ সহকারে অভিনেতা-অভিনেত্রীগণ গান করেছিলেন। সভাশেষে প্রশ্ন জাগে, তাঁর 'প্রথমা ও প্রধানা ছাত্রী বলিয়া এক সময়ে নাট্যজগতে' যাঁর গৌরব ছিল সেই বিনোদিনী দাসীর নিয়ে তাঁর অবশ্য প্রয়াণ কী অভিপ্রায়ে ঘৈরি করেছিল। প্রায় পঁচিশ বছর আগে তিনি রঙ্গালয়ের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করে আত্মনির্বাসন গ্রহণ করেছিলেন—তিনি গার্হস্থ্যজীবনে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন তাঁর শিক্ষাগুরু ও সমাজতান্ত্রিক প্রেমী অভিনেতা গিরিশচন্দ্র বিনোদিনীর 'আত্মকথা'র জন্য সমাজ-জীবন সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে আর একটি 'কুড়িয়া' লিখে গেলেন। গিরিশচন্দ্র যে কয়েকটি কবিতা প্রয়াণ করতে ইচ্ছুক হয়েছিলেন এমনকী স্টার থিয়েটারের মুখোপাধ্যায় অমৃতলাল বসুর অনুরোধের তিনি নিজের আত্মজীবনী লিখতে নিজ প্রয়াস করেছেন। তিনি বিনোদিনীর 'আত্মকথা'র জন্য যে ভূমিকা হয়েছিলেন তাতে স্পষ্টই বলেছিলেন 'পৃথিবীতে যত প্রকার কঠিন কার্য আছে, তাহাদের আপনার কথা আপনি বলিতে যাওয়া কঠিন কার্য। অনেক সময়ে প্রকৃত ঘটনারও ভ্রম বলিয়া পরিদৃষ্টিত হয় ; বহুদর্শীর অভিরঞ্জিত জ্ঞান হয় ; এবং সমস্তটাই আত্মশ্লাঘা পরিচয়—এইরূপ পাঠকের মনে ধারণা জন্মিবার সম্ভাবনা। এরূপ হইবার কারণ বিস্তর। অনেক সময় আপনি আপনার দোষ দেখা যায় না এবং আত্মদোষ দর্শনও অনেক সময়ে ঈশ্বরের নিয়মাধীনে অন্ধত্বে নিজ অঙ্গের দোষ দিবার ন্যায় ওতপ্রোতভাবে রহিয়া থাকে। তাহার পর ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্র অনুভবগুলি ভ্রম কি ?' তবু একটি, 'স্টার' থিয়েটারের উদ্বোধন-পরবের ইতিহাসের সর্বপ্রথমে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়টি তাঁর আত্মকথায় আলোকিত হতে পারত।

নটী বিনোদিনী ও স্টার থিয়েটার

লেখা দে

বাংলার রঙ্গমঞ্চের একেবারে আদিপর্বে নটী বিনোদিনী বা বিনোদিনী দাসীর আগমন। রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ে এসেছিলেন তাঁর ৯/১০ বছর বয়সে। আজ থেকে প্রায় ৬৮ বছর আগে তাঁর শতবর্ষপূর্তিও হয়ে গেছে। তবে সে উপলক্ষে কোনও উৎসব হয়নি। ইতিহাসের পাতা ওলটালে বোঝা যায় কোনও এক অজ্ঞাত কারণে আমরা নটী বিনোদিনীকে ভুলে থাকি বা সচেতনভাবে ভুলে থাকার চেষ্টা করে চলেছি। অথচ বাংলার পাবলিক থিয়েটার পঠনে সে-যুগে যাঁরা যাঁরা সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে বিনোদিনী শুধু অন্যতমা নয়—প্রধানা বললেও অত্যুক্তি হয় না। স্টার থিয়েটারের জন্ম-বৃত্তান্তেও তাঁর ভূমিকাই অগ্রগণ্য ছিল।

সে-যুগে পেশাদার রঙ্গমঞ্চের ও নটী আন্দোলনের তিনিই ছিলেন শক্তি ও প্রেরণার মূল উৎস। তাঁর অসামান্য অভিনয়-প্রতিভা, অতুলনীয় ত্যাগস্বীকার ও তাঁর চারিত্রিক মহত্ত্ব এবং তাঁর অভিনয়ের বিপুল প্রশস্তির আজও সাক্ষ্য বহন করে চলেছে সমসাময়িক পত্রপত্রিকার পাতাগুলি। তাই নটী বিনোদিনীকে ভুলে যাওয়া বা ভুলে থাকা শুধু সত্যের অপলাপ নয়, একপ্রকার সামাজিক পাপ।

এখানে আর একটি কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে বিনোদিনী শুধু অভিনয়ে পারদর্শিনী ছিলেন না, তিনি সুলেখিকাও। তাঁর রচনাবলী তাঁর অসামান্য সৃজনীশক্তির পরিচয় দেয় এবং যা তৎকালীন যে কোনও প্রখ্যাতা মহিলা কবি বা লেখিকার রচনাবলীর সমপর্যায়ভুক্ত হতে পারে। কেবলমাত্র তাঁর রচিত সঙ্গিতাসঙ্গারও আমাদের কাছে শ্রদ্ধার দাবি রাখতে পারে।

শুধু আত্মজীবনী নয়, কবিতাও লিখেছেন অনেক। কখনও পত্রাকারে কখনও বা নিবন্ধাকারে লিখেছেন নাটক ও রঙ্গালয় সম্পর্কে। তাঁর লেখাগুলি যেমন তথ্যসমৃদ্ধ তেমনই অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধিতেও একনিষ্ঠ। তিনি গীতিকার ও সঙ্গীতশিল্পী। কারণ, অনেকগুলি গান গেয়ে নিজেই গ্রামোফোন রেকর্ডে গেয়েছেন। কাব্যোপন্যাসও রচনা করেছেন। বিশেষ করে তাঁর একমাত্র কন্যা শকুন্তলার মৃত্যুর পর তাঁর কাব্যপ্রতিভার স্ফুরণ ঘটে। তাঁর অভিনয় জীবন মাত্র ১৪ বছর, কিন্তু তাঁর কাব্যচর্চার কাল প্রায় ৪০ বছর। তাঁর আত্মজীবনী থেকে তৎকালীন নাটক ও নাট্যশালার যে ইতিহাস আমরা পাই, তা অত্যন্ত মূল্যবান। কারণ, সেই সময়—বেঙ্গল, গ্রেট ন্যাশনাল, ন্যাশনাল ও স্টার থিয়েটার—এই চারটিতেই বিনোদিনীর অবাধ প্রবেশ ঘটেছিল। মধুসূদন, দীনবন্ধু, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল প্রমুখ সে সময়কার প্রখ্যাত নাট্যকারদের নাটকে অভিনয় করে বিনোদিনী বিরল প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। গিরিশচন্দ্র ছিলেন একাধারে নাট্যকার, নাট্যশিক্ষক ও অভিনেতা। সেকালের অন্যান্য নট এবং নটীদেরও অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। পাওয়া যায় স্টার থিয়েটারের জন্ম-

বৃত্তান্তের পাশাপাশি ইতিহাস। যদিও তাঁর আত্মজীবনী 'আমার কথা' গ্রন্থটিকে নানা দেশের পাশে দেশকালের নাটকসমাজের একটি জীবন্ত দলিল। অন্যদের মতো আত্মজীবনীও।

কিন্তু অন্যদের বিষয় পরবর্তীকালে যাঁরা সে-যুগের চিত্রকল্প বা নাট্য আন্দোলনের উপর পুস্তক রচনা করেছেন তাঁরা প্রায় সবাই বিনোদিনীকে অনুল্লেখ রেখেছেন বা কেউ কেউ খুব যৎসামান্য উল্লেখ করেছেন। যেমন হরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'কলিকাতা নাট্যশালার ইতিহাস' গ্রন্থে বিনোদিনীকে কিছুটা স্পর্শ করে গেছেন মাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বক্তৃতামালার বক্তাগণও তাই। অথচ বিনোদিনী ও স্টার থিয়েটারের অন্ধ-কৃষ্ণদের কথা সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় সুপ্রচুর এবং সেগুলি প্রামাণিক ও তথ্যসমৃদ্ধ। বিনোদিনী অসামান্যা ছিলেন। কেবলমাত্র সেজন্যই কি তাঁকে ও তাঁর প্রতিভাকে সযত্নে পরিহার বা বর্জন করা হয়েছে! বিনোদিনী তাঁর আত্মজীবনীতেও নিজেকে বারবার হীন বারাঙ্গনা বলে ঘোষণা করেছেন। মানতে হীনমন্য করেছেন। কিন্তু আমরা নিশ্চিত সেজন্যেই কেন তাঁকে সত্যের অপলাপ করে চলেছি!

'আমার কথা—বিনোদিনী দাসী' গ্রন্থটি শুধু ঐতিহাসিক দলিল নয়, একটি নিষ্ঠুর জীবনের গভীর মর্মবাণী। বিনোদিনী পড়ুয়া। কিন্তু তাঁর জন্ম সমাজের পাঁকে। সমাজ-কমলটিকে একটি কলিজার আসন ছেড়ার ও বড়ো সমাজের পঙ্কিল আবর্জনা থেকে আলোয় পথে উত্তরণের চেষ্টার আপাতহীন সংগ্রাম—সেজন্যেই নৃশংস মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জন করেছিল। বিশেষ করে তাঁর অভিনয় প্রতিভা তাঁকে কিংবদন্তীর নায়িকাসনে বসিয়ে দিয়েছিল। তাই তাঁর প্রতি সমাজের ও মানুষের বিদ্বেষ এবং ঔদাসীন্যতা খুবই স্বাভাবিক।

চরম বাস্তব আর সমাজের একেবারে নিচুতলার জীবনের সব কিছু প্রতিকূলতা নিয়ে এক সাধারণের বালিকার সংগ্রাম

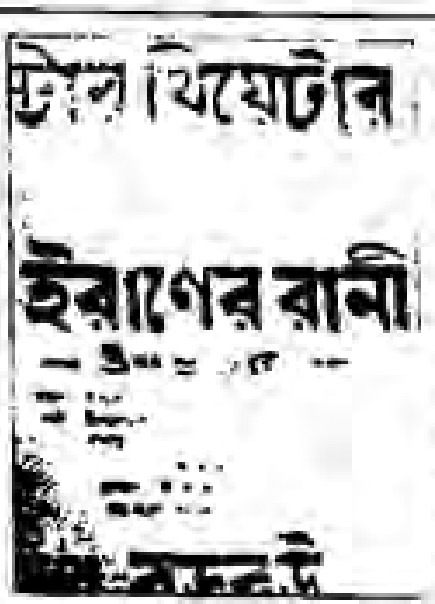

আর তাঁর প্রতি পদক্ষেপে জীবনের নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতাগুলির মোকাবিলা করতে করতে এক-একটি আলোর মোমবাতি উজ্জ্বল হয়েছে নারী জগতের কবি-মহাকবিদের সঙ্গে স্থায়ী শেকড়ের বন্ধনের প্রতিষ্ঠার আলোকপাতে নিজেকে যুক্ত করে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ লড়াইটি পালন করা—যাতে পরে চরম অবহেলা এবং অকৃতজ্ঞতাই পাওনা হয়ে বন্ধুবান্ধব পাড়াপড়শীদের আড়ালে চিরবিদায় নেবার আয়োজন। এই সব নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতাগুলি এক সরলমতি বালিকার জীবনে ঘটেছিল—যা তাঁকে এক পরম সত্যের দিকে নিয়ে গিয়েছিল। আর সেই সত্যেরই অনুসন্ধান করেছেন বিনোদিনী তাঁর আত্মজীবনীর প্রতিটি ছত্রে ছত্রে। তাই বিনোদিনীর আত্মজীবনী এক মহৎ উপন্যাসও বটে।

'চৈতন্যলীলা' নাটকে চৈতন্যের ভূমিকায় বিনোদিনী শুধু আলোর জনয়নে নয়, স্বয়ং ঈশ্বরাংশকৃষ্ণ পরমব্রহ্মদেবের হৃদয়েও আলোড়ন তুলেছিলেন। তিনি তাঁর অভিনয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। 'বিনোদ! তোমার চৈতন্য হোক'—এই আশীর্বাণী বিনোদকে পরবর্তীকালে সত্যই এক চৈতন্যময় জগতে নিয়ে গিয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত তখন অন্তরঙ্গে বিনোদিনী তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের অনুরোধ করেছিলেন। এ সব ঘটনা 'কিনে' হয়ে আছে। বিনোদিনীর প্রতিটি মুহূর্তকথা 'আমার কথা' গ্রন্থের দু'খণ্ডের দুটি সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছিল—যা সমসাময়িকদের তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তার সাক্ষ্য বহন করে। আজকে আমরা নাট্যশালার যে স্বীকৃতিকে নিশ্চিন্তভাবে নেবি, তার নিয়ন্ত্রণে বিনোদিনীর অভিনয়জীবনের উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। শুধু, অনেকগুলি নাটকের বিভিন্নভাবে নায়িকা চরিত্রে বিনোদিনীর প্রতিভাময়ী বিনোদিনী। তাই বিনোদিনী বার বার বলেছেন 'এ কথা বলিতে সঙ্কোচ আসে যে, যদি কখনও কোথাও দুটী হয়, বিনোদিনীর এই ক্ষুদ্র জীবনী আমারই সহিত অন্তর্হিত ও সমাধিস্থ হইবে।' (বিনোদিনীর আত্মজীবনীতে বিভিন্ন ভোগ লিখিত ভূমিকা)।

অভিনয় জগতে অনেক নটী-নটীর জীবনে বিস্ময়কর ট্রাজেডি নেমে আসে সত্য। কারণ অভিনয় জগতি—'ক্ষণকালী অপূর্ব সৃষ্টির মধ্যে'। অভিনয়ের ঘোর নিয়ে প্রতিভা স্ফুরণের একেবারে অবসানের পরে, তাদের কেউ কেউ বিস্মৃতির ও বিস্ময়ের ট্রাজেডি হয়ে থাকেন। কিন্তু বিনোদিনী ব্যতিক্রমী। অভিনয়ের পর তাঁর সেবাধর্মী ও জনকল্যাণে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য পায়।

শুধু বিনোদিনীকে তাঁর যৌবনকালেই অভিনয়ের পাশা সাজ করতে হয়েছিল তখন যেমনভাবে। তাঁর 'পূর্বাভাস' এর কিছু মানুষের অবহেলা ও প্রচণ্ড অপমানের মধ্যে উত্তরিয়েছিল। তাঁর জীবনকালপূর্ণ জন্য জন্ম-লিখিত হয়েছিল। তাঁর অসামান্য অভিনয় প্রতিভা সেকালের বাংলার নাট্যমোদীদের বিমুগ্ধ করে রাখত, শুধু রঙ্গালয় নয়, দেশ ও বিদেশের জমীদার, চিত্রশিল্পক, বিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী ও সাধারণ মানুষেরা মন্ত্রমুগ্ধ থাকত—তাঁকে ভালবেসেই ঘরে ফেরে চলে। সে সময় তাঁর অভিনয় প্রতিভা প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। তাঁর অভিনয় প্রতিভার অসামান্যতা বাংলার রঙ্গমঞ্চে আলোড়নের সৃষ্টি

মুখোপাধ্যায়। বিডি তখন অভিনয়ের বিশ্রামের মুখেই মহা ধুমধামে তখনই তাঁর জীবনে নেমে এল অন্ধকার। মাত্র ২৪ বছরের যৌবনের জগৎ থেকে চিরদিনের বিদায়। কিন্তু কেন ?

তার ইতিহাস খুঁজতে গেলে পাওয়া যাবে সে সময়কার পত্র-পত্রিকাগুলিতে। তার পরবর্তী জীবনে বিনোদিনীর নিজের লেখা বা তাঁর আত্মজীবনী 'আমার কথা'-এ পূর্ণাঙ্গভাবে কিছু আলোচনার কথা নয়।

বিনোদিনীর জন্ম ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা অঞ্চলের এক সম্ভ্রান্তবংশীয় নামে ১৪৪ নম্বর কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের একটি খোলার বাড়িতে। বাড়িটি ছিল তাঁর মাতামহীর। আরও অনেকগুলি খুপরি ঘরে অনেক ভাড়াটে ছিল। তাদের টাকাতেই তাঁদের জীবিকা নির্বাহ হত। তাঁর একজন মাসি, মামা ও মাতামহীকে নিয়ে চারজনের সংসার। বিনোদিনী তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন 'কিন্তু আমাদের জ্ঞানের সহিত আমাদের শরীর, দুঃখ বাড়িতে লাগিল, তখন আমার মাতামহী একটি মাঝারিগোছ আড়াই বৎসর বয়সের ছলিকার সহিত আমার পঞ্চমবর্ষীয় শিশু ভ্রাতার বিবাহ দিয়া তাঁহার আত্মার স্বর্গারোহণ, অনন্তযাত্রায় যাত্রা করিলেন। তখন অনন্তার বিক্রয়ে আমাদের জীবিকা চলিতে লাগিল। অবশ্য, ইহার আগেই মাতামহীর ও মাতামহকুলদীপের আয়ু কিছু ছিল, তাহা সমাপ্তই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল।'

সুতরাং বিনোদিনীদের সংসারে যে দারিদ্র ও অভাব নিত্যসঙ্গী—এর আভাস পাওয়া যায়। তাঁর এই অসীম প্রতিভার মূল্যও ঘটে অতি অল্প বয়সে এক সাহেব থিয়েটারওয়ালার প্রথম দিনে থিয়েটারে। তাদেরই আগামী সাফল্যের পরিমণ্ডলায় তাদের বিনোদিনীর জন্ম। তাই তাঁর পারিপার্শ্বিক পরিবেশও ছিল পরিপন্থীর। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন : "...ঘুরে ঘুরে পরিচয়ায়, কেননা, অতি সন্তর্পণে হইতে আমাদের বাটীর ভাড়াটিয়াদের প্রকৃত-সম্বন্ধের প্রতি কেহ একটা বিদ্রূপ দিলেও আমাদের খোলার ঘরে ভাড়াটিয়া ছিল ; তাহারা বলিত নিশ্চয়ই স্ত্রী-পুরুষ নহে, তবুও স্ত্রী-পুরুষের ন্যায় ঘর-সংসার করিত ; নিত্য আমিত্ব নিত্য করিত এবং সময়ে সময়ে এমন মারামারি করিত যে দেখিলে বোধ হইত বুঝি আর তাহাদের জীবনও রক্ষা পাইবে না। কিন্তু দেখিতাম যে পরক্ষণেই পুনরায় উহারা জড়াজড়ি হাস্য-পরিহাস করিত। প্রতি রবিবার তখন প্রতিবেশ বালিকা ছিলাম, কিন্তু তাহাদের ব্যবহার দেখিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যাইতাম। মনে হইত, আমি যেন কখনও এরূপ দুর্দান্ত হইব না। তখন জানি না যে আমার জন্মান্তরের আমার মাতার উপর অত্যাচার সকলের করিয়া আসিয়াছেন।'

বিনোদিনী তাঁর নিজের বিষয় সম্বন্ধে আত্মজীবনীতে লিখেছেন : 'ওভিয়াদি অন্নদাতার বিষয় হইয়াছিল এবং এ কথাও মনে হয়ে পড়ে যে আমার অপেক্ষা বিদ্যিৎ বড় একটি সুন্দর বালক ও আমার ভ্রাতা, বালিকা প্রতিবেশী আর আর প্রতিবেশিনী বালিকা মিলিয়া আমরা একত্রে খেলা করিতাম। সকলে বলিত যে সুন্দর বালকটি আমার বর। কিন্তু কিছুদিন পরে আর তাহাকে দেখিতে পাই নাই। শুনিলাম যে তাহার একজন আত্মীয়ারি ছিলেন ; তিনিই আমার স্বামীকে লইয়া গিয়াছিলেন, আর আসিতে দেন নাই। সেই অবধি আর তাহাকে দেখিতে পাই নাই। লোক পরম্পরায় শুনিয়াছি যে তিনি বিবাহাদি করিয়া সংসার করিতেছেন।'

বিনোদিনীর বাড়িতে একজন হাবীজী ভাড়াটে ছিল। নাম নফরদাস। এঁর সঙ্গে তাঁর ভালবাসাই সম্বন্ধ জন্মায়। পরম্পর 'গোলাপ ফুল' পাতান। এঁর আসেই ৭/৮ বছর বয়সে বিনোদিনীর সঙ্গীতশিক্ষার শুরু। পরবর্তীকালে গঙ্গাবাসী সঙ্গীত থিয়েটারের প্রসিদ্ধ গায়িকা ও অভিনেত্রী হয়েছিলেন।

এই গায়িকার ঘরে যান গুরুর অন্নদাদের বন্ধু পুরবিহারী মুখোপাধ্যায় ও প্রসন্নকুমার সেন। এঁদেরই সহায়তায় তখ টাকা মাইনের ন্যাশনাল থিয়েটারে বিনোদিনী ভর্তি হন। তখন অন্নদাদার ঘরে দুটি থিয়েটার ছিল—একটি দুঃখদায়ক বিনোদিনীর ন্যাশনাল থিয়েটার এবং দ্বিতীয়টি পরবর্তীকালে কেয়ের বেঙ্গল থিয়েটার। বিনোদিনীর প্রথম রজনীর প্রবেশ 'দেবী সহায়' নাটকে দ্রৌপদীর সখীর একটি ক্ষুদ্র ভূমিকায়। তখন তাঁর বয়স ৯/১০ বছর। সেই সময় অন্নদাদার রঙ্গালয়ে প্রায়শঃ বড় অভিনেত্রী ছিলেন—রাজা (রাজকুমারী), কেত্রমণি, লক্ষ্মী ও নারায়ণী।

প্রথম দিনের অভিনয়ের অভিজ্ঞতা পরে বিনোদিনী আত্মজীবনীতে লিখেছেন 'সেই সকল উজ্জ্বল আলোকমালা, সহস্র সহস্র লোকের উৎসাহপূর্ণ দৃষ্টি, এইসব দেখিয়া-শুনিয়া আমার সমস্ত শরীর থরথর করিতে লাগিল, পা দুটির থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, আর চক্ষের উপর সেই সকল উজ্জ্বল মূর্তি যেন ঘোঁয়ার আকার হইয়া গোল পাকিয়া ঘুরিতে লাগিল। ভিতর হইতে অধ্যক্ষেরা আমায় আশ্বাস দিতে লাগিলেন। তার, ভাবনা ও মনের চঞ্চলতার সহিত যেমন একটা ভিতরের আগ্রহও যেন মনের মধ্যে উথলিয়া উঠিতে লাগিল। আমি কেমন করিয়া বলিব ? একে আমি অভিনয়ের বালিকা, তাহাতে পরিবারের জন্য, কখনও এরূপ সমারোহে মুখে বাহির হয়ে বা কার্য করিতে পারি নাই। বক্ষস্থলে অত্যন্ত সাহসে মুখে অভিনয়ের ভয় পরিচালে হইতেছে বুঝিতে পারিলাম, আমিও ভয়ে ভয়ে ভগবানকে স্মরণ করিয়া, যে কথাটি কথা বলিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলাম, প্রাণপণ বলে তাঁহাদের শিক্ষানুযায়ী সুরসহকারে ও সেইরূপ ভাবভঙ্গির সহিত বলিয়া চলিয়া আসিলাম। অভিনয়ের সময় সময় দর্শক অভিনন্দনধ্বনি করিয়া করতালি দিতে থাকিলেন। তাহাতে বুঝিলাম, আমার অভিনয় ভালই হইতেছে, আমার তখনও গা কাঁপিতেছিল। ভিতরে আসিয়ে অভ্যক্তরা

করে আসর মাতিয়েছেন। কিন্তু তখন কল্পনাতেও কি তিনি ভাবতে পেরেছিলেন এই নায়ক-নায়িকাদের ভিড়ে একদিন তাঁর নামও লেখা হবে?

১৯৫৮ সালে বুদ্ধদেব গুহ লিখলেন তাঁর প্রথম উপন্যাস 'অন্তরঙ্গ'। ১৯৬০ সালে এই উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত হল ছবি। ছবির নাম 'অন্তরঙ্গ'। পরিচালনায় অজয় কর। ছবিতে নায়ক-নায়িকা ছিলেন উত্তম-সুচিত্রা। ছবিতে সুচিত্রার বোন ছিলেন বিনোদিনী। ছবিতে তাঁর নাম ছিল 'ঝুমুর'। ছবিতে ঝুমুর ছিল চঞ্চল, প্রাণবন্ত, উচ্ছল। ছবিতে ঝুমুরের একটি গান ছিল। গানটি গেয়েছিলেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। গানটি ছিল 'ও আমার চাঁদ বন্ধু রে'। ছবিতে ঝুমুর গানটি গাইছে আর নায়ক উত্তম কুমার তাকে ক্ষেপাচ্ছে। ছবিতে বিনোদিনীর অভিনয় ভালো হয়েছিল। ছবিটি ব্যবসাসফল হয়েছিল।

বিনোদিনী দেবী

১৯৬১ সালে বিনোদিনী অভিনয় করলেন 'সাগরিকা' ছবিতে। ছবির নায়ক উত্তম কুমার। ছবির পরিচালক অজয় কর। ছবিতে বিনোদিনী অভিনয় করেছিলেন নায়িকার বন্ধু 'ঝুমুর'-এর চরিত্রে। ছবিতে ঝুমুর ছিল চঞ্চল, প্রাণবন্ত, উচ্ছল। ছবিতে ঝুমুরের একটি গান ছিল। গানটি গেয়েছিলেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। গানটি ছিল 'ও আমার চাঁদ বন্ধু রে'। ছবিতে ঝুমুর গানটি গাইছে আর নায়ক উত্তম কুমার তাকে ক্ষেপাচ্ছে। ছবিতে বিনোদিনীর অভিনয় ভালো হয়েছিল। ছবিটি ব্যবসাসফল হয়েছিল।

১৯৬২ সালে বিনোদিনী অভিনয় করলেন 'সাগরিকা' ছবিতে। ছবির নায়ক উত্তম কুমার। ছবির পরিচালক অজয় কর। ছবিতে বিনোদিনী অভিনয় করেছিলেন নায়িকার বন্ধু 'ঝুমুর'-এর চরিত্রে। ছবিতে ঝুমুর ছিল চঞ্চল, প্রাণবন্ত, উচ্ছল। ছবিতে ঝুমুরের একটি গান ছিল। গানটি গেয়েছিলেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। গানটি ছিল 'ও আমার চাঁদ বন্ধু রে'। ছবিতে ঝুমুর গানটি গাইছে আর নায়ক উত্তম কুমার তাকে ক্ষেপাচ্ছে। ছবিতে বিনোদিনীর অভিনয় ভালো হয়েছিল। ছবিটি ব্যবসাসফল হয়েছিল।

১৯৬৩ সালে বিনোদিনী অভিনয় করলেন 'সাগরিকা' ছবিতে। ছবির নায়ক উত্তম কুমার। ছবির পরিচালক অজয় কর। ছবিতে বিনোদিনী অভিনয় করেছিলেন নায়িকার বন্ধু 'ঝুমুর'-এর চরিত্রে। ছবিতে ঝুমুর ছিল চঞ্চল, প্রাণবন্ত, উচ্ছল। ছবিতে ঝুমুরের একটি গান ছিল। গানটি গেয়েছিলেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। গানটি ছিল 'ও আমার চাঁদ বন্ধু রে'। ছবিতে ঝুমুর গানটি গাইছে আর নায়ক উত্তম কুমার তাকে ক্ষেপাচ্ছে। ছবিতে বিনোদিনীর অভিনয় ভালো হয়েছিল। ছবিটি ব্যবসাসফল হয়েছিল।

১৯৬৪ সালে বিনোদিনী অভিনয় করলেন 'সাগরিকা' ছবিতে। ছবির নায়ক উত্তম কুমার। ছবির পরিচালক অজয় কর। ছবিতে বিনোদিনী অভিনয় করেছিলেন নায়িকার বন্ধু 'ঝুমুর'-এর চরিত্রে। ছবিতে ঝুমুর ছিল চঞ্চল, প্রাণবন্ত, উচ্ছল। ছবিতে ঝুমুরের একটি গান ছিল। গানটি গেয়েছিলেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। গানটি ছিল 'ও আমার চাঁদ বন্ধু রে'। ছবিতে ঝুমুর গানটি গাইছে আর নায়ক উত্তম কুমার তাকে ক্ষেপাচ্ছে। ছবিতে বিনোদিনীর অভিনয় ভালো হয়েছিল। ছবিটি ব্যবসাসফল হয়েছিল।

১৯৬৫ সালে বিনোদিনী অভিনয় করলেন 'সাগরিকা' ছবিতে। ছবির নায়ক উত্তম কুমার। ছবির পরিচালক অজয় কর। ছবিতে বিনোদিনী অভিনয় করেছিলেন নায়িকার বন্ধু 'ঝুমুর'-এর চরিত্রে। ছবিতে ঝুমুর ছিল চঞ্চল, প্রাণবন্ত, উচ্ছল। ছবিতে ঝুমুরের একটি গান ছিল। গানটি গেয়েছিলেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। গানটি ছিল 'ও আমার চাঁদ বন্ধু রে'। ছবিতে ঝুমুর গানটি গাইছে আর নায়ক উত্তম কুমার তাকে ক্ষেপাচ্ছে। ছবিতে বিনোদিনীর অভিনয় ভালো হয়েছিল। ছবিটি ব্যবসাসফল হয়েছিল।

১৯৬৬ সালে বিনোদিনী অভিনয় করলেন 'সাগরিকা' ছবিতে। ছবির নায়ক উত্তম কুমার। ছবির পরিচালক অজয় কর। ছবিতে বিনোদিনী অভিনয় করেছিলেন নায়িকার বন্ধু 'ঝুমুর'-এর চরিত্রে। ছবিতে ঝুমুর ছিল চঞ্চল, প্রাণবন্ত, উচ্ছল। ছবিতে ঝুমুরের একটি গান ছিল। গানটি গেয়েছিলেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। গানটি ছিল 'ও আমার চাঁদ বন্ধু রে'। ছবিতে ঝুমুর গানটি গাইছে আর নায়ক উত্তম কুমার তাকে ক্ষেপাচ্ছে। ছবিতে বিনোদিনীর অভিনয় ভালো হয়েছিল। ছবিটি ব্যবসাসফল হয়েছিল।

১৯৬৭ সালে বিনোদিনী অভিনয় করলেন 'সাগরিকা' ছবিতে। ছবির নায়ক উত্তম কুমার। ছবির পরিচালক অজয় কর। ছবিতে বিনোদিনী অভিনয় করেছিলেন নায়িকার বন্ধু 'ঝুমুর'-এর চরিত্রে। ছবিতে ঝুমুর ছিল চঞ্চল, প্রাণবন্ত, উচ্ছল। ছবিতে ঝুমুরের একটি গান ছিল। গানটি গেয়েছিলেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। গানটি ছিল 'ও আমার চাঁদ বন্ধু রে'। ছবিতে ঝুমুর গানটি গাইছে আর নায়ক উত্তম কুমার তাকে ক্ষেপাচ্ছে। ছবিতে বিনোদিনীর অভিনয় ভালো হয়েছিল। ছবিটি ব্যবসাসফল হয়েছিল।

১৯৬৮ সালে বিনোদিনী অভিনয় করলেন 'সাগরিকা' ছবিতে। ছবির নায়ক উত্তম কুমার। ছবির পরিচালক অজয় কর। ছবিতে বিনোদিনী অভিনয় করেছিলেন নায়িকার বন্ধু 'ঝুমুর'-এর চরিত্রে। ছবিতে ঝুমুর ছিল চঞ্চল, প্রাণবন্ত, উচ্ছল। ছবিতে ঝুমুরের একটি গান ছিল। গানটি গেয়েছিলেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। গানটি ছিল 'ও আমার চাঁদ বন্ধু রে'। ছবিতে ঝুমুর গানটি গাইছে আর নায়ক উত্তম কুমার তাকে ক্ষেপাচ্ছে। ছবিতে বিনোদিনীর অভিনয় ভালো হয়েছিল। ছবিটি ব্যবসাসফল হয়েছিল।

১৯৬৯ সালে বিনোদিনী অভিনয় করলেন 'সাগরিকা' ছবিতে। ছবির নায়ক উত্তম কুমার। ছবির পরিচালক অজয় কর। ছবিতে বিনোদিনী অভিনয় করেছিলেন নায়িকার বন্ধু 'ঝুমুর'-এর চরিত্রে। ছবিতে ঝুমুর ছিল চঞ্চল, প্রাণবন্ত, উচ্ছল। ছবিতে ঝুমুরের একটি গান ছিল। গানটি গেয়েছিলেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। গানটি ছিল 'ও আমার চাঁদ বন্ধু রে'। ছবিতে ঝুমুর গানটি গাইছে আর নায়ক উত্তম কুমার তাকে ক্ষেপাচ্ছে। ছবিতে বিনোদিনীর অভিনয় ভালো হয়েছিল। ছবিটি ব্যবসাসফল হয়েছিল।

১৯৭০ সালে বিনোদিনী অভিনয় করলেন 'সাগরিকা' ছবিতে। ছবির নায়ক উত্তম কুমার। ছবির পরিচালক অজয় কর। ছবিতে বিনোদিনী অভিনয় করেছিলেন নায়িকার বন্ধু 'ঝুমুর'-এর চরিত্রে। ছবিতে ঝুমুর ছিল চঞ্চল, প্রাণবন্ত, উচ্ছল। ছবিতে ঝুমুরের একটি গান ছিল। গানটি গেয়েছিলেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। গানটি ছিল 'ও আমার চাঁদ বন্ধু রে'। ছবিতে ঝুমুর গানটি গাইছে আর নায়ক উত্তম কুমার তাকে ক্ষেপাচ্ছে। ছবিতে বিনোদিনীর অভিনয় ভালো হয়েছিল। ছবিটি ব্যবসাসফল হয়েছিল।

১৯৭১ সালে বিনোদিনী অভিনয় করলেন 'সাগরিকা' ছবিতে। ছবির নায়ক উত্তম কুমার। ছবির পরিচালক অজয় কর। ছবিতে বিনোদিনী অভিনয় করেছিলেন নায়িকার বন্ধু 'ঝুমুর'-এর চরিত্রে। ছবিতে ঝুমুর ছিল চঞ্চল, প্রাণবন্ত, উচ্ছল। ছবিতে ঝুমুরের একটি গান ছিল। গানটি গেয়েছিলেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। গানটি ছিল 'ও আমার চাঁদ বন্ধু রে'। ছবিতে ঝুমুর গানটি গাইছে আর নায়ক উত্তম কুমার তাকে ক্ষেপাচ্ছে। ছবিতে বিনোদিনীর অভিনয় ভালো হয়েছিল। ছবিটি ব্যবসাসফল হয়েছিল।

১৯৭২ সালে বিনোদিনী অভিনয় করলেন 'সাগরিকা' ছবিতে। ছবির নায়ক উত্তম কুমার। ছবির পরিচালক অজয় কর। ছবিতে বিনোদিনী অভিনয় করেছিলেন নায়িকার বন্ধু 'ঝুমুর'-এর চরিত্রে। ছবিতে ঝুমুর ছিল চঞ্চল, প্রাণবন্ত, উচ্ছল। ছবিতে ঝুমুরের একটি গান ছিল। গানটি গেয়েছিলেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। গানটি ছিল 'ও আমার চাঁদ বন্ধু রে'। ছবিতে ঝুমুর গানটি গাইছে আর নায়ক উত্তম কুমার তাকে ক্ষেপাচ্ছে। ছবিতে বিনোদিনীর অভিনয় ভালো হয়েছিল। ছবিটি ব্যবসাসফল হয়েছিল।

১৯৭৩ সালে বিনোদিনী অভিনয় করলেন 'সাগরিকা' ছবিতে। ছবির নায়ক উত্তম কুমার। ছবির পরিচালক অজয় কর। ছবিতে বিনোদিনী অভিনয় করেছিলেন নায়িকার বন্ধু 'ঝুমুর'-এর চরিত্রে। ছবিতে ঝুমুর ছিল চঞ্চল, প্রাণবন্ত, উচ্ছল। ছবিতে ঝুমুরের একটি গান ছিল। গানটি গেয়েছিলেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। গানটি ছিল 'ও আমার চাঁদ বন্ধু রে'। ছবিতে ঝুমুর গানটি গাইছে আর নায়ক উত্তম কুমার তাকে ক্ষেপাচ্ছে। ছবিতে বিনোদিনীর অভিনয় ভালো হয়েছিল। ছবিটি ব্যবসাসফল হয়েছিল।

১৯৭৪ সালে বিনোদিনী অভিনয় করলেন 'সাগরিকা' ছবিতে। ছবির নায়ক উত্তম কুমার। ছবির পরিচালক অজয় কর। ছবিতে বিনোদিনী অভিনয় করেছিলেন নায়িকার বন্ধু 'ঝুমুর'-এর চরিত্রে। ছবিতে ঝুমুর ছিল চঞ্চল, প্রাণবন্ত, উচ্ছল। ছবিতে ঝুমুরের একটি গান ছিল। গানটি গেয়েছিলেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। গানটি ছিল 'ও আমার চাঁদ বন্ধু রে'। ছবিতে ঝুমুর গানটি গাইছে আর নায়ক উত্তম কুমার তাকে ক্ষেপাচ্ছে। ছবিতে বিনোদিনীর অভিনয় ভালো হয়েছিল। ছবিটি ব্যবসাসফল হয়েছিল।

১৯৭৫ সালে বিনোদিনী অভিনয় করলেন 'সাগরিকা' ছবিতে। ছবির নায়ক উত্তম কুমার। ছবির পরিচালক অজয় কর। ছবিতে বিনোদিনী অভিনয় করেছিলেন নায়িকার বন্ধু 'ঝুমুর'-এর চরিত্রে। ছবিতে ঝুমুর ছিল চঞ্চল, প্রাণবন্ত, উচ্ছল। ছবিতে ঝুমুরের একটি গান ছিল। গানটি গেয়েছিলেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। গানটি ছিল 'ও আমার চাঁদ বন্ধু রে'। ছবিতে ঝুমুর গানটি গাইছে আর নায়ক উত্তম কুমার তাকে ক্ষেপাচ্ছে। ছবিতে বিনোদিনীর অভিনয় ভালো হয়েছিল। ছবিটি ব্যবসাসফল হয়েছিল।

১৯৭৬ সালে বিনোদিনী অভিনয় করলেন 'সাগরিকা' ছবিতে। ছবির নায়ক উত্তম কুমার। ছবির পরিচালক অজয় কর। ছবিতে বিনোদিনী অভিনয় করেছিলেন নায়িকার বন্ধু 'ঝুমুর'-এর চরিত্রে। ছবিতে ঝুমুর ছিল চঞ্চল, প্রাণবন্ত, উচ্ছল। ছবিতে ঝুমুরের একটি গান ছিল। গানটি গেয়েছিলেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। গানটি ছিল 'ও আমার চাঁদ বন্ধু রে'। ছবিতে ঝুমুর গানটি গাইছে আর নায়ক উত্তম কুমার তাকে ক্ষেপাচ্ছে। ছবিতে বিনোদিনীর অভিনয় ভালো হয়েছিল। ছবিটি ব্যবসাসফল হয়েছিল।

১৯৭৭ সালে বিনোদিনী অভিনয় করলেন 'সাগরিকা' ছবিতে। ছবির নায়ক উত্তম কুমার। ছবির পরিচালক অজয় কর। ছবিতে বিনোদিনী অভিনয় করেছিলেন নায়িকার বন্ধু 'ঝুমুর'-এর চরিত্রে। ছবিতে ঝুমুর ছিল চঞ্চল, প্রাণবন্ত, উচ্ছল। ছবিতে ঝুমুরের একটি গান ছিল। গানটি গেয়েছিলেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। গানটি ছিল 'ও আমার চাঁদ বন্ধু রে'। ছবিতে ঝুমুর গানটি গাইছে আর নায়ক উত্তম কুমার তাকে ক্ষেপাচ্ছে। ছবিতে বিনোদিনীর অভিনয় ভালো হয়েছিল। ছবিটি ব্যবসাসফল হয়েছিল।

১৯৭৮ সালে বিনোদিনী অভিনয় করলেন 'সাগরিকা' ছবিতে। ছবির নায়ক উত্তম কুমার। ছবির পরিচালক অজয় কর। ছবিতে বিনোদিনী অভিনয় করেছিলেন নায়িকার বন্ধু 'ঝুমুর'-এর চরিত্রে। ছবিতে ঝুমুর ছিল চঞ্চল, প্রাণবন্ত, উচ্ছল। ছবিতে ঝুমুরের একটি গান ছিল। গানটি গেয়েছিলেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। গানটি ছিল 'ও আমার চাঁদ বন্ধু রে'। ছবিতে ঝুমুর গানটি গাইছে আর নায়ক উত্তম কুমার তাকে ক্ষেপাচ্ছে। ছবিতে বিনোদিনীর অভিনয় ভালো হয়েছিল। ছবিটি ব্যবসাসফল হয়েছিল।

১৯৭৯ সালে বিনোদিনী অভিনয় করলেন 'সাগরিকা' ছবিতে। ছবির নায়ক উত্তম কুমার। ছবির পরিচালক অজয় কর। ছবিতে বিনোদিনী অভিনয় করেছিলেন নায়িকার বন্ধু 'ঝুমুর'-এর চরিত্রে। ছবিতে ঝুমুর ছিল চঞ্চল, প্রাণবন্ত, উচ্ছল। ছবিতে ঝুমুরের একটি গান ছিল। গানটি গেয়েছিলেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। গানটি ছিল 'ও আমার চাঁদ বন্ধু রে'। ছবিতে ঝুমুর গানটি গাইছে আর নায়ক উত্তম কুমার তাকে ক্ষেপাচ্ছে। ছবিতে বিনোদিনীর অভিনয় ভালো হয়েছিল। ছবিটি ব্যবসাসফল হয়েছিল।

১৯৮০ সালে বিনোদিনী অভিনয় করলেন 'সাগরিকা' ছবিতে। ছবির নায়ক উত্তম কুমার। ছবির পরিচালক অজয় কর। ছবিতে বিনোদিনী অভিনয় করেছিলেন নায়িকার বন্ধু 'ঝুমুর'-এর চরিত্রে। ছবিতে ঝুমুর ছিল চঞ্চল, প্রাণবন্ত, উচ্ছল। ছবিতে ঝুমুরের একটি গান ছিল। গানটি গেয়েছিলেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। গানটি ছিল 'ও আমার চাঁদ বন্ধু রে'। ছবিতে ঝুমুর গানটি গাইছে আর নায়ক উত্তম কুমার তাকে ক্ষেপাচ্ছে। ছবিতে বিনোদিনীর অভিনয় ভালো হয়েছিল। ছবিটি ব্যবসাসফল হয়েছিল।

পুরোহিতের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। সিরিল থেসে হয়েছেন থেসেনাক্স-এর রাজা। 'মুখার্জি'জ'-এর নির্মলবাবু পশুপতি, নিয়েছেন মহেশ্বরের। 'মুখার্জি-নিবাসী'তে নির্মলবাবু জগৎ, জিনার আংকেল। 'রিয়ারসুইজ'—নির্মলবাবু নগেন্দ্রনাথ ও বিনোদ মুখার্জি, 'নবাবীর যুদ্ধে' নির্মলবাবু প্রতিব, বিনোদিনী কুটুমিয়া, অদ্ভুত ছিল জগৎ সেঠ ও বাসবিহারী বসুর ভূমিকা।

নির্মলবাবুর অভিনয় দেখবার মতন ছিল। অভিনয়। শুধু বেশি নয়, নির্মলবাবু যে নাটক নিয়ে পড়ে থাকতেন ও অবশ্যই অভিনয় করে দেখাতেন, মিলিয়ে, বারবেন, খোঁজ নেবেন—এ তিনি করতেন না। শুধু অভিনয় নয়, পরিচালনাতেও বিনোদিনীর নৈপুণ্য ছিল যথেষ্ট। যা আজকাল এযুগে অনুকরণ হয়ে চলেছে। সম্ভবত 'শিবাজী' অভিনয়ের বেলাতেও ছিল তাঁর মনন। তিনি নাটক-হয়তো-কেন অভিনয়ের অভিনেত্রী। তখন ষ্টাজের জন্যে বিশেষ কোনও আদর্শ ছিল না। তাই বিনোদিনী তাঁর প্রতিভায় নব নব পন্থা আবিষ্কার করেছেন। এই জন্য তিনি অনেক বিদেশি থিয়েটারের রীতি ও শৈলীর চিত্রকলার নৈপুণ্য অনুসরণে ও অনুকরণে করেছেন এবং প্রচলন করেছেন।

বিনোদিনী তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন: "নির্মলবাবু যেমনভাবে শিক্ষা ও সাহায্য করেছিলেন তার উপরেও যদি কখন কোনো অভিনয়ের জন্য পীড়াপীড়ি হতো আমায় তাহা হইত না যে আমি জানা নেই। আমি যে ভূমিকা লইয়াছি আমি যেন নিজেই সেই ভূমিকা। আর শেষ হইয়া গেলে আমার চমক ভাঙ্গিত। আমার এইরূপ কাহাকে উৎসাহ ও যত্ন দেখিয়া বন্ধুবান্ধবের কর্তৃপক্ষীয়েরা আমার বাড়ীতে রাত্রিতে থিয়েটারে ও অভিনয় দেখাইবার নিমন্ত্রণ করিতেন। কেহ বা জানায় নাই, কেহ বা ডাকিয়া নাই, কেহ বা সঙ্কীর্ণ নাম আমার অভিনয় দেখিতেন। অভিনয় উপলক্ষে ঘরে ও বাহিরে তাঁহাদের উপর প্রথম দেখার অত্যাচার করিয়াম।

নিজের চরিত্রিক দীনতাকেও তিনি তাঁর লিখিত জীবনীতে এই সময়ে নানাবকমের ইতরামির অভিনয় করা আমার জন্য যেমন উৎসাহিত হইতে লাগিল, তেমনি নাচগান প্রযোজনের আকাঙ্ক্ষায় অস্থির হইয়া সময়ে সময়ে অস্থির হইবার উপক্রম হইত। তবুও নাচগানের আকর্ষণে করিতাম। বৃদ্ধির দোষে ও অদৃষ্টের ফেরে আত্মরক্ষা না করিলেও কখনও অভিনয়কার্যে অযোগ্যা হই নাই। অযোগ্যা হইবার ক্ষমতাও ছিল না। অভিনয়ই আমার জীবনের সার সম্পদ ছিল।

নাসরিন তার সংগ্রামের জন্য নয় সর্বক্ষণ মনকে নিজ হাতের অভি অঙ্কনায় ব্যস্ত রাখে, অঙ্কনার চিত্রের আকৃতিমাঙ্কন করিতে পারিয়াম, সেইজন্য বোধ হয় আমি যখন যে পার্ট অভিনয় করিয়াম, তাহার প্রতিপক্ষ ভাবের আমার হইত না।

বহু বছিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একবার 'মৃণালিনী' দেখতে এসেছিলেন। বিনোদিনী 'মনোরমা' চরিত্রের অভিনয় দেখে অভিভূত হয়েছিলেন। "আমি মনোরমার চরিত্র পুস্তকেই লিখিয়াছিলাম, কখনও যে ইহা প্রত্যক্ষ দেখিব তাহা মনে ছিল না, আজ মনোরমাকে দেখিয়া আমার মনে হইল যে আমার মনোরমাকে সাক্ষাৎ দেখিয়াছি।"

বিনোদিনী বাস্তবসম্মত। নিরক্ষর অভিনেতা। তাঁর পর্যবেক্ষণ ব্যাপারিক। তিনি দেখে নিয়েছিলেন এক সপ্তাহ দুবলের আক্রমণে ছিলেন। দুবলটি অভিনয়ক্ষম ছিল। পরে কিছুদিন একসঙ্গে তাঁর সঙ্গে বিনোদের কথাকথি চলে। এ সময় সময়ে তত্ত্বাবধান তার নায়ক এক অভিনয় এগিয়ে আসেন একটি নতুন থিয়েটার করবার জন্যে। নির্মলবাবুসহ অন্যান্য অভিনেতারা বিনোদিনীকে অভিনয়ের অনুরোধ করেন তত্ত্বাবধান তাঁকে খুশি করে অভিনয়ের করতে। কারণ, একটি নতুন থিয়েটার হলে বাঙ্গালীর অভিনেতারা এক নতুন দিগন্তের সূচনা হবে। বিনোদিনীর জীবনেও আসবে পরম সার্থকতা। আগের দুবলের অন্যায় ভাগ করে পুনরায় তত্ত্বাবধান তাদের অভিনয় প্রদর্শন করার ব্যাপারে বিনোদিনীর প্রতিভাকে ভয় পাওয়ার হলেও তাঁকে তা ভয়ে হয়েছিল। কারণ, তখন বিনোদিনীও বহু দেখেছিলেন একটি নতুন থিয়েটার হলে এবং তা হবে তাঁরই নামাঙ্কিত। সেইজন্য আত্মজীবনী বিনোদকে দেওয়া হয়েছিল।

এ ব্যাপারে বিনোদিনী তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন "এদের আমার পরিবারে করিয়া তাদের আত্মীয় করিয়া তাদের জন্য প্রাণপণ চিন্তা করিতাম এ অবস্থা আমার বড় চঞ্চল ও বাধিত করিয়াছিল। হয়তো লোকে শুনিয়া হাসিবেন যে আমারও আবার ভালবাসা, প্রত্যাশার বোধ বা বেদনা আছে! যদি স্থিরচিত্তে অভিনেত্রী অন্য হইলে বুঝিতেন যে আমারও হৃদয়ী। এ সংসারে যখন ঈশ্বর আমাদের পাঠাইয়াছিলেন তখন নারী হৃদয়ের সকল কোমলতায় হেয় বঞ্চিত করিয়া পাঠান নাই। সকলেই মিয়াইবেন, ভালবাসাতে সকলেই প্রার্থীযাছি; কিন্তু ইহাতে কি আমাদের দাবির কিছুই নাই, যে কোমলতায় একদিন হৃদয় পূর্ণ ছিল তাহা একেবারে নির্মূল হয় না, তাহার প্রমাণ সন্ধান পালন করা। পরিপ্রেক্ষ সব আমাদেরও আছে, কিন্তু কোথায় পাইব? তে আমাদের হৃদয়ের পরিবর্তে হৃদয় দান করিবে? ভালবাসা অনিচ্ছা প্রেমকথা বলিয়া মনোমুগ্ধ করিবার আমার নাই, কিন্তু কে হৃদয় দিয়া পরীক্ষা করিতে চায় যে আমাদের হৃদয় আছে? আমরা প্রথমে প্রত্যাখ্যা করিয়াছি, কি প্রত্যাশিতা হইয়া প্রত্যাহত নিশিয়াছি, কেহ কি তাহার অনুসন্ধান করিয়াছেন?"

যাই হোক নতুন থিয়েটারের কাজ এগিয়ে চলল। ভিডন স্ট্রিটে প্রিয় বিনোদ জায়গা নিজ নেওয়া হল। কিন্তু তত্ত্বাবধান তার আরও টাকা দিতে নারাজ হলেন। কারণ, তাঁর ইচ্ছা বিনোদিনীকে একমাসীন পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে তাঁকে বলে অন্য। কিন্তু বিনোদিনী ও নির্মলবাবুর চেষ্টায় নতুন থিয়েটারের স্বত্ব। বিনোদিনী আরাধনা হলেও অর্থলক্ষ টাকার মোহ সংবরণ করেন।

বিনোদিনী তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন : 'আমি স্থির করিলাম থিয়েটার করিব। থিয়েটারে যখন প্রস্তাব করি তখন আমি গোপনেরই উদ্যোগ করা হইল না। হরদম আমারই উদ্যোগে বিডন স্ট্রীটে জমি কিনা দেওয়া হইল এবং থিয়েটার প্রস্তুতের কথা চতুর্দিক রাষ্ট্র হইবার পূর্বেই বাগবাজারে ভাড়া বাড়ি লইয়া রিহার্সাল আরম্ভ হইল, তখন একে একে সব নূতন পুরাতন এক্টার-এক্ট্রেস আসিয়া যোগ দিতে লাগিলেন। গিরিশবাবু মহাশয় ম্যানেজার ও অধ্যক্ষের হইলেন এবং বই লিখিতে আরম্ভ করিলেন।

এখানে বলাই বাহুল্য যে, বিনোদিনী গিরিশবাবুসহ সকলেই নাচনোল থিয়েটার ত্যাগ করেছিলেন। এর পর বিনোদিনীর জীবনের সেই চরম অন্তরঙ্গ মুহূর্ত এগিয়ে এল। চরম আঘাত। যে আঘাতে তাঁর সরল নারী হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় এবং অভিনয় জগৎ থেকে যেন চির-নির্বাসন।

নারী বিনোদিনী একটি যুগে বিভোর। তাঁর জীবনের একমাত্র ভক্ত—যাঁর কাছে বিনোদিনীর ঋণের শেষ নেই—সেই গিরিশবাবুসহ সকলেই বিনোদিনীকে যে যুগে বিভোর করে রেখেছে, তা এই : 'এই যে থিয়েটার হাউস হইবে, ইহা তোমার নামের সহিত যোগ থাকিবে। তাহা হইলে তোমার মৃত্যুর পরও তোমার নামটি বজায় থাকিবে। অর্থাৎ এই থিয়েটারের নাম "বি" থিয়েটার হইবে।' এখানে আরও উল্লেখযোগ্য যে প্রস্তাবে এই নতুন থিয়েটার হাউসটির নাম 'বিনোদিনী' থিয়েটার বলে স্থির হয়। কিন্তু একজন ওয়ালালার সাহেব নাচনোল হলে অনেকদিন সঙ্গীত করে এই থিয়েটারে আসলে তা—এরূপ বিবেচনায় "বি" থিয়েটার নামকরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

অবশেষে থিয়েটার হাউসটির নির্মাণকার্য শেষ হল। রেজিস্ট্রি কাজও শেষ হল। থিয়েটার খুলতে আর সপ্তাহ খানেক বাকি। নতুন পালার প্রস্তুতি পর্বও প্রায় সমাপ্ত। কিন্তু বিনোদিনীর স্বপ্নভঙ্গ হল যখন তিনি জানতে পারলেন নতুন থিয়েটার হাউসটির রেজিস্ট্রিকৃতনামে নামকরণ হয়েছে 'স্টার', 'বি' থিয়েটার নয়। এই 'স্টার' থিয়েটারের জন্মের সঙ্গে বিনোদিনীর স্বপ্নভঙ্গ হয়। তিনি যে নিজের নামাঙ্কিত থিয়েটার হাউসের স্বপ্ন দেখেছিলেন—তা ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

বিনোদিনী

বিনোদিনী তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন : আমি আকাশটি ভিজিলেও অভিনয় যে থিয়েটারের নূতন নাম কি হইবে ? পশুপতিবাবু প্রস্তুতভাবে বলিলেন যে 'স্টার'। এই কথা শুনিয়া আমি হতবুদ্ধির মতো অভিনয় আসনে বসিয়া রহিলাম। যে দুই মিনিট কাল হবে কহিতে পারিলাম না।'

এখানেই শেষ নয়। বিনোদিনী যখন এই নতুন থিয়েটারের একজন বেতনভোগী অভিনেত্রীও না হইতে পারেন—তার জন্যও নানা চক্রান্ত চলতে লাগল। তবু তিনি সব অভিমান, বেদনা দূরে ঠেলে রেখে স্টারে অভিনয় করলেন। প্রথম বই 'দক্ষযজ্ঞ'। বলাই বাহুল্য, গিরিশ ঘোষ রচিত। গিরিশবাবু 'দক্ষ', অমৃত মিত্র 'মহাদেব', ক্ষীরোদবাবু 'ভবানী', বিনোদিনী 'সতী' ও তারাসুন্দরী 'প্রসূতি'—ইত্যাদি।

স্টারের প্রথম দিনের অভিনয়ের বর্ণনা দিয়েছেন বিনোদিনী নিজেই। প্রথম দিনের সে জোয়ারের, সে পড়তায় হেমাঙ্গিনী হলে সব কুলিরা কুলিরা হলে ওঠা দেখিয়া আনন্দের বৃহত্তর ছিহ্নে দুঃখের অবিরাম অশ্রুপাত করিয়াছিল। হলের পার্শ্বের বিনোদবাবুর সেই অকপটচিত্ত হেতুশূন্য হৃদ্‌প্রতিষ্ঠা মূর্তি যখন স্টেজের উপরিস্থিত হইল তখন সমস্তটা চুপ। তারার পর অভিনয় উপলক্ষে, সে রাত্রে সিন্ধির বোল হয়ে যায়। বিনোদবাবু 'দক্ষ', প্রভুর সিদ্ধুর 'ভবানীর' যে একজন বেহারাকে, সে কোন রাত্রে কখন এই ভাঁ তুলিতে শিখিয়ে দ'। 'কে-রে, কে-রে, মাই ও আমার' বলিয়া যখন অমৃত মিত্র স্টেজে নামিয়া হইতেন তখন হেসে হয় সমস্তেরই বুকের ভিতর প্রলিয়া উঠিত। রঙ্গের মুখে খড়ি-দিয়া গুলিয়া যখন মাটী প্রস্তুত হইতে তখন সে রোদ হয় নিজেরেই তুলিতে ইচ্ছা হইত।'

এক সময় স্বপ্নভঙ্গ হয়ে 'স্টার' থিয়েটার ছেড়ে চলে গেলেন। তিনি বিনোদিনীকেই এর স্বত্ব দিয়ে যান, অন্তত অর্ধেক স্বত্ব বিনোদিনীর থাকবে—এটাও স্বপ্নভঙ্গ হয়ে গেছিলেন। কিন্তু গিরিশবাবু যাবার আগে বিনোদিনীর কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন। তিনি বিনোদ ও বিনোদের মাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিশ্চয় করলেন। সেই সময় হরিবাবু, অমৃত মিত্র, ধর্মদাসবাবু, চুনিলাল দত্ত ও অমৃতলাল বসু কিছু কিছু টাকা দিয়ে 'স্টারে'র স্বত্ব কিনে নিলেন।

স্টারে অভিনীত হল 'দক্ষযজ্ঞ', 'চৈতন্যলীলা', 'বিল্বমঙ্গল', 'ঈশা-খাঁ', 'প্রফুল্ল চরিত্র' ইত্যাদি। প্রতিটিই সফল অভিনয়। স্টার থিয়েটারের নাম ছড়িয়ে পড়ল। বিনোদিনীর জীবনে এর পর এল সেই যুগপরিবর্তনী লগ্ন—চৈতন্যলীলা। বিনোদিনীর জীবনে ও স্টার থিয়েটারের ইতিহাসে এই পালা এক জীবন্ত ইতিহাস। এই পালায় অভিনয় করতে বিনোদিনী কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হয়ে প্রায় নিজেই ঘুর্ণিত হয়ে পড়তেন। আসরে নিয়ে তাঁর চৈতন্য আনতে হত। এক সময় তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন 'আনন্দের আবেগে সাজের সেদিন উপস্থিত

ছিলেন, স্বপ্নদিনের পরেই মেয়েদের বিয়ের বিজ্ঞাপিলেন ; অনেক এই রকম অবস্থা শুনিয়া নিরিলবাবু মহাশয়কে বলেন যে 'চল আমি একবার দেখিব।' নিরিলবাবু তাঁহাকে আবার ক্রিনারে লইয়া যাইলেন ; পরে যখন আবার ঠাকুর হইল, আমি দেখিতে পাইলাম, একজন বড় সাহিবরালা সাহেব নিজ ইচ্ছের জন্য পরা আবার জন্মের উপর হইতে পা পর্যন্ত চর্ম চালনা করিতেছেন।'

বিনোদিনীর 'চৈতন্যলীলা'র অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন নবদ্বীপের বিদ্যুৎপ্রতিম পণ্ডিত মধুসূদন গোস্বামী সপ্ততীর্থ, ইনি শ্রীরামকৃষ্ণ। বিনোদিনীও তাঁহাকে আশীর্বাদপত্র দিয়েছিলেন। 'নিমাইসন্ন্যাস' 'চৈতন্যলীলা'র তিনি অভিনয় করেছিলেন।

আরও পরে স্টারে শুরু হয় অমৃতলাল বসুর প্রহসন 'বিবাহ বিভ্রাট'। বিনোদিনী অভিনয় করেছিলেন 'বিনোদিনী আয়াসকুমার' চরিত্রটি। এটিই তাঁর শেষ অভিনয়। স্টার থিয়েটারের ইতিহাস থেকে নটী বিনোদিনী হারিয়ে গেলেন অবলীলে চিরতরে—যার ২৩ বছর বয়সে—যখন তিনি খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা চরম সিদ্ধির লগ্নে। বিনোদিনীর এই আত্ম-অবলুপ্তির পেছনে অনেক কারণ থাকলেও প্রধানত থিয়েটার কর্তৃপক্ষের ছলনা, প্রতারণা—বিশেষ করে স্টার থিয়েটার পরিচালনে তিনি বিশেষভাবে অনেকটা এ হতাশ হয়েছিলেন। বিনোদিনী পরে জানিয়েছেন তাঁর মনে হয়েছে একটি অভিনেত্রী মন আর সেজন্যই পরবর্তীকালে তাঁর লেখনীর মধ্যে বৈরাগ্য, আত্মজিজ্ঞাসা, পরলোকচিন্তা, আত্ম-বিশ্লেষণ ও অনুতাপ যা আত্মজিজ্ঞাসা পরিলক্ষিত হয়। ১৮৮৬ সালে বিনোদিনীর কৃষ্ণলাভ হয়। আর এই বছরেই ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মহাপ্রয়াণ।

বিনোদিনীর ২৪ বছর অভিনয় জীবন। ৪০টির অধিক নাটকে ৮০টির অধিক ভূমিকায় অভিনয় করেছেন তিনি। সমস্তের আলোচনা আজ হবে। সে কারণে জন্য অপেক্ষা করে এ। স্টার থিয়েটারে অভিনেতা-বিনোদনে মুখরিত, সুন্দরে পরিপূর্ণ হয়ে থাকে। কলকাতা পরিচয়ে এই স্টার থিয়েটারের চাকরও একদিন স্তব্ধ হয়ে যায়। পরিচালনার সরকার এই স্তব্ধ স্টার থিয়েটারকে আবার পরমুখর ও পরিমুখর করতে পারেন।

'বিনোদিনী তাঁর ৮৮৭ পৃষ্ঠার এক জায়গায় লিখেছেন : আমার উদ্দেশ্য জগতের প্রয়োজনমতন একটি কন্যা অবতারিকরণে প্রায় হইয়াছিলাম, সে কন্যাটি নাই। এক্ষণে আমার, যত তাহাকে জগৎ পাঠকের নিকিতে তুলিয়াছে। তত প্রকার সাজনা জানিবার ছোট পাই সকলই বিফল। ...জগতের আঁধারকে দেখিয়ে পাই যে আমার সেই প্রকৃতিরূপের জন্য আমি পাগলিনী।

নিরিলচন্দ্র ঘোষ অভিনয় তাঁর 'বঙ্গ'-রহস্যের শ্রীমতী বিনোদিনী' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন : বিনোদিনীর নিকট শুনিয়াছি, তাহার একটি কন্যা সন্তান হয়, সেই কন্যাটিকে শিক্ষাদান করিবে, বিনোদিনীর বড়ই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সে কন্যা দীনদুঃখেরাদুরে—এই অপরিচয়ে কোনও বিদ্যালয়ে পুরীত হয় নাই। আমাদিগকে বিনোদিনী বন্ধু বলিয়া জানিত, কন্যার শিক্ষাপ্রার্থী হইয়া আমাদের অনুমতি-ভিক্ষা করে, কিন্তু আমারা সাহায্য না করিয়া বরং সে কন্যার বিদ্যালয় প্রবেশে আরও প্রমাদ ঘটিয়াছিল।' পরে তাঁর এই শিক্ষকন্যাটির অকাল মৃত্যু ঘটে।

অবশেষে উল্লেখ করেছি বিনোদিনী সুলেখিকা। তাঁর জীবনের প্রায় ৪০ বছর সাহিত্যে সাধনায় কেটেছে। তাঁর ৩৩ বছর বয়সে কলকাতার ১৩০৩ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কনকলতা'। নিজ জীবনীকে উপন্যাসিকৃত। মোট ৪১টি কবিতা এতে সংকলিত হয়েছে। বিনোদিনীর অভিনয় প্রতিভা যেমন ছিল পরমের, তাঁর কবি-প্রতিভাও ছিল তেমনি উপলের। এর পর তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৩১৮ সালে—'কনক ও নলিনী'। এটি কৃষ্ণ ভক্তিগীতিকাব্য। তাঁর নিজের লিখিত কথা শ্রীমতী শকুন্তলা আমির উদ্দেশে উৎসর্গ। আমরা কয়েকটি কবিতার কিছু কিছু অংশ উদ্ধার করছি :

পুরি লো বিদের জ্বালা দিও সবে বাস,
এ সংসারে উদাসিনি কিছুই না হয়।
তবে জেনো দুঃখ তুমি দাও অনিবার।
তুমি মনে হাসে প্রাণে জ্বালা অবিশ্রান্ত॥
('পুরি' কনকলতা থেকে)

জানি হে পুরুষজাতি নিষ্ঠুর-নিদয়
কাকে কবে যায় কাছে
কেন সে তাহার জন্যে
অকারণে কোন কথা প্রাণে নাহি কয়।
যাও তবে ভালবাসা আমার এ নয়॥
(সেজন' কনকলতা : কনক)

সইয়া গোলাপ ফুল দিতে গেনু ঘরে,
ফুলে ধরি তারা পাই, দিব কিনা দিব তাই,
এই কথা বার বার জানিতে কাতরে॥
('জনুরাগ' কনকলতা : কনক)

প্রাণ না চিরকাল থাকে না আমার
আছি প্রফুল্লিত মনে
দিবসে সেবা গগনে
যার তথা বসিতেছে অমল আভাতে॥

দুই দিন পরে তুমি দেখিতে আসায়
হেসার সে প্রথমন
আনন্দে বিদের ঘন
ভরা ফুলে করে পান মধু অবিশ্রান্ত॥

এখন আদরে ঘোরে ঘুরায়ে ঘরেছে,
কালি নাহি তবে মোর
জানিয়ে ছিলাম ভোর
দেখিনি আদর স্নেহে সোহাগে মজেছে
('একটি খেলনা' কনকলতা : কনক)

মেয়ে মেয়ে খেলা করে ঘরে যতুধন
মেয়ে মেয়ে ডাকি নিয়ে, এস মধু বলিয়ে,
ঘুমুক আমার কোল প্রেমিতে মগন।
ওরে মোর পুত্রহারা একমাত্র ধন॥
('ওরে আমার পুত্রি আমিত' কনকলতা : কনক)

আমারে আর ডেকো না পাখি
গভীর আঁধারে তোমারে শুকানো রাতি
গহন কানন মাঝে
তোমা তুমি যাবাইরা বাঁধি
তুমার বিহনে তুমি মোর
নাই তোমা শাখি॥
দিবানিশি কাঁদে দিদি
হৃদয় পিঞ্জরে ;
আজিকে কেন যে পাখি
পেলি তুমি ঠাঁই রে।

(‘তোমা লেগি’ কাব্যগ্রন্থ থেকে)

অবনীন্দ্র চক্রবর্তী সংগৃহীত গীত-সংকলন ‘রেকর্ড-আকাশী’ (২য় সংস্করণ, ১৩৫৮) গ্রন্থে বিনোদিনীর রচিত অনেকগুলি গীতের সন্ধান পাওয়া যায়। রেকর্ডের প্রয়োজনে রেকর্ডে বিনোদিনীর কণ্ঠে ধারণকৃত গান অনেকেই শুনেছেন। তাঁর ধারণকৃত গানের সংখ্যা উল্লেখ নিম্নে

গীতে গীতে কথ কয়।
আমায় গেলেরে নাহী ক আমি গাহারে॥
তরী করে নিলমল, পালভরে উঠে জল,
মাঝখানে তুফানে তরী, কলঙ্ক তোমার॥

(‘আকাশ-আরতী’, গীত বিনোদিনী নাহী)

ছাই না ছাই না ছাই না রে তোর এজন
কথা ভালবাসা।
সিন্ধু সম ভালবাসা বিশ্বতে কি আর
পিপাসা॥
ভালবাসা পাকা খেলা, ভালবাসায় ঘাত
ভেদে না
ভালবাসা খেয়া খেলা, ভাঙাচুরি অবে
আশা॥

(‘আকাশ-দেবতা’ গীত বিনোদিনী নাহী)

তাঁর আত্মজীবনী ‘আমার কথা’ প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায় ১৩১৯ সালে তাঁর ৪৯ বছর বয়সে যখন তিনি ২৪ বছর থিয়েটার থেকে সম্পর্কশূন্য। বিনোদিনী অভিনীত ভূমিকাবলীর একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হল।

১। ‘আরতরঙ্গী’ পত্রিকায় ধারাবাহিক লিখিত আত্মজীবনী। ১২৯৯ সাল, ইং ১৮৯৩।
২। ‘গৌরব’ পত্রিকায় বিভিন্ন রচনা। ১৩০১ সাল।
৩। ‘বাসনা’। ৪১টি কবিতার সংকলন। পৃ ৮৪। মূল্য ।৵ (আট আনা)। উৎসর্গ লিপি জ্ঞাতব্য। ১৩০৩ সাল।
৪। ‘অনল ও অনিলী’। অভিনীতাদের বা রঙ্গোপজীবাদের। ১৩১২ সাল। পৃ ৪৪। মূল্য ।৵ (চার আনা)।
৫। ‘অভিনেত্রীর আত্মকথা’। ‘নাট্যমন্দির’ পত্রিকায় আত্মকথা রচনার সূত্রপাত। অসম্পূর্ণ। ১৩১৭ সাল।
৬। ‘আমার কথা’। প্রথম খণ্ড। প্রথম সংস্করণ, ১৩১৯ সাল। পৃ ।৶+ ১২৪। মূল্য ।৶ (দশ আনা)।
৭। ‘আমার কথা’ বা বিনোদিনীর কথা। নব সংস্করণ, ১৩৫০ সাল। পৃ ১।৶ + ১২৪। মূল্য দশ আনা।
৮। গীত। অবনীন্দ্র চক্রবর্তী সংকলিত ‘রেকর্ড আকাশী’ ২য় সংস্করণ, ১৩৫৮ সাল এবং ‘রেকর্ড সঙ্গীত’ ও ‘গীতার রেকর্ড’ নামে অন্য দুটি গ্রন্থে সংকলিত কয়েকটি গান।
৯। ‘আমার অভিনেত্রী জীবন’। ‘রূপ ও রঙ্গ’ সাপ্তাহিক পত্রিকায় ধারাবাহিক স্মৃতিকথা। অসম্পূর্ণ।

বিনোদিনী অভিনীত নাটক ও চরিত্রের তালিকা

নাটকের নাম	চরিত্র
দেবী চৌধুরাণ	প্রফুল্লমুখী নবী
চোখের বালি	চোখের বালি
প্রফুল্ল নলিনী	নলিনী
বিল্বমঙ্গল	চিন্তামণি
বীরাঙ্গনা	বীরাঙ্গনা
পলাশীর যুদ্ধ	(?)
মেঘনাদ-বধ	(?)
মায়াতরু	(?)
অভিমন্যু বধ	(?)
বিবাহ বিভ্রাট	(?)
বেল্লিক বাজার	(?)

নাটকের নাম	চরিত্র
প্রফুল্ল (দ্বিতীয় অভিনয়)	(?)
নবীন তপস্বিনী	তপস্বিনী
শঙ্করাচার্য	শঙ্করাচার্য
মোহিনী প্রতিমা	(?)
মেঘনাদবধ	বাসন্তী
আলাদীন	ইন্দ্রা
সপ্তমীতে বিসর্জন	সপ্তমী
দোলযাত্রা	(?)
রাজকুমার	(?)
পলাশীর যুদ্ধ	সিরাজদ্দৌলা
চন্দ্রাবলী	চন্দ্রাবলী
আনন্দময়	আনন্দময় কথা নহী
আলমগীর	আলমগীর
আলমগীর	(?)
ভারত মহিলা	(?)
হিমাদ্রি কুসুম	নাম
আনন্দময়	(?)
আলমগীর	(?)
বিল্বমঙ্গল	চিন্তামণি
বীরাঙ্গনা	বীরাঙ্গনা
শঙ্করাচার্য	শঙ্করাচার্য
কপালকুণ্ডলা	কপালকুণ্ডলা, পদ্মাবতী
বিল্বমঙ্গল	চিন্তামণি
রাবণ	সীতা
রাবণ	সতী
মেঘনাদ	সরমা
রামচন্দ্র	সীতা
রাবণ	সরমা
রাবণ	সীতা
রাবণ	সীতা
রাবণ	সীত

স্টার থিয়েটারের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী ও প্রযোজনা

অলকী ভাদুড়ীচৌধুরী

৯৮. বিডন স্ট্রিট (প্রথম পর্ব)

১৮৮৩

২১ জুলাই নকলবধ (নিবিলনাথ ঘোষ, অমৃত মিত্র/বিনোদিনী)
২১ আগস্ট প্রেম চরিত্র (অমৃতলাল, অঘোর পাঠক, বিনোদিনী)
২৯ আগস্ট নগরের কলঙ্ক (নিবিলনাথ ঘোষ)
২৯ সেপ্টেম্বর নীহারে প্রকাশ
২৪ অক্টোবর চোরের উপর বটপাড়ি (অমৃতলাল বসু)
১৫ ডিসেম্বর নল দময়ন্তী (নিবিলনাথ ঘোষ)

১৯শে সেপ্টেম্বর নিউ ওয়ুর্ক থিয়েটার ভেঙে স্টার থিয়েটার নিবিলনাথ অমৃতলাল মিত্র, শরৎচন্দ্র বিদ্যাপতি, হরিপ্রসাদ বসু ও অমৃতলাল বসু।

১৮৮৪

১৯ মার্চ অকালবোধিনী (নিবিলনাথ ঘোষ)
২৮ এপ্রিল কৃষ্ণকুমারী (নিবিলনাথ ঘোষ), ঈশার ফুল, চড়িয়ে পাঁড়ুয়ে (অমৃতলাল বসু)
৭ জুন প্রীতিতে ঢিল (নিবিলনাথ ঘোষ)
২ আগস্ট টৈতন্যলীলা (নিবিলনাথ ঘোষ) অভিনয়ে বিনোদিনী, ললিতাসিনী, কিরণবালা, অমৃতলাল, গঙ্গামণি, নীলমণির ভ্রাতৃবধূ প্রমুখ
৭১ সেপ্টেম্বর প্রীতিসম্মুক্ত উৎসবলীলা হোমেন
৫২ নভেম্বর প্রফুল্ল চরিত্র (নিবিলনাথ ঘোষ) ও বিনয় মিত্রটি (অমৃতলাল বসু)

১৮৮৫

১৩ জানুয়ারি নিমাইসন্ন্যাস (নিবিলনাথ ঘোষ)
৩৩ মার্চ কৃপালিনী (নবীনচন্দ্র নিবিলনাথ ঘোষ)
২৪ এপ্রিল পলাশীর যুদ্ধ (নবীনচন্দ্র নিবিলনাথ)
৩০ মে প্রভাসমিলন (নিবিলনাথ ঘোষ)
১৯ সেপ্টেম্বর বুদ্ধদেব চরিত (নিবিলনাথ ঘোষ), সার এডুইন আর্নল্ড এই নামে হোমেন

১৮৮৬

১৪ জুন বিল্বমঙ্গল ঠাকুর (নিবিলনাথ ঘোষ)
২৬ ডিসেম্বর হোরিখেলা সরকার (নিবিলনাথ ঘোষ)
এই বিনোদিনী অভিনীত শেষ নাটক।

১৮৮৭

২১ মে রূপসনাতন (নিবিলনাথ ঘোষ)
৩১ জুলাই বুদ্ধদেব চরিত ও মোহিনী সরকার
৪ সিপ্টে. বিডন স্ট্রিটে স্টারের শেষ অভিনয় হয়।

৭৯/৩. কর্নওয়ালিস স্ট্রিট (দ্বিতীয় পর্ব)

১৮৮৮

২৪ মে নবীনচন্দ্র (অভিনয়ে অমৃতলাল গঙ্গামণি, অমৃত মিত্র প্রমুখ)

১৮৮৯

২৭ এপ্রিল প্রফুল্ল (নিবিলনাথ ঘোষ), (অভিনয়ে অমৃতলাল, অমৃত মুখোপাধ্যায়, অমৃত মিত্র, কিরণবালা, গঙ্গামণি, তারাসুন্দরী)
৭ সেপ্টেম্বর চৈতন্যলীলা
২৪ ডিসেম্বর হারানিধি (অমৃতলাল বসু)

১৮৯০

১০ জুলাই চণ্ড (নিবিলনাথ ঘোষ/জনীবাবুর প্রথম অভিনয়)
১৩ সেপ্টেম্বর প্রফুল্ল নিবিলনাথ (নিবিলনাথ ঘোষ)
২৭ ডিসেম্বর হরকালা (অমৃতলাল বসু)
২৯ ডিসেম্বর নিমচাঁদ ও মহাপূজা (নিবিলনাথ ঘোষ)

১৮৯১

ফেব্রুয়ারি নিবিলনাথ পাঁড়ে হয়েছেন
২২ মার্চ নাসিরাম দারোগা (অমৃতলাল বসু)
১৩ মে নবীনের অঙ্ক (রামকৃষ্ণ রায়)
২১ আগস্ট : বিলাস
৩ ডিসেম্বর লায়লা-মজনু (রামকৃষ্ণ রায়)
২৪ ডিসেম্বর রাজা বাহাদুর (অমৃতলাল বসু)

১৮৯২

৬ আগস্ট কৃষ্ণবিলাস (প্রথম হিন্দি নাটক)
২৯ অক্টোবর আনারকলি (রামকৃষ্ণ রায়)
২৯ ডিসেম্বর অনাথবন্ধু
২৩ ডিসেম্বর বালাবাবি (অমৃতলাল বসু)

১৮৯৩

২৭ মে রাম অবতার (নিবিলনাথের পীড়ার জন্যবসের হিন্দি উপন্যাস)
২৬ আগস্ট বিলাস ও বিরহ জলন্ত (অমৃতলাল বসু)
২৩ ডিসেম্বর নেপালির জন্যে দুর্গাদাস (রামকৃষ্ণ রায়)

১৮৯৪

১ জানুয়ারি বসু (অমৃতলাল বসু)
৪ আগস্ট অন্নদাপ্রসাদ (বৃন্দাবনচন্দ্র ঘটকিয়া)
৮ সেপ্টেম্বর প্রহ্লাদের (নরেন্দ্রলাল অমৃতলাল বসু)
২৫ ডিসেম্বর এলাবার (অমৃতলাল বসু)

১৮৯৫

১০ জুলাই প্রভুর (নির্মলেন্দু লাহা)
৫ অক্টোবর ঈ-দুষি (বৃন্দাবনচন্দ্র ঘটকিয়া)

১৮৯৬

১১ জানুয়ারি চাকলিয়া (নরেন্দ্রলাল অমৃতলাল বসু)
এপ্রিল মঞ্চে নির্মলেন্দু লাহার কিংবদন্তি
১৬ সেপ্টেম্বর বঙ্গলনায়ক (নির্মলেন্দু লাহা)

১৮৯৭

১ জানুয়ারি হৈচৈ (অমৃতলাল বসু)
২১ জুন ঠিকে ঘুষিরি
১১ সেপ্টেম্বর পাকপ্রভুর
১৮ ডিসেম্বর যাজ্ঞবল্ক্য (নরেন্দ্রলাল নির্মলেন্দু লাহার)

১৮৯৮

১ জানুয়ারি - প্রহসনিকী (অমৃতলাল বসু)
৫৫ নির্মলেন্দু আবার ফাঁদে হাজারন
১০ সেপ্টেম্বর হরিশ্চন্দ্র (অমৃতলাল বসু)
২৯ অক্টোবর বসু (অমৃতলাল বসু) স্যার এডোয়ার্ডের ভ্রমণ

১৮৯৯

২৯ আগস্ট বসন্তসেনা (বৃন্দাবনচন্দ্র ঘটকিয়া)
২০ সেপ্টেম্বর সাধের অটোল (অমৃতলাল বসু)
৪ নভেম্বর বিয়ে (বিজেন্দ্রলাল রায়)

১৯০০

এপ্রিল মঞ্চে স্থান বইটির পরিচালনা ঐতিহাসিক আলোয় সাজানো হয়।
২৮ এপ্রিল অমর দত্ত (অমৃতলাল বসু)
১৪ মে কৃপণের ধন (অমৃতলাল বসু)
২৫ আগস্ট কিংকর্তব্য (রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়)
১০ নভেম্বর চলন্ত পরীক্ষা (মনমোহন বসু)
২৪ ডিসেম্বর ব্রাহ্মণ (বিজেন্দ্রলাল রায়)
২৫ ডিসেম্বর বাসুকী (অমৃতলাল বসু)

১৯০১

১৩ এপ্রিল বিবাহ (নরেন্দ্রলাল অমৃতলাল বসু)
২ নভেম্বর নীলকণ্ঠ (নিশিকান্ত মিত্র)
২৪ ডিসেম্বর অবতার (অমৃতলাল বসু)

১৯০২

১ জানুয়ারি নবজীবন (অমৃতলাল বসু)
১৯ জুলাই সপ্তম প্রহসন (শরৎচন্দ্রলাল বিদ্যাবিনোদ)
৪ অক্টোবর শরদিন্দু (শরৎচন্দ্রলাল বিদ্যাবিনোদ)
২৫ ডিসেম্বর বেহুলা

১৯০৩

১৪ আগস্ট প্রহ্লাদলীলা (শরৎচন্দ্রলাল বিদ্যাবিনোদ) অভিনয়ে অমৃত মিত্র, কালীনাথ চট্টোপাধ্যায়, বরীসুন্দরী, অপর্ণা মুখার্জি, অক্ষয় বোস্টম, ক্ষেত্রমণি প্রমুখ।
২৪ ডিসেম্বর কৃষ্ণার্জুন বিলাস (শরৎচন্দ্রলাল বিদ্যাবিনোদ)

১৯০৪

৩০ সেপ্টেম্বর বঙ্গলক্ষ্মী (শরৎচন্দ্রলাল বিদ্যাবিনোদ)
২৫ ডিসেম্বর সাধের বাইজি (অমৃতলাল বসু)

১৯০৫

এপ্রিল মহাকালী (শরৎচন্দ্রলাল বিদ্যাবিনোদ)
২২ জুলাই বঙ্গ ভঙ্গ (বি এল দাস)
৯ সেপ্টেম্বর বঙ্গবঙ্গ-৭ প্রতিবাদে অভিনয় বন্ধ
২৩ নভেম্বর পরিণয় (শরৎচন্দ্রলাল বিদ্যাবিনোদ)
২৪ ডিসেম্বর সাধের বাইজি (অমৃতলাল বসু)

১৯০৬

৯ জুন ঈশ্বরী (শরৎচন্দ্রলাল বিদ্যাবিনোদ)
৪ আগস্ট পলাশীর প্রতিশোধ
২৩ ডিসেম্বর রক্ত ও রাখী (শরৎচন্দ্রলাল বিদ্যাবিনোদ)

১৯০৭

অমৃতেন্দ্রনাথ বসু স্টারে যোগদান করলেন। অভিনীত হয়ে নরেশ, চন্দ্রশেখর, প্রহ্লাদলীলা, প্রভুর প্রভৃতি পুরনো নাটকগুলি। প্রভুর-৭ পুনরভিনয় উপলক্ষে নির্মলেন্দু লাহাকে স্টারে সম্বর্ধনা।
২৮ আগস্ট নবকুমার (শরৎচন্দ্রলাল বিদ্যাবিনোদ)

১৯০৮

২৫ জুন যৎকিঞ্চিৎ (অমরেন্দ্রনাথ দত্ত)
২৫ আগস্ট এডিটারক্লম (হরিসাধন মুখার্জি, নরেশচন্দ্র অমরেন্দ্রনাথ দত্ত)
২১ নভেম্বর চাকদহের জীবনসন্ধ্যা (অমল বসু, নরীন্দ্র অমরেন্দ্রনাথ দত্ত)
২৫ ডিসেম্বর ভেরা মজুমদার (অমরেন্দ্রনাথ দত্ত)

১৯০৯

ফেব্রুয়ারি ইন্দিরা
৪ জুলাই অবতার (অমরেন্দ্র দেবশর্মা)
২৩ জুলাই কুমুদে কীর্তি (নিত্যানন্দ বিদ্যারত্ন)

১৯১০

১৯ ফেব্রুয়ারি নন্দক (রবীন্দ্রনাথের মুক্তির উপায়ে অবলম্বনে নরেন্দ্রনাথ গৌরীমোহন মুখোপাধ্যায়)
৬ আগস্ট রাণী ভবানী (অমরেন্দ্রনাথ দত্ত)
১১ সেপ্টেম্বর ভক্তরাজুর (কুমুদ বন্দ্যোপাধ্যায়)
১৮ ডিসেম্বর সেকেন্দ্র (হরিসাধন মুখার্জি)

১৯১১

৫৩ এপ্রিল মুকুলমুখ ও নাগেশ্বর (শরৎচন্দ্রলাল)
১১ নভেম্বর সংসার (কুমুদরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়)

১৫ অক্টোবর হরিসাধনের অন্নপ্রাশন (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়)
২৬ ডিসেম্বর জীবন সন্ধ্যায় (নগেন্দ্রনাথ সমাদ্দার)

১৯১২

৯ ফেব্রুয়ারি নির্মলাসুন্দর বসু।
৪৩ মার্চ বালকবন্ধু (অনুরূপা দেবী) অভিনয়ে : অনুরূপা দেবী, সুশীলাসুন্দরী, কুঞ্জ চক্রবর্তী, অমরেন্দ্র দত্ত, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
১৪ জুন অশ্রুকণা (নগেন্দ্রনাথ বসু)
১৭ আগস্ট পরপারে (ডি এল রায়)
১৯ অক্টোবর অমলশিলার (ডি এল রায়)
২৫ ডিসেম্বর কালশিলার (বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়)

১৯১৩

২৯ মার্চ বর্ষা বিদায় (মনমোহন গোস্বামী)
৩ মে বিল্বমঙ্গল (অমরেন্দ্রনাথ দত্ত)। পুরনো নাটক মারফৎ নাম : ভক্তকুলচূড়ামণি, চিন্তামণি, পুণ্যপ্রভাবিণী, নবীন তপস্বিনী, সতী শ্রীবৃন্দাবনী, বিবাহ, জন্ম, ইতিহাস, পঞ্চবরাহ, কুশলিনী, রাণী প্রভৃতি নাটকগুলি মঞ্চের মাঝে অভিনীত হয়
৪ ডিসেম্বর জয়পরাজয় (অমরেন্দ্রনাথ দত্ত)।

১৯১৪

১ জানুয়ারি বারাণসী (বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়)
৩০ মে বঙ্গ রঙ্গালয়ের (অমরেন্দ্রনাথ দত্ত)। অভিনয়ে নবীন (রবীন্দ্রনাথের ভিন্ন নামের নাটকের নাম রসরাজ অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায়)
২৬ ডিসেম্বর অভিমন্যুর চক্রব্যূহ (অমরেন্দ্রনাথ দত্ত)।

১৯১৫

প্রেমের জেলখানা (অমরেন্দ্রনাথ দত্ত)। ফেরোজারি (বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়)।
২৭ ফেব্রুয়ারি কনে বদল (নাটকের সর্বসুন্দরী দেবী
২৭ এপ্রিল বাসর ঘর (ভূপেন বন্দ্যোপাধ্যায়)
২১ আগস্ট ভাঙ্গা চড়কডাঙ্গা (অমরেন্দ্র দেব)
১৮ সেপ্টেম্বর দ্বন্দ্ব উপেন্দ্রলাল (অমিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়)
৯ অক্টোবর ভক্তমঙ্গলী (হেমেন্দ্র দত্ত)
৪ ডিসেম্বর পরপারে (নরেন্দ্রনাথ ভূপেন বন্দ্যোপাধ্যায়)
৮ ডিসেম্বর পৌণ্ড্রবিজয়ী (ভূপেন বন্দ্যোপাধ্যায়)
১৪ ডিসেম্বর পীতাম্বরের জোনাকী (মনমোহন গোস্বামী)

১৯১৬

৬ ফেব্রুয়ারি অমরেন্দ্রনাথ দত্ত পরলোকগমন করেন।
১১ মার্চ পঞ্চশরিকা (ভূপেন বন্দ্যোপাধ্যায়)
৮ এপ্রিল প্রেমেন্দ্রলাল (হেমেন্দ্র বসু)
৩ মে অমল সেন
২৪ জুন : কলা বাঈয়ের
৭ সেপ্টেম্বর পাষাণপুরী (অমিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়)
৪ নভেম্বর : রামদাস
২৪ ডিসেম্বর সাকলা (নৌরীন ভূষণাচার্য্য)

১৯১৭

সেপ্টেম্বর সেবী ভূষণ অনন্তপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
২৭ সেপ্টেম্বর কুরুক্ষেত্র (নরেন্দ্রনাথ বসু)। দেবযানী ও তাপস বেশে (হেমেন্দ্র বসু)

১৯১৮

নিউ বেঙ্গল থিয়েটার নতুন সেজে হলেন।
১২ জানুয়ারি কাশ্মেরী (অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়)
১৯ জানুয়ারি দুর্দিনের বন্ধু
১ সেপ্টেম্বর বিদায়রী (ভূপেন বন্দ্যোপাধ্যায়)
৭ নভেম্বর আমার অভিমান (নরীন চট্টোপাধ্যায়)

১৯১৯

৮ মার্চ এবেলোনা (অনুরূপ দেবোত্তরনাথ বসু)
৩০ মার্চ মুকুরের মত (নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়)। দ্বিতীয় (কীরোদপ্রসাদ)
১৭ মে ইরানী (অমরেন্দ্রনাথ মুখার্জি)
৪ অক্টোবর মুমূর্ষো সাল (অমরেন্দ্রনাথ)
২৫ ডিসেম্বর বৈবাহিক (ভূপেন বন্দ্যোপাধ্যায়)

১৯২০

এপ্রিল মাস অমরেন্দ্রনাথ মুখার্জি সেজে হলেন।
১৯ জুন কুমারী (হেমেন্দ্র বসু)
২২ জুন রাণীসাহেব
২১ অক্টোবর বিদ্রোহ (অমরেন্দ্রনাথ)

১৯২১

১৪ জানুয়ারি বাসবদত্তা (অমরেন্দ্রনাথ)
২ এপ্রিল মন্দাকিনী (কীরোদপ্রসাদ)
৪ ডিসেম্বর : অমরেন্দ্রনাথ দেবপ্রত (অমরেন্দ্রনাথ) অভিনয়ে : অমরেশ, চুনীলাল, নন্দকিশোর, কৃষ্ণচন্দ্রিকা, নীহারবালা, তারাসুন্দরী
১৭ ডিসেম্বর আলমগীর (শিশিরকুমার) অভিনয়ে তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়, কুসুমকুমারী, শিশিরকুমার

১৯২২

১ জুলাই : নারদী ভাজন (নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়)
১৯ আগস্ট অনন্যা (অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়)
২৩ সেপ্টেম্বর সুলতা (অমরেন্দ্রনাথ মুখার্জি)

১৯২৩

মার্চ বিয়েটার প্রতিষ্ঠা। অভিনয়ে : ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র সেন, কৃষ্ণচন্দ্রকুমার মিত্র, হরিসাধন চট্টোপাধ্যায়, নির্মলশিব দত্ত, অমরেশ মুখার্জি, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত
৩০ জুন কর্ণার্জুন (অমরেন্দ্রনাথ) অভিনয়ে অহীন্দ্র চৌধুরী, যতীন মিত্র, পুণ্যশ্লোক, নিশানাথ, ইন্দু মুখার্জি, তুলসী চক্রবর্তি, অমরেশ, কৃষ্ণচন্দ্রিকা, অমরেন্দ্র, নিরুপমা, নীহারবালা

২৯ আগস্ট রাজা ও রানী (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) অভিনয়ে বিনয়ভূষি, সরোজ মিত্র, অপরেশ, অহীন্দ্র, কৃষ্ণভামিনী, গোলাপসুন্দরী, নীহারবালা

১৪ ডিসেম্বর বৃষ্টির রাত (দেবব্রত রায়) অভিনয়ে তরুণ সেনগুপ্ত, তুলসী চক্রবর্তি, কৃষ্ণভামিনী, নীহারবালা

১৯২৪

১ জানুয়ারি ইয়াসের বাঁশী (অমু অপরেশচন্দ্র) অভিনয়ে অহীন্দ্র, অপরেশ, ইন্দু মুখার্জি, কৃষ্ণভামিনী, নীহারবালা।

১৯২৫

৪ ফেব্রুয়ারি পোস্টমেস্টার (রবীন্দ্রনাথ) অভিনয়ে নিরোদেন্দু লাহিড়ী, অহীন্দ্র, কৃষ্ণভামিনী, রানীসুন্দরী

১৮ জুলাই চিরকুমার সভা (রবীন্দ্রনাথ) অভিনয়ে অহীন্দ্র, দুর্গাদাস, বিনোদিনী, প্রমিলাবালা, ইন্দুমুখী, সুশীলাসুন্দরী, নিরোদাসুন্দরী, নিরোদাসী, নীহারবালা

৩ ডিসেম্বর রূপকুমারী (নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়)

৪ ডিসেম্বর পুণ্যপ্রবেশ (রবীন্দ্রনাথ) অভিনয়ে অহীন্দ্র, বিনোদিনী, অমলনারায়ণ, মেনকাবালা, নীহারবালা,

১৫ ডিসেম্বর বন্দিনী (অপরেশচন্দ্র) ও অরির মেয়ে (মহেশ সেনগুপ্ত)

১৯২৬

১৩ জানুয়ারি কল্পীকরণ (রবীন্দ্রনাথ) অভিনয়ে রাধিকা, রানীসুন্দরী

১৬ এপ্রিল বিদায় অভিশাপ (রবীন্দ্রনাথ) অভিনয়ে প্রমিলাবালা, সুশীলাসুন্দরী

১৪ ঐ শ্রীকৃষ্ণ (অপরেশচন্দ্র)

৭ জুলাই নারদ সিরাজ (নৌরীন্দ্রনাথ)

২৩ জুলাই শোধবোধ (রবীন্দ্রনাথ) অভিনয়ে অহীন্দ্র, প্রমিলাবালা, অমলনারায়ণ, সুশীলাসুন্দরী, নীহারবালা

১৮ অক্টোবর অশ্রু ফুলের ফসল (অমৃতলাল) অভিনয়ে অহীন্দ্র চৌধুরী

২৪ ডিসেম্বর চরিত্রহীন (অপরেশচন্দ্র)

১৯২৭

১৩ ঐ চিরাচরিত (রবীন্দ্রনাথ) অভিনয়ে প্রমিলাবালা, সুশীলাসুন্দরী

১৩ সেপ্টেম্বর পরিত্রাণ (রবীন্দ্রনাথ) অভিনয়ে বিনোদিনী, সরোজ মিত্র, সন্তোষ সিংহ, নীহারবালা, তুলসী

৩ ডিসেম্বর অশ্রুর ফুলুক (অপরেশচন্দ্র)

২৪ ডিসেম্বর পুণ্যপ্রবেশ (অপরেশচন্দ্র)

১৯২৮

৪ জানুয়ারি নরনারায়ণ (পরশুরাম) অভিনয়ে অহীন্দ্র, অমলনারায়ণ, নীহারবালা

২৮ জানুয়ারি মেঘদূত (দেবব্রত রায়)

২১ অক্টোবর দুখরা (অপরেশচন্দ্র) অভিনয়ে অহীন্দ্র, তুলসী, অমলনারায়ণ, নীহারবালা, প্রমিলাবালা

২৪ ডিসেম্বর পাঁচের কবার (তুলসীচন্দ্রের অপ্রকাশিত)

১৯২৯

৮ জুন শ্রীমতের (দেবব্রত রায়)

২৩ অক্টোবর নরনারায়ণ (অনুবাদ দেবী, প্রকাশক অপরেশচন্দ্র) অভিনয়ে অহীন্দ্র, ইন্দু, কৃষ্ণভামিনী, সুশীলাসুন্দরী

১৯৩০

২৮ মে চিরকুমার সভা (রবীন্দ্রনাথ) অভিনয়ে নির্মলশিব, নিরুপমা, প্রভা, কৃষ্ণভামিনী, কমলেশী

৩০ অক্টোবর পথচারী

১৯৩১

১ জানুয়ারি দুখরা (অপরেশচন্দ্র)

২৭ জুন মহুয়া (নৌরীন্দ্রনাথ)

১৯ সেপ্টেম্বর শ্রীবৎসচিন্তা (অপরেশচন্দ্র)

১৯৩২

২২ মার্চ পোষ্যপুত্র অভিনয়ে নরেশবাবু, মনোরঞ্জন, অহীন্দ্র, জীবন গাঙ্গুলি, জহর গাঙ্গুলি, কৃষ্ণভামিনী

৩ আগস্ট বিজয়লক্ষ্মী (অপরেশচন্দ্র)

২৪ ডিসেম্বর সাধনা (মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য)

২৬ ডিসেম্বর মনচরী পাগলি ঝুমর (রবীন্দ্রনাথ মৈত্র) অভিনয়ে জহর গাঙ্গুলি, সরযূবালা, মুকুলিকা, ইন্দু, পান্নাবালা

১৯৩৩

২৭ মে রবির প্রকাশ (জলধর চট্টোপাধ্যায়)

১৭ জুন মৈত্রেয়ীর খাতা (রবীন্দ্রনাথ) অভিনয়ে মনোরঞ্জন নিশিরকুমার, অহীন্দ্র, জহর গাঙ্গুলি

২৮ ডিসেম্বর মোহানী ও পাতলের ঝঞ্ঝাবাতাস

২৯ ডিসেম্বর মৈত্রেয়ীর খাতা ও রিহিতা

৩০ ডিসেম্বর রিহিতার ও রাধাকৃষ্ণ

৩১ ডিসেম্বর অজলবাঈয়ের খাঁ বাবা (২৮ থেকে ৩১ নিশিরকুমার অভিনয় অবেহিতনে)

১৯৩৪

শেষী বলেন নিশিরকুমার

ফেব্রুয়ারি ভুলের আড়ালে (অমৃতের শেষ)

২৮ জুলাই বিরাজ বৌ (নরীন্দ্রনাথ নিশিরকুমার) অভিনয়ে নিশির, নৈহাটে, অমু চক্রবর্তি, বরীবালা, অপ্রকাশী রায়চৌধুরী

২৭ সেপ্টেম্বর সাধনা (সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার)

১৩ অক্টোবর অভিনয়িনী (অমুবাদ পাঞ্চালীর) অভিনয়ে নিশিরকুমার, তুলসী, প্রভা, কৃষ্ণভামিনী

২৪ অক্টোবর রাণের বাড়ি (শরীন সেনগুপ্ত) অভিনয়ে নিশির নৈহাটে, কৃষ্ণভামিনী, নিশিবালা, প্রভা

২৭ ডিসেম্বর বিজয়া (পরশুরাম) অভিনয়ে নিশির, নিশিবালা নৈহাটে, কৃষ্ণভামিনী

১৯৩৫

৫৮ সেপ্টেম্বর ছায়া (রবীন্দ্রনাথ মল্লিক) সংযোজনকৃষ্ণ গুপ্ত। অভিনয়ে নিশির, প্রভা, বিমলাংশু

১১ ডিসেম্বর ইন্টিমেট থিয়েটার (জলধর চ্যাটার্জি) অভিনয়ে নিশির, জীবন, প্রভা, কার্তিকের মেয়েরা, বিমলাংশু

১৯৩৬

১৭ অক্টোবর ছায়া (পরিচালক মল্লিক নিশিরকুমার) অভিনয়ে নিশির, প্রভা, বিমলাংশু

২৪ ডিসেম্বর মোগলাই (রবীন্দ্রনাথ) অভিনয়ে নিশির, মৈত্রেয়, বেবীরানী, কমলাঝরী

১৯৩৭

নিশিরকুমারের নবনাট্যসংস্থার টিকে গেল। ডিরেক্ট পাল মেয়ী হলেন

৪ অক্টোবর মীরাবাঈ (মোহন শ্রীমানী)

১৭ নভেম্বর সিরাজদ্দৌলা (হরেন গুহঠাকুরতা)

২৪ ডিসেম্বর অভিসারিকা (অমরনাথ বর্মা)

৩০ ডিসেম্বর অনন্যবন্দিতা (ইন্দ্রেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়)

১৯৩৮

২৯ মার্চ সলিলকুমার মিত্র মেয়ী হলেন

৩ জুন চক্রধারী (মন্মথ গুপ্ত)

৫০ সেপ্টেম্বর ঘরোয়া মেয়ে (সুবীরনাথ রায়) নতুনের (নলিনাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়)

১৯৩৯

১৮ মার্চ মুক্তি শ্রীমানি (মুকুলের বন্দ্যোপাধ্যায়)

২৭ মে সোনার বাংলা (মন্মথ গুপ্ত)

২ সেপ্টেম্বর কারাগার (মোহনলাল কাব্যশাস্ত্রী)

১৪ নভেম্বর জন্মাষ্টমী অভিযান (সুবীন রায়)

১৯৪০

১৬ মার্চ লক্ষ্মী ডুমনী (মন্মথ গুপ্ত) অভিনয়ে নরসুন্দরা, রঞ্জিৎ রায়, বাজলক্ষ্মী

১৮ মে ঈসরা (মন্মথ গুপ্ত)

১৬ জুলাই পাহাড় মেয়েটি চন্দ্রকিন্ন সিংহ (মন্মথ গুপ্ত)

১৮ সেপ্টেম্বর ঝলমলোনা (সুবীন রায়)

১৬ অক্টোবর গঙ্গাবতরণ (মন্মথ গুপ্ত)

২১ ডিসেম্বর ঈসারেল (মন্মথ গুপ্ত)

১৯৪১

৪ এপ্রিল মন্ত্রমোহনিনী (মন্মথ গুপ্ত)

১০ জুলাই কুরুক্ষেত্র (যোগেশচন্দ্র মজুমদার)

১৮ সেপ্টেম্বর অন্নপূর্ণার মন্দির (অমল মজুমদার)

১৯৪২

২৪ জানুয়ারি রাণী ভবানী (মন্মথ গুপ্ত)

৪ এপ্রিল আলমগীর (মন্মথ গুপ্ত)

১৮ জুলাই পুতুলের প্রতিশোধ (অমিয়া ঘোষ)

৯ অক্টোবর মহাকাশী (মন্মথ গুপ্ত)

১৯৪৩

৯ জানুয়ারি বাঈ মুর্শিদাবাদ (মন্মথ গুপ্ত)

১১ ফেব্রুয়ারি কৃষ্ণকান্তের উইল (বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনী)

২২ এপ্রিল মুক্তধারা (রবি শর্মা)

৫ জুন মহারাজা নন্দকুমার (মন্মথ গুপ্ত)

২৯ সেপ্টেম্বর মেবার শ্রীদুর্গাদাসী

২২ ডিসেম্বর দুর্গেশনন্দিনী

১৯৪৪

১৯ মে শিশু সুলতান (মন্মথ গুপ্ত) মেনার ভাঙ্গ ও মন্মথগুপ্ত বেদান্ত

১৯৪৫

৪ মে জন্মাষ্টমীর রাতি (মন্মথ গুপ্ত)

১১ নভেম্বর পলাশী (হীরেন মুখোপাধ্যায়)

২৩ ডিসেম্বর পরমার্থ আলো (মন্মথ গুপ্ত)

১৯৪৬

৩০ এপ্রিল ঘরোয়ার মেয়ে (অমল মজুমদার)

১৪ আগস্ট ছায়ালোক আলি (মন্মথ গুপ্ত)

১৪ সেপ্টেম্বর ছায়াপথ (মন্মথ গুপ্ত)

১৯৪৭

১৪ ফেব্রুয়ারি স্বর্গ হতে বড় (মন্মথ গুপ্ত)

৭ মে পলিমাটি বাহিনী (নিশীথ মজুমদার)

১২ অক্টোবর ত্রিপূর্ণা (মন্মথ গুপ্ত)

২০ ডিসেম্বর রাজনিতম (নরীরাণ মন্মথ গুপ্ত)

১৯৪৮

২৪ জুন জননিশী (ছায়ালোকে)

২৩ ডিসেম্বর ঘোলকুমা (সুবীন রায়)

১৯৪৯

১৪ ফেব্রুয়ারি নিশী ডাকে (সুবীন রায়)

৭ মে নৌকোডুবি (রবীন্দ্রনাথ) অভিনয়ে মন্মথ, নিশির, বিমলাংশু, কমলা, সুপ্রভাদেবী

২৩ জুলাই বিজয়লক্ষ্মী (মন্মথ গুপ্ত)

২০ ডিসেম্বর সমাধি সন্ধ্যালগ্ন (মন্মথ গুপ্ত)

১৯৫০

৯ ফেব্রুয়ারি ঈশানী (মন্মথ গুপ্ত)

২০ ডিসেম্বর পৃথ্বিরাজ (মন্মথ গুপ্ত)

১৯৫১

২ মে মেঘমল্লার (সুকোশ শ্রীমানী)

১২ জুলাই পদ্মপলাশ (মন্মথ গুপ্ত)

৩ অক্টোবর বালাজী রাও (ছায়ালোকে)

১৯৫২

১৯ মে দুর্যোধন (নরীরাণ মন্মথ গুপ্ত)

১৯৫৩

৬ মার্চ সমরঘরটী (ইপেলানন্দ মুখোপাধ্যায়)

১৫ মে ডাকবাংলো (নীহাররঞ্জন গুপ্ত)। কাহিনীর জন্য নীচের ছবগুলোর। অভিনয়ে এঁদের দেখা যাবে। সমরেশ গুপ্ত।

১৪ অক্টোবর শাসনী (সেবনারায়ণ গুপ্ত)। অভিনয়ে উত্তমকুমার, সাবিত্রী, সন্ধ্যা, ছবি বসু, অনুপকুমার, অনুপ

(মোট অভিনয়—৪৮৪

১৯৫৫

১৪ ডিসেম্বর পরিণীতা (শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)। অভিনয়ে অনিলবরণ, ছবি, ভানু, নিবেদিতা, সন্ধ্যা, নবকুমার, অনুপকুমার, সাবিত্রী

৫৩৫টি শো হয়। এবার পুরো সাফল্য ও স্বীকৃতির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়

১৯৫৭

৭ জানুয়ারি শ্রীকান্ত (১ ও ২)। অভিনয়ে নির্মলকুমার, মিতা, সাবিত্রী, ছবি, ভানু

১৯৫৮

১৫ মে সাজঘরটী, অভিনয়ে অভিজিৎ, মিতা, ছবি

১৯৫৯

১৪ মার্চ ডাকবাংলো (নীহাররঞ্জন সেবনারায়ণ গুপ্ত) অভিনয়ে রবি বিশ্বাস, সন্ধ্যা রায়, অনিল, অভিজিৎ, শ্যামল

১৯৬০

১৮ আগস্ট : মেয়েলী (সুবোধ ঘোষ/সেবনারায়ণ গুপ্ত)। অভিনয়ে ছবি, সন্ধ্যা চৌধুরী, অভিজিৎ, ভানু, সাবিত্রী, কমল মিত্র, নিলিমা চক্রবর্তী

পরবর্তীকালে শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ (সেবনারায়ণ গুপ্ত)

১৯৬১

১০ মে কালুলিংয়ারাম (রবীন্দ্রনাথ / সেবনারায়ণ)

মুক্তির উপায় (রবীন্দ্রনাথ)। অভিনয়ে ছবি, অভিজিৎ, ভোলানাথ, শ্যামল, ভানু, কমল, ভানু, অনুপ, পীতম, নিলিমা

১৯৬২

৯ মার্চ দেবযানি (শরিৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় / সেবনারায়ণ)। অভিনয়ে কমল, অনিল, নিলিমা, শ্যামলী বর্মণ

১৯৬৩

১৪ ফেব্রুয়ারি ছাপমারী (নীহাররঞ্জন গুপ্ত / সেবনারায়ণ)। অভিনয়ে দেবীমিত্র, বাসবী, ভোলানাথ, ভানু, কমল, বন্ধু দে

১৯৬৪

১৬ আগস্ট একদা রাত্রে (বিমল মিত্র / সেবনারায়ণ)। অভিনয়ে : নবকুমার, ভানু, ভোলানাথ, উৎপলা দাস, অভিজিৎ, বাসবী, দেবশ্রী

১৯৬৬

২৮ এপ্রিল দাবী (সেবনারায়ণ)। অভিনয়ে অভিজিৎ, ভানু, পুরবী, নীলিমা দাস, অনুপ।

১৯৬৮

২৪ অক্টোবর পরিণতা (সেবনারায়ণ)। অভিনয়ে তরুণকুমার, অভিজিৎ, ভানু, পুরবী, নীলিমা।

১৯৭১

১৮ ফেব্রুয়ারি নীড় (সেবনারায়ণ)। অভিজিৎ, সন্ধ্যা রায়, পুরবী, নীলিমা, সুদেষ্ণা

১ এপ্রিল অনিল মিত্র হঠাৎ ভানু মিত্র অবসরে অভিনয় নিয়ন্ত্রণের (পরিচালনা অসীমকুমার)

১৯৭২

২১ জানুয়ারি মহুয়া (তারাশঙ্কর / সেবনারায়ণ)। অভিনয়ে সন্ধ্যা রায়, সন্ধ্যা, পুরবী, নীলিমা

১৯৭৩

১৮ মার্চ শিরোমণি নায়ক (উপেন্দ্রনাথ মজুমদার ঐতিহাসিক-নাটক)। সেবনারায়ণ। অভিজিৎ, সাবিত্রীচট্টো, সন্ধ্যা রায়, পুরবী, নীলিমা, শিবেন, নীতা

২০ সেপ্টেম্বর জনমানব (শরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)। অভিজিৎ, পুরবী, সন্ধ্যা, সাবিত্রীচট্টো, সেবনারায়ণ গুপ্ত নিবেদিত শেষ নাটক। সঙ্গীত হিমাংশুবিকাশ

১৯৭৪

৩১ মে পরিচয় (কৃষ্ণা মুখার্জি)। নির্দেশক অজিত ঘোষ, সন্ধ্যা রায়, পুরবী, নীলিমা। সঙ্গীত হিমাংশুবিকাশ

১৯৭৫

২৮ জুন কৃষ্ণকান্তের উইল (বঙ্কিম)। নির্দেশক তরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়। উপন্যাস অমরেন্দ্রগুপ্ত। সঙ্গীত হিমাংশুবিকাশ, অমরেন্দ্রকৃষ্ণ, সুদেষ্ণা, বন্ধু।

১৯৭৭

২৮ জুন সমাপ্তি। অমরেন্দ্র মুখার্জি। সঙ্গীত। নির্দেশক অজিতকুমার।

১৯৭৯

এপ্রিল-জুন বন্ধ ছিল।

৩ জুলাই সমাধান (অজিত গাঙ্গুলি / সন্তোষ সেন)। অভিনয়ে বাসবী, সঙ্গীত, সেবনারায়ণ, বন্ধু চক্রবর্তী।

১৯৯১

১৪ অক্টোবর : প্রায় ১৯ মাস বন্ধ থাকার পর। তখন চলছিল 'পঞ্চম জিনার'। ঐ অভিনেতাদের নিয়েই অনন্যকুমার, নির্দেশনা গৌরির মট্টো-গঙ্গায়। গৌরিমা, বাসবী, রবি, প্রীতম। (শেষ নিয়ে যেতে দেন)।

প্রযোজনার অভিনব আয়োজন (১) বঙ্গীয় মুখোপাধ্যায়ের বাসায় চন্দননগরে ঐতিহ্যবাহী প্রকাশ। (২) সাহিত্যের পরবর্তীকালে উপন্যাসে, অভিনয়ের নিবেদিতদের অর্থ প্রদান। এই টাকায় চলচ্চিত্রক দেওয়া হয় নাট্যশিল্পীদের এবং বাকী সমাজসেবকে।

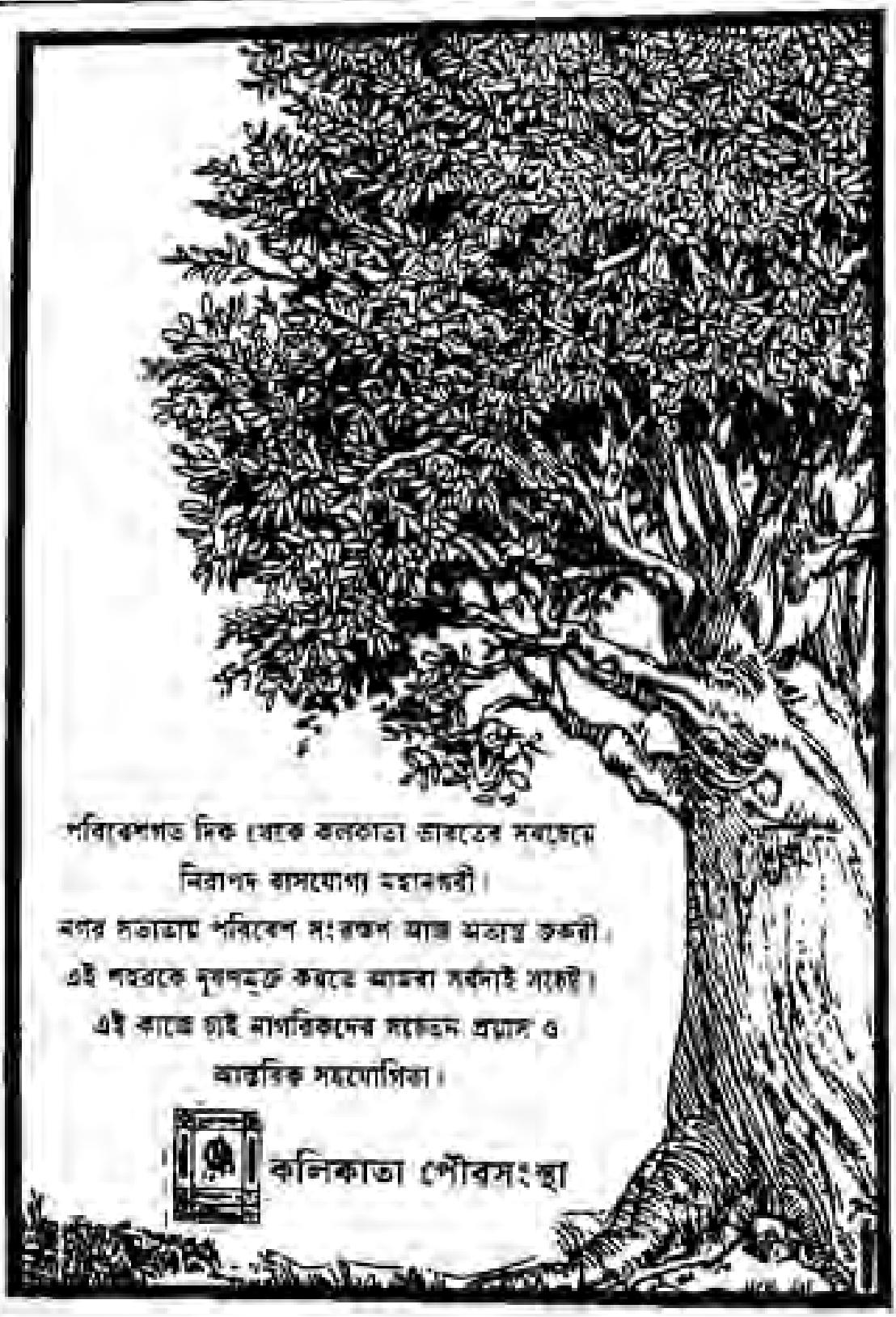
পরিবেশগত দিক থেকে কলকাতা ভারতের সবচেয়ে
নিরাপদ বাসযোগ্য মহানগরী।
নগর সভ্যতায় পরিবেশ সংরক্ষণ আজ অত্যন্ত জরুরী।
এই শহরকে দূষণমুক্ত করতে আমরা সর্বদাই সচেষ্ট।
এই কাজে চাই নাগরিকদের সচেতন প্রয়াস ও
আন্তরিক সহযোগিতা।
কলিকাতা পৌরসংস্থা

রুচিশীল ও মনের মত বিভিন্ন স্বাদের বই পেতে হলে কলকাতা পৌরসংস্থা প্রকাশিত বই পড়ুন

ছোটদের জন্য

আমাদের বিদ্যাসাগর

আমাদের সুভাষচন্দ্র

সাধারণের জন্য

মুক্তির সংগ্রাম ও কলকাতার পাঠ

C. M. Gazette C. V. Raman Birth Centenary Issue

C. M. Gazette Anthology Number 1924-1947

C. M. Gazette Netaji Birthday Com. Vol. Cent. eve-tribute

C. M. Gazette-Netaji Centenary Issue

Calcutta-a set of Pictures

Calcutta at a Glance

কলকাতা সম্বন্ধে নিখাদ জানতে হলে তথ্যসমৃদ্ধ পুরস্ত্রী নিয়মিত পড়ুন

উল্লিখিত বইগুলি কলকাতা পৌরসংস্থার তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ এবং রেকর্ড বিভাগের কাউন্টারে সারা বছর পাবেন।

তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ

১, হগ স্ট্রিট, হগ বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০ ০৮৭

Tech / WB / RNP-127 / 2001

কলকাতার অহংকার
কলকাতা
পুরস্কার

এখন সত্যিই এক বহুদূর হাঁটা শহর। ঝলমলে,

ঝকঝকে পরিষ্কার, জানলাবিহীন চওড়া ফুটপাথ, সবুজে সুন্দর

পরিবেশ আর মিলেনিয়াম পার্ক এর মত নানা সুন্দর স্থান।

এই স্বপ্নময় নগরীর বাস্তবায়নে হোক আমাদের যৌথ প্রচেষ্টায়।

কলিকাতা পৌরসংস্থা

কলকাতা
পুরশ্রী
১৮ বর্ষ □ ৯ম সংখ্যা □ জুন ২০০১

কলকাতা পুরসভায়

বর্তমান পুরবোর্ডের বর্ষপূর্তি

বিশেষ সংখ্যা

৮ই জুলাই ২০০০ – ৭ই জুলাই ২০০১

কলিকাতা পৌরসংস্থা

কলিকাতা পৌরসংস্থার করদাতাদের উদ্দেশ্যে

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বকেয়া পুরকর পরিশোধে সুদ ও জরিমানা মকুব

কলিকাতা পৌরসংস্থার প্রশাসন অনুযায়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুমোদন ক্রমে কলিকাতা পৌর আইনের অনুশাসন কলিকাতা পুরকর পরিশোধে উৎসাহিত করতে সুদ ও জরিমানা মকুব করার লক্ষ্যে নিম্নে বর্ণিত সময় সীমায় একটি প্রকল্প (Scheme) ঘোষণা করে একটি আদেশ বিজ্ঞপ্তি (নং 61/MA/MA/OC-14/C/2E-17/2004 dated 07.06.2004) জারি করা হয়েছে। এই প্রকল্পের মূল শর্তাবলি হল —

১। এই প্রকল্প চালু থাকবে ১লা জুলাই থেকে ৩১শে ডিসেম্বর, ২০০১ পর্যন্ত সময়সীমার জন্য।

২। এই প্রকল্প ৩১.৩.২০০০ পর্যন্ত প্রদেয় বকেয়া বিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

৩। প্রকল্প অনুসারে :—

(ক) ১১ ও ১৯৯৯ পর্যন্ত প্রদেয় বকেয়া বিলের ক্ষেত্রে সুদের ১০০% মকুব করা হবে।

(খ) ১.৪.৯৯ থেকে ৩১.৩.৯৯ পর্যন্ত প্রদেয় বকেয়া বিলের ক্ষেত্রে সুদের ৭৫% মকুব করা হবে।

(গ) ৩১.৩.২০০০ পর্যন্ত প্রদেয় বিলের ক্ষেত্রে সুদ জরিমানার ১০০% মকুব হবে।

৪। কলকাতা বকেয়া কর প্রকল্পের উদ্দেশ্যে যে কর থেকে টাকা এই প্রকল্প জারী হওয়ার পূর্বে জমা দিয়েছেন এবং বর্তমানে অতিরিক্ত (Unadjusted) আছে, সেই কর থেকে টাকা এই প্রকল্পের আওতায় আসবে না এবং এই জমা টাকা থেকে কর্তৃপক্ষ সুদের সুদ ও জরিমানা বাবদ বকেয়া কর পেশ দেওয়ার পর এই প্রকল্প অনুযায়ী বকেয়া কর নির্ধারিত হবে।

৫। প্রকল্পের সময় সীমা অর্থাৎ ৩১.১২.২০০১ এর মধ্যে বকেয়া বিলের গোটা টাকা সম্পূর্ণ জমা না দিলে সুদ ও জরিমানা মকুবের এই সুবিধা করদাতারা পাবেন না।

৬। ১লা জুলাই থেকে ৩১শে আগস্টের মধ্যে এই প্রকল্পের আওতায় আসতে করদাতাদের লিখিত আবেদন করতে হবে। আবেদনের কোনো ফরম নাই, এজেন্সি না, সাধারণ পুরো হিসাবে টাকা জমা করতে হবে। যদি কোন গোটা টাকা জমা আছে সে সম্পর্কিত রসিদের প্রতিলিপি আবেদনের সঙ্গে জমা দিতে হবে।

কলিকাতা পৌরসংস্থার আইনের অনুশাসন অনুযায়ে এক হাজার টাকা পর্যন্ত সুদ ও জরিমানা মকুবের এই সুবিধা গ্রহণ করে সমস্ত অঞ্চলের কর মিটিয়ে দিন।

— বরার্ট বিভিন্ন সংগ্রহ জমা দেওয়ার ও পেমেন্ট নেওয়ার টিকানা —

২১২, রাসবিহারী এভিনিউ
(গড়িয়াহাট মোড়), কিয়স
কলকাতা — ৭০০ ০২৯
ওয়ার্ড নং — ৬৬, ৬৭, ৮৬, ৯১-১০০

৬৬, সিরিজ রোড, পঞ্চিমা
কলকাতা — ৭০০ ০০৪
ওয়ার্ড নং — ১০৭, ১০৪, ১১০-১১৪

চাকলদার আবাস, বরফা কো রোড, হাওড়া
কলকাতা — ৭১১ ১১৮
ওয়ার্ড নং — ১০৩-১০৯

১, স্টিফ হাউ রোড, কলকাতা — ৭০০ ০০৮
ওয়ার্ড নং — ১১৭-১৩২

৪, এম. এন. ব্যানার্জী রোড
কলকাতা — ৭০০ ০১৪
ওয়ার্ড নং — ১-১০ (৯৯, ৯১, ৯৯ বাদে)

ই/০, কসমুলস গার্ডেন্স নিউ রোড
কলকাতা — ৭০০ ০৪৪
ওয়ার্ড নং — ১৪০-১৪১

(ফোনাঈন ঘোষ)
পৌর মহাধ্যক্ষ

কলকাতা
পুরশ্রী

১ম বর্ষ ☐ ষষ্ঠ সংখ্যা ☐ জুন ২০০১

বিষয়সূচী

- সম্পাদকীয় ☐
- নাগরিক পরিষেবার উন্নয়নের ক্ষেত্রে নতুন দৌড় শুরু করেছে — সুব্রত মুখোপাধ্যায় ☐
- পথচলতির মুখ-মুখর আলো পৌরসভিলেশনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি — কমল মুখোপাধ্যায় ☐
- দীর্ঘদিন অবহেলিত কলকাতার নাগরিক পরিষেবার বৃদ্ধি ঘটে চলেছে — নিরোদবরণ পুরোহিত ☐
- বিজ্ঞানভিত্তিক স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা চালু করার চেষ্টা চলছে — মলয় রায় ☐
- জল সরিল ব্যবস্থায় নতুন যোগ আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয় নিয়ে — শোভন চট্টোপাধ্যায় ☐
- কলকাতাবাসীদের আধুনিক নিকাশী ব্যবস্থার সুফল দিতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ — তারাপদ দে ☐
- নাগরিক পরিষেবার বৃদ্ধি করতে অন্যান্য সংস্থাগুলির কাজের পরিমার্জন ও সমন্বয়সাধনের চেষ্টা চলছে — অমূল্য চট্টোপাধ্যায় ☐
- প্রাথমিক শিক্ষায় পৌর সংস্থার ভূমিকা ক্রমবর্ধমান — মৈনুল হক চৌধুরী ☐
- গত এক বছরে আর্সেনিক-বিমুক্ত নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে — সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায় ☐
- পরিচ্ছন্নতা শহরবাসীদের আমাদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার অন্যতম লক্ষ্য — অরুণ ভাদুড়ী ☐
- গত এক বছরে কলকাতা পুরসভার উদ্যান বিভাগের কার্যক্রম — কল্যাণময় গুহ ☐
- আর্সেনিক দূষণে বিপদ্ধি ও আইসোলেশন বিভাগে প্রশাসনিক ব্যবস্থাদির ক্রমবিকাশ হয়েছে আরও দ্রুত — দুলাল সরকার
- পুরসভার আওতাভুক্ত সমস্ত মুদ্রণপ্রতিষ্ঠান ভবনে ভূমিকম্প জনিত নাগরিক পরিষেবা বৃদ্ধির চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে — নীলাংশু কুমার সেন ☐ ৫৪
- সড়কের বদ্ধ জলনালে সম্পত্তি এখন উদ্ধার করা হচ্ছে — এম. কে. ইকবাল ☐ ৫৫
- কলকাতা পৌরসভার নিকাশী ব্যবস্থার ইতিহাস — নির্মলেন্দু কুমার সাহানা ☐ ৫৭
- নতুন দিগন্ত সন্ধানে — দিলীপ মুখার্জি ☐ ৬৮
- পুরসভা সংবাদ ☐ ৭৩

প্রকাশনা উপদেষ্টা মণ্ডলী —
নিরোদ রায় (চেয়ারম্যান) তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায় (সদস্য)
পবিত্র মুখোপাধ্যায় (সদস্য) অমূল্য সিংহ (সদস্য)

সহযোগী : পলাশ ঘোষ
প্রচ্ছদশিল্প : শেখর চক্রবর্তী

মূল্য : ৫ টাকা

সম্পাদক : নীলমণি দাস

অনিলতা (পৌরসভার কাজের মুখপত্র পত্রিকা, ১৮৫ এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, ১ ম তল, কলিকাতা-৭০০ ০০৬ হইতে অনুপ সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত ও কলকাতা পুরসভার মুদ্রণালয় ১৮৬/১ (১১১) সি.আই.টি. রোড, কলকাতা, স্কিম ৪৪৪ এ ১৪৯ হইতে মুদ্রিত।

The Calcutta Municipal Corporation,
5, S. N. Banerjee Road,
Kolkata-700 013.

REVIVAL OF STAR THEATRE

Registered Architects are invited to participate in a two stage design competition titled "Revival of Star Theatre" at Calcutta. The brochure outlining the guidelines and regulations and other information may be obtained along with site plan from the office of Chief Municipal Engineer (P & D) at 19, Nelie Sengupta Sarani, Top Floor, West Block, (S. S. Hogg Market, Phase – II) in between 12.00 to 3.00 P.M. on any working day on payment of a non-refundable deposit of Rs. 1,000/- (Rupees One thousand only) from 10.07.2001 to 19.07.2001. Interested Architects are requested to make such payments in Demand Drafts in favour of "The Calcutta Municipal Corporation".

সম্পাদকীয়

দিকে পঁচিশটি দিন। অর্থাৎ এসেছে। কলকাতা পুরসভার নতুন বোর্ডের তথা পর্ষদপুরীর ৮ জুলাই। উনিশজন কাউন্সিলর পুরসভার বোর্ডে জিন বছরটি। কলকাতার রাস্তা ঘাটগুলি সাত বছর পর বোর্ড পাঁচ বছর নতুন বোর্ড। সংবাদ মাধ্যমেই এই পরিপ্রেক্ষিতে পর এককালীনের কার্যকলাপের পরিচালনার ভার। কথা উঠেছে, নতুন বোর্ড আসতেই হাজারো পরিবেশে সঙ্গে এই বোর্ডকে নিয়ে হয়ে বিপদ অনেকের ঘাড়ের বোঝা। এমনিতেই পৌরসংস্থার আর্থিক পরিস্থিতি মোটেই সুবিধাজনক নয়। এর উপর আছে নাগরিক পরিষেবার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই দায় থেকে সাধ্য অবশ্যই মুক্ত নয়। নয় কলকাতা পুরসভাও। তবে সুখের কথা — পুরসভাই উন্নয়নের অর্থে কেন্দ্রপড়ার ভিত্তিতে কাজ করতে উদ্যোগ। নাগরিক স্বার্থ নিয়ে আলোচনার মাধ্যমেই গেছেন নয়াদিল্লি। প্রয়োজন মেটানোর পৌরমন্ত্রী মহোদয়ের এসেছেন পৌরভবনে। আলাপ আলোচনার অনেক সমস্যাই সহজতর হয়ে উঠেছে। এই ধারার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা গেলে পুরসভার নাগরিক স্বার্থে কাজ করার সুযোগ বাড়বে।

কলকাতার উন্নয়ন কার্যত কারো একার হাতে পড়েনা। এর সঙ্গে জড়িত রাজ্যসরকার, বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক এজেন্সী, পুরসভা, সর্বোপরি কলকাতার লক্ষ লক্ষ নাগরিক। প্রথম পুরবোর্ডের পর্ষদপুরীতে এই সংস্থার সাথে এককাল কি কি উন্নয়ন হয়েছে তার সঠিক খতিয়ান দিয়েছেন চেয়ারম্যান, মহানগরপালিকা সহ মেয়র পরিষদ গণ।

কলকাতাবাসী, সরকার-পুরসভা কি করেছে সেই জানতে চায়। কলকাতা আমাদের উন্নয়নে নাগরিক হিসাবে আমরা কি করছি? এর মধ্যেও এগুলো নির্ভর করছে কলকাতার আগামীর উন্নয়ন। ভবিষ্যৎ।

সামান্য কিছু সতর্কতা

ম্যালেরিয়া

তাড়াতে পারে

- জ্বর হলেই রক্ত পরীক্ষা করান ও পুরোমাত্রায় ওষুধ খান।
- ম্যালেরিয়ার মশা কেবল পরিষ্কার জলে জন্মায় — খোলা চৌবাচ্চা, হাঁড়ি-কলসি বা ড্রামে ধরা জল সপ্তাহে কমপক্ষে একদিন পরিষ্কার করুন।
- বর্ষার জল বাড়ির ছাদে বা আনাচে-কানাচে জমতে দেবেন না।
- জলের ট্যাঙ্ক ঢেকে রাখুন যাতে মশা ঢুকতে না পারে।
- শোয়ার সময় অবশ্যই মশারি টাঙান।

॥ ম্যালেরিয়া জীবন নেয় : সাবধানের মার নেই ॥

তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ
কলিকাতা পৌরসভা

নাগরিক পরিষেবার উন্নয়নের ক্ষেত্রে নতুন পৌর বোর্ড দায়বদ্ধ

সুব্রত মুখোপাধ্যায়
মহানাগরিক

আমরা ৮ জুলাই ২০০০ তারিখে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছি। আমাদের খুবই আর্থিক সমস্যার সঙ্গে কাজ করতে হচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও নাগরিক জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আমরা বেশ কিছু সদর্থক ব্যবস্থা ও প্রকল্প গ্রহণ করেছি। কলকাতা পুরসভা নাগরিকদের পরিষেবা বিধানে দায়বদ্ধ। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি দারিদ্র পালনের ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার দেওয়া হবে জল সরবরাহ, জঞ্জাল অপসারণ, নিকাশী, রাস্তা এবং জন-স্বাস্থ্যের কিছু নির্বাচিত ক্ষেত্রে।

দেশের মধ্যে সবচেয়ে ঘনবসতি শহরগুলে পরিগণিত কলকাতা। বেকারি ও দারিদ্র্য হল প্রধান আর্থ-সামাজিক সমস্যা তবে সমস্যার জটিলতা থাকলেও বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটাতে চেষ্টা করব।

কলকাতা পুরসভার রাজস্বের মূল উৎস হল সম্পত্তি কর, সরকারি রাজস্ব অনুদান, রাজ্য অর্থ কমিশন, এলাকা অর্থ কমিশন এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মসূচি যথা NSDP প্রভৃতির কাছ থেকে প্রাপ্ত মূলধনী অনুদান। সন্তোষজনক নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যবিধান কলকাতা পুরসভার আন্তরিক সদিচ্ছা থাকলেও সম্প্রতি বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আর্থিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, আমরা শহরের সন্তান্য সর্বাধিক মানুষের জন্য ভূগর্ভস্থ জলের নির্ভরতা কাটিয়ে পরিশোধিত জল সরবরাহের জন্য সংকল্পবদ্ধ, এই লক্ষ্যে পৌঁছতে আমরা বাগমারী, রাণীকুঠি সহ একাধিক প্রকল্প রূপায়ণে সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।

গৃহীত প্রকল্পগুলির সঙ্গে সঙ্গে কালীঘাটে ভূগর্ভস্থ জলাধার নির্মাণের প্রকল্প আমরা গ্রহণ করেছি যাতে জলসরবরাহ আরও বৃদ্ধি পায়। আমরা অনুভব করছি যে, এই প্রকল্পগুলি রূপ সম্পন্ন করতে যে পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন তা পুরসভার পক্ষে সংকুলান করা সম্ভব নাও হতে পারে। আমরা অনুধাবন করেছি যে, জলসরবরাহ থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব এবং একই সঙ্গে অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহের উপায় হিসেবে পার্শ্ববর্তী বড় বাজারে ছেড়ে অর্থ সংগ্রহ করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে বড়ের ব্যবসায়িক লেনদেনের জন্য আমরা পঞ্চাশ কোটি টাকার অ-রূপান্তরযোগ্য পরিশোধ-যোগ্য বন্ড বাজারে ছাড়ার পরিকল্পনা নিয়েছি। এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুমোদন পাওয়া গেছে। বন্ড ছাড়ার প্রস্তুতি সম্পূর্ণ।

ভূমিসম্পদের ব্যবহার হ্রাস করতে আমরা বর্জ্য পদার্থকে প্রযুক্তি-বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিষয়ে বিশ্বব্যাপী টেন্ডার ডেকে প্রতিদিনের সংগৃহীত জঞ্জাল থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিষয় বিচার-বিবেচনা করছি।

বয়সে প্রবীণ এমন নাগরিকদের নিশ্চয় মনে পড়ে ছেলেবেলায় তাঁদের খুব ভাঙত রাস্তা জল দিয়ে ধোয়ার শব্দে। আমরা তাঁদের সেই সুখকর স্মৃতি ফিরিয়ে এনেছি প্রধান ২১টি রাস্তাকে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ধোয়ার ব্যবস্থা করে। অপেক্ষাকৃত নবীনদের কাছে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। আমি মনে করি, কলকাতা পুরসভার এটি একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য। যদিও বর্তমান যুগে প্রযুক্তিগত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রাস্তা ধোয়ার কাজ যান্ত্রিক পদ্ধতিতে করা হচ্ছে।

স্টার থিয়েটার পুনর্নির্মাণ পর্বের ভিত্তিপ্রস্তর।

কলকাতা বিমানবন্দরে অভিষেক মিছিল সংক্রান্ত সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রীকে ফুলের তোড়া দিচ্ছেন পরিবহন মন্ত্রী মদন মিত্র, পাশে রয়েছেন পরিবহন সচিব সুব্রত চট্টোপাধ্যায়, মেয়র পারিষদ শোভন চট্টোপাধ্যায় ও ডেপুটি মেয়র মহুয়া গুপ্তা।

কলকাতা শহরের বিভিন্ন এলাকায় নালা প্রকল্পের মাধ্যমে ৫৩টি আলাদা ড্রেনেজ ব্যবস্থার আওতায় আনা হয়েছে যাতে এই কাজ আরও ত্বরান্বিত করা যায়। এবার আমরা যা করব।

অন্যান্য মেট্রোপলিটান শহরে অপসারণের জন্য আমরা একটি নতুন ভূমি ভরাট (Land fill) ব্যবস্থা তৈরি করছি। কিন্তু আমরা মনে করি মেট্রোপলিটান বর্জ্য এইভাবে অপসারণ করলে হয়। মেট্রোপলিটান বর্জ্য পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করার জন্য একটি ভূমি স্থাপনের বিষয়ে আন্তর্জাতিকভাবে একটি সংস্থার সঙ্গে আলোচনা করছি। যা মেট্রোপলিটান ক্যান্সার বর্জ্য পদার্থ অপসারণে কম খরচসাপেক্ষ হবে। আমরা ল্যান্ডফিল্ড থেকে বেরোনো নির্গমনের, চিকিৎসালয় ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত মারাত্মক-মেট্রোপলিটান বর্জ্যপদার্থের পরিমাণ সন্তোষজনক নয়। আমরা রাজ্য সরকারের সক্রিয় সহযোগিতা চাই, যাতে শহরের সকল স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান থেকে মেট্রোপলিটান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা যা অপসারণে সহায়তা হয়। যৌথোদ্যোগিক ভরসায় কলকাতার বর্তমান অনেকটাই কলাই-এর মতো। তাই বৃষ্টির অধিকাংশ জল ভরে যায়। কিন্তু নাগরিকদের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে জমা জল যাতে ৪-৫ ঘণ্টার বেশি না থাকে সেজন্য আমরা যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়েছি। ঘণ্টায় 15 Cusec Submersible Pump বসিয়েছি মেটিয়াবুরুজ ড্রেনের পশ্চিম প্রান্তে এবং ঘণ্টায় 240 Cusec Capacity Pump বসিয়েছি পামার বাজার এবং বালমাকি পশ্চিম প্রান্তে। আশা করা যায় এবার বর্ষায় কলকাতার নাগরিকদের কষ্ট অনেকটাই লাঘব করা যাবে।

শহরের নিকাশী ব্যবস্থা উন্নয়নে আমরা প্রয়াসী। নিকাশী ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের জন্য আমরা ৪০০ মিলিয়ন ডলারের একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছি। এর মধ্যে ২০০ মিলিয়ন ডলার পাওয়া গেছে ADB-এর কাছ থেকে। ৩০০ মিলিয়ন ডলার পাওয়া যাবে DFID-এর কাছ থেকে। অবশিষ্ট অর্থ রাজ্য সরকার ও কলকাতা পুরসভা যৌথভাবে বহন করবে। ১ থেকে ৬ এবং ১০১ থেকে ১৪১ ওয়ার্ড পর্যন্ত করা হবে।

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব কলকাতায় নিকাশী ব্যবস্থার উন্নয়ন ও অতিরিক্ত পাম্প সংস্থার মাধ্যমে এই প্রকল্প অনুসারে গোটা শহরের বর্জ্য পদার্থ সুষ্ঠুভাবে উদ্বাহিত সাগর এবং কলকাতা পুর প্রশাসনের উন্নয়নের দিশারী অন্তর্ভুক্ত। এই প্রকল্পের অন্য প্রধান দিকটি হল কলকাতা পুরসভার সাংগঠনিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে নাগরিকের অংশগ্রহণ। সব কাজ সময়কালে প্রকল্পটি রূপায়িত হবে।

আমরা তিনটি নতুন রেলি-ব্রেথ-সমৃদ্ধ মেশিন চালু করেছি। শীতের সময়ে নিকাশীনালি সংস্কার করা হয়েছে যাতে নিকাশির সমস্যা অনেক পরিমাণে কমানো যায়। তবে এটা সবাই জানেন যৌগলিক কারণে কলকাতায় বৃষ্টির অধিকাংশ জল জমে। আমরা চেষ্টা করছি যাতে জমা জল ৪-৫ ঘণ্টার বেশি না থাকে।

সড়ক পরিবহনের ক্ষেত্রে কলিকাতা পৌরসংস্থার নিজস্ব সড়কগুলির প্রয়োজনীয় মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নতিকরণের দিকে আমরা তীক্ষ্ণ নজর রাখছি। BMS, SFC-এর

এটার ভিত্তিতে পুরসভা পর্যন্ত বিভিন্নস্তর ইলেন অনুষ্ঠানে ২৭৯৯টি কেন্দ্রীয় মেলাটি মেয়র শুভাশিস্তাস, মহানাগরিক সুব্রত মুখোপাধ্যায়, মেয়রমেয়র অনিল মুখোপাধ্যায় ও উপ মহানাগরিক উমাদেবী পুরোহিত।

Fund থেকে আমরা সড়ক উন্নয়নের ঋণ নিয়েছি। HUDCO থেকে ৬ কোটি টাকা জল এবং আমরা এক কোটি আটাত্তর লক্ষ টাকা নিয়ে শহরের রাস্তাঘাট উন্নয়নের পরিকল্পনা রূপায়িত করতে চলেছি। এর ফলে কলকাতার নাগরিকমুখ উপকৃত হবেন।

অধিকাংশ শহরের রাস্তার অবস্থা ভাল, কিন্তু কলকাতা ট্রামওয়েজের অতিরিক্ত সম্পত্তির জন্যে ট্রামলাইন বুক রাস্তা যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের আওতায় নেওয়া যাচ্ছে না। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি কলকাতা ট্রামওয়েজের প্রযুক্তিগত সহায়তা নিয়ে কলকাতায় পুরনো ট্রাম লাইন মেরামত করবো। এছাড়া BMS অর্থবিল থেকে সংযুক্ত এলাকায় সড়ক মেরামতির জন্য এক কোটি টাকার প্রকল্পের কাজ চলছে। বস্তি এলাকার সড়ক উন্নয়নের জন্য দেড় কোটি টাকা SFC অর্থবিল থেকে খরচ করার কাজ চলছে। HUDCO ঋণ থেকে ছয় কোটি টাকা জলের অপেক্ষায় রয়েছে এবং তার সঙ্গে আমরা এক কোটি আটাত্তর লক্ষ টাকা নিয়ে শহরের রাস্তাঘাট উন্নয়ন করার প্রকল্প হাতে নিয়েছি।

নাগরিকদের স্বাস্থ্যরক্ষা, বিশেষ করে ম্যালেরিয়া, টিবি, প্রসূতি-স্বাস্থ্যরক্ষা (প্রাক-প্রসব ও পরবর্তী-প্রসব) পোলিও দূরীকরণ, অন্ধত্বনিবারণ পরিষেবার প্রসার ইত্যাদি ক্ষেত্রে আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি। দেশের মধ্যে প্রথম ম্যালেরিয়া হাসপাতাল স্থাপনের উদ্যোগে আমরাও সামিল হয়ে গেছি। শহরে প্রথম ম্যালেরিয়া হাসপাতাল স্থাপনের পরিকল্পনার আমাদের রয়েছে যা হাতে নিলাম।

অবাধ্যতীন স্বাস্থ্যের উৎস/সম্পদ বৃদ্ধির জন্য করের হার বৃদ্ধি করাকে আমরা মনে করি প্রকৃত আদায় ব্যবস্থার দক্ষতার পক্ষে অতিরিক্ত। আমাদের লক্ষ্য হল কর-পরিধি যথাসম্ভব বাড়ানো যায়, যার ফলে উৎসাহিত নাগরিক সেবার জন্য নিজে এগিয়ে আসবেন। কলকাতা পুরসভার নাগরিক পরিষেবা উন্নয়নে নাগরিকদের যে নিরলসকারী ভূমিকা সেই বিষয়টি তাঁদের বোঝানোর জন্যে আমরা সচেষ্ট হব। ২০০১-২০০২ সালের মধ্যে সম্পত্তিকরের যথাযথ মূল্যায়ন করতে আমরা বদ্ধপরিকর যা হবে বার্ষিক মূল্যায়নের পরিবর্তে এলাকাভিত্তিক এবং যা নাগরিকদের কাছে আরও স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য হবে। আমরা মনে করি এর ফলে অভিযোগ, মামলা-মোকদ্দমা হ্রাস পাবে এবং আমাদের রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পাবে। সেই সঙ্গে আমরা অন্যান্য করবস্তু হাতে নিলাম।

আর্শিরোগ, মেয়রকলিন হাসপাতাল, মেয়র মেয়রের সেবিকা, আমেরিকা হাসপাতাল, মেয়রে ইয়োরিয়া বার্ষিক মূল্যায়নের কোনও প্রকার বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি না থাকায় আমরা সমস্যায় পড়েছিলাম। আমরা জানি যে বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানই বার্ষিকীকরণ উদ্যোগে পরিচালিত হলেও যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা হয় না। আমরা এই বিষয়ে যথাযোগ্য প্রতিবেদনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

কলকাতা সম্পত্তি-কর আদায়ের পথ সুগম করার বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা করে তিনি উপলব্ধি করেছি যে, এলাকার কলকাতার অধিবাসীর কাছে কর বকেয়া করের উপর বিশেষ ভরের ছাড়িয়ানো ও সুদ। বিভিন্ন স্তরে আলাপচারে মেয়রমেয়র, আমি আমাদের কাছে এই কলকাতার ছাড়িয়ানো ও সুদ দিতে অনিচ্ছুক। যাতে এর আদায় করার জন্য রাজ্য সরকারের অনুমোদনক্রমে আমরা একটি বিশেষ স্কীম করে করদাতাদের সমস্ত বকেয়া মিটিয়ে দিতে বলেছি ২০০১, ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে এবং তার জন্য আমরা সুদ ছাড়িয়ানো মকুব করেছি। ৩১.৩.১৯ পর্যন্ত প্রদেয় বিলের উপর ১০০ শতাংশে এবং ৩১.৩.১৯৯৯ পর্যন্ত ৭৫ শতাংশে সুদ মকুব করেছি। ৩১.৩.২০০১ পর্যন্ত ১০০ শতাংশে ছাড়িয়ানো মকুব করেছি। আশা করা যায় এর ফলে

পুরনো ভবন।

প্রায় ১৪০ কোটি টাকা অনুদান হবে।

নতুন ট্রেড লাইসেন্স দেওয়ার ব্যবস্থাকে জটিলতা মুক্ত করতে সরলীকরণ অনুষদের ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ করতে আমরা বিভিন্ন বিধি ব্যবস্থার প্রস্তাব করেছি। এর জন্যে পদ্ধতি পরিচালনা করে আমেরিকাসহ ৪৩ নির্দেশিকার মাধ্যমে আরও বেশি বেশি অনুমতি ট্রেড লাইসেন্স (Certificate of enlistment) দেওয়ার উপযোগিতা করার জন্য আমরা সচেষ্ট হয়েছি।

আমরা ইতিমধ্যেই বিজ্ঞাপন/হোর্ডিং ইত্যাদির ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনকে যুক্তিসঙ্গত করেছি। এক পর্যায় রাস্তার হোর্ডিং-এ সংখ্যাধিক্যের ছিল না যা আমরা ইতিমধ্যেই চালু করেছি। আমাদের হোর্ডিং স্থাপনের একটি বিজ্ঞাপনদাতার নীতি প্রণয়নের পরিকল্পনা আছে। হোর্ডিং-এর জন্য একটি বাস্তবধর্মী বিজ্ঞাপন কর-কাঠামো প্রবর্তনের চেষ্টাও নিয়েছি যা অনুমোদ আকারে বা সংখ্যায় উপর নয় এর অবস্থিতির ক্ষেত্রে ও উচ্চতার উপরও ধার্য হবে। প্রস্তাবিত কর কাঠামোতে বিভিন্ন ক্ষেত্রের চিহ্নিত করা হয়েছে যার-সিটি হোর্ডিং ও ফ্লাট ইলুমিনেটেড হোর্ডিং-এর জন্য।

কেন কয়েকটি ব্যবসাকেন্দ্রে যুক্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়েছে। সকল ব্যবসাকেন্দ্রে ব্যবসাক যুক্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর করা হবে যা অনুমোদ বিধিবদ্ধ যান চলা করবে যে, যুক্ত নিয়ন্ত্রণ পর্যবেক্ষণ নির্দেশিকার নিয়মিত পরিচালিতও হবে। পরিবেশ আইন ও নিয়ম অনুযায়ী অনুমোদ পুর এলাকার ধরন সংক্রান্ত বৃক্ষ শিল্প থাকছে না। পশ্চিমবঙ্গ যুক্ত নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ থেকে ছাড়পত্র পাওয়ার পরই আমরা কোনও শিল্পকে পরিবেশ সংক্রান্ত সম্মতিপত্র দিচ্ছি। অবশ্যে বায়ু, জল যুক্ত করতে আমরা ধরন সংক্রান্তযুক্ত শিল্পকে ট্রেড লাইসেন্স না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরা অনেক জায়গা থেকে ঘাট সরিয়ে সরাসরি জঞ্জাল বহন করার ব্যবস্থা করেছি, যার ফলে অনেক জায়গার ট্রাফিক জ্যাম কমেছে এবং দুর্ঘটনের হাত থেকে পথচারীরা রক্ষা পাচ্ছেন। বিশেষ বহন গাড়ীর মাধ্যমে আমরা বাড়ি বাড়ি জঞ্জাল সংগ্রহের ব্যবস্থা করেছি। এছাড়া জঞ্জাল থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যও আমরা ভেবেছি। এর জন্য Global Tender ডাকা হয়েছে।

কলকাতার নাগরিকদের বিশেষ করে ছোট ও মাঝারি পুর নির্মাণের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার সুবিধা দিতে আমরা সচেষ্ট হয়েছি। এর জন্য আমাদের নেওয়া পরিকল্প ১৯৯০ সালের বিধিবা চলার কেন কিছু কলের পুনঃ প্রয়োগ করেছি। লিফটী কলকাতার ক্ষেত্রে জল আমরা প্রয়োজনমত নিশ্চিত করেছি যাতে চলীন এবং কলকাতা আমাদের ঐতিহ্য ও পুরাতনে বাড়িগুলি বসবাস করতে সুবিধা হয়। আমাদের রেসকোর্সের হাত থেকে জমে উদ্ধৃত সাধারণ নাগরিকদের চাহিদার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য যে কোন বিল্ডিং ব্লকের কমি প্রয়োজনীয় কি-এর পরিবর্তে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি।

ঘানজট কমানোর এ পার্কিং করার সমস্যা দূর করতে পার্ক ষ্ট্রিট ও রসল ষ্ট্রিটের সংযোগ স্থলে ৬তল কম্পিউটার-চালিত স্বয়ংক্রিয় বহুতলবিশিষ্ট পার্কিং ব্যবস্থা নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অনুরূপ একটি তৈরি করা হবে এস এস হগ মার্কেটের কাছে। হগ মার্কেটের কাছে লিন্ডসে ষ্ট্রিটকে একটি Pedestrian Plaza-র রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা আছে। যাতে নিউ মার্কেটের বিজ্ঞাপনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় ও পরিবেশ উন্নত হয়। এই প্রকল্পটি সফল হলে অন্যত্র পার্কিং-এর সুবিধা বৃদ্ধির জন্য অনুরূপ অন্যত্র পরিকল্পনা নেওয়া হবে যার মূলধন হিসেবে পাওয়া যাবে স্বল্পমেয়াদে যানবাহন চলাচলের জন্য যথেষ্ট পথ।

কলকাতা জেলার জেলেরা-এ আমরা প্রায় ৫০০ বিঘা জমি সংরক্ষণ করতে পেরেছি যা জলাজলা পুনরুদ্ধার। আমরা সাধারণ মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য ওই জমি ব্যবহার করতে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা তৈরি করেছি। উত্তর চব্বিশ পরগনার জেলাশাসকের আমরা জেল বিদ্যু জমি আহরণ করেছি। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিকে পুনরুদ্ধার জমি বন্টনের সময় আমরা পরিবেশ পুরোপুরি রক্ষার চেষ্টা করতে চাই। জনসাধারণ যাতে খুটিনাটি জানতে পারেন তার জন্য আগামী বন্টন না করে টেন্ডার ডেকে জমি বন্টন করা হবে।

জলসরবরাহের ক্ষেত্রে আমরা বিদ্যু সমর্থক তুলিয়া নিয়েছি। কলকাতার জলস্তর নামুনপুষ্টি থেকে জেল নিচুতে নেমে গেছে। বাজা সরকারের ভূ-পৃষ্ঠের জল উত্তোলনে জেল বিদ্যু বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। আমরা তা দিয়েও-নয় বলে জেনেছি। তাই পরিবর্তে গভীর জল সরবরাহের দিকে আমরা নজর দিয়েছি। গঙ্গার জল চলাচলের মাধ্যমে আমরা প্রায় 100

MCD পরিচালন ভার পরিচালন ভার পরিচালনা নিয়েছি, যারে তাদের আগামী দুটি টেন্ডার এবং পার্কসার্কাস দুটি টেন্ডারের পরিপূর্ণ সমাধানের কথা আছে। কালীঘাটে আরও একটি পৃথিবী টেন্ডার আসবে। এছাড়াও আগামী এক বছরীপুরিতে দুপুরীয় কলকাতার পৃথিবী টেন্ডার স্থাপনের চেষ্টা আছে। CMDA এবং পৌরসভা এবং পরবর্তে জল সরবরাহ ব্যবস্থার আরও ভাল হবে নিয়েছে। গার্ডেনরীচে জল সরবরাহ বৃদ্ধি আরও জন্য CMWSA কাজ করছে।

এছাড়া Indo-French Protocol-এর আর্থিক সহযোগিতায় জল সরবরাহ, করার টেন্ডারগুলিকে আরও জোরদার আরে পরিচালনা ব্যবস্থাকে হাতে হাতেছে। জল সরবরাহ পাইপের নিম্নের জন্য আরও এ ব্যবস্থের একটি নিম্নের দিক। ১ থেকে ১০০ পাইপ এবং পাইপটি প্রকল্পের হিসাবে ৬০ লক্ষ পাইপকে নেয়া নেওয়া হয়েছে।

আমাদের প্রতিদিন পরিস্কোলন করা ও CMWSA-র মতো সাহায্য আছে থেকে আগে যেটি প্রায় ২২০ মিলিয়ন গ্যালন জলের মধ্যে জন্য পরিমান জল মিলি হয় তার হিসের নিম্ন কলকাই আমাদের পাইপের কারণে পাই না। আরও বেশি বেশি জল পরিশোধন ক্ষমতাবৃদ্ধির পরিকল্পনা যদি আমরা এই অপচয় বন্ধ করতে পারি তা হলে একটি বড় আকারের চাহিদা মেটা করা যাবে। ইংলো-ফ্রেঞ্চ প্রোটোকল অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ স্থানে চাপ ও প্রবাহ মিটার (Pressure & Flow Meters) বসানো হচ্ছে যাতে পরিচালনায় জলচাপের ক্ষেত্র চিহ্নিত করা যায়। ২০০০ সালের আগষ্ট মাসে কাজ শুরু হয়েছে ৩৩ মাস সময়ের মধ্যে তা সম্পূর্ণ হবে।

সাধারণ নাগরিকেরা কাছে তথ্য আরও সহজভাবে ও তাড়াতাড়ি পৌঁছে দিতে আগামী ২০০০ থেকে কলকাতা পুরসভা CALMANAC Web Site চালু করেছে। এই ইন্টারনেটের উৎসাহ হল তাদের লাইটের মাধ্যমে নাগরিকগণ তাদের জেলের পাওনার সম্পর্কে তথ্যাদি জানতে পারবেন, এবং সম্পত্তি কর ইত্যাদি সম্পর্কে পুরসভার কা এদের টাকা জমা দিতে পারে। আমরা আশা করছি সহজ পদ্ধতিতে সহজে পৌঁছে দিতে পারি। আগামী দিনগুলিতে CALMANAC আরও তথ্যসমৃদ্ধ, পরিপূর্ণ এবং বাণিজ্যিক বাস্তব হয়ে তোলা হবে।

ঐতিহ্যশালী ভবনগুলি রক্ষণাবেক্ষণে কলকাতা পুরসভা উদ্যোগী। আমরা এ পর্যন্ত ১০২টি ঐতিহ্যশালী ভবন চিহ্নিত করে Heritage Building হিসাবে ঘোষণা করেছি, এবং তাদের যথাযথ মর্যাদা রক্ষার ব্যাপারে সতর্ক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এই মধ্যে উত্তরাধিকারের হল লালদীঘি সরকারদের চলাচলের পায়ের 'স্টার বিল্ডিংস' এবং আমরা এটিকে ভাড়াদার থেকে মুক্ত করিয়ে আনতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

জলকরের আদায়ের সম্পর্কে হল পুরসভা আরও তীব্র। বিভিন্ন উদ্যোগমূলক সপ্তাহের মধ্যে এককালীন আমরা নবী বাঁধাবাড়ী ভবনের পৌরসংস্কার পরিচালন মুক্তভার উদ্যোগী হয়েছি।

একটি সমীক্ষা থেকে দেখা গেছে, পুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাতের সমস্যা রয়েছে। আমরা এটা দূর করতে চাই। অতিরিক্ত মুখ্যশিক্ষকের শ্রেণীতে অনুপাতের এলাকায়, যেখানে একজন পুরপিতাদেরিই শিক্ষকদের সুযোগ নেই, সেখানকার ছাত্রদিগকে একত্র দেওয়া হবে। জলকরের বাকিবকেয়ে মধ্যে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ হচ্ছেন বস্তিবাসী। তাঁদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করতে আমরা আগ্রহী। এর জন্য কলকাতার বস্তিগুলির সমীক্ষা আমরা শুরু করেছি। বস্তিবাসীদের জন্যে NSDP, NRY, SJSRY প্রভৃতি প্রকল্পের আর্থিক রূপায়ণ আমরা তরান্বিত করার সঙ্গে সঙ্গে চালাচ্ছি।

জলকরের ৪০ শতাংশ অনুন্নত বস্তিবাসী। কিন্তু অতি উৎসাহের আরও বেশি পরিমাণে করা হয়নি। তা হয়নি। বস্তিগুলির পরিকাঠামোর উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। বিশেষত সানিটেশন, বিজলী ব্যবস্থা, রাস্তা, জলপথ ইত্যাদি ক্ষেত্রে।

গত ৯ জুলাই ২০০০ সালে ১৯৯৩ প্রতিশ্রুতি পৌরসংস্থা অভিযানসূচী পরিপূরিত পৌর ক্ষেত্রের কর্মীদের আমাদের উপর অর্পিত হয়েছে। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হল : কলকাতার নাগরিকদের কাছে নাগরিক পরিষেবা আরও সহজলভ্যরূপে পৌঁছে দিতে আমরা সচেতন আমাদের কর্মীরাও নাগরিক পরিষেবার আরও ভালো মানের জন্য আমরা সচেতন। আমাদের কর্মীদের কর্তব্যের মধ্যে আমরা সমন্বয় সাধনে নিয়মিত নাগরিকদের মুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখা হবে।

আমরা পরিষেবার মানের ক্ষেত্রে কর্মীদের সচেতন করেছি। আমরা মেয়র পরিষদ এবং পুর আধিকারিক কর্মীদের বৈঠকের সমন্বয়সাধনের আমরা পুর পরিষেবাকে এগিয়ে চলেছি। প্রাথমিক নীতি হল চাহিদাটি। কি চাহিদা তা নিয়ে বিচার করার মোদ মানসিকতা আমাদের নেই। জলপথে ধরে আমরা নির্ভরিত হয়েছি। জলপথ বাঁধানোর দেখাশোনার ভার আমাদের উপর অর্পণ করেছেন। আমরা তাই বাহিত পালনে নিজেদের সর্বাত্মকভাবে নিয়োজিত করেছি।

আমরা সর্বস্তরে সহযোগিতা চাই। কলকাতা মহানগরীকে অক্লান্তিনী হিসেবেরা আরও তুলতে আমরা কৃতসংকল্প এবং তাইতে বেধেছি। তাই আমরা অন্তর্ভুক্তিতে ছাত্র সমাজের সহযোগিতা গ্রহণ করেছি এবং করব। ছাত্র সমাজের কাছে পরিচালনার আমাদের সংস্থাগুলির বন্ধে আমার নিবেদন এবারে তুলে ধরেছি। স্লোগান "আমরা গড়ব কলকাতা" সর্বস্তরে সহযোগিতায় মনোভাব নিয়ে তুলতে আমরা আগামী।

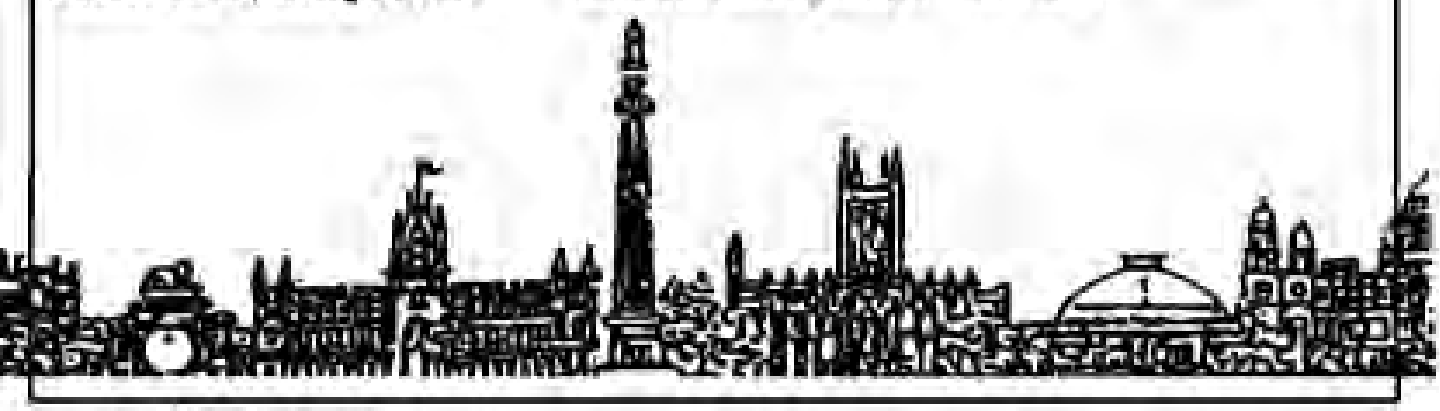

গনতন্ত্রের সুস্থ-সুন্দর আদর্শ পৌরঅধিবেশনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি

অনিল মুখোপাধ্যায়
চেয়ারম্যান

কলকাতা পুরসভার চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করি গত ৮ জুলাই। গত একবছরে পুরসভার কাউন্সিল চেম্বারে মোট অধিবেশন হয়েছে ১৩টি। প্রতিমাসে একটি করে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। শুধু অধিবেশন-ই নয়, সংসদীয় নিয়মকানুন, আচার আচরণ সম্পর্কে বিভিন্ন বিধিবদ্ধ আইনকানুন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করানোর জন্য গত ২১ নভেম্বর আমার সভাপতিত্বে কাউন্সিল চেম্বারে কাউন্সিলারদের নিয়ে একটি ওয়ার্কশপ ও করা হয়। এছাড়া, চলতি পুর নিয়মবিধি পর্যালোচনা এবং রিভিউ করার জন্য সাত জনের একটি কমিটি গঠন করে দেওয়া হয়েছে। এর সদস্য হলেন, মহানাগরিক, বিরোধী দলের চীফ হুইপ এবং সঙ্গে মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল কমিটির চেয়ারম্যান সহধ্যক্ষ প্রমুখ। এই কমিটিতে রাজ্য বিধানসভার ডেপুটি সেক্রেটারি মহাশয়কেও সদস্য করা হয়েছে।

গণতন্ত্রের সুস্থ ও স্বাভাবিক রীতিনীতিকে মর্যাদা দেবার জন্য গত একবছরে আমার নেতৃত্বাধীন অধিবেশনে বিরোধীদলকে বক্তব্য বলার জন্য বিশেষ সুযোগ দেওয়া হয়েছে। তাঁদের অভাব অভিযোগ সম্পর্কে যথারীতি গুরুত্ব দিয়েছি।

অধিবেশন চলাকালীন অধিবেশন কক্ষ সঠিকভাবে চালানোর স্বার্থে অধিবেশন চলাকালীন মোবাইল ফোনের ব্যবহার নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে। কক্ষের পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা এতদিন ছিলনা তা করা হয়েছে। কাউন্সিলারদের বসার ব্যবস্থাটি নতুন করে সাজানো হয়েছে।

> “গত একবছরে পুরসভার কাউন্সিল চেম্বারে মোট অধিবেশন হয়েছে ১৩টি। প্রতিমাসে একটি করে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। শুধু অধিবেশন-ই নয়, সংসদীয় নিয়মকানুন, আচার আচরণ সম্পর্কে বিভিন্ন বিধিবদ্ধ আইনকানুন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করানোর জন্য গত ২১ নভেম্বর আমার সভাপতিত্বে কাউন্সিল চেম্বারে কাউন্সিলারদের নিয়ে একটি ওয়ার্কশপ ও করা হয়।”

গত ৯ ফেব্রু-য়ারি ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের কাউন্সিলার সঙ্গে এক বৈঠক করে কাউন্সিলারস ক্লাবরুম সম্পর্কে কিছু বিশেষ ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হয়েছে। এরফলে ক্লাবরুমের পরিস্থিতি আগের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে সুন্দর হয়ে উঠেছে। আগে এই রুমে প্রবেশের কোনও নিয়মকানুন ছিলনা বললেই চলে। কাউন্সিলাররুমে প্রবেশ করতে হলে সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলারের অনুমতি সাপেক্ষে প্রবেশ করতে হবে। এটা আলোচনার ভিত্তিতে ঠিক হয়। এই নিয়ম কড়াকড়িভাবে চালু করায় কাউন্সিলারস রুমের সেই আগের বিশৃঙ্খল চেহারা আর নেই। এমনকি শৃঙ্খলা আরোপিত হওয়ায় কাউন্সিলাররুমের পরিবেশ একেবারে পাল্টে গেছে।

কাউন্সিলার ও সাধারণ কর্মীদের যৌথ উদ্যোগে গত ৪ নভেম্বর এই রুমে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিজয় সম্মিলনীও করা হয়েছে। আমার পৌরহিত্যে সুষ্ঠুভাবে মিউনিসিপ্যাল একাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচনও সম্পন্ন হয়েছে।

কাউন্সিলারদের সঠিক সহযোগিতা সুনিশ্চিত, সম্পর্কে গত একবছর কাউন্সিলারদের অধিবেশন সঠিকভাবে চালানোর চেষ্টা করছি। তাঁদের সহায়তে ও সহযোগিতায় আগামী দিনেও তা অব্যাহত থাকবে তা বিশ্বাস করি।

সীমিত আর্থিক ক্ষমতা সত্ত্বেও নাগরিক পরিষেবা বৃদ্ধি করে যাব

মীনা দেবী পুরোহিত
উপমহানাগরিক (আইন, জরিপ, প্রশিক্ষণ, মহাফেজখানা)

পুরসভার ভ্যালুয়েশন সার্ভে (এস্টেট ম্যানেজমেন্ট), আইন, রেকর্ড এবং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট টেবর মতো গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলিতে নাগরিক পরিষেবার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। দপ্তরগুলি সর্বোতোভাবে পরিচালনা প্রশাসন এবং যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে রয়েছেন পুরসভার ডেপুটি মেয়র।

ডেপুটি মেয়র হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করবার পর দপ্তরের সমস্ত রকমের কাজ পর্যালোচনা করা সম্ভব হয়েছে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। যার ফলস্বরূপ দপ্তরে কাজের গতি এসেছে। ব্যক্তিগতভাবে ইতিমধ্যে থেকে আমার দায়িত্বে যে সমস্ত দপ্তর রয়েছে, সেই সমস্ত দপ্তরের সমস্যা গুলি সমাধানের ঊর্ধ্ব চেষ্টা করেছি। বিগত জুলাই মাসে দপ্তরের বিভিন্ন কর্মক ইনেদের নিয়ে সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে জরুরী বৈঠক করা হয়েছে। পদস্থ এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী ও অফিসারদের যথাযথ ব্যবস্থা নেবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষ যেন বেশী করে নাগরিক পুরষেবার সুযোগ পান, বিশেষ করে যাঁরা পুরসভাকে নিয়মিত কর দেন। তারা যেন এই পরিষেবা থেকে বঞ্চিত না হন, সে ব্যাপারেও প্রয়োজনীয় উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করেছি।

কলকাতা শহরের প্রাণকেন্দ্র ডালহৌসী স্কোয়ার।

টিক ক্যামুয়াল এবং সার্ভেলান্স বিভাগ

মহানগরীতে পুরসভার যে সমস্ত এস্টেট রয়েছে, সেই সমস্ত এস্টেটের যাবতীয় বেকর্ড রিজার্ভে রক্ষণাবেক্ষণ করাই হল ডকুমেন্টেশন ও লগ্নে বিভাগের আসল কাজ। পুরসভা যাতে অযথা কোর্ট কেসে বহুধন অপচয় করতে না পারে, সে কারণে যাবতীয় তথ্যাদি তুলিয়ে রাখেন এই বিভাগের কর্মীরা। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, পুরসভার এই বিভাগটি বহুদিন ধরেই অবহেলিত হয়ে রয়েছে। বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে থাকা বিপুল পরিমাণ সম্পত্তির যে তালিকাটি এখন বিভাগে রয়েছে তা অত্যন্ত অসম্পূর্ণ। তাছাড়া বাঁধা কর্মচারীদের দিয়ে এখন সার্ভেলান্সের কাজও করানো হচ্ছে। পুরসভার বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিপুল পরিমাণ সম্পত্তির যে তালিকাটি এখন বিভাগে রয়েছে, তা টৈরিলগ্নের সময়ের অর্থাৎ নব্বই এর দশকের শুরুতে নির্মিলকরণের ফলে তৈরী হয়েছিল। এই বিভাগে যেসব কর্মচারী রয়েছেন, তাঁদের অধিকাংশই বয়স্ক। তাঁদের বাঁধা কর্মচারী হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল। তাঁরা পুরসভার সম্পত্তি যেমন সঠিকভাবে চিহ্নিতকরণের কাজ ঠিকমতো করে উঠতে পারেননি। তেমনি কিছু পুরসম্পত্তি রয়েছে, যে সম্পর্কেই কোনও তথ্য বা নথি বিভাগে নেই। ফলে কিছু পুরসম্পত্তি রয়েছে, যে সম্পর্কেই কোনও তথ্য বা নথি বিভাগে নেই। ফলে কিছু পুরসম্পত্তি রয়েছে, যে সম্পর্কে

বিজ্ঞানভিত্তিক অপসারণ ব্যবস্থা চালু করার চেষ্টা চলছে

মালা রায়
মেয়র পারিষদ (জঞ্জাল অপসারণ, হোর্ডিং-বিজ্ঞাপন, এস্টাবলি ওয়ার্কশপ)

না, পারিনি। কলকাতা শহরকে ঘরের মেঝের মত পরিষ্কার ঝকঝকে করে তুলতে পারিনি। আর্থিক সমস্যা। কিন্তু ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক অসহযোগিতায় আমার নিজের স্বপ্নমত শহরকে গড়ে তুলতে পারিনি। তবে শহরবাসীর প্রত্যাশা যে কোনও কিছুই পূরণ হয়নি, তাও ঠিক নয়। কলকাতা পুরসভায় ড. সুব্রত বি. ডে. সি'র নেতৃত্বাধীন পুরবোর্ড আসার পরেই শহর পরিচ্ছন্ন রাখার গুরুদায়িত্ব মহানাগরিক সুব্রত মুখোপাধ্যায় আমার অর্পণ করেন। এর কিছুদিন পরেই দায়িত্ব নিতে হয় হোর্ডিং নিয়ন্ত্রণের। এর পরপরেই অতিরিক্ত ভারে কলকাতার মহানাগরিক সম্ভার মুখপত্র কলকাতা পুরবীকে নবকলেবরে প্রকাশ করার দায়িত্ব দেন। পুরবীর দায়িত্ব নেবার পর প্রথমেই বুঝতে পারি, এই প্রকাশনাটির আর্থিক সংকটে প্রায় বিপর্যস্ত পুরসভার লক্ষ লক্ষ টাকা প্রায় জলে চলে যাচ্ছে। মনে হয়, এর ছাপাখানা পরিবর্তন না হলে এর থেকে রেহাই নেই। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে নতুন মুদ্রণ সংস্থার খোঁজ হল। এরপর বিজ্ঞাপনের উত্তরে আবেদনকারীদের বক্তব্য খুঁটিয়ে দেখে প্রাথমিক স্তরে কয়েকজনকে নির্বাচন করে পুরসভার প্রেস সুপার সমেত কয়েকজন অফিসারকে নিয়ে গঠিত একটি টিম মুদ্রণ সংস্থা গুলির প্রকৃত অবস্থা সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। এর পর

হাসপাতালের বর্জ্য পদার্থ বিশেষ পদ্ধতিতে ভাস্পিং গ্রাউন্ডে ফেলা হচ্ছে।

শহরের আবর্জনা ধাপা ডাম্পিং গ্রাউন্ডে এনে ফেলা হচ্ছে।

কমিটির সুপারিশক্রমে মুদ্রণ খরচ ঠিক করে 'পুরশ্রী' ছাপানোর কাজ শুরু করা হয়। এর ফলে নির্দিষ্ট দিনে ১ জুলাই পুরশ্রীর বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত করা গেছে। আগের তুলনায় কপি বিলু লক্ষও পড়েছে অবিশ্বাস্য রকম কম। আশা করা হচ্ছে, 'পুরশ্রী' এবার থেকে নিয়মিতভাবে কম খরচে প্রকাশ করা সম্ভব হবে এবং আগের তুলনায় অনেক কার্যকরী ভাবে পুরদুয়ারপত্র-কে জনসংযোগের কাজে প্রয়োগ করা যাবে। ইতিমধ্যে, 'পুরশ্রী'র সিডি থেকে রেজিস্ট্রেশন নম্বরও এসে গেছে। কিন্তু পুরবোর্ড দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় একাজ করে উঠতে পারেনি। পুরশ্রীর ছাপার মান, বিষয়বস্তু তাদের তুলনায় নিশ্চিতভাবেই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মহানাগরিক মহোদয় প্রকাশনার কাজে সবিশেষ যত্নের দেখার জন্য অতিরিক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে একটি উপদেষ্টা মণ্ডলী গঠন করেছেন।

নাগরিকদের সচেতনতা বৃদ্ধির স্বার্থে আরও কিছু নতুন পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে।

জঞ্জাল অপসারণ বিভাগ বাড়ি থেকে গাড়ি, গাড়ি থেকে ধাপায় বর্জ্য অপসারণের জন্য নতুন পদ্ধতি চালু করেছে। কেজা ১০টার মধ্যে সাফাইয়ের কাজ শেষ করার জন্য 'ডাইরেক্ট লেভিং' পদ্ধতিও চালু হয়েছে। পঁচিশ-বছর বাদে রাস্তা মেরামত কাজ পুরোদমে চালু করা হয়েছে। বিবাদী সরণী, বৌবাজার স্ট্রিট, জহরলাল নেহরু রোড, কামাক স্ট্রিট, হাজরা মোড়ের একাংশে, রাজাবাজার, ডিক্রুজ পরিকীর্ণ রাস্তা, কলেজ স্ট্রিট, নির্মল চন্দ্র স্ট্রিট, হরিশ মুখার্জি রোড, রাসবিহারী এভিনিউ, আমহার্স্ট স্ট্রিট, কালিঘাট রোড, রানী রাসমনি এভেনিউ, এস.এন.ব্যানার্জি রোড, পার্ক স্ট্রিট, মহাকরণ, রবীন্দ্র সদন সংলগ্ন রাস্তা সহ মোট ২১ টি রাস্তা মেরামত পরিকল্পনায় নাগরিকদের দীর্ঘদিনের একটি দাবি পূরণ করা সম্ভব হয়েছে।

শহরবাসীকে আরও বেশী পুর-পরিষেবা দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট সময়ের আগেই ভাটি শহরগুলি যাতে পরিষ্কার করা যায় সেদিকে, বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। মোট আবর্জনার শতকরা ৯০ ভাগ-ই প্রতিদিন বেলা সাড়ে দশটার মধ্যেই সরিয়ে ফেলা হচ্ছে। বলাবাহুল্য, এ রকমটা আগে হত না।

বিভু বিভু জায়গায় সাধারণ নাগরিকদের অসুবিধার কথা চিন্তা করে ময়লা ফেলবার ভাটি সরিয়ে ফেলা হয়েছে। এবং সরাসরি লেভিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। বীথি সিনেমা ভাটি, উদয়গেট ভাটি, প্রীতম আশ্রম ভাটি, শ্যাম পার্ক ভাটি, লর্ড সিনহা রোড ভাটি, পতিতিয়া ভাটি, নিউ আলিপুর 'এফ' ব্লক ভাটি, স্টেট ব্যাঙ্ক কাছেপোলা ভাটি — বহু পুরবাসী এই সব ভাটি অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ায় তাঁদের অভিনন্দন জানিয়েছেন পুরসভাকে। উত্তর কলকাতার খাল্লা মিলের সামনের খোলা ভাটি বহু বছর ধরে ঐ এলাকায় এক নারকীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি করে রেখেছিল। এলাকার মানুষদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল ঐ ভাটি অবিলম্বে সরিয়ে ফেলতে হবে। নতুন বোর্ডের আসর পরই এই দাবি আমার কাছেও আসে। জঞ্জাল বিভাগের মেয়র পারিষদের দায়িত্ব নিয়েই বিভাগীয় ইঞ্জিনীয়ারদের সঙ্গে কথা বলে ঐ খোলা ভাটি-এর আতঙ্ক থেকে এলাকার বাসিন্দাদের মুক্তি দিয়েছি। এই কাজ করার পরিণতিই এক প্রবীন

বাসিন্দের সচেতনতা বোধ করে তুলতে হবে।

ইতিহাসে, কলকাতা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কোল গ্যাসের ব্যবহার করা হয়েছে। কলকাতা বন্দর থেকে মাল পেয়ে শহরে আসা ঘোড়াগাড়ি জন্য ইতিহাসের অংশে চুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইলেকট্রিকের ওয়েস্টিং সমাধানের জন্য কলকাতার সাধারণ হাসপাতাল ও মানসিক রোগের হাসপাতালের এলাকা ছাড়া সৃষ্টির কাজ অবহেলিত রয়েছে।

বাড়ো ইলেকট্রিকেলের মতো ব্যবস্থাপনা পরিবেশ ও নিষ্কাশনের ক্ষেত্রেও বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। এই ব্যবস্থার কিছু নতুন প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ করেছে।

বাড়ো ১১ থেকে ১৪তে যাদবপুর জন্য বাজার জন্য দীর্ঘদিন ধরে যে সমস্যা ছিল তাইয়ের এবেলি, ও এল.জি.ও দের কাছে পলিথিন তার সমাধান করা হয়েছে।

> “শহরবাসীকে পুর-পরিষেবা দিতে চাই শুধু নয়, আমাদের পুরবোর্ডের মূল স্লোগান-ই হল “পরিচ্ছন্ন পুরসভা, পরিচ্ছন্ন কলকাতা।” আর এই স্লোগানকে বাস্তবায়িত করার জন্য বেহালা, যাদবপুর, গার্ডেনরীচ থেকে শুরু করে শ্যামবাজার, বেলগাছিয়া, কুমোরটুলি শোভাবাজার পর্যন্ত কলকাতায় এক স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ গড়ে তুলতে আমরা সবাই — পুরকর্মীরা ও নাগরিকেরা যৌথভাবে নিরলস প্রয়াস অব্যাহত রেখেছি।”

শহরবাসীকে পুরপরিষেবা দিতে চাই শুধু নয়, আমাদের পুরবোর্ডের মূল স্লোগান-ই হল “পরিচ্ছন্ন পুরসভা, পরিচ্ছন্ন কলকাতা।” আর এই স্লোগানকে বাস্তবায়িত করার জন্য বেহালা, যাদবপুর, গার্ডেনরীচ থেকে শুরু করে শ্যামবাজার, বেলগাছিয়া, কুমোরটুলি শোভাবাজার পর্যন্ত কলকাতায় এক স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ গড়ে তুলতে আমরা সবাই — পুরকর্মীরা ও নাগরিকেরা যৌথভাবে নিরলস প্রয়াস অব্যাহত রেখেছি।

এ কাজের সার্বিক রূপায়ণ করতে আমি কি.মি.ও, বিভাগীয়-ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে প্রতিদিন ভোর দুটো থেকে শহর পরিদর্শনে বেরিয়ে পড়ি, কঞ্জাল অপসারণের কাজকর্মের গতি সঠিক ভাবে অব্যাহত রাখতে। আমরা কেই আমার ২৪৪-৭০০৪ টেলিফোনে কঞ্জাল অপসারণের ব্যাপারে নানা সমস্যার কথাও জানান। পরিচ্ছন্নতার অংশে কেউ কেউ পরামর্শও দেন। এটি এতে গর্বিত। নাগরিকদের সমস্যা এবং তাঁদের পরামর্শ আমি আন্তরিক বলে মনে করি। এবং সে সম্পর্কে যথা সময়ে ব্যবস্থাও নিই।

আমরা শহরে কঠিন বর্জ্য ফেলা নাগরিক সচেতনতা দিয়ে বলার সঙ্গে সঙ্গে নতুন পুরবোর্ডের কঞ্জাল অপসারণের ইতিহাসকে নিরক্ষরতার মুক্তি হয়ে পুরপরিষেবার চেহারাকে বদলে দিয়েছে।

আরো জানতে চাই, নতুন পুরবোর্ড এসে পরিষেবার দেবার পর কঞ্জাল অপসারণের ব্যাপারে যান্ত্রিক ব্যবস্থাদির আধুনিকীকরণ, কর্মীদের নানা পরিবর্তন, নানা ব্যাপারে নাগরিকদের পরামর্শ আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। গোয়াটুলি লেন, টালিগঞ্জ ডেপো, অবকিশলয় ও বিজয় গড় সংযোগস্থলে, কঞ্জাল অপসারণ বন্ধুদের নতুন ওয়ার্ড অফিস তৈরীর ব্যাপারে লোকের নাগরিকদের ভূমিকাও কম নয়।

এখন কঞ্জাল ফেলার কাজ সুষ্ঠুভাবে করার জন্য ভালোমানের ট্রাক্টর এবং ভূল ফেল তৈরির ফলে অবকর্জনা ফেলার কাজ সুবিধাজনক হয়েছে। এই বছরে এই বিভাগ একসঙ্গে ৭টি ট্রাক্টর, ৪টি লুপ এবং ৪টি অ্যাম্বো জন্য তৈরি করবে যার ফল হবে সুদূরপ্রসারী। কমপিউটারাইজড ডেকপোষ্টের সাহায্যে একটি কন্ট্রোল সেটি-ও তৈরি করা হবে। যাতে ইলেকট্রিকেল বর্জ্যের ক্ষেত্রে অপসারণ, এবং শোধনের জন্য একটা সহজতর উন্নত বিজ্ঞান ভিত্তিক অপসারণ ব্যবস্থার বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করছি।

শহরকে সর্বাঙ্গীনভাবে ভালো করে পরিচ্ছন্নতা রাখার জন্য পরিচালনার রক্ষণাবেক্ষণ এবং কঠিন বর্জ্য পরিবহণের জন্য নতুন গাড়ি এবং শে-লোডার ক্রয় এবং গাড়ারেজ নিয়ে আরও নতুন কিছু চিন্তা ভাবনা সৃষ্টির পরিকল্পনা খুব শীঘ্র রূপায়িত হবে।

শে-লোডারের সাহায্যে শৌচালয়ের পরিষ্কার করা এক দৃশ্য।

জল বণ্টন ব্যবস্থায় নতুন বোর্ড আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য নিচ্ছে

শোভন চট্টোপাধ্যায়

মেয়র পরিষদ (জল সরবরাহ)

কলকাতা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে কলকাতা মহানগরীতে পরিশ্রুত পানীয় জলের চাহিদাও বৃদ্ধি পেয়েছে। ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহার করা সম্পর্কে রাজ্য সরকারের কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা থাকায় বর্তমান পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহের চাহিদা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। পানহা এবং গার্ডেনরীচের জল সরবরাহ ক্ষেত্রের জল সরবরাহের আলাদা ব্যবস্থা রিপোর্ট দর্শাচ্ছে। কলকাতা পুরসভা কর্তৃক পানহা জল সরবরাহ ক্ষেত্র থেকে এম এম ডি এ কর্তৃক গার্ডেনরীচ জল সরবরাহ ক্ষেত্রের জল সরবরাহের চাপ বৃদ্ধি করা আশু প্রয়োজন। কলকাতা পুরসভা পি এইচ ই-র সহযোগিতায় আরও ১০০ এম জি ডি পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা নিতে হবে। বর্তমানে ২২০ এম জি ডি পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ করা হয়। কলকাতায় পূর্ব প্রান্তে যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে সেখানকার অধিবাসীদের জন্য আরও বেশি পরিশ্রুত পানীয় জলের প্রয়োজন হয়ে পড়বে। বর্তমানে পানীয় স্টেশনে অপরিশ্রুত জল শোধন করার পরিকল্পনার কথা পরিমিতভাবে চিন্তা করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থমন্ত্রীর বাজেট অধিবেশনে পূর্বাঞ্চলে টাকশালের যে অর্থ আছে তা কলকাতা পুরসভাকে সেখানে পরিশ্রুত পানীয় জলের প্রধান কার্যালয়ে তার বিনিময়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ পাঠিয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

পলতায় নির্মীয়মান ৪০ এম জি ডি পরিশ্রুত জল সরবরাহ কেন্দ্রের অতিরিক্ত অংশে ৪০ এম জি ডি পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ বৃদ্ধি করছে আর একটি ফেজ স্থাপনের কথা ভাবা হয়েছে। বাজা সরকার, কলকাতা পুরসভা, পি এইচ ই এবং জাপানের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি যৌথ সমীক্ষা করা হয়েছে। এই সমীক্ষা অনুযায়ী ২০০১-এ আরও ১০০ এম জি ডি পরিশ্রুত পানীয় জলের চাহিদা হবে। এই চাহিদা পূরণের জন্য পলতায় ১০০ এম জি ডি পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ ক্ষেত্রের কাজ এখনও চালু হয়নি। চালু হলেই তালদাঙীর কাজে হাত দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে টালায় অনুরূপ ক্ষমতা করা হচ্ছে, আগামী আগামী, ২০০১-এ আরও করা যাবে। তালদাঙীতে বৃহৎ পাইপই একটি জলাধারসহ বৃদ্ধি পাম্পিং স্টেশন স্থাপন করা হবে। পি এইচ ই এ বাঁশদ্রোণী এবং গার্ডেনরীচে পাম্পিং স্টেশন স্থাপন করার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। এই সব এলাকার জল সরবরাহের চাপ নাটক করার জন্য।

কলকাতা পুরসভার অধীনে বর্তমানে ৩৪৪টি বৃহৎ নলকূপ এবং ১,৫০০টি ক্ষুদ্র নলকূপ আছে। বর্তমান আর্থিক বছরে ১১টি বৃহৎ নলকূপ বসান এবং ৭টি নতুন বৃহৎ নলকূপ বসানোর কাজ চলছে। বাজেট অধিবেশন থেকে ১১১৭টি ক্ষুদ্র নলকূপ এবং সাগের অধিবেশন থেকে ১৬০টি ক্ষুদ্র নলকূপ এই আর্থিক বছরে বসানো হয়েছে।

জলকরের পরিবর্তে এবার পূর্বাঞ্চলেই ই এম, বাইপাস অঞ্চলের পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহের, পরিকাঠামোগত কাজের জন্য রাজ্য সরকারের কাছ থেকে অর্থ সংস্থানের দাবি করা হয়েছে।

যেহেতু কলকাতায় পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহের মূল দায়িত্ব কলকাতা পুরসভার সেইহেতু পি এইচ ই-র চেয়ারম্যান ভূগর্ভস্থ জলস্তর এবং পরিবেষ্টিত বাঁশদ্রোণী ও গার্ডেনরীচ কলকারখানার পরিচালন কার্যকলাপ হাতে নেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে, পি এইচ ই এ নীতিগতভাবে রাজি হয়েছে।

ইছাপুর-কামারহাটি মেট্রোপলিটন আর্থিক সহায়তায় জল সরবরাহ বণ্টনের ব্যবস্থার পরিমার্জনের উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের মূল্য ধার্য করা হয়েছে ৪৫ কোটি টাকা। জল বণ্টনের ক্ষেত্রে পুরসভার নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা, জল বণ্টনের ক্ষেত্রে পুরসভার নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা এবং তার প্রতিষ্ঠার। আধুনিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উন্নয়ন সংক্রান্ত সাধারণ প্রকল্পের ৩০ কোটির মধ্যে ১ কোটি ১৩৫ ওয়ার্ডের ভিতর জল বণ্টনব্যবস্থার ক্ষেত্রে পরিমার্জন করা। পাইপই মেরামতীর দিগারে ৬৩৫ কিলোমিটার সর্বমোট জলের মিটার বসিয়ে জল বণ্টনব্যবস্থার ক্ষয় ও লুকানোর বিষয়ের সঠিকভাবে অনুসন্ধান করা এবং তা রোধ করার বিশেষ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

কলকাতাবাসীকে আধুনিক নিকাশী ব্যবস্থার সুফল দিতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ

রাজীব দেব
মেয়র পারিষদ (নিকাশী ও ক্রীড়া)

বর্তমান পুরবোর্ড কলকাতাবাসীকে উন্নত নাগরিক পরিষেবা দিতে দায়বদ্ধ। ক্ষমতায় আসার পর গত একবছরের মধ্যে, এই দপ্তরের লক্ষ্য স্থির হয় — এমনভাবে কাজ করতে হবে যাতে এর ফল সুদূরপ্রসারী হয়। এর জন্য দুভাবে আমরা এগোবার পরিকল্পনা করেছি। এক — নির্দিষ্ট এলাকাভিত্তিক ছোটো কিন্তু গঠনমূলক কাজ। এই কাজে সমস্যা চিহ্নিত করে তা বৈজ্ঞানিক সমাধানের মাধ্যমে করতে হবে। দুই — কলকাতার সামগ্রিক নিকাশী ব্যবস্থার সমীক্ষা ও তার দূরীকরণের জন্য পরিকল্পনা ও তার রূপায়ণ। প্রথম ক্ষেত্রে, এলাকাভিত্তিক বিভিন্ন কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বাস্তুকারকে দায়বদ্ধ থাকতে হবে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে — ADB এবং বিশ্ব ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে উন্নয়নের ব্যাপারটিকে ত্বরান্বিত করা হচ্ছে। ADB ঋণের ব্যাপারটি সম্পত্তি ও চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে চলেছে। এখন বিশদ পরিকল্পনা ও তার টেন্ডার সংক্রান্ত কাজকর্ম দ্রুত এগোচ্ছে। এই কাজ সম্পন্ন হতে ছয়/সাত বছর লাগবে এবং এর দ্বারা সংযোজিত এলাকা যাদবপুর, বেহালা ও গার্ডেনরিচ এবং কাশীপুর অঞ্চলের মানুষ আধুনিক নিকাশী ব্যবস্থা ভোগ করতে পারবে।

বিশ্বব্যাঙ্কের ঋণের প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ শেষের দিকে। এরপরে বিভিন্ন আইনি ব্যাপার ও শর্তাদি গ্রহণ সাপেক্ষে পরবর্তী পর্যায়ের কাজে হাত দেওয়া হবে। এই কাজ রূপায়িত হলে মূল কলকাতার নিকাশী ব্যবস্থার অভাবনীয় উন্নতি হবে। পুরবোর্ডের সীমিত আর্থিক ক্ষমতার জন্য, আধুনিক নগরোন্নয়নের স্বার্থে এই ঋণ নেওয়া অত্যন্ত জরুরী।

গত একবছরে নিকাশী দপ্তর নিকাশী পাইপ/ড্রেন/ব্রিক সুয়ারের পলি পরিষ্কার করার উপর জোর দিয়েছে। যেসব জায়গায় manually কাজ করা কঠিন সেখানে মেশিন দিয়ে জোরদার desilting করানো হয়েছে ও হচ্ছে। সমস্ত কলকাতায় শীতকালীন desilting অভিযান চালানো হয়েছে এবং তার সুফল পাওয়া যাচ্ছে। পাম্পিং স্টেশনগুলির সিল্ট পিট বারে বারে পরিষ্কার করানো হয়েছে। বিভিন্ন পাম্পিং স্টেশনে বর্তমান পাম্পগুলি আংশিক সংস্কার করা হয়েছে এবং নতুন পাম্প বসানোর কাজ চলছে।

মূল কলকাতার জলজমা প্রবণ নীচু এলাকা গুলিতে জল জমার সময় কমানোর জন্য কি করা যায় তার সমীক্ষা চালানো হয়েছে এবং আর্থিক ব্যবস্থা করে, পর্যায়ক্রমে তার রূপায়ণ করা হবে। এই চিন্তাধারার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে, কলকাতার বিখ্যাত জলজমা প্রবণ এলাকা Southern Avenue ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য Southern Avenue-এ একটি Lifting Station গড়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এর কাজ এ বছরেই শুরু হবে।

কলকাতার নিকাশীর জল কলকাতার পূর্বে বিভিন্ন আর্টিফিশল ক্যানাল গুলির মাধ্যমে কুলটি নদীতে গিয়ে পড়ে। এই সমস্ত ক্যানাল গুলি সংস্কার বহুদিন হয়নি। এই খালগুলির সংস্কার হলেই জল অতিরিক্ত ফ্লোমে যাবে। বর্তমান পুরবোর্ড এই ব্যাপারটি নিয়ে ইরিগেশন দপ্তরের সাথে, বহুদিন থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্তরে বিস্তারিত আলোচনা করে। তার ফলে এই

কলকাতা পুরসভার উদ্যোগে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।

পরিপ্রেক্ষিত: কলকাতা পুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঘর ঘটিতি।

কারখানাগুলি থেকে পানি সরবরাহের কাজ পর্যায়ক্রমে শুরু হয়েছে।

বর্তমান পুরবোর্ড, নিকাশী ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য জনগণের সক্রিয় ভূমিকার উপর জোর দিচ্ছে। এটা সকলকে খেয়াল রাখতে হবে যে নিকাশী ব্যবস্থা জল পরিবহনের জন্য — কোনো কঠিন দ্রব্য বা আবর্জনা বহনের জন্য নয়। জল সংরক্ষণতা বৃদ্ধির জন্য ব্যাবহৃত বিভিন্নভাবে প্রচার চালানোর পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

বর্তমান পুরবোর্ড আস্থা রাখে যে তারা কলকাতাবাসীকে উত্তরোত্তর উন্নত নিকাশী পরিষেবা দিতে পারবে এবং এই ব্যাপারে কলকাতাবাসীর অকুণ্ঠ সহযোগিতা কামনা করে।

মাননীয় মহানাগরিক গত ৮ জুলাই, ২০০০ আমাকে ক্রীড়া দপ্তরের ভার দেন। বিগত এক বছরে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

ক্রীড়া দপ্তরের বাজেট কড়া হাতে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানে অনুদান বন্ধ ও ব্যয় সংকোচন করা হয়।

ক্রীড়া দপ্তরে বাইরে থেকে নিয়োগ স্থগিত রাখা হয়। নিজেদের সংস্থার ক্রীড়াবিদদের বেশী করে কাজে লাগানো হয়।

পৌরসংস্থার কর্মচারীদের নিজস্ব সংগঠন, পৌর প্রতিষ্ঠান সংস্থা — এর মাধ্যমে জরুরী-ভিত্তিতে সংস্কার করা হয়। অল ইন্ডিয়া স্পোর্টিস কাউন্সিলের বকেয়া ঠান্ডা মিটিয়ে সর্বভারতীয় টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের রাস্তা খুলে দেওয়া হয়।

বিশেষ বিভিন্ন টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেও আর্থিক কারণে ৫ বার একাদশ এ বছর যাত্রা স্থগিত রেখেছে।

মেয়র একাদশ-কে নতুন সাজে নতুন ভাবে তৈরীর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

ব্লকে-ভিত্তিক টুর্নামেন্টের মাধ্যমে খুদে খেলোয়াড়দের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এর ফলে অনেক প্রতিভা-প্রকাশ পাবে এবং নতুনভাবে ফুটবল টিম তৈরী হবে। পৌরসভা প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ রাখবে যাতে অন্যান্য টিমের সাথে প্রতিযোগিতায় সমর্থ হয়।

খেলাধুলার মান উন্নয়নে একটা সেমিনার হয় সেখানে অনেক প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে নতুন সমাধানের রাস্তা বের হয়। আর্থিক অসুবিধা সত্ত্বেও অনেক Sports Project গ্রহণ ও রূপায়ণ হতে পারে। এতে নতুন উৎসাহের সৃষ্টি হবে।

খেলাধুলার মান বৃদ্ধি — বিশেষ করে আমাদের কর্মচারীদের মধ্যে নতুন উৎসাহ ও discipline-এর কথা মনে রেখে পৌরসংস্থার উদ্যোগে খেলাধুলার সামগ্রী ও নতুন করে সাজানো হচ্ছে। বেশী সংখ্যক কর্মচারী খেলাধুলায় এগিয়ে আসছেন। দৈনন্দিন কাজে নতুন উদ্দীপনা আসছে।

পৌর সংস্থার অনেক কর্মচারীদের মধ্যে ক্রীড়ামোদি মানুষ আছেন/আছে, অনেক প্রতিভা/তাই প্রয়োজন নতুন পরীক্ষা-যাতে এই সম্পদকে কাজে লাগানো যায়।

Mayor's Sports Benefit Fund-এ নামমাত্র টাকা আছে, অথচ এই Trust Fund-কে Income-Tax ছাড়ের স্বীকৃতি পেলে অনেক অনুদান পাওয়া যেত। এখন এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

কলকাতা পৌর এলাকাভুক্ত প্রধান প্রধান ক্রীড়া সংস্থাগুলোকে নিয়ে এক সমন্বয় কমিটি করার চেষ্টা হচ্ছে। এর ফলে অনেক খেলাধুলার সুযোগ বেড়ে যাবে।

নাগরিক পরিষেবা বৃদ্ধি করতে সড়ক সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনা দ্রুত রূপায়ণের চেষ্টা চলছে

অনুপ চট্টোপাধ্যায়
মেয়র পারিষদ (সড়ক উন্নয়ন ও ইঞ্জিনিয়ারিং)

সড়ক নির্মাণ ও সংস্কারের কাজে যথোপযুক্ত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। গাড়ি চলাচলের অধিকাংশ এস সড়ক সংযোগস্থলের গুরুত্ব অনুধাবন করে আমরা স্থির করি রাস্তা আরও চওড়া করা দরকার। এর ফলে যানজটও কমবে এবং দূষণের মাত্রাও কমবে। সেই মোতাবেক যেখানে যেখানে সম্ভব, সড়ক সম্প্রসারণের কিছু প্রকল্পের কথা জানানো হচ্ছে।

১১ নং এবং ১২ নং বরোতে কিছু প্রকল্পে সড়ক চওড়া করা হয়েছে। আরও কিছু সড়ক সম্প্রসারণের কাজ হাতে নেওয়া হবে যে সমস্ত সড়কের সম্প্রসারণ ঘটানো হবে তার মধ্যে আছে লেনিন সরণি রোড, সেক লেন, জনক রোড, যাদব বসু রায় রোড, সরীশ মুখার্জি রোডের বাকিটা, মার্কিয়ার্ড আর্টিরিজ সংযোগস্থল থেকে অলিম্পিক পার্ক পর্যন্ত ইত্যাদি। যে সমস্ত রাস্তায় উড়াল পুল তৈরি হবে যেমন পড়িয়াহাট রোড, এ জে সি বোস রোড, ট্রাংকরী রোড এবং লকগেট রোড সেই সব রাস্তা সম্প্রসারণের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সকল যোগাযোগ করা হয়েছে।

বেলি ব্রিজ, উল্টাডাঙ্গা এবং খুলনার সংযোগ রাস্তায় আরও গুরুত্বপূর্ণ ৯৬৩৩টি ন্যাসিক আসবেস্টস দিয়ে নির্মাণ করার ব্যাপারে আমরা চিন্তা-ভাবনা করছি। ১০টি সম্প্রতি ইতিমধ্যেই আসবেস্টস দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন এস সি মুখার্জি রোডের পূর্বপ্রান্ত সংযোগস্থল থেকে হাজরা রোড পর্যন্ত, এস সি মুখার্জি রোড এবং সার্কুলার আর্টিরিজ সংযোগস্থল থেকে লোয়ার সার্কুলার রোড পর্যন্ত, এলগিন রোড, রাসবিহারী এভেন্যু ইত্যাদি আরও কিছু রাস্তাকে আসবেস্টস দিয়ে মুড়ে দেওয়া হবে।

সড়ক সম্প্রসারণ এবং আসবেস্টস দিয়ে সড়ক মুড়ে দেওয়ার সঙ্গে

কলকাতা পুরসভার অধীনস্থ উল্টো সড়ক।

রাসবিহারীর রাস্তাটির মেরামতির পর নির্মলচন্দ্র স্ট্রিটের মোড়।

সঙ্গে ছিটকোনি মজবুত পাথর দিয়ে দিয়ে সড়ক সংস্কার ও উন্নয়নে কাজ চলছে। যেহেতু সংযুক্ত এলাকায় ছিটকোনি মজবুত পাথর নেই তাই ঠিকাদার নিয়োগ করে এইসব এলাকায় সড়কের সংস্কার ও উন্নয়নের কাজ হচ্ছে। পাথরঘাটার ও গোবরাপাড়ার অ্যাসফল্টিংস Plant থেকে hot mix যোগান দেওয়া হচ্ছে এই সমস্ত কাজগুলির জন্য। উপকণ্ঠের অন্য বরাবর রাস্তার জন্য ঠিকাদারদেরও অন্যান্যের plant থেকে hot mix যোগান দেওয়া হচ্ছে।

মূল রাস্তাগুলি এবং পার্শ্ববর্তী রাস্তাগুলির সংস্কার এবং উন্নয়নের কাজের জন্য অ্যাসফল্টিংয়ের বিভাগীয় পদ্ধতিকে কাজে লাগানো হচ্ছে। এছাড়া অন্যান্য রাস্তাগুলোর সংস্কার কাজের জন্য আমরা অটোমেটিক patch repairing gang দিয়ে করাচ্ছি।

৫০০০ টনের বার্ষিক Hot Mix প্ল্যান্টের প্লান্ট থেকে প্রতিদিন তৈরি হয়। এই বার্ষিক লক্ষ্যে মূল সড়কগুলির প্রায় চার লাখ স্কোয়ার মিটার এলাকার Hot Mix অ্যাসফল্টিংয়ের প্লান্ট দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়েছে এবং ৭.৭৫ লাখ স্কোয়ার মিটার রাস্তার সংস্কার সাধন করা হয়েছে এবং এর জন্য সংযুক্ত এলাকার কাজের জন্য নিযুক্ত ঠিকাদারদের Hot Mix যোগান দেওয়া হয়েছে।

Milling Cutter দিয়ে সড়কের যেই খোয়াগুলো আগে লাগান করা হয়েছে এবং সড়কের উপরে বরাবর এদে পরিবহনের দিকে লক্ষ্য রেখে সেই সড়কগুলিকে Hot mix দিয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে। সড়কের চুর্নিং উপকরণগুলিকে Hot Mix তৈরি করার কাঁচা মাল হিসাবে পুনরায় ব্যবহার করে কাঁচা মাল যোগানের পরিমাণ কমানো হয়েছে।

এই আর্থিক বৎসরে আমরা একটা পেভেমেন্ট ক্রয় করেছি। Static Roller, Vibratory Roller, Censor Paver, Bitumen Sprayer, পুনর্ব্যবহারযোগ্য Milling Cutter, Pot-hole মেরামতি যন্ত্র ইত্যাদি ক্রয় করার ভাবনা-চিন্তা চলছে।

আমরা HUDCO-এর কাছে ৪ কোটি টাকা ঋণ হিসাবে পরাশ চেয়েছি। আমাদের প্রস্তাব HUDCO-র অনুমোদন লাভ করেছে। এই টাকা দিয়ে আমরা নিম্নে বর্ণিত কাজগুলো হাতে নেব।

(ক) সড়কের ঐ পরিমাণ মাটির আস্তরণটুকু নিয়ে মুড়ে দেওয়া।

(খ) পাথরের সড়ক সংস্কারণ।

(গ) ট্রাম লাইন বরাবর সড়কের সংস্কার ও উন্নয়ন।

(ঘ) পাথরের রাস্তাগুলি সড়কগুলির মাঝ বরাবর মেরামত দেওয়া।

কলকাতা পুরসভার ইতিহাসে এই প্রথম সড়ক বরাবর ট্রাম লাইনের অংশ আমরা সংস্কার করব। এর আগে সড়কের ট্রাম লাইনের অংশ ছেড়ে দেওয়া হত যাতে ট্রাম কোম্পানি এই অংশের সংস্কার করে। কিন্তু ট্রাম কোম্পানির অবহেলার কারণে করপোরেশনের যাতায়াতের অসুবিধা আমরা বরদাস্ত করি না। তাই খুব শীঘ্র আমরা এই কাজে হাত দেব।

বর্তমান বোর্ড আর একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছে। বাসিন্দাদের সংস্থাগুলোর কাজ আমরা অনেক দেখেছি তাঁদের সংস্থার সম্পৃক্ত সড়ক মেরামতি ও সংস্কার যেন তাঁরা করেন। আশাতীত সাড়া এতে পাওয়া গেছে।

আমরা ক্রমে ক্রমে সড়ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ যান্ত্রিকরণের দিকে এগোচ্ছি। এতে সড়কের চেহারাই পালটে যাবে।

যেহেতু কর্পোরেশন ফান্ড আমার পরাশ Hot Mix-এর স্থায়িত্ব খুবই কম তাই স্থায়িত্বের কারণে আমরা ঠিক করেছি ইমালশন বিটুমিন দিয়ে সড়ক নির্মাণ/সংস্কার করব যার পরাশ Hot Mix-এর কারণে লাখ লাখ টাকার পরাশ বাঁচানো সম্ভব হবে।

প্রাথমিক শিক্ষায় পৌর সংস্থার ভূমিকা উজ্জ্বল

মৈনুল হক চৌধুরী
মেয়র পরিষদ (শিক্ষা ও জনসংযোগ)

বিশ্বের জ্ঞানবিজ্ঞান, চিন্তাভাবনার মতে সাধারণতঃ একজন মানুষের মানুষ হয়ে গড়ে ওঠার সময় হল তার শৈশব ও কৈশোর। এই সময়ে সে যদি প্রকৃত শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত থাকে, সে যদি উপযুক্ত সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বড় হবার সুযোগ না পায় তাহলে তার পরবর্তী জীবনের স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হয়। ফলে সুস্থ, সবল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য পৌর সংস্থার বিদ্যালয়গুলি স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমান মাস-লোকশনের হিসাব করলে দেখা যাবে যে এই পৌরসংস্থার বিপুল অর্থব্যয় সত্ত্বেও এই বিদ্যালয়গুলির এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এটা প্রাথমিক স্তরে ছেলেমেয়ে

সাধারণতঃ সমবয়সের একসঙ্গে নিয়মিত মেলামেশা পৌরসংস্থা পরিচালিত বিদ্যালয়ে হয়ে থাকে। পৌরসংস্থা সাধারণতঃ তিনটি স্তরে (বাংলা, হিন্দি ও উর্দু) বিদ্যালয় চালান। সব মিলিয়ে পৌরসংস্থার এই ধরনের বিদ্যালয় ৫০৮টি। প্রায়ঃ ৩ লিখ ছিয়াশি জন বিদ্যালয় যেমন চালু থাকে, আবার এটাও ঠিক যে অনেকগুলি বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত ছাত্র না হওয়ায় তাকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হয়েছে। তবে স্থানান্তরের ফলে উদ্দেশ্যহীনভাবে ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে এই বিদ্যালয়গুলির মধ্যে ছাত্র সংখ্যা ৩৮,৪৮৬ জন। সাধারণতঃ

কলকাতা ছেলেমেয়েরা সহজ শিক্ষার সুযোগ পায়। এবং সরকারী স্কুলেই প্রায় পাঠ্যপুস্তক সমূহ, তাদের মধ্যে বন্টন করা হয়।

এই শিক্ষাবর্ষে পৌরসংস্থার শিক্ষাখাতে বরাদ্দ ছিল প্রায় ১৪ কোটি টাকা। এই টাকাতেই বিদ্যালয়ের মেরামতির জন্য, জল বিদ্যুৎ ব্যবস্থার ব্যবস্থা করা হয়। বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র কেনা হয়। ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে মধ্যাহ্নে ও দিন কয়েক মধ্যাহ্নকালীন টিফিন হিসেবে রুটি দেওয়া হয়েছে। গত ২০০০ সালের জানুয়ারী থেকে প্রতি মাসে ৩ কিলো করে চাল দেওয়া হচ্ছে। অধ্যয়নপাঠের মাধ্যমে শিক্ষাকে ছাত্রছাত্রীদের কাছে আকর্ষণীয় ও আনন্দময় করে তোলার চেষ্টা হয়েছে।

পড়ানোর পরিবেশের মধ্যে নিজের মনোভাব শিল্পী প্রকাশ করছে

কলকাতা এখন সত্যি ভাবতের সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন শহর।

ওষুধ ও জনসাধারণ বস্তুগুলিকে জনমুখী করে তোলার জন্য সংস্থার মুখপত্র 'কলকাতা পুরসভা'-কে ঢেলে সাজানো হয়। পুরনো চেহারার সময় ওই পত্রিকাটি প্রতিটি মূল্য নিয়ে যেখান থেকে ছাপানো হতো, প্রথম পর্যায়ে সেখানে ছাপানো বন্ধ করে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রতিযোগিতামূলক দরদাতার আমন্ত্রণ করে নতুন মুদ্রণসংস্থা ঠিক করা হয়। দেখা গেছে, পৌরসংস্থার এই ছাপানোর খরচে যে পরিমাণ খরচ হতো, নতুন মুদ্রণ সংস্থায় এই ছাপানোর ফলে পৌরসংস্থার লক্ষ লক্ষ টাকা সাশ্রয় করা সম্ভব হয়েছে। পুরসভীকে নাগরিকদের আরও কাছাকাছি নিয়ে আসার লক্ষে আরও কিছু পরিষেবা দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। বিশেষ কিছু সংখ্যা পুনর্মুদ্রণের জন্যেও চিন্তাভাবনা চলছে। মৃত্যুসংবাদ-আকাঙ্ক্ষাবেদী-সংবাদপত্র মারফৎ নাগরিকদের কাছে জানানো ছাড়া নির্ধারিত আদায়ের ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে। বেসি ও সর্বস্তরবাসীর স্তরে বিজ্ঞাপন প্রকাশের কাজও সাফল্যের সঙ্গে চলছে। বিশ্ব ওনিজনদের নাগরিক সংবর্ধনা জানানো ছাড়াও বর্তমান স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র বিকাশ সহ মনীষীদের স্মরণানুষ্ঠান তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তরের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধির স্বার্থে হোর্ডিং, ব্যানার, বুকলেট, পথ নাটক প্রদর্শনীরও পদ্ধতি থেকে অংশগ্রহণ অব্যাহত রয়েছে।

দপ্তরের কর্মকর্তে গতি আনতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারও শুরু হয়েছে। মাননীয় মহানাগরিক-এর নির্দেশে পুরসভী ও অন্যান্য কর্মকর্তার জন্য বিশেষ শিক্ষিকের নিয়ে এক উপযোগিতাভিত্তিক পঠন করা হয়েছে।

এই কথা হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ অনুমোদন বইমুদ্রণালয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা। অনুষ্ঠান করে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলাগুলির অন্য প্রথম হয়েছে। মেয়র পরিষদ হিসেবে সদিচ্ছা মেয়র পদ গ্রহণেই সমস্ত পৌর বিদ্যালয় সংযোজনে পরিদর্শন শুরু করা হয়। পরে শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী সংগঠনে নিয়ে আলোচনা করে পরিচালনা নিয়োগ করেছে যেন কবেই হোক পৌরবিদ্যালয়ের হাল ফেরাতে হবে। এরপর উপ শিক্ষা আধিকারিক ও বিদ্যালয় পরিদর্শকদের বিদ্যালয় পরিদর্শনে নিয়মিত হোর শুরু করেন। পঠন-পাঠন ও হাজিরার অবস্থা উন্নতি এর ফলে লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু অনুমোদন শিক্ষাসংস্থার শ্রেণীকক্ষে অবশ্য থাকলেই শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। তাই এদিকে লক্ষ্য রেখেই ৮শেণী ঘরের সাফল্যের বিদ্যালয় কর্মীর নিয়োগ হয়েছে। সহায়ক সহ অতিরিক্তাধ্যক্ষেরও অংশগ্রহণ করেন। "প্রতিভা", 'পড়াশুনা' এবং পৌরসভা পৌরসভার প্রায় ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী পালন করেছে যাতে পৌরসভা সহ অন্যান্য বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাও অংশগ্রহণ করেছে। এছাড়াও শ্রেণীর পৌরসভার মনে উদ্বুদ্ধিত 'স্বাধীনতা' ও 'গণতন্ত্র' বিষয়ের অনুষ্ঠানে পৌরবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। কলকাতা ময়দানে অনুষ্ঠিত বিদ্যাসাগর মেলাতেও বিভিন্ন ষ্টল ও মডেল শোভিয়ের মাধ্যমে বিদ্যাসাগরের আদর্শ ও জীবন তুলে ধরে।

এছাড়া বিদ্যালয়গুলি ভিত্তিবছরের মধ্যে নিজেদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সম্পন্ন করে। ৯-১১ জানুয়ারি সমস্ত বিদ্যালয়ের জেলা ভিত্তিক ছুটি হয়েছিল। অবশেষে ২৭ জানুয়ারি, ২০০১ শিক্ষকদিবসের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

কিন্তু সংক্ষেপে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, ১ ও ২ ফেব্রুয়ারি, ২০০১ এ 'সল্টলেক-সাই-অম্বরোজে' প্রথম ক্রীড়া প্রতিযোগিতার কলকাতা পৌরনিগমের 'বালাবন্ধুরি পাড়া' বিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থীর দুটি স্বর্ণপদক ও রোজ পদক জয়ের ফলে মোট ব্যক্তিগত ক্রীড়াবিদের নিয়োগ অর্জন করে। সর্বত্র পৌরসংস্থা পরিচালিত বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এবারেই বিজয়ী হয়ে আসা আলা।

মূল সংস্কৃতি, জনসাধারণ, নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদি নানা কাজের অন্তরায়ের জন্যই কলকাতা পুরসভার তথ্য-জনসংযোগ দপ্তরের সৃষ্টি। গত একবছর ধরে

গত এক বছরে মার্কেট ও বিদ্যুৎ বিভাগে সাফল্য জোরদার হচ্ছে

শামসুজ্জামান আনসারী
চেয়ার পার্সন (বাজার, আলো, বিদ্যুৎ)

উত্তরের প্রবেশদ্বার মহাত্মা গান্ধী রোড থেকে শুরু করে দক্ষিণের বিবাদীবাগ পর্যন্ত এলাকার আলোক ব্যবস্থার আরও উন্নয়ন সাধন করা হয়েছে। এ ছাড়া বিভিন্ন চত্বরে, বাঁধঘাটে, পার্কে এবং জাদুঘর, কলাভবনের ঐতিহ্যবাহী জায়গায় হালকা সুন্দর আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আলোকিত পুরনো বাজার এলাকার বিভিন্ন গলিপথের ছাদের এইচ পি এমকিউরি ল্যাম্প এবং টিউবলাইটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যে সমস্ত এলাকায় আলোর ব্যবস্থা নেই সেই সব জায়গায় ছোট আলোকসজ্জার জন্য ছাদপথে আলোকিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অধিকতর সুন্দর সংযোজনের জন্য আলোক ল্যাম্পের পরিবর্তে (ইনক্যান্ডিসেন্ট ল্যাম্প) এইচ পি এম ভি ল্যাম্প লাগানো হয়েছে।

এই বিভাগের উন্নয়নমূলক কাজ হল কলাভবনিতে বৈদ্যুতিক টুরী বসানো। সারা শহরের মধ্যে এখন ১৭টি বৈদ্যুতিক টুরী বসানো হয়েছে। যেগুলোর নিয়ন্ত্রণ কলাভবনে এবং গান্ধীভবনে কলাভবনে দ্বিতীয় পর্যায়ে যান্ত্রিকভাবে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কিছুদিন আগে সম্পাদিত করা হয়েছে। কলাভবনে কলাভবনটি যান্ত্রিকভাবে নিয়ন্ত্রণ শুধু বাজারের ব্যবস্থার জন্য সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। অন্যান্য কলাভবনগুলিতে এখন যান্ত্রিকভাবে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার জন্য পরিবর্তন করে নেওয়া হবে।

আশা অনুযায়ী ১১ কেভি সাব-স্টেশন বানানোর কাজ চলছে, যার ফলে বাগুইআটি এলাকায় অধিকতর বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যাবে। সাধারণের পরিবেশগত সচেতনতার জন্য আলোর ব্যবস্থা করার কাজ করা হয়েছে। তালিকাভুক্ত নিজস্ব শক্তির স্টেশনে যারা টেলিফোন কেবল বসানোর কাজ করছে, তার ফলে পুরাতন শক্তির স্টেশনের সঙ্গে নতুন শক্তির স্টেশনের যোগাযোগের বদলে এক জায়গায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বিচ্ছিন্ন হলে অন্য জায়গা থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যাবে।

আগামীর পুরসভার বাজারগুলির সার্বিক উন্নয়নে পুরসভা গত এক বছর ধরে বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়িত করেছে। এর ফলে বাজার গুলির পরিবেশ আগের তুলনায় অনেক উন্নতমানের হয়েছে। পুরসভার বাজারগুলিতে অন্যান্য পরিবেশগত উন্নয়নের কাজে বৃদ্ধি পেয়েছে। যার ১৯৯৯-২০০০ আর্থিক বর্ষে ব্যয়ের অঙ্ক ছিল ৫৭৭.১৫ লাখ টাকা, যা ২০০০-০১ আর্থিক বর্ষে ৫৪ লক্ষাংশে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৮৩৯.৮০ লাখ টাকায়। বাজারগুলির বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো হচ্ছে এবং তারও অনেক ক্ষেত্রে একটি ট্রান্সফরমারের বসানো হয়েছে। আর একটি দিকে আলোর ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটছে, C E S C-র সহযোগিতায় বেশিরভাগ D. C. সরবরাহ লাইন কে A. C সরবরাহ লাইনে রূপান্তরিত করা হচ্ছে। প্রায় সবকটি বাজারে এলইডি আলোর সুবিধার্থে গাড়ি রাখার উপযুক্ত অংশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঐতিহ্য-সৌধ হিসেবে স্বীকৃত S. S. Hogg মার্কেটে বাজারগুলোর জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তবে ঐতিহ্যশালী পরিবেশকে ক্ষুণ্ণ করা হয়নি। সেন্ট্রাল এবং পরিধা বাজার বাজারগুলির অভ্যন্তরে যাতায়াতের সুবিধার জন্য বর্ষাকালীন ও ছাউনিপাশে ছোট ছোট বাজারপথের পরিষ্কারের দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে। বাজার সেন্টার বাজারেই ফ্রে লাইন ফোর্ড লাগান হয়েছে। নিরাপত্তার কারণে সমস্ত বাজারেই বৈদ্যুতিক ফায়ারের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং তার অনেকগুলি সারাই করান হচ্ছে। সমস্ত পৌরবাজারের ক্ষয় ইতিমধ্যে বাজারের বিক্রেতা বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ বাজারের বিক্রেতাদের জন্য ওয়েলফেয়ার এবং ফেডারেশন-এর সহযোগিতায় অন্যান্য ব্যবসায়ীদের বজ্রপাত ও পরিধান নিরাপত্তা পরিদর্শনের জন্য বাজার বিভাগ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে।

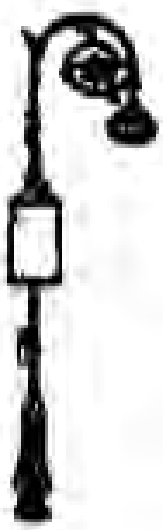

দরিদ্রতম শহরবাসীকে আরও প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য

জাভেদ আহমেদ খান
মেয়র পারিষদ (স্বাস্থ্য)

পুরসভার স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে পুরবাসীর সম্পর্ক আরও প্রত্যক্ষ করে তোলার ব্যাপারে আমরা সচেষ্ট। এই পরিষেবা জন্মলগ্নটি থেকে মৃত্যুলগ্নটি পর্যন্ত বিভিন্ন জনস্বাস্থ্য মূলক কার্যক্রমের দ্বারা পরিচালিত হয় — পুরসভার পূর্বতন ঐতিহ্য অনুসারিণী। পুরসভার পরিষেবে আসার পর পর এককভাবে ঐ পূর্বতন রীতি অনুযায়ী মূলতঃ প্রতিরোধমূলক, উন্নয়নমূলক ও রীতির নিরাময়মূলক প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কলটা সম্ভব বিভেদীকরণ করে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর শহরবাসীকে যাতে আরও বেশী করে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার সেবার ব্যাপ্ত সেটিই আমাদের মূল লক্ষ্য।

একদিকে এক লক্ষ্যের পুরবাসীর পরিষেবার বিভিন্ন বিভাগগুলি থেকে সেবার ব্যাপ্ত —

(১) প্রতিরোধমূলক সাধারণ ও জনসাধারণ অনুখ-বিসুখ যা এদের থেকে জনগণের রেহাই দিয়ে থাকে — যেমন ম্যালেরিয়া, টিবি, কালাজ্বর ইত্যাদি — এসব রোগের নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা।

(২) শিশু ও মাতৃমঙ্গল সংক্রান্ত।

(৩) জন্ম-মৃত্যুর নথিভুক্তকরণ ও পরিসংখ্যান রাখা।

(৪) (ক) সাধারণ অনুখ-বিসুখের চিকিৎসার জন্য ২৪টি ডাক্তার চিকিৎসালয়।

(খ) পরিবারী মাতৃমঙ্গলের জন্য ৪টি ডাক্তার চিকিৎসালয়।

(গ) ম্যালেরিয়ার নিদানমূলক রক্ত পরীক্ষা ও চিকিৎসার জন্য ৫৪টি কেন্দ্র।

(ঘ) টিবি রোগের অনুসন্ধান ও চিকিৎসার জন্য ২টি ডাক্তার এই ক্লিনিক এবং ৩১টি ডিসপেন্সারীর ডিবি-র চিকিৎসা কেন্দ্র।

(ঙ) একটি টিবি হাসপাতাল।

(৫) নির্দিষ্টভিত্তি বস্তিবাসী বা নিম্ন আয়ের শহরবাসীর জন্য বাড়ীর নোংরাপাড়ায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা সৌজন্যের প্রকল্প।

(৬) সন্তানদের জন্য পুরসমৃদ্ধ নিজস্ব আশ্রম (৭টি) ও অবস্থানের (৮টি) ব্যবস্থা ও মুখ পরিচালনা।

(৭) গর্ভাবস্থার এবং শৈশবে জলের বিশুদ্ধতা ও প্রদূষণ বিচারের জন্য পুরসভার নিজস্ব পরীক্ষাগার পরিচালনা।

(৮) পুর কর্মীদের (৪টি) পরিচালনা।

(৯) জলবাহিত রোগ প্রতিরোধে — রোগবাহিনী প্রসমূহ কুকুর ধরার ব্যবস্থা।

(১০) এ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা।

জনকল্যাণ পুরসভার স্বাস্থ্য পরিষেবার বিভিন্ন বিভাগগুলি অনুধাবনে করলে এই ব্যাপকতা উপলব্ধি করা যায়। এই ব্যাপক কর্মযজ্ঞের ব্যাপারটিকেও সকলে যেন আমরা পরিষ্কার সেবার পথে যে সব প্রতিবন্ধকতা সম্মুখীন পেয়েছি সে বিষয়ে সংক্ষেপে উল্লেখ করছি।

রোগ প্রতিরোধ

১) ম্যালেরিয়া — বিগত প্রায় দু-দশক ধরে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব কলকাতায় আবার ফিরে এসেছে। তার ফলশ্রুতে এর প্রকোপ দুই যোড়শের বিশেষ করে ডিসেম্বর ৫-৬ বছরে। যেন নিম্ন মৃত্যুহার বজায় রাখা যায়। আমাদের জন্য আমরা অবহেলে আমার পর এই প্রথম আমরা সম্মুখে কলকাতায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ সম্মুখে সম্মুখে বৃদ্ধি পাবার প্রবণতা ঘটনাবলী থেকে এবং অনুসন্ধানের সাম্প্রতিক দেখে সম্মুখে পেয়ে। যেমন এরূপ হিসেবে অনুযায়ী ১৯৯৯ সালে কলকাতা পুলসভা এলাকায় ১,৫৯,৬৯১ জন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। কিন্তু ২০০০ সালের হিসেবে সেই সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ৮৩,৫৮৮ এ। সেটা যদিও আশাপূর্ণ সেটা হলে ১৯৯৯ সালে মত রক্ত পরীক্ষা করা হয়েছিল তার ৪২.৭ শতাংশের জন্যে ম্যালেরিয়ার জীবাণু পাওয়া গিয়েছিল ২০০০ সালে এই হার কমে দাঁড়ায় ১৪.৮ শতাংশে। এই সময়ের মধ্যে ৬ বছরের এই ধারা অব্যাহত। আমাদের নিজস্ব ৪২টি ম্যালেরিয়া ক্লিনিকে ঐ সময়ে ৯৭০২ জনের ম্যালেরিয়ার জীবাণু পাওয়া গেছে। অবশ্য গত বছরে ঐ একই সময়ে ২২,৪০২ জনের মধ্যে ম্যালেরিয়া পাওয়া গিয়েছিল। এই রোগ প্রতিরোধে আমরা রক্ত পরীক্ষা ও চিকিৎসার ওপর বেশী গুরুত্ব দিই। বিনামূল্যে রক্ত পরীক্ষা ও চিকিৎসার জন্য পুরসভার ৪২টি ম্যালেরিয়া ক্লিনিক কাজ করছে। এর মধ্যে গত বছরে তিনটি নতুন ক্লিনিক যোগ করা হয়েছে। এ ছাড়া এই কাজ আরও ছড়িয়ে দেবার জন্য ৩৫টি বেসরকারী ম্যালেরিয়া ক্লিনিকে রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ক্লিনিকগুলিতে রক্ত পরীক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেইসব ম্যালেরিয়া প্রবণ এলাকায় প্রতিটি নির্বাচিত কর্পোরেশন নিয়ন্ত্রণের রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা করা হচ্ছে। বর্ষা আসলেই মশক-বন্ধু ব্রিদ্ধি নামে একটি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পুরসভার প্রতিরোধ কার্যসূচীতে হাত মিলিয়ে এই কাজ চালানো ম্যালেরিয়া ক্লিনিকে বিনামূল্যে রক্ত পরীক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে।

জনস্বাস্থ্যকেন্দ্র ও সচিব অনুসন্ধান ছাড়া কলকাতার মত জনবহুল এলাকায় ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ করা মুশকিল। তাই বিভিন্ন জোর

ম্যালেরিয়া ও পেটির রোগে কলকাতার বস্তুতির মানুষ।

কলকাতার বেহাল পরিবেশ, রাস্তার মোড়ে মোড়ে আবর্জনার স্তূপ, বিদ্যালয়ের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, বস্তি এলাকার নর্দমা, বন্ধ জলাশয় প্রভৃতি ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, টিবি, সংক্রামক হেপাটাইটিস-এ মতো নানা রোগের কারণ, এছাড়া পেটের ইনফেকশন সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ সমস্ত জনস্বাস্থ্যের সুবিধের জন্য ২৪ ঘণ্টা শুধু ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা করা যাবে এরকম চিকিৎসাকেন্দ্র এবছরই চালু করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

২) টিবি — এই রোগটি কলকাতার একটি অন্যতম জনস্বাস্থ্য সমস্যা। ঘনিষ্ট পরিবারগুলিতে থাকার ফলে এই রোগের সংক্রমণের মাত্রা বেশী। কলকাতা পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগ ৯টি ডোট ক্লিনিক পরিচালনা করছে। এখানে কফ পরীক্ষা বা এক্সরে করে রোগ নির্ণয় করা হয়। সঠিক রোগ নির্ণয় করার পর কম খরচায় আধুনিক পদ্ধতিতে DOTS পদ্ধতিতে (Directly Observed Treatment Short Course) স্বাস্থ্যকর্মীর তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা করা হয়। রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা করা হয় সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। জনস্বাস্থ্যের স্বার্থেই চিকিৎসার সুযোগ পৌঁছে দেবার জন্য শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ৬১টি কেন্দ্র থেকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১৯৯৯ সালে ৫০৮৭ জন এবং ২০০০ সালে ৪৩৭১ জনের টিবি রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা করা হয়েছে। চিকিৎসাকালে প্রতিটি রোগীকে চিকিৎসা সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহের ব্যবস্থাটি নেওয়া হয় — যাতে ওষুধের অভাবে চিকিৎসা বন্ধ না হয়।

পুরসভা পরিচালিত হাসপাতাল টিবি হাসপাতালে নির্ধারিত টিবি রোগীদের ভর্তি করে চিকিৎসা করা হয়। এই হাসপাতালটি ৪ শতাধিকার শয্যা সম্বলিত বৃহৎ হাসপাতাল নিয়ে আধুনিকীকরণ করা হয়েছে।

৩) আন্ত্রিক — গত এক বছরে কলকাতায় কোলেরা আক্রান্তের হয়নি। তবে বিভিন্নস্তরের কিছু কিছু এলাকায় সাধারণ পেটের অসুখের মোকাবিলার জন্য স্বাস্থ্য কর্মীদের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি, ORS তৈরিতে, পানীয় জলের গুণমান পরীক্ষা করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

প্রসূতি ও শিশুর বিশেষজ্ঞ প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা — ২০০০-২০০১ সালে ১০টি কমিউনিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণ ও সংস্কারের কাজ শুরু করা হয়েছে। এ ছাড়া ইতিমধ্যে ৯০ টি স্বাস্থ্য কেন্দ্র বিভিন্ন ধরণের মুখপাত্র করা হয়েছে এবং বিভিন্ন পরিষেবা চালু করা হয়েছে। পরিকাঠামোর উন্নতি ঘটিয়ে শীঘ্রই অন্যান্য কার্যালয়ী কেন্দ্রের জন্য যুদ্ধ। বস্তিঅঞ্চল ও সার্টিফিকেট প্রদান, ম্যালেরিয়া, টিবি, আন্ত্রিক ইত্যাদি রোগের প্রতিরোধ ও চিকিৎসা, সাধারণ প্রসূতি-শিশুদের চিকিৎসা, স্বাস্থ্য সচেতনতার শিক্ষামূলক কার্যক্রম, ছোট্টদের মধ্যে নিয়মিত প্রসূতি পরিষেবা পরিষেবিত হবে।

সাধারণ চিকিৎসক ও বিশেষ পেটনির চিকিৎসক — পুরসভার বিভিন্ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র মায়েদের শিশু ও গর্ভবতী মহিলাদের নৈমিত্তিক চিকিৎসক পরিষেবা চালু করা হচ্ছে। প্রায় ৮ লক্ষ বস্তিবাসী শিশু ও মায়েদের ১৩৩ পরিবারকেই এর আওতায় এনে প্রতিরোধক টিকা দেওয়া হয়েছে।

কলকাতার বৈদ্যুতিক চুল্লীর মূলন নিয়ন্ত্রণ — গত বছরে নিমতলা কবরখানে মূলন নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে। পরিবেশের অবক্ষয় একটি অনুকূল বস্তু বিচার এই কবরখানের সব বৈদ্যুতিক চুল্লীগুলি মূলন নিয়ন্ত্রণের আওতায় আনা হল। আশা করি অন্যান্য কবরখানেও এই যন্ত্র বসানোর কাজ চলছে।

স্কুল স্বাস্থ্য — এই প্রকল্প গত বছর থেকে শুরু প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি ছাড়া। অন্যান্য বিদ্যালয়গুলিতেও স্বাস্থ্য বিধি সম্বন্ধে শিক্ষার মধ্যে দিয়ে যাতে সচেতন থাকে তার জন্য শুরু চিকিৎসকদের নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ছেলেদের কার্ড — বয়ঃসন্ধিদের শারীরিক ছেলেদের জন্য ধারা প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার একটি জরুরী অঙ্গ। সেই জন্য ছাত্র এবং মিত্র আত্মের পরিবার বর্গকে ছেলেদের কার্ড দেওয়া শুরু হয়েছে।

ছেলেদের কাজের নিয়ন্ত্রণ — ছেলেদের কাজের বিরুদ্ধে অভিযান ছেলেদের করা হয়েছে। পুরসভার নিজস্ব জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষাগারে গত বছরে ১০০০টি খাদ্য দ্রব্যের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। ২৪ পরগণার ছেলেদের পাওয়া থেকে এবং অভিযোগমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে কেন মিল্ক পেটেন্স, কেরোসিন এবং মরসুমি ফলগুলিতে নিয়মিত অভিযান চালিয়ে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষদের সহায়তার ব্যাপারে সুপারিশ এবং মুনাফার পরিবেশগত ভাল উন্নত করা হয়েছে।

জলবসতি অধিকরণ ও সার্টিফিকেট প্রদান — নাগরিকদের সুবিধার্থে জন্য জন্ম অধিকরণ ও সার্টিফিকেট প্রদান বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় যে যাতে মৃত্যুর অধিকরণ ও ডিলিভুলের দু একদিন সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য কবরস্থানে লাশ কবরের সময় অসুবিধার মধ্যে থাকি। আমাদের ছেলেরা এই সুবিধে পাওয়া যায় না। জন্ম-মৃত্যু অধিকরণ ও সার্টিফিকেট প্রদান কম্পিউটারের মাধ্যমে আরও দ্রুত ও উন্নত করার প্রয়াস শুরু হয়েছে।

কবরস্থানের উন্নয়ন — পুরসভার অধীন কবরস্থানগুলির দিকে আমরা বিশেষ নজর দিয়েছি। জল সরবরাহ, রাস্তা, আলো যাতে পর্যাপ্ত থাকে সেই জন্য ব্যবস্থা নেওয়া শুরু হয়েছে। প্রতিবছর অন্তত একটি কবরস্থানকে মাথায় রেখে কবরস্থানে কলাগাছিয়া করা যায় সেইমত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

গত এক বৎসরে
কলকাতা পুরসভার উদ্যান বিভাগের সাফল্য

হৃদয়ানন্দ গুপ্ত
মেয়র পরিষদ : উদ্যান

কলকাতা পুরসভার চতুর্থ কাউন্সিল ও ৫৮তম ওয়ার্ড পার্ষদ সহযোগে নূতন বোর্ড গঠন হওয়ার পর মেয়র পরিষদের একজন সদস্য হিসাবে উদ্যান বিভাগের দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত হয়। এই দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই আমি ভাবতে শুরু করি কিভাবে এই শহরের বুকের মাত্রা কমিয়ে এখানকার পরিবেশের উন্নতি সাধন করা যায়। যে কোন শহরে সেখানে মানুষের পরিষেবা দেবার জন্য অন্ততঃ ২০% খোলা জায়গা প্রয়োজন সেখানে কলকাতা শহরে মানুষের পরিষেবা (উদ্যান) মাত্র ০.০৮% । এই দুয়ের মধ্যে ব্যবধান ১০% কিভাবে কমানো যায় সেই নিয়ে। উদ্যান বিভাগের তরফ থেকে কয়েকটি সমীক্ষণ —

১। পুরসভা থাকার পাশে সৌন্দর্যায়ন করবার জন্য আলাদা করে কর্তৃপক্ষের নিজস্ব থেকে বাদুড়বাগান ৪৩৯ মিটার ফাঁকা জায়গা নিয়েছে। এখানে পুরসভা ঠাকুরমি পার্ক গড়বে এবং বিভিন্ন ফোয়ারা ঝরনাসহ ও বৈচিত্র্যের মূলক নিয়ন্ত্রণকারী গাছগাছালি নিয়ে ছোট ছোট পার্ক তৈরী করবে। এছাড়া মূলের বাগানও থাকবে।

ভায়ারিটিস্ (বসুমেহ) রোগের প্রতিষেধক হিসাবে যে সব গাছগাছালি ব্যবহার হয় সেগুলি লাগানো হবে। এরকম ১৭টি গাছকে ভায়োবিটিস্ রিকিৎসার উপযোগী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়া বহুমেহ রোগের ক্ষেত্রে উপযোগী ২০টি ফোয়ারাযুক্ত মূলা কলাইবাগ ব্রাহ্মের সাথে চিত্রায়িত করা হবে যা সাধারণ মানুষকে এই রোগ সম্পর্কে সচেতন করবে এবং তাদিয়াতে এই রোগ প্রতিরোধকের ক্ষেত্রের কাজ করবে।

পার্ক তৈরীর সাথে সাথে কাদুবাগানের ঐতিহ্যবাহী ঘড়ি যা ৪৫০বর্ষীয় ব্যবস্থা ফোয়ারে ১৮৫০ সালে তৈরী করেন। পরে ঘড়ী ব্যবসায়ি নামের স্বামী বাবু রাজকৃষ্ণ পাল এই ঘড়িটির সংস্কার করেন এবং তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে এই ঘড়ির নামকরণ হয় 'রাজুঘড়ি'। তার সংস্কারের কাজ হয়েছে। এই ঘড়িগুলো বর্ষাদিবসে সংস্কারের অভাবে চলি ও আবর্জনায় ঢাকা ছিল ও পরিবেশ দূষিত করছিল। এখান থেকে আনুমানিক ১০০ মিটার আবর্জনা পরিষ্কার করা হয়েছে এবং ঘড়িগুলি ব্যবহারের উপযোগী হয়ে উঠেছে। এছাড়া স্থানের সমস্ত মহিলাদের পোষাক পরিবর্তনের জন্য একটি ঘর ও দুটি শৌচাগারের ব্যবস্থা হচ্ছে। সামের মুরীশ বন্দোপাধ্যায়ের সাংসদ তহবিলের অর্থে।

এছাড়া বাদুড়বাগান এবং কালীপুরের অভ্যন্তরীণ রাস্তাগুলির বিভিন্ন ঘটিগুলি যেখানে লক্ষাধিক মানুষ চলাচল করে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে জিনাজমায়েত করে থাকে সেগুলি সংস্কার করা ও সেখানকার পরিবেশ উন্নতি করার লক্ষ্যে। পুরসভার পক্ষ থেকে লক্ষ্যমোগে এক বিশেষ পরিদর্শনের ব্যবস্থা হয়। এখানে স্থানীয় সাংসদ, বিধায়ক, মেয়র ও অন্যান্য পৌর প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

আহিরিটোলা এবং কাশবাগানের অভ্যন্তরীণ রাস্তার ঐতিহ্যবাহী সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও দুষণ রোধে ইতিমধ্যেই এম. পি. মুরীশ বন্দোপাধ্যায়ের উন্নয়ন তহবিল থেকে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ ও পাশ করানো হয়েছে।

২। এই শহর কলকাতা পুরসভার উদ্যান বিভাগ বিশেষজ্ঞ নিয়ে কলকাতার বিশেষ বিশেষ পার্কে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে দূষণের মাত্রার পরিমাপ করি, তারপরে সেখানে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইডের মাপ কত তা মাপার ব্যবস্থা করেছি। এরপরে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কিভাবে এই দূষণের মাত্রা কমিয়ে সাধারণ পর্যায়ে আনা যায় তার বিশেষ চেষ্টা চলছে। ১৯৮৬ সালের National Environmental Research Report CMDA-র কাজ থেকে নিয়ে আমরা তুলনা করে দেখব যে দূষণমাত্রা বেড়েছে না কমেছে। তেমনি পর্যালোচনা করে আমরা চলাফেরা করব এবং পরিবেশ উন্নয়নে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৩। আমরা পূর্তবিভাগ মেয়র কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে Peerless Hotel-এর বিপরীতে ও Esplanade Metro Station-এর উত্তরদিকে কলকাতার মেয়রের নির্দেশে এক বিশাল পরিমাপের একটি জায়গা পাই। এখানে পুরসভা নিজস্ব উদ্যোগে একটি বাগান করবে যার উদ্বোধন পুরসভা নিজেই করবে। বাগান নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে এবং যত শীঘ্র সম্ভব পার্শ্ববর্তী Depot এবং পাশ্ববর্তী যানবাহন থেকে নির্গত ধোঁয়া যাতে সুষ্ঠু দূষণ নিয়ন্ত্রিত হবে।

৪। স্থানীয় পুরুষদের সহিদপুর ব্যায়শিল পার্কটি সুন্দর করে গড়বার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এখানে বিভিন্ন

শিশুদের শারীরিক বিকাশ বৃদ্ধিতে পার্ক ও উদ্যান তৈরীতে পুরসভার ভূমিকা।

বয়সের ছেলেমেয়েরা থাকবে যা অভিভাবকদের ও বিদেশী পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। কাজ শুরু হয়েছে এবং শীঘ্রই সমাপ্ত হবে। এছাড়া পার্কটির প্রবেশ পথটিকে রূপসজ্জার প্রতিকৃতি এবং ব্যবহৃত বিভিন্ন কক্ষের প্রতিকৃতি প্রদর্শিত হয়েছে।

৫। পুরসভা প্রতিবছরের মতো শীতের আগমনে বিভিন্ন অঞ্চলে পুষ্পপ্রদর্শনী করে জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য এবং সাথে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে থাকে। এছাড়াও পুরসভা বিভিন্ন পুষ্পপ্রদর্শনী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে এবং প্রায় সব বিভাগেই প্রথম স্থান অর্জন করে।

গত এক বছরে আমরা যে সব নতুন পার্ক নির্মাণের কাজ শুরু করেছি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল —

(১) ৯৫নং ওয়ার্ডে বিজয়গড় অঞ্চলে একটি খোলা জায়গাকে একটি পার্কে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

(২) ৯৮ নং ওয়ার্ডে পুকুর সংলগ্ন একটি খোলা জমিতে পার্ক করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

(৩) ৯৭ নং ওয়ার্ডে দুর্গা এভিনিউতে একটি নতুন পার্ক করা হয়েছে।

(৪) ৯৩ নং ওয়ার্ডে দেবক গার্ডেনসে একটি পার্কের কাজ শীঘ্রই শুরু হবে।

(৫) ৯১ নং ওয়ার্ডে এল. কে. ঘোষ রোড-এ একটি নতুন পার্ক করা হবে।

(৬) ৮৭ নং ওয়ার্ডে মেঘনাদ সাহা সরণীতে কিছু গাছের গোড়াকে বাঁধিয়ে সৌন্দর্যায়ন করা হয়েছে যা গাছটিকে বাঁচিয়ে রাখবে এবং সৌন্দর্য বর্ধনও করবে। এছাড়া কিছু রিসিকেন্স কাজ হয়েছে।

(৭) ৭২ নং ওয়ার্ডে বেলতলা গার্ডেন্স, স্কুলের কাছে একটি নতুন পার্ক করা হয়েছে।

(৮) ৬৬ নং ওয়ার্ডে কি. কে. খান রোডে খালের পার্শ্বে টানা রেলিং বসানো হয়েছে।

(৯) ৬৮ নং ওয়ার্ডে একবালপিয়া এভারগ্রীন পুজো যেখানে হয় সেখানে একটি পার্ক করা হচ্ছে যা পুজোর কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে না।

(১০) ৫৮ নং ওয়ার্ডে বাপা প্যারেডটিকে পার্কে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

(১১) ৪৬ নং ওয়ার্ডে ক্রী স্কুল স্ট্রীটের ওপর এবং New Market ও F.C.I. Building-এর আশপাশের Var-টি তুলে দিয়ে নতুন পার্ক তৈরীর কাজ শুরু হয়েছে।

(১২) ৩১ নং ওয়ার্ডে জীবনকৃষ্ণপাড়ি রোডের কাছে নতুন পার্ক করা হয়েছে।

(১৩) ১ নং ওয়ার্ডে ২২ নং বাগমারী রোডে একটি ফাঁকা জায়গায় পার্ক করার কাজ শুরু করা হয়েছে।

(১৪) ৪ নং ওয়ার্ডে তারাপদকর সরণীতে একটি ফাঁকা জায়গায় নতুন পার্ক করার কাজ শুরু করা হয়েছে।

(১৫) ৭ নং ওয়ার্ডে ৭৮/১, বালসুন্দর স্ট্রীটে যে Metal Yard আছে সেটিকে পার্কে রূপান্তরিত করার কাজ শুরু করার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে একটি উদ্যান তৈরীর কাজে হাত দেওয়া হয়েছে।

(১৬) ৯৪ নং ওয়ার্ডে কলাবাগানে একটি নতুন পার্ক করা হয়েছে।

(১৭) ৯৩ নং ওয়ার্ডে ডাকা কালী বাড়ীতে একটি নতুন শিশু উদ্যান করা হয়েছে।

এছাড়া ১১, ১২, ১৩, ১৪ এবং ১৫ নং বরোতে বিভিন্ন ফাঁকা জায়গায় পার্ক তৈরী করার জন্য সেন্ট্রাল ফান্ড থেকে কিছু Fund বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া Added unit গুলোতে তাদের নিজেদের জন্য বরাদ্দ Fund থেকেও নতুন পার্ক তৈরী করা হচ্ছে।

এছাড়াও নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য পার্কগুলি গত ১ বছরে সংস্কার করা হয়েছে।

(১) ৯৮ নং ওয়ার্ডে ৪, নেতাজী কলোনীস্থিত পার্ক

পুরসভার সাফল্য — মধ্যকলকাতার একটি উদ্যান।

(২) দেশপ্রিয় পার্ক
(৩) হরিশ পার্ক
(৪) হাজরা পার্ক
(৫) রমেশ মিত্র স্কোয়ারস্থিত লেডিজ পার্ক
(৬) কনভেন্ট স্কোয়ার
(৭) আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র পার্ক
(৮) ১০৬ সি. এল. এম. রোডস্থিত পার্ক
(৯) বিশ্বনাথ কলোনীস্থিত পার্ক
(১০) নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য পার্ক
(১১) ২ নং ওয়ার্ডে পঞ্চাননতলাস্থিত পার্ক
(১২) ২ নং ওয়ার্ডে সব্জিবাগানস্থিত পার্ক
(১৩) ৪ নং ওয়ার্ডে রাণী হৈমবতী পার্ক
(১৪) টালা পার্ক
(১৫) ৫ নং ওয়ার্ডে ৩৫, নিবেদিতা লেন স্থিত পার্ক।
(১৬) জনস্বার্থে সাংসদ সুবীণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর অর্থানুকূল্যে ৯ নং ওয়ার্ডে কুমোরটুলী পার্কে পৌর উদ্যোগে একটি 'লাফ্টার্স্কেপ' গার্ডেন, একটি মাল্টি জিম এবং কুমোরটুলী ইনস্টিটিউট বিল্ডিং-এ আন্তর্জাতিক মানের একটি কম্পিউটার সেন্টার উন্নয়ন প্রকল্প চলছে।
(১৭) এছাড়া এম. পি. উন্নয়ন তহবিল থেকে সাংসদ মমতা বন্দোপাধ্যায়, অজিত পাঁজা, মহম্মদ সেলিম, বিপ্লব দাসগুপ্ত, কৃষ্ণা বসু, চন্দ্রকলা পাণ্ডে প্রমুখ কলকাতার পার্কের পরিবেশ উন্নয়নে সাংসদ উন্নয়ন তহবিল থেকে সাহায্য করেছেন।

পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এবং সবুজায়ন প্রকল্পকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য কলিকাতা পুরসভা কর্তৃক প্রচুর গাছ কলকাতা এবং Added areas-এর নানা প্রান্তে বসানো হয়। এছাড়া কলকাতা পুরসভা জনসাধারণ, ক্লাব এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে হাজার হাজার গাছ বিনামূল্যে প্রদান করেছে এবং নানা স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানেও পুরসভা অংশ গ্রহণ করেছে।

নাগরিক স্বার্থে বিল্ডিং ও লাইসেন্স বিভাগে প্রশাসনিক নিয়মনীতি রদবদল হয়েছে আরও হবে

স্বপন সমাদ্দার
মেয়র পরিষদ (বিল্ডিং, লাইসেন্স, ট্রেডিং দপ্তর)

বর্তমানে কলকাতার মূল। একতলা, দুতলা বাড়ী থেকে ২০০ তলা বাড়ীর পরিকল্পনা করতে মানুষের দ্বিধা নেই। কিন্তু কেন এই ব্যতিক্রমী বাড়ীর পরিকল্পনা? মানুষ বুঝতে পেরেছে যে পৃথিবীর আকার একই থাকবে কিন্তু মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধিপাবার আছে। তেমনি ভাবে জনসংখ্যা বাড়বে, অদূর ভবিষ্যতে মানুষের বাসের জায়গা সংকুলান হবে না, বিশেষ করে শহরে। অন্যদিকে গাছের সংখ্যা বৃদ্ধি করলে, গ্রামে কৃষির জমি বা জলাভাব আছে আছে সংকুচিত হবে। ফলে মানুষের জীবনধারণের জন্য খাবার সংকট দেখা দেবে। সুতরাং গ্রামকে বা গ্রামের জমিকে নষ্ট করে পরিবর্তন করা ঠিক হবে না। কিন্তু বিকল্প ভাবতে হবে। শহরের মানুষের সুস্থভাবে বসবাস করতে হলে। আকাশ বাতাস শহরে থাকবেই আকাশ। এই কারণে দূরদর্শিতা থেকে সুষ্ঠু পরিকল্পনার প্রয়োজন দেখা দিল। তার কারণেই দেশী সংকুলান করবার। কারণ আকাশ-বাতাস ঠিক থাকবে আকাশের প্রয়োজনে। এইভাবে মানুষের চিন্তা এই দিকেই দেশী দেখা দেল। ক্রমে ক্রমে গগনচুম্বী বাড়ীর সৃষ্টি হল। এই কারণে বাড়ী নির্মাণকারে বা নক্সাকরা তৈরী না হয় তার জন্য কিছু বিধি-নিষেধ সৃষ্টি করা হল। এই কারণে আইন (Act) এবং নিয়মাবলী (Rule) তৈরী হল।

আমাদের কলকাতার জন্য Calcutta Municipal Act 1980 এবং Building Rule '90 এখন কার্যকর আছে। এই Act এবং Rule অনুযায়ীই কলকাতা শহরে বাড়ী তৈরী করা হয়।

কিন্তু বিধির কারণে মানুষের মধ্যে নিরুৎসাহিত্বের বাড়ী নির্মাণের বাসনা দেখা দিয়েছে। এই অসুবিধার হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য সহজ ব্যবস্থা ও সাধারণ মানুষের প্রয়োজন মিটিয়ে বাড়ী নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বিগত এক বছরের মধ্যে কলকাতা পৌরসভা মানুষের আহ্বানের প্রয়োজনকে মনে রেখে দুরদর্শিতা অনুযায়ীকে আইন এবং পদ্ধতি সরলীকরণ করার জন্য যথেষ্ট সচেষ্ট হয়েছে। তার মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলো খুবই উল্লেখযোগ্য।

১। Building Rule '90 কে সংশোধন করে বিগত পৌরসভা কিছু সময়ের অসুবিধে করে অনুমোদনের জন্য রেখেছিল। ঐ সংশোধন সমিতি L.B.S. বা L.B.A. শ্রেণীর আর্কিটেক্ট দেখে নিল এবং তার প্রতিফলনের জন্য মহাকরণ আকাশমহলের আরম্ভ হলেন, এই অবস্থায় বাড়ীর-নক্সা অনুমোদন প্রায় বন্ধই হয়ে গেল, শহরের মানুষ, যারা বাড়ী করবে চান তাঁরা খুবই অসুবিধার পড়লেন, অনুমতি জমি হতে লাগল। বর্তমান পৌরসভা পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে পারল। তাই আইনজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে মহাকরণ আকাশমহলের কাছ থেকেনিয়ে না পাঠিয়ে যাতে Building Rule '90 কে বাড়ীর নক্সা অনুমোদনের সিদ্ধান্ত নিল। এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে শহরবাসীকে উপকৃত করতে পারা বর্তমান পৌরসভার একটা বিশাল প্রাপ্তি। এখন মানুষ সহজেই বাড়ীর-নক্সা মঞ্জুর করাতে পারছেন।

২। শহরের অনেক পুরানো দুতলা, তিনতলা বা চারতলা বাড়ী আছে যেখানে লোকের জন্য কোনো Lift এর ব্যবস্থা নেই। কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বা শারীরিকভাবে অসুস্থতার জন্য অনেকেই Lift এর প্রয়োজন বোধ করছেন। অনেকেই বর্তমান ফ্লোরের মধ্যে আরেক ফ্লোর করতে চেয়েছেন। ঐ ফ্লোরকে বাড়ী নিয়ে এবং বৃদ্ধ ও পঙ্গু মানুষের প্রয়োজন মনে রেখে কর্পোরেশন পৌরসভা বাইলজের যথোপযুক্ত ছাড় করিয়ে ৬ (ছয়) লিফটের Lift বসাতে অনুমতি দিচ্ছে। এটাও একটা যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। মানুষের প্রয়োজন-ভিত্তিক সিদ্ধান্ত।

৩। Building Rule '90 কে কিছু ক্ষেত্রে আগে ছোটো ছোটো জমির (৪০০ বর্গমিটার) ক্ষেত্রেও আগে করিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে বর্তমান বোর্ড এর ফলাফল মানুষের উপকার হচ্ছে।

৪। বর্তমান পরিস্থিতিতে কোলকাতা শহরে জমির মূল্যমান প্রচণ্ড, অনেকেরই সম্পূর্ণ বাড়ী নির্মাণের জন্য তৈরী জমির সুযোগ হয়না। তাই মানুষ প্রচণ্ড জমির জন্য আড়াই হয়ে পড়ে, সেই ক্ষেত্রে প্রোমোটারদের প্রচণ্ড ব্যবসা ও প্রসার হয়ে উঠেছে দিন দিন। সেই সুযোগে অসাধু প্রোমোটাররা যে খারাপী বাড়ী তৈরী করে জনসাধারণকে বিপদ করছে। ফলে সাধারণ মানুষ যে-কোনো বাড়ী কিনে সমস্যায় পড়ছেন। অন্যদিকে কোন প্রোমো ও বাড়ী কিনবার আগে তার অনুমোদিত নক্সা দেখবার বা পাবার সুযোগ এখানে সাধারণ মানুষের ছিল না। বর্তমান পৌরসভা মানুষের এই অসুবিধার কথা ভেবে সকলকেই বাড়ীর প্রস্তাবিত নক্সার (অনুমোদিত) কপি দেখবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যাতে তিনি ঐ নক্সার প্রয়োজন দেখতে পারেন।

৫। বর্ষাকাল বা অন্যান্য দুর্ঘটনার দিনে Control Room-এ বাড়ীসহ বিশেষ Inspection team (Engineer, Surveyor, L

Guard এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয়, Corpn পরিষদ) প্রথার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে ঐ সকল ছুটির দিনে বেআইনী বাড়ী নির্মাণের প্রবণতা অনেক কমে গিয়েছে। এছাড়া ঐ বিশেষ ব্যবস্থার জন্য ঐ সকল দিনে যদি কোন পুরনো বাড়ী ভেঙে পড়ে বা অট্টালিকার কোন দুর্ঘটনা ঘটে, ঐ team সক্রিয় সাহায্যে আসে।

৬। বেআইনী বাড়ী বা বিপজ্জনক পুরনো বাড়ী ভাঙার জন্য বর্তমান পৌরসভা বিশেষ team তৈরী করেছে। ঐ team-এ যোগাযোগের সুবিধার জন্য Mobile Phone প্রথার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া যাতে কাজের সময় বিলম্ব না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে এজন্য করে Empanelled Structural Engineer বা E. S. E. প্রথার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৭। পুলিশের প্রয়োজনীয় সাহায্যের অভাব সত্ত্বেও বর্তমান পৌরসভা এযাবৎ প্রায় ২৪০ খানা বেআইনী বাড়ী ভেঙেছে। এবং প্রায় ৬৮৫ খানা বেআইনী বাড়ীর নির্মাণকার্যের বিরুদ্ধে নোটিশ দিয়েছে।

৮। বিপজ্জনক বাড়িগুলির হাত থেকে সম্পত্তি ও জীবনহানি রোধে বর্তমান পৌরসভা বিশেষ অভিযান চালিয়ে এই ধরণের বাড়িগুলির তালিকা তৈরী করে সাধ্যমতো অবলম্বন ও জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য নোটিশ বোর্ড লাগানোর ব্যবস্থা করেছে, এবং ঐসব বাড়ির মালিক/বসবাসকারীদের বিরুদ্ধে কলকাতা পুরসভার আইনানুযায়ী নোটিশ দেওয়া হয়েছে।

৯। পুনর্নির্মাণ সমস্যা জর্জরিত বিষয়গুলির আইনানুগ ছাড় নিষ্পত্তির জন্য ট্রাবুনাল (Hearing) করে জনসাধারণের অভিযোগের যুক্তিসঙ্গত দিকগুলি থেকে রেহাই দেবার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

পরিশেষে দুর্ঘটনাজনিত পরিস্থিতিকালীন প্রধান বিষয়ে আলোচনা করে প্রবন্ধটি —

১। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিয়ে ১ মাসের মধ্যে বাড়ির নক্সা মঞ্জুর।

২। সাধারণী কলকাতার পুরনো বাড়ির ক্ষেত্রে ব্যবহারিক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অপরিবর্তিত রেখে এবং বর্তমান আইনানুগ ছাড় দিয়ে বাড়ির বর্তমান মোট ব্যবহারিক পরিধি (F. A. R.) অক্ষুণ্ণ রেখে নতুন পুনর্নির্মাণ নকশা মঞ্জুরের চিন্তা-ভাবনা চলছে।

কলকাতা পুরসভার নজরদারির সমস্যা আছে। নির্দিষ্ট ক্ষমতা ও স্বল্প সময়ের মধ্যে সব সমাধান এখনও সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। সততা ও আদর্শ বজায় রেখে আগামী দিনে সর্বস্তরের নাগরিকদের ঐকান্তিক সহযোগিতায় স্বল্প, অনুন্নয় ও দুর্নীতিমুক্ত পৌরসেবা পৌঁছে দিতে চাই।

বিশ্বায়নের যুগে টিকে থাকার মূলমন্ত্রগুলির অন্যতম কয়েকটি হলো — কাজের গুণগত মান, উৎকর্ষ, পরিচ্ছন্নতা, গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা। এছাড়াও পুরপরিষেবার ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতা ও সংবেদনশীলতা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়।

বর্তমান ক্ষেত্রে-পারিষদ পুরসভায়

লাইসেন্সের ব্যবস্থা করার পর থেকেই উল্লেখিত লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। পুরসভার আজ সমস্ত বিজ্ঞাপনের নতুন অনুজ্ঞাপত্র বিজ্ঞাপন আলোর বিশেষ উপরি হয়েছে। বর্তমান ফুট-পাতিলেস্ক ধরণী পুরপরিচালনার ক্ষেত্রে আরও গতিশীল ও স্বচ্ছতা আনার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

অতীতে ব্যবসায়ীদের একটি অনুজ্ঞাপত্র পাওয়ার জন্য বহুবার পরীক্ষণের জন্য পুরসভার বিভিন্ন দপ্তরে ছোটে হত তেমন, জল সপ্লাই কল্যাণ দপ্তর, নির্মাণী দপ্তর ইত্যাদি। এর ফলে আবেদন প্রক্রিয়া হয়রানি ও সময় নষ্ট হতো তাছাড়া এই অসুবিধার কথা মাথায় রেখে চালু হয়েছে এক-জানালা কাজ করার পদ্ধতি। এর ফলে ব্যবসায়ীরা একটি অনুজ্ঞাপত্র বিজ্ঞাপনই যাবতীয় সুযোগ সুবিধা এক জায়গা থেকে অনুজ্ঞা পত্র পেয়ে যাচ্ছেন। এর জন্য তাদের অন্য কোন দপ্তরে যাওয়ার প্রয়োজন হচ্ছে না। এই ব্যবস্থা কম্পিউটারের কম্পিউটার দ্বারা চালিত হলে এর স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা অনেক বেশি।

বর্তমানে এই অনুজ্ঞাপত্র বিজ্ঞাপনের ব্যাপারেই দি, এস, এ লাইসেন্স দেওয়ার পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। ঐ একই অনুজ্ঞাপত্রের জন্যে দি, এস, এর অনুমতি প্রাপ্তির ফলে ব্যবসায়ীদের এখন আর এর জন্য বেলুন দপ্তরে লাইসেন্স করতে হচ্ছেনা।

আবেদন পরিমার্জনের ও স্বচ্ছতা আনার লক্ষ্যে অনুজ্ঞাপত্র মঞ্জুরের জন্য যেসব কমিটি আছে তাদের গঠন করেন আলিক্ষা ধরি আনাতে গঠনও করা হয়েছে। এই কমিটি একজনাতে তৈরী করা হয়েছে যাতে প্রত্যেক ব্যবসায়ী তার যেসব কথার পরিবর্তে তিনি নিজেই নির্বাচন করতে পারবেন। এর জন্য তাকে কোন পুর আধিকারিকের সাহায্য নিতে হবেনা। কমিটিগুলোতে পুরবিধানের কাজ একটু চলবে যাতে আর বেশি সময় আর নেতে পারে।

অনুজ্ঞাপত্র প্রাপ্তির আবেদন পত্রের পরিমার্জন ও সংশোধন করা হয়েছে। অতীতে এই আবেদন পত্রের জটিলতার জন্য সাধারণ ও ছোট ব্যবসায়ীরা অসুবিধার সম্মুখীন হতেন। এই অসুবিধা দূর করার জন্য এখন একটি একজনার সহজ ও সরল আবেদনপত্র চালু করা হয়েছে। এছাড়া ফোন করা হয়েছে কোর্টের ফাক ফাকার। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে অনুজ্ঞাপত্র সংক্রান্ত অসুবিধার কথা সরাসরি ফোনে পরিষদকে জানাতে পারেন।

অনুজ্ঞাপত্র প্রাপ্তির সময় নিয়মাবলী ওয়েব-সাইটের মাধ্যমে জন সাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। প্রতিদিন ছয়টি জনয়ে এই বিজ্ঞাপন কাজের আগের গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা আনবে।

একথা আলাদাভাবে বলারই একথাতো বীকার করতেই যে সরকারী প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধনের জন্য আরও এক বহু সময় নিয়ন্ত্রণই আর আগে নিয়োজন করা যায়। বিশেষত পঁচ বছর মেয়াদী নতুন পুরবোর্ডের প্রথম বছর। একটা ভাবমান প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা থেকে বিভিন্নদের চলতেরা করাটা নিশ্চয়ই যৌক্তিক আশা করা যায় এই কারণে যে এতে নিম্নু স্বার্থান্বেষী মহল চিন্তিত হবেন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন এবং জনসাধারণের কাছের বিরোধিতা করেন।

কলকাতা পুরসভার কর্মিমান পুরবোর্ড তার প্রথম এক বছরে যেসব কাজ নিম্নু সাধারণ মানুষের নিজেরে, তেমনই বিভিন্ন ব্যবসায় এইসব জায়গায় নিশ্চিন্তে অবাধ ঘোরা করেছে। কিন্তু লাইসেন্স বিজ্ঞাপনের মূল ব্যবস্থার যেসব পরিবর্তন এসেছে তার ফল ইতিমধ্যেই সুদূর প্রসারী — যদিও এখনও অনেক কাজ বাকী।

যার একবছরে লাইসেন্স বিজ্ঞাপনের জন্যের অনুজ্ঞাপত্রির বিষয়ে বলা যায় যে সার্বিকভাবে কাজের প্রকৃতিগত কোন নিম্নু পরিবর্তন করা হয়েছে। নতুন লাইসেন্সের জন্য আবেদন পত্র এখন বিজ্ঞাপনের কেবলীয় পত্র-প্রাপ্তি শাখার প্রাপ্তি-স্বীকার সহকারে গ্রহণ করা হচ্ছে। এতে অনুজ্ঞাপত্রকে অযথা বিভিন্ন দপ্তরেই ঘোরাঘুরির কাজে ফেতে হচ্ছেনা, ফলে সময়ের সাশ্রয় হচ্ছে। শুধু সময় নয়, এতে অনুজ্ঞাপত্র পাওয়ার জন্য যেসব অনিয়ম প্রবেশ পেতে পারেন সেগুলিও বন্ধ হয়েছে। তাছাড়া আবেদন পত্রের সঙ্গে সম্পর্ক যাতে পত্রে অনুজ্ঞাপত্র।

অনিয়ম পথের অবসান — তবুও কোন নিম্নু ব্যক্তির ক্ষেত্রে কর-নির্ধারণের কাজ সম্পূর্ণ হয়নি এখনও। আজও লাইসেন্স নিতে গেলে আবেদনী নানান পাওনা জমানী বিষয়-ফেত্রে কম্পিউটারের আওতা এসেছে ঠিকই। এইসব ব্যক্তির ক্ষেত্রে ছাই লাইসেন্স পাওয়া বিশেষ অসুবিধাজনক ছিল। লাইসেন্স বিজ্ঞাপনে নিম্নু প্রশাসনিক বিভাগে সঠিক সময়ে সঠিকভাবে কার্যকরী অবাধ পথ কম্পিউটার ব্যবস্থাপনা নিয়োজন্দের খুব কাছ পেয়েছে। আজ এই ব্যবস্থাপনার আলোর লাইসেন্স পেতে পেরেছে।

অবকাঠামোগত নিম্নুস্তরের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ মুক্ত নিম্নুক্ষেত্র সর্বাধ নিম্নু বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছে। জটিল নিয়ম ও দীর্ঘসূত্রিতা প্রক্রিয়ার বাঁধাজালে পড়ে এর কাজ ও সাফল্যের নিম্ন হয় প্রসাশন লাইসেন্স পাওয়া ছোট প্রতিষ্ঠান ছিলেন। নিম্ন লাইসেন্স থাকার অর্থের তৈরি হলে যেতে নেওয়া যায় না। আজকেই এইসমস্ত কাজকাজ ক্ষেত্রে বিশাল সাফল্য সৃষ্টি হয়েছিল। অবশেষে কলকাতা এখন পুরসভার এসেছে গেল নিম্নু অসুবিধা দূর করা গেছে। "সহজ" প্রতিষ্ঠানভুক্ত ব্যবসার ক্ষেত্রে ২০০১-২০০২ সালের জন্য লাইসেন্স নবীকরণে ব্যবস্থাটির ফোনো অসুবিধাই হবে নেই। নিম্ন যে ব্যবসার ক্ষেত্রে অনুকূল ব্যবস্থাপনা সৃষ্টির জন্য বর্তমান পুরবোর্ড এই ব্যবস্থাটি নিশ্চয়ই মেসবসায়ের সংগঠিতভাবে ব্যবসায় ব্যবস্থা করবে।

লাইসেন্স পাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যকলাপ ধরে ব্যবহৃত অর্থে "এক জানালা" পদ্ধতিতে চালু করা হয় যে কারণে মুনিসিপ্যাল নিম্নু করা হয়েছে। ফলে আগের বিভিন্ন বিভাগে ব্যবসায়ের ঘরে একা আর ঘুরতে হবে না। তবে একথা বীকার করা ভালো যে ব্যবসায়ের "এক জানালা" পদ্ধতির আরও পরিমার্জন দরকার যাতে আগামী দিনে কলকাতাবাসীর আরও সহজ হয়ে পারে।

বিভিন্ন আর্থিক সমস্যা থাকা সত্ত্বেও বর্তমান পুরবোর্ড নিম্নু ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আরোপিত নিম্নু নিম্নু হার্ড থেকেই পরিবর্তে করিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা নিয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা একেবারে বন্ধ করা হয়েছে। এতে নিম্নু ব্যবসায়ের লাইসেন্স নবীকরণের ক্ষেত্রে সাধারণ হলেও আর্থিক সুবিধা ফোন করতে পারবেন।

পুরসভার অব্যবহৃত সম্পদ সুপরিকল্পিত ভাবে ব্যবহার করে নাগরিক পরিষেবা বৃদ্ধির চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে

নীলাংশু ভূষণ বোস
মুখ্য আধিকারিক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)

কলকাতা। মহানগরীর পৌর পরিষেবার উন্নয়নের লক্ষ্যে নিত্য নতুন প্রকল্পের অভিমুখে পৌরসভার পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ তার গতির সুষ্ঠু তাল পালন করে চলেছে এবং আগামী দিনে উন্নততর নাগরিক পরিষেবার জন্য হেন কিছু প্রকল্প গ্রহণ করেছে। বিগত কয়েক বছরে এই বিভাগ অভিমুখে পুরসেবার অন্যতম সম্পদগুলি সুপরিকল্পিত উপায়ে ব্যবহারের মাধ্যমে নিজস্ব উপার্জন গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে এবং উপার্জিত অর্থ যথেষ্ট পরিমাণে নগরের সার্বিক পরিষেবা খাতে — জলসরবরাহ, জঞ্জাল অপসারণ, নিকাশী ব্যবস্থা ইত্যাদি খাতে সংযোজনের ব্যবস্থা করা হয়।

পুরসভার পুরনো বাজারগুলি একশ্রেণীর অতিরিক্ত ভাড়ার ফলে ক্রমশ দুর্বহ হয়ে পড়ার ফলে ব্যবসায়ীদের ব্যয় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় পুরো ব্যাপারটিকে আর্থিক ভাবে লাভজনক করবার জন্য বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে বি ও টি BOT ভিত্তিতে কয়েকটি আধুনিক বাণিজ্যিক কেন্দ্র গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হয়। আশা করা যায় আগামী দিনে এই ব্যবস্থার মাধ্যমে নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলি শহরের পরিবেশে কে উন্নয়ন করবে এবং বাণিজ্যিক ভাবে লাভবান হয়ে উঠবে।

ক) ১৯৯৯ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ (বাণিজ্যিক)

খ) এস, বি. কে. পাল অ্যাভিনিউ (বহুতল অফিস, কমিউনিটি হল, আবাসন)

গ) নিউ আলিপুর (দুর্গাপুর ব্রিজের নিকট) মোল মিলিত কেন্দ্র, বাণিজ্যিক কেন্দ্র।

ঘ) ১৯৪৫ আচার্য জগদীশ বসু রোড (প্রবিক আবাসন, বাণিজ্যিক কেন্দ্র, আবাসন)

ঙ) ১৮, হিন্দ আবাসনের পাশ রোড (বাণিজ্যিক, আবাসন)

কলকাতার মতো পুরনো শহরে যত্র তত্র ছোটোখাটো এলাকায় পার্কী রাখার সমস্যা একটি মারাত্মক জনস্বাস্থ্য রূপ ধারণ করেছে, এই সমস্যা সমাধানের জন্য রচন স্ট্রিটে অত্যাধুনিক কম্পিউটার চালিত স্বয়ংক্রিয় একটি আন্ডার গাড়ি পার্কিং কেন্দ্রের নির্মাণের কাজ চলছে। এটি এশিয়ার মধ্যে দ্বিতীয় অত্যাধুনিক আন্ডার গাড়ি পার্কিং ব্যবস্থা, আশা করা যায় আগামী দিনে এই প্রকল্প এই অঞ্চলে গাড়ি পার্কিং সমস্যা সমাধানে সহায়ক হবে এবং লাভজনক হয়ে উঠবে। এতে কলকাতার গৌরব বৃদ্ধি করবে।

পুরসভা আর্থিক ভাবে স্বনির্ভর প্রকল্প রূপায়ণে বা সেবা অটোনাশিং মোকেটি দ্বারা পুরসভার নিম্নলিখিত কম্পলিতগুলি নির্মাণের প্রস্তাব পৃথীত হয়েছে।

১। ডি-এল খান রোড-এ আবাসন প্রকল্প।

২। সুপরিচালন অ্যাভিনিউ (পাকপুকুর জংশন)-এ বিনোদনের মল।

৩। ২৪২, অলিগাট রোড-এ বাণিজ্যিক কেন্দ্র।

৪। অবনীন্দ্র সেনগুপ্ত রোড (ইউনিট-১, ২)-এ বাণিজ্যিক কেন্দ্র

৫। জয়নগর (অংশ-১১)-এ অফিসিমিটি হল ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র।

৬। প্রফুল্ল সুবোধ অটিক রোড (সুবোধ সেতু সংলগ্ন)-এ বাণিজ্যিক কেন্দ্র।

৭। মেটিয়ার মৈত্র মল।

৮। ঘুঘো-এ অফিস সমাবেশন।

৯। উদ্যোগের বালার্কি রোডে কমিউনিটি হল।

স্কুল/কলেজ বিল্ডিং নির্মাণের নিম্নলিখিত কাজ চলছে —

১। ক্যালকাটা ন্যাশনাল কলেজ, খেলাধুলির সেন।

২। টিপু সুলতান স্কুল, পার্কি সার্কাস।

৩। মৈত্রেয়ী স্কুল, মৈত্রেয়ান রোড।

৪। আদর্শ স্কুলবাড়ি নির্মাণ।

নিম্নলিখিত বিনোদন কেন্দ্রগুলি নির্মাণের কাজ চলছে —

১। সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারে মুক্তাঙ্গন পুল।

২। কমিউনিটি হল, বালি ব্রিজ।

৩। কমিউনিটি হল, মুক্তাঙ্গন।

পোস্তাবাজার নাট মন্দির একটি অন্যতম ঐতিহ্যশালী ভবন, এটির পুরো পুরি সংস্কার ও সংরক্ষণ প্রয়োজন। ভারত সরকারের বিশেষ সহায়তায় সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছিল। এই আর্থিক বছরেই কাজ সমাপ্ত হবে।

পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন বিভাগের পরিকাঠামোগত প্রকল্পগুলি ছাড়া, এখনকার কর্মপক্ষ বিশেষভাবে বেসরকারী মুখ উদ্যোগের প্রতি লক্ষ্য দিয়েছেন। যেমন শীঘ্রিত আর্থিক কারণের মধ্যে নাগরিক পরিষেবা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ করার উদ্যোগ নেয়। এর মূখল এরমধ্যেই বিদ্যু বিদ্যু ক্ষেত্রে পাওয়া গেছে। বিদ্যু আর্থিক সাফল্যের মাধ্যমে এবং বিদ্যু পরিষেবার বিদ্যুতির মাধ্যমে।

সংস্থার বহু হারানো সম্পত্তি এখন উদ্ধার করা হচ্ছে

এম. জে. ইকবাল
উপমহাপ্রশাসক (ই এন)

কলকাতা পুরসভার বহু জমি পুনরুদ্ধার, ঘটনা ও রেকর্ড সংশোধন মুলিয়েকেও এই বিভাগ সহযোগ অবলম্বনকেন্দ্রিক হিসেবে চলন ও পৌর সংস্থার সম্পত্তির মালিক বন্দোবস্তকরণ ও বহি সংরক্ষণের কাজ সম্পাদন করে থাকে।

কলকাতা পুরসভার প্রচুর পরিমান স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি আছে। এই সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ইতিপূর্বে এই বিভাগের কার্যকলাপ দেখভাল করতেন। ভূমি সংক্রান্ত ও ভূমি সংক্রান্ত একটি পৃথক বিষয়। কার্যকলাপের দ্বারা ভূমি সংস্কার ও ভূমি সংক্রান্তের জটিল নিয়মাবলি থাকার ফলে পৌর সংস্থার বিশাল পরিমাণ স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বন্দোবস্তকরণ সম্ভব হচ্ছিল না। ইতিমধ্যেই কয় ভূমিসম্পত্তি পৌর সংস্থার হাত ছাড়া হয়েছে ও হচ্ছে। এই সমস্ত বিষয় সমাধান নিষ্পত্তির জন্য ২৩.২.৯৭ তারিখে এক্সেলা নং ২৩, আইটেম নং ১১ এর মাধ্যমে পৌর সংস্থার বিভিন্ন অংশে বিভাগের অধীন পৃথক একটি শাখা খোল পরিচয় হয়। কর্তৃপক্ষের নির্দেশে পরিচালক বন্দোবস্তের ভূমি সংস্কার বিভাগের সব আলমের প্রাক্তন তিন জন অতিরিক্ত আধিকারিককে নিয়োগ করা হয়। বর্তমানে এর মধ্যে মাত্র দুজন কর্মরত আছেন। এই প্রতিনিধিদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও ঐকান্তিক ইতিমধ্যেই পৌর সংস্থা বহু হারানো ভূসম্পত্তি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। এর মধ্যে কলকাতা জেলার জোড়াসাঁকো, জোড়াসাঁকো মৌজায় প্রায় ৫.২৫ বিঘা ভূসম্পত্তি উদ্ধার হয়েছে। এই অঞ্চলে বাজেয়াপ্ত ছিল, জয়রামপুর, ডায়মন্ড হারবার, ডায়মন্ড

> “ মেট্রোরেল সহ বিভিন্ন সংস্থার বিকট বকেয়া প্রায় প্রায় ৮ কোটি টাকা ইতিমধ্যেই পুরসভার কোষাগারে জমা পড়ে ছে। এই টাকা আদায়ের জন্য ইতিপূর্বে কোনরূপ প্রচেষ্টা ছিলনা। বর্তমানে পুরসভার মধ্যে কয়েক হাজার ছোট বড় Premises আছে এবং প্রচুর অন্যান্য সম্পত্তি যেমন ফুটপাথি হোর্ডার, হোর্ডাইটি সিনেমা, ব্রঞ্চি সিনেমা, হ্যাপলিন হল ৩০২ জলাধার ইত্যাদি সহ পৌর সংস্থার হারানোধীন সম্পত্তির দেখভালের সুষ্ঠু ব্যবস্থা ছিলনা। প্যান্ড মেল কর্তৃক এই বিশাল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অনুসন্ধান কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এই কাজ সম্পন্ন হলে পুরসভার কোষাগারে কয়েক কোটি টাকা জমা পড়বে। ”

প্রভৃতি অঞ্চলে পৌর সংস্থার হারানো জমির সন্ধান পাওয়া গেছে।

আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে কয়েকশত একর জমি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ইছাপুর মৌজায় ইতি মধ্যে প্রায় ১৩৫০ বিঘা জমি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এই অঞ্চলে আরও অনেক গুলি মৌজার অনুরূপ প্রচেষ্টা চলছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নোয়াপাড়া, ঘাটকল, বেহিয়া পাতা প্রভৃতি মৌজায় পৌর সংস্থার শত্রু প্রায় ১০০ একর-এর অধিক জমি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। পানপুর এলাকায় পৌরসংস্থা ৪০.১ একর জমি অতিরিক্ত সহ পৌর সংস্থার শত্রু রেকর্ড সংশোধন সম্পন্ন হয়েছে।

মেট্রোরেল সহ বিভিন্ন সংস্থার নিকট বকেয়া প্রায় প্রায় ৮ কোটি টাকা ইতিমধ্যেই পুরসভার কোষাগারে জমা পড়েছে। এই টাকা আদায়ের জন্য ইতিপূর্বে কোনরূপ প্রচেষ্টা ছিলনা। বর্তমানে পুরসভার মধ্যে কয়েক হাজার ছোট বড় Premises আছে এবং প্রচুর অন্যান্য সম্পত্তি যেমন ফুটপাথি হোর্ডার, হোর্ডাইটি সিনেমা, ব্রঞ্চি সিনেমা, হ্যাপলিন হল ৩০২ জলাধার ইত্যাদি সহ পৌর সংস্থার হারানোধীন সম্পত্তির দেখভালের সুষ্ঠু ব্যবস্থা ছিলনা। প্যান্ড মেল কর্তৃক এই বিশাল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অনুসন্ধান কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এই কাজ সম্পন্ন হলে পুরসভার কোষাগারে কয়েক কোটি টাকা জমা পড়বে।

কলকাতা শহরের নিকাশী ব্যবস্থার ইতিহাস

দিলীপ কুমার সান্যাল
বিশেষ আধিকারিক

(১) ১৮৭০ সালে গঙ্গাবক্ষে ওয়েলেসলির অনুরোধে কলকাতা নিকাশী ব্যবস্থার সমীক্ষা —

শহর সমীক্ষার ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান জুড়ে আছে এবং আলোচ্যটি এমনই একটি অনুসন্ধান যাতে মনে হয় যে শহরের নিকাশী ব্যবস্থার ঐতিহাসিকদের জন্যে হবে মূল্যবান একটি তথ্যসূত্র (ইংরেজীতে এ জাতীয় অনুসন্ধান ও জরীপ অনুসন্ধান) তথ্যসূত্র হিসেবে পরিগণিত হতে পারে।

(২) কলকাতার ভূসংস্থান —

আমাদের এ অনুসন্ধান-এর মধ্যে নীচু জমির সমস্যা সমাধানের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়েছে।

মজা জল (ইংরেজি — অপরিষ্কার, আবর্জনা ও পয়ঃপ্রণালী ইত্যাদি) এবং বর্ষার জল একই ভূগর্ভস্থ নর্দমার মিশ্রণ থেকে চলাচল করে এবং পয়ঃপ্রণালীর সাহায্যে জলের সাথেই নদীতে অন্তর্হিত হয়ে যায়। কলকাতা ও আশেপাশের অঞ্চলে বন্যার কারণ কী কী ছিল তা খুঁজতে চলুন।

(৩) জলনিষ্কাশনে কলকাতা নিকাশী ব্যবস্থার ইতিবৃত্তি —

১৮০৫ — সার্কুলার খাল খনন করা হয়।

১৮১৭ — একটি পৌরী কমিটি স্থাপন এবং খেলোয়াড় খাল খনন।

১৮৩৪ — এক বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক কলকাতা শহরের ভূগর্ভস্থ নালার ক্রমকে মত প্রকাশ করা হয়।

১৮৪৬ — কলকাতা পৌরসভার ভূগর্ভস্থ নালার ক্রমকে মূল্যায়িত করেন।

১৮৭৬ হইতে ১৮৭৪ — ভূগর্ভস্থ নালার প্রাথমিক অবস্থাকে মি: ক্লার্ক-এর সময় হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। মি: ক্লার্ক কলকাতা পৌরসভার প্রথম চিফ ইঞ্জিনীয়ার। তিনি শহরের ভূগর্ভস্থ নিকাশীব্যবস্থার পরিকল্পনা এবং প্রস্তুত করেন।

১৮৭৩ — অনুমানিক ১৪ এম. জি. মতো জল খালাসকরণের পাম্পিং স্টেশন হেস্টিংস-এ পাম্পের সাহায্যে নিকাশের ব্যবস্থা করা হয়। এ কারণ প্রতি বছরে ৪০০ টন কয়লা ব্যবহার করা হয়।

১৮৭৮ — ৫৮ মাইল ট্রাঙ্ক সুয়ারেজ এবং ৩৭ মাইল পার্শ্বীয় সুয়ারেজ তৈরী সম্পন্ন হয়।

১৮৮৬ — খেলোয়াড় এবং সার্কুলার খাল খনন সম্পন্ন হয়।

১৮৭৪ হইতে ১৮৯১ — চিফ ইঞ্জিনীয়ার মি: কিবার-এর সময়কালে নিকাশী ব্যবস্থার উন্নতি ও বিস্তার ঘটে।

১৮৯৭ — এই সময় বার্চি খাল খনন সম্পন্ন হয়।

১৮৯১ হইতে ১৯০৭ — মি: কিবার ও মি: হিউজ এর সময়কালে —

(i) পাম্পিং স্টেশনের ক্ষমতা বৃদ্ধি।

(ii) ধাপিপুকুর স্লুইসের পাম্পিং স্টেশনের নির্মাণের সূচনা।

(iii) উচ্চক্ষমতার সম্পন্ন পাম্পসমূহ নির্গমনের ভূগর্ভস্থ নালার নির্মাণ করা।

(iv) খালসমূহের বর্ষার জল নির্গমনের মেটাল ব্যবস্থা করা হয়।

১৯০১ — খালাড়াঙ্গায় পাম্পিং স্টেশনে ইঞ্জিন হাউস-এর সম্প্রসারণ।

১৯০৩ — মেকলিবাগ পাম্পিং স্টেশন নির্মাণ এবং ধাপিপুকুরে উচ্চক্ষমতার সম্পন্ন ভূগর্ভস্থ নালা নির্মাণ।

১৯০৪ — ধাপিপুর পাম্পিং স্টেশন উদ্বোধন করা হয়।

১৯০৮ — এ. সি. সি. ব্লেয়ার এবং সার্কুলার খাল এবং ৩৬-পল্লী অঞ্চলের ভূগর্ভস্থ নালা নির্মাণ করা। ১৯০৮ সালে শুরু করিয়া ১৯১৩ সালে সমাপ্ত করা হয়।

১৯০৮ হইতে ১৯১৫ — এ. সি. সি. ব্লেয়ার এবং সার্কুলার খাল এর অন্তর্বর্তী অঞ্চলের ভূগর্ভস্থ নির্মিত নালার সাথে যুক্ত করে পাম্পঘরের ও ধাপিপুকুর পিয়ালদহ অঞ্চলে যুক্ত করা হয়।

১৯০৯ — টালিনালার উপর সাইফন নির্মাণ করা হয়।

১৯১০ — খেলিপুর খাল এবং টালিনালা খনন।

১৯১১ — বি. আই. টি. রাস্তাটির দুই পাশে ভূগর্ভস্থ নালা ও নালি তৈরীর পরিকল্পনা ও কার্যকরী করা হয়।

১৯১৩ — কিছাড়ী জমির অবস্থায় ভাঙ্গাড়াঙ্গায় অবস্থান হয়।

১৯১৪ — হাতিবাগান ব্লেয়ের পাম্পিং স্টেশনের কার্যক্রম শুরু।

১৯১৮ — আলিপুরদুয়ার, ডুমডুমা, খেলোয়াড় এবং বালিগঞ্জ-এ পাম্পিং স্টেশনের নির্মাণ সম্পন্ন হয়।

১৯৫০ — পাতালরেলের পশ্চিম দিকটির নির্মাণ শুরু হয়।

১৯৬৮ — পাতালরেল পশ্চিম দিকটির কাজ শেষ হয়।

১৯৮৭ থেকে ১৯৮৮ — গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান-এর অন্তর্গত প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হয়।

১৯৯৪ থেকে — মেট্রোরেলের পূর্বদিকের কাজের সূচনা।

১৯৯৩ থেকে — দুটো ভূগর্ভস্থ স্টেশনের মাঝখান ও পুরোটির কাজ হয়।

১৯৯৮ — গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান-এর অন্তর্গত দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজের সূচনা এবং কলিকাতা ট্রেনেজ পশ্চিম টেশনের নির্মাণ ও উদ্বোধন।

— ইন্দিরা ভবন থেকে ভবানী ভবন পর্যন্ত পশ্চিম টেশনের মধ্যে একটি ভূগর্ভস্থ মাধ্যমে যোগাযোগ ও দুটির মধ্যে ভবানী ভবনের কাছে আরেকটি পশ্চিম টেশনের নির্মাণ পরিকল্পনা।

নতুন দিশার লক্ষ্যে

রিন্টু মুখার্জি

কলকাতা শহরের যানযটটা যেন কোন কোন ক্ষেত্রে বড় বেশি জটিল। একে তো কলকাতার বুকে দেশ স্বাধীনতার আগে যেসব রাস্তা তৈরি হয়েছিল, তার ওপর এই শহরেই ছিল '৭১ সালের বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের ক্ষেত্র। আন্তর্জাতিক স্তরে যখনই মানবিকতার প্রশ্নটা এসেছে, এই শহরের অধিবাসীরা সাড়া দিয়েছেন। মানুষ হিসেবে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর এই মনোভাবটি তাই এই শহরেই। কারণ, বাংলাদেশের যে নিরাপত্তার প্রশ্ন এ শহরের মানুষের মনোভাবে জোগাই নেই। সমস্যা 'পুরীক্ষিতের' হাতে এই কলকাতা শহরে ছাই ভস্মি জমির আমার কিন্তু মাথার দিকে ৯০ শতাংশ থেকে, আর মাঝে আমাদের পায়ে ৬০ শতাংশ থেকে এখানে আমাদের আছে। কলকাতা পৌরসংস্থা এই ৯০ শতাংশ লোকেরই পৌর পরিষেবার আওতায় আনতে চায়।

নিম্নাঞ্চলে পৌরসংস্থার প্রাথমিক কর্তব্য হল বাসিন্দাদের পৌর সুবিধার আশ্বাস দেয়া। কোন কোন ক্ষেত্রে বর্ধিত পৌরসংস্থা বহির্ভূত অঞ্চলগুলির কয়েকটি সংস্থার মিলিতভাবে বাসিন্দা পরিষেবার দেখভাল করে। কিন্তু পানীয় জল সরবরাহ, নিকাশ ব্যবস্থাপনা, জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ের খুব দায়িত্ব পৌরসংস্থা। তাই একক দায়িত্বের এই ক্ষেত্রগুলিতে অগ্রাধিকার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

পৌরসংস্থার সামনের কয়েকটি চ্যালেঞ্জ আছে, যেমন বাসিন্দাদের জল ছেড়ে আসার ব্যবস্থা করা, সরকার থেকে প্রাপ্য 'এডিশনাল গ্রান্ট' বা মোট বিক্রয় কর থেকে পাওয়া 'আনিয়ারিং গ্রান্ট' ইত্যাদি, বর্ধিত পৌরসংস্থা বাসিন্দাদের কাছে যে পরিষেবা পৌঁছে দিতে চায়, তাদের উৎস যে তুলনায় অপ্রতুল। তাই শহরের বিশেষত পূর্ব ও দক্ষিণ কলকাতার প্রত্যেক ব্যবস্থায় ডিসিসাবনে এগিয়ে ডেভেলপমেন্ট ফান্ড সূত্রে জল হিসেবে পাওয়া ২৫০ মিলিয়ন ইউ. এস ডলারের সদ্ব্যবহারটা করা হচ্ছে। জল সরবরাহ ও CMDA-র সহযোগিতায় বাস জমানের ব্যাপক উন্নতিতে চলছে। পানীয় এডিস্ট ও ড্রেনেজ বিভাগের একাধিক জল নিষ্কাশনের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচির পরিপূরক পরিষেবা দেওয়াই সেবাশ্রয় জন্যেও সমান্তর এডিস্ট্রিক্টে একটি নিয়মিত সেন্সিস ব্যবস্থার চালু করার পুরোদমে নিয়েছে।

> "নিম্নাঞ্চলে পৌরসংস্থার প্রাথমিক কর্তব্য হল বাসিন্দাদের পৌর সুবিধার আশ্বাস দেয়া। কোন কোন ক্ষেত্রে বর্ধিত পৌরসংস্থা বহির্ভূত অঞ্চলগুলির কয়েকটি সংস্থার মিলিতভাবে বাসিন্দা পরিষেবার দেখভাল করে; কিন্তু পানীয় জল সরবরাহ, জল নিকাশ ব্যবস্থা, জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ের খুব দায়িত্ব পৌরসংস্থা। তাই একক দায়িত্বের এই ক্ষেত্রগুলিতে অগ্রাধিকার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।"

পানীয় জল সরবরাহের জন্য ইতিমধ্যেই গার্ডেনরীচ জলকলের সঙ্গে বর্তমান ডেভিস কমপ্লেক্সে 4 MG আরও ছাইড্রো ফিল্টারের যুক্তির পশ্চিম পৌঁছে স্থানান্তর প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। কিন্তু পৌরসংস্থার কর্মিমন্ত্রী আরও ৩পা নির্মলীকরণ না থেকে এ নিয়ে অধিকতর অতিরিক্ত পরিষেবার ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে পৌরসংস্থা বাজারে ঢেকেছে পাবলিক ঋণ এই ২৩ ডলার "AA (Sanctioned Obligation)" বেটা।

জল সরবরাহের ক্ষমতা যে নতুন চারটি ট্রেজার হচ্ছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, পলতা ওয়াটার ওয়ার্কসে 40 MGD ক্ষমতার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট, 6 MG ক্ষমতার পৌরসংস্থার প্রথম ফিল্টার সহ বৃহত্তর পশ্চিম পৌঁছে এবং একটি 3.5 MG ক্ষমতার ফিল্টার সহ দুটোর পশ্চিম পৌঁছে 1.0 সব কাজে প্রায় ১৬০ কোটি টাকা আনুমানিক ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে।

বর্তমান বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কলকাতার জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এক উল্লেখযোগ্য সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। সম্প্রতি এই ক্ষেত্রে ইকোফ্রেন্ডলি কলকাতার সংস্কৃতির সঙ্গতিকে নিজেই ফিরিয়ে নেওয়ার দিকে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে দেখা কিছু প্রস্তাব বর্তমান মেয়র পরিষদের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায়। জানা গেছে, আলোচনার ভাবনাগুলির মধ্যেই ইতিমধ্যে সফল করা গেছে। কিন্তু আলোচনা ট্রান্সপোর্টের পুরোপুরি ফলন দিতে পারলে প্রকল্পগুলো কলকাতা থেকে হচ্ছে না। কিন্তু পৌরসংস্থা নিজেই এখন

কলকাতা ট্রামওয়েজের সহযোগিতায় ট্রাম পথের রক্ষণাবেক্ষণ সারাই করবে।

জল ব্যবস্থার উন্নতি সাধন না করলে সামগ্রিক ভাবে পৌরসভার কর্মক্ষমতা বাড়বে না। ফলতঃ জল আনাতে এক সুস্থতার পরিবেশ আনার সৃষ্টির দিকে বর্তমান পুরবোর্ড বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছে।

> **“জল ব্যবস্থার উন্নতি সাধন না করলে সামগ্রিক ভাবে পৌরসভার কর্মক্ষমতা বাড়বে না। ফলতঃ জল আনাতে এক সুস্থতার পরিবেশ আনার সৃষ্টির দিকে বর্তমান পুরবোর্ড বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছে।”**

দূষণ সমস্যার মোকাবিলাও বর্তমান প্রশাসনের কাছে এক বড় চ্যালেঞ্জ। এই ব্যাপারে কঠোরভাবে পলিথিন বিরোধী বিশেষ অভিযান চালানোর প্রস্তাবও তাঁরা রেখেছেন। পলিথিনের দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ থেকে যথাযথ সার্টিফিকেট না দেখাতে পারলে কোন শিল্পকে 'সার্টিফিকেট অফ এনভিরনমেন্ট কেন্ট' দেওয়া হবে না বলেও পৌরসভা সিদ্ধান্ত করেছে। আশা করা যায় এর ফলে বায়ু এবং জল দূষণের প্রকোপ অনেকটাই হ্রাস করা যাবে।

শহরের ট্রাফিক সমস্যার সমাধানে পার্ক স্ট্রীট এবং ধরমতলা স্ট্রীট সংযোগ স্থলে কমপিউটারাইজড পার্কিং ব্যবস্থা চালু হয়েছে। ঠিক এই ধরণেরই ব্যবস্থা লিন্ডসে স্ট্রীটে চালুর (S.S. Hogg Market) চেষ্টা চলছে পরিকল্পনা রয়েছে বর্তমান পুরবোর্ডের। নতুন পুরবোর্ডের আমলে একটি উড়ালপথের কাজ ইস্পে-কলকাতা ফ্লাইওভারের মাথায় টিটি সার্কাস মোড় থেকে ভিআইপি রোড পর্যন্ত শুরু হয়েছে। এই উড়ালপথ নির্মাণের ফলে ভিআইপি রোড থেকে কলকাতা বিমানবন্দরে যাতায়াতের সময় অনেক কমে যাবে।

ট্রাফিক সমস্যা সমাধানে ফুটপাথ দখলমুক্ত করার ব্যাপারে পুরবোর্ড বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। ফুটপাথ দখলমুক্ত করার ব্যাপারে পুরবোর্ড বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। ফুটপাথ দখলমুক্ত করার ব্যাপারে পুরবোর্ড বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

পৌরসভা সংবাদ

পুরসভা ৫০ কোটি টাকার বণ্ড ছাড়লো

শহরে জল সরবরাহ ব্যবস্থা আরও উন্নত করার জন্য কলকাতা পুরসভা ৫০ কোটি টাকার বণ্ড ছাড়ছে। রাজ্য পুর দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য জানান অর্থ সংগ্রহের জন্যই এই বণ্ড ছাড়া হচ্ছে।

উল্লেখ্য, আমেদাবাদ ও সুরাটে এর আগে বণ্ড ছেড়ে অর্থ সংগ্রহের নজীর রয়েছে। প্রতিটি বণ্ডের ইস্যুমূল্য ১ লক্ষ টাকা হিসাবে মোট ৫০টি বণ্ড এক্ষেত্রে ক্রয় করতে হবে।

পুরকর্তা জানিয়েছেন, কয়েকটি ব্যাঙ্ক, আর্থিকসংস্থা বণ্ড কেনা ইতিমধ্যেই আগ্রহ দেখিয়েছে।

পুরকর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত হল, যারা প্রতিদিন কমপক্ষে ১৫ হাজার লিটারের বেশি জল ব্যবহার করেন তাঁদের পুরসভা ডালহৌসি-বালিগঞ্জ লাইনে বাণিজ্যিক হারে মিটার বসানোর উদ্যোগী হয়েছেন। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে জল ব্যবহারকারী ৪১টি সংস্থায় পুরসভা মিটার বসিয়ে ইতিমধ্যেই ১ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা আয় করেছে। আগামী তিন বছরের মধ্যে পুরসভা আরও ৩০০টি ক্ষেত্রে মিটার বসানোর তোড়জোড় শুরু করেছেন। পুরসভার পদস্থ অফিসারদের ধারনা, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে জল ব্যবহারকারীদের

মেয়র সকাশে বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনার।

A D B প্রতিনিধির সঙ্গে মেয়র ও কাউন্সিলর।

মিটার বসিয়ে জল বিক্রি করাতে পুরসভা বছরে ৬০ কোটি টাকা আয় করতে পারবে। প্রতিবছর ১০০টি দপ্তরকে মিটার প্রকল্পের আওতায় আনবে। শহরে মোটামুটি হিসেবে প্রকল্প বাণিজ্যিক ব্যবহারের ৬০০০টি ক্ষেত্রে জলের সরবরাহ বাড়ছে। বড় ছাড়াও অনুষ্ঠানে পুরমেয়রমান অনিল মুখার্জি ডেপুটি মেয়র পীযূষকান্তি মুখোপাধ্যায়, মেয়র পরিষদ, শোভন চট্টোপাধ্যায়, রাজীব মেথ, জয়েস আহমেদ খান, প্রবীণ ঘোষ, স্বপন সমাদ্দার উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে মহানাগরিক সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের লিখিত ভাষণটি পড়ে শোনান পুরমেয়রমান মেয়রপরিষদ সোহন।

মেয়র তাঁর ভাষণে জানান, প্রত্যেকটি বড় ১ লাখ টাকা। বাকিতে টাকার পুরসভা। জলপ্রকল্পগুলি যেসব সমস্যায় চায়। বালিগঞ্জ, রাসবিহারী, বালিগঞ্জ জলপ্রকল্পগুলি এই হিসেবের বাইরে রাখার কথা হবে।

পুরভবনে পুরীর শঙ্করাচার্য

পুরীর শঙ্করাচার্য জগদ্গুরু অধ্যাত্মিক সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের আমন্ত্রণে সম্প্রতি কলকাতা পুরভবনে আসেন।

জগদ্গুরু পুরভবনে আসার পর মহানাগরিক তাঁকে স্বাগত জানান, এরপর আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। মহানাগরিক ছাড়াও শঙ্করাচার্যের কক্ষ থেকে ডেপুটি মেয়র পরিষদ সভা যায়, রাজীব মেথ, শোভন চট্টোপাধ্যায়, প্রবীণ ঘোষ এবং অন্যান্য উপস্থিত অধিকারিক ও অভিবিদ্যম।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ-এর হিরোশিমা স্থিত মূর্তিকে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন।

চিত্তরঞ্জন দাশ স্মরণে

গত ১৬ জুন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ-এর হিরোশিমা স্থিত মূর্তিকে কলকাতা পুরসভার পক্ষ থেকে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনের এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দেশবন্ধুর স্মৃতিপ্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট ব্যক্তি পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। অনুষ্ঠানে পুরসভার পক্ষে অতিরিক্ত মুখ্য ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন।

শ্যামাপ্রসাদ স্মরণে

কলকাতা পুরসভার পক্ষ থেকে গত ২৯ জুন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের হিরোশিমা স্থিত মূর্তিকে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনের এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এটিই শ্যামাপ্রসাদের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য জ্ঞাপন। পুরসভার পক্ষে অতিরিক্ত মুখ্য ইঞ্জিনিয়ার অনুষ্ঠানে এক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

শ্যামাপ্রসাদের মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন।

* নাগরিক পরিষেবা অক্ষুন্ন রাখতে বকেয়া কর অবিলম্বে মিটিয়ে দিন।

* জলই জীবন — এর অপচয় রোধে সক্রিয় সহযোগিতা করুন।

* আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে সঠিক সময়ে ফেলুন।

* কলকাতা আমার — আপনার। এর ঐতিহ্য বজায় রাখার দায়িত্ব আমাদের সবারই।

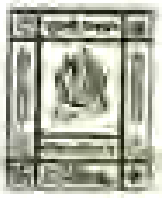

তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ
কলিকাতা পৌরসভা

পরিবেশগত দিক থেকে ভারতের সবচেয়ে
নিরাপদ বাসযোগ্য মহানগরী।
নগর সভ্যতায় পরিবেশ সংরক্ষণ আজ অত্যন্ত জরুরী।
এই শহরকে দূষণমুক্ত করতে আমরা সর্বদাই সচেষ্ট।
এই কাজে চাই নাগরিকদের সচেতন প্রয়াস ও
আন্তরিক সহযোগিতা।

তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ
কলিকাতা পৌরসভা

ঐতিহ্যের বন্ধন
কলকাতার স্পন্দন

কলিকাতা পৌরসংস্থা

কালের বসবধানে অতীতের স্বাক্ষর কলকাতার শিল্প সংস্কৃতি

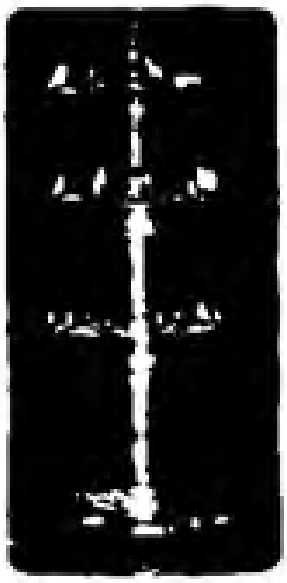

কলিকাতা পৌরসংস্থা

ঐতিহ্য রক্ষায় সচেষ্ট

কলকাতা

দুরশ্রী

রুচিশীল ও মনের মত বিভিন্ন স্বাদের বই পেতে হলে
কলকাতা পুরসভার প্রকাশিত বই পড়ুন ও পড়ান

ছোটদের জন্য

[illegible]		১৫.০০
[illegible]		২০.০০
[illegible]	(নিঃশেষিত)	১৫.০০
আনন্দমেলার ইচ্ছা		
		৫০.০০
	(নিঃশেষিত)	৫০.০০
A [illegible] ome to Rabindranath	(নিঃশেষিত)	৬৫.০০
C [illegible] A Rammi Birth Centenary Issue		২৫.০০
C. M. Co. [illegible] Anthology Number 1924-1947		২০.০০
C. M. Gazette [illegible] Netaji Birthday Cent. Vol. Cent. exc – tribute		৩০.০০
C. M. Gazette [illegible] Netaji Centenary Issue		১৫০.০০
Calcutta Steps into 300 years		৮.০০
Glimpses of Calcutta		
Mayors of Calcutta		
Calcutta – a Glimpse		
Calcutta – a set of pictures		১৫.০০
Calcutta at a Glance		৫৫.০০

মাসিক পত্রিকা

পুরশ্রী (বার্ষিক সংখ্যা)	৫.০০
পুরশ্রী (বিশেষ সংখ্যা)	১০.০০/১৫.০০

নব বর্ষবরণে শারদীয়া "কলকাতা পুরশ্রী" প্রকাশিত হচ্ছে এই বিশেষ সংখ্যায় থাকছে

পুজো বিষয়ক বিশেষ প্রবন্ধাদি, গল্প, কবিতা।

বিশিষ্ট লেখকবৃন্দের লেখনীতে পুষ্ট এই অনন্য সংখ্যাটি বেরোন মাত্রই সংগ্রহ করুন।

তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ

১নং বস্ত্র স্ট্রীট, ৪র্থ বিল্ডিং (চতুর্থতল)

কোলকাতা-৭০০ ০৬৯

দূরভাষ — ২৪৩-০২৫৯/২৪৪-২০৭১ প্রশাসনিক — ২৪১১/২৪৭২

কলকাতা পুরশ্রী

১ম বর্ষ ☐ সপ্তম সংখ্যা ☐ শ্রাবণ ১৩৬৮

বিষয়সূচী

- সম্পাদকীয়
- ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বামী বিবেকানন্দ — ডঃ তারাপদ বসু
- ভারতের প্রথম ঐতিহাসিক সংবাদপত্র — হরিপদ ভৌমিক
- স্বাধীন চেতনার দীপ্ত আলোকে শঙ্খ মিত্র — প্রফিত বসু
- ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের পুণ্য স্মৃতিবিজড়িত ঃ
  ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিস্মৃতপ্রায় নীরব দান
  ইতিহাস এ্যাসোসিয়েশন — প্রফুল্ল কুমার রায়
- স্বাধীনতার দিনে কলকাতা — ডঃ আশীষ লাহা ☐
- স্বাধীনতা দিবসে কিছু ভাবনা — পীযূষ কান্তি রায়
- কলকাতার বুকে ৩৮ ইংরেজির প্রথম স্বাধীনতার দৃশ্য — কালিদাস হাজরা
- ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিস্মৃতপ্রায় মনীষী — সুস্মিতা পাল
- পুরপত্রী সংবাদ

উপদেষ্টা মণ্ডলী —
নিত্যেন্দু রায় (চেয়ারম্যান) ডঃ শান্তি গোপাল চট্টোপাধ্যায় (সিনিয়র)
শচীন্দ্র কুমার পাল (সিনিয়র) অরুণ মিত্র (সিনিয়র)

সহযোগী সম্পাদক শ্যামল রায়
সম্পাদনা দেবাশিস চক্রবর্তী
মূল্য ৩ টাকা

প্রকাশক নীলমণি পাল

প্রতিষ্ঠান (পৌরসংস্থার কলকাতা পুরশ্রী পত্রিকা) হতে ৯ এপ্রিল ১৯৬১ খ্রিঃ, ১৮ চৈত্র ১৩৬৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত, ৪০০ নং ইটালি রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৬ হইতে প্রকাশিত।
নিবন্ধ ইতিহাসিক কলকাতার এবং ইহার উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ক। [illegible] কলকাতা, ভারত, ফোন ৩৫৩৯ ৩৩১৯ হইতে মুদ্রিত।

কলিকাতা পৌরসংস্থা

কলিকাতা পৌরসংস্থার করদাতাদের উদ্দেশ্যে

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বকেয়া পুরকর পরিশোধে সুদ ও জরিমানা মকুব

কলিকাতা পৌরসংস্থা [illegible] পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুমোদন [illegible] পৌরসংস্থার অন্তর্ভুক্ত [illegible] বকেয়া পুরকর পরিশোধে উৎসাহিত করতে সুদ ও জরিমানা মকুব করার নিমিত্ত একটি প্রকল্প (Scheme) ঘোষণা করেছে। প্রকল্পটি [illegible] (Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976) অধিভুক্ত হবে। এই প্রকল্পের খুঁটিনাটি হল —

১। এই প্রকল্প গত ১লা জুলাই থেকে ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৮১ পর্যন্ত চালু থাকবে।

২। এই প্রকল্প ১১.৫.১৯৮৩ পর্যন্ত চালু থাকবে বিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

৩। প্রকল্প অনুযায়ী —

(ক) ৫ ১৯৯৯ পর্যন্ত চালু থাকবে বিলের ক্ষেত্রে মোট সুদের ১০০% মকুব করা হবে।

(খ) ৯.৯৯ থেকে ৫১.৯৯ পর্যন্ত চালু থাকবে বিলের ক্ষেত্রে মোট সুদের ৭৫% মকুব করা হবে।

(গ) ৫১.৯৯ ও ১০০০ পর্যন্ত চালু বিলের ক্ষেত্রে মোট জরিমানা ১০০% মকুব হবে।

৪। প্রকল্পটায় থাকবে কর প্রদানের উৎসাহে যে কর থেকে টাকা এই প্রকল্প জারী হওয়ার পূর্বে জমা দিয়েছেন এবং ইতিমধ্যে অতিরিক্ত [illegible] (Urban Land Tax) আছে, সেই কর থেকে টাকা এই প্রকল্পের আওতায় না এনে এই জমা টাকা থেকে ইতিমধ্যে আদায় করা সুদ ও জরিমানা কর বাবদের জন্য শেষের দেওয়ার পর এই প্রকল্প অনুযায়ী হিসাব করা নির্ধারিত হবে।

৫। প্রকল্পের সময় সীমা অর্থাৎ ৩১.১২.১৯৮১ এর মধ্যে যাদের হিসাব মেটা টাকা সম্পূর্ণ ভাবে জমা না দিলে সুদ ও জরিমানা মকুবের এই সুবিধা তারা পাবেন না।

৬। ১লা জুলাই থেকে ৩১শে ডিসেম্বর মধ্যে এই প্রকল্পে আবেদন করতে হবে। [illegible] আবেদনের নমুনা ফর্ম [illegible] নাম, এলাকার নং, বাড়ির পুরো ঠিকানা উল্লেখ করতে হবে। যদি কোন ক্ষেত্রে টাকা জমা থাকে সে সম্পর্কিত রসিদের প্রতিলিপি আবেদনের সঙ্গে অবশ্যই দিতে হবে।

অতিরিক্ত পৌরকমিশনার অর্থ ও রাজস্ব নিয়ন্ত্রণের অনুমোদন ক্রমে এই প্রকল্প টাকা মোট সুদ ও জরিমানা মকুবের এই সুবিধা গ্রহণ করে সমস্ত করদাতা যাতে নিতে পারেন।

— করদাতা বিভিন্ন অফিসে জমা দেবেন ও যে অফিসে টাকা —

১১৬, লালবিহারী এভিনিউ (বড়িবাড়ি মোড়), ডিভিশন অফিসে — ৭৩৩ ৩১৪
ওয়ার্ড নং — ৭৩, ৭৭, ৭৪, ৪১-১১৬

৭৬, সিমলিয়া মোড়, পরিষদ অফিসে — ১৬৩ ৩৮৪
ওয়ার্ড নং — ১৫১, ১৭২, ১১৩-১১৪

রাজেন্দ্রলাল ব্যানার্জি, পাড়ুলিয়া মোড়, ডিভিশন অফিসে — ৭৭৩ ৩৭৯
ওয়ার্ড নং — ১০৩-১৭৯

১, এম এম হাই মোড়, অফিসে — ১৬৩ ৩৩৮
ওয়ার্ড নং — ১১৪-১৭৭

৪, এম এম আলমারী মোড়ে অফিসে — ১৩৩ ৩১৬
ওয়ার্ড নং — ১-১৬ (১৯, ৯১, ৯২ বাদে)

৩/৭, লালবিহারী পাড়ালিঙ্ক মোড়ে অফিসে — ১৩৩ ১১৪
ওয়ার্ড নং — ১৬৩-১৮১

তারিখ মোড়
পৌরপ্রমুখ

সম্পাদকীয়

স্বা

নাগরিক পরিষেবা অক্ষুন্ন রাখতে বকেয়া কর অবিলম্বে মিটিয়ে দিন।

জলই জীবন — এর অপচয় রোধে সক্রিয় সহযোগিতা করুন।

আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে সঠিক সময়ে ফেলুন।

❋ কলকাতা আমার — আপনার। এর ঐতিহ্য বজায় রাখার দায়িত্ব আমাদের সবারই।

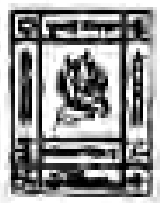

তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ
কলিকাতা পৌরসভা

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বামী বিবেকানন্দ

ডঃ তাপস বসু

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রসঙ্গতঃ তিনটি ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল। (১) মন্তু নিয়ন্ত্রণ-ভিত্তি-আইনিঅসহযোগী আন্দোলন। (২) গান্ধীজীর নেতৃত্বে অহিংস গণ আন্দোলন। (৩) সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ বাহিনীর মাধ্যমে ব্রিটিশ শক্তির সম্মুখ সমর। এছাড়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে সকল আন্দোলন চলেছিল তা এদের বিরোধিতা করেনি। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম তিনটি ধারার শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব সুস্পষ্ট। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম যখন সংগঠিত রূপ নিয়েছিল তখন শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের অন্তর্ধান ঘটেছে। কিন্তু, তাঁদের ভাবধারায় দীক্ষিতরা যে সময় রামকৃষ্ণ মিশন-তা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পরিপূর্ণ ভাবাদর্শে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল-প্রসারিত হয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের পরিকল্পনা প্রসূত এবং অটল আস্থা ও গুরুর পার্ষদদের অক্লান্ত পরিশ্রমের সহায়তায়। এই ভাবধারা মিশনের আনুষ্ঠানিক সূচনাকাল থেকেই তার নেতৃত্বে ছিলেন শ্রীমা সারদাদেবী। প্রকৃতপক্ষে তিনিই প্রথমকৃত্য ভার ও মিশনের সভানেত্রী। ১৮৮৬ থেকে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ-দীর্ঘ এই ৩৪টি বছর নিরবচ্ছিন্নভাবে শ্রীমা সারদাদেবী নেতৃত্ব এই মিশন পরিচালনা করেছেন। ও মিশনের ভবিষ্যৎ নিশ্চিন্তে সুদৃঢ় ভিত্তিভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শ্রীমা-মাতৃরূপে ভক্তদের কাছে যেমন বৃহৎ ও বিশেষ পরিচিত ছিলেন তেমনি সুচিন্তিত দৃষ্টিভঙ্গি, আশ্চর্য শক্তির আধার হয়েও শেষ পর্যন্ত ছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ

ভারতবর্ষে তৃতীয় আন্দোলন ও বিপ্লবের (১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ) পর থেকে ভারতবর্ষ পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ। সেই পরাধীনতা ঘৃণা থেকে ঘৃণিততর হয়েছে যেখানে পরিচালনা আধারণে ও শাসন আচরণে এবং অবশেষে ধনবাদী-ভাড়-পুঁজিবাদী নিপেষণে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিদেশের আগমন বিষয়ে, দীর্ঘ বছর পরাধীন থাকার ফলে ভারতবাসীর আত্মবিশ্বাস ভেঙে, আত্মবিস্মৃত জীবনযাপনের ক্ষেত্রে তৈরী করেছিল অবকাশ। বিদেশীদের কাছে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত আমুকরণের চাঁদনে নেমে এসেছিল ভারতের স্বপন-পতন। ধর্মান্তরণে নানাবিধ প্রচেষ্টার অধিকাংশের ক্ষেত্রে, সনাতনিক বিশ্বাসধারায় আঘাতের আঘাত হয়ে পড়েছিল মারাত্মক। পরিধির লম্পট পুরিবেশে পাশ্চাত্যের ভারতীয় আদর্শ জীবনধারায় নেমে এল অন্ধকারের অভিশাপ। সমস্ত ভারতেই সাধারণ মানুষ

বিবেকানন্দ কুমিলায় বসু

ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষাদানের জন্য যিনি বিনিময়ে ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির মূল্যবান তথ্যগুলি পাশ্চাত্যে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন, তিনি ছিলেন ডেভিড হেয়ার। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে স্কটল্যান্ডে তাঁর জন্ম হয়। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলকাতায় আসেন। ঘড়ি তৈরির ব্যবসা করে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ভারতের প্রতি সহানুভূতিশীল ইংরেজদের অন্যতম। ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য তিনি যে কাজ করেছিলেন তা ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পিছনে তাঁর প্রেরণা ছিল। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই কলেজের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর কলকাতার বিভিন্ন স্থানে তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে বহু প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। তাঁর নামে কলকাতায় একটি স্কুলও আছে।

ডেভিড হেয়ার ভারতীয় ছাত্রদের ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন, ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে ভারতীয়রা পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হবে এবং তার ফলে তারা ইংরেজদের সমকক্ষ হয়ে উঠবে। তিনি ভারতীয়দের ইংরেজি শিক্ষার জন্য যে প্রচেষ্টা করেছিলেন তা ছিল আংশিক এবং অপূর্ণ। তাঁর এই অসম্পূর্ণ ও অপূর্ণ প্রচেষ্টার ফলে ভারতে কিছু কিছু ইংরেজি শিক্ষিত লোকের সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁরা ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁরা ইংরেজদের কাছে ভারতের ইতিহাস, ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে অনেক তথ্য পরিবেশন করেছিলেন। ইংরেজরা ভারতের সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করত তার অনেকটা পরিবর্তন করতে তাঁরা সমর্থ হয়েছিলেন। ভারতীয়দের ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে ইংরেজদের সঙ্গে পরিচিত করার ব্যাপারে ডেভিড হেয়ার ছিলেন অগ্রণী। তাঁর এই প্রচেষ্টার ফলে ভারতীয়রা ইংরেজদের কাছে পরিচিত হতে পেরেছিল। তাঁর এই প্রচেষ্টার ফলে ভারতীয়রা ইংরেজদের কাছে পরিচিত হতে পেরেছিল। তাঁর এই প্রচেষ্টার ফলে ভারতীয়রা ইংরেজদের কাছে পরিচিত হতে পেরেছিল।

ডেভিড হেয়ার ভারতীয়দের ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত করার ব্যাপারে যে প্রচেষ্টা করেছিলেন তা ছিল আংশিক এবং অপূর্ণ। তাঁর এই প্রচেষ্টার ফলে ভারতে কিছু কিছু ইংরেজি শিক্ষিত লোকের সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁরা ইংরেজদের কাছে ভারতের ইতিহাস, ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে অনেক তথ্য পরিবেশন করেছিলেন। ইংরেজরা ভারতের সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করত তার অনেকটা পরিবর্তন করতে তাঁরা সমর্থ হয়েছিলেন। ভারতীয়দের ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে ইংরেজদের সঙ্গে পরিচিত করার ব্যাপারে ডেভিড হেয়ার ছিলেন অগ্রণী। তাঁর এই প্রচেষ্টার ফলে ভারতীয়রা ইংরেজদের কাছে পরিচিত হতে পেরেছিল।

ডেভিড হেয়ার ভারতীয়দের ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত করার ব্যাপারে যে প্রচেষ্টা করেছিলেন তা ছিল আংশিক এবং অপূর্ণ। তাঁর এই প্রচেষ্টার ফলে ভারতে কিছু কিছু ইংরেজি শিক্ষিত লোকের সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁরা ইংরেজদের কাছে ভারতের ইতিহাস, ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে অনেক তথ্য পরিবেশন করেছিলেন। ইংরেজরা ভারতের সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করত তার অনেকটা পরিবর্তন করতে তাঁরা সমর্থ হয়েছিলেন। ভারতীয়দের ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে ইংরেজদের সঙ্গে পরিচিত করার ব্যাপারে ডেভিড হেয়ার ছিলেন অগ্রণী। তাঁর এই প্রচেষ্টার ফলে ভারতীয়রা ইংরেজদের কাছে পরিচিত হতে পেরেছিল।

সমসাময়িক কালের ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিবেকানন্দের শক্তিশেলের শক্তিশেল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সূত্রেই তাঁর পাশাপাশি গান্ধী। দীর্ঘ চার বছর আন্দামানের অন্তরীণ, বিচারাধীন কারাবাস এবং মুক্তির পর ভারতীয় রাজনীতির ঈশ্বরীয় হয়ে ওঠা ইতিহাসে প্রতিনিধিত্বমূলক বিবেকানন্দ আধ্যাত্মিকতার নিরিখে ভারতবর্ষের মুখ হিসেবেই চিহ্নিত। ভারতের অন্তর্নিহিত দৈবীশক্তি নিয়ে তাঁর আলোড়ন তুলেছিলেন বলেই বিবেকানন্দের আকাশে ভারতের সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল নক্ষত্র।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বিবেকানন্দের ভারত-প্রত্যাবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে অভ্যর্থনার আয়োজন পূর্ণ হয়েছিল, তৃপ্ত হয়েছিল। এই অভ্যর্থনার পূর্ণতায় বিবেকানন্দের ভূমিকাকে মূল্যায়ন করতে গিয়ে ঐ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে ভগিনী নিবেদিতা লিখেছিলেন "শক্তিতে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে স্বামীজির সমস্ত কথা বারবারই যেন ঐ শব্দটিকে পুনরুল্লেখন ও ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল এই উপলব্ধি। পরবর্তী পর্যায়ে ঘটেছিল ভারতবর্ষের ভিতর থেকে তাঁর প্রতিক্রিয়া। কখনো স্বাভাবিক। সংস্কৃতির প্রত্যাখ্যান, কখনো বা প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার উপর নৃতত্ত্বজাতে গুরুত্ব আরোপ ও নতুনের বক্তব্যের সংযোজন শুরু হয়েছিল। ফলশ্রুতি ভারতীয় মনে পুরনো সংস্কৃতির সমস্ত কিছুকে সমর্থন ও জাতীয় জীবনে সেগুলির স্বাভীকরণই হয়ে উঠেছিল এই পর্যায়ের বিবেকানন্দের প্রধান কাজ। এরপর আসে হয় আত্মীকরণের এক যুগ চরিত্রিত। ফলতঃ গ্রহণ-বর্জনের প্রক্রিয়ায় সমাজকে পরিণত করতে গিয়ে যে পদ্ধতি অনুসরিত হয়েছিল তাকে বলা যায় প্রাচীন ও নবীন—ঐতিহ্যবাদী ও যুগ সমন্বয়বাদক—উভয়পন্থী মনুষ্যের সৃষ্টিবিধানের একটি চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেকটিরই একটি পূর্ণতার রূপ, একটি সমন্বয়ধর্মী পূর্ণতাকে নিতি গ্রহণ করেন। তা প্রাচীন সংস্কৃতির অন্তঃ আত্মিক কোন কোন সময়ে পুনরুজ্জীবিত করতে চাইলেও জীর্ণতাকে বর্জন করেছিল। মূলতঃ তা ছিল প্রাচীন আধ্যাত্মিকতার মধ্যে থাকা আর তাকে বৃহত্তর বিশ্বজীবনের দিকে নিয়ে যাবার প্রচেষ্টা। বিশ্বের এক দার্শনিকের মতে সেতুবন্ধন এবং পূর্ণবিশ্বাসের ধারা সারকথনের এই উপলব্ধিতে অনন্যসুলভ ছিলেন বিবেকানন্দ।

বুদ্ধদেবের উপদেশ পালনের জন্যেই শুধু নয়, সমস্ত মানুষের প্রতি প্রসারিত করুণা ও মৈত্রী হৃদয়ে নিয়ে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। তাঁর এই পরিব্রাজনের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বুঝেছিলেন ভারতের মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য, অজ্ঞতা-কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস-গোঁড়ামি, ধর্মের নামে ভণ্ডামি, সমাজের নামে অনাচার, অত্যাচার, অবিচার, ব্যক্তির নামে স্বেচ্ছাচার,

বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ হয়েছে।

আমাদের সকলকে আজই, নিশ্চিত ভাবে হবে। তবেই আমরা বলতে পারিনাকে করবো। ওঠো, জাগো, তোমাদের মাতৃভূমি এই মহাবলি প্রার্থনা করছেন।

এর আগে আমেরিকা থেকে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ১০ জানুয়ারি লিখিত আমেরিকা ভারতবিজয়ী, শেষবারের মতো বুকলিনের উদ্দেশ্যে বক্তৃতার উপসংহারে যা লিখেছেন তারমধ্যে প্রতিনিধিত্ব ব্যক্তিত্বের উপর আছে —

'এসো সাহসী হও। নিজেদের বন্দীর খোলস থেকে বেরিয়ে এসে দেখো, সব জাতি তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। তোমরা মানুষকে ভালোবাসো? ঈশ্বরকে ভালোবাসো? তাহলে এসো, আমরা আমাদের জন্যে-ই হয় আমার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করি। পেছনে তাকিও না — আমরা যেন আমাদের স্বজন বন্ধুকে কাঁদাবো। পেছনে তাকিও না। সামনে এগিয়ে যাও। ভারতমাতা পায়ের তলে বুকের বলি চায়। মনে রেখো, মানুষ চাই, পশু নয়। প্রভু তোমাদের এই বাঁধাবাধা সভ্যতাকে ধ্বংস করার জন্য ইংরেজ গভর্নমেন্টকে প্রেরণ করেছেন।'

বিবেকানন্দের এই অভিনবত্বই আমাদের পরাধীন ভারতবর্ষে বিশেষতঃ যুবকদের মনে নিয়ে এল বৃহত্তর নির্দেশ।

এই আহ্বানগুলির পিছনে ছিল তাঁর ভারত প্রত্যাবর্তনের পর পরাধীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ছবিটি। আর, পাশ্চাত্য পরিভ্রমণে আমেরিকা-ইউরোপের স্বাধীন দেশগুলির সামাজিক চিত্রটি। একদিকে ঔপনিবেশিক পুরাধীন ভারতবর্ষের দুর্বিষহ পরাধীনতার গ্লানি, অন্যদিকে আমেরিকা ইউরোপের স্বাধীন দেশগুলির উন্নতি বিবেকানন্দের কাছে দুঃসহ দুঃখদায়ক ছিল। তাই তিনি ভারতে ফিরে এসে যুবকদের মানসিকতাকে দেশোদ্ধারের আহ্বান জানানোর একটিমাত্র, অদ্বিতীয় রাস্তা, নির্দিষ্টভাবে করেন, অন্যান্য ভাবনাচিন্তাগুলি পরে প্রকাশ করে নিজে 'উদ্বোধন' পত্রিকায়; প্রতিষ্ঠাতে চ' — এই মন্ত্রকে উচ্চারণে করে নিবেদনের উদ্দেশ্যের উপযুক্ত নিয়ে মানসিকতার গড়ে

নিবেদিতা নিবেদিতা

তোলার জন্য ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মে কলকাতায় রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করলেন। তিনি নিজে রামকৃষ্ণ মিশনের নিবেদনটি ইংরেজী আহ্বানের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল রামকৃষ্ণভাবনার লক্ষ ও কার্যাবলী। বর্ণ-আশ্রমভিত্তিক ও জনকেন্দ্রমূলক প্রতিষ্ঠানগুলোই, রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শগুলি ও নিয়মের সেই লক্ষ্যেও পরে হলো। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে রাজনীতির কোন যোগাযোগ থাকবেনা — এটা প্রথম থেকেই স্থির হয়েছিল। তাছাড়া ও আমরা দেখতে পাচ্ছি বিদেশে ভারতবর্ষীয় মূর্তির সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক সভ্যতাসম্পর্কে আত্মবিশ্বাস অর্জনের মধ্যে দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা আনার মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানে যুবকদের যোগ দেবার বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছিল বিশেষ ভাবে।

রামকৃষ্ণ মিশন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সাধনে যেমন এগিয়ে চলেছিল, কিন্তু, অনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী গোয়েন্দা পড়েছিল এই প্রতিষ্ঠান। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা উল্লেখযোগ্য। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক স্বামী বিবেকানন্দের উপর ব্রিটিশ গোয়েন্দা পুলিশের নজরদারী এক হয়েছিল রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই। বিষয়টি সকলের দৃষ্টিগোচর হয়ে সময় লাগে।

১৮৯৮-এর ২২ মে তারিখে নিবেদিতা তাঁর এক বান্ধবীকে চিঠিতে এ প্রসঙ্গে লেখেন: 'আজ সকালে সন্ন্যাসীদের একজন সতর্কবাণী শুনেছেন — পুলিশ গোয়েন্দা আমাদের গতিবিধির উপর নজর রাখছে। ব্যাপারটা সাধারণভাবে অবশ্য আমরা জানতাম, কিন্তু, আজকের সংবাদটি একেবারে সামনে আঁকা ছবির মতো। সরকার নিশ্চয়ই ভেবে নেবে, আমরা রাজনীতিকে যদি হাত দেবার আগে তাদের ঠোঁট করে তবে তাই প্রমাণিত হবে। সরকারের এই ভাবনা কলকে আগুন ধরিয়ে দেবে। যা পারে দেখে আগুন ধরিয়ে দেবে।'

ব্রিটিশ সরকার 'যা' আশঙ্কা করেছিল, বিবেকানন্দের আমাদের, আপনাদের জাতিগঠনের লক্ষ করে। তবে বিবেকানন্দের প্রতি গোয়েন্দা পুলিশ নিযুক্ত করে ব্রিটিশ সরকার বিবেকানন্দের অধিবাসীতে উপস্থিত যুবকদের মনের মধ্যে স্বাধীনতা আন্দোলনের কাজটি ত্বরান্বিত করেছিল। পরবর্তী ইতিহাস সেই সত্যটাই প্রমাণ করে।

রামকৃষ্ণ মিশন ব্রিটিশ রাজদ্রোহের শিকার হয়ে গঠনের প্রথম কাল — ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ইংরেজ বিরোধী কার্যকলাপ সংগঠনের মূলত্ব বর্ষকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে নিবেদিতার কলকাতা উদ্বোধন বিদেশে আলোড়নের

বিভিন্নমুখী কার্যকলাপের দিকে তাকালে দেখতে পাওয়া যায় যে, শুধু ধ্যানে-জ্ঞানে নয়, কর্মে ও ভাবে তিনি ছিলেন একাধারে ভারতীয় ও বিশ্বমানবের। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যখন সমস্ত পৃথিবীতে তাদের সেই সকল উচ্চশ্রেণী বিরোধীদের আক্রমণ করা থেকে নিবৃত্ত করতে ঐতিহাসিক অবদান রেখেছিল তার "The Extremist Challange" গ্রন্থে লিখেছেন :

"This is the story on an idea at once religious and political." ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের-রাজনীতিতে যখন এই অপরিচিত প্রবল ব্রিটিশ সংকটের ঢেউ এড়িয়ে যাবার জন্য এদেশের সন্ত্রাসবাদী সমাজের কোন কোন অংশের উপর ভার করবার ঢেউ লাগছিল। এই গোপন প্রস্তুতি থেকে রামকৃষ্ণ মিশনও রেহাই পায়নি। এ পাওয়াটাই স্বাভাবিক। কেননা, রামকৃষ্ণ মিশনের অনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠাতা স্বামী বিবেকানন্দের অনুপম ও অভিনবত্ব ভাবধারা পরিচালিত হয়েছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন — বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ধারায়।

॥ ২ ॥

বিবেকানন্দের চেতনায় ভারতবর্ষ জুড়ে ছিল মানুষ-মানুষ আর মানুষ। তাঁর প্রথম কথাটিও মানুষ আর শেষ কথাটিও মানুষ। মানুষ শব্দটিকে তিনি দুটি অর্থে ব্যবহার করেছেন — (ক) "আমি" আর "তুমি" নিয়ে যথার্থ মানুষ হয়ে ওঠা, (খ) মানুষ হয়ে অন্য-কারও নিশ্চীড়িত প্রতিবেশী মানুষের পাশে দাঁড়ানো। বিবেকানন্দ ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে অকপট, খাঁটি, প্রতিটি, নিষ্ঠাবান, দেশপ্রেমী মানুষ হিসেবেই নয়। অভিজিতের প্রস্তুতির প্রায় অন্তিম লিখনে একটি উচ্চ আদর্শের জন্য বৃহত্তর পর্যন্ত বলি দেবার প্রস্তুত। যদি এমন একদিনে আমেরিকা-আগমনকারী যুবক বিবেকানন্দ দেশের তথা ভারতের মুক্তি আন্দোলনে অংশই গ্রহণ করতেন তবে ভারতের ইতিহাস অন্য রকম হতে পারত। বিবেকানন্দ তাঁর সমসাময়িক কালে এমন দেশপ্রেমী যুবকদের পাশাপাশি ছিলেন, তবে, পার্থক্যটা ছিল এখানে যে, তাঁরা এদিকে দেশের পরাধীনতার দুঃখকে যেভাবে উপলব্ধি করেছিলেন বিবেকানন্দের তা ভাবনার ধারা অনুসরণ করে এগোয়নি। কেননা, বিবেকানন্দই প্রথম ব্যক্তি, যিনি উচ্চবর্ণের দেশপ্রেমীদের কাছে থেকেছিলেন প্রত্যেকটি এক নতুন আদর্শ। শক্তিমের অন্যতম ধারা দেশপ্রেম এবং, তবে তা ছাড়াও দেশের আরো দেশপ্রেমিক এই বৃহৎ

সুভাষ চন্দ্র বসু

আদর্শ হলো, প্রত্যয় বুদ্ধ ভূমিকা এবং অধিকার নিয়ে দিয়ে দেশপ্রেমিক যুবক তৈরিতেই বিবেকানন্দ তাকে দিয়েছিলেন। বিবেকানন্দের অভিনব বাণী-প্রচার ও শিক্ষালয়ের আদর্শ গড়াতীনতার আন্দোলনে অনেক গভীর অবদান ও নৈরাশ্য দিয়েছে, বীরত্বের পূর্ণাঙ্গ অভিজ্ঞ তবে অনেক দেশপ্রেম, অপরিচিত আর শিক্ষার ও অনুভূত আদর্শে সমাজ করে তারতে এক নবজাগরণের সম্ভার করল। বিবেকানন্দ ইতিহাসে শেষ নিঃসন্দিগ্ধে প্রথম করলেন সেটিকারণের নিজারক —

"তুমি যখন ভারত তার শ্রেষ্ঠ হইবেছে। ... নিজের পর অনিবার্য হইবেছে, তাহার জন্যে প্রথম দুঃখ হইবেছে। আজ সে যে দেখিতেছে না, নিকট হইতে যে সে বুঝিতেছে না। তাহাদের এই মানুষটির গভীর নিজ শক্তিমান করিয়া তুলিতে হইবেছেন। তার ভেতরই ইহার পরিচয়ের সমর্থ নয়। ... কেন বহিঃশক্তি এখন আর ইহাকে ধ্বংস করিতে পারিবেনা। ... ভূমিকম্পের ইহা নিজে অভিজ্ঞতা।"

জাতি সত্যিই মোহিত হোয়েছিল। বিবেকানন্দের চেতনায় ভারতের রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস নতুন পথে ধাবিত হতে লাগল। লক্ষ লক্ষ যুবক জাতীয়তার মূলমন্ত্রকে আত্মানুভূতি দিতে এগিয়ে এলেন। রামকৃষ্ণ মিশন অনুষ্ঠানিক ভাবেই সেই সময় প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। আমরা জানি, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ছিলেন অহিংস ও সহিংস — কিন্তু এঁরা সকলেই বিবেকানন্দের বাণীবাহী পথে বিশেষ ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মধারা ও ভাবাদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েছিলেন আর তার ফলই তো-ভিত্তে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ক্রমশঃ ভীত হয়েছিল রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতি।

বিবেকানন্দের জীবদ্দশাতেই পরেই (১৯০২) ১৯০৫-এ বঙ্গ ভঙ্গের আন্দোলনে বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠেছিল বাংলাদেশে। বিপ্লবীরা শক্তিশালী হয়ে উঠল। নতুন রাজনৈতিক পরিবেশকে নিয়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে আবির্ভাব ঘটলো বালগঙ্গাধর তিলক ও গান্ধীজীর। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা জোরের সঙ্গে বলতে পারি যে, জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যে মানসিকতার প্রস্তুতি ও জাতীয় চেতনার উন্মেষ-প্রকৃত পক্ষে ভারতের মুক্তি সংগ্রামে সেই মহত্তর ভিত্তিভূমি তৈরি করেছেন বিবেকানন্দ। জাতীয় আন্দোলনে বিবেকানন্দের প্রভাব সম্পর্কে রাষ্ট্রগুরু সম্পূর্ণরূপে ওয়াকিবহাল ছিলেন।

বিপ্লবীদের আন্দোলন দমন করতে গিয়ে পুলিস বিভাগকেও প্রচণ্ডভাবে আঘাত করতে দেখা গিয়েছিল। ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে রাওলাট কমিটির রিপোর্ট (১৯১৮), ঐতিহাসিক রাজনৈতিক কেসের কাগজের ভিত্তিতে সম্পাদিত 'Political trouble in India' ১৯০৭-১৭ এবং বিভিন্ন গোপন রিপোর্টে বিপ্লবীদের উপর বিদেশনেতৃত্বে অত্যাচারের মূলে রাজনৈতিক শিক্ষা সম্পর্কে পুলিস রিপোর্ট থেকে তথ্য গ্রহণ করে বাঙালী লেখক বারীন্দ্রকুমার ঘোষ তাঁর 'নির্বাসিতের আত্মকথা' গ্রন্থে বাংলার বিপ্লবীদের উপর বিদেশনেতৃত্বে অত্যাচারের মূলে রাজনৈতিক শিক্ষা সম্পর্কে পুলিস রিপোর্ট থেকে তথ্য গ্রহণ করে বাঙালী লেখক হরিসাধন মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বিপ্লবীর

হিসাবের মধ্যে রাখিলে মুখস্থটি প্রত্যক্ষ করে, অন্যদিকে অল্প কয়েকটি অপরিচয়ের মাঝখানে শব্দের অর্থে বাঁশিয়ে পড়েছে সুধন্য মোহনে। তাহলে সেই প্রয়াস ব্যর্থ হয়নি। ১৯৪৭-৪৮ কালিদাস রায়ের সে কথাই স্বীকার করে।

১৪৫

গান্ধীজী ১৯০১-এ বেলুড় মঠে বিবেকানন্দের মাকে দেখা করতে। প্রান্ত-ক্লান্ত গান্ধীজীর সঙ্গে বিবেকানন্দের দেখা হয়নি সেদিন, কারণ, গান্ধীজী তখন অসুস্থাবস্থায় কলকাতায় চিকিৎসাধীন। গান্ধীজীর সঙ্গে বিবেকানন্দের দেখা হয়েছিল কলকাতায়, তবে সেটি সাক্ষাৎকার এ পারিপার্শ্বিক আলোচনা সুখকর হয় নি। না হওয়াই স্বাভাবিক, কেননা, গান্ধীজী ছিলেন অহিংসার আধারে জাতীয়তাবাদী মন্ত্র আন্দোলন গড়ে তোলার পক্ষে আর, বিবেকানন্দ সেই সময় লড়িয়ে বিপ্লবীদের উপাস্যদেব। গান্ধীজীর সঙ্গে বিবেকানন্দের দেখা হলে কী হতো সে প্রশ্ন কালের গর্ভে লিনীন।

শরীরমাধব চক্রবর্তী

বিবেকানন্দের পর জনমানসে যাঁর স্থান তিনি হলেন গান্ধীজী। গান্ধীজী ১৯২১-এর ৩০ জানুয়ারী স্বামী বিবেকানন্দের ৫৯ তম জন্মদিবস বিরিয়ে তিন স্ত্রী কস্তুরবা, মহিলাল নেহরু ও মহম্মদ আলি সহ বেলুড়মঠে এসেছিলেন। তখনকার অধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দ তাদের গান্ধীজীর ঘরে নিয়ে গেলে গান্ধীজী নানা জিজ্ঞাসার সদুত্তর পেয়ে প্রশংসা জানালেন গান্ধীজীকে। গান্ধীজীর বক্তৃতির বাইরে পায়ের ধুলোর ঘাটে তখন গান্ধীজীকে দেখার ও তার জামা পোশাক উদ্দেশে বয় অনুমান করেছে/ গান্ধীজী স্বামীজীর অতিথি সেবকদের আকাঙ্ক্ষা থেকে সমস্যের জনতার উদ্দেশে বলেছেন:

'আজ আমি এখানে এসেছি স্বামী বিবেকানন্দকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাতে/ গভীর নিরক্ষরতার মধ্যে আমি বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী পড়েছি এবং মুগ্ধ হয়েছি/ ইঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা শতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে/ আমার দেশবাসীদের ও দেশের প্রতি ভালোবাসা ইঁর লেখা পড়ে শতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে/ আমার এই পুণ্য তিথি স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য যোগ্য বলে মনে করি/ কারণ তিনি আমাদের জাতির জন্য যা/ তা দুঃখের উদ্দেশে প্রাণ বিসর্জন করেছেন। আমার আশা আছে, আমার এই আর্তির সংযোগ ঘটাবে/ তাহলে যে ভালোবাসা আমি পেয়েছি দেশ থেকে সেই আমি শুধু নিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস পুরো করে হবে।'

গান্ধিজীর এই মন্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়ে যায় যে, তাঁর নেতৃত্বাধীন আইনে পরবর্তী সময় আন্দোলন বিবেকানন্দের প্রভাবে প্রভাবিত। তাঁর যোগ্য উত্তরসূরী জওহরলাল নেহরুও বিবেকানন্দের ঋণ স্বীকার করেছেন দেশগঠনের প্রসঙ্গক্রমে। জওহরলাল নেহরু জানিয়েছেন —

'অতীতের মধ্যে প্রোথিত তাঁর মূল/ ভারতের ঐতিহ্যের অর্থ তিনি পূর্ণ — তবুও তিনি সমকালের সমস্যাদের অপূর্বিক দৃষ্টি সম্পন্ন — বিবেকানন্দ অতীত ভারত ও বর্তমান ভারতের মধ্যে সেতুস্বরূপ/ — ভারতবাসীর, বিশেষতঃ হিন্দু মনের আজ যা প্রয়োজন তাই তিনি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন/ তাঁহার অপরা আত্মনির্ভরতার অনুপ্রেরণায় তিনি সৃষ্টি করেছেন এমন এক যুবক বাহিনী যারা ভারতীয়দের প্রাণশক্তির উৎস। তাঁর কাছে আমরা সত্যকারী ঋণী।'

গান্ধীজীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা আন্দোলনে বিবেকানন্দের প্রভাব অপরিসীম এবং তা' প্রধানতঃ দুটি ক্ষেত্রে —

(ক) জাতিচেতনার অনুপ্রেরণা যোগানে ও (খ) সংবিধান রচনায়। এই দুটি ক্ষেত্রে বিবেকানন্দের অনুপ্রেরণায় ভিত্তি উত্তরাধিকার গান্ধিজী নিয়ে ছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সামাজিক ভাব এই দুই সমস্যার সমাধানে নিয়োজিত ছিল। তাঁর বহিরঙ্গ আন্দোলন ও ভাবধারায় এই প্রমাণ। এই প্রসঙ্গে জাতীয় জাগরণের বিষয়ে গান্ধীজীর প্রধান বিবেকানন্দের চিন্তাধারা মেলেনে/ গান্ধীজীর আন্দোলনে বর্ণবিদ্বেষ পরিকল্পনা — রাজকৃষ্ণ বিবেকানন্দের সর্বধর্ম সমন্বয়ের সমন্বয়ের।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্বে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, লালা লাজপত রায়, চিত্তরঞ্জন দাশ, ডঃ ভগবানদাস, সরোজিনী নাইডু, সৈয়দ হাসান ইমাম প্রমুখ বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন এবং রাজকৃষ্ণ মিত্রদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন/ সলন্ত্র বিপ্লবীদের মধ্যে বি. মিত্র, নরীন্দ্র ধর, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, অরবিন্দ ঘোষ ও সলন্ত্র নিয়ে বিবেকানন্দের ধারা অনুপ্রাণিত হলো কথা

ঋষি অরবিন্দ ঘোষ

॥ ৪ ॥

মৃণালকান্তি রবীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পরে যারা কয়েকটি বেসরকারী মুখোমুখি হিসেবে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব। তাঁর মোহিতলাল মজুমদার বলেছেন যে, বেসরকারী হলেন স্বামীজীর ভাবশিষ্য। মৃণালকান্তি অভিযোগের সুরে জানিয়েছেন যে, বিবেকানন্দ কোন আশ্রমে তিনি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেননি। মুখোমুখি কেন না হলেও বিবেকানন্দের চিন্তা-ভাবনাকে মৃণালকান্তি তাঁর আচরণে নিজের জীবনে গ্রহণ করেছিলেন।

ভারতে পৌঁছে বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল 'গোপালের' বিবেকানন্দের মৃত্যু ও তাঁর 'নিজস্ব' রূপ নিয়ে তা অটুট ছিল আমৃত্যু পর্যন্ত। কলিকাতা থেকে কলকাতা, মেরিনোটাস কলেজ থেকে বেলুড়মঠ, বেলুড় থেকে আই. সি. এস. হয়ে কলকাতা, কলকাতা থেকে কলকাতার বেলেঘাটা, বেলেঘাটা থেকে অমৃতসর, অমৃতসর থেকে কলকাতা, কলকাতা থেকে আই. এস. এ পরীক্ষা দিতে বিলেত, বিলেত থেকে মহানির্বাণ-জীবনের প্রতিটি পর্বেই বিবেকানন্দের প্রভাব ছড়িয়ে ছিটিয়ে। এমন প্রবল ব্যক্তিত্বে, আকর্ষণে — যা বিবেকানন্দের সঙ্গে ঈশ্বরসৃষ্টির পর্যন্তই সম্ভব, এবং ঈশ্বর তাঁর নিজে একাধী সংসার থেকে সেপারেশন হয়ে থাকলেন, সেখান থেকে ইন্টারেস্ট ঘুরে ফুরো জায়গায় জমালেন — প্রায়শ আজকাল ফিল্ম পরিচালনা পাচ্ছেন। সাংস্কৃতিকতা ও সাহিত্যের ইতিহাস তাঁরা, এরীশিষ্যকে সম্মান জানিয়ে 'শিল্পী হলেন' এ আসুন — এমনই মৃণালকান্ত নামক একটি মানুষের সঙ্গে সঙ্গত হয়েছিল বিবেকানন্দের আজন্ম ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক।

মৃণালকান্ত যৌবনে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিতে চেয়েছিলেন, দিতে, সম্ভব হয় নি। বিভিন্ন কারণে "তিনি আশ্রমে থাকতে পারেন নি, তাই আজন্ম হিন্দু আইনী পড়েন করে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ভাবের মন্দিরের সাহায্যে রক্ষা করেছেন, শিক্ষাগুরুর পেশাকে ব্রতে—পরীক্ষার আগে আগামীর বন্ধু ঘুরে পড়িয়ে পরিণত করে রামকৃষ্ণ মিশনের শাখাকেন্দ্রে যোগেন। পরীক্ষা আগে ডুব দিলেন। সেই থাকে আজও সেবা-জীবনসেবায় বিবেকানন্দের ধ্যান। ফেরুন পৌঁছেও ওরেন করার আগের দিন — আইনীনের ঘর ও আলমারি সবই আলোয় ঘরের থেকে পড়ছে কুরুক্ষুর করে—কলকাতা যা সম্বন্ধে — সারাদিন ওদুই আকাশের — সেই সারাদিন নিরবচ্ছিন্ন মুহূর্তে মৃণালকান্ত বলি, ৩২ পরিবার পরিচিতির মেলা হয়ে পৌঁছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনে

— জীবন সেখানে সেবাধর্মে। তাদের-সেবায় চিত্তে মুক্তাফলকে দলিলে হাজারুক্ষ. জীবন, বিবেকানন্দের সাথে মুখোমুখি বসে কি খুঁজে ফিরছিলেন? তিনি পেয়েছিলেন অবশ্যের ঠিকানা, আর্তত্রাণ মানে বিনিদ্র পরিচর্যা মাত্র নয়, দুর্গীতিমুক্ত নৈতিক ধারণার বিকাশ। তাই তাঁর মার্কিন-পর্যটনের উদ্দেশ্য একধাপ অগ্রসর। মুক্তাকাঙ্ক্ষার অন্তিম পরিণতি সম্পর্কে অজানা, তবে তিনি অন্তত অন্তর্দৃষ্টির মনের নিকৃষ্ট থেকেছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

মুক্তাকাঙ্ক্ষের মৌলিক জীবনের একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরে আমরা তার জীবনে বিবেকানন্দের আদর্শের প্রভাবের সন্ধানে নিরীক্ষণ করবো। বিবেকানন্দ আমাদের ইতিহাস 'প্রবহমানতা'কে স্বীকৃতি দিতে ভালবেসে ফেলে না, তা ভেঙে করে আমার করে নিতে হবে এবং তার জন্য বহু পথে অভিনিবেশ। তাই, বিবেকানন্দ চিরন্তনতার মধ্যে বলেছেন — ('The Master as I saw him: Select Nivedita) বিবেকানন্দের মতোই মুক্তাকাঙ্ক্ষের কৃষ্ণ নিজস্ব ভাবীতি ছিল, প্রত্যেক বিনিময়ে 'অর্জিত' না হলে স্বাধীনতার অকৃত মূল্য প্রাপ্তি করতে পারতেন। তাই, সহযাত্রী সৈনিকদের ঐক্যেপে তিনি জানালেন—'তোমার আমাকে বন্ধু নাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।' এ প্রসঙ্গে তাঁর জীবনীকার বিবেকানন্দের আর থেকেই পাওয়া। শেষের পরাধীনতার বন্ধন পরীক্ষিত হয়ে উঠেছিল তক ও বিশ্বের আরে একইরকম আবে। তাঁই তার উপায় বড় তোমার। ১১৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩ সেপ্টেম্বরী আমেরিকা ছিল পরিচালক সর্বোচ্চ পরিচালক মুক্তাকাঙ্ক্ষ তখন তাঁর সৈন্যদের প্রত্যক্ষ দৃষ্টি সংগ্রামে আনুষ্ঠানিকভাবে নিজের বিদেশ তখন তাঁর মনে ঐক্যাত্মিক হলো— 'ইতের ডাক এসেছে/ওঠো-জাগো/ আর এক মুহূর্ত দেরী নয়/ অস্ত্র হাতে তুলে নাও/ তোমাদের সম্মুখে যে পথ, সে পথ আমাদের পূর্বপুরুষ মহাপুরুষদের পদচিহ্ন এঁকে দিয়েছেন। এই পথ দিয়ে অতীত অনুসরণ করো।/ পথ- ভিন্নতার লক্ষ্যবিন্দু দূরে ছেড়ে এসে আমরা ভালোবেসে পথ করে ফেলেছি। আর একটি কিন্তু ভয় আমাদের লড়াইয়ে ভুলতে পারবে। এবং প্রতিটি নিজের কৃষ্ণ করে হবে এই কথাটি যে আমাদের 'সংগঠনের ভিত্তি' কৌশল, তাতে 'ভিত্তির পথ

প্রতিকৃতি চরকা

ফাসিবাদের পথ হলো নিচে।' (The Spring Tiger : Hugh Toye)

মুক্তাকাঙ্ক্ষের এই কথাগুলির মধ্যে বিবেকানন্দের কথার প্রতিধ্বনিই শুনতে পাই। চলমান বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (৭ম খণ্ড) থেকে দুটি উক্তি আমরা তুলে ধরছি —

(১) 'পেছনে তোমো না/অতি নিম্ন স্বাধীন স্বচ্ছন্দ জীবন, পেছনে তোমো না, সামনে এগিয়ে যাও।'

(২) 'তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ মরণ, তুচ্ছ সুখ, তুচ্ছ দুঃখ/ ..... অনন্তের ছেলে পশুপাখি হইয়া না/যে পক্ষিল পেষিতে চাহিয়া না, এগিয়ে যাও সম্মুখে/একদল আসিয়া অনুসরণ করিবে। একজন পড়িবে, আর একজন তাহা মুহূর্ত ধরিবে।'

বিপ্লবী মহাত্মাগান্ধি তোমোর কথা উল্লেখ করে আমরা ইতিহাসের। বুদ্ধদেব আগে তোমোর যোগ উদ্বোধনে পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে নিম্নরূপ চিত্রে জানিয়েছিলেন — ('বাংলার বেদ'/চিত্র-আনন্দ, ১৯৮৮)

'রামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দ- এই ত্রয়ী এক মহাবিশ্বাসের ভাইরাস/সারা পৃথিবীর চিন্তা ও চেতনার ক্ষেত্রে এক বিরাট 'রেভলিউশন' এনে দিয়েছেন এবং এখনো নিঃশেষ হয়ে যায়নি, এখনো সেই প্রক্রিয়া চলছে। ফলে আমি প্রতিদিন করতে চাই, তা থেকে নেই/সমাজের অন্যান্য আর আজ ঠিক ঠিকমতো মানুষের অন্তরে ঐক্যকে উদ্বোধিত করে, মানুষের চিন্তার ক্রমবিকাশে ঘটিয়ে মানুষকে মনুষ্যত্ব শেখিয়ে তোলাই হল বিপ্লবের প্রকৃতি। আমাদীকালের মানুষ দেখতে পাবে যে এই নিজস্ব বিপ্লবের ভাবসত্তা কালকে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে। এই বিপ্লবের কর্মধারাই হল রামকৃষ্ণ বিবেকের ভাবসত্তা আর রামকৃষ্ণ সারদা বিবেকানন্দ এবং আরো অনেককে নিয়েই তো রামকৃষ্ণ মিশন — যার প্রভাব ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক সংস্কৃতিক জীবনধারণের সর্বত্র সঞ্চারিত।

ভারতের প্রথম শ্রমিক সংগঠন বরানগরে

হরিপদ ভৌমিক

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ জুন বৃহস্পতিবার ভারতের ইতিহাসের দুর্বার গতিময় অধ্যায়ে প্রবেশ করেছিল। প্রায় দুশ বছর পর ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ আগষ্ট ভোরে ভারতবর্ষের মুক্ত আকাশ উদিত হয়। পরাধীন ঐ অধ্যায়ে শ্রমিক শ্রেণীর জন্য কঠিন চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছিল কলকাতায়। চুক্তির অন্যতম কি শর্তাবলী ছিল পরবর্তীকালে ইতিহাস-পাঠকদের কাছে অজানা ছিল—তা আজ আর কারো মনে নেই। স্বাধীন ভারতবর্ষে, সেই ঐতিহাসিক ঘোষণাপত্র জন্য প্রস্তাব মনে পড়ছে কারো— পরবর্তীকালে ঘোষণাপত্রটিকে পাওয়া যায়নি।

১৮৪৭ সালের কলকাতা। — রাজধানী কলকাতা। কলকাতা তখন পরিচিত ছিল, ১৬ জনীয় এক ছোট্ট রাজ্য পরিচালনা করতে যেসব রাজা করেছিল। ব্রিটিশ-ভারতের তখন বেশ্যাই হয়ে উঠেছিল। কিন্তু যে কারণে এই শহরটি শ্রমিকদের সংগঠনের জন্মভূমি হয়েছিল জানা যায় না। তবে এই ঘটনাটি সেকালের ঐতিহ্য পরম্পরাকে বহন করে এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় অধ্যায়ের সূচনা করেছিল, সে কারণে একথা বলা যায় — ঐ ঘটনাটি ইতিহাসের কাছে কোন প্রশ্নের সম্মুখীন হয় নি।

কলকাতার শ্রমিক শ্রেণীদের সংগঠিত করা, শিক্ষা দেওয়া প্রভৃতি বিষয় নিয়ে যিনি ভাবনা করেছিলেন, তিনি হলেন কলকাতার পাশ্ববর্তী বরানগর গ্রামের পণ্ডিত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ৯ সেপ্টেম্বর তারিখে পণ্ডিত শশিপদ ভট্টাচার্য কলকাতায় আসেন। বিদ্যোৎসাহিনী সিক্কিনপুরের ব্রজবোষ্টমী গ্রামের সাধারণের বন্দ্যোপাধ্যায়-পরিবারটি শ্রেষ্ঠীর বৃত্তিনিয়ন্ত্রণ পণ্ডিত। তাঁরা পরিবারটি শ্রেষ্ঠীর ব্যবসায়ীর ভোজনালয়, হাটিল সুতার উৎপাদন, কর্মচারীর কারবার, জমিদারীর হয়ে গেল কারণ পরিবর্তিত হবার পর ৩৮৩টি পরিবার হয়েছে দেখা যেতে। যাঁর কারণে কারণে পণ্ডিত নিযুক্তভাবে এল, পুরো পরিবারটি-ই তখন প্রশ্নিক অনুভূতিতে মন্ত্র পড়ে। বরানগরেই এক পরিবারের বিলাসিতা চরম হয়েছে, বরানগরের এক উচ্চ ইংরেজী স্কুলে পড়ার সময় আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য তাঁদেরকে পরীক্ষা দিতে-পরে তখন আসেনি, আর নিজ আত্মীয়তে বিদ্যালয়ে তাঁর অনুরূপ।

পণ্ডিত শশিপদ ভট্টাচার্যের জন্মের মানুষ পুরিবীতে আবির্ভূত হন মানুষের মঙ্গলের জন্য। প্রাথমিকভাবে তিনি হিসাবে নিয়েছিলেন তাদের বেশ্যাবৃত্তি থেকে ভদ্রলোকের পরিবার সন্তান তাঁদের 'বেশ্যাপুত্র' উপাধি দিয়ে প্রথা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বিদেশ পরাধীন দেশে মানুষ পড়িয়ে শিক্ষিত নিয়ে তোলার পণ্ডিত শশিপদ নামের মিলটি তাঁকিয়ে তাকে পাকাপাকি নিজেদের সন্তানদের মতো 'অর্থনৈতিক পণ্ডিতশাস্ত্রে' তাদের জন্মদিয়ে করার ইচ্ছে করে — তিনি শান্ত, উপহার, বিনিময়ে হইয়া কর্মচারী ভারতবর্ষের চাকরে সকলের জন্মদিনের বিভিন্ন কার্যালয়ের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে-পারেন, তিনি জীবনযুক্ত নয়। পণ্ডিত শশিপদ ভট্টাচার্য পুরোহিত গুণ সমুদয় বিদ্যমান। তিনি সংসারী হইয়া সন্ন্যাসী, কর্মচারীকারী না হইয়া কর্মী। অন্ন তাঁহার মূলধন, বিদ্যোৎসাহিনী তেজস্ক তাঁহার অস্ত্র, ভগবান তাঁহার মূলধন, বিদ্যোৎসাহিনী তেজস্ক তাঁহার অস্ত্র, ভগবান তাঁহার মঙ্গলময় ঈশ্বর, কর্ম তাঁহার ইষ্টমন্ত্র, মানুষ তাঁহার কার্যক্ষেত্র চীর্থ; এই মহাতীর্থে কর্মযোগী সাধন করিয়া তিনি সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। শিক্ষাপুরুষের যে সকল লক্ষণ, সে সকল তাঁহাতে পরিস্ফুট। তিনি যেমন অন্নদাতা, তেমনি শিক্ষক ও পালক।" প্রবাসীর মন্তব্য ছিল।।

ভারতবর্ষের ব্রিটিশ-ইতিহাসে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ২ ফেব্রুয়ারী তারিখটি স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এই দিন পণ্ডিত শশিপদ ভট্টাচার্য কলকাতায় একটি সভার প্রতিষ্ঠানিকের আয়োজন

জানান। ছাত্রী সম্মেলনে হলে একটি আলোচনা সূচীর মধ্যে প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে উপস্থিত জন্য, এলাকার শিক্ষানুরাগের একটিমাত্র, শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সামাজিক চরিত্র অভ্যাসগুলিকে বুঝিয়ে দেয়। এই সম্মেলন কালে, ছাত্রবৃত্তীরা অনুষ্ঠানের শিক্ষার ওপরে উপলব্ধি করে নিজেরা শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করে। তাদের এই আগ্রহ দেখে এই নিয়ে অনুসন্ধানে ছাত্রবৃত্তীদের জন্য একটি নৈশবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। খুব কম সময়ের মধ্যে এই স্কুল অসংখ্য জনপ্রিয়তা অর্জন করলে, তাদের সাথে সাথে ছেলে কানাকাড়া, আড়িয়াদহ, কুটিঘাটার ছাত্রবৃত্তি আরম্ভ হয়। পাশাপাশি নৈশ ছাত্রবৃত্তীরা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। খুব ছাত্রবৃত্তীরা অনুষ্ঠানের শিক্ষিত হলে কলকাতাকেন্দ্রের উৎপাদনে অনুপ্রেরণার সৃষ্টি হয়েছে—একথা ছেলেদের মনের প্রতিষ্ঠানের কিন্তু অজানা নেই। কেন, কারণটি কি। কারণ একটি আছে, প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দেবার সময় যে 'উপাদান বস্তু' ও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে তা পড়ে প্রতিষ্ঠানের প্রবন্ধে ছাত্রা জানাতে নিম্নবর্ণিত। ছাত্রবৃত্তীরা পরিচয় ছেলে ছেলেদের উপাদান বস্তু ও পরামর্শ এখানে তুলে দিচ্ছি, তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে —

। উপাদান বস্তু ।

- জলদে ছেলের পরীক্ষা পরিচয়ে নয় নিজে ছাত্রবৃত্তে খুশী মনে পড়ে যায়।
- ছাত্রের পরীক্ষা কম সফল সকল। কারণ ছাত্রটি ছেলে ছেলে উপস্থিত।
- সময় লাগবে যায়, কথা কম তায়। ছাত্রের সম্মান কাছে কম, কম ছাত্রের।
- ছাত্রবৃত্তে একটি খুব্ধ ছাত্রে দেও হয়। বর্তমান দিয়ে দিন যায়, নয়টি খুশিপাত।
- যে কাজে চলে না কারো কম সকলে। কথা তাতে নাড়ি ছাড়ে ছাত্রীর ভালো।
- যার কাছে প্রতীয়মান, খুব ছেলে করে। দুর্বল আলস, ছেলে ছেলে আনুষ্ঠানে।
- নাহিক নৈপুণ্যক কম, কিন্তু কাটি যায়, কারণ না পৌঁছায় কাজে ছাত্র-শীলতায়।
- কলম ছাত্রের ছেলে কলম পান। তাতে ছেলে পরীক্ষার ছাত্রের কারণ।
- এক ৩৭ পথে কাছে পড় ৫৭ পাই। তাতে কাজে পরীক্ষায় হয়ে লাভি পাই।

। কয়েকটি পরামর্শ ।

১। পড়া শুরুর কাছে ঠিকির ছাত্র কলমের জন্য লাগিয়ে দিও।

ছাত্র খুশি নিজে কাটিয়ে পাবে, তাহার জন্য ছাত্রদের হাতে ধরিও না।

টাকা পাওয়ার আগে টাকা খরচ করিও না। এখন সময় পাইয়ের যাঁরা ছাত্র তোমার আপনার নয় তারা বিশ্বিত।

খুশি, টুকরা অথবা যাঁর নিজেদের জন্য কত খরচ না হয়, অহঙ্কারের জন্য প্রয়োজনে অধিক কাজ হয়।

২। যারা ইচ্ছার সহিত কাজ তারা কখনও নিরুৎসাহিত হয় না।

যখন যায় হয়, তখন কথা বলিবার আগে কথা পর্যন্ত ভাবনা কর।

৩। যেমনের যারা খুশী তারাই করিও, যারা তোমার জন্য উচিত তারাই কর।

যেমন ছেলেটিকে ছেলের সকলে ভয় করিয়া চলা উচিত তারা কি তুমি করিতে চাও? এমনটি আশি তোমার সম্মুখে কর, যে ছেলের মুখি দেখিতে পাইবে।

১০। যে তাহার কর্তৃত্বকে পরিচয় পরিচয় শিখাইয়াছে, চলে তাহার কর্তৃত্বের জন্য কাজ নিজে ছাত্র করিয়াছে।

পরিচালক কলেজকাজের প্রতিষ্ঠানের এইভাবে ব্যবহার করে করিয়ে দিয়েছিলেন, ছেলের বিষয় নেই, ছাত্র অবশ্যই অর্থ হাত ভাবে বলা ছেলে, পালন নিয়ে বসে পাবলে নিজের এবং ছেলের ছাত্রো ছেলে উপলব্ধিই হয়ে না। ছাত্র ভাবলে অবাক হবে। হয় কর্তৃত্বে আগে কথা সহজ করে পরিচয় বাবু আগে খোয়াছিলেন—'ছাত্র নয়ে কাজকে আমি চমৎকার /ছাত্র চায়ে ছাত্র পাবে নিকট তাহার / ছাত্রে প্রতিক-ভাবে ভালো সাধারণ হচ্ছে। অবশ্য ছাত্র নিজে কাজ নিয়ে।

পরিচয় কলেজকাজের প্রতিষ্ঠানে ছাত্রবৃত্তী ছেলে বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে ছাত্রিকগণ কি শিক্ষা পেয়েছিলেন। যা পেয়েছিলেন এ খুশে তা ছাত্র। প্রতিষ্ঠান ছেলে কাজে কর্মীর পাঠান, প্রবৃত্তীরা ও বিদ্যার্থী হয়ে উঠিয়ে পেয়েছিল। তাদের বিদ্যালয় ১৯৮৫ কলকাতার ছেলে কাজে কলেজ ছাত্রের সৃষ্টি হয়নি, ছাত্র উৎপাদিত হয়েছিল, কলেজ কর্তৃপক্ষেরাই এই ছেলে বিদ্যালয়কে গড়তে ও উন্নতির জন্য টাকা ছাত্র করেছে।

এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠান কথা প্রথমে পরিচয় কলেজকাজের খুব থেকেই শোনা যায়, এই কথাটি খুলেই কলেজকাজের ছাত্রদের উঠিয়ে জানিয়েছিলেন —"এডিনবরার বিখ্যাত ব্যবসায়ী ডেভিড ম্যাকলাকলাজের নাম অনেকেই জানেন। ম্যাকলাকলাজের ছেলে ছেলে ছেলেদের একজন ছাত্রবৃত্তী। ছাত্রটি তাঁর পরে তাঁদের পরিবারে ছাত্রদের জন্য একটি বিদ্যালয় খুলতে অনুরোধ করে। ছাত্রের নিজের আগ্রহে ছাত্রবৃত্তি ছাত্রে কাজে পরিণত হয়ে ওঠেছে। আমার এই প্রস্তাবের সফলতা ঐ অনুরোধপত্রের কৃপাপ্রার্থী সাহিত্য হয়েছে। বিদ্যালয়ের বাড়ি তৈরী ৩৯ হয়েছে—আমি ঐ ছেলেদের ছেলে-পরীক্ষা ছেলের সময়ের যে নক্সা নিয়েছিলাম, সেই নক্সা অনুসারেই বাড়ি তৈরী হচ্ছে। দুই মাসের মধ্যে বাড়ি তৈরী শেষ হবে। ছাত্রবৃত্তীদের জন্য একটি বড় বিদ্যালয় খুব তৈরী শেষ হবে। ছাত্রবৃত্তীদের জন্য একটি বড় বিদ্যালয় খুব তৈরী হলে আমি অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হবো। ছাত্রবৃত্তীদের জন্য আমি যে সাত বিদ্যালয় করেছি, আপনি তা দেখে ছেলেন, এই বিদ্যালয়টিও ঐ নক্সাকে অনেই খুলনাকৃতির হবে। এই দুটি বিদ্যালয়ই ছাত্রবৃত্তী বিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠান শিক্ষালয় পরিচালনার জন্য আমার হাতে আসবে।"

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ জুন ডেভিড ছেলেদের ম্যাকলাকলাজের ছাত্রের ছেলে পড়েন এই ছাত্রবৃত্তী বিদ্যালয়টি ৬৯ ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে। পরিচয় কলেজকাজের কলকাতে মনের ইংরেজীতে বক্তৃতা ছাত্রছেন না, তিনি বাংলায় একটি সুন্দর বক্তৃতা রাখেন। পরিচয়বাবু তখন ছাত্রদের উৎসাহের জন্য 'সাহায্যিক' উৎসবে বিদ্যার্থী করা ঘোষণা করেছিলেন। সেই সময়ও এই ঘোষণা থেকেই পরিচয়ের হয়ে ৩৮৯ ছেলে করা হলো। কিন্তু এই স্কুল ছেলে নিয়ে টিকলে না, স্কুল বসিয়ে উৎসাহের ১৫ দিন পর ৫৭ স্কুল ছাত্রদের টিকলি ছেলে ছাত্রদের পুরস্কার ছেলেতে এই ছেলে ছেলেদের উপর পড়লো, স্কুল বসিয়ে পুড়ে যায়। ডেভিড ম্যাকলাকলাজ নৈশ বিদ্যালয়টি আবার তাড়া বাড়িতে ৩৯ করতে হলো। এই ছাত্রার টাকাটা পরিচয় বাবুকেই দিতে হয়েছে। পরিচয় বাবু ছেলেদের ছেলে-পরীক্ষার ছাত্রে আবার নূতন বাড়ি তৈরী আরম্ভে লাগী করেন। নূতন নিয়মে ছেলে বিদ্যালয়টি ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ জুলাই থেকে চালু হয়। নূতন ছাত্রে উৎসাহের সময় উপস্থিত ছিলেন হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার সাহায্যিক ৮ আগষ্ট ১৮৭০ তারিখের পত্রিকার লেখা হলো—"আমাদের পাঠকদের স্মরণ থাকতে পারে যে, পাকরাশী কলকাতা পত্রের

সম্পর্কিত এ সময়ে ইতিহাসের আলো হাতের তারতম্যে মেয়ের শিল্পী ও প্রত্নবীদদের জন্য প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টি—একমাত্র বিদ্যালয় ভারতবর্ষে এই সময়। বিদ্যালয়ে মেয়েদের জোগাড়ের ভার যে ব্যক্তিদের হাতে ছিল তাঁরা প্রথমটি করে বলে—এই সব প্রত্নবীদদের নিয়েই এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে। কারণ শহরের মধ্যে এক সঙ্গে এত মেয়েকে যে জোগাড় করা যায়, তার প্রমাণ একটা আমরা পাচ্ছি না কোথায় হতে পারে? কিন্তু সমালোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমাদের আলোচনার বিষয় প্রত্নবীদ মনুষ্য হয়েছে, জলীপুর, চিংপুর, বিলাড়, বালি, পোর্টব্লিয়ার এবং আন্দামানের আদিম অধিবাসীদের ও অন্যান্য প্রত্নবীদ মনুষ্য আছে, কিন্তু এই সব জায়গার কারণে মেয়েদের প্রত্নবীদদের ছবির জন্য আন্দামানের মানুষের ছোট্ট ঘর পাওয়া যায়নি। অবশেষে ছবি নিয়ে মেয়ের শিল্পের জায়গা, ইউরোপীয়দের। কারণটা এখানে উল্লেখ করেই আমি, যার সাহায্যে মিউজিয়ামের অবলম্বনে ছিল, এখন ইংরেজদের ব্যবহার আছে কিন্তু এর আগে কখনো প্রত্নবীদদের জন্য নিয়োগ হয়নি। এই সংখ্যক একজন অতি সাধারণ অবস্থাপন্ন ভদ্রলোককে নিয়েই বক্তব্য হয়েছে এইজন্য ছোট্ট মেয়ে হয়। উপন্যাসের কৃপাল এবং মেয়ের মেসপত্নির আধীনস্থদের সহায়তায় এই ভদ্রলোকটি এই কাজের নিমন্ত্রণকারী ইতালি সরকার দ্বারা দ্বারা হয়েছেন। শ্রীযুক্তবাবু শশিশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত ইতালিপ্রবাস গ্রন্থে ..... হিসেবে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রত্নবীদদের একের মধ্যে আন্দামানের ইংরেজদিগে বুঝিয়ে নিজের হাতের মধ্যে কাজ করেছেন বলে এবং সন্তান মেয়ে হাতের মেয়েদের দেখতে পাচ্ছেন। শশিশেখরবাবু ও তাঁর ভাই মেয়েদের এই বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষক। এক বছরের মধ্যে সংখ্যা ৫৫ জন হয়েছিল। প্রথমে এদের ছাত্রীদের ফুলের মধ্যে রাখে। মেসপত্নির কর্মকর্তারা এই পুরো ছাত্রীদের কাজ মনোযোগের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করছিলেন—এই মেসপত্নিই তাঁর বিদ্যালয়ের জন্য বাড়ি খুঁজে বিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য জন্যে সেই বাড়ি পুড়ে গেল। আমরা এই সময়ে মেসপত্নি আরো একটা ভাল বাড়ি তৈরী করে নিলেন, এখানকার ছাত্রীরা আরো ভাল ও সুন্দর হয়েছে। এই বাড়িটিতে ফুল ছাড়া প্রত্নবীদ ও অন্যান্য অনুকরণে ইতালির জন্য অন্যান্য কাজও হতে থাকে। পরে ধাপের ও ফুলিদের মধ্যেকার মধ্যেকার বিদ্যালয় মেয়ের এই বিদ্যালয়ের ইতিহাসে আসে। অনুষ্ঠানটি সমালের পরিচালন উপভোগ করেছিলেন, বিদেশ প্রত্নবীদী ও মেয়েদের জন্যেদের জন্য সমস্যার হয়েছে, এই দৃশ্য যেমন নূতন মেয়েদি ভিন্নাকর্ষক, এর প্রশিক্ষার আগে হয়েছিল। যখন ফুল খোলা হয়, তার সংখ্যা ৫৩ থেকে প্রায় ১৮০ হয়েছে। এই ধারণা মেয়ের মুহূর্তপূর্ণ, মেয়েদি নিজেদের কর্তৃপক্ষদের প্রত্নবীদ খুব ভাল জানাতেন। মেয়ে হয়েছে। তার বাবার মেসপত্নি ভিন্ন ধরনটি ডাক্তারিস্ট্রি বিদ্যের প্রত্নবি সাহের এরূ ফুলটি দেখতে এসেছিলেন। তিনি দেখে অত্যন্ত প্রশংসিত হয়েছিলেন। এই ফুলে ভিন্নিল পরিণত বয়স, এরা তাদের সঙ্গে ছোট ছোট মেয়েরা নূতনে পরিচিত অনুকরণে নিলেশিত হয়েছে, এরূপ ঘটি নূতন ফুল।

এ পর্যন্ত (প্রত্নবীদদের নিকলন) এই ঘটি মেয়ে সমালোচনা পাঠ করেছে। মেয়ের ইতিহাসে নিয়ে আমাদের আলোচনার মত দুটি পড়তে এখন অনুষ্ঠানের মেয়ে মেয়েদি প্রতি আছে জন্যে। ফলাফল মেসপত্নিইতালিদের আমরা এই আমাটি প্রতি মনোযোগের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করবার অনুরোধ করি" (অনুবাদ)।

॥ প্রত্নবীদী পরিচয় ॥

কলকাতার ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে নিযুক্ত করিতেই শশিশেখর চট্টোপাধ্যায় প্রত্নবীদী পরিচয় ও প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়ে অধিকেন্দ্র দুর্ভিতে বিশিষ্ট বিধিত্র সংখ্যক করিতেন অনুষ্ঠিত হয়ে। এই সময়ে জলাই পাস মেসপ মেসপ হয়ে—আমরা হয়ে, পরের অধিকেন্দ্রে এর ভেদে নিয়ি করা হয়ে—যে মিস পরিচিতি প্রবিবেদন হয়ে মেসিন প্রত্নবীদী পরিবারে নির্বাস আসন প্রবাহিত হয়ে। এই সময়ে ছাত্রা সম্পর্কের জন্যের ব্যাকরণের বাসুলী, কৃষ্ণকুমার মিত্র, জলীপুরের সুকুমার রায় শিক্ষার অনুকরণ নিয়মিত সহায়ক হয়েছেন। এদের সাহায্য এবং প্রত্নবীদী সাধারণ সম্পত্তির . কাদিনীকুমার, ডাক্তার, বিদ্যাবারী ও বিদ্যাবারী হয়ে ঔপনিবেশিক ধরে পাঠ করা হয়।

পরিচয় আন্দামানের দুজন ছিলেন, তবু মাত্র প্রতিবন্ধের শিক্ষা নিয়ে হয়েছে, এদের পরিচয়ের ও মেয়েকে হয়ে। এদের পরিচয়ে ও মহিলা প্রতিনিধির নিয়ে পরিচয় নিয়ের পরিচয়ে আলাদা মহিলা সভার অধিবেশন হয় করেছিলেন, মেয়েদের সভায় আসার আগে বাড়ানো এমন নিয়মগুলি তৈরী হয়ে—"এই সভার সভ্যের সাধারণ পরিচয়ের সম্প্রদায়ে সাধারণির ঔপনিবেশিকদের ও অন্যান্য নিয়ে প্রবেশি হইবে। অন্যান্য সকলের নি সঙ্গে আমাদের আমরা ছিল আসল ইংলিশদের এই ঔপনিবেশ আন্দামানে বিশেষ আন্তরিকতায় সহিত যোগদান করিব।"

এসবগুলি মেয়েদের মেসপত্নি হয়েছিল এক পরিচয়ে মুক্ত করে। মেয়েদের সভাটা না হয়ে সভার কথা আমরা এখন মেসপত্নি একটি গল্প বলা হয়েছিল —

॥ একটি পরিচয় মুক্ত করে ॥

একজন কৃষাণ মেসা পরিচয় আনন্দে উৎসব নষ্ট করিত। সে মিস আমার বিষয় হইল, মেসিন আমার স্ত্রী তার নব অনুরূপ বিষয়ের পর তাহাকে ঠিকমত আইন যে মেসপ আমাদের জন্য সে আমার আমাকে ১টি পরিচয় করিয়া দিবে। আমিও আমার গল্পের মুক্তির সাধার হইল,—কি আমি, বিবাহের আমার দিন, না হইলে স্ত্রী তার বিরক্ত হয়। ঠিকমত হইল আমি, কিন্তু আমি আমার মিস্ত্রি আমাদের হইলাম। আমার মেসপত্নি হইলে সে নিজে মেসপত্নির হইলেন। আমার পত্নী বিবাহমেলিনী হইলে আমুলির হইয়া সম্পর্ক নাই। সে আমা হউক, বিবাহের আমার মিস্ত্রি প্রতিষ্ঠানের হওয়ার সে প্রতিজ্ঞা পালনে আমার হইল।

ঠিকমতই আমিন পরিচয়ের আমিনে পরিচয় — না করিলে মিস হবে না, কিন্তু স্বামী অর্থনৈতের পরিচয়ান করার পর মুহূর্তেকের জন্য মেসপত্নি আমার আসিল না। আমাদের: কাজে ঔপনিবেশিক মন আমার আমাদের মেসপত্নি সহযোগিতা করিতে এবং আমাদের সময়ে মিস আমার স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে না। আমার নিজে আমার স্ত্রী আমার সময়ে মিনিটে পরিচয়ার পরিচয়ার আসিয়া হবিব, আইটি সকলে আমাদেরমেসপত্নি আসিয়া তুলিল এবং নানা প্রকারে পুরের সুখসমাধানের আমাদিগে নিয়ে গেলেন। আমি পরিবে পথে দাঁড়াইয়ে কথা হেটে না আমার সম্পর্কিতে আমার আমার উপস্থিত হইল না।

মেসপত্নি জন্য নিয়মিত আমি স্ত্রী আমার এক পরামর্শ পাইয়ে পরিল এবং আমার পরি আমার মেসি পরি আমি উপস্থিতে নিয়ে গেলিল। কিন্তু মেসপত্নি আমার নিজের মুক্তিমেলে আমিনে

দুই একদিন অতিক্রান্ত হইলে পুলিস, বাক্সটা বাড়ীতে লইয়া যাইতে পারিত। এবং তখনকার কালের দুই এক দিনের সম্পূর্ণরূপেই বাড়ীতে অবস্থিতি সম্ভব হইত। কিন্তু এখন সময় অতি বিষম ছিল। অতীব অনিচ্ছাসত্ত্বেও অধিক রাত্রি সেখানে অবস্থানেই বাধ্যিত হইবে।

এইরূপে শীঘ্র সমস্যার মীমাংসা হেল, বর্ষ বৎসরাধিকের ভ্রাতাকালে ঈশ্বর বসু পরিবার ও অতিরিক্ত পরিচারক হইয়া স্ত্রী বাড়ীতে রহিয়া গেল। এমন সময় পতি আসিয়া হইতে পুত্রে বিদায় লইলেন। সেই সময়কালে ক্ষুদ্র হইতে পড়িতেছে অভিমানাত্মক ভাবার অনে ভাবনাক আসিল, ঈশ্বর পর ঈশ্বরে স্ত্রী যেখানে রহিয়া ছিলেন, সেখানে তখন গেল, এবং ঈশ্বর সুন্দর নিজে খুব চিকিৎসক বলিয়া তখন অনুমানে ভাবার প্রবল ধারণা গেল। ভাবার স্ত্রী আছে আছে আসন গ্রাস করিয়া পতির নিকটে বসিয়া বলিলেন তেব আজ অনেকের বিলম্বের জন্য প্রশংসিত. তবেই আমি বাড়ী এত সকালেই, আমাদের বাড়ীতে আজ খুব একটা মুসলমান প্রাদের ছয় ইহা কি তুমি ইচ্ছা করনা?" পতি খেলের সহিত বলিল "বিদায় করার পর আমি এখনিও তোমাকে সুখী করি নাই, ইহা আর কহিয়া আমার বড় অনুশোচনা হইতেছে। আজ যদি এখেলিকের দিন, এটুকুও পালের হয়, তুমি একটু সুখী হও ইহা আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছা, কিন্তু কি করি, আমার হাতে ত একটী পয়সাও নাই, বাড়ীতে তোক দিব কিরূপে?" এই কথা বলিয়া পতি ঈশ্বরের মেরে এক দৃষ্টে সহীর সরলতাপূর্ণ সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

পত্নী ভাবুকের কহিত উত্তর করিলেন "আচ্ছা তুমি বসু বান্ধবদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আইস। তোমের কথা আমি দিব।"

"তুমি দিবে? কোথায় পাইবে? তুমি একটী আনাটীও পাইবার নহি।" স্বামী মুসলমান এই সকল তত্ত্ব করিয়া বেলিল।" কেন? আমার বেলায় এক পয়সা ও অধিকারে, আমি আনাই দিব।" স্বামী বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল না।

স্ত্রী আর কোন কথা না কহিয়া, আস্তে আস্তে একটী কহিয়া খুলিয়া, কোনো কোনটি, মুসলমান স্বামী একটী একটী করিয়া এক খণ্ড নোট পরম স্বামী সম্মুখে রাখিয়া আনুমানের সহিত বলিল "এই টাকা দিয়া তোমরা বন্ধু নিমন্ত্রিত হইবে। তুমি যাও বন্ধু বান্ধবদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আইস।"

স্বামীর মুখে আর কথা সরিল না— সে শক্তিত হেলমুখে, বিস্ময়পূর্ণ ও মুগ্ধ হইল চাহিয়া। এত টাকার সম্পর্কে এ কহিয়া বলিল, "আমার নিজের টাকা নাই কহিবার অধিকারই আমার হারাইয়াছি। তোমার এ পর্যন্ত টাকা আসিল কোথা?"

আমাদের সহিত বর্ষ বান্ধবের কহিয়ে হইল। এবং ইহার পর স্ত্রীর মুখে সম্পর্কের বৃত্তান্ত কহিয়া স্বামী তোমের এ বলিয়া আমি ঈশ্বরের এখনও সন্তান হেলে হইয়া উঠিলেন, এবং গাড়ী তোড়া বিদায় মুখে আমাদের পরিচয় লইতেছেন।

তাহাই তেল একটি পরিবারে কত মূল্য।

মুসলমানদের মধ্যে তাহাদের তেলে এমন অনেক মুসলমানই কথাপ্রসঙ্গে তত্ত্বটি মুনির তেলে বর্ণিত হইয়া তাহাদিগের পরিবারে ও সমাজে আমাদের অনেক মুসলমান হইয়া দিতেছে। তাহারা আমাদের মুখে তাহাদিগের ঘরে প্রবল উঠিত পড়ে, তখন তাহারা অধিক মূল্যের জন্য তোমাকে তার করিয়া পরিবারের সুখ শান্তি বর্ধিমান করে, পিতা মহাসন্দিগকে কৃতার্থ করিবার জন্য, পুত্র কন্যাকুল বর্ধিত হবে, এবং বিবাহের আমোদগুলি পরিমা হবে, সে সর্ব তাহার অতি একদিন বাদ না করিয়া জানাইতে থাকে তবে এক একটী পয়সা তাহার জানাইবার ৪ বৎসরে ৫০ টাকা হয়। এই ত্রিশ টাকার তাহারা সমাজীতেরও জন্য খুব সম্ভ্রান্ত হিসাবে তেলিতে পারে। তাই তেল একটী পয়সার মূল্য ১৫ এক পয়সা নহে। ইহার মূল্য বাস্তবিকতেরে খুব অধিক। সত্যতেল, এক পয়সার অতি অসম্ভবদার করিয়া আমাদিগের খুব অধিক অবহেলের হারাইয়া তেলিও না।"

এটা ১৫ বছর কথা যে কথার কথার নয়, তখন পয়সার অবস্থার আজকের মতের পয়সার পয়সার ভাব ছিল না। লোকাতে কলমাত্রা তোমাইও সমাজে এই ছিল আমাদের মিনতি তেমিতে অধিক ছিল। তাহার তেলের অনেক ও মহাসুমার অধিক ছাপিক হবে। সমস্ত মহাসুমা না হবার সত্ত্বেও ১৫মাস অতির অনেকের বাড়ে স্থাপন অধিক উঠিত — এখনও ইহাদের সমাজমাত্রে পুরিমাত্র ১৮৭১ ইংরিজির ৪ আইনের বলবানে "অনেক বার্ষ" প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

এই আজ প্রতিষ্ঠা তখনে একটী সমাজ, সমাপতি ব্রাহ্মণের তেলির ওয়ালটি সাহেব তে সমস্যা তেলেছিলেন, ১৮৭১ ইংরিজির ৭ আই অতিরিক্ত ইন্ডিয়ান তেলিমিনীয়' পরিবারে তা ব্রাহ্ম হয়েছিল। ঐ বছরের ৪ ওয়ালটি সাহেব তেলিছিলেন "এই মুসলমান তেলেমাদের) সাধারণের ইংরিজি বিবাহবিধি সমাজ ইংরিজিতে পরিণয় হয় না তেখেছেন, আমি জানতেছেই তা জানি। এই সমস্যা তখন তখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন কি তার উদ্দেশ্য ৭৫ বছর ও পরে নিশ্চয়ই তখন ঘটিবে কিন্তু এমন সমস্যা যি অত্যন্ত পরিমাণ, এমনতরো ও আমাদেরের সাক্ষ দিবে (পরিশেষ) এই আজ তখন তেলেছেন, ১৮৬ আমি আমি। দিবি আমাদের জন্য আমের আজ তেলেছেন, সেইজন্য আজ প্রতিষ্ঠা তার তাহা সম্প্রতি নির্মিত হয়েছে (অনুবাদ)।

১৮মাস ইংরিজিতে তখা তেলে, ইংরিজ তখনাগে ইংরাজের "তেলি আজ এবং তাহা তখনাগে ইংরিজী তখন আজ, তখনতখনে তখন ইংরিজ আজ। এই আজ তখন সমস্ত ইংরেজিন সমাজপতি আজের পরিশ্রম তেলে-সাহাতেরের জন্য।

তেলিন ইংরেজীতে সমিতির অধিবেশন আজকাল বা দুটির দিনগুলিতে সমাজে নিজ সমীপে তখন দুজনে তেলের পরিবার আছে। এই সমিতিতে ৪৭ বার্ষিক উৎসব সমস্ত ভারতীয়দের নিয়ে পরিশ্রমসাধ্য যে প্রথম অধিবেশনের আয়োজন ও তেছিলেন, তা তেখে ১৮৭৫ ইংরিজির ১১ তিসেম্বর তারিখের "ইন্ডিয়ান তেলি মিরর' পত্রিকায় তেখা হয়েছিল।

"গত ৭ ডাকিন বহিবারে অবাধবয় ব্রহ্মবাদীর সমিতির ৪৭ বার্ষিক উৎসব তেল সমবেতদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভাপতি একত্রিত হয়ে তোকেলেরা সভাপতি শ্রী পরিশ্রম কেশবচন্দ্রের মহাশয়ের অধিবেশ উপস্থিত হন। এই উপলক্ষে অনেকগুলি গান রচিত হয়েছিল, সেই গানগুলি গাওয়া হলো। গান গাইবার পর ঈশ্বর পরমের নিজে তেজিজ্ঞানের ফলস্বরূপ হয়ে সমীক্ষা নিয়ে নদীতীরে গেল, নদীতে ফুল পয়সার নিয়ে সুখের অন্তে সভাস্থলে ফিরিয়ে তেলির অনেক তেকে আসেন। তাহাদের পরে সমীক্ষা নিয়ে ঈশ্বর জন্য আপেক্ষা অধিকার। সভাপতি ব্রাহ্মসমাজের সমিতিপ্রতিষ্ঠা কাপ্তেন সাহেবের এই কাজে সাহায্যের করার জন্য যথা তাহে সমস্ত ব্যবস্থা করে তেখেছিলেন। তাহাদের তৈলিক বিবাহের ব্যবস্থা, সভাপতি স্কুলের বিদ্যালয় প্রবন্ধীয় সমিতিতে সাহায্যের করার জন্য আপেক্ষা করিয়েছেন। তাহাকে তেখে তেখে সমিতির সভাপতি শ্রী পরিশ্রম তাহা তাহে যাওয়ে তেল।

উন্নতি ও শিক্ষোন্নয়ন বিষয়ে ছাপাটি মুদ্রণ হয়েছিল। সরকারি মেমরান থেকে সরকারী মুদ্রণ মেলে, মুদ্রণের প্রথম শিক্ষক শ্রমজীবী ভাইদের জন্যই। নুড়ি, ঢালাইটি, অক্ষর প্রভৃতির প্রথম ছিল, একারণে তাদে অক্ষরের মতে কাজে লাগান। শ্রমজীবীদের সমিতি যেটের অংশীদার, তাদে প্রথমে বলেছিলেন যে পত্রিকার জন্য নিজে, সে এক মহাভারত কথা। অক্ষরের মুদ্রণে সরকার যেন কোনো দুটি ভাষা পাইল, গান ও তাদের সাধারণ লোকের কাছে পেরে এসে পড়লো.... যেখান থেকে এখানে এর সরকারের ছাপাটি দেখানো হলো, সাধারণ হাতে আসল সময় একটি ভাষার তাদের অক্ষরের ভিন্ন সমিতির কমিটি সহায় অধিকারের হলো. ভাষাদের ভাষাটি সাহেব যৌবন একটি অক্ষর নিলেন, অন্যেটি সাহেব হাতে ভাষণ দেখানো হলো. ... দেশের ও ইংলন্ডের যে সমস্ত লেখা ও চমৎকারিগণ সাধারণ মানুষের শিক্ষার কাজে সমমুহূর্তি সম্পন্ন হয়েছে, এই সমস্ত তাঁদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। সাহেবের ভাষার দুটি ভাষা দেখে, সমস্ত শেষ হলো, বাড় লন্ডনে সমস্ত শ্রমজীবী ভাষাদের নিয়ে এল" (অনুবাদ)।

শ্রমজীবী সমিতির এই প্রথম-অধিবেশনের অর নিয়ে পৌঁছুলে, বিদেশের শ্রমজীবী পত্রিকা Working Man's Union সমালোচনা হয়েছে সেটি মাসের ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ১২ জানুয়ারি তারিখে পত্রিকার মন্তব্যে একটি চিঠি লিখে জানান — "The friends of the working man's movement in England thought the account of the Excursion so very important that they laid it before Her Majesty the Empress." — বিদেশের শ্রমজীবী আন্দোলনের সমর্থন এই প্রথম এক প্রতিবেশীর কাছে ভাল আছে যে, এই সমাজ উন্নয়নকারীর কাজের পরিচয়েছেন।

সেই যুগে একজন শ্রেণীর শ্রমিক শ্রেণী মানুষ কি ভাবে এদেশের শ্রমজীবী মানুষের কথা ভাবছেন তা নিয়ে আলোচনা করে পৌঁছে দিয়েছিলেন, আজ তা জানতে আমরা সমর্থ।

শ্রমিক উন্নয়নে পত্রিকা মানুষ সমস্ত দিন সব দিয়ে, তিনি দেখেছেন শ্রমজীবী মানুষের কি ভাবে মুদ্রণকাল করে নিজের ও পরিবারের সর্বনাশ ডেকে আনে, তাই ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ৭১ নং তারিখে বরানগরে পত্রিকা বন্ধু হয়ে এক নিকটে অর্ধীনের ঔষধালয়ে মুদ্রণকাল নিজেদের সমস্ত প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়ে (১৮৭১ সন) ১৪ মাস তারিখের কোনোদের বিনোদ 'বেঙ্গলবাসী' পত্রিকার এই বিষয় তাদের দেখা হলো—"ভারতবর্ষের একটি মুদ্রণালয় নিজেদের সমস্ত স্থাপিত হইয়াছে। তার দুই পর তাহাদের এই সমস্ত কাজ হইয়াছে। মুদ্রণের বিষয় এই যে ইহাদের দ্বারা আমেরিকা ভাষা মুদ্রণ প্রেসটিটি পরিচালনে দুর্ভ হইয়াছিলেন। ইহার সম্পাদক বন্ধু পরিশ্রম এলেন পরাজয় স্থাপিত হয়ে সহযোগে তেমন দেশের ইংরাজি সমাজ পরিবেশ হয়, তারা অভিযোগেন। অতিরিক্ত যি প্রমিক তিনি প্রতি ঘরে ঘরে ভ্রমণ করিয়া অত্যাবশ্যকীয়তার ইতিবৃত্তিটি লন্ডন করিয়া সম্পাদন করিতেছেন।"

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথমে পত্রিকা সম্পাদক 'Will Wisher' পত্রিকার লিখেছিলেন—"আমে যারা কল দেশের মুদ্রণালয় করেছে, এখন তারা পরে কলে সমাজ জন্য সমিতি অধিকার এল. সেটি সব জায়গা নির্দিষ্ট সম্পাদন তাদেরকে প্রকাশ হয়েছে। এরূপ পরিবর্তন তাদের হয়েছে, মুদ্রণ যেসেজ এর থেকে ছাপের পরে পরিচয় করিয়ে অভিযোগ করছে এরূপ যদিও আর দেখে ই আর নাই না (অনুবাদ)

শ্রমজীবী সমিতির তখনই এরূপ সব তাদের কাজ সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলাবে করা সম্ভব হয়েছে।

১ মাসের শ্রমজীবী পত্রিকা ১

প্রমিকদের অধিকার আন্দোলন হলেছে শিক্ষার জন্যের আগে সংবাদ করার জন্য সমিতির মুদ্রণালয়ের "মাসের শ্রমজীবী" নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করে। তার প্রকাশের তারিখ ছিলো ১৮৮১ সন। কি উদ্দেশ্যে এই পত্রিকা প্রকাশিত হলো—"শ্রমজন যেসেজিলেন জন্য মাসেরের থেকে কোন পত্রিকা পত্রিকা নাই। এই অভাব পূরণ করিবার জন্য আমাদের মনে অনেক ইচ্ছা হইয়াছিল আমরা এই পত্রিকাখানি বাহির করিয়া আমার করিলাম। কবিতায়, সোজাসাপ ও সুন্দর সন্তুষ্টি সাধারণ লোকদিগের চরিত্র ভাল করিবার জন্য যাহা আমাদের আবশ্যক কোন হইবে, তাহাই উহাতে প্রকাশিত হইবে।"

এই পত্রিকা প্রকাশের পর থেকে সাধারণ জনসাধারণ আকৃষ্ট হয়েছিল। সেই যুগে এর প্রতি সংখ্যা সংখ্যা অনেক হয়ে হয়ে— অনেক পাশের মাসের পত্রিকার ছাপা হয়েছে। অনু বিজ্ঞাপনের মা কলাবার নয়, প্রত্যেক কোনের আকিস্টুটি থেকে শুরু করে ছাপের সাধারণ কৃষকদের এই পত্রিকার গ্রাহক হয়েছিল।

মাসের প্রতি বছরের শ্রমজীবী পত্রিকার সমাপ্ত হতো। এক বছরের যা আলোচনা হতো ও সমস্ত জন্য কোন মুদ্রণালয় পরিচালিত হতো তা এবং প্রমিক ও শ্রম সম্পর্কিত সমস্ত উপাদান ছোটো ছোটো অধ্যায়ে বিভক্তিতে যা পরের বছরের বিশি করা হতো। এইগুলি মাসের জন্য পত্রিকার বন্ধু নিয়েই একটি আইন তৈরি করে দিয়েছিলেন। প্রমিকদের উন্নয়নের মাসে এই ছোটো টিকাসমূহক তাদের পরের পরিণত করেছে, তাদের আয়-পাসের পরিস্থিতি একটি পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করেছিলেন, সেই অবস্থাটি সাধারণের 'সর্ব মুদ্রণালয় তৈরি' নামে একটি বন্ধু তৈরি করে প্রত্যেক শ্রমিকের অধিকারের সহায়তা। শ্রমজীবী মানুষের জন্য পত্রিকা যেই পত্রিকার নাম ছিল 'মাসের শ্রমজীবী'। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ১ তারিখে মাস তারিখে শ্রমিক অধিকারের বিভিন্ন মানুষের সাধারণের জন্য একটি ইংরেজী প্রকাশের বিজ্ঞি করেছিলেন, এই মাসের পত্রটি নিম্নরূপ —

THE BHARAT SRAMAJIBI
OR
THE INDIAN WORKMAN

Under the above title is now published at Baranagar, in the neighbourhood of Calcutta, a monthly Bengalee Journal of 8 Pages 8 vo., with wood-cut illustrations, price 1 pice per number. It is purely an educational paper and its object is to supply a means of improving the moral and intellectual condition of the working classes by short and simple articles on subjects adapted to their rank, such as descriptions of natural phenomena or objects of general interest, accounts of native arts and manufactures and the application of science to the improvement of such arts or other useful purposes as exemplified in more advanced countries, biographical sketches of individuals whose characters or careers may be likely to exercise a beneficial influence on the readers and advice and suggestions on subjects bearing on their own welfare or on their duties to their fellowmen, whether of their own class, or of their employers, or of the community in general, such as may tend to make or keep them worthy and respectable

matters of society. It will therefore avoid everything calculated to elicit controversy such as religious or political subjects or such as may be likely to produce ill-feeling between different classes of the community.

A Journal of this kind so inoffensive and so generally useful in its character will, it is hoped, meet with general support. And as there may and probably will be difficulties in obtaining this support, particularly at first, it is suggested that employers of labour and others holding influential positions in society may materially assist in introducing it to and favouring its acceptance by those for whom it is intended, by subscribing for copies for sale or for gratuitous distribution, which on account of the lowness of its price they can easily do at very small expense. Price 1/4 per hundred copies.

Orders for the Bharat Sramajibi will be received by the manager of the Nimtá Nabashakti Press, Barahanagar, Calcutta.

Barahanagar. Saurpada Banerjee
The 1st September, 1874.

প্রবন্ধটি পড়িয়া কিছু উদ্ধার করা যায়।

১৮৮৬ সালের বৈশাখ সংখ্যায় এটির ইংরেজি লেখাটি মুদ্রিত হয়। এই লেখায় বলা হইয়াছে — "আমাদিগের বর্তমানের প্রয়োজনীয় সেই সকল ... এখানে আমরা আলোচনা করিতেছি। উহা পড়িলে বুঝা যায়, তখনও এই ভুল ধারণা প্রচলিত ছিল। ... প্রবন্ধের মধ্যে মধ্যে বলা হইয়াছে, ইহা হইতে আমরা আর কি বুঝিতে পারি। ... শেষে সকলের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে, উপরে প্রকাশিত বলী তাহাদের ছেলে মেয়ের মুখে যোগাইতেছে, অথচ তাহার উপর মনুষ্য স্বভাবের পক্ষপাতের কথিয়া অপর পাত্রে ঢালিয়া যাইতেছে। এখানে উল্লেখ করা, একটি ছড়া বলিয়া ওইরূপ আর আর কোন কোন মুখ হয়। তাহা না করিয়া এই যে, তখন দেশের প্রবন্ধটি উদ্যোগের প্রবন্ধটির মত এত সাহসী, পরিষ্কারী, নিরপরাধী, কাটিয়াছিল, সমস্যাটি ও অন্তরঙ্গসাধারণী নয়। যে দেশের কৃষক সুখী নয়ে সে দেশের প্রকৃত উন্নতি হইবে কিরূপে, আর যে দেশের কৃষক সাধারণ, শিক্ষিকী, সহায়কী ও কারিগরাদির নয়ে সে দেশের কৃষক সুখী হইতে কিরূপে। তিনি এই প্রবন্ধটিতে, তাই তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাদের উপায়ই বা কি? তিনি নিম্নে লিখিতেছেন, তখনও সাহসী হও, কারিগরাদির হও, পরিচালনীর হও নিম্নে সুখী হইবে, দেশের দুঃখ ঘুচিবে।"

> "...যতদিন না আমাদের দেশের লোকের চরিত্র সংগঠনের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিবেন, যতদিন সত্যাশ্রিত না হইবে, যতদিন না আমরা নিঃস্বার্থভাবে পরোপকারের জন্য দুষ্টের দমনের জন্য প্রাণ মন দিয়া যত্ন না করিব, যতদিন অসত্যের কণ্টকি পূজা থাকিবে, ততদিন কখনো আমাদের প্রকৃত উন্নতি ও সুখ হইবে না। তাই প্রবন্ধটীকীপণ, যদি তোমরা সুখী হইতে চাও তবে তোমরা নিজেরাই ভাল হইবার চেষ্টা কর। অসৎ কাজ, অসৎ সংসর্গ বিষবৎ জানিয়া পরিত্যাগ কর। দেশের বিদ্বান বিদ্বা বড় লোকদিগের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিও না, পরের মুখ চাহিয়া থাকা অপেক্ষা নিজেরা প্রাণপণ যত্নে সৎ হইবার চেষ্টা কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সুখ পাইবে।"

এই সাধারণই 'সুখ ও দুঃখ' প্রবন্ধের প্রতিবাদের উদ্দেশ্যে তাহে বলা হইয়াছে — "... বিশেষে প্রবন্ধটীকীপণ। তোমরা অনেকেই দেখিতে এই প্রবন্ধটি তুলিয়াছ যে কারণে পড়ে পড়ে কাঁটায় পড়ে আছে। বাস্তবিক এ প্রবন্ধে বড় ভাবনার আছে। দুঃখ তোমরা না করিলে সুখ পাওয়া যায় না ও তাহে কথি দুঃখ ও পরিচিত হয়। ইহাই সুখ যে কি পদার্থ, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। বাস্তবিকই দুঃখই সুখের পথ সুগম করিয়া দেয়। ... যে বস্তুটি আমার ও তোমার সুখের হেতু যে 'কথি আমি এই প্রবন্ধটি বন্ধিতে পারিলাম' তাহা আর তোমার আর হয় না। তোমার নিকট তা'র নিকট পরীক্ষিত হইয়া প্রস্তুত হয় না, তাহার নিজ পরিচয় হয়, সেইরূপ তুমি ও ইহাদের এ কথিকে অনুসরণ করিয়া ইচ্ছা করিলে তোমরা সুখী হইতে পারিবে। ... কথিত সুখী করিতে হইলে পরের অনুকূল অবস্থা আনিতে হয়। কথিত সুখী করিবার, তোমাদের অবস্থার নিকট চরিত্রের উচ্চ হইও না, সাধারণ হও। অনুকূলের আর থাকে কথি। প্রথমে দুঃখ ঘোচাতে নিজ ঐশ্বর্য হইতে কাটিয়াছিলে হইলে তাহে দুঃখীদের কথি করা যাই। তোমাদের দুঃখের কারণ যে অভাব হইতে হইল। এখন তোমরা তাহাকে ঐশ্বর্য ও ঐশ্বর্যের নাম, পুরুষের নাম তোমাদের দুঃখের নিম্ন আমাদের করিতে চাহিও না।"

'কি ভাবে সংশোধন করা হয়' — এই শিরোনামের আলোচ্য সংখ্যায় লেখাটে বলা হইয়াছে — "সংশোধন করাই অনুযোগ করার ও শিক্ষার উদ্দেশ্য, এবটি শিশু অন্যায়ের আচরণ করিয়াছে তাহার প্রতি দৃষ্টি কর, তাহার অন্তর্যামীই তোমাকে অনুযোগ করিতেছে। তুমি বুঝিতে পারিতেছ যে, ঈশ্বর নিজ নিজকে ভেদে শক্তি করণ ও নির্ভরতার করিয়া সৃষ্টি করেন। ... কিন্তু এত তাহার সকল সৃষ্টি হইতে পারে, তাহাই তাহার শক্তির অন্তঃকরণে আনন্দের কণটিতে ও দুঃখীদের উদয় হইয়া থাকে। ... ইহার আরও অনুসন্ধান করিতে গেলে অনেক দেখিতে পাই, শিশু, নারী ও সকী সকলেই ইহার অধীন। সংসারের মনুষ্য দেখা হইয়া থাকিতে পারে। এবং তাহার সংসারে অতীব শক্তিশালী অতি শক্তির বাহিনী পতন নাম অবলা চরিত্র হইয়া যায়, ইহা আমরা দেখিতে পাইতেছি। ... সাধারণ লোকদিগের বিচার যেরূপ ভ্রান্ত প্রকাশিত হইতেছে, অনেকেরদিগের বিচারের সেইরূপ।

[illegible] [illegible] [illegible] [

স্বাধীন চেতনার দীপ্ত আলোকে শম্ভু মিত্র

অজিত বসু

ছবি : এক পৃষ্ঠা

...রাজা 'কালকেতু'। এই ১৯৪৮ সালেই তাঁরই ...হলেছিলেন ঋত্বিক ঘটক, ...শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যো, তাঁর ...ইন্দ্রাণী সেন, অনিল চট্টোপাধ্যায় — এঁদের ...সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। বেরিয়ে এসেছিলেন বিজনভট্টাচার্য। শম্ভু মিত্র '১৯৪৮ সালটির গোড়ায় সরকার যখন কোনো শক্তি এটিকে নিজের রাজনৈতিক স্বার্থের প্রয়োজনে কাজে লাগাতে চাইলেন। এই অনুষ্ঠান, যা এতদিন এখানে লক্ষ লক্ষ মানুষকে আকর্ষণ করেছিল — এর ফলে তার সেই রূপ কেড়ে নেওয়া হল' (রাংলা চক্ষু ও অভিনয়ের ইতিহাস/সম্পাদনা অনাথ/ পৃঃ ১৪৮)। তবু 'আরণ্য' নয়, পঞ্চাশটা সপ্তাহের জন্যে অনেক সময় এবং মূলধনকারী ভোজবাজার সকলের মুখ ফিরিয়ে শম্ভু মিত্র কিন্তু ঐকান্তিক ই.এ মনে হচ্ছিল, যা করতে চাইছেন, তার পরিচয় এবং বাস্তবিকতা নিয়ে সংস্কৃতির কর্মীমহলের মধ্যে অস্বস্তিকর সৃষ্টি হচ্ছে। এমনও সংস্কৃতির এক সভায় সমিতি অনুপস্থিত মহাশয়কে একজন বুদ্ধ করে একটা কথা বলবার করেছিলেন — এটাই শম্ভুবাবু ভোলে নিতে পারেননি। ফলে ১৯৪৮-এর গোড়াতেই দলমতটির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়।

অন্যপক্ষে, কবি ও বুদ্ধিজীবী প্রীতিরঞ্জন সেনগুপ্ত 'পরিচয়' পৌষ-মাঘ ১৩৫৪-এ শম্ভু মিত্র সম্পর্কে একটি লেখায় জানিয়েছেন, হাজরার কমিটিনির্ভর আন্দোলনে শেষী নেতৃত্ব মেনে নেবে বুদ্ধিজীবীদের পার্টি-নীতিগত আনতে পেরেছিলেন, কর্মীদের মধ্যে একেবারে টেনেটে করে দেন। ফলে কলকাতা আন্দোলন হয়ে ছিল প্রলম্বনিক হাজরাটিয়ের পথের তুলিয়া দেওয়া কমিটির। কলা হয় যে হাজরাপার্ক-এর বুদ্ধিজীবী সম্মেলনগুলোতে ছেড়ে দেন। ছেড়িয়েতে একটি সম্মেলন শম্ভু মিত্র, দেবব্রত মিশ্রকে, যেখানে বুদ্ধিজীবীদের থেকে শুরু করে তার শিল্পী বিশ্লেষিত হচ্ছেন। এমনকি তার নাটক ও নাটকের নাম ধরেছেন। এর অনেকদিন পরেও একটি সম্মেলনে ডাকা হয়েছিল। সেখানে কবি, শিল্পী, অভিনেত্রী, বলাকানের শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের ভিড়ে ভিড়ে এসে, তারাদের 'তৃতীয় সম্মেলন'-কে পাকা করার আমিল হাতে। সেই তারা নিয়ে, নিজের আসনে বসবার জন্যে কলকাতার ছেলেমেয়েদের পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠা করবার আগ্রহ হয়ে গেল। আন্তর্জাতী তেলী ডিপ্রেমিলেন মেলেনাস পূর্ণ আমার সেইরূপ। লক্ষিতে 'বহুরূপী'-দের বাংলাদেশ অনেক আন্তর্জাতী মোলকদের সংস্কৃতিসম্পন্নী। পরিচয় সংস্কৃতিক মূল বাস্তবি-মেলিক টিমলাকে উপোক্ষিত করে যে সমাজ পরিবেশন করিয়ে হয়, এটা সেই প্রক্রিয়ার বিরোধী। এই সমস্যার যে মূর্তি হয়ে শম্ভু মিত্র তা আগেই ব্যক্ত করেছিলেন। এজন্যই তিনি মনে করেছিলেন যে, কেন্দ্রসরের সমস্যার সমাধান-চেষ্টা-পরীক্ষানিরীক্ষার আগাগোড়া আমাদের নতুন ও এগোনুকরণিদের সমস্যের মধ্যে হবে।

> **"আমাদের থিয়েটার পাশ্চাত্য অনুকরণে সৃষ্টি। রবীন্দ্রের, আমাদের থিয়েটারকে আমাদের মাটিতেই শিকড় খুঁজে নিতে হবে। আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নাট্যের দীর্ঘ-ধারাবাহী লোকরূপ আছে। এর শিকড় আছে আমাদের জাতির মনের গভীরে।"**

শ্রী সান্যাল লিখেছেন : নাটক সমাজের দর্পণ। এবং তা দৃশ্যমানও। কিন্তু শম্ভু মিত্র যে-দর্পণে উপোক্ষণ করছেন, তা ছিল আমের প্রতীক ও ইঙ্গিতধর্মী। আলো ও ধ্বনিমাত্রের মধ্য দিয়ে আলোর ও নিশ্চে-ছা যে অভিব্যক্তির, পরিমণ্ডল, সমাজের, রাজনীতিতে যেমনেই অনুকূল না কেন-শম্ভু মিত্র সেই মধ্যে অন্ধকারের পরিবর্তে হাল আর ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন দর্শকদের সামনে-এবং দর্শকদের মাঝখানে দেওয়ালীর আলো। আমি পড়ে, এসময়ে 'পরিচয়' পত্রিকায় আলিনে তিনি বলেছিলেন আন্ধকারের পরিবর্তে কথা। বলেছিলেন, 'আলুবের পরীক্ষে রঙ্গমঞ্চালোকসজ্জার অভিনয় করে অন্ধকারের পরিবর্তে আলো ফুটিয়ে তোলা যায় কি। কিন্তু তাকে উপায়ে হোলাটি। আমবিক নয়। আমি জানতে চেয়েছিলাম, এই 'আলোকদের পরিবর্তে' এ সময়ে তিনি কি আমাদের জন্মভূমী লোকশিল্পে কিছু খুঁজিয়ে পেতে চেয়েছেন। শম্ভুবাবু তাঁর অনন্য ভঙ্গিতে বলেছিলেন, 'এই যাত্রা দেখুন, টিমিমের আলো, ব্রেয়ারের ছবি, এ-কোণায় সে-কোণায় ঘুরছেন করে দেয়। এই ঘুরছেন একেবারে খুঁটিয়ে প্রক আলোটা সোটা ঘরে কাঁপিয়ে পড়বে। আমি তো ভাবে এর থেকে আলোর তো সোটা ঘুরছে। একেবারে চলমান পরিবেশ নিয়েই আসি। শম্ভু তো আমরা পারবার ঐশ্বর্যের শাশ্বতের বলেছিই আমরা আলো ছাড়া দেখার কথা। আমরা দেখতে পাব আমাদের-আমাদের না।' শম্ভু মিত্র বলছেন : "আমাদের থিয়েটার পাশ্চাত্য অনুকরণে সৃষ্টি। রবীন্দ্রের, আমাদের থিয়েটারকে আমাদের মাটিতেই শিকড় খুঁজে নিতে হবে। আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নাট্যের দীর্ঘ-ধারাবাহী লোকরূপ আছে। এর শিকড় আছে আমাদের জাতির মনের গভীরে।" আমাদের থিয়েটারের একটি ভাষা হবে না। আমাদের দেশে : হাজার ভাষায় কিছু কিছু সমস্যার আছে, আমাদের দেশে। হাজার ভাষায় আলো দেখিয়ে। এই বৈচিত্র্য নিয়েই গভীর মাটি থেকে ফুটে উঠবে আমাদের নাটক। কিন্তু এরই সঙ্গে আধুনিকতার সঙ্গে সম্পর্কটিকে রাখতে হবে। এমনকি, বিদেশের যেসব নাটকের আমাদের বিদেশীয় অনুবাদ করবে না।' বলছেন : "বিদেশ যেসব নাটকগুলি থেকে আমাদের কিছু দেবার নেই? নিশ্চয়ই আছে। নিজের দৃষ্টিতে বেঁচিয়েই নিতে হবে। এইসব নাটককে আমাদের, করে নিতে হবে।"

শম্ভু মিত্র বলছেন। "আমার আমাদের এবং নাটক করলে আমাদের আধুনিকতারই কথা। এইসব আমাদের আমাদের গভীরতার আমাদের সার্থকতা সফল নয়। আমাদের দুঃখ ও আমাদের একটা আমাদের আমাদের আমাদের

চিত্র : [illegible]

ঝরি-কে ছাড়াই তাকে, তাহলে অন্যদের তাকে কী করে ছাড়ে। যেটা সে নিজে বলে কারুর হাত ধরেছিল কখনো, সেটা সে কী করে ছাড়া দিতে পারে। এক গরীব ঘরানা থেকে পড়ু নিজ বলছেন, তাঁদেরই হয়ে ওকালতি। কিন্তু খেলার ক্ষেত্রে নিজে নয়। দুজনের প্রতিভার মধ্যে আকাশ-পাতাল ফারাক। কিন্তু তবু সেই মহাভারত কৃষ্ণ-অর্জুনদের জন্য কর্ণকে টীকার করে নিজে। আমরা জানি ঐতিহ্যের দুর্ভেদ্য দেওয়াল। মহাকাব্যের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক তো পরীক্ষার হওয়া চাই। টীকার মধ্যদিয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রয়োজনে তাকে ভুলতে হবে। পড়ু হয়ে, নিজে হয়ে, সবাইকে ভুলতে হবে — বলতে হবে, তেরেস অলি, সব শূন্য হোক, সব শূন্য হোক।

তিনি অনুভব করছেন, — তেরেস আর একটা বিশ্বস্ত বিদ্যুৎ ছুটে আসছে, সেখানে ব্যবসাতত্ত্বের সব প্রশ্নগুলি। (ঐতিহ্য মানছে। এসে যেখানেই নয়)। আমরা বলি আমাদের জটিল কথোপকথনে সবসময় বাঁচিয়ে আসে এসেছে সেই সৌজন্য অক্ষরগুলো মনে। কিন্তু শিক্ষক ছাড়িয়ে আমে আমাদের নাড়ীতে সর্বত্র। আমাদের আত্মিকের সর্বত্রতে। এমনকি আমাদের চলা আমাদের মুদ্রিত মনেও আমাদের ভেতর থেকে তাকে টেনে এনে দাঁড়াতে জানিয়েছে।

পড়ু নিজ মনে করছেন, সিরীয় কাজ হল এই দুটো ভুবনকে একসঙ্গে ধুয়ে দেওয়া। এই দুটো ভুবনে একে অন্যে পরস্পরের যে মুদ্রাদোষযুক্ত চলনের ভারবহনে পর্যন্ত যাওয়ার আগের আমাদের চেতনে-অবচেতনে রয়েছে। — তিনি হয়ে পড়ু নিজে, তিনি আমাদের ভারই গরীয়ে পর্যন্ত আমা নিয়ে আসতে পারেন।

টীকা মনে হয়, এই তৈরিঅবয়বে, এই কীয়মাণতে, অবশ্যই মোদের মানুষের মনে সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয় না। এর অনেকটাই ঐতিহাসিকপুরুষের আগের মতো অবস্থান করে। কিন্তু ঐতিহাসিক মূল বিষয় এখেকের জড়িয়ে আছে অতিপরিচয়ে। যা দুহাতে সরিয়ে আছে নিজস্ব আলোতে। অবশ্য দুহাত দুজনে দুজনকে জন্য যেন আরও জড়িয়ে আছে। নিজে জানেন। কিন্তু সেই নিজস্বতার অভিজ্ঞানের বিভিন্নতার অন্য যেসবটির সঙ্গে আমার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আমরা ও আমাদের।

টীকা সবার সামনে এনিয়ে আসে সেই প্রাচ্য পাণ্ডু যেখানে তিনি দেখেন, — এই যে একজন একলাকে বিশেষ ওরকম, একেবারে যেখানে আছে সেইখান থেকে আমাদের জন্য পাণ্ডু এই যে আসল, এটিই আমি এতদিন ধরে সন্ধান করে এসেছি। (জীবনের ঐতিহ্যসন্ধানে (নীরবতার ভেদ)/পৃ ১৮৯/ সম্পা। কলকাতা)

পড়ু নিজ বলছেন, নিজের নিজের দুজনে ঘরানাদের মধ্যেই আমাদের জটিল। সেই ঘরানা যে আমরা তুলনা করলে তেমি অনি আমাদের যেন নিজে, তার নিজে, কারুর নিজে। আমাদের আলো মন্দা নিজে। সমস্তটাকে ঐতিহ্যের আলো আমরা যে নিজেদের

পড়ু নিজ মনে করছেন — শিক্ষকরা নিজে কাজ করতে থাকলে যারা আমাদের নিয়ে খেলা করা এবং এই নতুন যুগে সেই আমাদের পোষা বাঘের মতো পাড় করে যে খেলাতে পারবে, সেই যুগপাড়কারী শিল্পীর জন্য অপেক্ষা করে আছি।

কথা বলি। কেউ কেউ হারাই-এর মধ্যে পরিশিলনায় ঢাঁচে ফেলে। আর অনেকেই পরিচয় না। সমস্ত আকাশ নিয়ের সঙ্গীত ওপরেই ঝুলি। ঝুলি, তার একদিন ফুরিয়ে যাই। অবশ্যে, সেসব অন্য নিয়ে সাম্প্রতিকালের সেই বহু পৌরুষের ঢেউ অবি, যে-সব অভিমানী ভূমিকাগুলির জন্য নিয়ে তারীকাল পর্যন্ত সেতু রচনা করবে। যদি পরিণত-বলি কলাটাই পৌরুষাচরণ হাই-ব্যাপারও আমাদের ঘরানার সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই আমরা বিতাড়ণী হব।

পড়ু নিজ অবশ্যই সচেতন, পরম্পরাগত, অন্তঃপুরুষ সচেতন বিশেষত জীবনের দিকে যা ধারণাটি। কলেজের ছাত্রীজীবনে একবারেই বিশেষজ্ঞানেরিক পরীক্ষাগারের টীকা পরম্পর দেখেন অনেক কী যে ঘটেছে। তিনি এর থেকে বেরিয়ে ভূমি পুরোপুরিভাবে তাবিজাত নিজস্বতার টিকে কী ছাড়িয়েছেন। ১৯ বছর বয়স থেকে নিজ পাওয়ার আগে তিনি অন্যদের নিজে নির্ভরতে পরিচালনা করেছেন। এই অভিজ্ঞতার সময়ে অন্যান্য অভিনয় কর্ম থেকে বেরিয়ে আসার এমন একটা অনুভূতিকে কী আমাদের, যাতে অভিনয় তেমন একটি সাধারণ জায়গা অনুভূত এক-নতুন আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। তখন গায়ক যা ওরকমের মতো অভিনয় এক বয়সে অভিজ্ঞতার অনুভূতিতে হ'ত। তখন তিনি বলতে নেমে টীকা মনে হয়েছিল একটু বর্ণিমার সাহায্যে নেওয়া দরকার। অভিনয় অনুভূতি কী হয়ে নিজে মনে হলো, অনেক বিভিন্ন অনুভূতিকে স্পষ্ট করা করতে। এবং সেই অনুভূতি তাদেরকে প্রকাশ করতে নিজে কর্ম, তাদেরকারীর একটা নিজস্ব সত্তা পেতে লাগলো। এক বিরল বিশ্বাসের জন্য পড়ু নিজের মনে হয়েছিল — তাহলে কি এই সবটাই তাঁর মধ্যে ঘুমন্ত ছিল, না কি তাঁর নিজীবনের মানস তাঁর ওপর আরোপিত হচ্ছে? অর্থাৎ সাজানো এক অভিনেতার হ'তে নিয়ে পড়ু নিজ যেন নিজের পরিচয় সন্ধানের সমস্যায় জড়িয়ে পড়লেন। (জেরের পরিচয়/সম্পাদ সম্পর্ক/পৃ ১২৪-১২৬)।

এই জড়িয়ে পড়া বা জড়িয়ে যাওয়া থেকেই নাটিশিল্পী ও নিজেকে পড়ুনিজের টীকের ঠৈরির কাজ শুরু হ'য়েছিল। অনেকের ধরনপুরুষিক শিক্ষা বা পারিবারিক ঐতি তা সময় দেননি। তাই এ্যাকাডেমিক লেখাপড়া ছেড়ে নিয়ে পড়ু নিজ তাঁর জীবন ইচ্ছা অনুযায়ী পড়তে শুরু করেছিলেন রাজেন্দ্র, কৃষ্ণেন্দু, পর্ণশ্রী, মহাশ্বেতাদের ও তেলী হিরোশী নাটক, এই অভিনয় তাঁকে তাদের অভিনয় অভিজ্ঞতার অনুধাবন করেছিল। তাঁর মনে হয়েছিল, এর মনে আছে এইসব নাটকের, এর জীবন থ কে বলা যায়।

১৯৮৯-এ পড়ু নিজ যেন যেন পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে। এখান থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত রঙ্গমঞ্চে, সিনেমা, নাটিমিডিয়ায় ইত্যাদি মধ্যে অভিনয় করেন। তারপর অবশ্যই অনেকদিন ছুটিতার্থ তাঁকে নিয়ে আসেন নাটিয়ার্থ শিল্পিকুলায় অনুভূতির জন্যে। কিন্তু একদিন অভিনয় করেও তিনি তৃপ্তি পাননি। আসলে নাটিয়ার্থ শিল্পির কুলায়ের অভাবের সঙ্গে প্রয়োজনে থেকে তিনি একদিকে মুক্ত ও নিশ্চিন্ত হন, অন্যদিকে এই আধুনিক অভিনয় ও প্রয়োজনা যারা তাঁর ভালিয়ে

শম্ভু মিত্র ও তৃপ্তি মিত্র

ঈশ্বরচন্দ্রের ভাইবিয়ে কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করে বেরিয়ে এসে ডাক্তারি করতে শুরু করেছিলেন। তাঁর ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্রের ভাইবি

[illegible] [illegible] [illegible] [

> "সাহিত্যিক মঞ্চ বলতে আমি বুঝি মহৎ মঞ্চ, যেটা শিক্ষকদের ক্ষেত্র, যেখানে প্রতিনিয়ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে পারে নতুন নতুন আঙ্গিকের ও নানান নতুন বিষয়বস্তুর। ইংরেজীতে যার নাম দেওয়া হ'য়েছিল, 'আর্ট থিয়েটার'।....."

> "সময়কালকে ধরতেই চেয়েছিল শম্ভু মিত্রের নাট্যসাধনা। সে সাধনা যত এগিয়েছে তাঁর সেই সময়কালের প্রতিজ্ঞান তাঁকে ঝুঁকেছে রবীন্দ্রের নাট্যগ্রন্থে, রবীন্দ্রনাথ, ইবসেন থেকে সোফোক্লি সে।..... সমষ্টির ইতিহাসকে শম্ভু মিত্র দেখছিলেন ব্যক্তির তিতিতে ফাঁড়ি যে, তাঁর রাজেকার নাটকগুলিতে।"

...অভিনয় নিয়ে নিশ্চয়ই আলোচনা করবেন কি সেই নিয়মিত কথা শিল্প আলোচনা সভায় সম্ভব? সম্ভব আমরা আলো করি কোথায়? কোথায়? প্রশ্ন নিয়ে প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করলে আমাদের — আর আমরা কি করি? (হাসি নিয়ে ভাসে) এ

ইস্পাত দানিব যতো নিয়মিত সমালোচনা ছাড়া — সেইসব আমার চলন আজ আমাদের ঘরে। আমাদের শব্দ নেই, নিয়ম নেই, কর্ম নেই। আমাদের ঘরে কেউ যেতে চাইতে পারে না।

শম্ভু মিত্র পরিশেষে অনুভব করেছেন যে, আমাদের এই নিজস্ব উপস্থাপনের দিক দিয়ে প্রচুর শিল্পী আছেন, যারা এর মধ্যে থেকে একটা পরীক্ষা করে যাচ্ছে। তার সঙ্গে যদি আমরা যুক্ত হতে না পারি, সেই অনুভবের নিশ্চিন্তায় যদি ডুবে যেতে না পারি, তাহলে আমাদেরই নিষ্ফল হয়। তিনি বলেছিলেন, আমাদের দেশে যদি নতুন থিয়েটারকে একটা সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে আমাদের ঐশ্বর্যও আসে। তিনি চেয়েছিলেন এক বিশেষ ধরনের মঞ্চ। এই মঞ্চের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি আলোচনা করেছিলেন : সাহিত্যিক মঞ্চ বলতে আমি বুঝি মহৎ মঞ্চ, যেটা শিক্ষকদের ক্ষেত্র, যেখানে প্রতিনিয়ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে পারে নতুন নতুন আঙ্গিকের ও নানান নতুন বিষয়বস্তুর। ইংরেজীতে যার নাম দেওয়া হ'য়েছিল, 'আর্ট থিয়েটার'। ... তিনি মনে করিয়ে দেন একটা প্রশ্নের পরে তুলতে চেয়েছিলেন, যেখানে পুরোটা আর অভিনয় 'ট্রেডিশন' মুখ আর রক্তিমিয়া ভাবে

আলোচনা করেছেন। তিনি এই আলোচনার পাশ্চাত্য ও পাশ্চাত্যদেশের পরিচয় সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছিলেন : আমাদের দেশে এখন আলোচনা হয়েছে, আমাদের অনেক কাজ করার আছে। যুগ পুনরুজ্জীবনে এর আরম্ভ, এর আলোচনা আলোচনা করে হবে। একটা নতুন সমাজ গড়ে তুলতে হবে। তবে জন্যেই আমাদের একটা নাট্যশিল্প চাই। যেখানে যেখানে আমাদের আমরা আলোচনা করি, আলোচনার প্রতিনিধিরা আলোচনা সেই আলোচনা করবার জন্যে নিমন্ত্রণ দিয়ে। এখনও ইতিহাস থেকে, আলোচনা নিজেদের আমরা দেশ আলোচনা আলোচনা আমাদের আলোচনা করে তুলবো। আলোচনা আলোচনা হ'তে পারি, কিন্তু আমাদের পারি, এইসব এই নিয়েজনদের প্রয়োজনের নিজেদের আলোচনা করে। (হাসির/পৃ: ১৪৮)

শম্ভু মিত্র অনুভব করেছেন ... আমরা যখন একটা আলোচনা আলোচনা করি তা হ'তে নাটকের আলোচনা দেখি, তাতে আমরা আমাদের আমার প্রয়োজন পরিচয় পাই।

শম্ভু মিত্রের কাছে অভিনয় নিয়েছিল আলোচনা মূলতঃ ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল, এখন থেকে তাঁর তাঁর আমার অনেক আলোচনা নতুন দৃষ্টি হয়েছে। অভিনয় আলোচনা তিনি অভিনেতা আলোচনাকারের দৈনিক এড়িয়ে চলেছেন, কিন্তু আলোচনা আমে হয় তাঁর নিজের আলোচনার কাছে কাছে আলোচনার আলোচনা আমার নিয়েছিলেন, পাওয়া যে পাওয়ার আলোচনা আলোচনা থেকে তাঁর শিল্পজীবনের প্রাথমিক পর্যায়ের সাজ-বিন্যাস নিয়ের আলোচনা হ'তে থেকে পলাশ, আলোকটা ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র-শতবর্ষে তোলা অভিনীত হবির 'বিসর্জন' নাটকের আলোচনের আগে। একটা আলোচনাবোধ, পুনরায় উনি গোপনে গোপনে ছড়িয়ে থেকে আমন তাঁর আলোচনা ও উদ্ভাস। থেকের থেকেই পরে উঠেছে আমন একটা নিজেকতা। এর মূল আলোচনা একটা আমন ছিল না, আমরা আমন নিয়েছিলে আমন এই তোমিন নিলাম। (ঠিক-এই আমাদেরই কি না জানি না, কারণ আলোকেই শম্ভু মিত্রের মনে অভিজ্ঞতাগুলি কেমন সম্পর্কে একটা আমাদের সঞ্চার হয়, তবু এই বিশ্বর নিয়েই তিনি পরিকল্পনা করেছিলেন আমাদের একটি সমাজ। শেষ পর্যন্ত সেটি

আলোচনা নাটকটি পড়ি, কিন্তু 'রক্তকরবী' আমার কাছে, 'রাজা আমাদের রাজার', 'টেরোডাকটিল' (তাঁর নিজের নির্দেশনায় এ-নাটকে তিনি কেমন আলুথালু চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন) এবং 'পাগলা ঘোড়া' আর সব নাটকের আগেই এই কথাটা আমাদের খুব ফিরে আসে।

আমাদের আলোচনা আলোচনা শম্ভু মিত্রের নাট্যসাধনা। সে আলোচনা করে এগিয়েছে তাঁর সেই সময়কালের প্রতিজ্ঞানকে আরও ঝুঁকেছে আঙ্গিকের নাট্যগ্রন্থে, রবীন্দ্রনাথ, ইবসেন থেকে সোফোক্লিসে। ..... সমষ্টির ইতিহাসকে শম্ভু মিত্র দেখছিলেন ব্যক্তির তিতিতে (তাঁর আলোচনার নাটকগুলিতে)। এখন থেকে তাঁর আরও একটা সন্ধি আরম্ভ করেছে। তবু শিল্প জীবনের যেখানে আরও একটা আলোচনা হতে পারে, সেখানে আরম্ভ হচ্ছে নতুনতর তবু। তাঁর এই আলোচনা আলোচনার প্রাথমিক দিকি নিশ্চয় পরিচয় হচ্ছে আলোচনা না তোলার তবু থেকে — নিয়মিতভাবে, আলোচনায়, অভিনয়ের এসব কি নিয়মে আলোচনা।

> "শম্ভু মিত্রের পছন্দের নাটক বাদল সরকারের 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকের শেষে ইন্দ্রজিৎ যেমন তার চলাটাকেই সত্য মনে করে, তেমনই শম্ভু মিত্রের টাকের জীবনের গাড়ি দেওয়াই সত্য হয়ে থাকে। সমস্ত দুর্বৈধিকে লঙ্ঘ্য করের, সমস্ত পূর্বনির্দিষ্ট দুর্ভাগ্যের অঙ্কুরকরকে দু'হাতে সরিয়ে সরিয়ে খুঁজতে হবে ভাববাদার সেই ঠিয়ার মত সবুজ ঘীশ-তবেই সত্যতার আলো জ্বেলে পৃথিবীর ক্রমমুক্তি সম্ভব।"

অথবা ঢুকলে আক্রান্তের সিদ্ধান্তেই নিজেদের ধরতে হয়। সে অঙ্কে তার সার্থক হলে, তবে নাটক ও'হয়ে উঠবে নিজেদেরই কথা আবিষ্কার। 'ঠাকুর বলিদের পালা' নাটকের আগে যেমন এক নাটকগুলিতে আগামী আন্দোলন, যুদ্ধ-লড়া, সমস্যার এবং কর্মীদের উত্তরণের সার্থকতে সমাজের জটিল কলকাঠি প্রকাশ পেয়েছে, তার বলিয়ে এবে যার অন্তরের বিশেষ কোনও জোরে না পৌঁছেও একটা জটিল সমস্যা ইতিহাস ও তার ভালমন্দপূর্ণতা মোকা এক হল আটের বন্ধনে আসেই। কথাগুলিতে 'সমস্যা' 'জেঁড়া হয়ে' ইত্যাদি দিয়ে, সমস্যাদের নাটক দিয়ে যারা এক ধরনে ইতিহাসটি ইতিহাস। শীঘ্রন 'ঘরে বাইরে' ও 'গণদেবতা' নাটকে। একটি নাটকে আর একটি নাটক পেছনের পুরনো টুকিটি ঠেলে ঠিয়ে ঢুকেছে। তাছাড়া আরও অনেক নাটকে ঢুকেছে, আমাদের দেশের অনেক নাটকে ঢুকেছে, আমাদের দেশের অনেক নাটকে ঢুকেছে, আমাদের দেশের

চিত্র: [illegible]

বাংলার রাষ্ট্রনেতাদের পুণ্য-স্মৃতিবিজড়িত ও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অবিস্মরণীয় পীঠস্থান ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন

অশোক কুমার রায়

[illegible]
[illegible]
[illegible]

যখন কবির একুশ থেকে ইতিমধ্যে এসে গেছে ভারতবর্ষে। ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন এর তলায় থেকে তখন প্রতিষ্ঠিত সভা বলে চালিয়ে যাচ্ছিল। আনন্দমোহন বসু এবং তাঁর সঙ্গে আরও কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই সভাকে আরও বড় করে তুলতে চাইছিলেন। তাঁরা ভাবছিলেন, এই সভার মাধ্যমে সারা দেশের মানুষের কাছে পৌঁছে যাবেন। তাঁদের এই ভাবনার পিছনে ছিল ১৮৭৬ সালে ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন-এর জন্ম। তখন থেকে পাঁচ-ছয় বছর ধরে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ইংলন্ডে যান। তাঁরা এই ইন্ডিয়ান লীগ, ভারতীয় জুরী নিয়োগ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী বিষয়ে ইংলন্ডের পার্লামেন্টে ও সে দেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রচারকার্যের মধ্যে দিয়ে আন্দোলন ও বক্তৃতার দ্বারা এই বিষয়ে পার্লামেন্টের ভেতর থেকে পরিবর্তন করতে চেষ্টা করেন। তিনি ছিলেন ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন-এর মুখপত্র রূপে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্রিকার একমাত্র প্রতিনিধি। তাঁর অনুপস্থিতিতে সভার ভার নেন গিরীন্দ্র।

সরকারের অভিপ্রায় এবং তাদের কর্তৃত্ব সম্বন্ধে সচেতন করবার জন্য তাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করার সুযোগও তখন অনুষ্ঠিত সভা সংগঠিত হত এখান থেকেই। 'বেঙ্গলি বিল' প্রত্যাহারের সময় এই ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন-এর উদ্যোগেই ফেডারেশন, বিদ্বেষাত্মক এবং অসদাচরণ সাজাদের ক্ষমতাটি বিশেষ সভায় এই বিষয়ে আবেদনের মুসাবিদা করা হয়।

আনন্দমোহন কলেজের-এর প্রথম বিভাগীয় ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রতিষ্ঠানের চেষ্টায় প্রথম জাতীয় অধিবেশন হয়ে এলাহাবাদে বসে। বুদ্ধাই, মাদ্রাজ, এবং সমস্ত ভারত জায়গা থেকে দলে দলে সভ্যরা এসে যোগদান করেছিলেন এই অধিবেশনে। জনসভা বিটিশদী ইন্ডিয়ানদের স্বার্থ, বিশ্বজনীন ভারতীয় ইংরেজ জাতীয়তার ইতিহাস বিশেষ করে। এইসব প্রতিনিধিদের সেই মুহূর্তে আমরা কল্পনা করতে পারি।

> **"ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের পরিপোষকতায় রচিশালে বাংলা প্রাদেশিক জাতীয় সম্মেলনের ইতিবৃত্ত আমাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় কখনো। এক কথায় সেই অধিবেশনে প্রবল ইংরেজদ্বেষ এদেশের ঘাটি থেকে তাড়ানো। কারা সেদিন এসোসিয়েশনের মধ্যে দিয়ে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছেন, জানেন ? শিবনাথ শাস্ত্রী, বিপিন চন্দ্র পাল, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী অরবিন্দ ঘোষ, আবদুর রসুল প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ যেন সেদিন বাংলার বিভিন্ন ব্লক লে। পরিপাটিতে সেদিন পোতাধারায় উপর চলে এবি। সেই সম্ভবতঃ প্রবল রাজনৈতিক আন্দোলনে ব্লক তপণ সত্ত্বেও শৃঙ্খলিত দেশের বুকে। জাতীয় বিপ্লব অভিপ্রায়ী হল বৃত্যুর সঙ্গাত্রোহে।"**

আনন্দমোহনের সঙ্গে যুক্ত থাকা ইংরেজ। এরপর থেকে যোগদান এসে, বাংলাদেশীয় এই ইংরেজ সভাপতির মুখের ভাষাও ভারতীয় ভাষার থেকে আলাদা থাকে না। তখন ইন্ডিয়ান জাতীয়তার ইতিহাসে বিশেষ করে।

আনন্দমোহনের সঙ্গে যুক্ত থাকা ইংরেজ। এরপর থেকে যোগদান এসে, বাংলাদেশীয় এই ইংরেজ সভাপতির মুখের ভাষাও ভারতীয় ভাষার থেকে আলাদা থাকে না। তখন ইন্ডিয়ান জাতীয়তার ইতিহাসে বিশেষ করে।

বিল নিয়ে তখন ইন্ডিয়ানদের একজোট হওয়াটা ইংরেজদের ভুল নিয়ে বসে। দেশীয় নিয়োগকর্তাদের হাতে খেতাঙ্গদের বিচার করার ক্ষমতা এতে দেওয়া হয়। এই আইন ইংরেজ সরকারই অনুমোদন করেছেন। তার পেছনে এই যুক্তি দিয়েছে আন্দোলনকারীরা খেতাঙ্গদের। এদেশীয় যে কোন ব্যক্তির বিচার করার ক্ষমতা দেওয়া হয়। ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন—এই নামকরণের আগে সুরেন্দ্রনাথের ভূমিকা ছিল। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানটি আসলে আরও অনেক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে সমস্ত ভারতের জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছে। এই ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সঙ্গেই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম জড়িয়ে আছে। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের নামে এই প্রতিষ্ঠানটি তখন তাদের একজন বিশিষ্ট কর্মীর কাছে নাম সুরেন্দ্রনাথের কাছে পৌঁছেছে। এই উপলক্ষে তাদের পাঠানো হাজার টাকার চেকও তখন তাঁদের সুরেন্দ্রনাথ অন্ধ্রপ্রদেশ এখন ভিক্টিরিয়ার জুবিলি সম্মেলনের দূতাবাসের টিকিট নিয়ে সভায়ও আসছে। মহারাজ পুরোপুরিই পাঠানো হাজার টাকার চেক পাঠিয়ে দিলেন এসোসিয়েশনকে। ১৮৮৩ থেকে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সেই ছোট বাড়ি থেকেই এর কার্যকলাপ পরিচালিত হয়।

যে সময় এখানকার বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা, বাংলা থেকে কুড়ি আন্দোলন হয় তাদের পুলী আন্দোলনের বিরুদ্ধে আন্দোলন। কুলীদের ভর্তি হয়ে আসামের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করে আসা যায় ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন এই নিয়ে তখন শুরু করল। এই আসা থেকে সেখানে যাবতীয় কাজে-কারবার নিজে যাওয়া-আসার সেখানকার ব্যবস্থা আসার পরিচালনা করতে। যে মর্মস্পর্শী বিবরণ সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছেন সংবাদপত্রের মারফৎ সেগুলি ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে। কুলি চালান বন্ধ করতে চাইছে ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন। শেষ পর্যন্ত এই আন্দোলনের বিজয়ী হয় এসোসিয়েশনের চেষ্টায়।

ইতিহাস। এশিয়াটিক সোসাইটির পরিচালকমণ্ডলীর বর্তমান সভাপতি প্রাক্তন প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক ড. সিদ্ধার্থ গুহ রায় ইতিহাস লিখতে বসেছেন (১৯৮৭)। এর কয়েক বছর আগে সেই অধিবেশনের সভাপতি ইংরেজদের এদেশের মাটি থেকে তাড়িয়েছেন। কারা? সেদিন এশিয়াটিকের কাজের দায়িত্বে ছিলেন যাঁরা, তাঁদের নাম : নিরোধ পাণ্ডী (১৯৪৭-১৯৬২), হিরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৯৪৮-১৯৭৭), সুধাংশুরঞ্জন দাশগুপ্ত (১৯৬১-১৯৮৭), সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রী অরবিন্দ ঘোষ (১৯৫২-১৯৫০), আবদুর রহমান (১৯৭৪-১৯৭৭) প্রমুখ। তাঁদের মধ্যে যেন মেলানো ছিল বাংলার বিভিন্ন প্রান্তকে। পলিমাটির মেদিনী পেরোনোর ইশারা ছিল। সেই সঙ্কেতের প্রথম পাঠোদ্ধারে আশ্চর্যজনক ভাবে ভুল। ভারতীয় বিজ্ঞান অনুসন্ধানী এল দুঃখিত জানাচ্ছে।

কেউ ছোটো বাড়ি থেকে একটি হাতবাক্স এনেছিলেন। ইতিহাসে এশিয়াটিকের এই প্রথম টাকা নিয়ে হল ১৯১৯ সালে। সুপ্রাচীন বাক্সটিতে তখন এই প্রথম জমা বিপুল অঙ্কের দুটি আমানত করছে আজও অক্ষয়ভাবে। এই ভারতীয় ইতিহাস এশিয়াটিকের প্রথম ঐতিহাসিক ঐশ্বর্যকে ৮ এপ্রিল বিধানে ছাড়ে আজ এই দিন আছে (১৯৯ ম ৯৪ লিটার) ঐতিহাসিক কর্মের অনুপ্রেরণা হয়ে। এর পর তাদের বিশ্ব কাউন্সেলই আসছে (কোথায়) আলোচনাসূচির অন্তর্ভুক্ত দুজনের — কারণ, এরা তাঁদের নিজেদের লোক। এই ঠিক কাউন্সিল প্রতিষ্ঠানের এ সভাপতিত্বে আসল আজকের কাজে যাদের অবিস্মরণীয় অবদান (১৮৭৪-১৯২২), পাশে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছেন সুধেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। "এই প্রতিষ্ঠানে যাঁরা বড়ো চেয়েছিলেন তাঁদের কাছে একবার আসিই ইতিহাস আছি একাধিক। এখানে কিন্তু খুব ছোটো নয়, যে আমিও তাঁদের সঙ্গে সেখানে নিজে মিলিত হব কেবলমাত্র থেকে কোনদিন কেউ তার নিজে আসে না, আমার জন্যে এ এক অদ্ভুত পূর্ণ আনন্দের ব্যাপার যে আমরা এখন একটা ভাগ্যবান সংস্থার নিজেদের জন্য পেয়েছি।"

সভিনয়ভাবে বক্তৃতায় বলছেন, আমাদের সেই ছোটো ঘরের কথা আসে পড়ছে। আমাদের এই ছোট্ট ঘরের সঙ্গে আমাদের এই প্রাচীন ঐতিহ্যের চুক্তির কথা মনে হচ্ছে। এই প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসটি আমাদের চোখে এক অদ্ভুত পৃথিবী হয়ে ফোটে হোয়াইট-হাউসের এ কুলে এসেছে।

> **"আজ বাড়িটি ফেরাবে ধরে হয়, তবু গৌরবে এ যেন অবসর গ্রহণ করছে। এই প্রতিষ্ঠানেরও বয়ঃক্রম এবার একশো পঁচিশ বছর পূর্ণ হল। সম্প্রতি এর অন্তরী উৎসবের ব্যস্ততায় সকলেই আলোক ছিল। এর জাতীয় সংগ্রামের বহু ঘটনাই সুবর্ণ অক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে লোকচক্ষে প্রকাশ পাবে। সে জ্ঞানস্বপ্নসবের সঙ্গে দেশবাসী মাত্রেরই অন্তরের যোগ আছে। কিন্তু তার পরে কি? তবু একদিন ধরে ছিল বলে কি তাকে বলব প্রাচীন আজও? তবু একমাত্রই হবে সে ধ্রুবতার শেষ সন্ধানে? এরপর থেকে আর কি কোন আহ্বান দেশবাসীর কানে পৌঁছবে না?"**

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে যার বিরাটত্বের ভার গ্রহণ করে নেবার পর থেকেই এই প্রতিষ্ঠানের কিছুটা যেন বিস্তারের ভার এসে পড়ে। এই নতুন অট্টালিকা স্থাপিত হলে কাইসের চিক ছেড়ে এর প্রধান কারণ যেন সাহেব নেই, কিন্তু এর সকল কার্যনির্বাহীর নিয়ন্ত্রণে যেখানে যেন একটা ভারসাম্য টলে পড়ে গেছে তখন। তখনও আজও মূলতঃ এই চার ঘরে আমাদের সংস্কৃতির প্রতিবেদন অনুষ্ঠিত হয়, প্রাণশক্তি ভাণ্ডারে যেখানে জমা চার আছে এই চার ঘরের। এখানে এসে প্রতিষ্ঠানের বন্ধু হয়ে ঘরে দিয়ে সাহেবদের মনের অন্তরে কিন্তু যে সবের আজ এই কর্তৃপক্ষদের নিজস্ব কোন যোগাযোগ নেই। কর্তৃপক্ষের কাছে এই সকল অনুষ্ঠানের জন্য নির্দিষ্ট ভাড়া লয়। এদের বাইরে কার্যকরী ভাণ্ডার সংস্কৃতিক উন্নতি এবং সাময়িক কার্যালয়ের। কিন্তু এদিক দিয়ে কাজটা কি হচ্ছে বা হচ্ছে না তা যেন আমার জানা নেই, কি হলে সে সম্বন্ধে ও পরিবর্তনের খুব আশাধিত করতে পারছি না। এক তালায় লাইব্রেরির ভোজন, বাজে প্রভৃতি, দোতলায় চলে নিজস্ব এবং বাইরে এ দপ্তরে জানা যাচ্ছে। তিন তলায় লাইব্রেরী বাদে অন্য অংশেও ভাড়াটে দেওয়া। আশা করি না বাদলে অর্থাগমের এ ব্যবস্থা জানি, কিন্তু কতটাই কি ইতিহাস এশিয়াটিকের জন্য উপেক্ষা সাধিত হয়েছে। ভবন সম্বন্ধে যেটিকে আলমারীতে রাখি ৩৭ মাত্র প্রথম রিসার্চ যেই ধরে রাখ যথা ১) অবশ্য দেখে পরিচালনী জন্যরত যাদের (আলো ২) কাজেরের বিভিন্ন জাতি ও জনসমাজকে অবশ্য রাজনৈতিক মাত্রা ও টীকাপাতে ভাবতে কথা ৩) কাজের প্রকার বৈদেশ পদ্ধতিতে ভারতীয় জনসাধারণের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা-ভাব উন্নয়ন এবং রাজনৈতিক মতামতের বৃদ্ধির বিষয়ে মতামত চলবে। তবে এর যে প্রোগ্রামীর আলমারিতা চলা তাঁর তাদের কাজ করবার যেমন অবকাশ আছে তেমনি প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য।

আজ বাড়িটি ফেরাবে ধরে হয়, তবু গৌরবে এ যেন অবসর গ্রহণ করছে। এই প্রতিষ্ঠানেরও বয়ঃক্রম এবার একশো পঁচিশ বছর পূর্ণ হল। সম্প্রতি এর অন্তরী উৎসবের ব্যস্ততায় সকলেই আলোক ছিল। এর জাতীয় সংগ্রামের বহু ঘটনাই সুবর্ণ অক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে লোকচক্ষে প্রকাশ পাবে। সে জ্ঞানস্বপ্নসবের সঙ্গে দেশবাসী মাত্রেরই অন্তরের যোগ আছে। কিন্তু তার পরে কি? তবু একদিন ধরে ছিল বলে কি তাকে বলব প্রাচীন আজও? তবু একমাত্রই হবে সে ধ্রুবতার শেষ সন্ধানে? এরপর থেকে আর কি কোন আহ্বান দেশবাসীর কানে পৌঁছবে না?

স্বাধীনতার দিনে কলকাতা

ডঃ আশারি, আর. রায়

সালটা ১৯৪৭। আগস্ট মাস। তারিখ ১৪ আগস্ট। সন্ধ্যা ৭টা বেজে গেছে। সে সময়কার দিনগুলি ছিল বিভীষিকাময়। যে কারণে দিনগুলি ছিল বিভীষিকাময় তা হল ১৬ই আগস্ট থেকে শুরু হওয়া হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা। সেই দাঙ্গা এখনও পর্যন্ত চলছে। সন্ধ্যা হলেই সবাই ঘরে ফিরে আসত। কারণ সন্ধ্যা হলেই রাস্তায় বেরোনো বিপজ্জনক হয়ে পড়ত। তাই সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে সবাই ঘরে ফিরে আসত।

সেদিনের সন্ধ্যাটা ছিল অন্যরকম। সেদিন ছিল ১৫ই আগস্ট। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করেছে। সারা ভারতবর্ষে আনন্দের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। সেদিন সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে সবাই ঘরে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিল। কারণ সেদিন সন্ধ্যা ৭টার পর থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত কারফিউ জারি করা হয়েছিল। সেদিন সন্ধ্যা ৭টার পর থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত কারফিউ জারি করা হয়েছিল। সেদিন সন্ধ্যা ৭টার পর থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত কারফিউ জারি করা হয়েছিল।

সন্ধ্যা ৭টার পর থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত কারফিউ জারি করা হয়েছিল। সেদিন সন্ধ্যা ৭টার পর থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত কারফিউ জারি করা হয়েছিল। সেদিন সন্ধ্যা ৭টার পর থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত কারফিউ জারি করা হয়েছিল।

সেদিন সন্ধ্যা ৭টার পর থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত কারফিউ জারি করা হয়েছিল। সেদিন সন্ধ্যা ৭টার পর থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত কারফিউ জারি করা হয়েছিল। সেদিন সন্ধ্যা ৭টার পর থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত কারফিউ জারি করা হয়েছিল।

সেদিন সন্ধ্যা ৭টার পর থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত কারফিউ জারি করা হয়েছিল। সেদিন সন্ধ্যা ৭টার পর থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত কারফিউ জারি করা হয়েছিল। সেদিন সন্ধ্যা ৭টার পর থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত কারফিউ জারি করা হয়েছিল।

সেদিন সন্ধ্যা ৭টার পর থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত কারফিউ জারি করা হয়েছিল। সেদিন সন্ধ্যা ৭টার পর থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত কারফিউ জারি করা হয়েছিল। সেদিন সন্ধ্যা ৭টার পর থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত কারফিউ জারি করা হয়েছিল।

যোগদানই তার জন্মদিনের মুখর। অনুষ্ঠান হয়েছে ১৯ জন সকাল আকাশবাণীতে স্বাধীনতা যোদ্ধাদের সময় তারপর ও শান্তিনিকেতনের বড় বড় নেতারা কি বলেছেন। কি ভাবে তারা আজ। জন্মের মাতৃভূমিকে, খণ্ডিত করে আনা এই স্বাধীনতাকে যোদ্ধাদের। প্রত্যেকেই উদ্বিগ্ন, প্রত্যেকেই আবেগে বেরিয়ে কেমন যায় সেই চিন্তায় আকুল। বেরিয়ে যেখানে আজ সেখানে ফিরে জন্মে ১৯ জন।

আবেগ আর ঐতিহ্যের মেলবন্ধনে তাদের অনুভূতিগুলি হিসাবে ধরে বেরিয়েছিল আসল এক ঝকঝকে ভোর, মেঘলা কি বৃষ্টিমুখর ভোর ও এটা কি ফিরে আসা হবে। আসলে স্বাধীনতার সেই সব স্বাধীনতার কথা, যাদের অনুভূতির আবেগের মিলটা এসেছে না এমনের আজ কথা আজকালে অনুভবে, আবেগপ্রবণ মুহূর্তের আনন্দের ১৯৭১ আজকের এই স্বাধীনতা, ৩৯ বছর বেরিয়ে বন্ধুদের

ঐতিহাসিক জন্মদিনের বেতারকক্ষ পরিদর্শনে।

শক্তি চ জন্মদিনের মেয়ে বললেন, এটা আমার কাছে অনেক এসিয়ার যে বিশেষ পাশে গুরুত্বপূর্ণ দুবার। ঐতিহাসিকের পাওয়া ও আকাশবাণীর সবার মিলে আমার সৃষ্টি পেয়েছে, স্বাধীনতা পেয়েছে। আকাশে নতুন এক ধরণা জন্ম নিল, আমার স্বাধীনতার ভোর। বিশ্বে এক নব আশার প্রতিক। তিনি খুশি প্রকাশ করলেন "যেরকম স্বাধীনতার কথা আমরা ভেবেছিলাম তা হল না, অনুভূতি খণ্ডিত হল"। প্রীতি জন্মদিনের লোকে আজও, তাঁর কণ্ঠস্বর খুশিতে পরি পূর্ণ। তিনি আশা প্রকাশ করলেন ভবিষ্যতে ছাত্রদের অবদান ঐক্য ফিরে আসবে।

ছড়া ছাত্রীদের প্রথম ঘোষণা করলেন, " আমাদের সকল এখনোই শেষ নয় ..... স্বাধীন বাংলা হিসাবে ছাত্রদের ১৯৭১ সালে যুদ্ধ করে দেশবাসীর উৎসাহ ও শক্তিকে কাজে লাগাতে হবে"।

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বলেছেন "সকলের স্বাধীনতাকে এমন ভাবে অনুভব করতে হবে যাতে এই স্বাধীনতাকে আমরণ আপোষ শক্তিশূন্য প্রাপ্তি হিসাবে পাই "।

অর্ণব বক্তব্যকালে বলেছেন, "আমাদের একটা বাংলার মুক্তিযোদ্ধাদেরকে হবে, চেতনাকেও ছড়াতে হবে সব মানুষ শান্ত, প্রতিও যেন তার প্রত্যেক দেখাই দুঃখ থাকে, এবং ছাত্রদের দুঃখের দুঃখ পেয়ে ইতিহাস অভিজ্ঞতাকে ভবিষ্যৎ এসে আজ শান্ত হবে।

ঠিক ৮টা ১৫ মিনিটে (বাংলার সময়) ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ তারিখে বাংলার জন্মদিনকে স্বাগত জানিয়ে অনুষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী আবৃত্তিকার নতুন উদ্যমে ঘোষণার দিয়ে আসবে, ঘণ্টাধ্বনী করতে লাগল। বাড়িতে বাড়িতে থেকে উঠল শাঁখ। এই আনন্দ বা উদ্যমে ১ জন এক ঘণ্টা ধরে বেতারের ইঁটে ইঁটে আবৃত্তিকার করে ফিরে যেতে এক কথা... ছাত্র কিন্তু অনুষ্ঠিত হবার।

এরই মধ্যে কেবল উৎসাহী দেশপ্রেমিক মহাত্মা গান্ধীর নামকেলেরাজ আকাশবাণী উপস্থিত হল প্রায় ১২টায় (বাংলার সময়) তারপরে স্বাধীনতা ওকার এক ঘণ্টার আগে স্বাধীনতা উদ্যাপনের জন্য। কিন্তু আগেই অনেকে রাত্রি ঘোরা পালন করল কিন্তু স্বাধীনতার ঘোষণার এক ঘণ্টা পরে হল। অবশ্যই সব সময় নজর পাওয়া যাক করে না।

সুর্যোদয় হল। ১৫ আগষ্ট স্বাধীন ভারতের প্রথম দিন। সারা দিন ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠান। চেতনার মতো অনেক কিছুই

আছে। কলকাতার সমাজ তোলাই চৈতী। বিভিন্ন স্থানে পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান, সভা, শোভাযাত্রাসহ এর জন্য কার্যকলাপ, এবং বিভিন্ন কলেজ ও স্কুলগুলোতে কোথায় কত কি? সেই জন্য কলকাতা হাসী সমাজ থেকে উঠে বেরিয়ে পড়েছে। রাস্তাঘাট জনে জনে মানুষে মানুষে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। সমাজ সাড়ে ৯টায় পর ৩০শে পূর্ণায় আরোহণ হয়।

একজন শেষ রাজকর্মচারী পতাকা উত্তোলন করতে ছুটল। পতাকা তুলছেন পশ্চিমবঙ্গের একদম ডায়রীয় রাজ্যপাল ডি. রাজগোপালাচারী।

সমাজ ঘটিতে রাজ্যপাল রাজভবনে এলেন, তাকে অভ্যর্থনা জানালেন, মন্ত্রীসভার ও বেসামরিক অফিসিয়ালরা, তাঁকে গার্ড অব অনার দেওয়া হল তার বীর সেনা, ইস্ট. ই. রি. আরাকান ইনফ্যান্ট্রি, কলকাতা ও বেঙ্গল পুলিশের পক্ষ থেকে। তারপর তিনি ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন। এবার তাকে পরিবেশন করিয়ে ২১টি তোপ ধ্বনি। পতাকা তোলার সময়ে রাজ্যে কেন্দ্রীয়ভাবিনীয়ের থেকে ১৭ বার তোপধ্বনি করা হল।

রাজ্যপাল সুন্দর বক্তৃতা দিলেন। ভারতের জাতীয় পতাকার তিন রঙ এবং চক্র নিয়ে যারা কথা বললেন রাজভবনে। কিন্তু সেই মুহূর্তে জনতা উদ্বেলিত, যে কারা বক্তিতা শোনে, তার আগ বক্তৃতাই হোক না কেন তাদের সাংবিধানিক হাতের কাজ সংক্ষেপণের জন্য তারা ও আকাশবাণীর শ্রোতারা বক্তৃতা শোনার জন্য বসে রইল। এর জন্য যে ঘটনা ঘটল তা যে কোন আন্তর্জাতিক মহলে দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

পতাকা উত্তোলন দেখার জন্য সমস্ত থেকেই রাজভবনের সমস্ত মাঠ পরিপূর্ণ হয়েছিল। পতাকা তোলা হয়ে গেলে সেই পতাকা শেষ প্রান্তে এসে আটকে পড়ে পড়ে করে উড়তে লাগল জনতা উল্লেসিত হয়ে পড়ল। সমস্ত উৎসাহ একত্রে লাগল — এর ছিল। কারণ সকলের মনে সন্দেহ দেখা দিল। কারণ তা সকলের মনে উত্তেজনার সঞ্চার করল। এই সময়ে সেই ইউনিয়নের থেকে তোপের আওয়াজ এলো। জনতা হাততালির আওয়াজে আকাশ বাতাস হল। তোপের দিতে ১৫ বার, পরেরে ৩৫ বার।

মহাত্মাজী এটচু

নিজেদের ওপর তারা কর্তৃত্ব রাখতে পারল না। এই সময় কেউ যদি জনতাকে শান্ত পাইতে না বলত কিন্তু কারণে জনতা আহ্বান হয়তো আরও অনেকক্ষণ আনন্দিকে আনন্দিত হতো। কিন্তু কিন্তু হল না। জনতা পুলিশের লাগল তার ভাঙতে লাগল। সবাই মিলে এগিয়ে এল রাজভবনের মূল ফটকের দিকে। জনতা যা খুশি তাই করতে পারত। বাড়ি ভাঙিয়ে ফেলতে পারত বা আগামী শতাব্দীর ফোরে ফেলতে পারত — যা খুশি তাই করার স্বাধীনতা ছিল জনতার ফেরার কী জীবন। খুব সামান্য কয়েকটি হল, কিন্তুকলের মধ্যেই তারা সমস্তে শান্ত হয়ে গেল।

যখন জনতার উত্তেজনা বাইরে চলে যাচ্ছে তখন রাজ্যের শেষ ব্রিটিশ রাজপাল সাহেব (ড্রেকফিল্ড সাহেব) ও তাঁর স্ত্রীকে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে পড়ল। রাজপালের বেসামরিক সচিব লিন্টোলে রাজভবনের বাইরে নিয়ে গেল। তাদের বিদায় জানানোর জন্য যে সব সরকারী ও বেসরকারী অফিসিয়ালদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল তারা কেউ একটে পারলেন না। সাথে স্ত্রী তাঁর ও তাঁর স্ত্রীকে বাদি বিমানবন্দরে নিয়ে যাওয়া হল (সেখান থেকে তারা বিশেষ বিমানে ইংলন্ডে পাড়ি দেবেন)।

সমাজ ঘটিতে পনেরো মিনিট রাজ্যপাল বিশ্রামকক্ষে তাদের গেলেন। মন্ত্রণা দেওয়া এবং স্বাধীনতার পরবর্তী বিশ্লেষণের জানানোর জন্য। এটা ছিল এতিহাসিক মুহূর্ত।" মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বি. সি. রায় বক্তৃতা করলেন। অনুষ্ঠানটি খুব সংক্ষিপ্ত ছিল। ৯-১৫ মিঃ মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বি. সি. রায় বিধানসভা ভবনের পতাকা উত্তোলন করলেন।

এদিন কলকাতার কত যে পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান হল তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু সর্বত্র একটা ব্যাপার এক ছিল তা হল দু দুজন হর্ষধ্বনি ও উত্তেজনার মধ্যে কত ছিল উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে পতাকা তোলা। হাইকোর্টের পতাকা তুলছেন তখন বিচারপতি সতীশ চন্দ্র মিত্র। টীক (প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট) মিঃ আলি বেজা পতাকা তুলছেন রাইটার্স বোর্ডে, লালবাজারে পতাকা তুলছেন ডেপুটি পুলিশ কমিশনার হরিসাধন ঘোষ চৌধুরী।

সবচেয়ে আকর্ষণীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিলো রাজ্যে, বিশেষ করে 'পাকিস্থান' বলে যারা নামোচ্চ ও পার্ক সার্কাসের কিছু মুসলমান অধিবাসীদের মধ্যে। বেশ কয়েক মাস ধরে এ অঞ্চলে হিন্দুরা

"কোন রহস্য নয়, ইন্দ্রজাল নয় বা জাদুবল নয়, ইচ্ছে করে তৈরী করা ঘূর্ণা, ভয় বা আতংকের বাতাবরণে জীবন পদ্ধতি কিছুই লিখিত ছিল না। মানুষ একে সহজ ভাবে নেয়নি। তারা এর উপর বীতশ্রদ্ধ বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। তারা চাইছিল সাধারন গৃহ জীবন, স্বাধীনতার আনন্দ, উৎসাহ এটা উপলব্ধ মাত্র। তাই ঐ আসই আসা মাত্রই তারা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবো। এবং সকলে মিলে উৎসব পালনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাই এটা কোন জাদুবলের জাদুবলী বা মায়াবিদ্যা নয়। মানুষের ঘটনা সমন্ধে নিজেদের ব্যাখ্যা ও সংগত আচরন।"

স্বাধীনতা দিবসে কিছু ভাবনা

পীযূষ কান্তি রায়

রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রিক ব্যক্তি ছিলেন না। সুভাষচন্দ্রকে শান্তিনিকেতন থেকে ১৯.১.১৯৪১ তারিখে এক পত্রে দ্বিতীয় বারের জন্য তাঁর কংগ্রেস সভাপতি পদে নির্বাচনের ব্যাপারে লিখেছিলেন।" ..... যাঁরা কংগ্রেসের চালক তাঁরা বিশেষ উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে কাজ করা স্থির করেন—আমি রাষ্ট্রিক সম্প্রদায়ের বহির্ভূত মানুষ, সে উদ্দেশ্য আমার অগোচর, সুতরাং অন্যপক্ষীয় ইচ্ছাজ্ঞাপনের বেশি আর কিছু করার অধিকার আমার নেই। সংক্ষেপতঃ তিনি ছিলেন মানবিক কবি, যাঁর জীবনের একটা সহজ সম্বন্ধ ঘটেছে অতীন্দ্রিয়তার পানের হাওয়ায় ডানার শক্তি সঞ্চয় করে। তবুও কিন্তু রাষ্ট্রীয় চেতনা তাঁর মন-প্রাণ অধিষ্ট করে রেখেছিল জীবনের প্রাথমিক পর্ব থেকেই। জ্ঞান বিজ্ঞান, সাহিত্য দর্শন আদি মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশের নানাক্ষেত্রে ইংরেজ জাতির মহান অবদানের মহিমার ঔজ্জ্বল্যে তিনি ছিলেন বিমোহিত। ইংরেজ জাতির এসব মানুষের সৃষ্টির প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানালেও সাম্রাজ্যবাদী মিথ্যাচারী নৃশংস ইংরেজের নিষ্ঠুর ও ভয়ঙ্কর দস্যু ও নখরের আক্রমণের কাহিনী তাঁকে ব্যথিত করেছে, তিনি বজ্রকণ্ঠে প্রতিক্ষেত্রে এসবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন স্বজাতির মান-সম্মান রক্ষার্থে ও মনুষ্যত্বের ধর্মকে রক্ষা করার জন্য। প্রতিক্ষেত্রে তিনি বজ্রকণ্ঠে এসব অনাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হয়েছেন বার বারই কোথাও উপেক্ষা করে। নানা সময়ে তাঁর বিভিন্ন রচনায় কবির এ প্রতিবাদী চরিত্র প্রস্ফুটিত। নিখাদ কবিসত্তা ও দেশপ্রেমের অনির্বাণ শিখা এসব ক্ষেত্রে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। তাই স্বদেশের স্বাধীনতার আন্দোলনেও তিনি ছিলেন এক অত্যন্ত সচেতন রাষ্ট্রিক ব্যক্তি না হয়েও। এ প্রসঙ্গের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল মাত্র ছেলে বয়স থেকে ১ ..। ১ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত হিন্দু মেলা উপলক্ষে সভাশিল্পে তাঁর এক কবিতার জন্ম নিয়ে। সমসাময়িক কালে নিম্ন জনসভায় বালক কবি "অকৃতির খেদ" নামে একখানি পদ্য প্রবন্ধ ও পাঠ করেছিলেন যার বিষয়বস্তু ছিল ভারতবর্ষের ইতিবৃত্ত। দীর্ঘপথ অতিক্রম করে প্রায় কবি তাঁর শেষ জন্মদিনে (২৫ শে বৈশাখ, ১৩৪৮)। অতি বাল্যে পূর্তি হলে যে বাণী পাঠ করলেন তা ছিল "সভ্যতার সঙ্কট" এই শেষ বাণীই হলো দেশপ্রেমিক কবির মৃত্যি নিজের শেষ কথা। ইতিমধ্যে ঘর হয়ে গিয়েছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, দেশের মানুষের মতামত না নিয়েই ইংরেজ ভারতবর্ষকে যুদ্ধরত দেশ বলে ঘোষণা করলে দেশবাসী চাইলো পূর্ণ স্বাধীনতার আশ্বাস। দেশ নেতারা সবাই তখন কারারুদ্ধ। এমন পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি মিস রাথবোন ভারতীয় নেতাদের স্বাধীনতার দাবী অকৃতজ্ঞতার নামান্তর বলে জওহরলাল নেহেরুকে নিন্দাসহ এক প্রবন্ধ লিখলেন। এ আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে কবি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবী জানিয়ে ৪.৯.১৯৪১ তারিখে একখানি প্রবন্ধ রচনা করলেন। দেশের স্বাধীনতার দাবীতে এটিই কবির শেষ রচনা। কবির জন্মদিনের শেষ বাণী "সভ্যতার সঙ্কট" এ তাঁর ভাবনায় দেশের স্বাধীনতার একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ চিত্র উদ্ভাসিত। দেশের স্বাধীনতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কবি বলেছেন," ..... আমাদের স্বাভাবিক সহিষ্ণুতাবশত ইংরেজকে উচ্চাসনে বসিয়েছি। এই গোল টেবিলের প্রথম আসন..... নিকৃষ্টতে সহিষ্ণুতার রসসম্ভোগের উপকরণের বেদীর হতে একদিন আমাকে নেমে আসতে হলো। সে দিন ভারতবর্ষের জনসাধারণের যে নিদারুণ দরিদ্র অবস্থা সম্মুখে উদ্ঘাটিত হলো তা হলো বিদেশী অন্ন, বস্ত্র, শাসীয়, শিক্ষা, আরোগ্য প্রভৃতি মনুষ্যের শরীর মনের পক্ষে যা নিম্নু অত্যাবশ্যক হলে এমন নিরতিশয় অভাব বোধ হয় পৃথিবীর আধুনিক শাসন চালিত কোন দেশেই ঘটেনি। অথচ এই দেশ ইংরেজকে দীর্ঘকালে ধরে তার ঐশ্বর্য জুগিয়ে এসেছে। যখন সভ্যতাগর্বের মহিমা ধ্যানে একান্ত মনে নিবিষ্ট ছিলেম, তখন কোনদিন সভ্যতাগর্বী মনের আবরণে এতবড়ো নিষ্ঠুর বিকৃতরূপ কল্পনা করতেই পারিনি, অবশেষে দেখছি একদিন এ বিদেশের ভিতর দিয়ে কয়কোটি জনসাধারণের প্রতি সভ্যতারতির অপরিসীম অবজ্ঞাপূর্ণ উদাসীনতা উগ্র হয়ে উঠল। এ বাণীতেই কবি ভাষণের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে স্বাধীনতার একটি সংজ্ঞা নির্ণয় করেছেন যা হলো "স্বজাতির মতো সভ্য শাসন।" তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু সংশয়ও ছিল "কিন্তু কেন ভারতবর্ষকে সে বিদায়ে ত্যাগ করে যাবে, কি লক্ষীছাড়া দীনতার আবর্জনা তে।

কবির আশঙ্কা অকৃতই বড় কঠিন সত্যরূপে দুঃস্বপ্নের রাত্রির অবসানের জন্য নিয়ে তাঁর মৃত্যুর মাত্র ছয় বছর পরে প্রকাশিত হলো। মনুষ্যের ধর্ম ও মনুষ্যত্বের মূলবোধকে পরখলিত করে

দেশবন্ধী ব্রহ্মচারিণীদের দ্বারা সংবলিত একজনের অধিকার এ পুরাতনি বিধানসভার তার দিয়ে তাকে ফাইল করা। আমরা তাদের ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন করার জন্য ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট।

২

স্বাধীনতা লাভের ভাষণগুলোর মধ্যে তাঁর ভাষণগুলির পার্থক্যের প্রধান কারণটিকে টানা এবং জাতির জন্য যারা গভীর আগ্রহী তারা তিনি বিশেষ কিছু ব্যক্ত করেছিলেন তার উপর একটি বিশেষ দৃষ্টি স্বাধীনতা লাভের মুহূর্তে রাখতে পারে।

মহাত্মা গান্ধী তখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য নোয়াখালি গ্রামে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিধির ভাষণ জন্য ব্যস্ত কলিকাতায় অবস্থান করছিলেন। স্বাধীনতা দিবসের পূর্বাহ্নে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তাঁকে উদ্বিগ্ন দেখলাম। ... It is a new world and we have to do this if we are to get the fullest advantage of the independence which is coming. Hindus and Muslims must live together and establish the state jointly as their Common endeavour. স্বাধীনতা লাভ করবার আগে কংগ্রেসের প্রধান কর্মীরা মন্ত্রিত্বগ্রহণে রাজি হয়েছিলেন। The Past clings on to us still in some measure, and we have to do much before we redeem the pledges we have so often taken. yet the turning point is past, history begins anew for us, the history which we shall live and act and others will write about. তাঁর মন্ত্রিসভার ভাষণে তাঁর মনীষা যেন পূর্ণ ভাস্বর। ... The future beckones to us whither do we go and what shall be our endeavour? To bring freedom and opportunity to the common man, to the Peasants and workmen of India. To fight and end Poverty and ignorance and disease. To build up a Prosperous, democratic and Progressive nation and to create social, economic and Political institutions which will ensure justice and fulness of life to every man and woman..... we cannot encourage communalism or narrowmindedness, for no nation can be great whose people are narrow in thought or in action. তাঁর ভাষণের প্রধান টানা মনীষার সন্ধানের।

The victory against foreign domination which we celebrate today is the common victory through of our own citizens. But it is not the end of our path Millions face Privation, hunger and disease and to conquer these, Petty quarrels will need to be forgotten ... তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী স্বাধীন ভারতের। Our Primary duty is jealously to guard our freedom against danger from without and from within. We have also to ensure that the humblest among us has the same stature as the tallest in the land, that the labourer gets the legitimate share of its produce, that the toiling millions in village obtain just return for the sweat of the brow and that the state discharges adequately the elementary duty of feeding, clothing, housing and educating every son and daughter of the Motherland. ... Our hearts naturally go out to those who were of us and with us so long but who are now to be separated. Few can realise the heaviness and sorrow which partition has brought to those who cherished unity but lived to fashion its details. But for all our brethren across the border feel that they are neglected or forgotten. Their welfare will claim our vigilance and we shall follow with abiding interest their future in full hope and confidence that sooner than later we shall again be united in common allegiance to our country. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বক্তব্যটি আছাই যে কি, মুসলিমদের জাতির উদ্দেশ্যে তাঁর আবেদন ..... Let us not be disheartened because freedom has not come in the full glory of a united India. ... we accepted this separation, however Painful, because freedom from foreign rule was the imperative necessity of our national existence and unity without freedom had turned into disunity. Freedom achieved, unity may return, a unity greater than we had before..... Let every citizen pledge himself today to lend all his energies to the building of a democratic society based on social justice where all Power shall reside in the people and all citizens shall have equal opportunities of development. Today, our enemy is not outside us but within us. Hunger, poverty and disease, ignorance, prejudice and frailty and above all the spirit of violence and disorder let loose by communal passions are our real enemies. Against these enemies we have to marshal our forces.

অন্যত্রও, আমরা আগেই দেখেছি তখন চারদিকে ঘিরে দেশের আকাঙ্ক্ষার জন্য খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আবাসনের ব্যবস্থা করা আর যা করতে হবে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে। গণতন্ত্রের বিকাশের বিষয়ে তাঁর ধারণা বিষয়ে তাঁরা ছিলেন স্পষ্ট, তাঁরা তার কোন অবাধ্যতা হতে কাজ তাঁরা আবার পারেন কি। দেশের অভ্যন্তরে সমস্যাগুলি তাঁদের তাঁরা ছিলেন সচেতন। তাঁরা পরিচালনে ছিলেন, ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক বিভেদ প্রকটিত সর্বাত্মক সংহতির যে ধারণা গড়ে তুলতে দেশের সংবিধান বিভিন্নে পরিচালিত তাঁর পরিচয় প্রকাশের তুলনা পাবে।

স্বাধীনতা লাভের পর দুবার বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। পূর্বোল্লিখিত প্রতিজ্ঞাসমূহ পূরণের ও জাতির সুফল লাভের জন্য এ দীর্ঘ সময় কম নয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ঐসব ভাষণ পুনরায় পাঠ ও অনুধাবন দীর্ঘ তিরিশি বিষয়ে কিছু বলা যায়। তবুও আমাদের পাঠের সময়ের ব্যবধান থেকে আজকের দৃষ্টিকোণ কিছুটা ভিন্ন হয়ে পরিস্থিতির তথ্য নিয়ে আলোচনা করছি উপলব্ধি ঘটেছে, তার বিষয়ে বর্ণনা করা যায়।

পরিষদ প্রসঙ্গে কথা নিয়ে একটি কথা বলতেই হয়। আমাদের দেশ ইংরেজ শাসনের দৃষ্টিকোণ দেশ হয়ে পরিচিত ছিল। বৈচিত্র্যই তার বিভিন্ন আকার দেশ যে শাসি দেশ-দেশের দেশের না দেশ নানার আকাঙ্ক্ষা জাতির দৃষ্টিকে দেশেই আকাঙ্ক্ষা। আবার এ দৃষ্টি ও আদেশ নয়ন ইংরেজদেরই সৃষ্টি ছিল। দেশের ১৯৪৭ সালে আকাঙ্ক্ষার সমাজ, যা তাদের নয়ন দৃষ্টিগত আমাদের হয়েছিল আজ আমাদের। সে আজ আকাঙ্ক্ষা ছিল না, ছিল বিশ্বযুদ্ধ-পরিচালনার জন্য ইংরেজের আজ আমূল নয়ন প্রয়োজন। সেই সুযোগে আমরা

ফাঁসির আগের দিন তাঁকে শেষবারের মতো দেখতে এসেছেন তাঁর স্ত্রী ও কন্যা।

ব্রহ্মদেশের ও বাংলা মানুষ কখনও খুন হয়ে যাওয়া ও অন্যায়ভাবে মৃত্যুর মুখে পড়েছিল পাকিস্তানী। তাদেরকে বুকের অভ্যন্তরে পাহাড়-সমান নিজের প্রতিটির শ্রেণীর মানুষের নিজেই বাসস্থানের তৈরি না পাওয়ের ব্যাপারে বৃদ্ধিজীবী, দিনমজুরের অন্যান্য দিন আলো-দিন পাওয়া মানুষের উপর এ দুর্ঘটনের কোন পড়েছিল না প্রভাবকরবে। তাদের ক্রমবর্ধমান ছিল না। তারা ভোক্তাদের কোন পথ ছিল না।

তাদের অনেকে ভিক্ষাবৃত্তিতে কলকাতায় এসে পথে রাজধানীতে একমুঠো ভাত বা জন্যের জন্য প্রার্থনা করে বুভুক্ষার ঘুরবার ফিরেছে। এমনও দেখা গেছে মৃত-মায়ের স্তন মুখে দিয়ে কঙ্কালসার শিশু পড়ে আছে ফুটপাথে। এই দুর্ঘটনে বাংলাদেশের পরীক্ষাগারী জমির মানুষের মৃত্যুর ভয় ঠেকেছিল পাকিস্তান সঙ্গে। তা নিয়ে বিদেশী সরকারের কোন মাথাব্যথা ছিল না। অথবা অসংখ্য মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কোন কার্যকর ব্যবস্থা হয়েছিল। গ্রামের মানুষের জন্যও কারও মাথাব্যথা ছিল না। তা নিয়ে আন্দোলন করার ও কেউ ছিল না। তা নিয়ে সংঘের বীর সন্তান পাকিস্তানের পুরস্কারী লিখেছিলেন 'পঞ্চাশের মন্বন্তর'। এমন বিশ্বাসের সময় বিদেশী সরকারের আমলের স্বদেশীয় কর্মচারিদের অনেকের ব্যবহারও ছিল পর নির্মম। ১৯৪২ সালের শেষে যখন তাদের উত্তরবঙ্গে চালানো করার ঐ অঞ্চলে সমূহ প্রলয়ঙ্করী ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছিল। কলার ঘটিয়ে মানুষের জন্য সরকারি সাহায্যের পরিমাণ ছিল মাত্র তিন হাজার টাকা। এর আর পরিমাণ অর্থ সাহায্যের ফলকে বৃদ্ধি দেখিয়ে পরপর এক্সিকিউটিভ কোর্ট পলের সদস্য পরিষদের মহারাজা সে সময় বলেছিলেন — সাদকে কোন কারণ ঘটেছিল না। পাকিস্তানে সরকারতন্ত্রে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাবর্ষে আজকে পরিষদের মধ্যে কোন সরকারকে নয় এ জনসাধারণ আর এক্সিকিউটিভ অফিসার ও কর্মচারিদের সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু বুভুক্ষা না থাকলেও নিষ্ঠুর পরিহাস যে ক্ষুধা বা ক্ষুধার মানুষকে জড়িয়ে নেই সে কথা বলার বলে এসে যায় না। পরিস্থিতিকে ঢুল-ভেজা হিসাব করে যেমন অনাবৃষ্টি এ হয়েও এসে যায় তেমনি মানুষের ভয়াবহতা ব্যাপক কারণে, অনিবার্য প্রাকৃতিক ঘটনাতে ভয়াবহ মহামন্বন্তরের ভয় মানুষ ব্যাপক ও সর্বগ্রাসী হয়ে পড়তে পারে।

এখনও বৃষ্টিসম্পাতেই মানুষকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে যা কোন সভ্য স্বাধীন দেশের পক্ষে কলঙ্ক বিশেষ। চোখের সামনে উড়িষ্যার ভয়াবহতি এক ভয়াল দৃষ্টিত্ব। একটি স্বাধীন দেশে ঐ অঞ্চলের মানুষ নিরাপত্তার অভাবে কেন এমন পরিস্থিতির শিকার হতে দিন কাটাবে? এর কি কোন প্রতিকার নেই? সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার এক আধিনীও এ প্রসঙ্গে স্মরণ। আমি আরও পঁচিশজন বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিদের মতো সভাপতি এবটি বিশিষ্ট আমন্ত্রণ আমার কাছে পেয়ে আমি সাহসের কাজকর্ম সাধারণ দেশবাসীর জন্য একজন অভিজাত আন্তর্জাতিক সাহায্যের প্রস্তাবক হয়েছিলাম। সে কাজে সবে একজন এসেছে। তার পরিবারে আছে স্ত্রী ও তিনটি শিশু সন্তান নিয়ে। তাদের তাদের এক বাড়ি নিয়ে ভেলোর এক ছাত্রের আমার জন্য একটি বাসস্থান একজন প্রস্তাব যা পাকাপাকি আমাদের চরম দুর্ঘটনা বাড়ি নির্মাণ হয়ে যাবে। ছাত্রের অভিভাবক বলে মনে করে কাজ ও তার স্ত্রী ছিল খুব মহৎ। তার বন্ধুদের কাছে সাংবাদিকদের নির্দেশ হয়েছে এমন কাজকে ঘটনার ঘটিয়ে আমি কোন মুখোশ না আসায় ওরা আমাকে চরে এসেছে বাঁচার চাহিদে। একজন ভেলোরী এক মহীয়সী ভেলোরীর সোজাসুজি শিক্ষাদীক্ষা, তাই ভেলোরির কাজ শেষে কাজ হলে, আমাদের দুটি আন্তর্জাতিক প্রথম নিয়ে কম সাহসের আর দুটি চারটি ভাড়াটে কাজ করে কোন সময়ে প্রাসঙ্গিকভাবের আমার করে। কথা করার বিষয়, ভারতীয়দের পর মর্মপরাক্রমী ঘটনাবলি, অথচ দেশে এরম শত শত মানুষ আমার ব্যক্তিগত ওরা দুটি ভেলো যাতে উচিত পুরস্কার জন্য, তাদের সন্তানদের শিক্ষাদের মুখের কথা। এদের চিত্র মহাদেশীর যা পরে কাজ নয়ে আমরা উপলব্ধি করতে চেষ্টা। বাসির ভাড় থেকে কথা পাওয়ার জন্য কলকাতায় উটনির মতো বাসিকে মুখ ভুলে আমরা আমে ঘটি ভেলো আমাদের আমাই চলছে। কিন্তু ভেলোরের না। ভেলো অনেক গড়িয়ে, যার মূল্যায়নটান করতে না পারলে আমাদের এ ঘটনিরা আমাদের কাছেই মনে হবে প্রকল্পনা। কলম ওরাই কাজ করে, ওদের পরিস্থিতির উপর নির্ভর করেই আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতির ঘর-আমাই। ব্যক্তিগতের নিয়োজনাই হলো প্রথম। আরিস্টটল (Aristotle) বলিত সমাজ ও সংস্কৃতি প্রতিপালনের জন্য এমন ব্যবস্থাকেই স্বাভাবিক বলে নিয়ম নিয়েছেন, কিন্তু আধুনিক যুগে ভেলোরী চলতে পারে

একবিংশ শতাব্দীতে দেশের স্বাধীনতা লাভের অর্ধশতাব্দী পরেও রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দর কণ্ঠস্বর মিটে এখন অমানবিক ব্যবহার সহ্য করতে হচ্ছে মানুষকে! তার জন্য এসব অপরাধীদের কোন শাস্তি হয়েছে বলে আর শোনা যায়নি। যেন ব্যাপারটা তেমন কিছু নয়। অথচ সেই ঘণ্টাধ্বনির টানের মতো নাক-খুত উঁজে পড়ে থেকে দেখিনা দেখিনা তাবদেখালেও এর অভিশাপ থেকে আমাদের নিস্তার নেই। রবীন্দ্রনাথ কবি হয়েও টানের ধর্ম অবলম্বন করতে পারেন নি। যেখানে সমাজের লক্ষ্য করেছেন মানুষ্যত্বের অবমাননা সেখানেই বজ্রকণ্ঠে দেশবাসীর জন্য উচ্চারণ করেছেন সাবধান বাণী। আজ থেকে প্রায় একশতাব্দী পূর্বে (২০ শ্রাবণ, ১৩১৭) তাঁর রচিত 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ' কবিতা খানি আজ পুনরায় আমরা স্মরণ করতে পারি।

না। দেশের একটি বৃহৎ অংশের মানুষ এখন দারিদ্র্য ও অশিক্ষার শিকার হয়ে আছেন। এ সমস্ত দেশের পক্ষেই নিন্দনীয়। এ তুলনায় চীনের বা জাপানের কথা নাই বা বললাম। তাদের কথা বলতে গেলে তাদের সঙ্গে আমাদের তুলনা দিতে হয়। তবু আইন-শৃঙ্খলার এত ভয়াবহ চিত্র বস্তুত চিন্তা করা যায় না। অথচ এসব ঘটনা ঘটছে। তাই এগুলি নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন।

প্রাচীনকালে রাজদণ্ডের আঘাতের ভয়ে মানুষ অপরাধ থেকে বিরত থাকত। এখন রাজদণ্ড বুঝি দেখাচ্ছে বিদ্রূপ, শিক্ষিতজনের। কিন্তু তার চেয়েও বেশী ভয়ের কথা, দেশের আইনের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলা। এমন অপরাধীর সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছে, যারা আইনকে ভয় করে না। আইনের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছে। এমন অপরাধীদের নিয়ে আমাদের সমাজ। অপরাধীরা সমাজের মধ্যে থেকে সমাজের ক্ষতি কর

(২০ আগস্ট, ১৮১৭) তাঁর পরিচিত 'যে যেমন বুঝিবামাত্রেন' কবিতা খানি আজ পুনরায় আমাদের স্মরণ করতে পারি। আমাদের এই মহান দেশ যে বিশেষত্বের জন্য সারা পৃথিবীর কাছে শ্রদ্ধার্হ ছিল। এর ২৫টা সম্প্রদায় কবির 'যবে রাইবে' ইঙ্গিতে হিন্দু-মুসলমান বিরোধের বিষয়ে অন্যরূপ বিশ্লেষণের সফল করতে পারি। মূল হলো সমস্ত সম্প্রদায়ের মূল। এর মূলোৎপাটন করতে সর্বাত্মক আক্রমণ চালাতে হবে, তবেই প্রযুক্ত হয়ে উঠতে পারবে সংস্কারমুক্তির ও জাগরণের, যাতায় মানুষ লাভ করতে সক্ষম হবে অমৃতের সন্ধানের আজ আমরা অনেক এগিয়েছি তার নিরন্তর সন্ধানকারিণী চেতনাকে পরিণত জীবন-উপলব্ধির জীবন দর্শন। কিন্তু সুখের কথা হচ্ছে সে আকৃষ্টিজ্ঞাসার ও প্রয়োজন হয়েছে আজ। তাঁ নিলেন চন্দ্র সেন কবিগুরু পূর্বে রচনা করে গেছেন তাঁর নিজের গ্রন্থ 'সুবৃৎ বঙ্গ'। ঐ গ্রন্থের এককালীন খুশীর পরিশ্রমের এক অসাধারণ কৃতিত্ব নিয়েছেন। তাদের ঐতিহাসিক পুরুষে নীচু জাতির অবদান তুলে ধরা হয়েছে। তাদের মূলমান হয়েছে। যেই ঐ ইতিহাসিক নীচু জাতির অনুযায়ী ইসলাম গ্রহণ করে পুনরায় ঐ পুরুষে জল আনতে গেল, তখন সমাজ বুঝ বন্ধ, কারণ এবার সে আর নীচু কুলজাত হিন্দু নয়, সে মুসলমান হয়েছে, তাকে তার দেওয়ার ক্ষমতা আর নেই। ইতিমি সাইদুলের এক পাইত মনুষ্যের হাতে ফেটে দেওয়ার দাবীর পশ্চাতের শক্তির ছিল তার ও তার জাতির প্রতি খ্রীষ্টিয়দের ঘৃণা আর তা থেকেই জন্ম নিয়েছিল তার প্রতিশোধ স্পৃহা। আমরা আজকাল পাঠ্যসূচীর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছোটছিলবাবু পড়ান-পড়াশোনা

চন্দ্রাবলী পুরুষ পড়েন রাইবি, ঐতিহাসিক।

করে চেতনের উপর আলোচিত। পড়া করতে পারেন কিনা, মনুষ্য পারে আলোচনাতে। আজকের সমাজে তা প্রায় বন্ধ হয়ে গেলেও আন্তর্জাতিকতার বিকাশের ফলে, অন্তত পুস্তিপত্রে আমরা যে অনেক বেশী লিখিত হয়েছি আমরা-কলমে।

গবেষণার পরীক্ষার আমরা উন্নতি হয়েছি ঠেকে আমরা আমরা লাভ করে থাকি। কিন্তু গবেষণার মূলে যে দিন দিনে প্রথাটি ঘটবে কম আলোচনা ও মতিয়ার আর বিষয়িনিয়া জন্ম চলেছে। ইংরেজ শাসনমূলে এক সময় মনুষ্য আইনিজ আইনীর আলোচনার হয়েছিল। তেন আমরা ছিল যোগ্য তুলনী পারা। এই আলোচনার প্রথম কয়েই তাদেরকে সমস্যার আন্তর্জাতিকতার লিখিতে পারা নিয়েছিল আমরা। আর ইতিহাস লিখে গেছেন আর ইতিহাস লিখিল আছি ঘটে থাকবে। কিন্তু একটা কথাতে বলতেই হয় প্রাচ্যের কেন ইতিহাসের পশ্চাতে হয়েছিল প্রাচ্যেরই কৃতকর্মের ফলে। এ আমাদের আন্তর্জাতিকতার নামেরোহন ও দুঃখ নয়। পক্ষ করা যাচ্ছে ত্রিবার্ষিক আলোচনের মেধাবেন/মেধাবেন এর পর থেকে তিনি যে ইতিহাস লিখে ছিলেন তার কারণ ছিল ত্রিবার্ষিকাদের ভূমিকায় সমস্ত বর্তমানের এতিহাসের নিয়ে কর্তৃপক্ষ আমাদের ঐতিহাসিক

> "আমাদের পরিপক্ক গণতন্ত্রে যে ক্রমবর্ধমান অবক্ষয়ের সূচনা হয়েছে তা পরিবর্তন না করে দেশের সার্বিক মঙ্গল বিধান করা সম্ভব হবে না। রাষ্ট্রনায়কদের জীবনদর্শনের মৌলিকোঠায় কিছু পরিবর্তন আনার কাজ আজ অত্যন্ত জরুরি।"

কলকাতার বুকে শুরু হয়েছিল প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ

কালিদাস হাজরা

বস্তুত পক্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও শোষণের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের সর্বাত্মক মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্রেও কলকাতা হল ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ। সেই সময় ভারতের গভর্ণর জেনারেল ছিলেন লর্ড ক্যানিং। তখনো মহাবিদ্রোহের ক্ষেত্র হয় আগে থেকেই, অর্থাৎ ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের পর থেকেই তৈরী হচ্ছিল। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক প্রভৃতি কারণে সমগ্রদেশীয় জনগণ একেবারে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অভিযোগী হয়ে উঠেছিল। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ। ফুলাড়া-বিদ্রোহ, মাঝাজী, ওয়াহাবী, ফেলা-বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ প্রভৃতি সব বিদ্রোহগুলি ছিল বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। শেষ পর্যন্ত তাহা অভিযোগ পরিণতি বিস্ফোরণে রূপ হয় ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ।

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ আকস্মিক কোন ঘটনা নয়। ক্রোশপ্রসিদ্ধ ভারতীয় সিপাহীরা তাদের দীর্ঘ পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে এই বিদ্রোহ। সিপাহীদের মধ্যে প্রথম সংগঠন কলকাতায়, তবু — সিপাহী-বিদ্রোহ বলা যায় না। কারণ কেবল মাত্র সিপাহীদের মধ্যেই বিদ্রোহ সীমাবদ্ধ ছিলনা। তার অনেকদিনের মধ্যেই সাধারণ জনতার মধ্যেও বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল। তাই ঐতিহাসিকরা ১৮৫৭-র অভ্যুত্থানকে — "মহাবিদ্রোহ" বলে অভিহিত করেছেন।

মাইত্রোক ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের একাধিক কারণ ছিল। কারণগুলি, যথা — রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, এই পাঁচটি কারণে বিদ্রোহের ক্ষেত্র তৈরী হচ্ছিল, তখন একমাত্র প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল একটি ফেলনাই কাটি, যেই ফেলনাই কাটি ব্যবহার, ঠিক তাই সময় ভারতীয় সিপাহীদের এক নতুন ধরনের বন্দুক দেওয়া হয়, তার নাম, — "এনফিল্ড রাইফেল। এই বন্দুকের টোটা দাঁতে কেটে ব্যবহার করতে হয়। সিপাহীদের মনে (হিন্দুদের মনে) ধারণা হল যে টোটায় গরুর ও শুকরের চর্বি মিশিয়ে আছে। এতে দুই দিকে হিন্দু ও মুসলিমদের জাতিনাশ হবে, এটা বৃটিশ সাম্রাজ্যের খুব অভিসন্ধি, তাই সিপাহীরা এই টোটা ব্যবহার করতে অসম্মত হল।

২

১৮৫৭ সাল ২৯ মার্চ, ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম বিদ্রোহ যা আরম্ভ হয়ে ঐতিহাসিক কলকাতার বুকে আহারুপুরের ৩৪নং সেনা নিবাসের প্রধান গেটের কাছে, কলকাতায় প্রথম ভূমিকা এখানেই শেষ ছিলনা, বরঞ্চ গোটাকে নদী করা হয়, বিদ্রোহে তাঁর আগমন হয় এবং ফাঁসি দিয়ে তাঁকে হত্যা করা হয়।

২৪ এপ্রিল কলকাতার সময় ১০ জন সিপাহী এনফিল্ড রাইফেল ব্যবহার করতে অস্বীকার করলে বৃটিশ সরকার তাদের কোর্ট মার্শাল করে। তার পরিণামে ১০মে মীরাটের সিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ঠিক এই সময়ই কলকাতার প্রথম আগুন জ্বলে উঠতে পারেছিল, সৃষ্টি হয়েছিল ভারতের স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধ। শেষ পর্যন্ত কলকাতার যুদ্ধে নেতৃত্বের দায়িত্বের ৩৪ নং পল্টন ছেড়ে দিল বৃটিশ সরকার।

শেষ পর্যন্ত এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছিল। তবুও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে সামরিক ভাবে ধ্বংসকে রুখিয়ে দাঁড়িয়েছিল, তাদের ভাবকে মুছে ফেলে দিয়েছিল সিপাহীরা।

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের প্রকৃতি বা ধরণ সম্পর্কে বিভিন্নের অবকাশ থাকলেও তা নয়। কেউ বলেছেন — নিছক সিপাহী অভ্যুত্থান। কেউ বলেছেন — সিপাহীদের বিদ্রোহ।

— যাই হোক আধুনিক ঐতিহাসিকেরা তাদের ও তাদের মতামত বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন আজ এটা সিপাহী বিদ্রোহকে ছাড়িয়ে প্রথম গণসংগ্রাম বলেছেন।

এবার দেখা যাক তাঁদের যুক্তি কতটা কি কি,— জন লর্ন, ডাক, আলেকজ, ইউলিয়াম ডে, অধুনা আধুনিক ঐতিহাসিকদের ১৮৫৭ সালের মহা বিদ্রোহকে একটি গণ বিদ্রোহ বলেছেন।

ডিঃ সাভারকর তাঁর বই, — "The Indian war of Independence" বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর মহাবিদ্রোহকে ভারতীয় সংগ্রাম রূপে অভিহিত করার প্রবণতা দেখা যায়। কারণ তিনি ও—"১৮৫৭এর প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ" বলেছেন। কিন্তু ঐতিহাসিক - 'এরিকস্টোকস', তিনি মহাবিদ্রোহকে জনগণের অংশগ্রহণের কথা বীকার করতে চাননি, কিন্তু কেমব্রিজ ঐতিহাসিক সি, এ - বেইলি, স্পষ্ট ভাবে ঘোষণা করেছেন, — বিদ্রোহের শুরু থেকেই আমলাতান্ত্রিক জনতার অংশগ্রহণ ও সিপাহীদের আন্দোলন পরস্পরের পরিপূরক ছিল।

ঐতিহাসিক শচীন্দ্রনাথ চৌধুরী তাদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় যুদ্ধ এবং একটি গণবিদ্রোহ। কারণ বিদ্রোহীরা বিদেশী শাসনের সমাপ্তি ঘোষণা করে, জাতীয়তাবাদী মনোভাবের যথেষ্ট পরিচয় বহন করে থাকলে।

ঐতিহাসিক রঃ মুখোপাধ্যায় তো বলেছেন — ১৮৫৭ সালের যে অভ্যুত্থান,

প্রথমে সিপাহী বিদ্রোহ বলে তাকে ও এই বিদ্রোহে সিপাহীদের ভূমিকা স্বীকার করা হলেও অন্যান্য সব বিভিন্ন প্রদেশে সেদিনের এই বিদ্রোহ জাতীয় সংগ্রামে পরিণত হয়েছিল।

১৯৪৭ বিদ্রোহের সঙ্গে পরবর্তীকালের স্বাধীনতা সংগ্রামের যে নানা ধরনের আন্দোলনের যে বিচ্ছেদ-বিশ্লেষণ করলেন ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহকে তার ও পলাশীযুদ্ধের ঘটনার ও মূল্যায়নকে পরিষ্কার করেন তেমন।

যেমন ইংরেজ নেতৃত্বে আইনি প্রথায় আন্দোলনে মাত্র ১ লক্ষ ভূস্বামী জমায়েত করে ছিলেন, কিন্তু ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহে আন্দোলনে নেমে ছিলেন লক্ষাধিক সিপাহী, কৃষক, কারিগর, এবং তারা ভূস্বামীদের-ও বিপক্ষে ছিলেন।

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের ভূমিকায় যে প্রথম জাতীয় সংগ্রাম, সে প্রসঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ মূল্যায়ন রয়েছে রজনী পাম দত্তের "ইন্ডিয়া টুডে" — "যদি প্রমাণিত কোটি মানুষের মনে মাত্র এক দিন স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম বলিয়া গণ্য হইতে পারে, তবে কোটি কোটি মানুষের সর্বস্পর্শী সংগ্রাম ও লক্ষাধিক ভারতবাসীর আত্মবলিদানকে জাতীয় সংগ্রাম বলিতে দ্বিধা কিসের? ভারতের জনসাধারণের প্রতি চরম অবমাননা এবং চরম জনবিরোধী মনোবৃত্তিরই পরিচায়ক।" কাজে কাজেই ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ভারতের ইতিহাসে এটাই প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ।

অবশ্যে কলকাতা মহানগরী ছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূতিকাগার। এই কলকাতাতেই স্বাধীনতার প্রথম মুকুলোদ্গম। এক সময়, গোটা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছে — এই মহানগরী কলকাতা।

বাইরের প্রকৃতির মানুষের কাছে বাংলার এ অঞ্চলের কথা।

পলাশীর প্রান্তরের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে স্বদেশী আন্দোলনের গুরুত্বকে যেমন ভাবে ১৯৩৮ সালে ব্যক্ত করা যায় না। যে দিনের এই আন্দোলনের সময় ৯৮ বছর বয়সে যে ভাবে টীকেন্দ্রনাথ এসেছিল, ইতিপূর্বে তার যেমন নিদর্শন পাওয়া যায়নি।

১৯৩৮ — এপ্রিলে এই স্বাধীনতা আন্দোলনের এ ঐতিহাসিক আন্দোলনের যেমন ঘটে, যেমনটি ঘটেছিল, তেমন আগে, তেমন এমনটি হয়নি।

১৯৩৮ সালে এপ্রিলে এই স্বাধীনতা আন্দোলনের যেমন ঘটে, যেমনটি ঘটেছিল, তেমন আগে, তেমন এমনটি হয়নি।

এ ঘটনার আসল কথা ছিল, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ঐতিহাসিক ভূমিকা নিয়ে ছাত্রসমাজের নেতৃত্বে বৃহত্তর নাগরিকসমাজের স্বাধীনতা চেতনার উদ্বোধন।

যেদিন এই কলকাতাতে কুড়ি বছর বয়সে ঐতিহাসিক ভূমিকা নিয়ে সুভাষচন্দ্র বসু ছাত্রদের নেতৃত্বে ছিলেন, কলকাতার বহু ছাত্র ও নাগরিক যারা ছিলেন তাঁরা সকলেই ঐতিহাসিক ভূমিকা নিয়ে ছিলেন। কলকাতার ঐতিহাসিক ভূমিকা নিয়ে ছিলেন। কলকাতার ঐতিহাসিক ভূমিকা নিয়ে ছিলেন।

এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় — পরাধীন ভারতে বাঙালির সর্বপ্রথম এবং শেষবার হিন্দুমেলা, উদ্যোক্তা, দেশীয় শিল্পের প্রদর্শনী, জাতীয় সংগীত, বক্তৃতা, প্রবন্ধ নিয়ে যে সূত্রপাত ঘটেছিল কলকাতার বুকে।

অর্থাৎ ১২ এপ্রিল ১৮৬৭ সালে বেলগাছিয়ার ১৯নম্বর সাহেবের বাগান বাড়িতে প্রথম হিন্দুমেলা বা স্বদেশী মেলার উদ্বোধন হয়েছিল। বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরামর্শে, নবগোপাল মিত্রের উদ্যোগে, এবং সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুকূলতা স্বদেশী মেলার জোগে উঠেছিল।

সৃষ্টি হয়েছিল — "জিগে মনে ভারত সন্তান" স্বদেশী সঙ্গীতের ইতিহাসে এই গানটি ছিল অবিস্মরণীয়, এছাড়া ঠাকুরবাড়ির সকলের বহু ভূমিকায় কথা যে সকলের জানা। এক কথায় কলকাতা মহানগরীর জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে স্বদেশিকতার এক অপূর্ব স্রোত বয়ে চলতে থাকে (প্রায় একশ বছর ধরে) এই পথ

১৮ ই ১৯৪৭, লর্ড মাউন্টব্যাটেনের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান।

উঠেছিল সত্যেন্দ্রনাথের বা স্বদেশি আন্দোলনের এক বড় যোগসূত্র ধরে।

রবীন্দ্রনাথের জীবন স্মৃতিতে পাওয়া যায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তিনি তাঁর পরিবারে কাজেই একটি স্বদেশিকতার পরিবেশ সৃষ্টি করে রাখতেন।

অপর দিকে শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে এক নতুনত্বের পরিবেশ গড়ে তুলে ছিলেন তাঁর বড় ভ্রাতা — রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৪-১৯২০) ছিলেন প্রথম ভারতীয় সিভিলিয়ান।

হয়েই একদিন সহিংস বৈপ্লবিক আন্দোলনের কুশিলব হয়ে উঠেছিল কলকাতার চারুচন্দ্রিরা।
১৯০৫ সালের বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলন হয়ে পড়ে প্রধান।

১৯০২ সাল, ২৪ মার্চ কলকাতায় অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠার আগেই বাংলার বিপ্লবের কর্মপদ্ধতি সংগঠনিক রূপ পেয়েছিল। এই অনুশীলন সমিতি স্থাপন করেন ৩ নম্বর বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিটের (অধুনা আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড) বাড়িতে। ১৯০৩ সালে এর নিজস্ব বাড়ি হয় ৪৯ নম্বর কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটে (বর্তমান বিধান সরণি) স্থানান্তরিত হয়।

তারপর ১৯০৬ সালে মুগান্তর নামে সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রকাশ, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ নেতৃত্ব কলকাতার মুগান্তর এর সঙ্গে যুক্ত হন।

১৯০৪ সাল, ইংরেজদের লর্ড-আর্লদের বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত দিল ১৬ অক্টোবর বাস্তবায়িত হতে এদে কলকাতা সহ গোটা বাংলা ও ভারত প্রতিবাদে সামিল হয়। কলকাতার শহরে আর পুন পরিণত হয়। বঙ্গ ভঙ্গের দিনে জোড়াসাঁকো কলকাতা মহানগরির অধিনিত মনুষ গঙ্গা স্নান করে রাজপথে — "বন্দেমাতরম" ধ্বনি দিতে দিতে শঙ্খ পরিক্রমা করেছিল। 'রাখীবন্ধন' অনুষ্ঠানের প্রস্তাব দিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের এই ঐক্যের ভাবীক হিসাবে পালিয়ে হয়। শুধু তাই নয় কলকাতার রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা ছিল আরো বাস্তব সৃষ্টি করলেন গান — (১) বাংলার মাটি বাংলার জল, (২) আমি বাংলার কোকের হৃদয় হতে, তবু তি প্রবেশ প্রবেশ গান আজও কলকাতা বাসীকে প্রেরণা দেয়।

সৃষ্টি হল অসংখ্য আন্দোলনে এক হল স্বদেশি যুগ। এই সময় সম্পূর্ণ দেশীয় পদ্ধতিতে বস্ত্র-সংগঠন স্থাপনের নতুন অর্থনীতির ইঙ্গিত দিয়েছিলেন রবি রবীন্দ্রনাথ। কেবল সভা সমিতিতে উপস্থিত হয়েছিলেন ৪০ হাজার, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে হাতে ছিলেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ" এগারোটি আন্দোলনের সদস্যদের পরিচয়টি ও তুলে ধরে ছিলেন। পরিচ্ছন্নতার ব্রাহ্মণ সমাজে, পড়ুয়ে ছাত্রদের ছুটির দিন

বীরেন্দ্র কুমার ঘোষ

কুমার অরে আন্দোলনের করার যে আহ্বান জানিয়ে ছিলেন তার তাৎপর্য আজকের দিনেও ফুরিয়ে যায় নি। যে দিনের শত বছরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতিবেদ কলকাতার আকাশে ফুটে উঠেছিল। কলকাতাবাসী তা কোন দিন ভুলতে পারবে না।

ইতিমধ্যে কলকাতাকে কেন্দ্র করে ঘিরে ঘিরে আন্দোলনের আগুনকণা ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্রদের স্বাধীনতার আন্দোলনে এক নতুন মোড় নিয়ে ছিল।

১৯০৮ সাল।

ব্রেজফোর্ড কিংসফোর্ড, বাঙালি ছেলে প্রফুল্ল চাকীকে হত্যা করেছিল। মজফ্ফরপুরে ঘটনাস্থলে ফুরাইদিরামকে এক বোমার গাড়িতে ছোড়া হিসেবে এক ভুল করেছিল। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবে বোমারহস্য ফুলবী পুকুরের নাম ইতিহাসে লিখিত। আবদ এই বোমার গাড়ির বিরোধী আন্দোলনের ফলে বিদেশী কাপড়ের বিরুদ্ধে বয়কটের দৃঢ়তর প্রকাশ ঘটেছিল।

কলকাতার উচ্চ শ্রেণিশ্রেণী আন্দোলনটি হিসাবে বিদেশের একচেটিয়ে অধিকারের অধিকৃত হয়েছিল নির্বাচ পরিচালনের জন্য দৃঢ়তার ছিলেন।

বৃটিশ সরকার এই বিপ্লবোদ্যোগকে নিয়ন্ত্রণের জন্য কলকাতা থেকে মজফ্ফরপুর — এ বদলি করে দিয়েছিল কলকাতা তথা বাংলার বিপ্লবীরা এঁকে কেন্দ্রস্থলেই রেখেই দিতে চেয়েছিল। এ প্রসঙ্গে কুদিরামের ফাঁসির কথা পড়ে।

শেষ পর্যন্ত বঙ্গ বিভাজনের হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্রকরে ইংরেজ গোয়েন্দাদের কর্তৃত্বপরতার কলকাতার বুবলী পুকুরের বিপ্লবী কেন্দ্রস্থল গোপন ঘাটির সন্ধান পেয়ে যায়। ১৪ বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সেটাই বাংলার ইতিহাসে — আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা নামে ১৯০৭ সাল পর্যন্ত বিচার বিভাগীয় ঘটনা ঘটে।

ঠিক এরপরেই স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ পর্ব অর্থাৎ ১৯৪৬ সালের আগস্ট ছাড় আন্দোলনের প্রথম কুশিলব ছিল কলকাতা।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপ্লবী মর্মবস্তু

সুজিত পাল

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। ব্রিটিশ শাসনের অবসান হয়। ব্রিটিশরা ভারত ছেড়ে চলে যায়। এই ঘটনাটি ভারতের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এর ফলে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ভারতের ইতিহাসে স্বাধীনতা সংগ্রাম একটি গৌরবময় অধ্যায়। এই সংগ্রামে অসংখ্য বিপ্লবী আত্মত্যাগ করেছেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বিপ্লবী আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম। বিপ্লবী আন্দোলন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছিল। বিপ্লবী আন্দোলনের ফলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম আরও তীব্র হয়েছিল। বিপ্লবী আন্দোলনের ফলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম আরও ব্যাপক হয়েছিল। বিপ্লবী আন্দোলনের ফলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম আরও সংগঠিত হয়েছিল। বিপ্লবী আন্দোলনের ফলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম আরও শক্তিশালী হয়েছিল।

বিপ্লবী আন্দোলনের ফলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম আরও ব্যাপক হয়েছিল। বিপ্লবী আন্দোলনের ফলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম আরও সংগঠিত হয়েছিল। বিপ্লবী আন্দোলনের ফলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম আরও শক্তিশালী হয়েছিল। বিপ্লবী আন্দোলনের ফলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম আরও তীব্র হয়েছিল। বিপ্লবী আন্দোলনের ফলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম আরও ব্যাপক হয়েছিল।

> **"১৯০৮ এর একটি বক্তৃতায় অরবিন্দ ঘোষ বললেন যে আত্মশক্তি সাধিত না হলে রাষ্ট্রিয়ের মুক্তির প্রচেষ্টা ব্যাহত হবে। তিনি আরও বললেন যে বিশ্বে এমন কোন শক্তি নেই যা ভারতকে পদানত করে রাখতে পারে, যখন আমরা বুঝব যে ঈশ্বর আমাদের মুক্ত করবেন।"**

বিপ্লবী আন্দোলনের ফলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম আরও ব্যাপক হয়েছিল। বিপ্লবী আন্দোলনের ফলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম আরও সংগঠিত হয়েছিল। বিপ্লবী আন্দোলনের ফলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম আরও শক্তিশালী হয়েছিল। বিপ্লবী আন্দোলনের ফলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম আরও তীব্র হয়েছিল। বিপ্লবী আন্দোলনের ফলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম আরও ব্যাপক হয়েছিল।

বিপ্লবী আন্দোলনের ফলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম আরও ব্যাপক হয়েছিল। বিপ্লবী আন্দোলনের ফলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম আরও সংগঠিত হয়েছিল। বিপ্লবী আন্দোলনের ফলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম আরও শক্তিশালী হয়েছিল। বিপ্লবী আন্দোলনের ফলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম আরও তীব্র হয়েছিল। বিপ্লবী আন্দোলনের ফলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম আরও ব্যাপক হয়েছিল।

পৌরসভা সংবাদ

শহরের জঞ্জাল বিদ্যুৎ ও সার উৎপাদনের কাজে লাগাবে পুরসভা

শহরের ঠনা জঞ্জাল বিদ্যুৎ ও সার উৎপাদনের কাজে লাগাবে পুরসভা। এজন্যে মহ ৫টি বিদেশী অনুমোদন করা থেকে এই কাজের জন্য টেন্ডার পাওয়া গেছে। 'ইন্টিগ্রেটেড ওয়েস্টেজ' এ প্রকল্পের নাম দেয়া হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী ২১১ মেট্রিক টন জঞ্জাল তৈরির কেন্দ্রগুলি করা হবে। আগামী ৫ বছরে এই জঞ্জাল পুরসভার কাছ থেকে কিনে নিবে। বর্তমানে ৫৭৫ এই জঞ্জাল ডাম্পিংগ্রাউন্ডে নিয়ে।

মেয়র শান্তিরঞ্জন দাশ অভিযোগ করেন, শহরের ডাস্টবিনগুলিতে বহুদিন জঞ্জাল জমে থাকে ফলে দুর্গন্ধ ছড়ায়। তিনি আশা করেন, এই সমস্ত ডাস্টবিন থেকে জঞ্জাল সরিয়ে নেয়া হবে। যেখানে ট্রেনিং ডাস্টবিন থেকে আট মেট্রিক টন বর্জ্য পদার্থ আলাদার কথা কিন্তু সেখানে মাত্র ২.৫ মেট্রিক টন জঞ্জাল পাওয়া যায়। তাই, ডিসপোজাল ডাস্টবিনের অবস্থা খুবই খারাপ বলে জানা গেছে। গত ৭ আগষ্ট থেকে ১৫ জুলাই যাবৎ ডি কে ডাস্টবিন থেকে পাওয়া গেছে ১২৯ পাউন্ড। মেট্রিক কেজি হলেছে ৫৮ পাউন্ড, আন্তর্জাতিক মেট্রিটেবল হলেছে মাত্র ৫৫ পাউন্ড। এম এস কে ৪২ এ ৬৪৬ পাউন্ড। কলকাতা পুলিশ হাসপাতাল ও ৪০৫ পাউন্ড কলকাতা হাসপাতালের অন্তর্গতের কোন হিসাব পুরসভার কাছে নেই বলে পুরসভা সূত্রে জানা।

সার্টিফায়েড কপি এবার পাওয়া যাবে পুরসভা থেকে

এটি বা ফ্ল্যাট কেনার আগে ক্রেতারা চাইলে কলকাতা পুরসভা থেকে সেই ফ্ল্যাটের সার্টিফায়েড কপি সংগ্রহ করতে পারবেন। এই সব ফ্ল্যাটের সম্পত্তির পুরসভার অনুমোদিত দিলে, সেই বিষয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারবেন ক্রেতারা। পুরসভার মেয়র পরিষদের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়েছে। মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার এই খবর জানিয়েছেন, ক্রেতাদের উদ্বেগ হালকা হবে মেনে করছে পুরসভা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

মেয়র পারিষদ চলিতেছেন ফ্ল্যাটের মালিকানা সংক্রান্ত কপি সংগ্রহের জন্য সম্পত্তির মালিকদের পুরসভাকে কোন ফল দিতে হবে। তবে ১৯৯৯ কলকাতার জন্য ছোট ছোট 'ওনশিপ ফ্ল্যাটের' ক্ষেত্রে এবার থেকে আর পুরসভার বিশিষ্ট কমিটির অনুমতি নিতে হবে না। পুরসভার বিশিষ্ট কিছুদিন থেকেই, সেই অনুমোদন পাওয়া যাবে। তবে বাণিজ্যিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই সুযোগ প্রযোজ্য হবে না বলে তিনি জানিয়েছেন।

এক বছরে পুরসভা নয়টি পার্ক নির্মাণ করল

গত এক বছরে কলকাতা শহরে নয়টি নতুন পার্ক তৈরী করা হয়েছে। পার্কগুলি হয়েছে ১৫, ৯৩ ও ৯৮ প্রভৃতি ওয়ার্ডে। শিক্ষামন্ত্রের ইন হোটেলের বিপরীতে প্রায় এক বিঘা প্রমি পাওয়া গেছে। তার কলকাতার হাতি মহম্মদ মহম্মি স্কোয়ারে ও অন্যান্য স্থানে পুরসভা পার্ক লাগানোর পরিকল্পনা নিয়েছে। এছাড়া বর্তমানে যে সমস্ত পার্কের বৃক্ষরোপণের পরিকল্পনা হয়েছে। মেয়র সেখানে একটি চেয়ারম্যান পার্ক খুলেছেন। মেয়র পরিষদ বলেন যায় ও শোভন চট্টোপাধ্যায়ও বৃক্ষরোপণ করেন। মেয়র পরিষদ চলমানস্থ ৩৫ ওয়ার্ডে কাজের এবছরের পার্ক লাগানো হবে। পার্ক লাগানো হবে, উল্টাডাঙ্গা ঘাট প্রভৃতি এলাকাতে ও পার্ক লাগানোর পরিকল্পনা হয়েছে। ১৫ জুলাই থেকে গাছের চারা বিতরণ করা হচ্ছে। মেয়র পরিষদের গাছের চারা এবছর বিতরণ করা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। মেয়র মুখর মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি পুরসভার সামনে একটি অনুষ্ঠানে প্রায় ৪ হাজার ৬০০ গাছের চারা বিতরণ করেন।

পলিপ্যাক নিয়ে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সাথে পুরসভার আলোচনা

শহরে পলিথিন নিষিদ্ধ করলেও কলকাতা মেয়র সুব্রত মুখোপাধ্যায় আজ কুল নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। পর্ষদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার পর পুরসভা এ ব্যাপারে কোনরকম ব্যবস্থা নেবে। পরিবেশ দূষণ ও শহরের নিকাশী ব্যবস্থা এই সমস্ত কেন্দ্রে দেওয়া পলিপ্যাকের জন্য ক্ষতিকর কর্তিয়ক হচ্ছে, কলকাতা পুরসভার বাঁধ ও পরিবেশ বিভাগের ব্যবস্থাপনা মেয়র পারিষদ ডঃ শোভন চট্টোপাধ্যায় এই মন্তব্য করেছেন। প্রবীণমন্ত্রী জানিয়েছেন শুধু পলিথিন ব্যবহারই নয়, পলিপ্যাক তৈরির নির্মাণী পদ্ধতি এবং তৈরির পরিবেশ মানও নিয়ন্ত্রণের আওতায় আনা সরকারের ব্যবস্থা নিয়েছে হবে। সম্প্রতি প্রবীণমন্ত্রী কবি উদ্যানের আশপাশে বিভিন্ন ব্যবসা কেন্দ্রগুলির ও কাউন্সিলারদের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে অনেকেই পলিপ্যাকের জন্য কবি কলকাতা জল সঞ্চালনের ব্যবস্থা বিঘ্নিত হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন।

গণতন্ত্রের স্বার্থে অধিবেশন কক্ষের পবিত্রতা রক্ষার দায়িত্ব শাসক ও বিরোধীদল সবারই

অমিল কুমার মুখোপাধ্যায়, চেয়ারম্যান, পুর অধিবেশনকক্ষের পবিত্রতা রক্ষার দায়িত্ব শাসকদল বা বিরোধী উভয়ের। কলকাতা পুরসভার অধিবেশনকক্ষে সাম্প্রতিক হিংসাত্মক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পুরসভার চেয়ারম্যান শ্রী অমিলকুমার মুখোপাধ্যায় সাংবাদিকদের কাছে এ মন্তব্য করেছেন।

চেয়ারম্যান বলেন, অধিবেশন সুষ্ঠুভাবে চালানোর জন্য লক্ষ্মণ রেখা টানা প্রয়োজন। এজন্য অবশ্যই শাসক ও বিরোধী দলকে সঠিক ভূমিকা সঠিক উদাহরণ দিতে হবে। বিরোধী দলেরও দেখতে হবে, অধিবেশনে উত্থাপিত প্রশ্নটি যেন মূল ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, সারগর্ভ পূর্ণ হয়।

শ্রী মুখোপাধ্যায় বলেন, হাউস চলাকালীন অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন জানানোর আগাম চেষ্টা করছি। বিরোধীদলের সদস্যকে বক্তব্য সুযোগ বিস্তৃত বেশি করে। আমি মনে করি, বিরোধীদলের সদস্যদের না শাসকদলের পক্ষে হওয়া হবে। এতে শাসকদল নিজেদের সংশোধন করতে পারবে। এবং দ্বিতীয়তে তারা সঠিক সিদ্ধান্তও নিতে পারবে।

সদস্যদের জন্যে পুর আইন হতে পারে। কিন্তু সভার ঐতিহ্য মনে রেখেই শাসক বিরোধীদল উভয়কেই অধিবেশনে সদস্যদের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে হবে।

চেয়ারম্যান বলেন, কোন কোন ক্ষেত্রে এই কলম্ব খুব একটা ছড়ায় নয়। সেসব ক্ষেত্রে অভিযোগ এলে তদন্তের ব্যবস্থা নিতে হবে। সম্প্রতি এক বিধায়কের বিরুদ্ধে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি মনে করেন হাউসে চেয়ারম্যানের একটি বিবৃতির মোটামোটি থাকা দরকার। বক্তব্য রাখতে বলেই সভাপতির সিদ্ধান্ত নিতে হয়। অথচ চেয়ারম্যানের কোন বিশেষাধিকার নেই। তাই ঠিক হয়েছে, চলতি আইনের কিছু কিছু অংশ সংশোধন করা হবে। এছাড়া ও বলেন, সম্পর্কে আরও পরিষ্কার ধারণা তৈরী করতে হবে। পুরসভার আলোচনা সিদ্ধান্ত নেবার পর তা রাজ্য বিধানসভায় অনুমোদন করার জন্য পাঠানো হবে। এবার শেষে মহানগরিক, বিরোধী দলের চীফ হুইপ বিধানসভায় যে দুটি সেক্রেটারির প্রস্তাব বলে এক সভা আলোচনা হয়েছে। বিদেশ থেকে মহানাগরিক ফিরে আসার পর আবার বৈঠক বসবে।

আসল কথাই মনে রাখা, সুষ্ঠুভাবে হাউস চালাতে আমাদের কিছু ব্যবস্থা। আর সে কথা মনে রেখেই, অধিবেশন কক্ষের সংস্কারের কাজও শুরু হয়েছে। কক্ষের সর্বাধিক সংখ্যক সদস্য আগে অধিবেশন কক্ষের ভিতরে মিনি মহাকরণে, সেজন্য পরিষেবার্থে এবং পরে ইতিমধ্যেই সংস্কার করিয়ে নিয়েছেন। চেয়ারম্যান বলেন, এই পরিবর্তন করে ছিলেন। শ্রী মুখোপাধ্যায় জানান কক্ষের পুরনো বাতাবরণ বজায় রেখে কক্ষের মর্যাদাবোধের কিছু রদবদল ঘটবে। ইতিমধ্যে কক্ষের সিলিং থেকে ঝুলন্ত কাঠের কিছু অংশ ভেঙে পড়ে। আসলে ঘুণপোকা, অন্য পোকা এ ধরনের ক্ষতিটা পরে হওয়ায়ও পুরকর্তৃপক্ষ কক্ষের মেরামতির কাজে হাত দিয়ে। তবে ইতিমধ্যে মেরামতির সময় অধিবেশন বসবে কোলকাতা। আমাদের মেরামতির সিদ্ধান্ত হল, তাতে হলে অন্তত বাজা বিধানসভার অধিবেশনকক্ষে। হয়ে পারা তবে বিধানসভার অধিবেশন কক্ষ ব্যবহারের কথাও দিয়েছি। পুর অধিবেশনের ঐতিহ্য বোঝাতে প্রয়োজনমতো কক্ষের কলকাতাকে রূপে পুরঅধিবেশনের অধিবেশনের আলোচনা পুরঅধিকারীদের অবহিত করানো হয়। চেয়ারম্যান বলেন, অধিবেশন কক্ষের চেয়ারম্যানের চেয়ারে বসার জন্যে একটা কথাই বারবার জানি, স্বাভাবিক প্রতিযোগিতা এই আসনে বসে গেছেন। ঐতিহ্যের সম্মান এবং পুর অধিবেশন কক্ষের পবিত্রতা-রীতিমতো রক্ষার দায়িত্ব শাসক বিরোধী দলের।

আলোচ্য পুরসভার অধিবেশন কক্ষের দৃশ্য।

রবীন্দ্রনাথ - সুরেন্দ্রনাথ স্মরণে

গত ৯ আগস্ট সেতারের কুশীলব পণ্ডিত রবিশঙ্কর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের [illegible] উদ্যোগে হয়। ওই দিন কলকাতা পুরসভার পক্ষ থেকে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সুরেন্দ্রনাথের মর্মরমূর্তিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন মেয়র। ওই মূর্তি মেয়রের চেম্বার থেকে পুরোহিত, মেয়র পরিষদের কলকাতা চলচ্চিত্রোৎসব ও পুরসভার পক্ষ থেকে মাল্যদান করা হয়।

গত ২২ শ্রাবণ রবিবার (৭ আগস্ট) পুরসভার পক্ষ থেকে রবিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৩৪তম জন্মদিনে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। এদিন বিকেল ৪টেয় পুরসভার বাঁধানো মূর্তি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন মেয়র। উপস্থিত ছিলেন মেয়র পরিষদ কলকাতা চলচ্চিত্রোৎসব ও পুরসভার পক্ষ থেকে [illegible]

রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করছেন মেয়র সুব্রত মুখোপাধ্যায়

[illegible] ১৯৬৮ সালে [illegible] ১৯৭৮ সালে [illegible] ১৯৭৯ সালে [illegible] ১৯৮০ সালে [illegible] ১৯৮১ সালে [illegible] ১৯৮২ সালে [illegible] ১৯৮৩ সালে [illegible] ১৯৮৪ সালে [illegible] ১৯৮৫ সালে [illegible] ১৯৮৬ সালে [illegible] ১৯৮৭ সালে [illegible] ১৯৮৮ সালে [illegible] ১৯৮৯ সালে [illegible] ১৯৯০ সালে [illegible]

পুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নতুন ভবন

তথ্য ও সমাজসংযোগ প্রকল্প শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মেয়র পরিষদ সইদুল হক চৌধুরী বলেন, পুরপ্রাথমিক বিদ্যালয়ের পুরনো বিল্ডিংটির পরিবর্তে নতুন ভবনের কাজ শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে একটির কাজ শেষ। মোট ছয়টি ভবনের কাজ হাতে নেওয়া হবে। তার মধ্যে একতলা থেকে সাততলা কয়েকটি দোতলা থেকে তিনতলা করা হবে।

শ্রী সইদুল হক চৌধুরী অবশ্য ৩৭ বিল্ডিং এর নতুনত্ব নয়। ছাত্রছাত্রীদের পোষাক দেবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বিদ্যালয়ের চেয়ার- টেবিল, আসবাবপত্র, ফ্যান, পাখা ইত্যাদিও নিয়মিত মেরামত দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য পুরসভার নতুন বোর্ড পরিষদ চেষ্টা অব্যাহত রাখবে বলে শ্রী চৌধুরী জানান।

কলকাতা পুরসভার পটারী রোডের প্রাথমিক বিদ্যালয় নতুন শিক্ষাবর্ষে ছাত্রছাত্রী ভর্তি। ৭৮ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর চৌধুরী বেগম নতুন ভবনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার এবং ঠিকাদার সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করছেন।

ইতিমধ্যে একটি পরিবেশের কাজে পুরপ্রাথমিক বিদ্যালয়ের দায়িত্বভার

বিদ্যালয় ভবনটির ফলক উন্মোচন করছেন মেয়র পরিষদ সইদুল হক চৌধুরী ও ১৮ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর শ্রীমতী রত্নশ্রী বাগচী। অনুষ্ঠানে মেয়র ছাড়াও আসন্ন পৌরসভা নির্বাচনে ৮ ও ৯নং ওয়ার্ডের প্রার্থীরা কাউন্সিলার হেমন্ত পাঁড়ে ও ইন্দ্রকুমার তোষনিওয়াল উপস্থিত ছিলেন।

বেলগাছিয়ার ১৮/২ নম্বর রোডে নবনির্মিত অফিসঘরে কর্পোরেশনের কলকারখানা কমিটির সভাপতি ঈশ্বরচন্দ্র কয়াল ও মেয়র পরিষদ সইদুল হক চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন সংস্থার ডি পরমহারাজ। প্রধান অতিথির ভাষণে মেয়র পরিষদ সইদুল হক চৌধুরী বলেন, পুরপ্রাথমিক বিদ্যালয়ের নতুন ভবনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার এবং ঠিকাদার সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করছেন।

এদিকে ঈশ্বর কলকাতার বেলগাছিয়া রোডে ৩৭ ডিগ্রি ছাত্রছাত্রীদের জন্য পুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটি নতুন ভবনের দায়িত্বভার করা হয়েছে।

কলকাতা পৌরসংস্থার উদ্যোগে ৫৫তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

কলকাতা পৌরসংস্থার উদ্যোগে গত ১৫আগস্ট বৃহস্পতিবার সকালে কেন্দ্রীয় পুরভবন প্রাঙ্গণে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়। এই উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পৌরপিতা কল্পনা পুরনায়ক ফ্লোরেন্স নাজারেথ ডি'রোজারিও কুমার মুখার্জি। স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করেন উপপুরপ্রধান ডালিম কুমার মুখোপাধ্যায়। অতীন বেদীতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন মেয়র পরিষদ সদস্য রাজীব সেন, প্রবীণ মেয়র, মইনুল হক চৌধুরী, কাউন্সিলর অতীনের মণ্ডল, বিশেষী দলনেতা নির্মল মুখার্জি, প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র ও মেয়র পরিষদ পূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত। অনুষ্ঠানে সংস্থার পদস্থ আধিকারিকবৃন্দের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন পুরমহাধ্যক্ষ বেবাশীষ সেন ও পৌরপিতার সচিব রৌশনারা।

অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পুরমহাধ্যক্ষ শ্রী বেবাশীষ সেন। স্বাধীনতা দিবস সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন পুর প্রশাসনিক বিভাগগুলোর ভূমিকা তুলে ধরেন। উপস্থিত বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলে পরিবেশন করেন শিল্পী মুকুলদেব চক্রবর্তী।

রানীকুঠিতে বেআইনী বাড়ি ভাঙল পুরকর্মীরা

রানীকুঠিতে একটি বেআইনী বাড়ি ভাঙতে গিয়ে ঘুষিতে বেশ কিছু পুরকর্মীর হাতে নিগৃহীত হন পুরকর্মীরা। ঘটনাস্থলে অবশ্যই পুলিশ থাকায় উভয় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ গিয়ে অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনে। পুরকর্মীরা চলে আসার পর বেআইনী বাড়ি ভাঙতে শুরু করে।

জানা গেছে রানীকুঠি টোলারহাট মোড়ের পাশেই হিলকলোনি। ২০ নম্বর হিলকল রোডে নির্মল হেঁড়িয়া হিলকলোনি একটি বেআইনী বাড়ি, বাড়ির অধিকারে গত বছর বেআইনী বাড়ি নির্মাণ বন্ধ করতে পুরসভা নোটিস দেয়। সেই সময় বেআইনী বাড়ি ভাঙতে গিয়ে পুরকর্মীরা নিগৃহীত হয়েছিলেন। এলাকার পুরকর্মীরা কাজ করতে গিয়ে মার খেয়েছেন। এই সব ঘটনা সত্ত্বেও পুরকর্মীরা গ্যাসকাটার হাতুড়ি শাবল নিয়ে বেআইনীভাবে নির্মিত বাড়িটির বেশীর ভাগ অংশ ভেঙে দিয়েছেন।

গড়িয়াহাটে পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল

গড়িয়াহাট ফ্লাইওভারের জন্য গড়াপাটি ও নিকাশীব্যবস্থা ও জলসরবরাহ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে যে অভিযোগ উঠেছে তা খতিয়ে দেখতে পাঁচ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল দেখতে আসে। পুরকমিশনার দেবাশীষ সেন ছাড়াও পরিকল্পনা, জলসরবরাহ, নিকাশী ও কারখানা বিভাগের ৫ জন মুখ্য ইঞ্জিনিয়ার সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

মেয়র জানান, ফ্লাইওভারের কারণে জল গড়াপাটি ও নিকাশী ব্যবস্থার কি ক্ষতি হচ্ছে সে ব্যাপারে ওই কমিটি পুরসভার কাছে রিপোর্ট জমা দেবে। পুরকর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে প্রয়োজনে ট্রিফ কমিশনের সঙ্গেও কথা বলবেন। তারা নিকাশী ব্যবস্থা সংক্রান্ত ক্ষতি পূরণ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

কঙ্কাল বিক্রি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চাইলেন মেয়র পারিষদ

[illegible] বিক্রি হওয়ে [illegible] মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের হস্তক্ষেপ চাইলেন মেয়র পারিষদ [illegible] মুখ্যমন্ত্রীকে তিনি এ ব্যাপারে একটি চিঠিও লিখেছেন। তাঁর মতে, হাসপাতাল পরিষেবার খুবই [illegible] তিনি [illegible] এ ব্যাপারে পুরসভা [illegible]

সম্প্রতি উলটাডাঙা মোড়ে ছাত্র করতে গিয়ে একটি মেডিক্যাল কিটের নমুনা সহ এক ব্যক্তিকে ধরে পুলিস। তাকে জেরা করে জানা যায়, ওই কিট বিক্রি করত একটি বেসরকারি সংস্থা। সেই সংস্থার কর্তাদের ধরতে পুলিস ছুটে যায় [illegible] ধরা পড়ে। পুলিস [illegible] ওই ব্যবসার মূল পাণ্ডাদের গ্রেপ্তার করেছে।

[illegible] ধরে পুরকর্তৃপক্ষ ও [illegible] পুলিস ছুটে যায়। [illegible] বাড়ি জানিয়েছেন, পাশ থেকে [illegible] মৃতদেহ থেকে এই সমস্ত [illegible] নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু পুলিস বা পুরসভা [illegible] ওই বাড়ির মধ্যে প্রবেশে [illegible] সকলেরই ধারণা এর পিছনে একটা আন্তর্রাষ্ট্রিক চক্র রয়েছে।

হাসপাতালের জলের মান ঠিক করতে পুরসভার নির্দেশ

[illegible] হাসপাতালের জলের মান নিয়ে খুশি নয় পুরকর্তৃপক্ষ। সম্প্রতি পুরকর্তৃপক্ষ শহরের [illegible] হাসপাতালের পানীয় জলের নমুনা পরীক্ষা করে। পরীক্ষা করে দেখা যায় হাসপাতালের পানীয় জলের মান [illegible]। জলের মান ঠিক করতে যা [illegible] হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে নোটিস পাঠিয়েছেন। [illegible] পাঠিয়ে [illegible] হাসপাতালে যে জল সরবরাহ করে তার মান খারাপ নয়। কিন্তু হাসপাতালের [illegible] জলাধারের [illegible] ঠিক মতো পরিষ্কার না হওয়ায় এবং পাইপ লাইন পরিষ্কার না করায় জলের মান খারাপ বলে পুরকর্তৃপক্ষ মনে করছে। কলকাতার হাসপাতালগুলির মধ্যে সরকারি ও বেসরকারী হাসপাতাল রয়েছে।

পীযূষকান্তি আর নেই

[illegible] পীযূষকান্তি সরকার। রবীন্দ্রসঙ্গীতের [illegible] এই শিল্পী কিছুদিন [illegible] অসুস্থ থাকার পরিণামে [illegible] মোট [illegible] ছিলেন। [illegible] সোমবার ৫৭ বছর [illegible] পুরুষ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। [illegible] এই শিল্পীর দুই পুত্র ও কন্যা বর্তমান। ১৯৯৪ সালে রবীন্দ্র সঙ্গীতের ক্যাসেট [illegible] পর প্রতিভাবী পীযূষকান্তিকে আর পিছনে ফিরে [illegible]। পরে পরে অবস্থা এবং [illegible] হয়ে [illegible]। শরীর [illegible] আর [illegible]। শেষদিকে [illegible] এবং সংসারজীবন [illegible] রবীন্দ্রসঙ্গীতের [illegible] এসে [illegible]। সাধারণ [illegible] পুরো সময়ে [illegible]। পারিবারিক [illegible] কোন [illegible] শরিবর্তন করে [illegible] পীযূষ [illegible] করে [illegible] ছোটো ও দর্শকদের কাছ থেকে।

[illegible] ক্যাসেটগুলি [illegible] দিয়েছিল, [illegible] পীযূষকান্তি [illegible] [illegible] পেয়েছিলেন। কিন্তু সেটা [illegible] তিনি বুঝতে পেরেছি। তিনি [illegible] তিনি তাঁর [illegible] নিজেই গানের [illegible] করতে পারবেন এবং সেটা [illegible] কেউ [illegible] [illegible] [illegible]। পীযূষকান্তির জন্ম [illegible] ১৯৩৭ সালের ৩২ অক্টোবর। ৪০ বছর [illegible] প্রথম রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্যাসেট [illegible]। গানের [illegible] ক্যাসেট না [illegible] সম্পর্কে তিনি নিজেই [illegible] প্রকাশ করে [illegible] [illegible] [illegible] একজন প্রতিভাবান [illegible] [illegible] বিশ্বভারতী [illegible] [illegible] [illegible] ক্যাসেটগুলির [illegible] গানের ক্যাসেট [illegible] [illegible]। বিভিন্ন [illegible] [illegible] ক্যাসেট [illegible] [illegible]। কিন্তু [illegible] [illegible]।

সামান্য কিছু সতর্কতা

ম্যালেরিয়া

তাড়াতে পারে

- জ্বর হলেই রক্ত পরীক্ষা করান ও পুরোমাত্রায় ওষুধ খান।
- ম্যালেরিয়ার মশা কেবল পরিষ্কার জলে জন্মায় — খোলা চৌবাচ্চা, হাঁড়ি-কলসি বা ড্রামে ধরা জল সপ্তাহে কমপক্ষে একদিন পরিষ্কার করুন।
- বর্ষার জল বাড়ির ছাদে বা আনাচে-কানাচে জমতে দেবেন না।
- জলের ট্যাঙ্ক ঢেকে রাখুন যাতে মশা ঢুকতে না পারে।
- শোয়ার সময় অবশ্যই মশারি টাঙান।

॥ ম্যালেরিয়া জীবন নেয় : সাবধানের মার নেই ॥

তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ
কলিকাতা পৌরসভা

পরিবেশগত দিক থেকে ভারতের সবচেয়ে
নিরাপদ পরিবহণ মহানগরী।
নাগরিক সচেতনতা পরিবেশ সংরক্ষণ আজ একান্ত প্রয়োজন।
এই শহরকে দূষণমুক্ত করতে আমরা সর্বদাই সচেষ্ট।
এই কাজে চাই নাগরিকদের সহযোগিতা ও
আন্তরিক সহযোগিতা।

তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ
কলিকাতা পৌরসভা

পরিচ্ছন্ন কলকাতা।
সুস্থ কলকাতা।

সামান্য কয়েকটি স্বাস্থ্যবিধি পালন করেই
আমাদের প্রিয় কলকাতাকে
আমরা পালটে দিতে পারি।

◆ রাস্তায় নোংরা ফেলবেন না।

◆ আপনার বাড়ি ও এলাকায় জল জমতে দেবেন না।

◆ রাস্তায় থুথু ফেলা বা প্রস্রাব করা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। দয়া করে এ থেকে বিরত থাকুন।

আসুন, সকলে মিলে গড়ে তুলি এক নতুন আনন্দনগরী।
যার গর্ব শুধু আমরাই নই, সারা দেশ গর্বিত হবে।

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন

আমাদের শহর - আমার সুন্দর। আমার গর্বের।

ক ল কা তা

এক চলমান ঐতিহ্য

আমরা আছি। আমরা থাকবো।

কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

কলকাতা

পুরশ্রী

শারদ সংখ্যা

কারুশিল্প, প্রযুক্তিবিদ্যা কৃষ্টি
এই তিন কলকাতার সৃষ্টি

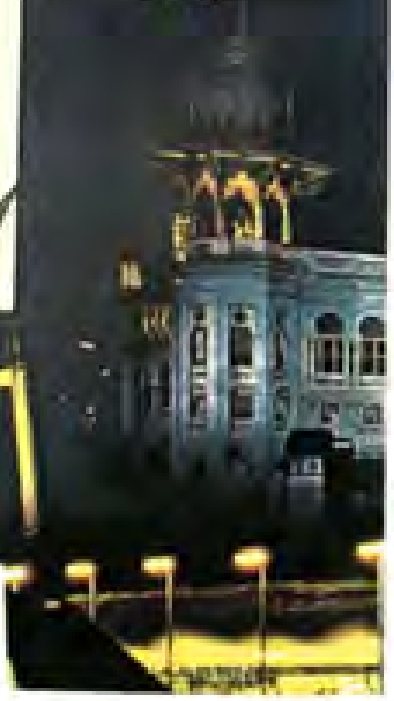

কালী মন্দির
পরেশনাথ মন্দির
মহাবোধি সোসাইটি
নাখোদা মসজিদ
আর্মেনিয়ান গির্জা
ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল
রাজা রামমোহন রায়
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
যামিনী রায়ের ছবি
নোবেল জয়ী অমর্ত্য সেন
দ্বিতীয় হুগলী সেতু

অনেক সম্প্রদায় অনেক সংস্কৃতি
অনেক সাহসে গড়ে উঠেছে এই শহর

কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

শারদীয়া

কলকাতা

পুরশ্রী

১৪০৮

১ম বর্ষ, নবম সংখ্যা

অক্টোবর ২০০১

প্রকাশনা উপদেষ্টা মণ্ডলী

নির্মেষ রায় (চেয়ারম্যান)
পবিত্র মুখোপাধ্যায় (সভাপতি)
আশিস গঙ্গোপাধ্যায় (সভাপতি)
অনুপ মিত্র (আহ্বায়ক)।

প্রধান সম্পাদক : অনুপ মিত্র
সম্পাদক : বীরেন্দ্রজিৎ লাহা
সম্পাদকীয়-
সহযোগিতা : অজিত সিংহ
সহযোগী : সমরেশ কর
প্রচ্ছদ : গৌতম আচার্য

অফিসকর্তা (পৌরসংস্থার অনুমোদিত মুখপত্র পুরশ্রী, ইথা ও অনুমোদনের বিজ্ঞাপন, ১ ইন্দ্র স্ট্রিট, ২য় বিল্ডিং (৪র্থ তলা), কলকাতা-৭০০ ০৪৭ হইতে অনুপ মিত্র বিশেষ অধিকারিক কর্তৃক প্রকাশিত এবং তাহকর্তৃক প্রকাশিত ইন্ডিয়ানপ্রেস, ১২/১বি, রাধা মাধবী সেন, কলকাতা-৭০০০০৯, দূরভাষ : ৪৭৪-১২৪১, হইতে মুদ্রিত।

মূল্য ঃ কুড়ি টাকা

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়			
দুর্গা দুর্গতিনাশিনী		নবকুমার ভট্টাচার্য	
দুর্গাপূজা একাকারের ইতিহাস			
নিছক রাজনীতির অভিধান		ডঃ হেমন্ত বসু	
কলকাতার কালী মন্দির পুরুষ		সমরেশ কর, অজিত সিংহ	
বিশ্বজিৎকাল (পুনর্মুদ্রণ)		শরদিন্দু (শরদিন্দু বসু)	
যেসব মেয়েদের অসম্পূর্ণ ইতিহাস পুরাণে		বুদ্ধদেব গুহ-পোদ্দার	
কার যোগাই যিনিয়ে মুখোপাধ্যায়		প্রবিনব ঘোষ্টিত	
কলকাতায় নিয়ে কয় কথা		হুমন সন্যাল	
কথা থেকে কথা		তরুণ মুখোপাধ্যায়	
দেবতার ছদ্ম (পুনর্মুদ্রণ)		নিবেদিতা চক্রবর্তী	
বাঙালিদের বুদ্ধা হলে		অমর মিত্র	
মাতৃত্ব কবিতা		মৃদুলা চক্রবর্তী	
রিটায়ে মানুষের ও সমস্যাটি সেই মুখ		শৈলেন কান্তি বসু	
কলকাতার থিয়েটারে নারী অভিনেত্রীরা			
বিনোদন ও তার বুটিনিয়ন		তপনকুমার ঘোষ	
বৃটিশ সোনের শেষ সাক্ষাৎকার		অনিন্দ্যসুন্দর মুখোপাধ্যায়	
কবিতা গুচ্ছ	শরিফা, সিদ্ধের পর সিদ্ধ		উত্তম বসু, তাপস বসু
	কবিতায়-কলকাতা (কোলকাতা)		
	একটি অবিস্মরণীয় শীতরাত		বেবেটুকুমার ঘোষ
	শহর		অজিত বসু
	শহর, নদী		শিপ্রা সরকার, বিপ্লব মুখোপাধ্যায়
ছড়াগুচ্ছ			শরিফন কাজিরুজ্জা
শেষ্টেরাজের উৎসব			শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়
মহিলা আরাই			উৎপলেন্দু সরকার
পুনরায় ছাদা			প্রদীপ দত্ত
কবিতা গুচ্ছ : মেটিনটি, বৈধব, কালী ইত্যা			চন্দন চক্রবর্তী, অভিজিৎ চৌধুরী
	তুমি নিজে মহাবিদ্যা		সুব্রত বোরাল
	সেদিনে হোমার মতো		তাপসী সিংহ, বীথি চট্টোপাধ্যায়
	কবিতা বিষয়ক		
	মনে তারা ফুলেরী ছবি		উত্তরজ্ঞ চক্রবর্তী
	ভয়, বিশ্বসিরিকে নিয়ে		দিব্যেন্দু পলিয়, অজিতাভ দশগুপ্ত
জীবনের পথে পথে			অজিত সরকার
কিছু বাঙালা, অস্তিত্ব			অজিত চক্রবর্তী
কলকাতার খাদ্য			অমলেন্দু চক্রবর্তী
পত্রি অন্যের চাই পুরীবাসীর			শঙ্কর নিকেতন

আনন্দ ঘোষণা

শারদোৎসবকে কেন্দ্র করে পুরশ্রীর বিশেষ সাহিত্য সংকলন প্রকাশ পেল বর্তমান প্রকাশনার উদ্যোগে স্বনামধন্য লেখকদের অভূতপূর্ব সাড়া আমরা পেয়েছি। আগ্রহী পাঠকদের অবগতির জন্য জানাই প্রাপ্ত ঐ সব রচনার বেশ কয়েকটি এবং বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের আরও অনেক রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে আগামী শুভ দীপাবলী উপলক্ষে পুরশ্রী প্রকাশ করতে চলেছে আরও একটি মূল্যবান সাহিত্য সংকলন।

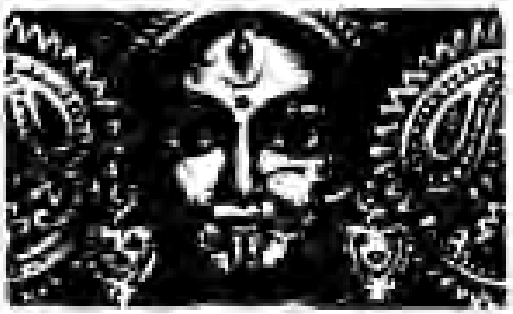

সম্পাদকীয়

আবার এলো বহু কাঙ্খিত পূজা। একই আশা-প্রত্যাশা নিয়ে বরাবরের মতোই। এবারের পূজা প্রেক্ষাপট কিছুটা ভিন্ন। বন্যার কবলে আর্তত্রাণে বিপর্যস্ত কিছু মানুষ দিশেহারা। চলছে যুদ্ধও। সন্ত্রাস বনাম সন্ত্রাস। ভোরের শিশির - শিউলির স্নিগ্ধতা যুদ্ধের দামামায় পূজার আনন্দকে অনেকটাই ম্লান করে দিয়েছে। দেবী দুর্গা অসুর নাশিনী রূপে আসেন। বাঙালি তারই মধ্যে দেখতে পায় তাঁর আরাধ্যা মা-কে। পূজা ও ভক্তিতে শারদোৎসব ভরে ওঠে আনন্দ খুশীর জোয়ারে।

কলকাতা পুরসভা সারাবছর নাগরিক পরিষেবার মধ্যে দিয়ে ঐতিহ্য বহন করে চলে। পুরশ্রী তার অন্যতম হাতিয়ারও। শারদশুভেচ্ছার সঙ্গে পুরশ্রী শারদসাহিত্যের বিচিত্র সম্ভারে সাজানো হল। পাঠকের খুশী হলে খুশী হবো আমরাও।

ই সিনহা

দুর্গা — দুর্গতিনাশিনী

নন্দলাল ভট্টাচার্য

এক

বর্ষার জল নদী হয়েই-ই হবে যায়। বাদলে ঘায় আকাশের চেহারা। নীল আকাশে হাল্কা সাদা মেঘের আনাগোনা। পরমন্ত প্রান্তরে কাশের গন্ধের মহুয়া দোলা। আকাশের মেঘ আর প্রান্তরের কাশ-মিশে হয় একাকার। বাতাসেও আসে শীতলতার আভাস। শিউলি বিছানো পথেও কেমন যেন একটা ধ্যান কেমন করা ভাব। আজ ওই সবকিই বোঝা যায় এসেছে শরৎ। আসছেন মা।

মা — মহামায়া।

মহামায়ার মায়ায় ধরা এ সংসার। একথা প্রাজ্ঞ ঋষিদের। তবুও প্রশ্ন, কা হি সা দেবী মহামায়েতি যা ভবান্?

এই প্রশ্ন আজকের নয়। এ প্রশ্ন অনন্তের। এ প্রশ্ন অনাদি অতীতের। সেই বৈবস্বত মন্বন্তরে রাজা সুরথ নিজের স্বজনদের চক্রান্তেই রাজ্য হারিয়েও আবেগেই কল্যাণের কথা চিন্তা করতে করতে ঠিক এই প্রশ্নই করেছিলেন ঋষি মেধসকে। মেধসি একবাক্যে ঋষি বলেছিলেন, নিত্যৈব সা জগন্মূর্তি স্তয়া — তিনি নিত্যা — তিনি জগন্মূর্তা তিনি মহামায়া — তিনি প্রাজ্ঞদিগের ধারণা। মুক্তির হেতুভূতা তিনি সনাতনী। তিনি সংসার বন্ধনের কারণ। আবার তিনিই সর্বেশ্বরেশ্বরী।

প্রশ্নই জন্ম দেয় প্রশ্নের। তাই শেষ হয় না জিজ্ঞাসার। উদ্ভাসিত হয়, সে এই মা?

ঈশ্বর আসে, তিনি এই বিশ্বকে ধারণ করেছেন, — নিয়েছেন গর্ভ, বিশ্বকে তিনি

পালন করেন — যেন ধর্ম, বিশ্বকে তিনি লালন করেন, — যেন মন্ত্র, তন্ত্র — তিনিই মা। অধিনায়ী তিনি, সর্বাধারের আধারও তিনি। সর্বলোকের যেকোনও দেবী — সর্বলোকে পরিব্যাপ্ত। তিনি অক্ষর, অব্যয়। শাস্ত্রিণী তিনি আবার রক্ষ তিনি সংহার লীলায়তেও। ধর্ম স্থাপয়িত্রী তিনি ধর্মরক্ষিণীশক্তি, সত্যস্বরূপ সমন্বিতা তিনি, যদিও ছলনাময়ী রহস্যেই প্রকটিতা। অন্তর্যামী তিনি — অমৃতলোকনিবাসিনী। তবুও দ্বিভুজা রূপেই বলা যেন তিনি এই ধরার মাটিতে কখনও মাতা, কখনও কন্যা রূপে। আসন তিনি। তবুও অবশেষেই তাঁর প্রকাশ। অবলা তিনি, অবীশা তিনি — তবুও তাঁকে পাওয়া যায় এই ধরাতেই — সীমার মাঝে।

বিচিত্ররূপিনী এই মা। অভিব্যক্তিতে যেন তিনি নানারূপে — বলা যায়ে। কখনও তিনি মধ্যবয়সী, দেহ বিপুল — সন্তানকে যেন প্রার্থিত কোল, কখনও তিনি কন্যারূপিনী, স্নেহের তীব্রতা — অনুজ্ঞাময়ী। কিন্তু তবুও তিনি মা — সন্তান পেরে যাওয়া ছেলেকেও তাই যেন নিজেরই চরণতলে। পূজা নেন তিনি সেই সন্তানকে সঙ্গে নিয়েই। কখনও তিনি কালী করাল বদনা। আবার কখনও তিনি কমলা — ঐশ্বর্যময়ী, কখনও তারা, চারুমুখা, ধূমাবতী আবার কখনও বা ষোড়শী, ত্রিপুরেশ্বরী, ভাগ্যদা।

তিনি মা। কল্যাণী। কল্যাণেই তাঁর আনন্দ, প্রকাশ। তিনি শান্তিময়ী, পুরুষ স্বরূপিণী — দুঃখবিনাশিনী, শঙ্খস্বরূপিনী তিনি স্নেহের আশ্রয়স্বরূপা, দেবী স্নেহের ধারণা। তিনি ভগবতী, মনের গভীর কৃষি স্বরূপা। সর্বত্র জগতের পীড়নকারিণী, তিনি নিত্যা। অসুরবাসিনী তিনি — তবুও মা। তাঁর মৃষ্টিপাতেই অসীভূত হয় ত্রিজগৎ, তবুও পরক্ষণেই যদ কন্যে তিনি অসুর। অসুরও তাঁর হস্তধৃত অস্ত্রে পবিত্র হোক, হোক ত্রিলোকস্বামী — তাই অস্ত্রের এই ব্যবহার। জগতকে সুখ দিতে, ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করতে, তাঁর অনুশাসন, আমার সেই অসুরকে সুলোকে তাই নিয়েই যুদ্ধের অভিনয়।

অভিনয় ছাড়া কি? দেবী বলছেন - মহিষাসুর বধের মুহূর্তে দশহাতে দশটি অস্ত্র নিয়েও মায়ের নিলেন কমল আসন — অসুরের মস্তকে, কমলের প্রতীক পদ্ম নিলেন হাতে। সেদিনও তাঁর দুচোখে ছিল স্নেহ, প্রেম, ছিল করুণা, ভালবাসা, ছিল ভালবাসা। তাই দুষ্ট সন্তানকে বধ করতে যা সেদিন কৃতীর নামে ছলনেন মোহময়ী। তারপর সেই মহাবলী বিনাশে মা তাঁর আসুরিক প্রেতনাকে নিধন করেছেই করলেন অনুশাসন। মা হয়ে সন্তান হনন — এতো আসুরিক অপরাধের সাজায় নয় — তাই তো মধুপানের এই প্রয়োজন। ওদিকে অসুরও পেয়ে এল মায়ের, মার হাতে অথবা আমি মায়ের — মায়ের বলেই। সেদিন অসুরের মনে ছিল শুধু — মা - মা ডাকটি। সেদিন অসুর ভেবে এসেছিল নিজের কথাতে নয়, হেরেই। মা মুখোমুখিতে সন্তানের চোখের সেই ভীরু ভাষা। তাই অভিমানে ভুলে নিলেন চরণ মেয়েছে সন্তানের বুকে।

মায়ের এই লীলা শেষ হয়ে যায়নি একটি দিনে বা অহরে। নিত্য এ লীলা চলেছে নিত্যলোকে। চলছে প্রতিটি অসুরের ভেতে — অন্তরে। যার প্রাণশক্তি প্রভুর কিন্তু নেই ওজাবেগ — সেই তো অসুর। মদ, মদ, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা আর অজ্ঞানতা — এগুলিই তো আসুরিক সম্পদ। এই অসুরকে নিধন করতে, তাকে ওজাগুণে নিয়ে যেতে - জগন্মাতাকে আজন অবিরত হোম করতেই হবে আসতে হয় নিত্য — নানারূপে — নানা ভাবে।

দুর্গা

দেবী মহামায়ার সেই নানা রূপেরই একটি হল মহিষাসুরমর্দিনী রূপ। তাঁর সেই রূপের উদ্ভবের কথা প্রথিত হয়েছে মার্কণ্ডেয় পুরাণের পাতায়, আছে দেবী ভাগবতে।

তখন চলছে সপ্তম মনু বৈবস্বতের কাল। স্বর্গে ইন্দ্র তখন পুরন্দর। ইঁর শতাব্দরে দৈত্যরা তখন হতমান। দেবতারা তখন হয়েছেন অধিকারচ্যুত আর দেবতাদের পরাজিত দৈত্যরা তখন পাতালবাসী।

ওইরকমই একটা সময় প্রজাপতি ব্রহ্মাদের উঁহসে মনুর গর্ভে জন্মান দুই সন্তান করম্ভ আর রম্ভ।

করম্ভ আর রম্ভ বড় হয়ে দেখে দৈত্যদের অবস্থা। বুঝতে পারে, দৈত্যদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হলে প্রয়োজন যোগ্য নেতৃত্বের। আরও বুঝতে পারে, সে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা তাদের কারও নেই। তাই যোগ্য নেতৃত্ব জন্য, নিজেদের অভিলাষপূরণকারী পুত্রের জন্য করম্ভ আর রম্ভ শুরু করল সুকঠিন এক তপস্যা। তাদের তপের শৈবশক্তি ছাড়া পরাজিত করা যাবে না দেবতাদের। তাই সেই শক্তি

আর্জনের জন্যই শুরু হল তপস্যা।

পঞ্চজন প্রদেশে — বিন্ধ্যহিম পীঠকে ঘিরে পীঠে, প্রীঢ়ে, পদ্মে, বর্ষায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে অসুর আছে আছে থাকে।

অন্যদিকে রম্ভ আর চারিদিকে অধিষ্ঠিত ছোলে বীর সুর্যের প্রখর কিরণের মধ্যে জলতে থাকে তপস্যা। রম্ভ তখন অধিষ্ঠাত্রী।

দুই ভাই — অসুর আর রম্ভ-র সেই সুকঠোর তপস্যায় ভীত হয়ে ওঠেন ইন্দ্র - পুরন্দর। কখনও হাজারো তারে এক হীন চক্রান্তের জাল ফেলেন ইন্দ্র। তাদের কোনও ভাবে যদি বুঝতেন একজনের মৃত্যু ঘটানো যায়, তাহলে ত্রিভুবনেতে মানা হাহা থাকবেন। তাই কোনও এক ভাইকে হত্যার জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন ইন্দ্র।

অসুর অনেক আগে একমনে ডেকে চলেছে আরাধ্যাকে। কোনও দিকে দৃষ্টি নেই তার। সেই সুযোগে ইন্দ্র নেমে পড়েন জলে। তারপর ভয়ঙ্কর এক কুমিরের রূপ ধরে পদ্মীর জলে টেনে নিয়ে যান করছেন। আক্রমণের কোনও সুযোগ না দিয়েই ভীষ্মদাঁতে ছিন্নভিন্ন করে ফেলেন অসুরের শরীর।

অসুরের এই শোচনীয় পরিণতির কথা শুনেই ক্রোধে রক্তের খুটী চোখ বন্ধ হয়ে। আত্মগর্বিত লোচনে প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে সব দেবতাকে ধ্বংস করার জন্য সে নেয় চরম পণ। সেই থেকে মরণ নিশ্চিত করে রম্ভ অধিতে দিতে যায় আহুতি। তার সেই আত্মঘাতী আত্মনীড়নের মুহূর্তে আবির্ভূত হন অগ্নি। তাকে নিরস্ত করে নিতে চান বর।

অগ্নির কথায় রম্ভ বলেন, সত্যিই যদি বর দিতে হয়, তাহলে এই বর দিন — আমার যেন ত্রৈলোক্যবিজয়ী পরাক্রমশালিতার সমকক্ষ একটি পুত্র হয়। সে যেন সেই, সমস্ত এলা জনমের আক্রোশ হয়।

অগ্নি বলে, তাই হবে। তুমি দেবরাজের পরাজিত করতে পারবে না কিন্তু তোমার ছেলের হাতে পরাজিত হবে দেবতারা। অমিত বলশালী তোমার সে পুত্র হবে অজেয়। তাই তুমি আর তয় তোমার এই ভয়ঙ্কর সংকল্প।

রম্ভ আনন্দিত। অগ্নির কথায় তপস্যা থেকেও সে হয় নিবৃত্ত। পথ ধরে সে এগায় নিজ আবাসের।

পথে যেতে যেতে বিশালকায় এক মহিষীকে দেখে রম্ভ তাকেই করে ভার্যা সম্ভার। তারপর তাকে আশ্রমে এনে পালন করতে থাকে। প্রতীক্ষা করতে থাকে সেই বিজয়ী অগ্নির বিক্রম পুত্রের জন্য।

সেদিন অকস্মাৎই এক ভীষণ মহিষ তাড়া করে সেই মহিষীকে। ভীতা মহিষীকে রক্ষা করতে এগিয়ে যায় রম্ভ। নিজে নিজেন, অমন বলশালী রম্ভ সেই মহিষের ভীষণ শৃঙ্গের আঘাতে হল নিহত।

রম্ভ নিহত। শোকে নিশ্চল তার আত্মজরা। সান্ত্বনা দিয়া। চিতায় আরোহণ করতে উদ্যত হওয়ার পরই ঘটে আরও এক বিস্ময়কর ঘটনা। সেই মহিষী কোথা থেকে ছুটে এসে ঝাঁপ দেয় সেই আগুনে। রম্ভের প্রতি তার এই একনিষ্ঠতা দেখে নিশ্চিত হন সবাই।

বিস্ময়ের অবশ্য বাকী ছিল তখনও। মহিষী আগুনে ঝাঁপ দেওয়ায় ঠিক পূর্বমুহূর্তে তার গর্ভমোচন করে অবিকৃত হয়ে এক মহিষ — মহিষাসুর। তার মুখটির গঠনে তখনিসার হল প্রতিনিধি।

একমনস্ক নেত্রে চিন্তায় আগুন। পিতৃপিতৃত্বের শোচনীয় মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে — দেবরাজের পরাজিত করতে মহিষাসুর বসল তপস্যায় সুমেরু পাহাড়ে। দশ হাজার বছর তপস্যায় পর তার সামনে আবির্ভূত হন ব্রহ্মাজি ব্রহ্মা। বাসনা, বলে, মহিষাসুর, ভীষণ ভয়ঙ্কর তপস্যায়। বর কী বর চাও তুমি? আজ তোমাকে অদেয় আর কিছুই নেই আমার।

যদি তুষ্টই হয়ে থাকেন, তাহলে দিন আমাকে অমরত্ব।

ব্রহ্মা বলে, তা হয় না মহিষ। সে বর দিতে আমিও প্রকৃতির বিপরীতাচরণ করতে পারি না। অমরত্ব ছাড়া অন্য বর চাও তুমি।

মহিষ বলে, তাহে বর দিন, কোনও পুরুষ — সে দেবতা, দানব বা মানুষ যেই হোক না কেন, তার হাতে মৃত্যু হবে না আমার। অবলা নারী আমার কিছুই করতে পারবে না। বরং নারীর হাতে মৃত্যুই যেন থাকে আমার। ব্রহ্মা বলেন, তাই হবে। আজ থেকে তুমি পুরুষের অবধ্য।

মহানন্দিত মহিষাসুর। নিজ রাজ্যে ফিরে এসে সংগঠিত করে অসুরসেনা। তারপর আক্রমণ স্বর্গ রাজ্য। মহিষাসুরের সেই মহাবিক্রমের সামনে নিষ্ক্রিয় হয় দেবতারা। অমরাবতী ছেড়ে পালায় তাঁরা। বিচরণ করতে থাকেন পাহাড়ে কন্দরে, সাধারণ মানুষের মতই।

অসুর মহিষাসুর তখন ত্রিভুবনে। ত্রিভুবন আর পদানত। তারপর নারী ছাড়া অন্য অমরত্ব হাতে মৃত্যু ঘটবে না তার — ব্রহ্মার এই বর তাকে করে তোলে অন্তর্নিহিত। অন্তর্নিহিত স্থানে অসুরের।

আজ অহংকারের ছিন্ন বন্ধেই তৈরী হবে আমাদের পতাকার পট।

ওদিকে হতভম্ব দেবতারা মহিষাসুরের হাতে সব হারিয়েও তার অত্যাচার উৎপাতের থাপরে হতে পারেন না একদম। তাই দুঃখের মাঝেরও দুজনা অবসর।

তবে হয়ত আজকেই যেমন আসে নি, অন্ধকারের পর আসিত হয় পৃথিবী হীরেজোহ্বল রোদের ঝলায়, ঠিক তেমনি একদিন দেবতাদের প্রার্থনাকুলের ডাকা হয়ে ওঠে। সৌভাগ্যের সূর্য ওঠার ইঙ্গিত রোদ্দুর দেখা যেতে পূবাকাশে। দেবতারা হন আশান্বিত। এরসিনেও নিজামর ব্রহ্মার কাছে না আওয়ার অপরাধে তাঁদের করে বিমুখ। তবে সে বিমুখতা কাটতে সময় লাগে না। ইন্দ্রের নেতৃত্বে তাঁরা যান ব্রহ্মার কাছে। দেবতাদের এই দীনবেশ দেখে ব্রহ্মা হন দুঃখিত। প্রকাশও করেন তাঁর দুঃখ। আর তাতেই ক্ষুব্ধ দেবতারা সমস্বরে বলেন, আমাদের এই অবস্থার জন্য তো দায়ী আপনিই। আপনারই বরে অজেয় আজ মহিষাসুর। আর তাইতো আমরা আজ সর্বহারা।

সে কথা শুনে হাসেন ব্রহ্মা। বলেন, ঠিকই বলেছ তোমরা। তোমাদের এই দুঃখের জন্য দায়ী আমিই। কিন্তু যখন দুঃখে মরমর ছিলে তোমরা, তখন কি একবারও ভেবেছ আমার কথা?

মাথা নীচু করেন দেবতারা। তাই দেখে পরা হয় ব্রহ্মার। বলেন, যাক যাও এসব কথা। এখন কি করতে চাও বল।

আমাদের এই দুঃখের হয়ত করে শেষ হবে? কবে আবার স্বর্গ করায়ত্ত হবে আমাদের!

ব্রহ্মা বলে, দেখ এ ব্যাপারে আমার কিছু নেই। চল আমরা যাই হরি ও হরের কাছে যাই। তাঁরা হয়তো একটা উপায় বলতে পারবেন।

অতএব ব্রহ্মার নেতৃত্বে সবাই যান মহাদেব ও বিষ্ণুর কাছে। সবার আগেই বিষ্ণু শুনতে পান তাঁদের দুর্দশার কথা। সে সব কথা শুনতে শুনতেই ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন শিব ও বিষ্ণু। তাঁদের মুখ মণ্ডল থেকে নির্গত হতে থাকে এক মহাতেজের ছোঁয়া। একই রকমের তেজ নির্গত হয় ব্রহ্মার বদন মণ্ডল থেকেও। তাই দেখে দেবতারাও হন ধীর। তেজের রূপ ধরে থাকে তাঁদের মুখমণ্ডল থেকেও। সবার সমন্বয়ের সেই বিশালকায়ী অনুপম তেজরাশি থেকেই আবির্ভূতা হন এক নারী। তেজোময়ী, পরম কল্যাণময়ী মহিষমর্দনকারী সেই দেবী শিবাকে বর্ণনা করা যায়ই এক অনির্বচনীয় আনন্দধারায় প্লাবিত হয় দেবতাদের হৃদয়। সেই আনন্দিত হৃদয় আনন্দময়ীকে সাজাতে চায় নানা অস্ত্র আভরণে। আর তাই দেবরাজই মহাজয়ের সব অস্ত্র নিক্ষাশন করেন নিজেদের অস্ত্র থেকে আর তাই দিয়ে সাজান দেবীকে। সেই সময় শিব দিলেন শূল, বিষ্ণু দিলেন চক্র, ব্রহ্মা দিলেন কমণ্ডলু ও অক্ষমালা, ইন্দ্র দিলেন বজ্র এবং অন্যান্য দেবতারা সাজালেন তাঁকে তাঁদের অস্ত্র দিয়েই। হিমালয় তখন দেবীকে দিলেন তাঁর বাহন সিংহ, সমুদ্র তাঁর আধার দিলেন কমল মালা, গন্ধরাও দিলেন সেই গন্ধেরই মালা এবং হাতেও দিলেন একটা রক্তকমল।

দেবতাদের তেজসম্ভূতা সেই দেবী নানা অস্ত্রে এবং অলঙ্কারে সজ্জিত হয়েই অট্টহাস্য করে উঠলেন। তাঁর সেই অট্টহাসে দেবতাদের হৃদয় পরিপূর্ণ হল আনন্দে আর তাঁরাও করলেন অসুরদের খুঁজে।

মহিষাসুর স্বয়ং বেরিয়ে এসে সেই সাহসের মুখোমুখি হয়েই থমকে দাঁড়ায়। এ কে এই নারী! আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে কে হাসে অমন করে! একী তেজ — ! পরমুহূর্তেই নিজেকে সংযত করে মহিষাসুর আদেশ দেয় সৈন্যদের — ধর ধরো ওই নারীকে।

অসুররা ঝাঁপিয়ে পড়ে দেবীর ওপর। তিনি নিমেষ অন্তরালে প্রায় মুহূর্তেই মহিষাসুরকে করলেন সৈন্যহীন।

ওই দেখে কিন্তু মহিষাসুর মহিষের রূপ নিয়েই ছেড়ে যান দেবীর দিকে। মহিষাসুরের ওই মূর্তি দেখে দেবী প্রথমে তাকে পাশবদ্ধ করেছেই মহিষ রেখে দিয়ে মূর্তি। কিন্তু দেবীর অসির আঘাতে ছিন্ন হল শিরোদেহ মস্তক।

এবার মহিষাসুর বিরাট এক পুরুষের মূর্তিতে এগিয়ে আসে দেবীর দিকে সগর্জনে। কিন্তু দেবী সেই পুরুষকে পরাস্ত করে জর্জরিত করতে থাকলে সে নেয় নতুন ছদ্মবেশ। কিন্তু তাতেও বিপর্যস্ত হয়ে থাকার সময় মহিষের মূর্তি ধরেই আক্রমণ করেন দেবীকে।

দেবীও তখন মধুপান করে নেন হয়ে হয়ে। মধু পান করতে করতেই তিনি বলেন, —আমি যতক্ষণ মধু পান করি ততক্ষণ তুই হেঁসিয়ে নে, তারপর আমি থেকে হয়ো করলে দেখবি এমনই গর্জন করছে দেবতারা।

একথায় আরও ক্ষিপ্ত হয়ে মহিষ

এগিয়ে আসতেই দেবী জাগ দিয়ে তাকে নিচে উঠে যা দিয়ে ফেলে মাথের তার গলা আর শুলটা বসিয়ে দেন তার শরীরে।

সেব ছেড়ে ওরে নরিষাসুর। বহিষ দেব থেকে বেরিয়ে আসতে চায় সে। কিন্তু আর দেহ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রান্ত হবে না হতেই মহামায়া তাঁর হাতের অসি দিয়ে ছিন্ন করলেন অসুরের মাথা।

নিহত হল অসুর। আর জয়ধ্বনি দিলেন মুখর হলেন দেবতারা। তাঁরা বলতে থাকেন, মা, তুমি ত্রিলোকজিতা, তুমিই সমস্ত জগতের হেতুস্বরূপা। তুমিই সকলের আশ্রয় — এই জগৎ তোমারই অংশ স্বরূপ, তুমি নিত্যস্বরূপিনী প্রকৃতি, তুমি যাদের ওপর প্রসন্ন হও, তারা হয় জগতে ধনশালী, বলশালী ও কীর্তিমান। তারা সকলে ধার্মিক, সুখী সমৃদ্ধশালী। ত্রিলোকের জগদ্ধাত্রী, তোমার প্রসাদে অভিভূত তারা হয় — ধন্যধিকারী। হে দেবী, তুমি প্রসন্ন হও, সব কিছু দিয়ে আমাদের রক্ষা কর — এটিই শুধু আমাদের প্রার্থনা।

সেদিন দেবতারা যে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, সেই একই প্রার্থনা করে অসুর ফুলে ফুলে। বলে, হে মাতঃ, প্রসন্না হও, বৃদ্ধি সমৃদ্ধি দান দাও আমাদের। রক্ষা কর তুমি মা, তুমি হে সর্বমঙ্গলা।

তিন

দুর্গাপূজা বলতে তোমরা শরৎ উৎসবকেই। কিন্তু একে আবার বলে অকাল বোধন। তাহলে আসল বোধন কোনটি? বলা হয়, রামায়ণে দেবী অকালীন পূজাই নিজ আগে প্রচলিত। তারপর এল শারদে অকাল বোধন।[১,২]

কেমন ছিল?

একদা আসন্ন নিচে হয় পূজা এ মহাআয়োজন। পৌষ সংক্রান্তির পর সূর্য কলস রাশিতে গেলে হয় উত্তরায়ণ। একদা হয় রাত্রি। এটা হল দেবতাদের দিন। আসন্ন আরও সংক্রান্তিতে সূর্য কর্কট রাশিতে গেলে হয় দক্ষিণায়ন। এরও রাত্রি হয় যায়। এটা হল দেবতাদের রাত্রি। তাঁদের ঘুমনোর সময়।

ত্রেতায়ুগ হয় রাবণের যুদ্ধ তখন শুরু হল, তখন দেবতাদের মধ্যরাত্রি। দেবী তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। তখন তাঁর জাগরণ, তাঁর অকাল বোধন না হলে রাবণ শত্রুর সংহার নয় সাধন হবে। শিবসহ ব্রহ্মাকে নিয়ে সম্পন্ন করালেন হল দেবীর বোধন — তাঁকে জাগরিত করার প্রক্রিয়া। তুষ্টা দেবী জন্মগ্রহণ এসে বললেন, আজ, দেবতাদের নিত্য তুষ্টি, পূজা, প্রশাসনির দ্বারা তব তোষণ। তাতেই জাগবেন দেবী।

বোধনের নিত্য সেই বোধনের ফলে জাগলেন দেবী। প্রসন্ন হয়ে রামচন্দ্রকে দিলেন বর। দেবী বোধনিলেন অকিল মাসের শুক্লা প্রতিপদে। তাই এখনও ওই দিনেই শুরু হয় বোধন অনুষ্ঠান।

তবে বাল্মীকির রামায়ণে এ কাহিনী নেই। আছে পুরাণে। আবার কৃত্তিবাসের রামায়ণে আছে। রামচন্দ্র নিজেই করেছিলেন এই পূজা। সে যাই হোক, অকালে মহা রাত্রে দেবীকে জাগরিত করে যে পূজার আয়োজন তাই পরিচিত অকালবোধন নামে। তবে আবহাওয়া, কৃষির উৎপাদন, অবসর সব মিলিয়ে শরৎকালের অকাল বোধনই পরিণত হয়েছে বাঙালির জাতীয় উৎসবে।

এই পূজায় অনাদিতে অন্য হল নবপত্রিকার প্রবেশ এবং স্নান পূজা। যে নবপত্রিকা সাধারণ ভাষে পরিচিত কলাবউ হিসেবে। সাধারণের ধারণা, কলাবউ হল গণেশের বউ। কিন্তু ধারণাটি সম্পূর্ণ ভুল। কলাবউ হল দেবী শক্তির প্রতীক নটি ওষধির সমন্বিত পূজা।

কোন সে নটি ওষধি? নটি শক্তির প্রতীক ওই নটি গাছের ছাল হল কলা, কচু, হলুদ, জয়ন্তী, বেল, ডালিম, অশোক, মানকচু ও ধান। এর মধ্যে কলাগাছের অধিষ্ঠাত্রী হল ব্রহ্মাণী, কচুর কালী, হলুদের দুর্গা, জয়ন্তীর কার্তিকী, বেলের শিবা, ডালিমের রক্তদন্তিকা, অশোকের শোকরহিতা, মানকচুর চামুণ্ডা এবং ধানের লক্ষ্মী। এই নটি গাছকে কোত অপরাজিতা লতা ও হলুদ সুতোয় বেঁধে কাপড় পরিয়ে অবগুণ্ঠনবতী বধূর রূপ দেওয়া হয়। সমারোহসহকারে এই নবপত্রিকার অধিষ্ঠাত্রী হয় দুর্গা। অতীতে মূর্তি নবপত্রিকাতেই হয় পূজা। আজও তার রেশ ধরে পূজার প্রথম দিনে হয় নবপত্রিকার প্রবেশ।

চার

দুর্গাপূজা — শুধু পূজা নয়, দুর্গা হল উৎসব — শারদোৎসব। বাঙালির জাতীয় উৎসব। তার শুভারম্ভ জাগ্রত হওয়ার উৎসব। সকলকে নিয়ে সকলের হিতের জন্য, সকলের এই শুভ উৎসব। যেন আবহমান গল-উৎসবের।

দুর্গা মূর্তির পরিকাঠামোতেই রয়েছে সর্বভূতের কল্যাণের বিষয়গুলি। সকলকে নিয়ে — সকলের হিতের জন্যই দেবীর অধিষ্ঠান। অসুর শক্তির অধিকারিণী

নিবন্ধ

দুর্গাপুজো : কলকাতা ছাড়িয়ে মিশ্র সংস্কৃতির আঙিনায়

ডঃ তাপস বসু

বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো কলকাতাতেও শারদীয়া দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হচ্ছে সাড়ম্বরে। কলকাতার দুটো প্রথম পারিবারিক পুজোর সঙ্গে সাত্ত্বা নবকৃষ্ণদেবের গোষ্ঠীগত পরিবারের বাড়ীতে। সেই পুজো শুরু হয়েছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাতে নিযুক্ত ইনসেটান্স পদাধিকারের সময়ে। আর একটি নথীভুক্ত গোষ্ঠীগত পরিবারের বারোয়ারী দুর্গাপুজোয় উপস্থিত হয়েছিলেন। হয়েছিল। সেই পুজো আজও অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তবে, আগেকার গৌরবময় আর নেই। এরপরেই কলকাতার অন্যতম প্রাচীন দুর্গাপুজো হল সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের। এই পুজো শুরু হয়েছিল ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে বড়িষায়। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখা ভালো আমাদের বর্তমান কলকাতা আসলে তৎকালীন সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতা এই তিনটি অঞ্চলের প্রতিনিধি হিসেবে সাবর্ণ রায়চৌধুরীরা। তাঁদের কাছ থেকে ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৩০০ টাকায় তিনিয়ের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই তিনটি অঞ্চল যার সংযুক্তি আমাদের কলকাতা। —তা কিনে নিয়েছিল। এই কলকাতাতেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেছিল তাদের ব্যবসাবাণিজ্যের রাজধানী।

শহরটিতে ছড়িয়ে কলকাতার নানা অঞ্চলে দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠিত হয়েছে অভিজাত বিত্তশালী মানুষদের বাড়ীতে। ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ঘর কর্ণওয়ালিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রেক্ষিতে নায়েবাদি প্রভিন্সী রাইয়তদের মধ্য দিয়ে হয়ে প্রচুর অর্থ-বিত্তের মালিক হয়ে যাওয়া অভিজাত মানুষেরা গ্রামীণ জীবন থেকে কলকাতা মহানগরীতে পৌঁছে বাগবাজারী নয় বড় বড় অট্টালিকা তৈরী করলেন। সেই বাড়ীর সঙ্গেই বিভিন্ন পূজামন্ডপ তৈরী হল বহুতর মকলাদের। সেই সব জমজমাটেই লক্ষ্যের তাঁরা শুরু করেছিলেন পুজো। তার মধ্যে কোনো কোনো বাড়ীতে আজও পুজো অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। কোথাও কোথাও কালের নির্মম প্রহারে বন্ধ হয়ে গেছে সেই দুর্গাপুজো, কলকাতায় বারোয়ারি দুর্গাপুজো বা দুর্গোৎসবের সূচনা অনেক পরে। পলাশীর প্রান্তরে কলঙ্কিত আম্রকাননের পর ব্রিটিশরাজশক্তি ভেঙেবার উদ্যোগ করেছিলেন বিশেষত বাংলার মধ্যে শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে মুঘলসম্রাট মহম্মদ উদ্যোগে উদ্যোগ কলকাতার নিজেদের অঞ্চলে শহরের প্রথম সার্বজনীন দুর্গোৎসব শুরু হয়।

দুই

কলকাতার পুজো নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, হচ্ছে এখনও লেখালেখিও। প্রথম দুটি কলকাতা ছড়িয়ে বৃহত্তর বাংলার মিশ্র সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে যে সকল দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে দীর্ঘদিন ধরে সেগুলিকেই দৃষ্টি দেওয়া।

বাংলাদেশে দুর্গাপুজোর সূচনা করে হয়েছিল এর উত্তরে সকলেই যে কথা বলে থাকেন সেই কথাটি আমরাও একবার উল্লেখ করবো আলোচনার শুরুতে। বর্তমান বাংলাদেশ অর্থাৎ পূর্বের বাংলার রাজশাহী জেলার তাহেরপুর নামের একটি ছোট রাজ্যের রাজা ছিলেন কংসনারায়ণ। তিনিই প্রথম শুরু করেছিলেন দুর্গাপুজো। তিনি ছিলেন মানুসংহিতার প্রসিদ্ধ টীকাকার কুলুকভট্টের পুত্র। সেই পুজো অনুষ্ঠিত হয়েছিল শারৎকালে, রামায়ণের অকালবোধনের অনুষঙ্গে। তবে, কংসনারায়ণের পুজোয় আট লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল বলে ব্রিটিশ লেখালেখিতে যে উল্লেখ আছে, সেটি বোধহয় ঠিক না। তবে রাজকর্মচারীর যে অভাব ছিল না, সে কথা আমরা প্রমাণের সঙ্গে বলতে পারি।

শরৎকালে দুর্গাপুজো শুরু হওয়ার কারণের অনুসন্ধানের সূত্রে — সে কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু, শ্রী শ্রী চণ্ডীতে (মার্কণ্ডেয় পুরাণের ৮১-৯৩ অধ্যায়) বর্ণিত মধু ও কৈটভ দৈত্য ব্রহ্মাবধে বলদৃপ্তা দুর্গার মূর্তিটি তৈরী করে বসন্তকালে যে দুর্গাপুজো করেছিলেন সেটিই আদি দুর্গাপুজো। বসন্তকালে ত্রেতাযুগের রামও দুর্গাপুজো করেছিলেন বলে কথিত আছে। রাজা রাজেন্দ্রলাল ঘোষাল পরবর্তীতে বাংলাদেশে শরৎকালে অকালবোধনের সূত্র ধরে যে দুর্গাপুজো শুরু করেছিলেন তা থেকেই আমাদের পারিবারিক দুর্গাপুজোর প্রচলন-এ কথা সর্বজনবিদিত।

বসন্তকাল থেকে শরৎকালে দুর্গাপুজো সরে আসার আর একটি কারণ, শরৎকালে কৃষিক্ষেত্রে পুরুষদের অনেক বেশি অংশগ্রহণ করতে হয়, সেই কারণে যাতে তাঁরা প্রায় দুমাস পরিবারের মহিলাদের আনন্দময় সঙ্গ পেতে পারেন সেইজন্য উৎসবটি আনন্দে-উল্লাসে। এই কৃষি এবং কৃষিক্ষেত্রে অনার্যদের অনুকরণে দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হওয়ার বিষয়ে অনার্য সংস্কৃতির প্রভাব যে সুস্পষ্ট তা আমরা জানতে পারি কালপুরুষের জীমূতবাহনের "কালবিবেক" গ্রন্থ থেকে। এই দুর্গাপুজোকে তিনি শারদা পূজা বলেই উল্লেখ করেছেন। দুর্গার মূর্তি কল্পনা, পূজার উপকরণ সাজান থেকে যে প্রাণী অন্তর্ভুক্ত আবশ্যক অর্থনীতির পরিবেশে এবং লোকায়ত ভেতনার প্রকাশে পরিচয় হয়েছে। নরপরিকার পূজো, শক্ত-গাছ-কলা ইত্যাদির সংগ্রহ অনার্য অনুষ্ঠানের জীবনের কথাই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। আমরা দিয়ে, ঘটি, বটিম, ইঁদুর, পেঁচা, হাঁস, মদুর, সাপ ইত্যাদির অনুকরণ সেই আদিমদের শিকারী জীবনের স্মারক। শিকারী জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দুর্গাপুজো শিকারের উপযুক্ত সময় বসন্তকালেই অনুষ্ঠিত হতো। আবশ্যক অর্থনীতি থেকে কৃষিনির্ভরতায় উত্তরণের ফলে মানুষ শিকারের পর্ব থেকে সরে এসে কৃষিকেন্দ্রিক জীবনধারায় অভ্যস্ত হয়ে উঠল যখন, তখন এই দুর্গোৎসব বসন্তকাল থেকে এগিয়ে এল শরৎকালে। অকালবোধনের সঙ্গে কৃষিনির্ভরতার বিষয়টি সংযুক্ত হয়ে আছে — এমন বলেছেন রবীন্দ্রনাথ রক্তকরবী নাটকের প্রয়োজনায়। রামচন্দ্র তাঁর জন্মে সম্পূর্ণমন নয়। রবীন্দ্রনাথের মতে, রামচন্দ্র কৃষিসভ্যতার প্রতীক এবং রাক্ষস সভ্যতা — অনার্য সভ্যতাকে আক্রমণ করায় তাদেরই সূত্রে রাবণ রাজা - অনুর্বর পতিত প্রতীক। রাবণের পরাজয়ে এবং রামচন্দ্রের জয়ে কৃষিনির্ভরতার প্রাধান্যই সূচিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য দেবী দুর্গা তাঁর সন্তান-সন্ততি এবং তাঁদের বাহনগুলি সবে প্রকৃত অর্থে আদিম জনগোষ্ঠীর সম্পর্ক সূচিত হয়েছে। তাদের কুলপ্রতীক (টোটেম) পশু, পাখি, গাছপালা অর্থাৎ দিয়ে, হাতি (পদ্মেশ্বর মালা), সাপ, পেঁচা, হাঁস, মদুর, ইঁদুর ও অন্যান্যদের প্রসঙ্গে।

স্ত্রিন

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের দেবীসূক্তে প্রথম অভিব্যক্তির সম্পর্কে নিয়োক্ত ঋক-মন্ত্র শক্তিতত্ত্বের প্রবীণদের কাছে নিয়ে আলোচনার প্রথম সূত্রপাত ঘটে। আমাদের দেশ-দেহীদের যে শরিরে আছে সেখানে ছিন্ন শির নেই, আছেন কবন্ধ। এই কবন্ধ পৌরাণিক যুগে এসে শিবের লিঙ্গে একাকার হয়ে গেছেন। তেমনি কবন্ধী হয়েছেন শিবানী। শিব-শিবানীর যুগ পরেই এসেছেন পার্বতী, হৈমবতী ও উমা। পরবর্তীকালে এঁরাই দুর্গা নামে সুপ্রসিদ্ধা। দুর্গা অবশ্য চণ্ডীর সঙ্গে মিশে গেছেন। এসবই পৌরাণিক যুগের ঘটনা। তবে, দুর্গা যে পৌরাণিক যুগের দেবী নন তার পরিচয় পাই বৈদিকীয় আরণ্যকের অনুগত মন্ত্রিকা উপনিষদে। সেখানে দুর্গার উপস্থিতি আমরা লক্ষ্য করি একটি গায়ত্রী মন্ত্রে "তন্নো দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ"। দুর্গি এখানে দুর্গারই সমার্থক। বৈদিকীয় আরণ্যকেরই নারায়ণ উপনিষদে দেখি "তামগ্নিবর্ণাং, তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্। / দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরসিতরেন নমঃ।" দুর্গার কথা বৈদিক সাহিত্যে যেমন আছে, তেমনি বৈদিক যুগের অনেক আগের অনার্য গোত্রের মানুষদের মধ্যে অর্থাৎ লোকায়ত চেতনায়ও তাঁর

উপস্থিতি ছিল। পৌরাণিক যুগে দেবী দুর্গার নানা রূপভেদ নানান নামে অনার্য সমাজের লোকায়ত দেবতার রূপ ও নাম - বৈচিত্র্যে আমরা লক্ষ্য করব। দুর্গার সেই রূপ ও নাম আজও অবলুপ্ত।

সাধারণতঃ দুর্গতিনাশিনী মাতৃমূর্তি আমরা দুর্গাকে জানি। অনার্য দুর্গার লোকেরাও জানত। পৌরাণিক যুগে দুর্গা নামের নানা ব্যাখ্যা আমরা পাই। 'শব্দকল্পদ্রুম'-এ দুর্গা শব্দের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে এইভাবে – 'দুর্গে মৈত্রে ব্রহ্মবিষ্ণু ভবরূপে কৃতবর্ণনি।/শোকে দুঃখে চ নরকে স্মরণেও চ মুক্তিদে।। মহাভারতেইতিহাসেষু চাখ্যাপনেষু যত্নবানঃ।/এতান্ যত্নের যা দেবী সা দুর্গা পরিকীর্তিতা।।' অর্থাৎ দুর্গা নামক মৈত্রে, ব্রহ্মবিষ্ণু, ভবরূপে, কুকর্মে, শোকে, দুঃখে, নরকে, স্মরণেও, মুক্তি, মহাভারত এবং অভিযোগ - সকলকে স্মরণ করেন যে দেবী তিনিই দুর্গা নামে পরিকীর্তিতা। (এই কারণেই সাধারণ মানুষ মহাকালে দুর্গাকে স্মরণ করে।) 'দুর্গা' শব্দের ব্যাখ্যা মার্কণ্ডেয় পুরাণে ৪/১১, ৫/১২, ১১/৪৯ -৫০ ইত্যাদি শ্লোকে বিস্তৃতভাবে আমরা পাই। এই শ্লোকে আছে 'দুর্গমি ভবসাগরে নৌরাকরূপ রূপে তুমি দুর্গা', 'দুর্গ নামক মহাসুরকে বধ করেছ বলে তুমি দুর্গা' ইত্যাদি। মার্কণ্ডেয় পুরাণ ছাড়া দেবীপুরাণে (৮০/৮২ ৮৩), দেবী ভাগবতে (৪/২৪/৫-৬), হরিবংশে (১২০/৪৩) 'দুর্গা' নামের নানা ব্যাখ্যা আছে। দুর্গার সর্বাঙ্গসুন্দরীরূপটি মার্কণ্ডেয় পুরাণেই সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে দুর্গা মালা, মহাদেবী শক্তি, তিনি সৃষ্টি-স্থিতিবিনাশকারিণী/ধন্য, সিদ্ধা, ক্ষুধা, তৃপ্তি, তৃষ্ণা, প্রভা, ক্ষমা, ধৃতি, তুষ্টি, পুষ্টি, শান্তি, মাতৃরূপ-এই সকলের অধিষ্ঠাত্রী তিনি।

পুরাবিদ যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বলেছেন :-

১) আধ্যাত্মিক অর্থে দুর্গা বিশ্বজননী মহাশক্তি,

২) অধিভৌতিক অর্থে পঞ্চভূতের মধ্যে দুর্গা অধিষ্ঠাতা।

৩) মনস্তাত্ত্বিক অর্থে দুর্গা রজোগুণের শক্তি।

চার

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মৃত্তিকার উৎপাদন থেকেই পরিবার ও সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক। এই মাতৃতান্ত্রিক তন্ত্রের মূল ধরেই মাতৃদেবীর আবির্ভাব। মাতৃদেবী পরিকল্পনার মূলে শস্য উৎপাদন ও গৌরাঙ্গনের পাশে উদ্ভানের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করার বাসনা ছিল প্রবল। তাছাড়া সমাজে মাতৃদেবীর প্রাধান্য যেমন প্রকৃতিতত্ত্বিক কারণে ও গবেষণার প্রমাণিত, তেমনি সমাজে নারীর স্থান ছিল সবার ওপরে, তাও সুবিদিত। গ্রীসে আফ্রোদা, সুমিক, মিশরে টাওয়াত, ইন্দিস অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতায় অক্টোথ, সিবিলী প্রমুখ নানা দেবীর পরিচয় পাই। শেষোক্ত দেবী এশিয়া মাইনরে, কুবলনালীর অঞ্চলে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। ক্রীট ও নিকটবর্তী অঞ্চলে প্রাক্ত পাথরের গায়ে অঙ্কিত মাতৃদেবীদের আমরা প্রধানতঃ দুটি রূপে পাই ১) মাতৃরূপা কুমারী, মাতৃরূপায় গোত্রিতা, বৃক্ষাধিষ্ঠাত্রী, বন্যপশুরক্ষা কারীমূর্তি ২) বৃক্ষরূপা নারীমূর্তি, সম্মুখে একটি গাছ থেকে বৃক্ষশাখারূপ একটি শূল, ৩) একটি বৃক্ষকুলের উপাধিষ্ঠা। সদ্য নারীমূর্তি, ৪) অন্যান্যমূর্তিসমূহ ও। উপরীয় অলঙ্কৃত, পরিধেয়বস্ত্র উপবিষ্টা, দুই পাশে দুই সিংহরূপা পরিবৃতা দেবী সিংহাসনে পাদযুক্ত একটি মঞ্চরূপে শূল ধারণ আঘাত করছেন। মাতৃদেবীরূপা প্রত্নতত্ত্বে যে মূর্তিগুলি পাওয়া গিয়েছে তার অধিকাংশই নারী। অন্যতম: দেবীমূর্তি। ইতিহাসের নিরিখে আমরা জানতে পারি যে, মাতৃ-সভ্যতার শুরু ২০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। তার আগের ইতিহাস অনার্য সভ্যতার ইতিহাস। এদের মধ্যে ছিল - কোল, ভীল, মুণ্ডা, শবর, পুলিন্দ, সাঁওতাল, প্রভৃতি গোষ্ঠীর মানুষেরা। এদের জীবনযাত্রে ছিল মাতৃতান্ত্রিক। এই মাতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীদেবী ছিল প্রধান। দুর্গা তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

দুর্গার সঙ্গে চণ্ডী এক হয়ে গেছেন বৈদিক-উত্তর পৌরাণিক যুগে। দুর্গার সঙ্গে চণ্ডীর অভিন্নতা পৌরাণিক কাল থেকে এ কাল পর্যন্ত আমাদের মনোমূলে প্রোথিত হয়ে গেছে। আমাদের এই অভিজ্ঞানুসারিণী অভিধাটিও অনস্বীকার্য। তবে, চণ্ডীর সঙ্গে দুর্গার এক হয়ে

আমরা আমরা অনার্য সংস্কৃতির পারম্পর্য ও শুরুত্বকালকে বিশ্লেষণের লক্ষ্য করি। ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টি থেকে 'চণ্ডী' শব্দটি এসেছে 'ছাণ্ডী' থেকে। ভাষাতত্ত্বের মুনিজন সেন এই সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছেন। ছাণ্ডী একজন অনার্য দেবী। আদিম মানুষের বিশ্বাস, তিনি প্রতিকূলতা থেকে রক্ষা করেন। অষ্টাদশ শতকের কবিকঙ্কণ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কালকেতু উপাখ্যানে ব্যাধ কালকেতুকে রক্ষা করেছেন এবং সমৃদ্ধির অধিকারী করেছেন দেবী চণ্ডী। লোকায়ত ছোটবড় তিনি ঠিকাতিনী ও পরমী নামেও চিহ্নিত। মুনিজনের (১/৫) আমরা আরও দেখতে পাচ্ছি যে, তিনি বনে উপবনে পথের পুলিন্দ প্রভৃতি অনার্য জাতির দ্বারা পূজিত হচ্ছেন। নরকপাতালের এর কথন প্রসঙ্গে দেবীকে আমরা পাচ্ছি 'উচ্ছিষ্ট চাণ্ডালিনী' - রূপে। উচ্ছিষ্ট চাণ্ডালিনীর উৎপত্তি সম্পর্কে একটি উপাখ্যান আছে। পার্বতী শিবপুরে পাকাকালীন শঙ্কর সেখানে শঙ্খবণিকরূপে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং পার্বতীকে শাঁখা পরিয়ে কৃষ্ণকলঙ্ক তাঁকেই প্রদান করেছিলেন। দেবী শঙ্খবণিকরূপী মহেশ্বরকে চিনতে পেরে ঘরোয়ানার তাঁর অনেকক্ষণ পূর্ণ করতে লজ্জিত হলেন। পরে কোনো একদিন যখন মহেশ্বরের তাঁদের পরমী সখী পদ্মিনীকন্যা ঘরে অন্যায়ের সন্নিধানে উপস্থিত হলেন। চণ্ডালিনীর বেশে আসতা পার্বতীকে চণ্ডাল-বেশধারী মহেশ্বর চিনতে পেরে বললেন, চণ্ডালিনী বেশে এসেছ বলে তুমি 'উচ্ছিষ্ট চাণ্ডালিনী' নামে পৃথিবীতে খ্যাত হবে। 'মহাভারত' গ্রন্থে উচ্ছিষ্ট চাণ্ডালিনীর যে অন্তর্বৃত্তি পাওয়া যায় তা হলো – দেবী পথের উপর উপবিষ্টা, শুষ্কমুখ পরিহিতা, বস্ত্রবর্ণ আভরণে ভূষিতা, ওষ্ঠাধরের মলা পরিহিতা, জোড়াকর্ণিকা মুকুটী, নরকপাল ও খট্টাঙ্গধারিনী, পদ্মযোনিসম্ভবা। দেবীকে জিহ্বাহিনী, চণ্ডালিনী, পরমী ইত্যাদি নামে অভিহিতা দেখে আমরা বুঝতে পারি অনার্য সমাজপরিবেশে সাধারণ মানুষের সঙ্গে দেবীর সংযোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দেবীর গলার ওষ্ঠাধরের মলা ও পরমী নাম পাওয়া যায় বাঙলার সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদেও – 'উঁচা উঁচা পাবত তাহি বসই সবরী বালী।/মোরঙ্গি পিচ্ছ পরহিন সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী।।' অর্থাৎ দেবী পরমী বালিকা রূপে উচ্চ পর্বতে অবস্থান করছেন, তিনি ময়ূরের পালক এবং গলায় পরেছেন গুঞ্জাফুলের মালা। চর্যাপদ হাজার বছর আগে হলেও ঈশ্বরীর সময় থেকে অনেক পরবর্তী সময়ে রচিত।

দেবীর 'বিদ্যাবাসিনী' নামের ক্ষেত্রে একটু লক্ষ্য করলে অনার্য লোকসমাজে প্রবাহ লক্ষণীয়। মুনিজনে একটি স্তবে বিদ্যাবাসিনী সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তুর্যবি পর্বতশৃঙ্গে, নদী, ওষধি, বন প্রভৃতি স্থানে দেবীর বাস। তিনি পদ্মা, পুলিন্দদের দ্বারা পূজিতা এবং মহাপুরুষের আরাধ্যা। মেঘেশ-জ্ঞানদা-মেঘ-নিত্য-বাণী প্রভৃতির পরিবেষ্টিত হয়ে দেবী সর্বদা ঘণ্টাধ্বনি-মুখরিত বিদ্যাগৃহে বাস করেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণে (৯১/৫৮) বিন্ধ্যবাসিনীর কথা আছে। এখানে মহাত্মার স্পর্শে দিনাজপুরে রচিত অপরাপর শক্তিগ্রন্থেও দেবীর লোকায়ত অনার্য রূপটি উদ্ঘাটিত। মধ্যযুগে রচিত রামচরিতের 'অভয়া-মঙ্গল'-এ পদ্মাবতীর দ্বারা এই বিন্ধ্যবাসিনীকে বলি দিয়ে পূজার উল্লেখ আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রাচীনতম রচিত 'গৌড়বহো' নামক প্রাকৃত কাব্যে লিখেছিলেন যে, বিন্ধ্যপর্বতবাসী শবরেরা নিত্য নরবলি দিয়ে দেবীর পূজা করত। নিত্য নরবলি প্রসঙ্গটি বোধহয় ঠিক নয়। তার মানসিকতা নিয়ে অনার্য আদিম সমাজের মানুষদের ধর্মবিশ্বাস সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে দেখাই সমীচীন এটি।

খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে লেখা সোমদেবের কথাসরিৎসাগর -এ আমরা দেখতে পাই, একজন শবর শ্রীবৃক্ষবাসনকে ধরে শবরদের উপাস্যদেবী চণ্ডীর কাছে বলি দিতে নিয়ে গেলে শবরপতি পুলিন্দ শ্রীবৃক্ষবাসনকে রক্ষা করেন। গ্রন্থ থেকে আমরা আরও জানতে পারি যে, বিন্ধ্য অঞ্চলে কোল, ভীল, পুলিন্দ, শবর প্রভৃতি অনার্য জাতির বসবাস ছিল। তারা বিন্ধ্যবাসিনী, কালী, দুর্গা, চণ্ডিকা প্রভৃতি দেবীর বিভিন্ন নাম ও রূপের উপাসক ছিল। একাদশ খ্রীষ্টাব্দে রচিত কথাসরিৎসাগর-এ বিন্ধ্য অঞ্চলে 'অনার্যা' নামে এক দেবীর উল্লেখ

অনুষ্ঠে। চণ্ডী'-তে দেখা যায়, দেবী নিজেই ঘোষণা করেছেন তিনি ভবিষ্যতে স্তাবরী রূপে অরুণ নামক দানবকে বধ করবেন। এইজন্য তাঁর নাম হবে দুর্গা। এইভাবে তিনি দুর্গতির নাশে এ রূপে অনার্য সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

দেবী দুর্গার উমা নামটি যে সংস্কৃত শব্দ থেকে আসেনি, এসেছে প্রাক-আর্য কোনো লোকায়ত শব্দ থেকে তা সম্প্রতি জানিয়েছেন, বিশিষ্ট মাইথোলজিস্ট ডঃ এস. কে. চ্যাটার্জি। তাঁর মতে, বাস্কিলনীয়, আক্কাদীয়, হুরিত প্রভৃতি ভাষায় 'উপ্পে' বা 'উপ্পি' বা 'উম্মু' শব্দ থেকেই উমা শব্দটি এসেছে। আবার ই. জুলিয়াস বৃশকিন 'উমা' শব্দের উৎসরূপে চিহ্নিত করেছেন আদিম জাতির মাতৃদেবী অম্ব'-কে। আবার এক গবেষক আগেপাড়ি অনার্য শব্দ 'অম্বা' থেকে 'উমা' শব্দের আগমন-এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। আদিম লোকায়ত চেতনার বিস্তারটিও এক্ষেত্রে সমানভাবে সক্রিয়।

দেবী দুর্গার আনুষঙ্গিক রূপটি আমরা দেখতে পাই আদিম লোকায়ত দেবী পর্ণ—শবরী ও নগ্ন-শবরীর মধ্যে খুঁজে পান। স্কন্দপুরাণে শিবনিন্দকে শবরী নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। আবার জানি, দেবী শাবরীর অপর নাম অপর্ণা। অপর্ণা শব্দের অর্থ যে ভোজনকারিণী পর্ণ বা পাতাও ভোজন করেন না। কালিদাস 'কুমারসম্ভব' কাব্যে (৫/৪৮) লিখেছেন "স্বয়ং বিশীর্ণদ্রুমপর্ণবৃত্তিতা পরাহি কাষ্ঠা তপসস্তয়ৈবসা পুনঃ।/তমঃপরাকীর্ণমিবপ্রকাশতা বিভাবরী কল্পতপোধৃতি ও উমা মুখালিতি।।" অর্থাৎ গাছের ঝরে পড়া পাতা যার খেয়ে তীব্রতপস্যা করা সহজসাধ্য করেছিল বলে তাঁর নাম হয়েছে অপর্ণা। কালিকাপুরাণে (৪২/৪৬) দেবীর অপর্ণা নামটি আমরা পাই। অন্যত্র লোকায়ত চেতনায় দেবী পর্ণ-শবরী এবং নগ্ন-শবরী রূপেও আখ্যাত। আখ্যাত অপর্ণারূপেও, যদিও সেক্ষেত্রে অপর্ণার অর্থ ভিন্ন। যিনি পর্ণাদির বা পাতার জামাকাপড় পরিধান করেন লজ্জা নিবারণের জন্য তিনি পর্ণ শবরী, আর যিনি পাতার বসনও পরিধান করেন না তিনি নগ্ন-শবরী বা অপর্ণা। এই বিবসনা দেবী অপর্ণার রূপে দেবী তারার অনেকটা সাদৃশ্য আছে। এই পর্ণ-শবরী, নগ্ন-শবরী বা অপর্ণা আদিম মনস্তত্ত্বের টোটেমকে যেমন রক্ষা করেছেন, তেমনি তাদের আরাধ্যা দেবীও হয়ে উঠেছেন।

পাঁচ

বাংলাদেশে লোকায়ত চেতনার তিনটি সূত্র ধরে একালে দেবী দুর্গার উপস্থিতি (ক) নিত্যসরীসৃপে অপরিবর্তিত কিংবা আরোপিত নামের জন্ম দিয়ে, যেমন জয়দুর্গা, রক্ষদুর্গা, ওজদুর্গা, ওড়ারচণ্ডী, রূপচণ্ডী, এলাচণ্ডী, উদ্ধারচণ্ডী, অবাকচণ্ডী, ফলচণ্ডী প্রভৃতি। এক্ষেত্রে প্রতিবৃক্ষরূপা থেকে উত্তরণের অভীপ্সাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে অর্থাৎ লৌকিক চেতনারই প্রাধান্য ঘটেছে।

(খ) পরিবর্তিত নামে অন্নপূর্ণা, দুর্গা, রিদ্ধিমালিনী, শুভচণ্ডী চণ্ডীর উপস্থিতি। এক্ষেত্রে আর্য অনার্য সংস্কৃতির সংযুক্তি লিপিস্তরে প্রকটিত।

(গ) বাংলার মঙ্গলকাব্যগুলি—যা কিনা লৌকিক সাহিত্যেরই মহত্তর রূপ, তাতে অনার্য সংস্কৃতির মূলে সবলভাবে প্রকাশ। এক্ষেত্রে অনার্য সংস্কৃতির ঐতিহ্যের অনার্য প্রধানটি বড় হয়ে উঠেছে।

তিনটি ধারা নিয়েই আমরা আলোচনা করব। প্রথমেই আমরা বনদুর্গার কথা তুলে ধরব। অরণ্যনিবাসী, ঢাকা, শ্রীহট্ট ও পূর্ব বাংলার অন্যান্য স্থানে বনদুর্গা দেবীর পূজো লিপিস্তরাগে প্রচলিত। সাধারণ লোকের মধ্যে অর্থাৎ লোকায়ত চেতনায় বনদুর্গা জলদুর্গা দুর্গার জন্য অঞ্চল ভেদে জলদুর্গা দুর্গা। রায়দিঘির পুজোয় ঘোলো মূর্তি স্থাপন করতে দেখা যায় না। কিন্তু ঢাকা জেলার ধামরাই, বজ্রযোগিনী, সাভার, নবাবগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে প্রতিবছর পৌষ-সংক্রান্তিতে চতুর্ভুজা, বাঘাম্বরী, বাঘাম্বরা পরিহিতা, নীলশ্রীমুক্তকেশা মূর্তি নির্মাণ করে বনদুর্গার পুজো করা হয়। ঢাকা জেলার নানা স্থানে বাঘছাল পোষের এক পরিবর্তে বনদুর্গার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এই মূর্তিটি দেবতোষ

বছরের তারিখ। পৌষ-সংক্রান্তি ছাড়া এই অঞ্চলে বৈশাখ মাসের কোনো এক শনিবারে ঘটের উপর কৃষ্ণবিবীর অন্নপূর্ণার পূজাও প্রচলন আছে। চাষা ভোলার কংশাই ও করিমগঞ্জের নদীর সঙ্গমে ত্রিযোমনাথ ঘাটেতে অন্নপূর্ণা দেবীর প্রস্তরের মূর্তি স্থাপন করা হয়।

অন্নপূর্ণার উৎপত্তি সম্পর্কে লোকমনে যেসব সূত্র ধরে যা প্রচার আছে তা হলো একদিন দুর্গার ইচ্ছা হলো শাঁখা পরবেন, তিনি শিবের কাছে শাঁখা চাইলেন। শিব বলীর, তিনি ভাঙ-ধুতুরা খান, শ্মশানে থাকেন। তাই, শাঁখা কিনে দেওয়ার ক্ষমতা তাঁর নেই। দুর্গা বুঝেও বুঝলেন না। শাঁখা না পেয়ে রাগ করে তিনি পিত্রালয়ে চলে গেলেন। শিব অতি বড় বৃদ্ধ, কে তাঁর সেবাযত্ন করবে! অবশেষে এক শাঁখারীর বেশে তিনি শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হলেন। শাঁখা পরতে এসে শাঁখারীর হাতে প্রতিবারই দুর্গা ধরা পড়লেন। তিনি স্বামীকে চিনতে পারলেন এবং বিদেশ হলেন। কিন্তু, ভবদেবী শিবকে তাঁর শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে চেনা সম্ভব হলো না। কিন্তুদিন পরে দুর্গার গর্ভে একটি কন্যা জন্ম নিল। লোকলজ্জার ভয়ে সেই কন্যাকে তিনি নিকটবর্তী বনাঞ্চলে শেওড়া গাছের তলায় পরিত্যাগ করে শিবের সন্ধানে চলে গেলেন। এই পরিত্যক্ত শিশুটিরা 'অন্নপূর্ণা' নামে সকলের পূজা-ভক্তি-অর্ঘ্য পেয়ে আসছেন। কালের সঙ্গে তাঁর প্রথম অবস্থানের সূত্র ধরে অন্নপূর্ণা নামটি এসেছে। শেওড়া, বট, শালুক প্রভৃতি গাছের নিম্নে দেবীর অধিষ্ঠান। অন্নপূর্ণার পূজোয় হিংসের কোনো অবকাশ নেই। প্রথমে পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। ঘটও পেতে হয় না। ফুলবেলপাতা, হিংসে জাতে মাজনবর্তী বনবীরা এই পূজোর প্রধান উপাচার। পূজোর সময়ে নেবার নতুন ফলমূল পাওয়া গেলে তা দেবীকে উৎসর্গ করা হয়। এছাড়া আক-আতে-তরকারী-মাছেরও ভোগও দেওয়া হয়। অন্নপূর্ণাদেবীর পূজোর সময় মাজনবর্তী নারীরা সমবেত কণ্ঠে গান করে। সেই গানের মধ্য দিয়ে তারা তাদের কামনা বাসনার কথা দেবীকে জানায় এবং ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদন করে।

নবদুর্গা হলেন চতুর্ভুজা, সিংহের উপর আসীন। প্রধানত ফাল্গুন মাসে অর্থাৎ বসন্তকালের একবার অন্নপূর্ণার পূজো হয়ে থাকে। নামকরণের মধ্য দিয়ে বোঝা যায়, বসন্তঋতু দুর্গাদেবীকেই নতুন ভাবে ও রূপে উপাসনা, আরাধনা করা হয় এই পূজার মাধ্যমে। আশ্বিন মাসে অনুষ্ঠিত দুর্গাপূজার প্রায় সব প্রকরণই অল্প পরিসরে নবদুর্গাপূজায় অবলম্বিত হয়। তবে, পূজা কিন্তু হয় একদিন, তিনদিন ধরে নয়। সর্বস্তরের নরনারী এই পূজোয় যোগ দেয়। তাইই পূজোর সময় আয়োজন করে।

'অন্নপূর্ণা' অভিধার হয় অন্নদা, বিন্দু ও অন্নত পত্নিকে বিনষ্ট করার পরিপ্রেক্ষিতে। এই অন্নপূর্ণার পূজোতে কোনো পুরোহিতের আবশ্যক বা কোনো মূর্তি স্থাপনের প্রয়োজন হয় না। ঘরের মধ্যে একটি মাটি-পাথরের ঠাক মূর্তি। ছোট্ট আয়। চালের গুঁড়ো ও সামান্য দুধ-কলা উপকরণ দিয়ে নারীরা এই অন্নপূর্ণাদেবীর পূজো করে থাকে। এই পূজোয় নিষিদ্ধ কোনো ধরা বা তিথি নেই। তবে দিনের বেলায় এই দেবীর পূজো হয়ে থাকে। অন্নপূর্ণাদেবীর পূজোয় উৎস হলেই একটি উপাখ্যান পাওয়া যায়। সেই উপাখ্যানটি হলো — এক বিধবা গ্রামবাসী সুতো কাটে, সেই সুতো বিক্রি করে একমাত্র পুত্রকে নিয়ে কোনোরকমে দিন চালান। একদিন ছেলেটির ইচ্ছা হলো মাছ কিনে মাসে খাওয়ার। এক জেলেনীর কাছ থেকে রাঙ্গাপী মাছ এনে রান্না করালেন। গ্রামবাসী সুতো বিক্রি করে মাছের দাম দেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন জেলেনীকে। কিন্তু সেইদিন দুর্ভাগ্যক্রমে সুতো বিক্রি হয়নি। তাই জেলেনী পয়সা না পেয়ে রান্না করা মাছগুলি সেখান থেকে নিয়ে গিয়েছিল। তখন ছেলেটি শুধু মাছের ঝোল খেয়ে প্রচণ্ড তৃপ্তি পেয়ে বলল যে, ঝোলেরই এত স্বাদ, তাহলে মাছ না খাওয়ার স্বাদ আরও ভালো। তাই, লোভের বশবর্তী হয়ে সে একদিন রান্নাঘরে একটি বাঁশ বেঁধে রান্না করে খেয়ে ফেলল। এতদিনের রান্নাঘরে ঘরের পেয়ে মাতা তৎক্ষণাৎ পেয়াদা পাঠিয়ে ছেলেটিকে আটক করলেন। এই খবর পেয়ে গ্রামবাসী অস্থির হয়ে প্রচণ্ড কান্নাকাটি করলেন। তখন অন্নপূর্ণা দেবী এক ব্রাহ্মণ ছেলে রাঙ্গাপীর বাড়িতে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, কাঁদিস না, তুই আমার পূজো কর, সকল

বিপদ থেকে উদ্ধার পাবি, তোর ছেলে মুক্ত হবে এবং তার সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে হবে।'' ব্রাহ্মণী শুভমুহূর্তে নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর পুজো করলেন এবং পুজোর পর মূল-মূর্তিসহ ছাদ ভেদ করে ঈগলটির পালকের উপর চড়িয়ে দেবতার সঙ্গে সঙ্গে ঈগলটি প্রচণ্ড বেগে রাজার বাড়ির দিকে ছুটে গেল। ব্রাহ্মণী তখন রাজার কাছে অনুরোধ জানালেন তাঁর ছেলেকে মুক্ত করে দেওয়ার জন্য। ইতিমধ্যে, ঈগলপালকের রাজাকে জানানো, রাজ্যের মধ্যে ১০৮টি ঈগলই আছে, অথচ কোনো ঈগলই চুরি যায়নি। তখন রাজা ব্রাহ্মণীর পুত্রকে মুক্তি দিলেন। ব্রাহ্মণী পুত্রকে শুভমুহূর্তে আরাধনার কথা জানালেন। পুত্র শুভমুহূর্তে সন্ধানে বেরিয়ে একটি ঘটনাচক্রের তাড়নায় এক বৃদ্ধাকে দেখতে পেল এবং পরে তার সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে হলো। সকলের বিশ্বাস, শিকদারী পাবদৌ বৃদ্ধার বেশ ধরে লোকালয়ে আর্ত, পীড়িত, দুঃখী, অভাবী মানুষদের দুঃখ বিমোচনে এগিয়ে এসেছেন।

ছয়

বিভীষ গাছার শক্তিদেবী দুর্গার নাম পরিবর্তিত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন নামে লোকসমাজে পূজিতা হয়ে আসছে। এক্ষেত্রে আর্য-অনার্য সংস্কৃতির সমন্বয়ের ছবিটি স্পষ্ট। এইরকম এক দেবী হলেন ঝাওলীদেবী। ঝাওড়া-বুপলী-ঝাকুড়া-মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় এই ঝাওলীদেবীর পুজো হয়ে থাকে। কোথাও কোথাও উত্তর-জনপদে যা পরবে ঝাওলীদেবীর স্থায়ী মন্দির বা 'থান' আছে। তিন-চারশ বছরের পুরনো ইট বা পাথরের নির্মিত মন্দিরও বিরল নয়। ঝাওলীদেবীকে 'ঝাওলী' 'বিপদনাশী' নামেও অভিহিত করা হয়। বর্তমানে বিপদনাশী নামেই প্রচলন অধিক। এই দেবী দুর্গা-চণ্ডীর অনুরূপিণী। সিংহবাহিনীর সঙ্গেও এঁর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ঝাওলী দেবীর পরনে লাল চেলি, এলোকেশী, দীর্ঘ ত্রিনয়না, চতুর্ভুজা, দক্ষিণ দিকে, উপরে বাঁয়ে, বিভুজা-এক হাতে প্রহরণ, অপর হাতে বরাভয় মুদ্রা। এর চতুর্ভুজা মূর্তিও রয়েছে। সেক্ষেত্রে খড়্গ ও প্রহরণ ত্রিশূলরূপ। পরিধানে রক্তলাল গলায় ও অঙ্গভূষণে নরমুণ্ডমালা ও রক্তজবামুণ্ড। পদতলে বা পার্শ্বে শিব বা শিবের প্রকৃতিবিশিষ্ট ভয়ানক চেহারাকে দেখা যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পার্শ্বদেবতাদের মধ্যে দুই সহচর বা কালো। আবরণবিহীনা এই উগ্রচণ্ডা রূপে অষ্টাদশভুজা বিপদনাশী মূর্তি খুব দু-একটা দেখা যায়। উড়িষ্যায় অষ্টভুজী একটি মূর্তি আছে। কোনো স্থানে পূর্ণপ্রতিষ্ঠিত ঘরে, কোনো স্থানে তান্ত্রিক ও ব্রাহ্মণ্য বিধিতে বিধানে, আবার অনেক বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ্য ঘরে এই দেবীর পুজো অনুষ্ঠিত হয়। সেসব মন্দিরে দেবীপূজায় পৌরোহিত্য অব্রাহ্মণেরা করেন, সেসব স্থানে লোকায়ত বিধান অনুসৃত হয়, সংস্কৃত মন্ত্রাদি ব্যবহৃত হয় না। প্রতিষ্ঠিত মন্দিরগুলিতে দেবীর নিত্যপূজা হয়। শনি ও মঙ্গলবার দেবীপূজার প্রশস্ত দিন। বৈশাখ মাসে প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে এবং মাঠে-ঘাটে দেবীর মাসিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় এই পূজাকে কেন্দ্র করে মেলা বসে। অনার্য প্রভাবিত সংস্কৃতির প্রভাবও এই দেবীর মধ্যে পড়েছে। বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতিবিদ ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন 'দক্ষিণাঞ্চলের গ্রামাঞ্চলে লোকায়ত দেবী' বিপদনাশীই যে বাংলার ঝাওলীদেবী সে বিষয়ে তাঁর সন্দেহ নেই।' অন্যদিকে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস ছিলেন এই ঝাওলীদেবীর উপাসক। কবির ঝাওলী উপাসনা এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি বৈষ্ণব সমাজে গৃহীত না হওয়ার কারণ। ঝাওলীদেবীকে নিয়ে লেখা একটি মঙ্গলকাব্যেরও সন্ধান পাওয়া গেছে। কাব্যটির নাম 'ঝাওলী মঙ্গল'। রচয়িতা মুকুন্দ মিশ্র। এই কাব্যে দুটি কাহিনী আছে। তৃতীয়টি একেবারে 'চণ্ডী'র অনুকৃতি বলা যায়। এখানেও রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য গভীরারা হয়ে মেধস মুনির শরণাপন্ন হলেন। মুনি তাদের বিপদ উদ্ধারের জন্য মহালয়ার আরাধনা করার উপদেশ দিলেন এবং আশ্বাস দিলেন দেবী মহামায়াই বিপদনাশী।

'ঘোপলা' মূলেও দুর্গাই আর এক লৌকিক রূপ। কার্তিক মেলার ঝাঁকরাদে ঘোপলা দেবী বিশেষ মাহাত্ম্য এবং সারীর একার পীঠের এক পীঠ রূপে প্রসিদ্ধ। এখানে দেবীর বড় প্রাচীন মন্দির, আছে, মূর্তিও আছে। পূজাবদলে ছাগল ও বিশ্বাস ঘোপলাদেবী

দুর্গার আকৃতি-ভেদে। অন্যকালী রূপেও তাঁকে কখনসখন পূজিত হতে দেখা যায় কোথাও কোথাও স্থানে। ষোলোজা মূর্তি আছে বিস্তর। প্রস্তরখণ্ডের উপর খোদিত মূর্তি বা এর শিলাপ্রতীক প্রায় সর্বত্র পূজিত হয়। খাদ্যের দিক থেকে খাঁড়াহাসনের ষোলোজার পরই এই ষোলোজা বাসন্তী পূজিতা ধানুড়গাছীর ষোলোজার স্থান। এখানে দেবীর শিলাপ্রতীক পূজা হয়। শিলাখণ্ডটি বেশ বড়, কতকটা ডোলচকার। ষোলোজাদেবীর বিশেষ পূজো হয় বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠে নয়ে। কোনো কোনো স্থানে অন্য কালেও হয়। পূজোয় ছাগ-মহিষ বলির প্রচলন আছে। তবে ধানুড়ে ষোলোজার পূজোয় পশুবলি হয় না। তার কারণ বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব। ষোলোজার পূজা আচার সঙ্গে তান্ত্রিক ও অন্যান্য কৃষ্টির কোনো কোনো রীতি দেখা যায়। দেবীর বিন্যাসে পীঠস্থানে অবস্থিত একেবারে পীঠের অন্তরতম কল্পনীতলাতে কল্পনীদেবীর বিগ্রহের মতো সারা বছর পুকুরের জলে ডুবিয়ে রাখা হয়। বছরে দু'বার বার্ষিক এবং একটি বিশেষ পূজোর সময় জল থেকে তুলে আনা হয় মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য। বিগ্রহটি রত্নপ্রস্তর। তবে, দেবী অন্যান্য মূলের ষোলোজার চেয়েও ঐতিহ্যবাহী, তাই আর্থসামাজিক কারণের এত্তারায় জন্য এই রীতির প্রবর্তন হয়েছে বলে অনেকের ধারণা।

'খড়ার' বা খড়্গ চণ্ডীদেবী মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, হুগলী জেলার বসবাসকারী অন্যান্য গাঁওকাল, সোঁও ভূমিজ জাতির উপাস্যা বলে তিনি পরিচিত। কিন্তু মেদিনীপুর শহরে এই দেবীর প্রাচীন দেখলে মনে হয়, তিনি রাজপরিবারের হিন্দু সমাজের মূল বিশেষের উপর প্রভাব বিস্তার করে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। মেদিনীপুর জেলায় প্রায় ছোট-বড় কারণায়, পল্লিতে, তেমাথায় কোনো প্রকাশ্য স্থানে খড়্গ দেবীকে মিত্তির মূর্তিতে বিরাজ করতে দেখা যায়। পৌষ-সংক্রান্তির সময়ে বা নতুন আমের প্রথম দিনে মেদিনীপুর শহরের আশ-পাশে এই দেবীর বার্ষিক পূজা হয়। সাধারণতঃ খড়্গ চণ্ডীর পূর্ণ ও মৃণ্ময়মূর্তি পূজো হয়। কোনো কোনো স্থানে বিশেষত ঝাঁকুড়া জেলার প্রতীক হিসাবে ঘটে, ঘোড়া ও শিলাতেও পূজো হয়। খড়্গদেবীর মুখ দিকে হলদে, তিনটি চোখ। তৃতীয় চোখটি ছোট, আগুন দৃষ্টি বিপদ। মাথায় চুল এলানো, তার উপর ছোট মুকুট, নানা-পাতা আঁকা। মৃণ্ময়মূর্তির গলদেশের দু-পাশে ছোট-ছোটহাড়ি ও মাদুলের মূর্তি থাকে। পূর্ণমূর্তি সর্বাঙ্গ অলঙ্কারভূষিত, পরণে জানুপর্যন্ত ঝোলা কাঁচা লাল বা হলুদ রঙের ছোট শাড়ী। দেবীর দুটি হাত, কোনো কোনো স্থানে এক হাতে কৃষ্ণপাখা দেখা যায়। এছাড়া অন্য কোনো প্রহরণ থাকে না, আয়ুধও নয়, তবে দু-এক জায়গায় দেবীর পায়ে জল ও হাতে ধানু থাকে। পায়ের তলায় শিবযান পরিচিত। খড়্গ দেবীকে মূর্তীর আকৃতি ছেড়ে জানুপর্যন্ত ঘটে চিত্রিত করা হয়ে থাকে। জানুপর্যন্ত ঘটের ও মাথে খড়্গদেবীর পূজো হয়। পুরোহিত অবিবাহিত-বিবাহিত উভয় প্রকার দেখেও দেওয়া হয়।

বর্ধমান জেলার রায়বন্দরগ্রামে 'রায়বন্দরী' দেবীর অবস্থান। এই দেবী অতি পরাক্রমী আদ্যা। বহু দেশের প্রাচীন মূলের তুলিপ্রেম রায়বন্দরের দ্বারা দেবী প্রতিষ্ঠিত বলে কথিত। তুলিপ্রেম রায়রায়া ছিলেন ব্রাহ্মণ। এই অঞ্চলের শৌর্য, বীর্য, ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী একাধারে ছিলেন। তাই রায়বন্দরীদেবীর পূজো তাঁরা নিজেরাই করতেন। লোকমতে ভৈরবরায় রায়বন্দরী হলেন দেবী দুর্গা বা শাস্ত্রীয় চণ্ডীর আকৃতিভেদের মা খেড়কালী। দুর্গাপুজোর সময় অর্থাৎ, সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে রায়বন্দরী দেবীর বার্ষিক পূজো হয়। রায়বন্দরীর মূর্তি মহিষ। আকৃতি অতি সুন্দর। বর্ণ পদ্মফুলের ওড়। খুব উজ্জ্বল। দেখলে অনেকক্ষণের পাঁক দিয়ে মাজা পালিশের কাজ বলে মনে হবে। কিংবা রত্নপ্রলেপে চকচকে হয়েছে। দেবী নিখাদী, বলিষ্ঠ আকৃতির। ডান পায়ের তলায় মহাকাল পরিচিত, বাম পা উর্ধ্বস্থিত বিরূপাক্ষের মাথায় ন্যস্ত। মহাকাল ও বিরূপাক্ষের বেশভূষা শাস্ত্রীয় শিবের মতো। দেবীর মাথায় মুকুট। বর্ণ তিনটি চোখ, দুটি হাত। ডান হাতে শাণিত ছুরিকা, বাম হাতে ছিন্নির পাত্র। মহানবমীর দিন ছাগল এবং মহিষ বলি হয়। 'পীঠ নির্ণয়' গ্রন্থে উল্লেখ আছে - রায়বন্দরীই একটি শক্তিপীঠ ও অধিষ্ঠিতা দেবীর নাম চণ্ডী। কিংবদন্তী থেকে অনুমান করা হয়, এই

দেবী আদিতে লৌকিক বা আদিম মানুষের উপাস্যা ছিলেন। পরে বৃহত্তর ধর্মীয় ভাবনা তাঁকেও নিজের আর্য - অনার্য বিচিত্র সৃষ্টির এক অভিনব দেবী রূপে গড়ে তোলে রাজবল্লভী। ব্রাহ্মণ্য আর্য-বৈদিক ধর্মের প্রতিভূ ছিলেন। সে কারণে ব্রাহ্মণ্য শিবায়ন অনুযায়ী দেবীর পুজো অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। একক্ষেত্রে যে দেবী আদিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত এবং রক্তলিপ্সায় ছিলেন, তার নিদর্শন শেষ পর্যন্ত নেই। তাই দেবীর এক হাতে কাটির পাত্র, সাজানো ছাগলের পাত্র। এ অঞ্চলে প্রচলিত ধারণা, দুর্গা পূর্বে অরণ্যে অবস্থান করতেন। অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোকেরা এঁকে বিশেষ ভক্তি করত। লোকায়ত ভেতনায় দেবীর জনপ্রিয়তা লক্ষ করে ব্রাহ্মণ্য দেবীর মন্দির তৈরী করে দেন। সেই থেকে সমাজে দেবীর নিত্য আরাধনা - উপাসনা শুরু হয়। আর্য-অনার্য সমস্ত শ্রেণীর মানুষ দেবীর আরাধনায় অংশ নেয়।

দেবী 'উত্তরবাহিনীর' মূর্তি রাজবল্লভী দেবীর মতোই আর্য-অনার্য সংস্কৃতি সমন্বয়ে নির্মিত। উত্তরবাহিনী দেবী হুগলি জেলার শিয়াখালা বা শিবাক্ষেত্র পল্লীর প্রাচীন লৌকিক দেবী। দেবীর মূর্তি বেশ দৃষ্টি, দীর্ঘাঙ্গী, উজ্জ্বল দু-দুটি। বর্ণ করকাত -ঘরিজা, মাথায় এলোকেশের উপর মুকুট, জিনেত্র, গলায় মুণ্ডমালা। ডান হাতে কলম, বামে কাটির পাত্র। পরিধানে কাঁচুলি বা বক্ষনী ও নিচের অংশে গাড়া আরীয় শাড়ি। অনেকটা মেয়াদি আদিবাসী গ্রাম-দেবীর মতো কাটিলেশ বিস্তৃত। দেবীর বাম ক্রোড়দেহে উপবিষ্ট শিবাসনের শঙ্খ চৈতন্যের আসনে এবং অপর পা শিবের উপর ন্যস্তিত। শিবের নাভিদেশে একটি বৃহৎ আকারের অনুজের মুণ্ড এ গলার কাছে দুটি সাপের মূর্তি দেখা যায়। দেবীর ঘটপুজোও হয়। বার্ষিক পুজো হয় পাকীয়া ওঠা-একাদশী তিথিতে। উত্তরবাহিনী দেবীর খ্যাতি যে বহুকাল ধরে বিদ্যমান তা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রচিত কবিকঙ্কণের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য থেকে আমরা জানতে পারি। উত্তরবাহিনী দেবী সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কাব্যে উল্লেখিত হয়েছে 'শুম্ভনে বন্দিলাম শালা জয়লক্ষ্মী।/সেই খানায় বন্দিলাম উত্তরবাহিনী।।'/ এই দেবীর প্রাচীনত্ব সম্পর্কে জানা যায়, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর গভীর অরণ্যে আবৃত ছিল সংশ্লিষ্ট অঞ্চলটি। সেই অরণ্যাঞ্চলের অধিবাসী অনুন্নত শ্রেণীর মানুষের ছিল আরাধ্যের এবং শক্তি উপাসক। সেই সূত্রে দুর্গা-চণ্ডীর আদলে ও লোকায়ত ধারায় উত্তরবাহিনী দেবীর অধিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠা।

শাক্ত

বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলিতে লোকায়ত চেতনা বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে। দেব-দেবী কল্পনা, ঘটনা এবং মানুষের বর্ণনায় লোকায়ত প্রভাব স্পষ্ট। তবে সংশ্লিষ্ট দেব-দেবীকে পৌরাণিক দেব-দেবীর সঙ্গে সাযুজ্য করার বিষয়টি প্রধানত পৌরাণ কবিদের উদ্ভাবনা এর লোকায়ত চেতনা থেকে অর্থাৎ ওঁরা যে লৌকিক দেব-দেবী, তা বুঝতে আমাদের কোনো অসুবিধা হয় না। 'মঙ্গলকাব্য' নামকরণের মূল নিয়ে কবিজনেরা সাধারণ মানুষকে অন্ধকার থেকে মঙ্গলের আলোয়, অশুভ থেকে শুভ বোধে, প্রতিকূলতা থেকে অনুকূলতায় উত্তীর্ণ হওয়ার পথ দেখাবেন বলেই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ও স্থানে আমরা লৌকিক দেব-দেবীদের মহাত্ম্য কীর্তন করেছেন। মঙ্গলকাব্যগুলিতে বর্ণিত লৌকিক দেব-দেবীর সঙ্গে পৌরাণিক সংযুক্তির সূত্র ধরেই দেবী দুর্গার লোকায়ত রূপটি উদ্ভাসিত হয়েছে। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে ভবানী সঙ্গে শিব-পত্নী শিবানী দুর্গা পার্বতীর সংযোজনের যে চিত্র আঁকা হয়েছে তাতে দেবীদুর্গা অরণ্যচারিণী একজন সাধারণ গৃহিণী বলেই মনে হয়েছে। লৌকিক দেবী ভবানীর পাশে তাঁর অবস্থানে লোকায়ত চেতনাই প্রকাশ পেয়েছে। 'চণ্ডীমঙ্গল'-এর চণ্ডীদেবী যেন নিম্নবিত্ত কিরাত আর্য অর্থাৎ লোকায়ত চেতনাস্তরে দেবীরূপে স্বীকৃত। এই দৃষ্টি এবং অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে দেবী দুর্গাকে আমরা লৌকিক দুর্গার রূপান্তরিত হতে দেখি। এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কবিশেখর ভট্টাচার্যের 'শিবায়ন' কিংবা 'শিবসংকীর্তন' বা 'শিবমঙ্গল' কাব্যটি। এখানে সাধারণ কৃষক ও কৃষক রমণী রূপে আমরা পেয়েছি শিব ও দুর্গাকে। এই কাব্যটি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রচিত।

এই সব মঙ্গলকাব্যগুলিতে দেখতে পাই, দেবী দুর্গা-কোনোটি, চণ্ডীকা, বাশুলী

সেবাই লোকায়ত ঐতিহ্যে অনুসৃত অনার্য শব্দ) প্রচলিত নিরক্ষরাইীয় নারীদের অন্তরালের কবল থেকে উদ্ধার করার জন্য নিজে প্রজাপতী, তুলসী, বাদিনী রূপ পরিগ্রহ করেছিলেন। মুন্সিয়ানা গ্রামের নবপুরুলিয়া গ্রামে চতুর্ভুজা প্রস্তরমূর্তী তুলসীর 'মা' দুর্গাদেবীর প্রবাহমানের প্রধানে পূজিতা হচ্ছেন। এছাড়া কবিকঙ্কন মুকুন্দের 'অভয়ামঙ্গল' ছাড়ে দেবীকে সাধারণ ভাবেও আমরা দেখেছি। ঘৃতমালা বাসাযাত্রা' অংশটিতেও দুর্গা প্রসঙ্গের অন্তরালে আমরা তা বুঝতে পারি। ঘটনাক্রম

অনুযায়ী দেবী দুর্গা বৈদিক দেবী ধরিত্রী মাতৃকার সাদৃশ্যে উপস্থিত - 'দুর্গা নামে নারী পূজি আছিনে অনন্ত।/সেই মত ভাবে আছ তার নাই সন্ধ।'

এইভাবেই দেবী দুর্গা কলকাতার অন্তর্লীন চারপাশে ঘিরিয়ে থাকা ঔপনিবেশিক আঞ্চলিক ধর্ম সংস্কৃতির অনেকটাই জুড়ে আছেন অনার্য অন্তিবাসী সমাজের জনপদসম্পর্কিত মৌলিকে অথবা লৌকিক ঐতিহ্যের। যদিও ভারতবর্ষে আসার আগে আদ্যোপান্ত অনার্য সমাজে পরিচালনা নারী রূপে পূজিতা হতেন, তারই

ক্রমবিবর্তনের প্রক্রিয়ায় যেখানে তিনি আজকে — সমাজ সংস্কৃতিতে। আজও তার প্রবাহমান রূপটি প্রত্যক্ষ করতে হলে আমাদের কলকাতা ছাড়িয়ে যেতে হবে দূরে। দূরান্তরে এবং ডুব দিতে হবে আর্য অনার্য মিশ্র সংস্কৃতির গভীরে। সেই গভীরে মন অবিরাম খেই দুর্গা, সন্তানপুত্রের মানুষ জননীর কাছে পরিচয় তারেই আজ যজ্ঞেশ্বরী জননী, দুর্গতিনাশিনী ওপেই অভিধারী। তাঁরই পূজো অনুষ্ঠিত হচ্ছে বাংলার নানা স্থানে, নানাভাবে গভীরকালে সোনা আমাদের চেতনে মনে।

নিবন্ধ

কলকাতার বনেদি বাড়ির পুজো

সায়ন্তন দাস অধিকারী

প্রথমে বাড়ির কর্তাদের। তারপর বাবোয়ারি। আর সবশেষে সার্বজনীন। প্রথমের গল্পে তাল মিলিয়ে অনুরূপাদেবী দেবী দুর্গা এইভাবেই নিমাই থেকে নিমাইয়ের হয়েছেন তাঁর গল্পগুজবে। দুর্গোৎসব হয়ে ওঠে বাঙালির প্রাণের স্পন্দন। আমার বন্ধন। আর আমাদের আনন্দকে পূর্ণতা দিতে আমন্ত্রণ সভা-সমিতি সবেই বাঙালি। ওই একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে আজও অনেকে গল্পে কল্পনা হই-হুল্লোড় বাদ দিলে পুজোর গন্ধে কিন্তু সত্যের ছিটে কোথাও, একতোলিয়া, একচালিয়া কিংবা বনেদিয়ানার গন্ধ। পুজোর আসল অহঙ্কারটাও কারোর প্যান্ডেলে নয়, গড়ে আছে সেই বনেদি বাড়িগুলোর পুজোয়। আর ঘটনা এটাই যে এই দুর্গাপুজো দিয়েই শুরুতে আছে কলকাতার বিভিন্ন বনেদি বাড়ির না-জানা বহু ইতিহাস। কিছু ছেড়ে যা কলকাতার সামাজিক ইতিহাসেও দাগ কেটেছে। আসুন সময়ের সোপা অলিন্দে প্যান্ডেলগুলো থেকে একটু চোখ সরিয়ে তাকানো যাক কিছু বনেদি বাড়ির পুজোয়।

৬৫ নং সাকার্স চৌধুরীর বাড়ি □ এই বাড়ির পুজো কলকাতার প্রাচীনতম।

বয়স ৪০১ বছর। জোব চার্নক বন, কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা নাকি এই সাকার্সরাই, এই বলে কলকাতা হাইকোর্টে এ বছর একটি মামলাও করেছেন তাঁরা। বাড়ির কর্তাদের মতে, দেবী নাকি এ বিষয়ে স্বপ্নাদেশ দিয়েছিলেন। এ বাড়ির পুজো 'আটচালার পুজো' নামে প্রসিদ্ধ। আগে ছিল আটটি পৌত্তলিকতার চালা। আলাদা তিনটে চালচিত্রে বিশিষ্ট ডাকের সাজের প্রতিমা গড়েন অঙ্কিত পাল। দেবীকে পরানো হয় বেনারসি। একটি কুমড়ো, একটি মোষ ও তেরোটি পাঁঠা বলি দেওয়ার তেওরোহ এখনও চালু আছে।

শোভাবাজার রাজবাড়ি □ ৩৪ ও ৩৬ নং রাজা নবকৃষ্ণ দেব রোডের বাড়িতে শোভাবাজার রাজবাড়ির পুজো হয়। ১৭৪৭-তে রাজা নবকৃষ্ণ দেবের উদ্যোগে ৩৬ নং বাড়িটিতে দুর্গাপুজোর প্রচলন হয়। সেই বছরই ইংরেজের পলাশির যুদ্ধে জিতে বাংলার বাজলাট সালাবার। আর সেই জয়কে 'স্বদেশীয়' করে রাখতে ইংরেজদের নবপ্রভুদের রাজা নবকৃষ্ণ সেই পুজোতে লক্ষাধিক টাকা খরচ করেছিলেন বলে শোনা যায়। লর্ড ক্লাইভ, ওয়ারেন হেস্টিংসরা এই রাজবাড়ির পুজোয় নাকি এসেছিলেন। নবকৃষ্ণ মারা যাওয়ার পর ৩৪ নং বাড়িতে অনুরূপাদেবী ১৭৬০-তে দুর্গাপুজো শুরু হয়। সপ্তমী, অষ্টমীতে প্রতিবছর পাঁঠাবলি হয়। আগে নবমীতে মোট পাঁঠাবলি হত। এখন হয় একটা। পাঁঠার আয়গায় এসেছে আখ, মাছ, লাউ ইত্যাদি।

রামদুলাল-শম্ভুবাবুর বাড়ি □ রামদুলাল দে ১৭৮৬তে তাঁর শম্ভিবাবুর দুর্গাপুজো প্রচলন করেন। ছাটিখোলা লস্করবাড়িতে

'সরকার মশাইয়ের' কাজ করার সুবাদে তিনি সরকার উপাধিতে ভূষিত হন। পরে পরিবারকুলের হাত থেকে 'দেব' উপাধি পাওয়ার সেটাই আজ অবধি চলে আসছে। রামদুলালের দুই ছেলে 'হাবুবাবু' ও 'নাটুবাবু' নামে পরিচিত হওয়ার ফলে এই বাড়ির পুজো আজ এঁদের নামেই প্রচলিত। প্রতিমা নির্মাণে আছেন নিতাই পাল। প্রথম কয়েক বছর পাঁঠাবলির রেওয়াজ চালু থাকলেও পরে রামদুলালবাবুই সেটা বন্ধ করে দেন। বাড়ির ঠিকানা ৬৭ই, বিডন স্ট্রিট।

হাটখোলার বন্ধবাড়ি ☐ নিতান্তই ছোট স্ট্রীটে জোড়াসাঁকো থানার কাছাকাছি এক বাড়ির পুজোয় প্রতিবারই কালীমোহন দত্ত। গণ্যমান্য কারোর আশীর্বাদক অনুমোদন নয় অবিশ্যি শহরাঞ্চীয় প্রথমদিকে পারিবারিক পুজো শুরু করেন। প্রতিমা একচালা হলেও তিনটি পৃথক চালচিত্র আছে। তাদের মাঝের প্রতিমার ঘরে শোভিত মাটির গহনা। ঠাকুরের পায়ে জাপটও মাটির। ইদানীং চালচিত্র তৈরী করছেন প্রবীণ পাল। বৃদ্ধ অভিজ্ঞদের মতে হওয়া এই বাড়ির পুজোয় এখনও একটি নীলকণ্ঠ পাখি ছাড়া হয়। সেটা অবশ্য বিসর্জনের দিন।

ধর্মতলার বিডিরবাড়ি ☐ হাবুবাবু-নাটুবাবুদের 'জামাইবাড়ি' নীলমণি মিত্র স্ট্রীটে ১৮০৪-এ রাধাকৃষ্ণ মিত্র এই পুজোর প্রচলন করেন। এই এত বছরে একঘরের ছন্দও বন্ধ হয়নি। প্রতিমা গড়ছিলেন নকুলপাল। আজ একচালা কিন্তু তিনটি অলঙ্কার চালচিত্রে দশভুজা মূর্তি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। সঙ্গে লক্ষ্মীর মূর্তি। ডাকের সাজের প্রতিমা নির্মাণ করেন বাবলা পাল। রাধাকৃষ্ণের মৃত্যুর পর পুত্র রামকৃষ্ণ মিত্রের সময় থেকে পাঁঠাবলি নিষিদ্ধ হওয়ার পর আর কোনওরকম বলিই এখানে হয় না।

মনোমোহনে পাঁঠাহীন বাড়ি ☐ পূর্বপুরুষের মুখের ডেকরার জাইবা গ্রামের এই পরিবারের আদি পুজোয় প্রচলন রয়েছিল। তার সঠিক দিনক্ষণ এখন বর্তমান সদস্যরা বলতে পারেন না। প্রায় সেড়শো বছর আগে গোয়ালপাড়া স্ট্রিটের বাড়িতে দুর্গাপুজোর প্রচলন হয় পণ্ডিত ঈশ্বরের পাণ্ডের উদ্যোগে। সন্ধিপুজোয় মোট পাঁচটা পাঁঠাবলি দেওয়া হয়। একচালার মাটির প্রতিমা নির্মাণ করেন কৃষ্ণকানাই গোপাল পাল। ঠিকানা ১/১এ মোহনলাল স্ট্রীট।

শঙ্খবাড়ি ☐ এক চালার ঐতিহ্যবাহী প্রতিমা। এই বাড়ির পুজোয় এক অন্যরকম বৈশিষ্ট্য মহাদেবের কোলে শায়িতা মা দুর্গা। প্রায় ১৭০ বছর আগে প্রাণকৃষ্ণ শাঁখা এই পুজোর প্রচলন করেন। কথোদিন ডাকের সাজে এই মূর্তি গড়েন নিতাই পাল। এই বাড়িতে নিত্যপুজোরও মূর্তিও আছে। দুটি মূর্তিকেই একসঙ্গে পুজো করা হয়। কোনও প্রাণী বলি দেওয়ার রেওয়াজ এই বাড়িতে নেই। সেই প্রথম থেকেই আখ, শসা, কুমড়ো বলি দেওয়ার রেওয়াজ চলছে। কলকাতার বিভিন্ন এলাকার শাঁখবাড়ির পঞ্জিকলের হাল। প্রত্যেক বছর পুজোর পরদা পড়ে এক একটা বাড়িতে। ঠিকানা ২১৩ বিধান সরণি।

ভাদরকুল কর বাড়ি ☐ অনুমান বাংলাদেশ থেকে বহু বছর আগে এই শহরে এসেছিল এই ভাদরকুল পরিবার। ভাদরকুল নামের একটি জায়গায় এঁদের একসময় বসবাস ছিল বলেই এঁদের ভাদরকুল বলা হয়। কলকাতায় ছড়িয়ে আছেন এই পরিবারের বিভিন্ন শরিকরা। বিভিন্ন বাড়িতে ঘুরে ঘিরে পুজো হয়। এবার পুজো হচ্ছে ১৪ নং রমানাথ মজিক স্ট্রিটের বাড়িতে। এই পরিবারের পুজোয় প্রতিমার পরিবর্তে ঘট ও কার্তিক স্থান করেছেন। নবমীর দিন পরিবারের সদস্যদের জন্য থাকে খাসির কষা মাংস। পরিবারের সদস্য সংখ্যা ১০৬ জনের বেশি বাপার বেরিয়ে ঘরে ঢুকতে হয়।

কৈলাস ভবনের পুজো ☐ ভাদরকুলের শিষ্য কৈলাস ঘোষ ১৮৮৩-তে এই পুজো প্রচলন করেন। এ বাড়ির প্রতিমা শিল্পী নকুলপাল পাল। প্রতিমার হাতদশ আছে। কুমারী পুজোরও রেওয়াজ আছে। বিভিন্ন তীর্থ থেকে আনা জল বিভিন্নপাত্রে শঙ্খে ঢেলে জলাধিবাস জল জানানো হয়। সন্ধিপুজোয় বলানো হয় ১০৮টি প্রদীপ। পুজোর দিনগুলোয় ১৫ রকমের পিঠাই ভোগেরও বেশ নামডাক আছে। ৮ নং কৈলাস ঘোষ লেনের এই বাড়ির পুজোয় ভোগের দিন রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজদের আমন্ত্রণ জানানো হয়।

ঘোষবাগানের মাটুজ্যে বাড়ি ☐ রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ১৮৬৩-এ এই

পুজোর প্রতিমা। প্রতিমা একচালার। বুড়ি তৈরীর ক্ষেত্রেও বংশপরম্পরা একটা ধারাকে মেনে আসা হচ্ছে। তারাতলা লাইনের বংশধরেরা গড়েন এই ঐতিহ্যের বুড়ি। আগে পাঁয়রাবলি হত শুধু ৭০ বছর ধরে তা বন্ধ।

পটলডাঙার বনেদিয়ানা বাড়ি ☐ ১৭২ বছরের পুরনো কলকাতার মুখ যেন স্ট্রিটের এই পারিবারিক পুজোটি। পুজোর প্রতিষ্ঠাতা বাগবাজার বল্লিক। আগে পাঁয়রাবলির রেওয়াজ ছিল। কিন্তু প্রায় ১৩২ বছর আগে বলি দেওয়ার পাঁঠাটি বলির আগের মুহূর্তে পালিয়ে যায়। সেটি তখন প্রসন্ন নিবেদিল গোপাল মল্লিকের কাছে। সেই থেকে পুজোয় পাঁয়রাবলি বন্ধ করে দেওয়া হয়। বাড়ির প্রতিমা তৈরী করেন শৈলেন পালের বংশধরেরা। প্রতিমা বাংলা ধাঁচের, কিন্তু মিশেছে অভিনবত্ব। নিখুঁত গায়ের রং, লম্বা, টানা চোখ মুখ আর ছুঁচোলো নাক। সন্ধিপুজোয় বন্দুক থেকে গুলি ছোঁড়া হয়। আগে গুলির ব্যবস্থাও করেন দাদা হত।

পটলডাঙার ঘোষাল বাড়ি ☐ বনেদিয়ানা বাড়ি থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে মুখ যেন স্ট্রিটে এই পটলডাঙার ঘোষাল বাড়ি। প্রায় ২৪০ বছর আগে এই বাড়িতে পুজোর প্রচলন করেন রাধাকান্ত ঘোষাল। প্রতিমায় ডাকের সাজ না থাকলেও বুড়ি একচালার। নাকে সোনার নথ। বাড়ির সব মহিলা কপোর। রাধাকী পালের বংশধরেরা প্রতিমা গড়ে আসছেন চতুর্থীপুজোর অনুসরণে। নিত্য এখানে মূর্তিগড়া হয়ে। আগে বলি দেওয়া হলেও এখন সে পাট তুলে দিয়েছেন।

ঈশ্বরদিয়া ঘোষ বাড়ি ☐ ঈশ্বরদিয়া কালীবাড়ির সেবায় নিবেদিত প্রাণ এই ঘোষ বাড়ির। কালীবাড়ি প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই এই বাড়িতে দুর্গা পুজো হচ্ছে। শংকর ঘোষ জানান এই পুজোর বয়স দেখ কয়েকবছর আগেই হিসাবে ছাড়িয়েছে। ঘোষ বাগানের মাটি পুকুর শংকর ঘোষ কড়ক বাড়ির এই পুজোর প্রচলন। তিনি এই বিখ্যাত কালীবাড়িও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রতিমা-শিল্পী তিনপুরুষ ধরে। আগে বলি হত। এখন আখোমানের নামে বলি বন্ধ হয়ে গেছে।

রানি রাসমণির বাড়ি ☐ রানি রাসমণির বড় মেয়ে পদ্মমণি দাসী ও তাঁর স্বামী রাজচন্দ্র দাস এসে এসে বাগবাজারে এই বাড়িতে পুজোর প্রচলন করেন আজ থেকে প্রায় দুশো বছর আগে। রানি রাসমণি নিজে বেঁচে থাকতে কোনো পুজো শুরু করেননি। এসে এসে বাগবাজারে বেড়ে রাসমণির বাড়ি তিনবাড়ি।

সবচেয়ে পুরোনো পুজো হয় বালিবাড়িতে। ইংরেজদের দিন তারিখে কালীপুজো হত। প্রতিমা গড়েন রাজবল্লভ পালের বংশধরেরা। প্রতিমা একচালার। বোনএলাকাটাই বলির রেওয়াজ ছিল না। এলাকার প্রতিমা মেলে এই পরিবারের সদস্যরা ঢাকে করে ঠেলাগাড়িতে নিয়ে যান পরার ঘাটে। আগে মৌজা থেকে ঘুরে বিসর্জন হত।

অষ্টধাতুর বড়মা বাড়ি ☐ অষ্টধাতুর বড়মা দেখার এই বাড়িটিতে পুজোর প্রচলন উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। প্রতিষ্ঠাতা অষ্টধাতুর বড়মা। প্রতিমা একচালা ঢাকের সাজের। বাড়িতে কলাবৌ স্নানের রেওয়াজ মেনে আজও হচ্ছে। আগের চালা আগে নিতিন তীর্থ থেকে।

ভবানীপুরে মল্লিকবাড়ি ☐ কলকাতার প্রথমের দাই প্রেসিডেন্সি এই মল্লিক পরিবারে পুজোর শুরু প্রসন্ন চৌধুরী। বংশের আদি পুরুষ দুর্গতের মন্ত্রণা থেকে। সেটা ছিল নবাব সুজার পালের আমল। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কলকাতার বনেদিয়ানা বাড়ি স্ট্রিটে নেবীবল্লভ শুরু করেন ঈশ্বরচন্দ্র মল্লিক। বর্তমানে পুজো হয় ১২টি নেবেদিনীনেবেদ্য মোতে। এই ভবানীপুরের বাড়িতে পুজো শুরু ১২৭৩-এ। মল্লিকরা বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত। বলিও পুজো হয় শাক্ত মত অনুসরণেই। কিন্তু পুজোয় পাওয়া যাবে না আমিষের চল।

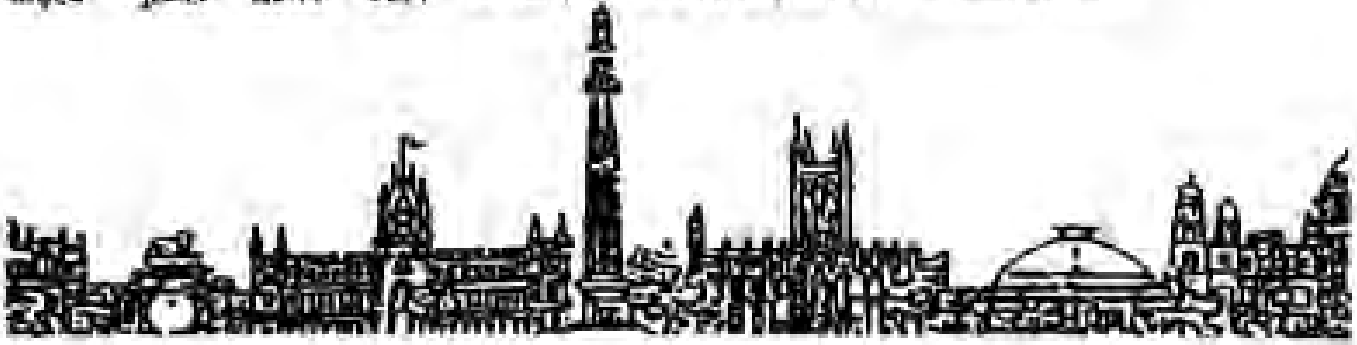

বিরিঞ্চিবাবা

শরদিন্দু (রাজশেখর বসু)

চৌধুরি সাহেব যখন রাসবিহারীকে শেষটি ছেড়ে দিতে বলেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ঝকঝকে ফ্ল্যাটের খুব আদুরে ছেলে হইলেও সব দিকে তার নজর রাখা দরকার ছিল। মেসের অধিবাসী পাঁচ-ছয়জন ছাত্র এবং সকলেরই অবস্থা ভাল। বসিবার জন্য একটি আলাদা ঘর, তাহাতে রেডিয়ো বসানো এবং অনেক রকম ব্যবস্থা আছে, দাবা-তাস-পাশা ও অন্যান্য খেলার সরঞ্জাম, কতকগুলি মাসিক পত্রিকা প্রভৃতি বিশ্রামিসেবনের উপকরণ সজ্জিত আছে। কাল হইতে পূজার বন্ধ, সেজন্য মেসের অনেকে দেশে চলিয়া গিয়াছে। বাকী আছে কেবল নিবারণ ও পরমার্থ। ইহারা তোষাও যাইবে না, কালও দুজনেরই পরমপরিচিত সাতজন বন্ধিকারায় আসিতেছেন।

নিবারণ কলেজে পড়ায়। পরমার্থ ইনসিওরেন্সের দালালি, হাইযোগ এবং কিঞ্চিৎসিদ্ধির চর্চা করে। আজ সন্ধ্যায় মেসের মৌলিকদ্বয়ের ইহারা দুইজন এবং পাশের বাড়ির নিবারণবাবু আসর দিয়েছেন। নিবারণবাবু নিরীহ প্রকৃতির লোক। তাঁর একটু সর্দি হইয়াছে, সেজন্য মেসের ছোকরার দল তাঁকে একটু সর্দীহ করে, অর্থাৎ দিল্লি চিরিয়া দিয়াছে থাকে।

নিবারণবাবু বলিতেছিলেন—টাকার খুব দেই বাবা। কি-বেটী পালিয়েছে, খুঁজিয়ে

বার, পিসী চিঠিপত্তি করছেন, আপিসে গিয়েও দে দু-পাত দুধুর তার ছো নেই, নতুন ছোট-সাহেব যদি কেন বেরিয়ে যুচছে।

পরমার্থ বলিল—কেন আপনাদের আপিসে তো বেশ ভাল ব্যবস্থা আছে।

নিবারণ—সেদিন আর নেই রে ভাই। ছিল ঘটে বেকেরি সাহেবের আমলে। সকাল-খুড়োকে জল ছো। শ্যামলালের বাবা দুধুকোকে জল ছো। শ্রীমন্তলালের বাবা দুধুকো। খুড়ো দুটোর সময়ে আসিত বেয়ারা, আড়াইটা থেকে সাড়ে চারটে পর্যন্ত ঘুমুতেন। আমরা সবাই পালা করে টিফিনবক্সে পড়িয়ে নিতুম, কিন্তু খুড়ো চেয়ার ছাড়তেন না। একদিন হয়েছে কি—সেজার টিক দিতে দিতে যেমনি পাতায় হাত পৌঁছেছেন অমনি ঘুম এল। নড়ন-চড়ন নেই, নাক-ডাকা নেই, খালি একটু কুঁচকন না, সেজার টেরিয়েলের আঙুলের হাতের কলমটি ঠিক ধরা আছে। অসাধারণ ক্ষমতা—ঘুম থেকে দেখলে যে জানে খুড়ো ঘুমুচ্ছেন। এমন সময় বেকেরি সাহেব ঘরে এল, সকলে শশব্যস্ত। সাহেব খুড়োর কানের কাছে একটি টিনটি কাটলে। খুড়ো একটু মিটমিটিয়ে চেয়েই বিরক্তি করে আবার করলেন— সাইত্রিশের সাত নামে ছিয়ে কটি তিন। সাহেব হেসে বললে — ড্যাম এ কল অব টী বাবু। এখন সে রায়ত নেই, সে অকেশাও নেই। সবাই বেরা বয়ে গেছে। একটি ভাল বাবু-গোছানী পাই তো দশ ছোকরা নিয়ে বেরিয়ে পড়ি।

পরমার্থ— জীবনাথ-ঘাটে আজ একটি

সাধুকে দেখে একদম—আশ্চর্য ব্যাপার। লোকে তাঁকে বলে জিয়ড়াইবাবা। তিনি তোলেন লম্বা। খড়ম পরেছেন—তাও লম্বা, কাঠ লম্বা, হাতও লম্বা—সবই লম্বা। হাজার হাজার লোক প্রণাম নিতে আসছে, একটি কথায় সবার মনস্কামনা পূর্ণ করে দিচ্ছেন, তাই খেয়ে মন ভালো হয়ে যাচ্ছে। শুনেছি তাঁর আবার দিব্যি গন্ধ আছে, তাঁর সামনে আসলে উড়ুনচণ্ডে। তিনি কম বেশ কয়লেরো ঘাঁড়ো।

নিতাই —ওরে আন্টার, তুমি তো সিলভারসিটিতে এম. এ পাশ করেছ—লম্বা, জয়লেরো ঘাঁড়ো এ সবের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য কি বল তো? তোমার পাখোরাজ বন্ধ কর তাপু, কথা বলা যাচ্ছে না।

নিতাই প্রথমে একটি মাসিক পত্রিকা লইয়া সাড়াচাড়া করিতেছিল। তাহাতে যে পাঁচটি গল্প আছে তার প্রত্যেকের নায়িকা এক-একটি সতী-সাধ্বী রাজকন্যা। অবশেষে নিতাই পত্রিকাটি ফেলিয়া দিয়া একটা পাখোরাজ টেনে লইয়া মাঝে মাঝে তেরাদা ঠাটি বাজাইতেছিল। নিতাইবাবুর কথার ব্যঞ্জনা বাড়াইয়া বলিল, —এ সব হচ্ছে তিন তিন সাধনার মার্গ। যেমন জ্ঞানমার্গ-কর্মমার্গ-ভক্তিমার্গ — তেমনি জিয়ড়াইমার্গ-জয়লেরমার্গ-পাখোরমার্গ - একাদশীমার্গ-পোস্তরমার্গ-টিকিমার্গ পাড়িমার্গ-স্পটিকমার্গ-কানমার্গ ....।

নিতাই— কানমার্গ কি রকম?

নিরঞ্জন— জানেন না? সেদ বছর বরিষের ছুটের মেলায় গিয়েছিলুম। এক জায়গায় দেখি একটি চশমা চাঁদের পাঁচার শ-খুই জল বাতেলা করছে। পাশে একটা লোক দাঁড়িয়ে— সে-সে আসে মৌজে, সে-সে যায়। তারপর বুঝি পেশোয়াজি কি মুসলমানি কলা হবে, নিশার পড়তে লাগবে। একটা বাড়িওয়ালা কাগের হাতে দিয়ে দিল দিয়ে বললুম—পাতো আলা, চিত্তরেটা কি ঘাটি নয়— পাঁচমাম— ত্রাত্রিকম খেলো—হুম্ভঃ। আমি রোজবারে এসে। আলা-ওলা বলছে—বাবু মৌজা নহি পড়তা। —হয়ে কি তরে তাপু? আগের বারে তো তেনাকে পাই হেরো, সোকে বুঝি মুক্ত আনাবার জন্যে ডেকে? বললে— ছাও নয়। এই কাল খাঁচার কয়েদ রয়েছে, ধু-টু আনা খরচ করে তাওতলি ইস্কে দিয়ে জীবকে বন্ধনদশা হতে মুক্তি দাও, তোমারও মুক্তি হবে। তারপর মোক্ষের মার্গ কি রিটিং! আমা থেকে মুক্তি পাবে তাই এই পরিশ কাল-ওলা তোরা নিজের পয়জাল নষ্ট করছে। একে বলে conservation of value। একজন পাশ না করলে আর একজনের পুশ হবার জো নেই।

এই সময় একটি হাটিহোরাকলী বাইশ-তেইশ বছরের ছেলে ঘরে আসিয়া পাখার রেওসেটার শেষ পর্যন্ত টেনিয়া দিয়া হাতটি আছড়াইয়া ফেলিয়া তক্তাপোষে উপর ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। এর নাম সত্যব্রত, সম্প্রতি সেকেণ্ডক্লাস ইংরেজি দিয়া কাজকর্মের চেষ্টা দেখিতেছে। সত্যব্রত হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—ওঃ কি মুশকিলেই পড়া গেছে!

সত্য হাতটি মুশকিলে পড়িয়া আছে, সেজন্য তার কথায় কেহ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিল না। অগত্যা সে আপন মনে বলিতে লাগিল— সমস্তদিন আপিসের হাড়ভাঙা খাটুনি, বিকেলে যে একটু ফুর্তি করব তারও জো নেই। জানলুম আজ ঘাটশিলে পাঁচা খেতে আসি। অমনি নিশীথ বলে বসলেন— সঙ্গে, দুই বন্ধে বাজিয়ে, আসবার সময় ফল, সাতেলমশায়ের হাসুতে ওঠবি। কি আপদ, যেতে হল। কিন্তু সব মিথ্যে। সাতেলমশায় বলছেন ধর্মজীবনের মধুরতা, আর আমি ভাবছি অম্বলের।

নিতাই— আম্বলোলা?

সত্য— ছিল টুন আম্বলোলা। ফরওয়ার্ড অন্দুটাই আছে, নভেম্বর-ডিসেম্বর শিপমেণ্ট, চল্লিশ পার্সেণ্ট পদ্ম লিলিং টুন, সি-আই-এফ হুগলি। চারবার লড়াই হারবে ভিনা, তাই আগে আকবরে ডবল সপ্তয় আছে। বড়সাহেবের কথা— এক মাসের মধ্যে সমস্ত ডাক শিপে-বন্দী হওয়া চাই। কোথেকে পাই বলুন তো? ওঃ কি বিপদ!

নিতাই— যাঁয়ে সতে, তুই, না বেশবজানী, তোদের ন বিদ্যে কথা বলতে নেই?

সত্য— কেন বলতে নেই। নিশীথদা কাছে না বললেই হল।

নিরঞ্জন— সঙ্গে, তোর সন্ধানে জানা বাবাজী কি পামিজী আছে?

সত্য— ক-টা চাই?

নিতাই— যা ঘাট, ইয়ারকি করিসনি। তোরা অন্তরঙ্গই আসিস না তা আমার বাবাজী।

সত্য— তোর মরম না। নিশিরঞ্জন খাঁড় কখন ভরছিল, খেতে পারেন না, ঘুমুতে পারেন না, কথা কইতে পারেন না, কেবল শিসেপলাপে ঘরময় দেন। বাড়িসুদ্ধ লোক ঘরে ঘাঁহিয়। নিশারঞ্জিনী, আলিপরিন,

মাসুলি, জলপড়া, পাঁচের সেরা যার কো-ও-দি, কিছুতে কিছু হয় না। তখন নিরুপায় হয়ে তিনি নিজের শির পাঁত পড়ে গেল।

পরমার্থ হাসিয়া উঠিয়া বলিল—বেশ সত্য, তুমি যা ভেক না তা নিয়ে মাতামাতি কর না, প্রার্থনাও না অনুশোচনাও না। মনুষ্যজীবনের প্রকৃত এডভেঞ্চার হয় তা হলে?

সত্য— আলবৎ আমি। তার সাক্ষী রাজশক্তির ঐতিহাসিক ঠাকুর, অনেকের ছেলেরা যাকে বলে মেডিক্যাল বাবা। আমার দুই টিকি, একটি পলিটিক্স, একটি সোশ্যালিজম আকাশ থেকে ইলেক্ট্রিসিটি গ্রহণ নেন। স্পর্শ মাত্রেই এক-একটি অবতারের ইতি লভ্য। তাদের প্রত্যেক কাজ সাধ্য, নিজের চলের যুক্তি দিয়ে দেখা করতে হয়।

নিরারণ—নাঃ নিরঞ্জনই, বেশান্ত, ইলেকট্রিসিটি এর একটাও নিরঞ্জনের ধারে কাছে আসবে না। যদি কোনও নিরীহ বাবাজী সন্ধানে থাকে তো বল। কিন্তু কেরামতি চাই, শুধু ভক্তিতত্ত্বে চলবে না। কি বলেন নিরঞ্জনবাবু?

পরমার্থ—তবে ধনলক্ষ্মীর গুরুপদবাবুর বাগানে চলুন, সিদ্ধিকিশোরীর আছে।

নিরারণ— আলিপুরের উকিল গুরুপদবাবু? আমাদের ডেপুটির মেসীর শ্বশুর? তিনি আবার বাবাজী ফেলিলেন কোথা থেকে? সত্য, তুই জানিস কিছু?

সত্য— মেসীমার কাছে শুনেছিলুম বটে গুরুপদবাবু সম্প্রতি একটি গুরুর পাল্লায় পড়েছেন। স্ত্রী আর নিজে অনেক অনুরোধ এড়েছেন বলে গেছেন। তাতে তো কিছুই যায় আসে না।

নিরারণ— গুরুপদবাবুর আর একটি মাইনর মেয়ে আছে না।

সত্য— বুবুরী, মেসীমার শালী।

নিরারণ— তোমার পরমার্থ, বাবাজীটি কেমন?

পরমার্থ— আশ্চর্য! কেউ বলে তাঁর বয়স পঁচিশ বৎসর, কেউ বলে পাঁচ হাজার অথচ দেখতে এই নিরাইবাবুর মতনই তরুণ হয়। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে একটু হেসে যাবেন—বয়স বলে কোনও বস্তুই নেই। সময় আছে—একটি কাল, সমস্ত ক্ষুদ্র—একই ক্ষুদ্র। তিনি নিত্য তিনি চিরকাল চিরদেহ একসঙ্গেই ভোগ করেন। এই যথা— এখন সেপ্টেম্বর ১৯২৫, তুমি হাওড়ীবাগানে আছ। সিদ্ধিকিশোরী ইচ্ছে করলে এখনই তোমাকে ব্যাকলণ্ডের টাইমে প্রত্যহে অথবা ভোর্থ ডেকুটি কি.সি.-এর পার্টনিপুর নগরে এনে ফেলতে পারেন। সময়ই অপেক্ষিক কি না।

নিরারণ—আইনস্টাইনের শলায় একেবারে মাটি।

পরমার্থ— আরে আইনস্টাইন বিশ্বাস করেছে? তবেই সিদ্ধিকিশোরী যখন ভেলোক্রোডাকিয়ায় তপস্যা করছেন তখন আইনস্টাইন তাঁর কাছে আসতেন। তবে তার নিজে ইলেকট্রিসিটির দেখী এগোয়নি।

নিরাইবাবু উদ্‌গ্রীব হইয়া সমস্ত শুনিতেছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—আচ্ছা, আইনস্টাইনের থিওরিটা কি বল তো?

পরমার্থ—কি জানেন, স্থান কাল আর গতি এরা পরস্পরের ওপর নির্ভর করে। যদি স্থান কিংবা কাল বদলায়, তবে গতিও বদলাবে।

সত্য— ও হল না, আমি সহজ ভাষে বলছি শুনুন। ধরুন আপনি এখানে দুপুরে খেলেন, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে গেলেন, তখন আপনার ওজন ২ মণ ৫০ সের। সেখান থেকে গেলেন গৌরাঙ্গসেবা কংগ্রেস কমিটিতে—সেখানে ওজন হল মাত্র ১ মণ, হাঁফাচ্ছ, ঘুঁটে উঠে গেলেন।

নিরারণ—ঠিক, জনার্দন ঠাকুর পলিসিবাজার থেকে আড়াই সের আলু, আর ফেলে এলেই হয়ে যায় ৯-সের।

নিরাই— আচ্ছা পরমার্থ, সিদ্ধিকিশোরীর নিজে তো ত্রিকালসিদ্ধ পুরুষ। তাঁহাদের কোনও বুদ্ধিকে কয়ে যেন কি?

পরমার্থ—তেমন তেমন ভক্ত হলে কয়েন বই কি। এই সেদিন ভেলিয়ায় আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থা দিয়েছিলেন। তিন দিনের জন্য তাকে নাইনটিন ফোর্টিতে নিয়ে গেলেন, ঠিক লড়াইয়ের আগে। ভেলিয়ায় পাঁচ হাজার টন লোহার কড়ি কিনে কেলেন-৪ টাকা হন্দর। তার পরেই তাকে একেবারে নাইনটিন নাইনটিনে রাখলেন। ভেলিয়ায় বেচে দিলে একুশ টাকা পড়ে। তখন অনেক তাকে হাল আমলে ফিরিয়ে আনলেন। ভেলিয়ায় এখন পড়ে আছে টাকার মাসিক। না বিশ্বাস হয়, আজ করে দেখ।

নিরাইবাবু পরমার্থের দুই হাত ধরিয়া গদগদস্বরে বলিলেন— পরমার্থ ভাই, যে, আমায় একটুনি নিয়ে চল্ সিদ্ধিকিশোরীর

কাছে। আপনি পাশে হয়ে হয়তো দেখ। ওরকম যা লাগে সব দেখ. ঘটি-বাটি বিক্রি করবে, নিজীব হাতে পড়ে থাকে সেই সব জিনিস গোটি-ছড়াটা পড়ব দেখ। আমার দরকার হলে ইংরাজিতে লাইসিন্স ফোটিনে ঘুরে আসতে পারি, তবে তোমার কুলশ না পরমার্থ। টেন শ্যারমেন্ট— বুঝলে। হা ভগবান, হায় যে দেহা।

নিমাইচন্দ্র— ওরকম বাবু কিছু ওষুধ দিয়ে পারবেন?

পরমার্থ— ইয়ে ইয়েকালের কোনও চিন্তাই নেই। ওসবেই বিষয়-সম্পত্তি সরস্বতী ওকাতে দেবেন।

নিমাইচন্দ্র— এতদূর গড়িয়েছে? হাতে সন্ধ্যা, তোর নন্দীদা, তোর বউদি, এরা কিছু বলছে না?

সন্ধ্যা— নন্দীদাকে তো জানই, নাদা-খাপা লোক, নিজের এক্সপেরিমেন্টে নিয়েই আছেন। আর বউদি নিজের ভালমানুষ। এঁদের দ্বারা কিছু হবে না। কিছু করতে হয় তো তুমি আর আমি। কিন্তু সেটি নয়।

নিমাইচন্দ্র— তবে একটি নন্দীর ঘরে চল্। ব্যাপারটা ওকে আগে ভেঙে নিয়ে তার পর সবজনায় আসা যাবে।

নিমাইবাবু কাগজ পেন্সিল নাড়িয়া লোহার হিসাব কষিতেছিলেন। ওজনটা রাখবার কথা শুনিয়া বলিলেন— তোমাদের বন্ধুর কাছে যাবে নাকি? সেটা কি ভাল হবে। এর লোক নিয়ে আসবার করলে বাবা ভড়কে যেতে পারেন। লক্ষটা এক্কে যেন তার কিংকর্তব্য, ওর নিয়ে লাভ নেই। তেল বাবু, তোমের যখন খালা ব্রাহ্মসমাজ রয়েছে, সেখানে নিয়ে ওজন যে না, আমাদের ঠাকুর-দেবতার ওসব নজর দিল কেন? আমি বলি কি, আগে আমি আর পরমার্থ যাই। তার পর আর একদিন না হয় নিবারণ যেয়ো।

নিবারণ— না না, আপনার কোনও ভয় নেই, আমরা যেটুকু আপনার ওজন না শুধু একটু পরীক্ষা করব। বুঝিয়ে হয় তো কাল বিকেলেই সব একসঙ্গে যাওয়া যাবে।

প্রফেসর নন্দী কোনও কালে প্রফেসরি করে নাই, কিন্তু অনেকগুলি পাস করিয়াছেন। সে বাড়িতে নানারকম বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিয়া থাকে, সেজন্য বন্ধুরা তাকে প্রফেসর আখ্যা দিয়াছে। প্রফেসরের ডিগ্রি নাই, তাহার কৌতুক বস্তুটি কিছু আছে। নন্দী ওরফে বন্ধুর কাছারি, সহরতলীর পুরাতন-পন্থীর প্রজা এবং নিবারণের ক্লায়েন্টরা।

নিবারণ ও সন্ধ্যার যখন নন্দীর বাড়িতে পৌঁছিল তখন রাত্রি আটটা। বাহিরের ঘরে কেহ নাই, তাহারা বলিল বাবু এবং বৌমা ভিতরের টানানে আছেন। নিবারণ ও সন্ধ্যা অন্দরে গিয়া দেখিল উঠানের এক পাশে একটি উনানের উপর প্রকাণ্ড ডেকচিতে সন্দেশ রঙের কোনও পদার্থ সিদ্ধ হইতেছে, নন্দীর স্ত্রী নিরুপমা তাহা কাঠি দিয়া ঘাঁটিতেছে। পাশের বারান্দায় একটা হারমোনিয়ম আছে, তাহা হইতে একটা হারমোনিয়ম আসিয়া ডেকচির ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে। প্রফেসর নন্দী মাদুরে বসিয়া তোবড়ানো হাত দিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

নিবারণ বলিল—একি বউদি, এত সন্দেশ ঘটি ভরে আনো এইখেনে?

নিরুপমা বলিল—পাগ নয়, আম সেদ্ধ হচ্ছে। ওঁর কত রকম খেয়াল হয় জানেন তো।

নিবারণ— সেদ্ধ হচ্ছে? কেন নন্দীর বুঝি কাঁচা আম আর হজম হয় না?

নন্দী বলিল—নিবারণ, ইয়ারকি নয়। পৃথিবীতে আর অন্নাভাব থাকবে না।

নিবারণ— সকালেই তো প্রফেসর নন্দী বা বোলচুক ক্লীন এক বে খেয়ে বাঁচবে।

নন্দী— আরে ও কি আর খাদ্য থাকবে? প্রোটিন সিন্থেসিস হচ্ছে। আম ঘাঁটি-প্রোসেসড হয়ে কার্বোহাইড্রেট হবে। তাতে বুটো অ্যামিনো-অ্যাস মিশে যাবে— হেক্সোহাইড্রক্সি-ডাই-অ্যামিনো—

নিবারণ— থাক, থাক। হারমোনিয়মটা কি হবে?

নন্দী— বুঝলে না? অক্সিজারীক অবস্থায় জানো। নিজ হারমোনিয়মটা বাজাও তো।

নিরুপমা হারমোনিয়মের পেডাল চালাইল। সুর বাহির হইল না, হারমোনিয়ম বন্ধ করিয়া হাওয়া আসিয়া ডেকচির ভিতর গানিয়া করিতে লাগিল।

নিবারণ— ওপুই ফুড়ফুড়ি? আমি ভাবলুম বুঝি সন্দীপনের ওষুধের মত ঘরে ঘরের সঙ্গে মিশে সন্দেশ-অমৃতের প্রাণ সৃষ্টি করবে। থাক—বউদি হাতার ওজন কি কমল তো।

নিরুপমা ভালমুখে বলিল— লোহাতেই কিছু? না হাওয়ার পর থেকেই কেমন এক রকম হয়ে গেছেন। পাড়াপড়শী কোথা

থেকে এক গুরু জুটিয়ে দিলেন, তাঁকে নিয়েই একবারে মুশকিল। তাঁহাজন নেই বলেই হয়, কেবল গুরু গুরু গুরু। অনেক বরাতাতি করেছি, কোনও ফল হয়নি। শুনেছি টিকাকারি সবাই গুরুতে দেবেন। বুঁচকীটার জন্যেই ভাবনা। তার জন্যেই নিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু শাশুড়ীর অসুখ, এ বাড়ি ছেড়ে যেতে পারছি না।

সন্ধ্যা বলিল—আচ্ছা নবীনা, তুমি তো বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলতে পার?

নবী— তা কখনও পারি? শ্বশুরমশায় তাবলেন বাটী সম্পত্তির লোভে আমার ধর্মকর্মের ব্যাঘাত করতে এসেছে।

সন্ধ্যা— তবে অসুখ বাও, প্রয়োজন কলছার করে দিই।

নিরুপমা— না না অসুখ হলি তার তবে সেটা বলবার ওপরেই পড়বে। বাবাকে কষ্ট না দিয়ে যদি কিছু করতে পার তো দেখ।

সন্ধ্যা— হুঁ, শক্ত কথা। আচ্ছা বউদি, বিরিঞ্চিবাবার ব্যাপার কি রকম বলুন তো।

নিরুপমা— ব্যাপার প্রায় আশপাশের সেকে চলছে। সন্ধ্যাবাবা বলছেন, সঙ্গে আছে তাঁর চেলা ছোট-মহারাজ কেশলানন্দ। সন্ধ্যাবাবা বিশ্রাম করছেন। বাবা কিন্তাত সেখানেই পড়ে আছেন। রোজ দু-তিনশ লোক করণ নিচ্ছে, বিরিঞ্চিবাবার আদুত কমলালেবু পোকলার মতো খাঁ করে আছে। প্রতি রবিবার ভাণ্ডারা হচ্ছে, তা থেকে এক-এক দিন এক-একটি সেবকাশ্রম খাবিষ্কার হচ্ছে। কোনও দিন ভাগলপুর, কোনও দিন ভাগলপুর, কোনও দিন কিল, কোনও দিন শ্রীচৈতন্য। আজকাল সেখানে ঢুকতে দেওয়া হয় না, যারা খুব দেশী ভক্ত তারাই যেতে পারে। ভাগ্যে বেরবার দিন আমি ছিলুম।

সন্ধ্যা— কি রকম দেখলেন?

নিরুপমা— আমি কি ছাই ভাল করে দেখেছি! অন্ধকার ঘরে হোমকুণ্ডের সিদ্ধনে আবছায়ার মত ভাবায় খুঁটি, চারটে ঘুণ, লম্বা লম্বা দাড়ি। আমার তো দেখেই বাঁচতে বাঁচত দেয়ে চিঠি হল। গুরুপমায় ঘর থেকে টেনে ঘরে ঘরে নিলেন। বুঁচকীর কথা সাহসে আছে, প্রণাম দেখেছে কিনা। কাল আবি যাচ্ছেন বাত হবেন।

নিরঞ্জন— কাল একবার আমরা বিরিঞ্চিবাবার চরণ দর্শন করে আসি, যদি তাঁর দয়া হয় তবে কপালে হয়তো মহাযোগ দর্শনও হবে।

নিরুপমা— গণেশমামাকে বল করুন, তিনি অনুমতি না দিলে ভেতরে ঢুকতেই পাবেন না।

নিরঞ্জন— সে আমি করে নেব। কিন্তু সত্যি, তোকে নিয়ে যেতে সাহস হয় না তোর মুখ বড় খারাপ, দুষ্টু ছেলে কোথাকার।

সন্ধ্যা তার সরল হেসে বলিল—কখখনো নয়, তুমি দেখে নিও, হবে কেমন শা—ন্ত।

নিরঞ্জন— ও হি, জিব বার করলি যে?

সন্ধ্যা— কেন ইচ্ছে পাচ্ছি বউদি, খুব সামলে নিয়েছি। দিদীমার কাছে বলে ফেললে হবে থাকত না।

নিরঞ্জন— হবে আজ আমরা ছুটি। যাঁ, ভাল কথা। নবী এমন কিছু বলতে পার যাতে খুব যৌয়া হয়?

নবী— কি রকম যৌয়া। যদি লাল যৌয়া চাও তবে নাইট্রিক অ্যাসিড অ্যাণ্ড ভাল, যদি বেগুনী চাও তবে আয়োডিন কেলবে, যদি সবুজ চাও—

নিরঞ্জন— আরে না না। ধোঁয়া চাই।

নবী— তা হলে ক্লোই—নাইট্রো-ডাই-থিওনিল

নিরঞ্জন জল প্রতিবার বলিল—আবার আরম্ভ করলে যে। বউদি, এটাকে নিয়ে আপনার হলে কি করে?

নিরুপমা হাসিয়া বলিল—আমার বাড়িতে দেখেছি তোয়ালেঘরে ঢিকে পড় ঝাড়লে খুব ধোঁয়া হয়।

নিরঞ্জন— ইউরেকা। বউদি, আপনিই দেখছেন প্রাইজ পাবেন, মডেলটার কিন্তু হবে না।

নিরুপমা— ধোঁয়া দিয়ে করবেন কি?

নিরঞ্জন— ছুঁচোর উপদ্রব হয়েছে, দেখি তাড়াতে পারি কি না।

গুরুপমায়ের সন্ধ্যাবার বাসমন্দিরটি খুবই সুসজ্জিত ছিল, কিন্তু তাঁর গাড়ী পার হওয়া অবধি হতাশী হইয়াছে। সন্ধ্যাবাবা বিরিঞ্চিবাবার অধিষ্ঠানহেতু বাড়িটি মেরামত করানো হইয়াছে এবং আসবাব কিছু কিছু সাজ হইয়াছে, কিন্তু পূর্বের গৌরব ফিরিয়া আসে নাই। গুরুপমায়ের সন্ধ্যাবার কোনও খবর রাখেন না, তাঁর শরীর গণেশই এখন সর্বাধিকার অধিকার করিয়াছেন।

বৈকালে শাঁখারীর সন্ধ্য নিরঞ্জন, সন্ধ্যাবার, পরমার্থ এবং নিরঞ্জনবাবু আসিয়া পৌঁছিলেন। বাড়ির বাঁয়ে একটি বড় ঘরে সতরঞ্চ বিছাইয়া ভক্তদের বসিবার

ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তার একপাশে একটি তক্তপোশে গদি এবং লম্বা ছাপ-মারা রাগের উপর বিরিঞ্চিবাবার আসন। পাশের ঘরে ভক্ত মহিলাগণের স্থান। মৌলবী এখনও তাঁর সাধনোচ্চ হইতে নামেন নাই। তাহার বদ্ধ চক্ষু ঊর্ধ্বমুখী হইয়া রহিয়া আছে এবং মুখমণ্ডলে সর্বদা একটি হাস্য করিতেছে। একটি সাহেবী পোশাক পরা প্রৌঢ় ব্যক্তি অনেক কষ্টে ধীকার করিয়া পদ ধূলিয়া বসিয়া আছেন এবং অধীর হইয়া মাঝে মাঝে তাঁর কানমলা গোঁফে পাক দিতেছেন। ইনি সিভিয়ন এ. কে. সেন, আই-এস-ও। সম্প্রতি কয়লার খনিতে অনেক টাকা রোজগার দিয়া ধর্মকর্মে মন দিয়াছেন।

পরমার্থ ও নিতাইবাবুকে ঘরে বসাইয়া নিরঞ্জন ও সন্তোষকে বাহিরে আসিল এবং আশ্রমের চারিদিক প্রদক্ষিণ করিয়া ফটকের কাছে উপস্থিত হইল। ফটকের পাশেই এক সারি টালি-ছাওয়া ঘর, তাহাতে আফসার এবং ফোরম্যান, গার্ডেনার, মালী ইত্যাদির থাকিবার স্থান।

অভ্যর্থনের সম্মুখে মৌলবী বহিঃপ্রকৃতি একটি আরাম কেদারায় বসিয়া ফোরম্যান গোটা তিন এবং খরোয়ান কেদু পাঁড়ের সঙ্গে গল্প করিতেছেন। মৌলবী সাহেবের নিবাস ফরিদপুর, ইনি ওকালতিতে অনারেবল মুন্সী। ওকালতিবাবু ওকালতি ছাড়া অন্য বহিঃপ্রকৃতির উপার্জন জমিয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও তিনি নিয়তির আদেশের পাইয়া থাকেন, সেজন্য মক্কেলকে সেলাম করিতে ছাড়েন না।

মৌলবী সাহেব ফরিদপুরী ঊর্দুকে দুনিয়ার বর্তমান বুলবুল বিশ্বাস করিতেছিলেন, ফোরম্যান ও সর্দারের মাথা নাড়িয়া সায় দিতেছিল। অমূল্য সাহেব ঘোড়ার ডাক ডাকিতেছে এবং মাঝে মাঝে চক্ষু ঘোড়ার পেটে ফলাপে আবদার জানিয়া বলিতেছে —আরে ঠহর যা ঊঁহু। সাধনের মাঠে একটি ঘূর্ণমান বিরাট বুদবুদকে জন্মিয়া ফল ধরিতেছে—প্রত্যেক বিরিঞ্চিবাবার অনুকরণশিষ্ট মাথের মুণ্ড ধরিয়া তার গবেষক হইয়াছে।

সন্তোষ বলিল—আসার মৌলবী সাহেব। মোছাব্বে তো নিশ্চি পরিচয়? পরনার পাঁড়েজী। ফোরম্যানজী আচ্ছা হ্যায় তো? এঁকে চেনে না বুঝি! ইনি নিরঞ্জন বাবু, জামাইবাবুর দোস্ত। গুজোরে জলো ডিমু ভেটি এনেছেন—ডিমু মতে বলেছেন না মৌলবী সাহেব—আপনার কম চিন্তা, পাঁড়েজী আর ফোরম্যানজীর পাঁচ-পাঁচ, সাহিব, মালী এদের আরও পাঁচ।

সৌজন্যে অভিভূত হইয়া বহিঃপ্রকৃতি, কেদু এবং খোঁটি সন্তুবিবাদ করিয়া সার আর সেলাম করিল এবং খেলা ও কালীবাড়ীর নিকট বাবুজীদের অবস্থিতি প্রার্থনা করিল।

মৌলবী বলিলেন—আর বাবুজীদের, সে সব দিন খতম হয়ে গেছে। মা-ঠাকরুণ যেদিন পাওয়া ইস্তক দেখের বাবুগিরেদের জন্যও কলেজার নেই। আর আজ কলিয়ার, কারুর আজন পসারও নাই করছেন না। তা কে শোনে!—খোদার মর্জি।

নিরঞ্জন বলিল—এ জমানাটাই বড় খারাপ গেল।

কেদু পাঁড়ে ভজন পাইয়া মহা উল্লাস করিল—নিরিঞ্চিবাবা জমানাকী খেতাই আছেন। উঁহার জরো ভি নাই, জরিভি নাই। তিনি বহুলি ভি খান, তরকারিও খেতে ভি খান। খোলে লঙ্কা না-বিচুটি না হইলে উঁহার চলে না। এ সব খরোয়ানী জমানাকী বিলকুল ভুলচুকার। আর ছোটা মহারাজ তিনি আছেন তিনি তো একটি সিন্ধু, কেদু পাঁড়েকে পর্যন্ত বগলে ছবিয়ে উঁহারা সরেস হয়। তিনি জানেন না যে উক্ত কেদু পাঁড়ে সিভিটিনিমে তলোয়ার খেলায়া থা (তিনিও কেদু তখনও জন্মেন নাই)। একবার যদি মনিব হুকুম দেন, তবে আপিস ছোটা জমাদারীয়ের ছক্কি চুর করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

মৌলবী জানাইলেন যে তাঁকেও এক অপমান সহ্য করিতে হয় নাই। জামাইবাবু (গণেশ) যে তাঁর উপর লম্বাই-চওড়াই করিয়াছে তা তিনি গ্রাহ্যের মধ্যে করিতেন না। তিনি খানদানি মনিষি, তাঁর ধমনীতে মোগলাই রক্ত প্রবাহিত হইতেছে। বলিও লোকে তাঁকে বহিঃপ্রকৃতি বলে, কিন্তু তাঁর আসল নাম মেহের খাঁ, তাঁর পিতার নাম জাঁহাবাজ খাঁ, পিতামহের নাম আলবুল জবুর, তাঁদের আদি নিবাস ফরিদপুর নয়—আগরা জেলে, তাঁরা বলে দুর্খ। সেখানে সকলেই লুঙ্গি পরে এবং ঊর্দু বলে, কেবল পেটের দায়ে তাকে বাংলা শিখতে হইয়াছে। সেই আগরা দেশের মনিষ্যিদের ইজ্জতখুল, তার উপরে পরনে পোশাক। এই সকলতা পরমাত্মা তাঁর কাছে একেবারেই তুচ্ছ। মোগলদের ধমনি বাস করা-পরিক, সেখানকার পবিত্র জুতার জল আর-এ-জমজম তাঁর কাছে এক সিনি

আছে। মনির যদি বন্ধুর মেয়েটাকে নেই ছল ছিটাইয়া হাসাতে-পেলে-হাসাতে ইতিমধ্যে লাভা দুই পাগলাটী ঘাড় জলদেবতাকে তিনি হা-ই সাত বলিয়ার পাশে জাহাজের চৌধুরাতে পৌঁছাইয়া দিতে পারেন।

নিবারণ বলিল—কেতুন চৌধুরী সাহেব, আমরা বাস্তবাদী মুটোরের ভাড়াটেই আছার। যদি মুটিয়ে হয় তো আছাই। কিন্তু এখন খেয়ে উঠিব না। আপনি আর কয়েকজনকী সঙ্গে থাকা চাই।

কেতু— আর-লিট হোবে?

নিবারণ— আছে না না। হোমাদের কোনও ভয় নেই। কেবল একটু টিয়াটিয়ি করতে হবে। পারবে তো?

জলদ— অবশ্যই। জান বন্ধুন। কিন্তু বলির যদি গোলা হন!

নিবারণ বুঝাইল, মনিবের চরিত্রের কোনও অনিষ্ট ঘটিবে না। একটু পরে সে আসিয়া যথাকর্তব্য বুঝাইয়া দিবে।

নিবারণ ও সত্যব্রতকে বিভিন্নিবাবার গন্তব্যের অভিমুখে চলিল। পথে গণেশজনের সঙ্গে দেখা, তিনি ব্যস্ত হইয়া হোমের আয়োজন করিতে যাইতেছেন। নিবারণ ও সত্যব্রতকে দেখিয়া বলিলেন—এই যে হোমরার এসের দেখছি, বেশ বেশ। যেঁয়ে তারপর—গাড়ির সব যেঁ যেঁ? নিবারণ, তোমার আর বেশ যেঁ-যেঁ। তোমার আ এখন একটু যেঁ-যেঁ? তোমার ছোট খোকাটি যেঁ-যেঁ? সত্য, তোমার নিবেদনের শিশীরা সকুকলে—

নিবারণের ব্যাখ্যানের সকলেই যেঁ-যেঁ। সত্যব্রতেরও অভ্যাস। সকলেই গণেশ জনের আশীর্বাদের ফল। ব্যস্তবাদুর আনন্দের কুল হইতেছিল না, এখন কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হইলেন।

সত্য বলিল—তবে, আপনার ছোট জামাইটির চাকরি হয়েছে? যদি না হয়ে থাকে তবে দুটির পরেই আমাদের আপিসে একবার পাঠাবেন, একটা ভেকান্সি আছে।

গণেশ— বেঁচে থাক বাবা, বেঁচে থাক। তোমরা হলে আপনার লোক, তোমাকে ছেড়া না বললে কি কিছু হয়? আপিস খুললেই সে তোমার সঙ্গে দেখা করবে।

নিবারণ— ব্যস্তবাদু, একটি নিবেদন আছে। বেলাবশন করিয়ে দিতে হবে।

গণেশ— তা বাপ না বাবার আছে। সকলেই তো দেছে।

নিবারণ— ও বেলাবশ তো নেখাই। আসল বেলাবশ বেলাবে হবি—হোমাবরে।

গণেশজনো সজোরে জিব কাটিয়া বলিলেন—রাম রে, সে কি হয়! কত সংযোজনা করে তবে অধিবাস জন্মায়। আর আমাদের সন্ধ্যা তো—এই—এই—আছে বলে—

নিবারণ— বেলাবশী। কিন্তু তব ব্রাহ্মজ্ঞান এখনও হয়নি। সন্ধ্যা হচ্ছে টাকা তুলে রাখা, বিশ্বাসিনীটা ঠিক বজায় রেখেছে। ও বাঁধা আকড়ায়, বিয়েটির পেছে, সত্যনারায়ণের সিন্নি, অন্নপ্রাশনের খিচুড়ি-ভোগ, কালীঘাটের কালিকা সকল খায়। আর কিছুতে নেই, আপনি হলেন বেদার গুরুজন, নইলে তব মু-চারটি বেলাবাল তনলে বুঝতেন যে ও বড় বড় বিষ্ণুর কম করিতে পারে।

গণেশ— যাই কলক, আর খেলে আর কিছু আসে না। তুমিও তো তনতে পাই ব্রাহ্মণ পণ্ড।

নিবারণ— সে তো সকলই সত্য। গুরুপরম্পরাতে এসে খেয়েছেন। তা হলে বেদবশন হবে না? নিবারণই নিবেদ করবেন? আচ্ছা, তবে চলুন।

সত্য— প্রণাম আমাদের। ঈশ, একটি কথা—আমি বলি কি, আপনার জামাইটি এখন মাস চার-পাঁচ টাইশবাইটি। নিখুঁত। একবারে আনকী, তাকে চুকিয়ে দিয়ে আমিই সাহেবের কাছে অপনস্থ হব। সেকটি ভেকান্সিতে তার ছোট করা যাবে।

গণেশ— তাহলে না না না। চাকরি একবার ফসকে গেলে কি আর সহজে মেলে? না সত্য, লক্ষ্মী পায় আমার, চেষ্টাচিষ্টি করে দিতেই হবে। ইঁয়া—কি বলছিলে? বুদ্ধি এখন বীজা-টীজা পড়ে থাক। খুব ভাল। তা—হোমঘরে গেলে তেমন দোষ হবে না। একটু গঙ্গাজল তাকার দিয়ে যোয়ে—বুঝলেই। আচ্ছা—তা হলে জামাইটির কথা ভুলো না।

গণেশ-আদ্য তনতে গেলে নিবারণ বলিল—এখন পর্যন্ত তো বেশ আশাজনক বোধ হচ্ছে, শেষ রক্ষা হলেই হয়। তবুও, হাজার এরা সব এসেছে।

সত্য— হ্যাঁ, তারা ধরণাতে রয়েছে। ঠিক সময় হাজির হবে। আচ্ছা নিবারণদা, ব্যস্তবাদুর কিছু কথায় আছে নাকি?

নিবারণ — তাকবান আছেন। গুরুপরম্পরা হক দিন সংসারে নির্লিপ্ত আছেন, ব্যস্তবাদুর তত কিনই খুশিয়ে।

বিভিন্নিবাবা সভা আলোকিত করিয়া বসিয়াছেন। তাঁর চেলারাটি বেশ লম্বা-

চওড়া, গৌরবর্ণ, মুণ্ডিত মুখ। বৃদ্ধদের পায়ের আঘাত হইতে বৃষ্টিটি উজ্জ্বল চোখ দুটি মেলিয়াছে। দু-পাশের লম্বা সিঁড়ির মত সুবৃহৎ নাক, মৃদু হাস্যরঞ্জিত প্রশস্ত ঠোঁট, তার নীচে থাকে থাকে চিবুকের স্তর নামিয়াছে। বার্মিসিরির উপরক্ত মূর্তি। মনে হৈমিতবল্লির অমলধারা, মস্তকে ঐরূপ আলবার্টা টুপি। বয়স ঠিক শত বলিয়া বোধ হয় না, তেন শতকের কি পঞ্চদশ। আসার বেদীর নীচে ডানদিকে ছোট-মহারাজের কেবলানন্দ বিরাজ করিতেছেন। ইহার বয়স অল্প পঞ্চাশী তাহা অন্তরঙ্গ এখনও লিখি আসে নাই, তবে দেখিয়ে কেন জোয়ান বলিয়াই মনে হয়। ইনির গুরুর অনুরূপ কেশধারী স্তরে কাপড়টা সন্ন্যাসের। বেদীর নীচে বাঁদিকে শীর্ণকায় গুরুপাদবাবু বেদীতে মাথা ঠেকাইয়া অর্ধশয়িত অবস্থায় আছেন, জ্ঞানের কি নিদ্রিত বুঝিতে পারা যায় না। পাশের ঘরে মহিলাদের প্রথম শ্রেণীতে একটি বয়স-আঠারোর মেয়ে মাথা পাড়িয়া উপর এলোচুল মেলিয়া বসিয়া আছে এবং মাঝে মাঝে গুরুপাদবাবুর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়াছে। সে বুলবুলী, গুরুপাদবাবুর কন্যা। ভক্তবৃন্দের অনেকে সটান লম্বা অবস্থায় উপুড় হইয়া বৃদ্ধকের সম্মুখে প্রসারিত করিয়া পড়িয়া আছেন। অনেকে সকলে হাতজোড় করিয়া পা ঢাকিয়া বসার বলবদ্ধুত পালনের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিয়া আছেন।

সভা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া ভক্তমণ্ডলীর ভিতর বসিয়া পড়িল। নিমাইল ছোট-মহারাজের কাছে অগ্রসর হইয়া প্রণাম করিয়া হাতজোড়ে দাঁড়াইয়া রহিল। বাবা তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বলিলেন—ভেলে ভেলা ভোগ হচ্ছে!

নিমাইল— আজ্ঞের নয় নিশ্চয়ই।

বিরিঞ্চি— নিমাইল! ও, এখন বুঝি তোমার ওই নাম! তোমা ভেলে দেখেছি তোমায়,—দেখাচ্ছিল! ঠিক মুর্শিদাবাদে। তোমার মনে থাকবার কথা নয়। জগৎ-শেঠের বুঝিয়ে, তার মায়ের জাতেরই ছিল। অনেক লোক ছিল—রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, রাজা রাজবল্লভ জগৎশেঠ-প্রমুখ, মায়ের পিপাসু সভায় খুব-কমলে মহাপুরুষ, মুতোমুটির আমিরচন্দ—হিস্টিরে মনে হয় ভালো উমিচাঁদ। তুমি শেঠজীর দাদাজী ছিলে, তোমার নাম ছিল—ভোম—ভোটিরাম। উঃ শেঠজী খুব খাইয়েছিল, কেবল মুতোমুটির মধুমেলার পাঁঠে ভজা ভর পাঁঠে, তারা পঞ্চাশজন মিলে ভজে যায়। বা ভেটিরাম, উঁহু—নিমাইচন্দ্র, তুমি দুর্ঘটি মন্ত্র জপ করতে শেখ, তাতে তোমার সুবিধে হবে। ভোজ ভোরে উঠেই একশ-আটবার জপবে — দুর্ঘটি — দুর্ঘটি — দুর্ঘটি, খুব আড়াআড়ি। আচ্ছা, এখন যাও দিয়ে।

নিমাইল খুনাহার পায়ের ধূলা লইল এবং অন্য ভাষিদের প্রণাম করিয়া ভক্তদের মধ্যে গিয়া বসিল।

নিমাইবাবু চুনি চুনি পদমার্থকে বলিলেন—ব্যাপার দেখলে! নিমাইটা আজকালকার ছেলের নজরে পড়ে গেল, আর আমি-বাটা কেউ কথা হাঁ করে বসে আছি। একেই বলে বরাত! এইবার একবার উঠে দিয়ে গা ঝাড়িয়ে বসুন, তা নয়ে জপতে।

যাঁহা ভূমিসাৎ হইয়া পড়িয়া ছিলেন তাঁহের মধ্যে একটি যুবকের বৃদ্ধ ছিলেন। তাঁর পরিধানে মিহি ফরিশডাঙা ধুতি, সিল্কের আদ্দির পাঞ্জাবি, তার উপর সিল্কের দিদা সতো সোনার হার দেখা যাইতেছে। ইনি বিখ্যাত মুখুয্যে গোবর্ধন প্রমিক, সম্প্রতি তৃতীয়পক্ষ করে আসিয়াছেন। গোবর্ধনবাবু মাথাটি আগে উঠিয়া করজোড়ে নিবেদন করিলেন—বাবা, প্রবৃত্তিমার্গ আর নিবৃত্তিমার্গ এর কোনটা ভালো?

বাবা ঈষৎ হাস্যমুখে বলিলেন—ঠিক ঐ কথা তুলসীদাস আমায় জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমরা আছার প্রথম করি। ভোজ করি? ক্ষুধা পায় বলে। কি আহার করি? আহারান্তে কলমুল হবে আসাদি। আহার করলে কি হয়? ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়। ক্ষুধা একটা প্রবৃত্তি, আহারে তার নিবৃত্তি। অতএব ভোজের মূল হচ্ছে প্রবৃত্তি, ভোজের ফল হচ্ছে নিবৃত্তি। তুলসী ছিল সন্ন্যাসী। আমি বলনুম—বাপু, ভোগ না হলে তোমার নিবৃত্তি হবে না। তার আমাদের ভোগ শেষ হলে তাকে ত্যাগ করেছি নিশ্চয়। অনেক বিবাহ-সম্পত্তি করেছিল, কিন্তু কিছুই হইল না। তার ফটো জগন্নাথে রাজলক্ষ্মীর মেয়ে যে কাজ সমস্ত উড়িয়ে দিলে। বন্ধির তার বাঁএ সে-কথা লেখেনি।

ব্যারিস্টার প.কে.সেন বলিলেন,—গুরুবাক্যমূল!

নিমাইবাবু আর থাকিতে পারিলেন না। ছুটিয়া গিয়া বাবার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ হইয়া বলিলেন,—বড়া কর প্রভু!

বাবা তা ভূমিষ্ঠ করিয়া বলিলেন—

কিছু চাই তোমার?

নিতাইবাবু ফতবদন বাহির করিয়া বলিলেন—নাহ্‌ কিছু নেই।

সহস্রাক্ষের একটা মহৎ দোষ—সে হাসি সামলাইতে পারে না। সে নিজে যেন লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইতে পারে, কিন্তু অন্যের মুখে অদ্ভুত কথা শুনিলে গাম্ভীর্যরক্ষা কঠিন হয়। হাসা অভ্যাসের জন্য সত্য একটি মুষ্টিযোগ আবিষ্কার করিয়া থাকে। ওষ্ঠাধরের সাহায্যে হাসির কারণ উপস্থিত হইলে সে কোনও অজুহাতে অবশ্যই তাহা আড়াল করে। তাহে মন সবসময় তাহে উপস্থিত হয় না।

বিরিঞ্চিবাবু বলিলেন—নাহ্‌ কিছু নেই? সেকি?

নিবারণ চুপি চুপি বলিল—ওষুধ-নাইন-বায়ান-সোহ, জ্ঞানবাটী। সে জিনিস? ট্রাই এগেন নিব?

সহস্রাক্ষ ধ্যান করিতে লাগিল—ফুলের নিম্নে ছয় শিরের উপর রাজা রাজত্ব করিতেছে। চোখলা চোখলা চামড়া উঠিয়া যাইতেছে। এ যে কি অসহ্য যন্ত্রণা!

নিতাইবাবু বলিলেন—পরশুই নিজের জন্যে আমার লড়াইয়ের আগে নিয়ে যান যাদু, সঙ্গের সোয়া কিলো—সোয়াই ওজন।

বিরিঞ্চি— তোমার কি ওষুধ হয়?

নিতাই— আজ্ঞে তলানির গ্রহণীর আশ্বিনে সোজার-বিপদ, কুত্তে যেরূপ টানা মারিলে, সঙ্গের চলে না।

বিরিঞ্চি— বড়েশ্বর্য সহ্য হয় না বাপু, কষ্টের সাধনা চাই। মূলাধারচক্রে ঠেলা দিয়ে কুলকুণ্ডলিনীকে আজ্ঞাচক্রে আনতে হবে, তার পর ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রার পদ্মে তুলতে হবে। সহস্রারই হচ্ছেন সূর্য। এই সূর্যকে পিছু হটাতে হবে। সূর্যবিজ্ঞান আয়ত্ত না হলে কালজ্বর কমা যায় না। আমার বিশ্বাস ওষুধ—তোমার কম্ম নয়। তুমি আমাকে কিছুদিন মার্তণ্ডমন্ত্র জপ কর। ঠিক দুপুর বেলা সূর্যের দিকে চেয়ে একশ-আটবার বলবে— মার্তণ্ড-মার্তণ্ড-মার্তণ্ড, খুব তাড়াতাড়ি। কিন্তু খবরদার, চোখের পাতা না পড়ে, জিভ জড়িয়ে না যায়—তা হলেই মরবে।

নিতাইবাবু বিষম ঘাবড়াইয়া গেলেন।

বিরিঞ্চিবাবু বলিলেন—এন-মৌলের সকলেরই চলে, কিন্তু উপযুক্ত পাত্রে পড়া চাই। এই নিয়েই তো বিপদ সঙ্গে আমার ঝগড়া। পিত্ত বলছে, ক্ষীর কখনও স্বর্ণাক্ষর পাত্র হবে না। আমি বলছি—তা কেন? অর্থেই সম্বন্ধবন্ধন হওয়েই হবে। আমি জোড়া বেলোয়ারি প্রদীপ খোয়াবো।

বিটির সেন সবিস্ময়ে বলিলেন—এক্সকিউজ মি স্যর, আপনি কি মিসেস ক্রাইসিসকে জানেন?

বিরিঞ্চি— হ্যাঁ হ্যাঁ পিত্ত তো মেথিলনের ছেলে।

বিটির সেন— মাই গড।

সভোর কানের ভিতর গঙ্গাযাত্রীর নাকের ভিতরে ওষুধ পোকা কুরিয়া কুরিয়া খাইতেছে।

বিটির সেন নিবারণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ইনি আ হলে মৌটিয়ার গভর্নমেন্টও জানেন?

নিবারণ— নিশ্চয়। মৌতত যুদ্ধ কেন্দ্র ছায়, প্রভু মন্ত্রি-পরিষদের সঙ্গে এক ডিনিসে পাঁচা খেয়েন। সপ্তাহ সঙ্গে এঁর আলাপ ছিল। ডগীসিং, টুকিনপ্রসেন, সেন-ফাং-বাজার, হাপুড়প্রসিং, নিওলিথিক মান, নিকোবরপ্রোপল ইত্যেইলস, আর মিসি: সিকে।

বিটির সেন চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলেন —বাই!

সারটা রাত সহস্রাক্ষ শিহরে জাগরণ করিয়াছে। সামনে ঠিনটি জাদুক খাদ্য তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

বিরিঞ্চিবাবা কহিলেন—এলাচের মহাপ্রসাদের পর বৈদ্যরাজ আমায় বলেন—নীল-লোহিত রক্তে কি? না, খেতরক্তে রক্ত তখন সবে শুরু হয়েছে। বৈদ্যরাজ বললেন—মানুষ তো সৃষ্টি করতুম, কিন্তু ঘাটিয়ার দাঁড়াবে কোথা, খাবে কি?—চারিদিকে জল থই থই করছে। আমি বললুম—তায় কি বিদু, আমি আছি, সূর্যবিজ্ঞান আমার মুঠোর মধ্যে। সূর্যকে ডেকে বলিয়ে, ঠোঁ জলে জল শুকিয়ে গেল, বসুন্ধরা ঝলমলে ভাবে উঠল। চন্দ্র-সূর্য চলাচলে তার আমলাটী ধরার ছিল।

বিটির সেন কেবল মূর্ছাযাবন করিলেন।

সন্ধ্যা ঘনিয়া গিয়াছে। পঞ্চাশ সেলের ব্যাটারিটি সেলের বলিলেন—রক্তচক্ষি—সিসীমা—

কিছুতেই কিছু হইল না। পুঞ্জীভূত হানি সহস্রাক্ষের চোখ নাক মুখ ফাটিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিল। সে তখন নিরুপায় হইয়া বিপুল চেষ্টায় হাহিকে কথায় পরিবর্তিত করিল-এবং দু-হাতে মুখ ঢাকিয়া ছোট ছোট করিয়া উঠিল।

বিভিক্ষিকাকা বলিলেন—কি হয়েছে, কি হয়েছে—আচ্ছা, ওকে আসতে দাও আমার কাছে।

সন্ধ্যা নিকটে গিয়া বলিল— উঠবার কত বাবা, মানবজন্মে যেন না হয়েছে। আমার ইচ্ছে করে সেই ছোট্ট খুকু হয়ে জন্ম দুনিয়ার আড়ালে ছোট্ট দাও বাবা! অর্থ চাই না, মান চাই না, জ্ঞানও চাই না। শুধু একটি কটি ঘর, শকুন্তলার নিজের হাতে ছোঁয়া। আর এক জোড়া শিং বিশ্ব প্রভু, পুষ্পস্তবীকে যাতে ঠুকিয়ে দিতে পারি।

নিস্তারণ মেয়েটির দেখিয়া বলল—ছেলেটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে বাবা। বিয়ার পোকা পেয়েছে বিনা।

অতিথি সন্ধ্যাটী বাড়িল। নৈমিক পদ্ধতি অনুসারে এই সময় বিভিক্ষিকাকা ঈশান তুরীয় অবস্থাপ্রাপ্ত হইলেন। তিনি চক্ষু বুজিয়া আই হইয়া বসিয়া রহিলেন, কেবল তাঁর ঠোঁট দুটি ঈষৎ নড়িতে লাগিল। মাতাবাবু, টেলানিয়ারাজ এবং দুইজন ভক্ত তাঁকে ধীরপদে ধরাধরি করিয়া শয়নকক্ষে লইয়া গেলেন। সভা আজকের মত ভঙ্গ হইল। ভক্তগণ একজন বিদায় হইতে লাগিলেন।

নিস্তারণবাবু বলিলেন—বিয়ের সঙ্গে খোঁজ নেই, তুলোপানা ছেলে। এ রকম ব্রহ্মচারী আমার পোষাবে না। জামাতা যদি থাকে ঘরে দু-চারটে নতুন দেখা না যাদু। তা নয়, সভাতুলে কি করেছিলেন জানই তো। চল পরমার্থ, সাতটা ছুটির ট্রেন এখনও পাওয়া যাবে। নিস্তারণ ঘরে সন্ধেটার খোঁজে তাঁকার নেই। তারা নিজের নিজের পথ দেখবে। দেখ পরমার্থ, আজ না হয় নিরম্বাইবার জন্যেই নিয়ে চল।

সন্ধ্যাভ্রত বৃদ্ধাকে খুঁজিয়া অধিক করিয়া বলিল,—দেখুন, একটু চা খাওয়াতে পারেন? নিস্তারণবাবু আসবে একটু। ওর মাথাটা বড্ড ধরে গেছে।

বৃদ্ধাকী বলিল — ছিছিছে না! — তা চেয়েছিলেন! জল চড়িয়ে দিচ্ছি, বসুন একটু। আচ্ছা, আমার বাবার সামনে কি কাণ্ডটা করলেন বলুন তো? কি ভাবলেন তিনি?

সন্ধ্যা মনে মনে বলিল, —তোমার বাবা তো দেবতা ছিলেন। প্রকাশ্যে বলিল — একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি নয়? আমি অন্যায় হয়ে গেছে, আর কখনও অমন হবে না। আপনার বাবার কাছে মাপ চেয়ে তাঁকে খুশি করে তবে বাড়ি ফিরব।

বৃদ্ধাকী — বাবার আমার খুশি-অখুশি। প্রেতে আছেন এই পর্যন্ত, কে কি অন্যায় বলছে তা জানতেও পারছেন না।

সন্ধ্যা— আবার না, এমন দিন থাকবে না। আপনি দেখে নেবেন। ওই যে, নিস্তারণ-দা আসছেন।

রাত ন-টা। হোম আরম্ভ হইয়াছে। রাত্রের যজ্ঞ শুরুই বিলম্ব হইয়াছে। হোমঘরে আছেন কেবল বিভিক্ষিকাকা, শুকশারবাবু, বৃদ্ধাকী, মাতাবাবু, নিস্তারণ, সন্ধ্যাভ্রত এবং গোবর্ধনবাবু। ইনি একজন বিশিষ্ট ভক্ত, অবশ্য কলা হোমের আরম্ভ নির্বাণ করিয়া বিদায় প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। হোমঘরটি ছোট, দরজা-জানালার ঝাঁপ সবগুলি বন্ধ, প্রবেশের পথ মাতাবাবু আগলাইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ছোট-মহারাজ প্রথাই, কেবলমাত্র সাধুর নিম আহার্য প্রস্তুত করিবার জন্য অন্যত্র আছেন। ঘরে একটি মাত্র ঘৃতপ্রদীপ মিটমিট করিতেছে। বিভিক্ষিকাকা যোগাসনে বসিয়া, সম্মুখে হোমকুণ্ড। শিষ্যদের শুকশারবাবু ও তাঁর জন্য উপবিষ্ট। তাঁহাদের এক পাশে নিস্তারণ ও সন্ধ্যাভ্রত, অন্য পাশে গোবর্ধনবাবু বসিয়া আছেন।

অনেকক্ষণ ধ্যানস্থ থাকিয়া বিভিক্ষিকাকা চোখ হইতে জল মাটিয়া চতুর্দিকে ছড়াইয়া দিলেন। ঘৃতপ্রদীপ নিবিয়া গেল। হোমটির শিখা নাই, কেবল কাঠের রক্ত অঙ্গার অবশিষ্ট হইয়া আছে। বিভিক্ষিকাকা তখন ধূপের টিনের হাত জাঁপাইয়া তীব্রে আলবাল আরম্ভ করিলেন। সেই গন্ধীর গু-গু-গু-গু নিনাদে ক্ষুদ্র গৃহ কম্পিত হইতে লাগিল।

সন্ধ্যাভ্রত বৃদ্ধাকীর কানে কানে বলিল—বৃদ্ধ, ওরা করছে? বৃদ্ধাকী বলিল—না।

সহসা হোমকুণ্ড হইতে নীলাভ অগ্নিশিখা নির্গত হইল। সেই ক্ষীণ আলোয় সকলে দেখিলেন—অন্ধকারই তো বটে!—হোমকুণ্ডের পশ্চাতে বস্ত্রাবৃতদেহধারী ছায়ামূর্তি বিদ্যুৎবিহ্ন নিমেষে-তরঙ্গপাণি একলাফে দণ্ডায়মান হইয়াছে।

শুকশারবাবু নির্বাক নিশ্চল। গোবর্ধন মল্লিক তাঁর আসনের এবং দুর্গাচরণের সম্প্রসারণ অভাব-অভিযোগ অনেক বার দেখাশিলেনকে নিবেদন করিতে লাগিলেন। গলেশ-মালা শিবত্রোম্ব আবৃত্তি করিতে লাগিলেন—যেটি তাঁর ছোট মেয়ে মহাকালী পাঠশালায় শিখিয়াছে।

নিস্তারণ সন্ধ্যাভ্রতকে চুপি চুপি বলিল—

এইবার'। সত্যব্রত উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল —বন্ধু লক্ষ্য মহাদেব!

একটু পরে হরিৎ সাহিত্যে একটা আন্দোলন উঠিল। তারপর ত্রিশঙ্কুর ব্যাপার কে বলিল—আর লাভ নাই।

বিরিঞ্চিবাবার পায়ধারা থামিল। তিনি চক্ষু মুদিয়া ইতস্তত চাহিতে লাগিলেন। মাধবাবু ঘাড় নাড়িয়া বসিয়াই রহিলেন।

খাওন—খাওন—বেরিয়ে আসুন নিমুদিয়ে— বলে বৌমা কুশলী পাকাইয়া ঘরে ঢুকিতে লাগিল। বিরিঞ্চিবাবা এক লাফে মুখুয্যেদের বাড়িতে। গোবর্ধনবাবু ঠিকানা করিতে করিতে তাহার পদানুসরণ করিলেন, বুঁচকী পিছনে হাত ধরিয়া বলিল—বাবা যাবা, ওই! নিমাইদা কহিল—যাবেন না, একটু বসুন, কোনও ভয় নেই।

মহাদেবের চিত্ত নড়িল। তিনি উঠিবার উপক্রম করিতে লাগিলেন। নিমাইদা একটা বাহি ঝুলিল। মহাদেব শিষ্যের পরাক্ষা নিয়া পদাসনের উপক্রম করিলেন—তখনি সত্যব্রত জাপটাইয়া ধরিল।

মহাদেব বলিলেন—আরে—আরে—ছাড়ু— ছাড়ু— লাগে, আমিরি এক ইয়ারকি ভাল লাগে না— চলিয়ে আসুন—ছেড়ে দাও বলছি।

সত্যব্রত বলিল—পায়ের ধুলো নেবে কেন। একটু আলাপ পরিচয় হোক। আচ্ছা করতলরাম, কতদিন থেকে ভেলকিবাজি করা হচ্ছে?

বাহির হইতে দু-একজন লোক হোহো করে হাসিল। কেহ কাহার কিম্বায় কেলেঙ্কারিকে দিয়া নিরঞ্জন ও সত্যব্রতর দিকায় বিদ্যুৎ গুরুপদবাবু ও তাঁর কন্যাকে বাহিরে আনিল।

বাড়িতে আজন লাগে নাই। পাশের ঘরে খানিকটা ছিন্না খড় যে জ্বালাইয়া দিয়াছিল। দরোজায়, জৌলুসী সাহেব, কেরোসিন এবং অন্যান্য, হাসেরা প্রভৃতি সত্যব্রতের অনুচরবৃন্দ মিথ্যা হল্লা করিয়াছে।

বিরিঞ্চিবাবা ভাবেন কিন্তু মহাদেব না। বলিলেন—কেমন গুরুপদ, এখন আপনি মিটল তো? যে নাস্তিক, আর বিশ্বাসঘাতী হয়ে গেল। তাই তোমার কন্যাকে ফেরত দেওয়া ঠিক হবে না। পেত্নীটার অনুরোধে বুদ্ধি ঘরে বিক্রম করলেন।

সত্যব্রত বলিল —বিক্রম বলে বিক্রম! মহাদেবের পথে নিয়ে কেরল ক্যারামা বিরিঞ্চিবাবা হয়ে গেলেন জোচ্চোর।

গোবর্ধনবাবু বলিলেন,—ছাড়ো আমাদের সঙ্গে চালাকি! গোবর্ধন ত্রিশক পাঁচটা চৌদ্দের মুক্তুখুনী, বড় বড় ইয়েদের চরিতে খায়,—তাকে তুমি ঠকাবে! মারো শালেকো দুই থাপড়া।

গুরুপদবাবু এতক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। বলিলেন—না না, যেতে দাও, যেতে দাও। সত্য, গাড়িটা ঘুরিয়ে এঁদের পৌঁছনোর ব্যবস্থা কর। কেউ যেন কিছু না বলে।

গুরুপদবাবু এতক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। বলিলেন—না না, যেতে দাও, যেতে দাও। সত্য, গাড়িটা ঘুরিয়ে এঁদের পৌঁছনোর ব্যবস্থা কর। কেউ যেন কিছু না বলে।

গুরুপদবাবু এতক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। বলিলেন—না না, যেতে দাও, যেতে দাও। সত্য, গাড়িটা ঘুরিয়ে এঁদের পৌঁছনোর ব্যবস্থা কর। কেউ যেন কিছু না বলে।

ছিড় ভলিলে গুরুপদবাবু বলিলেন—বাবা নিমাইদা, বাবা সত্য তোমার আমাদের রক্ষা করেছ, এ উপকার আমি ভুলব না। আজ তোমরা এখানেই খাওয়া-দাওয়া করে যেও, অনেক রাত হয়েছে। একি সত্য, তোমার হাতে রক্ত কেন?

সত্য— ও কিছু নয়, বাড়ুয্যেদের মধ্যে মহাদেব একটু আঘাত দিয়েছিলেন। আপনি ব্যস্ত হবেন না, বিশ্রাম করুন গিয়ে।

গুরুপদ— তবে তুমি আমার সঙ্গে এস, বুঁচকী টিংচার আয়োডিন দিয়ে বেঁধে দেবে এখন।

আড়ালে সত্য বলিল—ওঃ কি দুর্ঘটনাই পড়া গেছে।

নিমাইদা বলিল—আরেক কি হল রে!

সত্য— নিমাইদা-না।

নিমাইদা— বল্ না কি।

সত্য— নিমাইদা-না।

নিমাইদা— বলেই ফেলে না কি।

সত্য— আমি বুঁচকীকে বে করব।

নিমাইদা— তা তো বুঝতেই পারছি, কিন্তু তোর সঙ্গে বিয়ে বসি না দেয়?

সত্য— আলবৎ দেবে, বুঁচকীর বাপ দেবে।

নিমাইদা— বাপ না হয় রাজী হল, কিন্তু মেয়ে কি বলে?

সত্য— বড় গোলমেলে জবাব দিচ্ছে।

নিমাইদা— কি বলে বুঁচকী?

সত্য— বললে—যাঃ।

নিমাইদা— খুব খাসা, যাঃ মানেই হ্যাঁ।

গল্পগুচ্ছ

ঢোল গোবিন্দ-র অসম্পূর্ণ উলট-পুরাণ

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

কী ব্যাপার! এখনো ইতিহাসের বইয়ের ব্যাপ্ত। ওগুলোই পড়বে। ছেলেবেলার নাটাইটাই ঘুড়িগুলোও তার ওপর যেন ঘুরিয়েও ঘুরোয় না।

বাঁড়ি টোনে ফেলে রেখেছিলাম। ফিরতে ন'টা দেখি, সে বাঁড়ি বুঝে নিয়ে আমার পরে সব একদম ঘরে গেছে।

খাদে হাত দিয়ে ভাবি, ঘটে এরও ছিল!

কে বলল?

'ঘুড়ো বয়েসে হাজোটা কী!'

বিষম খেয়ে এদিক-ওদিক তাকাই। চেনা গলা। অথচ ধারে-কাছাকাছি কেউ নেই। কে বলল?

ও, বুঝেছি। নিশ্চয় ঢোল-গোবিন্দ।

একটা গায়েবি টুপি প'রে নেই-আঁকড়া হয়ে সারাক্ষণ ও আমার পেছনে লেগে রয়েছে।

মনে মনে আমি হাই বলি, ও-ব্যাটা তাড়ি খেয়ে খোনে। আর আলটপকা ফোড়ন কাটে। ওরে ঘাড়পিরি ছলে যায় আমার।

আমি বুড়োবয়েসী হলে, তুমিও যে আর বাটি খোকাটি থাকো না — সে কথা আছে তোমার?

বলি বটে। কিন্তু পরাক্ষণেই হাত পড়ে যায়।

বাটি, মানে: বছরের খোকা। আহা!

জ্ঞান হওয়া অবধি, সেই কবে থেকে, ছড়া হয়ে ও আমার সঙ্গে। জানতে চেয়ে, ও আমার আছের বাঁড়ি। সব সময়ে ওর নজর, যাতে আমি গাদ্দারি না পড়ি। নইলে কবে—

আমি চুপ করে যাই। কিছু বলি না।

একটু মায়াও হয়। মেয়ে মোরে ওরও তো বেলা কম হল না। তবে আছে কবে নেই। এখন আর ওর আছে কী নিয়ে কী লাভে!

তবে এও ঠিক, ইদানিং ওর খিটখিটে ভাবটা পেয়ারে বেড়ে গেছে। বন্ধু কিটিয়ে কিটিয়ে কথা শোনায়। ওরকে সব সময় আছে একটা ক-রে দীর্ঘ-ঈ'র ভাব। আমি ভেবে একটা —

ক'দিন আগে

ক'দিন আগে ভেবে একটা মজা হয়েছিল।

আমার সাদা চুলের জঙ্গলে চিরুনি চালাতে ক'রে আমার ছোট নাতনিটি একটা কালো চুল পেয়ে —'দাদুর মাথায় কালো চুল' ব'লে নাচতে শুরু করে দিয়েছিল। অবিকল রিথি ঘুনির গোবিন্দ-র মতো।

তবে কিছু বলার না ক'রে আমি দুধ দিয়ে হাসছিলাম। কেননা ঐ একটি কালোচুলটি যে কার, আমি তা বিলক্ষণ জানতাম। আসলে ও-চুলটা ছিল ঢোলগোবিন্দ-র।

যারে দেখা যায় না, ঢোলগোবিন্দ তা টিপে টিপে এসে পেছন থেকে হঠাৎ আমার চোখে হাতচাপা দিয়ে বলে 'ওঃ, ছেলেবেলায় তুমি কী দুষ্টোমিই না ছিলে। সেই চড়েও তা ছাড়তে না। আর এই তুমি এখন? একেবারে ভালোর গুষ্টি। অথচ মনে কষ্ট এখন কেবল ওখানে পাঁই পেতেছিলো।'

কিন্তু দেখ আবাগী। নতুন চালে এখন আর তোমার নজর আমার গায়েল নেই। খুবলে ঢাল আরো বেড়ে। এটা ধ'রে নিয়ে ওরে ব'সে এখন কেবলে জমার ভাটা। ওকার বলে : 'বুড়োর নেই কাজ, ডাকে আর বসে।' বুড়ির নেই কাজ, ফেলে আর কাচে।' তোমার হয়েছে তাই।

জমার ঘরে শূন্য। তাই শূন্য জমাটির আওয়াজও বেশি হয়।

তবলে যার তা তো না বাপু। এ কে বলে না? 'বুড়ো বয়সে পড়েছে ধরে। কাঁচা হলুদ পাকে ঘরে।' তোমার হয়েছে তাই।

এমনি ক'রে সারাক্ষণ ও আমাকে খোঁচায়। আর কথায় কথায় ফ্রেন্ড্ দেয়।

অথচ ঢোলগোবিন্দ যে আমাকে ফ্রেন্ড্ দেবে, এ আর বেশি কথা কী। আজীবন ও তো রয়েইছে আমার ফ্রেন্ড দিয়ে।

বুকের ফ্রেন্ড আমি চোখ বুঁজলে।

যাচ্ছেতাই ভাবে কেবলই হাই তোলে।

এখন থাকে থাকুক। কিন্তু ছেলে যাবে কোথা, শুনি? থাকবে নন্দুদের আড়তদারে। নইলে আমারই একদিন কি তোমারই একদিন।

হয়তো হবেও। বিশ্বাসিনী ঘাঁসে ঠক ঠক করি এবার উল্টো-পুরাণ।

সে এক সময় ছিল

সে এক সময় ছিল।

কলকাতায় বাবুরা তখন 'যাই, গাড়ে একটু পাঁড়েদের হাওয়া লাগিয়ে আসি' বলে এক হাতে বৌয়ারটি বাগিয়ে ধ'রে, বর্ষাকালে ওয়াটারপ্রুফে গিয়ে কপ্ ক'রে উঠে পড়তেন বেহালার ঝাঁকা ট্রামের ফার্স্ট ক্লাসে জানালার ঠিক পাশের সিটে। নাকতলাটি নেই। ধনক্ষেতে কুঁড়েঘর ডোবাপুকুর — সাঁতিয়ে সব দেখে টেখে ফিরলে হয়তো সেই একই ট্রামে বর্ষাকালে ফিরে আসা। আহা, সে এক দিন ছিল বটে।

বৌবাজারের পেছিয়ে এসপ্ল্যানেডের আগেই সেন্ট্রাল এভিনিউয়ের দু'পাশে তখনও এস্তার খালি জমি। কর্পোরেশনের সামনের গলিতে ছিল টামে ঘিয়েটার। কাল, তার পরই, সমুখ রাস্তার দু'পাশে ক'সে বেত নিত্যদিনের মেলা। হেরিক বাদি। ঝড়ি-পাতা ফলওয়ার। আর্থরাইটিস আর দু দু আলা। পাখিপাখালি। আলাদিন খেলা। দাঁত তোলা। কান খুস্কলি। অবসর আলো। ঘুড়ির মেলা। আলু পরীক্ষা। মোড়া বুদ্ধু। মজল কুপ। পীত পড়লেই সার্কাস। আর আর্টিস্ট্রাল। সন্ধে হলেই সপাসপ জ্বলে উঠত ফেলমেটিনের ডোম পাঁয়রাবে আলো। সেই সঙ্গে শহরটাকাদের গোরস্থানে।

হাড় পাটি পাঁড়ে ছিড়ের মধ্যে ডিঙি মেরে মেরে আমরা হাজুলে পাঁড়ে দেখার চেষ্টা করতাম। কেবল মুড়ি ওড়ানোর মতন্টুকু বাদ দেবে।

হিন্দিদের অর্ধশতাব্দীর ঢেউ এসেছিল ঘাটে এসে লাগে একটু মেরিয়ে। সারকারি ডাকবিয়ে পাথার মাইলে আসি গেল। ছুটে গেল মোজাফরপুরে পাটি আড়তে চাকরি।

এরপর বাসা বদলে, স্কুল বদলে, ছমাংশলবন্ধু মেয়েদের দেখার বাড়িতে চলল ক'রে অক্ষিল অলকাতাতে এসে বেড়ানো ঘরে মেয়েদের মাসা গোঁজা।

আসা গলি ছেড়ে

আ-কে ছেড়ে থাকতে কষ্ট হয়নি।

হয়নি আবার!

কষ্ট হয়েছিল আসা-অলকাতা ছেড়ে আসতেও।

এখন কোনো গলি ফিকা নয়, আর নামবন্ধ আবার অন্ধকার। নাম বললেই আমি জানিয়ে দিতে পারতাম কোনটা কোথায়। গন্ধ দিয়ে গলি চেনার আশ্চর্যটা অবশ্য কাউকে বোঝানো সম্ভব নয়। এটা কেবল আমিই জানতাম। বাড়ি পুরনো হয়ে গেলে তার গা দিয়ে একটা গাঁতসেঁতে গন্ধ বেরোয়। কোনো কোনো গলিতে চুনসুরকির গন্ধে মেশে থাকত পাঁচফোড়নের গন্ধ। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে কেন, আমি তা বুঝিয়ে বলতে পারব না। কিন্তু থাকত। আর থাকত বুকের মধ্যে ছাঁৎ-ক'রে ওঠা ভাল লাগানোর একটা শব্দ।

মনে হল, ফোনেলিপি ঈশপুর জানাই। ও কিছু জানবে। ওর যা কথা মেশেই আমি বুকে নিয়েছি ও কী বলতে চায়। ও-চলে কেবলি টানিয়ে নিয়ে যেতে। ও তো দেখার নয়। আমি বোঝে না যে, পাঁচফোড়ন কাকে বলার একটা লাভ আছে। আমি যদি ইনিয়ে বিনিয়ে সেই একই কথা বলি, পাঁচফোড়ন ঘরে গেলে সে কথার মান নিয়ে। আমাকে নিয়ে খেতে হবে। এও এক রকমের মেজমেলামি। ঘরিঘরার বাবুটী। পাঁচের মুখ ফিরিয়ে নিলে আমার এই দিন-আনি-দিন-খাই অবস্থাটাও আর থাকবে না। ফোনেলিপি এসব বুঝবে কেমন ক'রে? ওকে তো আর পাঁচফোড়ন খেয়ে আসেনা চালাতে হয় না। ও তো কেবল ব'সেই খাবার।

'খুড়া, তোমরা?' 'আজ্ঞা, ভাতপাঁচ।' এই ক'রে আর সমানে পেছন থেকে আমাকে টেনেছে, আমার কানে আসা, মন-পাগলা কাকের কিছু আর আসে না। পাঁচফ চলাবে লেখকের অভিধানে। পাগল নাকি? পাঁচফোড়ন মানে লেখকের 'আজ নগদ কাল ধার'— এই একটা মধুর সম্পর্ক। ফোনেলিপিটা কী! ওর মেলি আবার এটিও নেই না?

কলকাতার কোল-ঝাড়া

কলকাতা কোলিপুত্র। এক রকম অকছাড়াই তো। লোক নেই, জল নেই। এতে কি বাড়া যায়? পানওয়ালা নেই। ফুলুরি-বেগুনির দোকান নেই। ট্রামে উঠলে তো আর সেই আশীর্বাদটির ভিখেরি? বা একটু মজা, সব এই হাজরায় মোড়ে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ, মোড়ের আধার ছাদার পেঁয়াজে ভন্ডাই গলিয়ে লুচি ভেজে দেখাচ্ছে ভালভা-র সেকেন্দা। ট্রামের

কাগজের আলা দেখে 'আমি দুটি ঈদুরের আলা হইতেও খাইবেন না।' সে-গল্পটাকেও এখন আবার খোলাচ্ছি। বুঝ। বুঝ। এখনকার মানুষগুলোই বা কী! ছিছি। একটা ইতিহাস নেই, পেশিশক্তি নেই। ভোঁ-ধরা আর বুদ্ধোজ্ঞে ধ'রে টিকবার নেই। সবচেয়ে বড় কথা, এখানে শহরের মতন কোনো ঝোড়ঝাপ নেই।

ফেলে-আসা সেই গলিগঞ্জের আলো আমার মন কেমন করে। আর ঝোড় টিকে-টাকুনির একঘেয়ে কাঁদা কাঁদা খাঁচ খাঁচ আর হলুদগোলা জলে বেশ মুসুরির ডাল খেয়ে পেটে চড়া পড়ে যায়। চিঠিতে এসব কথা অ-কে খুলাকরেও লিখি না। বরার কিন্তু এসব আপাতত কোনো ভাব উদ্রাব নেই। মেয়েরা যে এখনভার ছাত্রায় তুড়ি মেরে ঘুরে বেড়ায়, এতেই যেন আহ্লাদে আটখানা হয়।

বাবা অতকণই বা আবার থাকে। সবরাসে বুটো নাকে ঘুষে খাঁজেই সে-ছুট। ঠাকুরদো তো নেই। এদিকে চাকরির খাতিরে মেজোকাকাকে পুজোদেই কলকাতায় ফিরতে হয়। মেজোকাকা পাইয়েদের বাড়িতে বাড়িয়ে চক্কর দিয়ে বেরায়। কাজেই বাড়ির পার্মেন্ট থেকে বসে ছোট্ট ভাজা।

বাইরে যোরাবার সময় ছোটকাকাকে ব'লে যাই, কলকাতায় আছি। হাঁ, কলকাতাই তো। এটা পা-নাম। তারপর কালীঘাট। তারপর ডাকবাংলো। কড়পুকুর। চড়কডাঙা। শাঁখারিপাড়া। কর্পোরেশন আপিস যাই মাঝখান। তবে তো খাস কলকাতা। সেখানে পকালে ট্রামরাস্তার জল ক'রে জল আসার মতন হাজরা আর খেয়ালদা দিয়ে ঘর ঘর ক'রে লোক এসে শহরটাকে ভালয় আলায় ভাতি ক'রে রিপোর্ট আবার ঘন্ ক'রে রিলিজে যায়।

তারপর আমরা যেমন বড় হলাম, আমাদের সঙ্গে তাল দিয়ে কলকাতারও বড় হল। ট্রাম থেকে টালিগঞ্জ। সবটাই কলকাতার পায়ায় এসে গেল। উত্তরে দমদম-বারাসত-বেলঘরিয়া। দক্ষিণে যাদবপুর-গড়িয়া-বেহালা তখনও কলকাতার মধ্যেই নয়। পুবে সিঁথিকলা টালার ট্যাংক বিলকুল বাজে। আর, তখনও ভোঁ কলকাতোর ঘন্টা বেজে ঢেকে যাওয়ার যায়।

এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা

হাওড়াকে কলকাতেই আমরা পৃথক ভাবে দেখেছি বরা নিয়ে। আমাদের বন্দ বয়সে ছিল খোলা আর বন্ধ হওয়া লৌকো-জোড়া-দেওয়া ভাসা পুল। কখন খোলা কখন বন্ধ। তার খবর রাখতে ছোকরার কালাজে।

সেই পুল পেরিয়ে ছোক মানে ছেলেবেলার পকাতে আসত জাঁটিয়ার অনাথ আশ্রম থেকে রঞ্জনীদা। তারপর একবেলা আমাদের বাড়িতে খেয়ে কলেজে যেত। রঞ্জনীদা একদিন বলেছিল কী না কী উপন্যাস লিখছে। সেই প্রথম একজনকে চর্যক্ষে দেখেছিলাম যে লেখে। রঞ্জনীদা কি লেখক হতে পেরেছিল? আজও খুব জানতে ইচ্ছে করে।

ছেলেমানুষীর গণ্ডিতে আমাদের কলকাতা ছাড়া হাওড়ার রাস্তাঘাট আমরা বড় একটা মাড়াই না। মেটিয়াবুরুজ, মেটিয়াবিরালয়, আলিপুর জাদুঘর, খেলার মাঠ, সিমলাস্টাট, জাদুঘরঘাট, বড় বড় সদাগর — সব আমরা এপারে ডাঙায় নিয়ে ব'সে আছি। ওদের আগে ফেলে দিয়েছি, তবু কোম্পানির জমানা আর শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। তার কারণ কি এই যে স্বাধীনতার আগে পারে যারা গেছেলেরা নিয়ে এ শহরে ঢুকেছে, তারাই ধরাধর এ রাজ্যের অধিবাসিন্দা?

আমি মনে মনে বলি — দেখে যা, দেখে যা, নরাস নারায়! কিন্তু আমার মনের কথা মনেই থেকে যায়।

বলতে বাকিছিলাম আমার মতন গৌরবর্ণ রোগিণীকে ফেলে মাতালাদাস বুলিয়ে গুপ করেছিল সেদিনের সেই একরত্তি শহর যা আজ আকাশছোঁয়া ফেলে নিয়ে আশপাশের সবাইকে ফেলে নিয়ে একডাকে বেঁচেছে। তার যে নামই হোক, তাদের এখন ডাক এক — কলকাতা।

হঠাৎ গোলগোবিন্দর হাতেলাটা দেখে থামতে হল। ঈশারায় আমাকে বলছে ঘাই-বসতো চলতে। বুঝছি না, ও কি বলতে এগিয়ে যেতে? না আরও পিছোতে।

গোলগোবিন্দ যাই বলুক, আমি তখনও এগিয়ে তখনও পিছিয়ে নিজের ইচ্ছেমতো চলব। আমি ওকে আমার ওপর জোর খাটাতে কিছুতেই দেব না। তাছাড়া সম্পর্কে আমি ওর বড়। আমার জন্ম হওয়ার পর ও জন্মেছে। আমি ওর ঢের আগে জন্মেছি।

মায়ের খাঁখী

একটা বরাপাতে পাঠকদের কাছ থেকে আমি একটু আলাদা হাপ চেয়ে নিচ্ছি।

পেছনে পড়ে সারা জীবন এত জায়গায় এত কিছু লিখতে হয়েছে যে, কোথায় আগে কী বলেছি, লেখার সময় সেসব খুঁটি মনেও থাকে না। তার চেয়ে এই রোলসোয়িস-এর কেচ্ছা লিখতে গিয়ে। রোলসোয়িসকে নিয়ে লেখা আগের দুটো বই হাতে না থাকায় একটা কথা খুব্বার বলার ফলে আরও বেড়েছে।

ঐ যে, রোলসোয়িস কার থেকে কোড়ন কাটছি— 'খুব্বা কেন তিনবারও হতে পারে।'

তা যদি হয়, রোলসোয়িস আমাকে দশবারের সময়কে ঘিরে পারত। সেটা সম্ভব নয়। জেনেও তো আমরাই ধরে নেওয়াই। এ নিয়েও যে আমরাই ফতন ভুলো। আমরা যে একই কায়দের বাঁদর।

কাজেই বলব এক্সপেরটাও আমাদের করে নিন। জেনেও তো বেশি নেই।

আমাদের বাড়িতে 'আপনি' 'আজ্ঞে' কথার পাট ছিল না। আমার বড় ভাই আর ঠাকুরদা দুজনকেই বলতাম 'দাদা'। আর ছোট জনকে, এক আকে বাঁ কাঁহে দুজনকে আলাদা করতে করতাম। এই অসাধ্য সাধনটা ঘটার পেছ পলার পর কারণে।

বাড়িতে ঠাকুরদার ছিল দুটো নাম ফটোগ্রাফ। একটা তোলা হয়েছিল আমরা জন্মানোর ঢের আগে। বছরপুর ডাকাতি, ঠাকুরদা ছিলেন ডুয়ার্সাঞ্চল কোর্টের একজন সেরেস্তাদার। আর্দালরা চেয়ারে ব'সে, ঠাকুরদারা সব পেছনে দাঁড়িয়ে। মাঝে দাঁড়িয়ে, আসামি প্রত্যেকের মুখে চাপদাড়ি আর পরে কালো আলখাল্লা। সবাই যেন একইটে তারা।

দ্বিতীয় ছবিটা তোলা হয়েছিল মৃত্যুর আগে। পৌরকবাড়ি কলকাতা। চেয়ারে ছড়িলাঠি হাতে। পাশে মা। হাড়হিমকরিতে চেয়ারে। মাথার বরফ তখন কারাবার। এখন আমি যা, তার চেয়ে কম বছরের ছোট। দেখে মনে হয়, কী নিশ্চিন্দিরকমের বুড়ো।

হাতে লাঠি ধরবার জন্যেই বোধহয় আমার চেয়ে আমার বাবার কাছেই ঠাকুরদা ছিল বেশি টান। কিন্তু বাবার বেরোনোর সময় অফিসেই ছিলাম বাঁর আজও নাড়ি।

পূর্বপুরুষদের ৪

ঠাকুরদার কাছেই শুনেছিলাম দর্শনির-র লোকনাথপুরে যে বসতবাড়ি, সেটা আমাদের আসল ভিটে নয়। ওটা নাকি ঠাকুরমা পেয়েছিলেন তাঁর বাপের বাড়ির সূত্রে।

আমাদের আসল দেশ ছিল নাকি ঘাঘরার ধেলার সুদিক্ষের। কিন্তু ঠাকুরদার পিতৃপরিবারের কাউকেই কোনোদিন আমরা চর্মচক্ষে দেখিনি। ঘণ্টোরের কোনো লোকই কখনও আমাদের সুদিক্ষের হদিশ দিতে পারেনি।

শিকড়ের টান থেকে ভিলা জানি না। তবে সুদিক্ষে নামটা ছেলেবেলা থেকেই কখনও আমাকে ছাড়া ক'রে দিয়েছে।

একশর ছো দেশ ছাড় হয়ে আমাদের সৈতৃক বসতবাড়িটার হাতবদল হয়ে গেছে। সুদিক্ষের কথা তবু মন থেকে যায় নি। সেই সঙ্গে জেলার ইতিহাস, টুকরো ক'রে একবার দর্শনার দিয়ে লোকনাথপুরের পুরনো আয়গাটা একটু দেখে আসার।

ব্যাপারটা অবশ্য খুব বেশিদিন আগে নয়।

মাঝে বার কয়েক ডাকবিভাগের সিনেমায়। এ-ডিটি, সে-ডিটি, ডি-পদক্ষেপ। কর্তব্যের শিকে বদলপুর টেলিগ্রাফ টিকে ডাকিয়ে দু-একটা দীর্ঘশ্বাসও ফেলেছি। কাজেই তো যেতেই। আর তারপরই তো দর্শনা।

কি জন্য যেনো একটা সময়ে মেটেরিতে জমজমাট মেলা বসত। আর ঠিক আগে সাজো-সাজো রব পড়ে যেত। লোকনাথপুর গ্রামে। সারা রাত ধরে আমার শলায় সে কী ঠকাস্-ঠক্ ঠকাস্-ঠক্ হাতুড়ি পেটার শব্দ। ফাঁক পেলেই আমি আর দাদা সেখানে চলে গিয়ে হয় তাঁদের টানবাম, নয় জয়ঢাকে হাতুড়ি পেটাতাম। তৈরি হত কারুর কুড়ুল আর কারুরটার কাস্তে। কুমোর পাড়ার ভাঁই-করা হাঁড়ি কুড়ির মধ্যে পা ফেলবার জায়গা থাকত না। ছুতোর পাড়িয়ে তৈরি হত পাকুর পাড়ির-বড় বড় চাকা। কাঠের বারকোশ, সিঁড়ি। জেলার কষ্টের ধরের কানো কেউ তখন নিজের মেলার সময় পেত না।

পেছে ফেলানো আশপাশ

পেছনের এই আকর্ষণেই বোধ হিলে গিয়েছিলি আয়পাশের। কিন্তু পেছনকে হয়নি। জীবনে সে আশপাশের আমার কোনোদিন আসে না।

কলেজের সময় পেছনে ঢুঁ মেরে আমি গাড়িতে উঠতে যাচ্ছি। দিবস কলকাতায়। অনেকটা রাস্তা। এদিকে সন্ধে হয়ে আসছে।

হঠাৎ এক ছোকরা ছুটতে ছুটতে এসে

বলল, 'বাবা আপনাকে একবার দেখতে চায়।' সে যখন এসে দাঁড়াল তখন তার মুখ অন্ধকার। চিনতে পারলাম না। তারপর বলল, 'লোকনাথপুরে আপনার যাকে বলেছেন ক্ষ্যাপাদা'।

ক্ষ্যাপাদা! ছেলেবেলার তার স্কুল ছিল আমাদের গ্রামের মসজিদটায়। সেই ক্ষ্যাপাদা! বেশ ভয় হওয়ায় পর জনে জনে জিজ্ঞেস ক'রেও তার হদিস জানতে পারিনি, সেই ক্ষ্যাপাদা যে তার ছেলেকে এখন ব্যারিস্টারই বলিনি, সে কথা মুখাক্ষরেও তখনও জানতে পারিনি। তাড়াতাড়ি সাইকেল নিয়ে বার হয়ে পড়লাম। তারপর আর এক মুহূর্ত দেরি করার সময় নেই। তাই নিশ্চিন্তিই আমার এসে দেখা করার ছ'টা চলে যাওয়া ছাড়া আমার তখন কীই বা করবার আছে!

পরে শুনেছিলাম ক্ষ্যাপাদার ঐ ছেলে নাকি পাগল হয়ে এতদিন অজ্ঞাতবাসে ছিল। এখন গ্রামে ফিরেছে। ও যে এরপর থেকে আমাকে ভয়ন্ন চোখে দেখবে, সেটা ভেবে নিজেকে ভারি অপরাধী মনে হচ্ছিল।

আমি জানতাম, ক্ষ্যাপাদার সঙ্গে দেখা হওয়ার এ সুযোগ আমার জীবনে আর ফিরে আসবে না।

সেই ক্ষ্যাপাদা বড়বাজারে দোকানে নিয়ে পরার যে পাথর কেনাতে ঠেকে আর ঠোকা ভর্তি ক'রে পান এনে যে আমাদের মন জয় করে নিত। সেই ক্ষ্যাপাদা, যার আঙুলের ছোঁয়ায় একদল মাটি হয়ে উঠত জীবন্ত পুতুল। সেই ক্ষ্যাপাদা, যাঁদের আমরা লাইন বুলিয়ে আমাদের সায়েন্সের উঠোনে যে তলার জাগান দেখিয়ে ছিলাম নিত আমাদের ভোর।

আমরা সব নিস্তব্ধতার হাতের পুতুল। এই ব'লে পাক দিয়ে মাছ ধরি।

আমি যাচ্ছি সুদিপ্তে

এরই মধ্যে এসে যায় একটা সুযোগ। পেশবাদের মতো কর্ণপুরে অভ্যুত্থান।

জলপুরে পড়ে তন্ময়ীরা। চুনারাঙার বাড়ি। ও কর্ণপুরের বাওয়ার কথা পাড়তেই সঙ্গে সঙ্গে আমি লুফে নিই। অর্ণিত-আর্যরাইটিসে তখন আমার ইটিংয়ে গেলে জল বেরিয়ে যায়। তন্ময়ীর বলে, যেখানে ভয় নেই। গেলে সেখানেই ভিজা থাকবে।

ছুটি ফলায় বেরিয়ে ভিজা নিয়ে শেয়ালদার ট্রেন ধরলাম। মালদহিয়া থেকেই গুরু হয়েছিল বেদম ভিড়। কামরায় ভিজা বাঙালের জায়গা নেই। প্রায় সবার হাতেই একটা করে নুনের পুটুলি। নয় আর ভিজু। ট্রেনে পথে সীমান্ত পেরোবে। এরা সব চুনোপুটি। হাবলাদোহারারা যার বীধা সড়কে। ভুরু কুঁচকে।

খেয়ের থেকে আমার হাত। তন্ময়ীর ভোরবারাকে করার পাঠানোও সে করার ফুরসতের পৌঁছোনি। ফলে, ভিজা আসেনি।

দুর্গ ভুল করে তন্ময়ীর বলে, আমি তাহলে একটা স্ট্রেচার আনার ব্যবস্থা করি।

স্ট্রেচারে শুয়ে কটার পেয়েছি, এটা জানতেও যেন মরা কাটা যায়। বললাম, দুর্গ পেয়ারা নেই। ইটিন।

দু-ধারে রেল লাইনের ধার ঘেঁষে ঘোরের জঙ্গলে কাপড়ের হয়ে আছে, কর্ণপুর দেখিনি।

খেতে হয়ে রেল লাইনের পাশ ঘোরার ঠোঁকর খেতে খেতে —মেঘ ঘোল অনেকটা হাল্কা। এক ঘোরল ভো বটেই।

শড়ি-খড়ি ক'রে শেষ পর্যন্ত আমরা হয়ে পৌঁছেছিলাম ঠিকই। দুর্গ তুলে দেখি, কালভার্টের ওপরে দাঁড়িয়ে হাত হাতে তুলের গুচ্ছ নিয়ে আমাকে আসতে জনতেছে হাসিমুখের ছোট একটা ভিড়।

তারপর স্টার্ট সোনালাথপুর।

ছোকরা নেই

বেটা ছিল আগে গরুর গাড়ির রাস্তা, এখন সেটা হয়েছে বাস-লরি যাওয়ার পিচঢালা সড়ক।

বাড়ির আমরা আগে বলতাম ও-পাড়া, তার ঠিক দুধে নামতেই সামনে একটা চায়ের দোকান। চা-বিস্কুট না খাইয়ে ওরা ছাড়বে না। আমি এদিকে মনে মনে ছটফট করছি — কতক্ষণে বাঁধের বাড়িতে পৌঁছব।

ওপাড়া পেরোতে গিয়ে মনে হচ্ছিল — না, খুব কিছু বদলায়নি। নতুন পাকা বাড়িগুলো তেমন চোখে পড়ল না। এমন সময় বলল্। অবশ্য, এই-কালেই ঘোল ছিল নীলু-বেবুদের ঘোল-বাড়ি। ওরা ছিল এ-বাঁধের জমিদার। ওদের সেই জিনিস এখন বাদুড়ের।

যেতে যেতে আমি খুঁজছি বাঁধানো সেই ইঁদারা। যার খুব পাশে ছিল জিওল গাছ। তার বাঁটির ওপরে ছিল পুজোরক্ত বেদিয়ে আসার মতো একটা ফাটা দা। সেখানে জলে টিল টিল করার জিওলের ফাটা। ছেলেবেলায় ঐ জিওল গাছটাতে চোখ

পড়লেই আমার মনের ভেতরটা কেমন যেন বাচ্চার মোজার মতো উল্টে যেত।

ঐ ইশারার পরিণামে আমাদের সে-বাড়ির কোনো চিহ্ন আর নেই। এখন সেই পাঁচ-ছ বিঘেতে খালি জায়গা জুড়ে রয়েছে আমার চিনের ফ্রাস ফেলবার আট-দশ গজ লোহার বাসরকিটে — এক কালে যেখানে সন্ধ্যেবেলা বাঁশির শব্দ শুনে আকাশ থেকে কালেভদ্রে আসা বুনোহাঁসের ঝোঁকগুলো নেমে এসে একটানা এসে ঠেকা পুরনো বাগানে বোরা।

রক্তকরবী

আর কিছুর জন্যে নয়,আমার মনটা হায়-হায় ও যে উঠল শুধু বাড়ির কোনোদের সেই শেওড়া গাছটা নেই বলে — যার ডালে বসে আরাম থেকে আমি দেখতাম বড়োরা জীবনের একজন আরেকজনের বুক্কুটি নেয়ে নিচ্ছে।

যে জায়গাটায় ছিল আমাদের ঝিঙে-জল-আলু-কুলকুলি আর পাহারাদারের, সেটা এখন বাসবাড়ির সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে হয়েছে বাসগুলি আর আপনের বিশাল কেতা।

বাড়ির যৌবনের যে পাঁচিল ছিল শুধু দুটায়টি কলাগাছ আর মাটিতে, এখন তার সর্বাঙ্গে সবুজের বাহার। ছিল যেন আমরা আকাশেই গড়িয়ে নিয়েছিল। ঘরে আছে নদীও নেই। আয়নে এরা জল পেল কোথায়!

হঠাৎ মনে পড়ে গেল আত্রিকার কেন্দুবনের কথা। জাসের হায়নারা পড়লে পাঁচের লোকে নাকি কেন্দুবনের ভরপেটে নুন খাইয়ে ছেড়ে দেয়। কেন্দুবনের যখন তেষ্টায় ছাতি ফাটে তখন তারা ঠিক খুঁজে বার করে কোথায় বালির নীচে জল আছে।

এখনও তেমনি জল এনেছে আমি খুঁড়ে।

এতে তো আমার আনন্দ হওয়ার কথা।

কিন্তু হয়নি। তবে কারণটা ছিল সম্পূর্ণ অন্য।

ভেবেছিলাম, নিজের পাঁয়ে দিয়ে পুরনো স্মৃতিটাকে নতুন করে আবার জাগিয়ে নেব। এতদিন বুকের মধ্যে পুষে রেখেছিলাম যে স্মৃতি, এসে দেখাতে দিয়ে সেটা জন্মের মতো মুছে গেল। হেঁটুকুতেও ছিল, নতুন করে ফিরে পেয়ে দিয়ে সেটুকুও খোয়া গেল।

এরকম তা করিনি, দেখি যেলগোবিন্দ আমার সন্ধানে আমার গা টিপছে। ঘুমেছি। সেই সুদিনের কথা তো।

সোনকনাথপুর থেকে আসে চুরাডাঙার চিঠি। তারপর।

নাম করতে নেই

এর মধ্যে আমার একটা ঘোড়া এসে গেল কেন?

ঘরের ঘোড়া?

আও ভালোবাসের। আমার জামাইবাবু আর আওপাড়ু পরস্পর পরস্পর বন্ধু। এই তো দুপড়ুনিয়া হাট পেরোলেই, এঁদের গাঁ। জামাইবাবু হাতে একটা ছলটি নিয়ে সেই ঘোড়ার চেপেই এ গাঁয়ে এসে আমাকে আর দাদাকে ভাইবৌটির নেমন্তন্ন করে গেছেন।

এঁদের গ্রাম জয়রামপুরের নাম করতে নেই। বলতে হয় শঙ্করী।

চুরাডাঙা শঙ্করীর পথে সেই গাঁয়ে একবার না যেয়ে পাঁড়ে পারিনি।

এই গাঁয়েই যেলগোল বাড়িয়ে দিয়ে হয়েছিল জগদ্ধাত্রী দেবীর। এঁর নামে একটা বাঁধিয়া আছে। নিয়ে দেখি টলটল করছে তার জল। চারপাশে গাঁজা। পুব পাড়ে যে ছিল চৌধুরীবাবুদের জমিদারি বাড়ি। ঐ বাড়িতেই হয়ে ছিল আমার দিদি।

বর্তমানটুকুকী আজকি হলেও পড়ন্ত জমিদারির বাড়াই বুড়ি, জামাইবাবুর ভা-গীকে আমরা বলতাম মাউইমা। ছিলেন আমার আর দাদার চেয়ে একটু আলাদা ধরনের মানুষ। বাড়ারঘরের আয়নায় আমরা মানুষ পেতে ওলেই আউইমা এসে দিয়ে বসে আমাদের মেখেন ছড়ার পর ছড়া, প্রবাদের পর প্রবাদ। একলব্য লিখতে পড়তে জানতেন না। লিখতে লব ওনে ওনে লেখা। লেকালে নিরক্ষরতার কী অসম্ভব শক্তিশালি ছিল!

দুষ্টু লোকে বলত, পড়ন্ত ঐ জমিদারবাড়ির যোলআনাটিতে নাকি মাউইমার মোহরের ছড়া পোঁতা আছে। তাই এ-বাড়ি ছেড়ে তিনি একদণ্ড যাবেন না। কিন্তু এঁর নিজের যাওয়াই যে আসল গণ্ডগোল ঘুচবে ছিল —এরকম আড়ি আর পাবাই তার পৌঁছ পেয়েছিলাম।

যেলগোবিন্দ আমার আদরে এই মাত্র যেন সেই মাত্র। ওর যৌবী নড়া দেখে মুখলাম ও আমাকে মনে করিয়ে দিতে চাইছে সুদিনের কথা।

ছোলা কাঁকল

যেলগুকে নিয়ে এই এক মুশকিল। ওর কথা সবার কেন যেনিয়ে ছেলে পড়ে আছে

এবেলি একটা ভাব। ও যে কোথেকে এই ধার শেখ, কে জানে। আমার বাবার ধারার একরকম যোড়ার ডিম দিয়ে আসার ভাব লক্ষ করা যায় বটে। যেন ঠানুরদাও ছিলেন সেখানে বাহকগীরিশ। আমার মতো আলস্য মানুষের বাবারিই চলন। দাদাকালীন অত কিছু রেখে গেলেন, আমরা কেবল পৈতেগুলি ক'টা হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলালেন।

যাক গে যাক। সুমিত্তে বো। সেই কথাই এতক্ষণ আমায় ঠেটা করছিলাম।

চুড়ামণ্ডায় এসে উঠলাম ওদের জল বসুরের সরকারি ডাকবাংলোয়। পাশেই স্থানীয় জমি কর্তাদের বাড়িতে ঘুরেলা চর্মরোগ হোমিওপ্যাথ-এ বসছে। বেলার বাবাশ্বশুর কাছেই এক বড় আমাদের মালিক। তার বাগানের অবশ্য, তাই সন্ধি সময়টা সেই সাজগুছিয়ায়।

ট্রাঙ্কিতে টেনে ঘুম দেওয়ার পর সকালে উঠে নিজেকে খুব ঝরঝরে লাগল। এরকম দর্শনা আর লোকনাথপুর সম্বন্ধে আমার যে কদুরে ভাব মনের মধ্যে জমাট বসছ হয়ে ছেলে বলেছিল, সেখি ঘাসফাটি-পালে জল হয়ে তা বেরিয়ে গেছে।

গ্রাম ছেড়ে বেঁচে আসাতে তাই বেলাকে একমুখ হেসে আমি বলতে পেরেছিলাম।

—'বুঝলে বেলাল, আমাদের আসল বাড়ি ছেল নদিয়ায় নয় — আমাদের আদিনিবাস ছিল সুমিত্তেয়।'

আমার কথায় কান মেতে বেলাল বলে 'সুমিত্তে বলছেন। সে তো এই আমাদের পাশেই।'

আমি হাঁ-খা ক'রে উঠে বলি, 'সা-না। এ সুমিত্তে নয়। সে হল ছত্তিশগড়ের সুমিত্তের।'

বেলাল আপত্তি জানিয়ে বলে, 'ঐ একই হল। এসেই তো আছে ছত্তিশগড়ের মধ্যে ছিল। তার লোকনাথপুর দর্শনীও।'

আমি ওর হাতে ঘোলাম। মানেছে। ছোকরাও পড় রাখতে পারছি না যে।

তো-এই হল আমার সুমিত্তের বৃত্তান্ত।

এর পর থেকেই মনের মধ্যে ঘুর ঘুর করছে একটা ভয়। সুমিত্তের ছোবার কত পুরুষের আগ? তার আগে? কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছিল এই সুরুলদা মুলুকে?

আমাকে শাঁকে পড়তে দেখে চোলপোক্তিদের আলা হয়। মাড়োর কাছে আঙুল ঘষ্টে ঘষ্টে বাবা দিয়ে বলে—আর ওসব।

ব্রাহ্মণরাজুর

এতদিনে আমিও এটা হাতে হাতে বুঝেছি, যে মনুষ্যের পেছনে লাগছি তার অতীতের সন্ধানে। মনুষ্যে পড়েও নদীর জলের যোগাই নেই। তাকে অতীতে তাড়িয়ে বাদশ ক'রে মাড় ধরে নিয়ে গিয়ে ফের ঠেলে ফেলতে হবে তার উৎসে।

এইসময় সেই রাজবের একটা ঘটনায় ঘটল।

সামনে পা ছড়িয়েই চেঁচিয়ে 'ব্রাহ্মণরাজুর' বলে পেছন থেকে আমার আলা টেনে বসল একজন। ফিরে দেখি ওভালাল। নওগাঁয় ছিল বাবার আর্থাটিস। সরকারি চাকরির মোড়কে আসলে মনিবের বাড়ির বিলাসবহুল কাজের লোক। তখন কি ছাই আমলের সুকুমার! বাড়ির কাজ করলেও ওভালাল হয়ে গিয়েছিল মা-র ছত্রছায়ায় পুরোপুরি বাড়ির লোক। ওরকমের মতই রানাকে আর আমাকে কলা শাসনে রাখত। ওভালাল রানাকে ডাকত 'আপেরাজুর' আর আমাকে বলত 'মজেরাজুর'। ও হাসলে ফোকলা হয়ে যেত। সেখা মেত একটা দাঁত ওর মাড়ির মাঝখানে দাঁড়ানো। মেসপড়ির এক ঘরে ওদের ছিল কয়েকজন মিলে থাকবার আলাদা আলাদা ঘর। বড়দিন ওপর মেলো বাবলে অভিমান হলে ওটা ছিল আমার দৌলতঘর। কিন্তু খাঁকার অন্তে বেশিক্ষণ সেখানে থাকা যেত না।

ওভালালকে ছেড়ে আসতে আমাদের খুব কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু ওপাল ওকে কলকাতায় এসে পেয়ে গিয়েছিলাম শিউরাজকে। দুজনের আশ্চর্য মিল ছিল চেহারায়। শিউরাজ ছিল মা-র খুব ন্যাওটা। বাড়িতে মা-র ওপর কারো কোনো অন্যায় দেখলে সঙ্গে সঙ্গেই ও ভিড়ে মা-র দিক। তাতে জনে জনে আরো অপ্রিয় হয়েও ও নির্বিকার ছিল।

আমার বাবা রিটায়ারের ওবার পরেও শিউরাজ তার চাকরি বাঁচিয়ে রাখতে বেশ কিছুদিন আমাদের কাছে রেখে দিয়েছিল। তারপর শিউরাজও অসেন। দিয়ে বসিয়ে তার গ্রামে ফিরে যায়। চাকরির জমানো টাকায় যে দু চার বিঘে জমি করেছিল, তাই নিয়ে বুড়ো বয়সে নিরক্ষর শিউরাজ গ্রামে গিয়ে মুরুব্বি হয়ে বসতে পেরেছিল। ওর ছেলেও এখন এইটি পর্যন্ত প'ড়ে বাড়ি চালানোর দিকে মন দিয়ে ঠেলি চরিয়ে করে কলকাতায় ওর বাবার

কাজের জায়গায় ছুটিছাটায় একটা চাকরি পেয়ে যায়।

যমুনা-পুথা

এমনি ক'রে ওকালাল শিকদারের পর এলো এ বাড়ির হাল ধরেছিল যমুনা আর পুথা।

সে কি আজকের কথা?

পুরনোই তালাচিওরা। যমুনা নিতেরজন। পুথাকে কোলে আসতে হয়েছিল দুই শিশু পুত্রকে। লম্বা বিড়ি বেঁধে কোনোরকমে সংসার চালাত।

যমুনা গ্রামে পাঠশালায় পড়েছে। পুথার ও আক্ষর জ্ঞানোদয়ে। ওকে বর্ণপরিচয় অবধিও টেনে কম হয়নি। কিন্তু বল চেষ্টাই মাঠে মারা গেছে।

পুথে যখন বুঝেছে বাজে, বাঁচাকে বেঁধিয়ে পাঠশালায় দিয়ে আসিল করতে হয়েছে। যমুনাই পুথাকে মানুষ করেছে। সেই সময় এক কবিতায় পুথার বিষয়ে লিখেছিলাম, "পুথা ওরফে যেঁৎ খাওয়ায়, স্নান করায় যমুনা।"

তিন কাচ্চার মানুষ আমরা এক আঙিনায় বেড়েছি। সেও তো কম দিন নয়। আমাদের মধ্যেকার তফাত গড়েও মনে মনে তিনে তিনে একজনার হয়ে গেছে আমাদের তো কই মনে থাকেনি। জাতের সম্পর্ক? নাড়ির টান? ধুৎ!

তারী তবে চাটার্জিরা কি অবে আমাদের পাশ্চাত্য অবে সহজে ভোলানো যায়? ওরা বোঝাতে চাইলো এক ঢিলেতে দুপাখি মারে। আমাদের অবস্থা একটু ফিরলে বাঁচা একটা ছোট্ট টেবিল ফ্যান কিনে দিয়েছে। ওরা খেয়েছে জমিয়ে ব'সে আমরা টেবিলে।

পুজোতেই বাবা গুনিকদের মধুপুর। মধুপুর বাবারও ছিলেন দুজাই। এক উঠোনে দু ঘরের বাস। শরিকদার ঘরগুলো একটু জমি আর একটা ভালোর পুকুর। আমরা এসব কিছুই আনেনি। লোকের বাড়িতে কাজ নিয়ে যমুনাকে চলে আসতে হয়েছিল কলকাতায়। ওর বিয়ে বুড়ি ছিল তাই। মাইনের টাকা সুদে খাটিয়ে দিয়ে তাদের জমি ফিরে ঘরবাড়ি করে দেশঘরে গিয়ে ও এখন ভালোই আছে।

মধুপুর দুই ছেলে কর্তা গিন্নি। বাড়ি মাহলি নিয়ে এর ভরা সংসার। কোন বুদ্ধে আর এখনও এ বাড়ির হাঁড়ি ঠেলছেই দু বিকেই টান। তারী চলে গিয়েও ফেরা ফিরে আসত। শেষ পর্যন্ত পা ভেঙে গিয়ে নিজের বাড়িতেই থেকে গিয়ে ঘরে হয়ে রয়েছে।

বৌদি শরিবার আসা অবস্থায় এমনিতেই এ বাড়িতে আসতে হাতে এক ভার হয়ে ওঠেছি। তার ওপর ছেলেপেলা সুদ্ধ ছোট শিশিমা আর পিসি এসে গেলে তো আরও ঝিরিয়ে।

ঘুরন চাক

লোক জমতে জমতে এখন আমরা দুই বুড়োবুড়িতে এসে ঠেকেছি। দুই নাতনি এসে আছে তাই। মাইনে পেল বাজারে বাজার খুলে মেওয়াটাও এক সমস্যা। গাঁয়ে ইস্কুলে গেলে আজকাল পড়ে খেতে হয়। খাটি তো তবু খোঁড়া নই। কারুর কে তুমি না।

চোলাপোলিশ হচ্ছে।

গলছে: মনে নেই। জিনটা বলা বাড়ির বাইরে যাইনেই তো আমাদের। শেষ বয়সে এসব ভয় পেলে।

কথাটা মিথ্যে নয়।

ঠাঁয়ে খোলা নিয়ে এত সময়ে বাজার এদুতো থেকে ওদুতো চক্কে বেড়িয়েছি। মা-বাবাকে একটা ঠিকই নিয়ের জানাইনি কবে কোথায় আছি।

ডাক্তারখানার এতিয়খানা থেকে বেরিয়ে ভেন এক হেপাজতের ডাক। নিজের আলো নিয়ে এসেছে প্রায়। মাঠে পা দিয়েই বন্ধুকে ফোনার। সামনে একটা ভজাও মনে লাগ। আকাশ আলো ক'রে মেঘ। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। তবু সাদাটা না দেখা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থেকে হল। তারপরে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি ঘরে নামা নিয়ে দিয়ে-কড় এসে হাজির। সেই সঙ্গে চারদিকের মতো বৃষ্টি। বাড়ি না পেরোলে কোথাও ফোনো আশ্রয় মিলবে না। তখন কি বাড়ির কথা মনে পড়েনি?

কিন্তু তখন শেষকে বাঁচবের মতো আড়া করেছে একটাই ভাবনা। এই অজানা আচেনা জায়গায় কোথায় পাওয়া যাবে শুধু একটা মাথার ওপর ছাদ আর মৌজার একটু চাঁই।

এক ভারী মেয়েছের বাড়িতে পেয়ে গিয়েছি সেই চাঁই। চৌপেলে ব'সে সন্ধ্যেবেলা কত কত করতে করতে হঠাৎ খেয়াল হয়েছে আমি একাই কথা ব'লে যাচ্ছি।

ভারীর বউ কানুল ক'রে বলেছে, আপনি বড়ো ভাল লোক দেখে। তাই কথা এত মিষ্টি।

আমরা যা কেউ বলছের মেয়ে। আমার বন্ধুরা তা-র কথা শোনার জন্য ঠিক এমনিভাবে ঝুঁকে থাকে। তাদের ছাড়তে ইচ্ছে দিত।

কাঠখোদাই ছবিতে দুর্গা ঠাকুর

প্রতিলিপি রেইটিন্ক

কাঠখোদাই ছবিতে দুর্গা ঠাকুরের প্রথম ছবিটি সচিত্র পত্রিকায় পাওয়াতেই ছাপা হয়েছিল। এখন পর্যন্ত ছাপা সবচেয়ে পুরোনো পত্রিকাটি ছাপা হয়েছিল ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে. এই পত্রিকায় একটি মাত্র ছবি ছাপা হয়েছিল. এক কেরী সুপারি হাত টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। এর পরের বছর যে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় তাতে ছিল একটি নৃত্য-প্রদর্শনের ছবি ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের পত্রিকায় প্রতি মাসে ঠাকুর বা ইতিহাসের ছবি ছাপা শুরু হয়। এই কারণে এই সালের পত্রিকাটি গুরুত্ব অপরিসীম। সেই রীতি আজ পর্যন্ত ১৮০ বছর ধরেই চলে আসছে। এই সূত্রানুসারে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের পত্রিকায় দুটি দুর্গা ঠাকুরের ছবি ছাপা হয়েছিল, একটি আশ্বিন মাসে, অন্যটি চৈত্র মাসে বাসন্তী পূজা মাসে।

ছাপা ছবিতের গোড়ার কথা

পত্রিকায় প্রকাশিত কাঠখোদাই ছবির শুরুর প্রসঙ্গে কথা আগে ছাপা-বই প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলে নিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। পৃথিবীর প্রথম কাঠখোদাই দিয়ে যে বইটি প্রকাশিত হয় তার নাম 'হীরকসূত্র'। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের টীকা অনুযায়ী এই বইটি প্রকাশিত হয় ৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে, ছোটপরিসরে ওজন ছিলো। চীনের একটি কাগজে চুনকামের উপর ছবি খোদাই করে তার উপর কালি মাখিয়ে চাপ দিয়ে ছাপা হতো। চাপ দিতে যে চাপা দিয়ে ছাপা হতো তাকে ইংরেজিতে বলে ব্যাপ হয় ছাপাখানা। এই শব্দটি চীন থেকে যায় জাপানে। জাপানে ছাপা ছাপার বইটি নাম 'ধর্মনীসূত্র'। জাপান থেকে কাঠখোদাই ছাপা পদ্ধতি যায় কোরিয়ায়, কোরিয়া হয়ে সিল্কের ও মেশপথে আসে।

আধুনিক ছাপা-যন্ত্রের জনক যাঁকে বলা হয় তিনি হলেন, জার্মানীর জোহান গুটেনবার্গ। তিনি পেশায় স্বর্ণকার ছিলেন ১৩৯৭ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর মেনজ, শহরে গুটেনবার্গ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ১৪৩৩ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে তিনি মেনজ, ধর্মনিবরণ ইস্তফার, গ্রন্থ প্রভৃতি ছাপার

জন্য ছাপাখানা খোলেন। পরে তাঁর এই ছাপা-পদ্ধতি সমস্ত বিশ্বের অবস্থিতির হয়ে পড়েছিল। এই কারণেই গুটেনবার্গ বলেছিলেন —'ছাব্বিশটি বানুন তৈরী সৈন্য নিয়ে আমি পৃথিবী জয় করেছি' কথাটি সত্যি।

জার্মানীর বাইরে প্রথম ইতালির সুবিয়াকো শহরের বেনেডিকটীন সন্ন্যাসদের এক মঠে প্রথম ছাপাখানা চালু হয় ১৪৬৪ খ্রীষ্টাব্দে। ১৪৬৬ খ্রীষ্টাব্দে সুইজারল্যান্ডের বাসল শহরে ছাপাখানার কাজ শুরু হয়। ১৪৭০ থেকে ১৪৭৫ খ্রীষ্টাব্দে-এই সময়ের মধ্যে ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল, হল্যান্ড সহ অনেক জায়গাতেই ছাপাখানার কাজ ছড়িয়ে পড়ে। ১৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বিদেশে ইটালিয়ান আলবার্টাস প্রথম ছাপাখানা বসান। ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ ইউরোপ থেকে ছাপাখানা আমেরিকায় আসে।

গুটেনবার্গ বাইবেল ছেপে ধর্মজগতে সাড়া জাগিয়ে দিয়েছিলেন বলে —সেই সময় ধর্মপ্রচারে ছাপাখানার ভূমিকা প্রধান হয়ে পড়েছিল। এক সময় আবিসিনিয়ার পর্তুগীজ মিশনারিরা পর্তুগাল কর্তৃপক্ষের কাছে একজন মুদ্রাকর ও একটি ছাপাখানা পাঠাবার জন্য অনুরোধ করেন। ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মনোনীত ধর্মযাজক ছাপার যন্ত্র নিয়ে রওনা দেন। পালতোলা জাহাজে পর্তুগাল থেকে আবিসিনিয়ার উদ্দেশে যাত্রা কালে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ঘুরে আসার সময় নানান অসুবিধার মধ্যে পড়ে ধর্মযাজককে গোয়ায় নামতে হয়। তবু নামা নয়, থেকে যেতে হলো এখানেই। দু-বছর পরে ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে গোয়াতেই ঐ ধর্মযাজকের মৃত্যু হয়, ফলে ঐ ছাপাখানাটি গোয়াতেই থেকে যায়। ভারতবর্ষে ছাপা প্রথম বইটি একটি পর্তুগীজ ধর্মগ্রন্থ, নাম 'কনফুসোদেস এ ডকট্রিনা ক্রিসটাম'। ভারতীয় ভাষায় প্রথম বইটি ছাপা হয়েছিল ১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দে, তামিল ভাষাতে নাম 'দ্যাকট্রিনা ক্রীস্টি'। গোয়ার পর ১৬৭৪-৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইতে ছাপাখানা চালু হয়। এখনও পর্যন্ত পাওয়া সবচেয়ে পুরোনো বাংলা মুদ্রিত প্রতিলিপি ছাপা হয়েছিল 'চারজন ইলাসট্রেটর' গ্রন্থটিতে। ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দে আমস্টারডাম থেকে-এটি প্রকাশিত হয়েছিল।

কলকাতার প্রথম ছাপাখানাটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল উইলিয়ম বোলটসের উদ্যোগে ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে, কিন্তু নানান কারণে তা চালু করা যায়নি, বাংলা দেশে

প্রথম বাংলা ছাপা শুরু হয় ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায়, বইটির নাম 'এ গ্রামার অফ দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ'। মুদ্রাকর হলেন হার্মান উইলকিন্স্। ইংরেজি বইয়ে কালীঘাটের নাম, কৃত্তিবাস, ভারতচন্দ্রের লেখা থেকে বাংলায় উদ্ধৃতি ছাপা দিয়ে বাংলা অক্ষরের যাত্রা শুরু।

কলকাতায় সোভাবাজারের রিষড়াস্থ দেবের ছাপাখানার সত্তরের ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে দুর্গাচরণ বিদ্যাভূষণ নামক প্রথম বাংলা পঞ্জিকা ছাপার অক্ষরে আত্মপ্রকাশ করে। এক সময় বাংলা দেশে সামাজিক নিয়ম অনুযায়ী সমাজকে বেঁধে নিয়েছিলেন, এমনকথার ধৌনিক খ্রীষ্টান-ব্যবহার সব নির্দেশই নিয়েছিলেন ভার্চ রঘুনন্দন। কিন্তু সমস্যা হলো এই রীতিনীতি সাধারণে মনে রাখবে কী করে। তাই পাঁচটি বিষয়— তিথি, নক্ষত্র, বার যোগ ও করণ - এর তথ্য নিয়ে তৈরী হলো একটি বই নাম পঞ্জিকা বা পঞ্জিকা। স্মৃতিশাস্ত্রের অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ গণনা করে যে পঞ্জিকা বা পঞ্জিকা প্রস্তুত করেছিলেন তা নিয়ে কিছু মতপার্থক্য দেখা দিয়েছিল। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের আগে এই বাংলার বিভিন্ন পণ্ডিত সমাজ নিজের ধারার পঞ্জিকা প্রস্তুত করেছিলেন, ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে ২৭ ফেব্রুয়ারী তারিখের সমাচার দর্পণ পত্রিকায় প্রকাশিত এক সংবাদ থেকে নৈহাটি, ভরাইখালি, বাকলা, খানাকুল, রামরামপুর, বালি, গলপুর এই সব গ্রামে পঞ্জিকা প্রস্তুত হয় বলে জানা যায়। এছাড়া ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবরের পত্রিকায় শিবপুরী, বরুণা, কুলটি, মেদিনীপুর, বালুচি গ্রামেও পঞ্জিকা প্রস্তুত হয় বলে জানা গেছে। ইংরেজদের এদেশের শাসনভার হাতে নেওয়ার পর দেশীয় রীতি অনুসারে দেশী তারিখ অনুযায়ী রাজস্বাদি পরিচালনা ও আদালতী ছুটি প্রভৃতি করতেন। জানকান সাহেব ৩০-৪-১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে দেশীয় পঞ্জি মতে সরকারী যে ছুটির তালিকা তৈরী করেছিলেন তা নিম্নরূপ :—

বাংলা ১১৯৪ সাল

রথযাত্রা	১ দিন
পুনর্যাত্রা	১ দিন
দুর্গাষ্টমী	২ দিন
মহানবমী	১ দিন
দুর্গাপূজা	৩ দিন
দেওয়ালি	১ দিন
ভাতৃদ্বিতীয়া-যোগিনী	১ দিন
জগদ্ধাত্রী-সংক্রান্তি	১ দিন
বসন্ত পঞ্চমী	১দিন
রাধী পৌর্ণমাসী	১দিন
জন্মাষ্টমী	২দিন
শিবরাত্রি	২দিন
হোলি	৩দিন
ঝাপনী	১দিন
চড়কপূজা	১দিন
রামনবমী	১দিন

অনুষ্ঠানে ছুটি পাওয়া যায়

অক্ষয় তৃতীয়া	১দিন
নৃসিংহচতুর্দশী ও দোলযাত্রা	২দিন
রথযাত্রা ও উল্টোরথ	২দিন
ঝুলনযাত্রা	১দিন
জন্মাষ্টমী	১দিন
নন্দোৎসব	১দিন
রাধাষ্টমী	১দিন
জগদ্ধাত্রী পূজা	১দিন
রাসযাত্রা	১দিন
উত্থান একাদশী	১দিন
তুলসী জন্মবাসর	১দিন
দোল পূর্ণিমা (ডাঁইবাঁধা)	১দিন
রথযাত্রা	১দিন
কার্তিক পূজা	১দিন
ধাত্রী নবমী (জগদ্ধাত্রী)	১দিন
রাসযাত্রা	১দিন
অন্নকূটোৎসব	১দিন
রটন্তী জন্মবাসর	১দিন
দোল পূর্ণিমা (ডাঁইবাঁধা)	১দিন
কালরাত্রি পূজা	৪দিন

উৎসব সূচীর তালিকা যদি সমস্ত পণ্ডিত সমাজে এক হতো তাহলে কোনো সমস্যা হতো না, কিন্তু বিভিন্ন পণ্ডিত সমাজের গণনায় পার্থক্য থাকায় ফলে বাস্তবক্ষেত্রে বিঘ্ন ঘটলো। এই সমস্যার সমাধানের জন্য ইংরেজ সরকারের অনুরোধে নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বিভিন্ন পণ্ডিত সমাজকে কৃষ্ণনগরে আমন্ত্রণ করে আলোচনার মাধ্যমে ঐ সভায় একটা সর্বসম্মত পঞ্জিকা-বিধি প্রস্তুত করেন। পরবর্তীকালে এই বিধি মেনেই পঞ্জিকা ছাপা শুরু হয়। মজার প্রতি অনুগত্য প্রকাশের উদাহরণ স্বরূপ সেই থেকে নবদ্বীপাধিপতি বা নদীয়াধিপতির অনুমতিক্রমে বা অনুজ্ঞানুসারে ছাপা হয়েছে লেখা থাকতো। কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র নদীয়া রাজবংশে থেকে পঞ্জিকা কমিটির নিয়োগ করলেন, সেই থেকে যাঁরা যাঁরা পঞ্জিকার গ্রন্থ-প্রতিনিধি হিসেবে সম্পাদিত হয়েছিলেন তাঁরা হলেন —

নবদ্বীপাধিপতি —
মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়
মহারাজা শিবচন্দ্র রায়
মহারাজা ঈশ্বরচন্দ্র রায়
মহারাজা গিরিশচন্দ্র রায়
মহারাজা শ্রীশচন্দ্র রায়
মহারাজা সতীশচন্দ্র রায়
মহারাজা ক্ষিতীশচন্দ্র রায়

পঞ্জিকা প্রতিনিধি —
পণ্ডিত রামভদ্র বিদ্যানিধি
পণ্ডিত রামকৃষ্ণ বিদ্যানিধি
পণ্ডিত প্রাণনাথ বিদ্যাভূষণ
পণ্ডিত রাধাকান্ত সিদ্ধান্তবাগীশ
পণ্ডিত শ্রীনাথ বিদ্যারত্নভূষণ
পণ্ডিত তারিণীচরণ বিদ্যাবাগীশ
পণ্ডিত দুর্গাদাস বিদ্যারত্ন

এখানে স্মরণযোগ্য চালু হবার পর কেন মনে কেন যন্ত্রে প্রথম পঞ্জিকাটি ছাপা হয় তা জানা যায় না, তবে সবচেয়ে পুরোনো যে পঞ্জিকাটির সন্ধান পাওয়া গেছে সেটি ছাপা হয়েছিল ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে। প্রকাশক ছিলেন কোন্নগর এক রামহরি। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ১৩৫। মজার ব্যাপার ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে অনেক রামহরি দ্বারা একটি পঞ্জিকা প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানিয়েছেন। এই পঞ্জিকায় রামহরি এবং উপাধের পঞ্জিকার রামহরি একই ব্যক্তি হতে পারে, এই রামহরিকেই প্রথম পঞ্জিকা প্রকাশক হিসেবে সম্মান দেওয়া হয়েছে, তবে বিশ্বকোষের লেখকের মতে রামহরির সাহায্যার্থে কোম্পানিই সর্বপ্রথম বাংলা পঞ্জিকা ছেপে প্রকাশ করেন। সম্পাদক ছিলেন রামধন বিদ্যানিধি। কিন্তু কোন সালে এই পঞ্জিকা ছাপা হয়েছিল তা উল্লেখ না থাকায় এবং ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের আগে ছাপা এই পঞ্জিকার কোনো হদিস না পাওয়ায় রামহরির পঞ্জিকাকেই এখনো পর্যন্ত প্রথম ছাপা পঞ্জিকা বলে পণ্ডিতগণ মেনে নিয়েছেন।

জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত ১২১৮ সালের (১৮১৮-১৯) পঞ্জিকাতেও রামহরির পৃষ্ঠপোষকতার উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে. সম্পাদ বাদলা করিলাম পঞ্জিকা প্রকাশ— এই বাণী ঘোষণাপত্রের দুর্গাপ্রসাদের। ঐ পঞ্জিকার শেষে যে নিবেদনটি ছাপা হয়েছিল তা থেকেই পঞ্জিকা প্রকাশ সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। সেখানের বক্তব্যে নিবেদনটি —"ভরসিন্ধু যে অপার তাহে হয়ে কর্ণধার কীর্তিগণের করিছেন নিস্তার ॥ অধীনে তরি নাম ঘোষে ভবন জড়িতায় সাক্ষেপে করিব কিছু না তবি নিস্তার ॥ ভরসংসের ওর উক্তি পাবে ঘোর নিপুণ যুক্তি যেন উক্তি পাবে তার ॥ শ্রীযুক্ত রামহরি নাম হয়ত দুজনে ধাম ত্রিবেণীতে তিনি সাকিম সার ॥ সেই পদে সেবা করি সম্পন্ন বাসনা করি করিলাম পঞ্জিকা

প্রকাশ।

'কোড়ালীকো মমঃ বাম লিখ দুর্গাপ্রসাদ নাম দুর্গাপুরী পুরাণ অভিলাষ। নবদ্বিপের মতে মত তাহে সংবেদনাদক এতত জানিবে সকলে। জাতো হেও যোগ বার আর মত আছে তার কাবার রচিলাম দেখে মুলে। প্রহর আগমের ফল জানিতে হয় এ সকল ফলাফল যে প্রহরে যে লীনে। অক্টোবরে ক্রেব নাই পত্রিকা সকলের তাই দেখিলেন যখন হবে মনে। —আর কীছু বলি ভুল যদি থাকে ইতে ভুল আমি করি মুলের প্রমাণে। আমরে আবার ত্রুটি থাকে যদি ক্ষোটী ২ ৩৬ প্রহে সাধু সরিধানে ৫

পত্রিকা : লঙ্ সাহেবের তালিকা

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অনেকগুলি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। লঙ্ সাহেবের তালিকা থেকে আমরা কিছু পত্রিকার নাম পাচ্ছি, সেগুলি হলো —

১৮২৪ খ্রীঃ	জলিকাতা নূতন পত্রিকা
১৮২৫	শিবনাথ বসুর পত্রিকা
১৮৩৪	গোবর্ধন শর্ম্মার পত্রিকা
১৮৩৬	মাধব দাসের পত্রিকা
১৮৩৬	মেরির পত্রিকা
১৮৪০	বিদ্যারম্ভের পত্রিকা
১৮৪৪	কাশীশুণ্ড পত্রিকা
	নূতন পত্রিকা
	রামেশ্বর পত্রিকা
	দ্বিজেশ্বর ঘোষের পত্রিকা

এই তালিকা ছাড়া যে পত্রিকার সন্ধান পাওয়া গেছে সেগুলি হলো

খ্রীষ্টাব্দ	প্রকাশক
১৮৪৪	বঙ্গভাষানুবাদ সমাচার নূতন পত্রিকা। সভাসন্থ মুদ্রাযন্ত্র, ১৬ সাউথ রোড, ইণ্টালী।
১৮৪৪	মধুসূদন রায়ের নূতন পত্রিকা। হিন্দু পেট্রিয়ট প্রেস, কলুটোলা।

॥ আগমনী ॥

১৮৫৬ গোলকনাথ ধরের নূতন পত্রিকা। মুখপত্র মাত্র।

১৮৫৭ সেন্ট্রাল কৌশ নূতন পত্রিকা। সেন্ট্রাল কোল অ্যাণ্ড কোম্পানীর মাত্র, পালবাজার।

১৮৫৮ ডি. এল. মজুমদার কোং-এর নূতন পত্রিকা। হিন্দু প্রেস, আহিরীটোলা।

১৮৫৯ বি. আর. সে অ্যাণ্ড ব্রাদার্স-এর পত্রিকা ও ডাইরেক্টরি. অফিস মাত্র, জোড়াবাগানে।

১৮৬০ রসিকলাল ধরের নূতন পত্রিকা. করিয়া কৌমুদী মাত্র হিংপুর হোড, ১৪৭ ভবন।

১৮৮১ গোপালচন্দ্র সাহার নূতন পত্রিকা। হিন্দু প্রেস।

১৮৮৫ কেশীরামের সে অ্যাণ্ড কোং এর লাই রিপন পত্রিকা। কৈফিয়া — দার্জিলিং মাত্র, নিমতলা ষ্ট্রীট, ৪৩ নম্বরের ভবন।

১৮৮৬ সে অ্যাণ্ড ব্রাদার্সের নূতন পত্রিকা। হিন্দু প্রেস।

১৮৯০ দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের হিন্দু প্রেস পত্রিকা।

১৮৯২ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সনাতন হিন্দু পত্রিকা। কলিকাতা মেশিন প্রেস, ৩, বিডন রোডস্থ।

১৮৯৪ দুর্গাচরণ গুপ্তের গুপ্ত প্রেস পত্রিকা। গুপ্তপ্রেস, ২২১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

১৮৯৯ পি. এম. বাকচির ডাইরেক্টরী পত্রিকা। প্রথম কুমার বিদ্যারত্নের সম্পাদনে পত্রিকা। বঙ্গবাসী স্টিম মেশিন মাত্র, ২৯, নন্দকুমার ষ্ট্রীট।

১৯০৩ উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্যের নূতন পত্রিকা। হরমোনিয়াম মাত্র।

১৯১২ বঙ্গবাসী পত্রিকা। বঙ্গবাসী প্রেস. ৩৩/২, অপার চিৎপুর রোড।

১৯১৭ বলিরুদ্ধ পাল কোং-এর বিপণন পত্রিকা। হিন্দুস্থান প্রেস ১২৩, আপার চিৎপুর রোড।

১৯২৭ আশুতোষ মিত্রের বিপণন বিজ্ঞান পত্রিকা।

১৯২৮ কেশীরামের বা নন্দলাল সীলের পুর্ণচন্দ্র পত্রিকা ও ডাইরেক্টরী। অরুণ প্রেস, ২৭/৫, হারিসন চাটুয্যের লেন।

উপরোক্ত যে পত্রিকাগুলির কথা বলা হলো, তার পাশে যে সন দেওয়া হয়েছে তা প্রথম প্রকাশের সন নয়। বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনার দুশো বছর পূর্তি উপলক্ষে যে প্রদর্শনী হয়েছিল, সেখানে উপরের সনের পত্রিকাগুলি তালিকাভুক্ত হয়েছিল। উপরোক্ত পত্রিকাগুলির প্রকাশক আলাদা আলাদা কোম্পানী। পত্রিকাকে সুন্দর করতে কাঠখোদাই বেহুবেদীর ছবি দিয়ে সুন্দর করতে চেয়েছিলেন প্রকাশকরা। এরাপেই জানতে পেরেছি কয় কাঠখোদাই শিল্পীদের। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য— কৃষ্ণচন্দ্র কর্মকার, কৃষ্ণচন্দ্র বসাক, কৃষ্ণচন্দ্র দাস, কার্তিকচন্দ্র কর্মকার, কালিকাচন্দ্র বসাক, কালীনাথ মিস্ত্রি, গণেশচন্দ্র সাহা, গঙ্গাধর ঘোষ, গোবিন্দচন্দ্র কর, গোপীনাথ কর্মকার, তারিণীচরণ দাস, নৃহরিলাল কর, নন্দকৃষ্ণ সরখেল, পঞ্চানন কর্মকার, বিশ্বেশ্বর আচার্য্য, বীরচন্দ্র কর, ভৈরবচরণ ভট্টাচার্য্য, বীরচন্দ্র দাস, মনোহর কর্মকার, ভাবকচন্দ্র ধর, রাজধন কর্মকার, রামহরি ধর, রূপচাঁদ আচার্য্য, রামসাগর চক্রবর্তী, রামচন্দ্র কর্মকার, রসিকচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হীরালাল কর্মকার, হরচন্দ্র কর্মকার, হীরামণি কর্মকার, হরিমোহন ধর প্রমুখ।

পত্রিকার ছবি

সম্প্রতি যে পুরোনো ও যে পত্রিকাটি প্রথম পত্রিকার সন্ধান পেয়েছে, ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের সেই পত্রিকার ছবি ছাপা হয়েছিল একটি —এক বেদী সূর্যের ধর টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের পত্রিকাগুলির ছবি ছাপা হয়েছিল একটি — সূর্যগ্রহণের ছবি। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের পত্রিকার মস্তকের প্রথম ও তৃতীয়াংশের সাক্ষরতি-প্রথমে ঠাকুরের ছবি ছাপা হয়. ১৮৩০ সাল থেকে এই ধারায় আজও ছবি ছাপা চলছে।

কৃষ্ণচন্দ্র কর্মকার শ্রীরামপুর প্রেসের কর্মকার ছিলেন। তিনি নিজেই ছিলেন নিপুণ চিত্রশিল্পী, কুশলী ব্লক নির্মাতা, সুদক্ষ ব্লক নির্মাতা ও মুদ্রাকর। তাঁর ছবি খোদাইয়ে সুপরিচিতি ও জনপ্রিয় ছিল। পত্রিকা আরেই নিয়মানের প্রকাশ, ছাপা এমনি কথায় যখন আসায় নিয়েছে, তখন কৃষ্ণচন্দ্রের সমাচার প্রেসের ছাপা পত্রিকা ছিল সুমুদ্রিত ও সজ্জিত শোভিত। সুন্দর সুন্দর খোদাইকীয় ছবি ও উৎসব অনুষ্ঠানের ছবি

দিয়ে পত্রিকাটি মুদ্রণ সৌষ্ঠবে এক নূতন যুগের সূচনা করিয়াছিল।

এই পত্রিকার জনপ্রিয়তা দেখেই কলকাতার শ্যামবর্ণ কোম্পানি নূতন পত্রিকা প্রকাশ করার কথা ভেবেছিলেন বলে মনে করা হয়। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে বিলেত থেকে ছবি ও কবিতা আমিয়ে নূতন পত্রিকাকে অলংকৃত করবেন বলে ঘোষণা করেও সময়মত ছবি না আসায় একটি অজুহাত খাড়া করেছিলেন। শিল্পীর নাম বলে বিলে অন্য পত্রিকা থেকে ছবি নিয়ে তা ছেপে দিয়েছিলেন। ছবি নকল করে ছাপানোর অভিযোগ নি গঁয়ুহ, ১২৫৩ সনের পত্রিকার বিজ্ঞাপন নিয়ে আলোচনাতেও সেই কথা

বিজ্ঞাপন

"এই বিজ্ঞাপনপত্র দ্বারা সর্বসাধারণ লোকদিগের জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে আমরা এই পত্রিকার অনুষ্ঠানসময়ীন করিয়াছিলাম, শ্রীরামপুরের পত্রিকা-প্রেরক অতি মনোহর রূপে মুদ্রিত করিব, ইহা মনস্থ করিয়া ছবি, বর্ডার অর্থাৎ পৃষ্ঠার চতুষ্পার্শ্বের মূল ও আর ২ প্রকার নিমিত্ত বিলাতে পত্র লিখিয়াছিলাম। কিন্তু ঐ সকল দ্রব্য বিলাত হইতে আসিবার অনেক বিলম্ব দেখিয়া বর্তমান সনের এতদ্দেশীয় ছবি সকল গ্রহণ করিলাম। সম্প্রতি বিলাত হইতে ঐ সকল দ্রব্য এবং বিলাতি রাজস্ব আসিয়াছে তাহা আমাদি কলেজের পত্রিকায় মুদ্রিত করা যাইবেক।"

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ছাপা হিতৌষিণী পত্রিকার ছবির তালিকা করা হয়েছিল মূলত সমাচার পত্রিকায়। ১লা জৈষ্ঠ ১২৮০ তারিখের পত্রিকায় লেখা হয়েছিল— "হিতৌষিণী পত্রিকা নামক একখানি পুস্তক অদ্য বিদ্যোৎসাহিনী সভায় প্রকাশ করিবেন। ইহাতে কামরূপ রাজার কালিকাদেবীর মন্দির প্রভৃতির বিষয় লিখিত আছে। ছবিগুলি অতি পরিপাটি এবং উৎকৃষ্ট হইয়াছে। এই পুস্তক একখানি অন্যে আসিলে অনেক বিষয়ে উপকার পাওয়া যায়।"

বিদ্যোৎসাহিনী সভার হিতৌষিণী পত্রিকা তখন বেশ জনপ্রিয় ছিল, তবু শেষ পর্যন্ত প্রায় দেড় বছর সময়ের প্রতিক্রিয়ায় পুরো পত্রিকার পার্থক্য নিয়ে কাজে ২৩শে ফাল্গুন ১৮৭৭ তারিখে লেখা হলো — "আমরা তত্ত্ব বন্ধু হইতে কতু মুদ্রাঙ্কণ তাহার প্রকাশিত মূল পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার মূল্য চারি আনা মাত্র। ইহা সুদৃশ্য চিত্র সহিত উত্তমকাগজে এবং পরিষ্কারাক্ষরে ছাপা হইয়াছে। ইহাতে যেরূপ চিত্র দেওয়া হইয়াছে, বাজারের দোকানে কোনো পত্রিকায় তাহা দৃষ্ট হয় না। কলে একখণ্ড বিক্রয়ে যেরূপ অল্প বিদ্যোৎসাহী সভার হিতৌষিণী পত্রিকার বিক্রয় হইয়া থাকে। সে পত্রিকার সহিত মূল্যের তুলনায় দেখিলে অপরিমিত বলিয়া দৃষ্ট হয়।"

তত্ত্ব বোধ মূল পত্রিকা 'সুদৃশ্য চিত্র সহিত' আর 'চারি আনা মাত্র'। অন্য দিকে হিতৌষিণী পত্রিকার দাম ছিল এক টাকা চার আনা। 'সুলভ সমাচার' পত্রিকায় (১৮ বৈশাখ ১২৮০ পৃ ৩১২) প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপন থেকে তা জানা যায়।

বিজ্ঞাপন

"১২৮০ সালে হিতৌষিণী পত্রিকা এবং রামায়ণ ডাইরেক্টরী ডিংপুর লোক ১২২ নং মাটিহিত নাসনালের ট্রেডিং কোম্পানীর পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য ১৮ ডাক মাশুল ৮ আনা"।

একটি পত্রিকার দাম চার আনা, অন্যটি এক টাকা চার আনা, এই কারণেই 'সমাচার হিতৈষিণী' সমালো ছিল 'সে পত্রিকার সহিত মূল্যের তুলনা দেখিলে অপরিমিত বলিয়া দৃষ্ট হয়।

ছবির বিষয়বস্তু

আজকের দিনে প্রকাশিত ছবির নীচে, ছবির যে পরিচয়-লিপি ছাপা হয়, —তা নিয়ে ঔনিশ শতকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয় পত্রিকার পাতায়, সংবাদপত্রের পাতায় নয়। আমার আলোচনার সময়ের প্রকাশিত যে পত্রিকার ছবি হাতের কাছে তা ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের। এই পত্রিকার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১—১৭৬, ছবি ছাপা হয়েছে ১৪ টি। এই ছবির মধ্যে কিছু ছবির শিরোনামে ছিল না, যেমন গঙ্গাপূজা (পৃ. ৪৮), রথযাত্রা (পৃ.৭৭), শ্রীকৃষ্ণের জন্ম (পৃ.৯৫), লক্ষ্মী পূজা (পৃ.১১২)।

ছবির উপর নাম লেখা হয়েছে, — 'কুলনারায়ণ (পৃ.৮৯), রাজরাজেশ্বর মূর্তির মুখাবয়ব মূর্তি মূর্তি রয়েছে একটি নীচে লেখা 'আশ্বারোহণ' ও 'পৌঢ়িনারায়ণ'। 'শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা (পৃ.১০৯), 'শ্যামাপূজা (পৃ.১১৬), 'জগদ্ধাত্রী পূজা (পৃ.১১৯), 'জগদ্ধাত্রী-পূজা (পৃ.১২৭), 'রাসযাত্রা (পৃ.১২৪), রটিন্ডী-পূজা (পৃ.১৩৭), শ্রীপঞ্চমী সরস্বতী পূজা (পৃ.১৪১), 'শিবরাত্রি' (পৃ.১৪৮), 'দোলযাত্রা (পৃ.১৫৩)। এই ছবিতে মুখাবয়ব

'আলাওয়ালদ' ও 'সৌদিয়েলেন' — এই ছবি মিলে যাচ্ছে। চতুর্থের ছবিটা আরও স্পষ্ট ভাবে পুরো পৃষ্ঠা জুড়ে, ছবির উপরে লেখা 'সে শাহ্ চে শাহ্ চে শাহ্'। এটাই পুরাণ ঘরের নীচের লাইনে লেখা ছিল —

"একদে প্রথমদের নিশানার বলি।
শিশিরাদের মধ্যে এটাই চতুর্থবলী ও
অন্তিম উৎসর্গ হলেন লর্ডীস হাসদে।
নিশানার অন্তিম বলি ঘটিয়ে তাদের ও
যদি কেহ সেই ঘরে প্রবেশ করে আক্রমণ

করে ও শাস্ত্রের প্রথা ভঙ্গ করে তাহলে
নিশ্চিন্ত ভাবেই মৃত্যু অনিবার্য পৃথা।
সাবধ! আর আর কোক যেন ভঙ্গ করো না
এদের এমন প্রাচীন যুগ থেকেই পালন।
নিশানারী নিশানার ভঙ্গ নাহি পাবা।"

১৮৫৯ থেকে ১৮৯৪ খ্রীঃ এই সময় মধ্যে মনে হচ্ছে কিছু শিল্পীর দুর্ঘটনাই ঘটেছিল ছবি এঁকেছিল লাইনের জন্য নূতন করে ছবি আঁকা হলো। 'অসমাপ্ত' শব্দটার দুর্ঘটনাই নিয়ে প্রথমে কার্টুনটি করা হয় ১৯৮০ সালে, তিন বছর পর আবার একটি কার্টুনও এঁকেছিল, ১৯৯৪ সালে ফ্রেঞ্চের মৌজায় আগমন ঘটেছি কিন্তু এরোপ্লেনের মানুষকে চালাবে

আশ্চর্যজনকই ছবির প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়ছে—এবং এতটুকু আলোচনা দিয়ে এরোপ্লেনই ছবি ডাইনোসর শব্দিকা ও নানা পত্রিকা যেখানে সংগ্রহ করে আনার চেষ্টা করেছি তাদের একটা তালিকা করা সম্ভব হবে।

কলকাতা নিয়ে কত কথা

তরুণ সান্যাল

শহর কলকাতার কবে জন্ম নিয়ে এখন খুব বিতর্ক হচ্ছে। আদালতের জজ সাহেবেরাতো সর্বদিনাশ কাণ্ডারী। প্রতিষ্ঠানিকতার এদিকে রব পড়েছে ওদিকে রব কি রাজে পড়েছে হিসাব কষে বলে দেবেন. এ তারিখ যা ও তারিখ। এ এক অসম্ভব খেলা। কারা কারারি বসতিস্থল তাহলো? আদৌ সেখানে মনুষ্যকুল-কলরবের জন্ম হয়েছিল কিনা, এসবের কথা সাধারণ লোকজন বেশ জানে। তবে সিদ্ধান্ত নাকি নেবেন জজসাহেবরা বেশ?

সত্যি সত্যি ঢাকের বাদ্যিগুলোর ঘুমের পর সিরাজদ্দৌলা নাকি হঠাৎ গাড়ে উঠেছিল, ফ্লাশ ইয়েছিল... ফ্লাশ ফ্রিকোয়েন্সি পড়ছ? নাকি আগেও যে কলকাতা ছিল সরকার ঠেলুয়ারা পত্তন দিয়েছিলেন ইংরেজ কোম্পানিকে, সেইদিন স্মরণ করছে আমরা ভাগ্যবান। বেশ কথা, তবে জলি টুনা কালা (ফুপা) না কলকাতা, না কালীঘাট, গালগোবা না কালী কালী- কোথা থেকে নামটা এসেছে? ঐতিহ্যসচেতনতার শেষ ছিটেফোঁটা ঝেড়েঝুড়ে জিজ্ঞাসা করছে বিধান সভায় আইন পাশ করে বানিয়েছি কলকাতা। ইতিমধ্যেই কবীর চক্রবর্তী খপাই একলা কলকাতার পোক্তা, বৃটিশ সাম্রাজ্যের ঘিরীয় নগরী ও প্রাচ্য নগরীর কালকাটার প্রতিষ্ঠিতা বৃটিশ রাজপুরুষের মূর্তিগুলিকে ওপাশে পাঠিয়েছেন। সেখানে যবেষ্ট জঙ্গল ধুলো পাওলা ইত্যাদি জমছে তাঁদের প্রীতার্থে। এবার কালকাটাও গেল। কিন্তু ইংরেজ কোম্পানীকে যারা আপন নৈতিক সম্পত্তি বেচে দিয়ে কাল কেটে কুটীর থেকে আনলেন। সেই ঐশনিবেশিকতার খোরাকে বহু জনেকের উপযুক্ত বংশধরা, এখন দাবী করছেন — তাদের বৃটিশ রাজিজাকেন্দ্র স্থাপনের সৃষ্টি নিয়ে কলকাতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৬৯০-এর আগষ্ট মাসের ঠের আগেই।

যে কলকাতা নিয়ে আমার কিছুই এসে যায় না। আমার জন্মের পরে প্রেমে পড়া তরুণীটির পিতা-মাতা নিয়ে আমি আদৌ চিন্তিত নই। আমার মুগ্ধতা, বিমুগ্ধতা, আকর্ষণ, ছেট-লাভ সেই প্রেমিকার প্রতি।

আমার এক নিজস্ব কলকাতা আছে। একান্তই যা আমারই। কিশোর পূর্ব এ তারতে জন্মেছিলাম সাবেকি পাকরা ছেলেরা। বলক বয়সের অনেকটা অংশ কেটেছে বর্ধমান শহরে। তারপর কিছুকাল জলপাই, শেষাঞ্চলে। বাঁকুড়া, ডায়মন্ডহারবার জেলার মুফস্সলটি সহরের এক ধনী মুফস্সলিদিগের প্রবে, বাঁড়ার পর ২৩গাছি তারপর থেকে বর্ধমানে এসে গাইপেস কলকাতাতে। তারপর ১৯৪২ সাল থেকে, আমৈশবে বছর বয়স কি দুঃখর থেকে এখনালয়ে পঞ্চাশ বছর।

গ্রাম থেকে কচু-ঘেঁচ-লাউ-কুমড়া-মাছটা-আঁশটা কলকাতার বাজারে নিয়া সাসিল হয়। কোন গ্রামে কোন মাঠে না বাজারে তাদের জন্ম, কে মনে রেখেছে। বিশাল পহর গ্রা করে বয়েছে যাবে বলে। এমনি আমিও কলকাতার তরের বাজারে এসেছিলাম। পদ্মা-মধুমা-কর্ণফুলী-বড়লের পালতোলা নৌকা, পানকৌড়ী, মাছরাঙা পাটিয়াগীর আর হয় গান হয়ে... দুকলমাটির ভালাব-কৃষ্ণ যাত্রা হয়ে। বাঁকুড়ার কাঁকা পাথরে আঁটিতে হয়ে বড়লে একলাই নীল নীল ঘেওনী ফুল ফোটানো ফনীমনসার কথা হয়ে, বর্ধমানের কন্ধ উৎসবের গান 'খোয়া যেতেনা যে, কলাই দাদা আখরে' হয়ে...কলকাতা আমাকে নিয়েছে। 'হয়ে' কলকাতা এসে-ই-আসলে মানুষ অসলত শৃতিকে শক্তিরী করেইতো হয়ে ওঠে!

খুব ছেলেবেলায় যখন বর্ধমানে যাই, তখন আমার কয়েস বছর ছিল। কলকাতা হয়ে যেতে হয়েছিল। উত্তরপাড়া, উত্তরানি - পেড়াগলা, তারপর

হাওড়া হয়ে বর্ধমান। তবে বছর ছয় বয়সে বর্ধমান থেকে পালনা জেলার সেই গ্রাম শেওরাফলায় তখন যাই, তখন আর কলকাতা আসা হয়নি। বাবাও— বৈদ্যবাটি ছুঁয়ে, বাড়ি কলম করে ফিরছি, ... উত্তরপাড়া। ঠিক যখন গাড়ে ব বছর বয়স আমার, দেশ ছেড়ে কবেকে ইয়ে মবেকে ব আর আগে কেরা গ্রাম কবিরেক দান' এর আকর্ষণে হচ্ছে, কলকাতা হয়ে চেনেছিলাম বাবার মুখে ঈকুতাম। সেবার আমার বড় আকেলিয়া হয়েছিল। হাওড়া কলকাতা নাকি ভয়ংকরী ছিল। তাই এখনও সেই কলকাতার ছবি একটু আবটু মনে আছে। সেই আমার বালাস্মৃতি। হাওড়াস্টেশনে নাকি অভিশাপ থাকে। ট্রেন থেকে নেমে শেয়ালদা স্টেশনে ঘোড়ার গাড়ীতে ওঠা হলো। সেকালে মাঝরাত্রে উত্তরপাড়ায় ট্রেনে চড়েছি। আজ যেমন বাস, মিনিবাস, মিনিবাস, অটোরিক্সার অবশ্য তখন তেমনটি ছিলনা। যেতে হবে ভেতরবাড়ি। দুটি ঘোড়া, পিছনে তাদের পালকী গাড়ী, গাড়ীর নীচে ঝুলছে বড়ার ডাল এবং সঙ্গবরত ছোনার ভেতরানো ঘোড়ার দানা। গাড়ী ছুটলো হটর-হটর। মনে নেই সব। তবে মনে আছে শুনিবাম রোড-বাড়িবাড়ান-চৌরাস্তা এসব কোচয়ানের মুখে আয়াগত নাম। মাঝরাত্রে মনে নেই কোথায়, গাড়ী থামানো হলো। ঘোড়া জল খাবে। পৌঁছে গেলাম বোধহয়। ঘন্টা-খানেক পর ভেতরবাড়ি আসার পিসতুতো দিদির বাড়ি। বাড়িটি এখন মনে হয়, তখনকার অন্যান্য বাড়ির মতো বেশ সাজানো-গোছানো ছিল। আলোকমার দিয়ে ঘেরটোপ-টেরটোপে থাকার কথা আমাদি যেত না। কলকাতায় আসিশবাবের আসায় নিশ্চয়ই ছিল দেশের থেকে আলা অতিরিক্ত সাবধান। পিসতুতো ভগ্নীপতি ছিলেন মুইডিশ কনসুলেটের পদস্থ কর্মচারী। তখনতো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তুঙ্গ সময়। তাদের মুইডেন ছিল নিরপেক্ষ দেশ। তাদের কূটনৈতিক কেন্দ্র ছিল সম্ভবত মুম্বাই। কলকাতায় ছিল শাখা। তাদের পাশে বড় পাথরের চৌহাদ্দী। চৌদ্দাচারে গায়ে গোল করে ঘোরা কি যেন। ঘাড়ঘাদনে দুটো সাদেশ না কালকেউটের পাখি। আমরাও আসাকাছি একটা মিষ্টির দোকানে জলযোগ সারলাম, ছা-টোস্ট-ওমলেট-কেক নয়। নিতান্তই ঘিয়ে ভাজা ছোট ছোট্ট ছোট্ট লুচি। একটু যেন মিষ্টি ছোলার ডাল। কোথায় সঙ্গে কচুরীও। কলার পাতায়। পাশে বাটির ডালে জল। ছাত্র ছিলেন বর্ধমান রাজার পদস্থ কর্মচারী। এখন বলে আমন দোকানে পা-ও দিতেন না কোথায়। তখন ছিল আমনি খাবার দোকানে খাওয়ার বাহুতি। বাড়িও ছিল পিসতুলা। গাড়ী চলছিল বটি হটর-হটর। তবে এ রাস্তায় জল নয়, ঘোড়া আর গাড়ীর ঘুমিকে টাল সামলানোর ছড়োছড়ি। ঢাকা একটু আবটু আছে ছিল বলে।

ভেতরবাড়ি পৌঁছে মুখ হাত ধুয়ে আর একদফা হলো। আসা রাস্তায় আমাকে বাইরে নিয়েছিলেন, পরম্পর সুদর্শন ভিলির বাড়ি পৌঁছতে পথের ডানে বেশী মনে আছে তা ভেবে। তাছাড়া খাঁটী কলকাতাবাসী মানুষজনের বিষয়ে কিছুটা জ্ঞান আহরণও ছিল। আসা সেই কবে ১৯১৩-১৪ সালে বি. এল. পড়েছিলেন। সে সময়ের কলকাতা তো আর ১৯৪১-এর কলকাতা নয়। ১৯১৩ সালের দিকে ভেতরা তেমন জনসমাকীর্ণ ছিল না। ছিল আকি নিতান্তই গ্রাম এলাকে কালিঘাটেই ছিল কলকাতার প্রায় সীমানা।

পরদিন সকালে মামার তগ্নীপতি ও ভিলিকে সঙ্গে করে বাবা কালীঘাটের মন্দিরে গেলেন। আমার তা তো মনে আসেননি। তাঁর অনুরুদ্ধ ছেলের জন্য বাসনা ছিল কালীঘাটে পুজো দেবেন। বাবা তেমন পুজোআচ্চায় ভক্ত ছিলেন না। বরং ভোরে তাঁর মুখে কালী স্তব শুনে খুব ভয়ভয়ো। আমরাও নিস্তারিণী হবেই আবৃত্তি করতাম 'এখানে চিন্তায় বিশ্ব ভোয়ানে ঃ ভয়ভাবিনি ... আমার ছোট্ট যেন 'শক্তিতে বন্ধুবন্ধন' বলতে পারছো না। এরাই ছোট্ট সে। বলতে পারতে 'এখু বন্ধুক' – আমরা সবাই তাতে হেসে উঠতাম কিন্তু ঐ স্তব মন্ত্রের মুগ্ধ স্পন্দন আমার কবিতার গান তৈরী করে দিয়েছিল।

কালীঘাটে পুজো দিয়ে দিয়ে সবাই গঙ্গায় বা কালীগঙ্গায় স্নান সেরে নিলেন। তখন কেউ টিনির মন্দা বা অনিমিষা বলছো না। ঘাটের ডান দিকে পাঁচিলঘেরা মেয়েদের কাপড় কামানোর জায়গা, বাঁদিকে পুরুষদের। সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসতেই সব দিয়ে ঘনে আছেন পুরোহিত-পাণ্ডারা। হাতে তাদের লাল চন্দন ছাপ দেবার পঁচালপ। আলা

ঘরীদের পোশাক-আশাক, জুতো-টুতো লক্ষ করেন। বেশির ভাগ দেশ স্বাধীন। অনেক মানুষ জ্ঞান কমছেন। বয়স পড়ছে। ঘাটে বসে পুজো-টুজো, বেরোয় ব্রহ্ম-টাহ্মোও হচ্ছে। এখন তাবাই যায় না, আমিলারা এই সেদিনও কেলনটি ছিল। ১৯৪৭ সালেও একবার তার মনে কালীঘাটে এসেছিলাম। সে ছিল সাম্প্রদায়িক হানার সময়। দেখেছি কালীদাসা বা আমিলারা স্বাধীনতা। আমার মাইনরী কলুষ কলঙ্কিনী নয়। তখনও ছিল তরল তরল।

সেদিন তো আর যেন কোনো কাজই নেই। আগের দিন ট্রেনের ধকলের পর সারা গেহে জ্বর বেরেছিলাম পাওয়ারের জ্বরে। কি কাও একটা পাঁচ মোকাবেলাই দৃষ্টির মতো কম-কম করে নেমে এল। সব ঘরের পাশেই পায়খানা। সেখানেও একটা শিকল টানলেই হু-হু করে জল এসে সব নোংরা ভাসিয়ে নিয়ে যায়। একবার করে মাথার উপরে শোয়ার বাল্বটি জ্বলে ওঠি, শিকল টানি, আর পঞ্চান ঘুরে যায়। কি চমৎকার! একটি জ্বলের পাওয়ারে জ্বল করি আর ভাবি।

পঞ্চাশের সময়ের একটা রাস্তা থেকে অনেক কথা অনেক গান শুনেছিলাম। সুরমিলি বাবাকে শোনাচ্ছিলেন কথা, গান। সেটি নাকি রেডিয়ো। বৃটিশ সৈন্যরা তখন রাস্তা জুড়ে প্রতিদিনই 'সাহেবের সঙ্গে সন্ধ্যেবেলা' করছিল। বাবা জিজ্ঞাসা করছিলেন 'বুঝতে পারিস'? আমাইবাবু বললেন 'বুঝ চেষ্টা করেছি শুধু শব্দ এসে মনে লাগে ইবিয়ে বাদ'। তখন বুঝিনি এখন বুঝি, আমেরিকাতে মুক্তাঞ্চলের কথা হচ্ছিল। রাতে একটা মোরগ টিপটপই ঝলমল করে ওঠে বাড়ি। এ যে কলকাতার গল্প রাজপুত্র ঝাঁপি নামলেই ছুটি হয়ে যায় ঝাঁপি তুলতেই গুনগান অন্ধকার আগে তো আমি বিদ্যাসাগরি দেখিনি।

আমি একা একা ঘুপুরে সারা বাড়ী ঘুরি। ওরে ভাই বাইরের দরজা খুলি। রোদ ঝলমল করছে রাস্তা। পাশে ভেরা কয়েকটি ছেলে খুব হুড়োহুড়ি করে মারবেল খেলছে। ভেতর বাড়িতে মাথায় টাওয়ার পাখা ঘুরিয়ে দিদি ঘুমুচ্ছেন। বাবা ও আমাইবাবু অফিসে নেই। এইতো সময় আমার রাস্তা থেকে গান শোনার। দেখেছি দরজার একপাশেই রয়েছে হাতের আঁকিবুঁকিতে বাঁধা রাস্তা। আমি এদিক ওদিক তাকিয়ে রাস্তায় হাত দিই। মনে সমস্ত শরীরে ঝাঁকুনি দেয় কি যেন। আমারই হাত সরে যায় আমার। আর হাত বাড়াইনি। সে আমার আধুনিক শিশু-সন্তানের আগমে পেতে পেতে হারানো পাওয়া 'শক'।

কলকাতায় এসে তখন অবশ্য ছেলেমেয়েরা দেখতো ঢিড়িলাবনা, ভালুকের। বোরখা, বিভিন্নপুর ঢক, হাতিরাগানে খেলা পড়েছিল বলে, যুদ্ধের সময় ঢিড়িলাবনা, ভালুকের বন্ধ থাকতো। মাঝে দেখেছি বাস্তার যাদো সব আশা ঢাকা। কালেভদ্রে একটু আধটা এসে পড়তে, রাস্তার দেখেছি রাস্তার এখানে-ওখানে ঝাড়ীর খুব ঢাকা দেয়াল। জানলার কাছে মাস্টারমশাই কাছে কাগজের ঠিতে মাটি। কলকাতা আমাকে তার ঝলমলে খুব দেখাতে না দেখতেই খোকটা ফেলে দিল।

ট্রামগাড়িতে সকাল সকাল যাওয়া হওয়া। এবার ছাকড়া গাড়িতে নয়। মোটর গাড়িতে। ডক্টিপটির অফিসের গাড়ি দেখছি। গাড়ির ড্রাইভারের চেহারা পোশাক আশাক সবই আমাদের চেয়ে অনেক। পরণে পা ঢাকা প্যান্ট, গায়ে গোঞ্জা সার্ট, মাথায় পাগড়ি। তবে সেগ গাড়িটা গাড়ি। গ্রামের বাড়ির যেমনটি ইশারার বাড়ি দেখেছি। তারপাশে আমার-কালের ডক্টিপটিকে মনে হচ্ছিল কাগের ছানা। ভোঁপ-ভোঁপ করে গাড়ি ছুটছে। আমাইবাবু বলছে তখন বলছেন 'দেখছেন মামা, কি কাও। বুঝছো, তোমের কি? দেখুন ফুটপাতে পলপাতা রাস্তেছে, বেরোয় রাস্তা পোড়াইনি তেমন করে'। বাবা বললেন 'কেন, ডোমযোগ্য তো সৌ-সৌ রাস্তা পোড়ার শব্দ শুনেছি'। 'ঐ শুনেছেন! এখন আমার অফিসীদের একজন ঐ রাস্তা পোড়া মানুষদের মাথার কাছে। বলছেন না, একদিকে 'ভুইট ইন্ডিয়া' অন্যদিকে 'ভাগলপুরে ভগতে হবে'। এ যে 'পাঁচের কারাত'—মামা বলেন শেষ জমীদার, আমাদের সেই ১২-১৩ সালে পক-মোক ঘোড়াগাড়ি টানতো, পিছনে একটা ঝাঁড়ারি নিয়ে জল ফেলতো। ডিহিরাও সকাল বিকালে জল দেয়তো। অফিসে টানা পাখা ছিল। পাখা পুলার টানতো। একবারটাতে

দেখছি প্রায় সবার মাথায় ইংরেজটুকি ফ্যাশন যে। হোমরা চুমরা ছাড়া আর ছাতা।

গাড়ি স্টেশনে পৌঁছল। বাবা বললেন, 'ঐ দেখ দেখ গৌরাঙ্গ-গৌরাঙ্গী দাঁড়িয়ে এরা। হবেরই তো, উপরে পড়াশুনা। আর এটা হাওড়ার নতুন ব্রীজ।

নতুন ব্রীজ ? কলেজি বাচ্চা সবগুলোর মোদ্দে ঝক ঝক করছে ব্রিজ। তখনও তার কাজ শেষ হয়নি। একেবারে বুড়ি ছুঁয়ে উত্তরে লম্বা ঘাসের শেউলেজা টাটকা কি একটা। জানাইবাবু বলেন 'বেলুন ব্যাপোর'। বেলুনের বাঁধ। জানাদি কোম্পানি আটকাবার ফন্দি। এখনও চোখে ভাসে সেই ব্রিজ।

জানুয়ারি ১৯৪৭। সেবার ছোড়দার সঙ্গে এসেছিলাম। মামার পড়ার। পেয়ারলেস নেমেছি। মনটা ভারী লেগে। খুব কাছেই। মা-কাকিমা সবাই আছি। ছোড়দা আমাদের গাইড। তিনি তখন বিপন কলেজে পড়েন। তরুণ সাম্যবাদী কর্মিউনিস্ট। গ্রাম হতে কবে সাম্রাজ্যবাদী প্রচার চালান। তিনি ঘোড়ার গাড়ি না নিয়ে নিলেন ঘুটি রিক্সা।

রিক্সা ডাকতে গেছেন তিনি বোধয় ডানদিকে রোডের দিকে। আমরা তিনজন ট্রাম রাস্তার পাশে, ফুটপাতে দাঁড়িয়ে। ঘুটি বড়ো-বড়ো এরোপ্লেন কাছের কাছে এসে এ-ওকে চোখ টিপছে করে। দিদীরজন প্রথমজনকে বলে, 'এ যে দি-দুই। মা মহিলায় মাথায় সিঁদুর দেখছিস না! ও তখন অনেকেই ফেক নিয়েছে, দেখি রাস্তাদিন লিকেই মুক্তাদের নজর, 'দেখছ তোমার বয় কি? ভারি তখনতো দেখো, নই। ঈতিহাসতো বওয়াত ভ্রান নাইবে পড়ি। বলি কি দরকার? দরকার আছে, হে ছোকড়া। লাল চোখে প্রথমজন বলে। আমি তবু ছেলে — ভাবি। 'কবুন কি দরকার।' ইতিমধ্যে জনদুই তরুণ কাছে এগিয়ে। কথাবার্তা ঘুটি-পাল্টাপাটি পড়া। প্রথমও দোমড়ুটির দিকে কটিমটি করে তাকায়। একটি পুলিশ দাঁড়িয়ে কাছে আছে। ওরা লোক দুটি দেখিয়ে যায়। ইতিমধ্যে ছোড়দা ঘুটি রিক্সা নিয়ে হাজির। পুলিশটি বলে, অল্পবয়সী মেয়েকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখে গেছেন, এমন সময়ে! তরুণ দুটি বলে — আপনাকে চেনা চেনা মনে হয়। ছোড়দা বলে আপনাদেরও। ও দুজন হেসে ওঠে। ঐ-যে রীপনে আপনাদের পেটাতে নিয়েছিলাম আমরা শ্যামবাজারে। খুব মারপিট হলো। ছোড়দা বললেন তার ফ্রন্ট ওপরে দেইতো কাটা দাগ। ছোড়দা আর সেই দুজন তখন পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে চলেছে। একজন সিগারেট ধরাতে নিয়ে, ছোড়দাকে দিতে যায়। ছোড়দা বলে, 'না'। সিগারেট ওটিয়ে নেয় সেও। তিনজন যেন কত দিনের বন্ধু। ক-মিনিটের মধ্যে তিনজন পৌঁছে গেছ আমাদের। দু-জন তখন বলে 'আই তাই আর বিশ্বাস করছেন না তাদের, দেখছেন না মেশটা ভাল করে দিতে কেমন এক পায়ে খাড়া, আমাদেরতো বাবা চাইবে, তবে বলি 'ঈশ্বর না পাথরের মূর্তি'। ছোড়দা থেমে যান — পরে কথা হবে। মনে পিছনে ধলাধলি করে আর কে বাঁচিয়ে বলে, সেবার কালেক হলো পাশাপাশি এক সাথে সব ভুল।' যে বাড়িতে ভেলেমার, গৃহকর্তা আমার বাবার মানতুতো ভাই। ঋনু ব্রহ্মচারী। তিনি সস্ত্রীক সবাইকে নিয়ে গৃহদেবতা উপাসনায় বসছেন এবং ভুল বুঝে। আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার। পাইতেন। ভুল দুপটা অবশ্য ঢের পরে বুঝেছিলাম। তখন আমরাদের ছেলে ফাউনটেন পেন ও কোড়াক বক্স অ্যাবেরার আমদানি হয়েছে। ঐ কারণে এক ছেলে এক দরজায় বিজ্ঞানপন্থী পণ্ডিতের ছবি তুলে তার পার্শ্ব বাটিতে আর পা পড়ে না। কিন্তু ফিলম্ ধুতে দেবা পেশ ফুরিয়ে এটেনি। ঐ ফাউনটেন পেনের নিব পালাতো হাতেল কলম আমরাও পেটা দুই হলো।

সেবার কলকাতায় আমার প্রথম ভোর দেখাতে। মেডিকেল কলেজে ভোর দেখানো। মা বললেন — তাদের কোনো চোখের ডাক্তারকে দেখিয়ে নিয়ে, চল বাড়ি ফিরি। ছোড়দা আর তার বন্ধু ডাক্তার সন্তানী ছেলে ধরে। 'জনপথের কাছের ধর্মিষ্ঠ সরকারের। আমরা জনপথ জনপথ বলে গলা ফাটিয়েছি। আর আমাদের খু পয়সা আছে বলেই হাসপাতালে চোখ দেখাতে যা? এটা কার্যে কথায় সত্য আমীমাংসা হলো না। অগত্যা মা ও কাকিমি আগেই ছোড়দাকে চড়কগাছ করে ঘুরুলহাটি ফিরে গেলেন। আমি রইলাম ভিক্টিম

কলকাতায় আসবার কয়েকদিনের মধ্যে পরিচয় পাঁচুর, আমাদের মো-তে। বয়সেও সবচেয়ে ছোট। আসবার ছোটোদের ছিল আগে ভূগে ছড়িয়ে। ভেতরে-বাইরে চারদিক থেকে ঘিরে নিয়ে একঘরকে মাত্র। ছোটোদের খেলার নানা উপকরণ। ঘরের ঘরণ ছিলেন একলা বিরাজমানী। প্রবলই পুতুলীপুতুল রাজত্বের গল্প বলতেন। তাঁর আসবার সিনেমার ভুবনেও একসময় যাতায়াত ছিল। এঁর ছোটোবাই রাষ্ট্রীয়তা আন্দোলনে জাতীয় শিশুর অবস্থানের কথা ভেবে, কবতু গড়েছিলেন কালোবাটা কেমিক্যাল— বীরেন্দ্র মৈত্র। ঢাকার সবচেয়ে রাজেন্দ্র মৈত্র সপরিবার ঢাকায় বি-এস-সি পাশ করে জামেদপুরে এক রাসায়নিক কারখানার নিযুক্তানবিশ হয়ে চলে। বাংলা পাসন তখন জাপানীতে। আমাদের দেশে প্রাধান প্রীতির দীক্ষিনের। শুধু 'মোক্ষমুলার বলেছে আমি নয়, নানা তারে তাঁরাদি মন্তব্যিত জাপান সরকারের ইচ্ছির ছিলাম না করেই, তার প্রতি প্রেমে লক্ষণ হতো। যা আসা সেই আডেরিক আহ্বানের পর. বুড়ি বালাদের তীরে বাপাবতীনের পরীক্ষ হওয়া. 'পথের বাঁধী' সরকারীর জাপান অন্ত সংগ্রহ করার প্রচেষ্টা, রাসবিহারী বসুর পথর মন ইত্যাদির— জাপান সহযোগে দেশবহিলীতে বিপ্লবের ভাবনা এসব খুব বাড়া দিয়ে। বাই হোক রাজেন্দ্রবাবু বৃদ্ধ বাপাতেই ইতস্তি হয়ে. প্রায় রাতে কেবলভাবে যেন তারতে দিয়ে আসেন।

ঐ বাড়িতে থাকতে থাকতেই বাই কবিতাই কলকাতাতেই ছোটে। সাহস করে ছেলেদের পত্রিকা 'কামধনু' অফিসে যাই। পাশেই ছিল তার ট্রামের মেশিনের ছাপাখানা। সেই প্রথম ছাপাখানা দেখা ঘটিল ঘটাং করে মেশিন ঘুরছে এ পৃষ্ঠা ও পৃষ্ঠা। কিছুং বয় পাতের চাপে ঘুরছে চাকা। সম্পাদক ছিলেন বিভিন্নজনবাবু তাঁরাদি। আমি ঐ পত্রিকারও গ্রাহকও ছিলাম। দিয়ে দেখি, আমার তখনকার কাঁচা হাতে লেখা কবিতা একটু-আধটু ঠিক ঠাক করে উনি ছেপে দিয়েছেন। ছাপা অক্ষরে সেই আমার প্রথম নিজের নাম দেখা। দেশবিভাগের সম্ভাবনায় আর, সাম্প্রদায়িক ভাবার দিক এক বিশ্লেষণের লেখা সেটি। নূতন যুগের আমি। সে আমি অবশ্যই স্বাধীনী সুভাষচন্দ্র সেদিন ঘোষণা এক কাওয়ী। তাতে একটি পঙ্‌ক্তি ছিল সব অবহেলি ধরে থাক হাল নূতন যুগের আমি, সেই-যে নিজের বুকিত নাম লেখা যায়। কবিতাটি হয়তো দশজন পড়ছে ভেবে আরো কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলাম ঐ পত্রিকায়। সব কবিতাই কিশীপ্রসাদ ছেপে আমার শিশু ও মুগ্ধ ছাত্রজীবন অন্ধকার করে দিলেন। ঐ বাড়িতে এই সময়ে পড়লাম। জাতীয়তায় প্রাকস্টাবায় রাজনৈতিক স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা তাঁর সাহসে সমাজকে রবিক ইতিহাস বদলের সাধন চলাকালীন এলি করে ফেলেছে। রাজনৈতিক বা সাহিত্যক্ষেত্রে সেই থেকে যে অস্থিতি চলেছে। এই বাড়াতে-চুরাতে বছরের তা শেষ হলো না। তারপর বিরোজ পাড়ী, বন্দনাদেবক, ইন্দিরা গান্ধী শেখ মুজিবর রহমান, রাজীব গান্ধী এই দক্ষিণ এশিয়ার কত রাজনীতি-না পরীক্ষ হলেন আমাদেরই চোখিতে। ঐ সময়ে কিছু খুব মাতিশয় ঘটনা আছে প্রীবনের। তখনতো শরীরের কোরক শীরপত্র খুলছিল। মনকারাগারেই সে জ্ঞান পেয়েছিলাম। আলেইয়ের সংখ্যি বাহারো সালে মনকারাগার পড়াতে আসা। তারপর এখানেই বিয়ু হয়ে যাওয়া। সেও তো মন্ত্র রাত্রিবী। ১৯৬৫ সালে মাটির বেহালা নামে দীর্ঘ এক কবিতা লিখেছিলাম। তখন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পড়ি। সে দিন একটি সম্মেলন হয়তে গেলাম, বইটির নাম 'প্রথম সভা জাগানো কবিতা' তাতে ঐ কবিতাটি পুনর্মুদ্রিত করেছে দেখলাম। তার শেষ পঙ্‌ক্তিগুলি এরকম —

তবু আমি কাঁদি, তবু কেঁদে ফেলব এখন
জলই/জলপাতার ঘুমের মৌরা আছলন
মাটির দু-হাতে চেহে মেটি ছপ্পা,
ইটিয়ে, মানুষের জন আসেছেই বর্ষায় ফুল
ওঠাবে, ঘুমুক্ত পাখিদেরা ছবে/
ছেলেরা ওখেলবে ফুল, খেলবে ছেলে
মাটির পুতুলের পাঁজর হয়ে পাশে পাশে,
নাবিকের বিশ্বে কথা ওবে পাঁচাই
পৌঁছবে ছবে ছেলে ফলকে ঘুমুর ঘুটায়/
ছেলেরা ফুল ফুটি ছিটাবে, তবু তাদে
আমিনে মনছনে। আমি ফিরে মনবেন,
আমি মনবেন, হবে আবার/আমার
পৌঁছবে পাঁচাই দু আমার মাটির
ছেলেদের মাটির পুতুলে তার আবার-ছবে
ফুল ফুটিবে আবে /ছবে ওরা ছবে বৃক্ষ

অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল। আমি যেন আমি নই, কোনও অচেনা জায়গা থেকে / আমাদের বাড়িতে এক বেড়ে বসবে আপনাকে পড়ি / আমি কিন্তু ভুলি নিজ মুখেও ভুলিনে সে কে /আমরা অনেক ঘরে বিছানাটি চিনতেই পারি। আমাদের দোরগোড়ায় কোথা আসবে ও কী করে একদিন/আমাদের অজান্তেই কে এসেছিল ঘরটির মোহানাও ফাঁকা ও ফুটিয়ে কিংবা আমার বা আমাদের জিনীয়/ নিজেকে খুঁজে, খুঁজে দেখে দেখিনের আলো। আজ হলো, ফেরা নেই, আমি ঠিক যেমনের মতো আমার মুখোমুখি আর দেখনের দর্পণিক ভুলি/ঠিক যেমনের মতো, সময় বলে আর মুখে ও নিজের আজকে আমি শুধু আজকের এটি আমি ভুলিনে মাজা, আর হারানর সাজ করে পালা/ নিজস্ব নিজের মতো ফেরে ফেলাতে আমির খোলস।

কলকাতা বিষয়ে লেখার কি শেষ আছে ? এই পত্রলেখী মনে হয়েছে ঐ লেখাটাই।

কলকাতা কবিতাটা প্রেমে খুব এটি খুলা আমি আমি/খুলের আলোক পাতে হাল হয় ফোন কাজের গাত্র আমদি পথাদ আমি কাজের উত্ত আমার আলোটি নিজের নিজের খুঁটি দুর্দিনের পাতুলে তুচ্ছাত অন্তর শুধু, পথী আমি কে দুই আমাতে দুপাশ গুচ্ছও প্রেমে মৌখন্ডিল প্রবাদ বিশ্বজনা দুজনে ঢাকায় সাদা, আলোকাতে, আজ বা বৈশাখে একইভাবে শেষ তবি নাগরিক যৌবনের দেনা।

এখানে যা একেবারে কাছ থেকে দারিদ্র আলোকে / আমি এই কলকাতার দুপাশের নকল আলো/আলো না দেখলাম যেন আলোকেই দুর্ঘিসাথে আকে ছেড়ে। পায়ারার বিদ্ধ গোডলিয়াতে চলবার আগে।

আমুতলাল মেশ-বিদেশের কাছ এসেছিলেন দুর্ব চিনিয়েছে কলকাতা। খালি নিয়েছে, আদর দিয়েছে, প্রেম দিয়েছে। নিজে নিয়েছে স্বীকৃতি দিয়েছে এত ও সম্মান দিয়েছে এতকিছু সত্যকারের, কিন্তু মানুষের কাছে বিশ্বজনের আর কোনও তুলনায় কলকাতাই। অনিশ্চিত ও দিয়েছে

চলমানতাই মেই। আমার চলিশে বেশ বছর। আমার বাকি চল্লিশটি কলকাতাতেই থেকে যেতে চাই। গ্রাম থেকে উঠানী মুলিয়াতে নদী পর্যন্ত পুল-কাতালাতার কল থেকে এসে আমি এক নতুন কলকাতায়, যা কলকাতায় নবযুগের ছড়াছড়ি আর অনুদিনি বেরোনি কথা বাড়ুক আমি অনিবার্য, ঘটনাগুলো প্রথা সৃষ্টিশীল চুক্তির মেলার ছাড়া বেরুবার অবলোকনি, চমৎকার কৃত্য কাজগুলো। কৃত্য আমি ঘরার শুটিয়েমাসিতায় আর শিক্ষক দুঃখী দুঃখ যেন না দেখি, না দেখি এসে যেখানে মুহূর্তের দুঃখ। গুরুত্বীন ক্রিস্ট নিবন্ধাপন। পাশের মুখিনমিনিকরণীয় আলোর আসে, আর আজ নিজেদীন এক বাড়ির নামল, যেখানে বিশ্ব এক স্বীকৃত নিজের কলেজ।।

কথা থেকে কথা

কথা বসুমিত্র

মাঝে মাঝেই আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া কিংবা ওয়েবসাইটে ঢুকে কিছু লেখা পড়ি। লেখা মানে ওপরে ওপরে পড়া। পড়ার পর মনে হয়, লেখাটা ভালো হয়েছে। লেখার ভাষা সহজ, বিষয় নিয়ে লেখক যথেষ্ট পড়াশোনা করেছেন, তথ্য ঠিক আছে, লেখার মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা আছে, লেখক নিজের মতামত জোর দিয়ে বলতে পারছেন, লেখার শেষে একটা সুন্দর সিদ্ধান্তে পৌঁছনো হয়েছে। এরপর আমরা লেখাটা লাইক করে, শেয়ার করে, কমেন্ট করে পাশের লোককে বলি, লেখাটা পড়েছ? দারুণ লিখেছে। আমরা ভাবি, লেখাটা পড়ে আমাদের জ্ঞান বাড়ল, আমরা সমৃদ্ধ হলাম। কিন্তু আদৌ কি তাই? লেখাটা পড়ে আমাদের কি সত্যিই কিছু বাড়ল? নাকি লেখাটা পড়ে আমরা শুধু ভাবলাম, লেখাটা পড়ে আমাদের কিছু বাড়ল?

একটা উদাহরণ দিই। ধরুন, লেখা, লেখা, লেখা ... । ধরুন একটা লেখা, নদীর স্রোতের প্রায় ...। কিন্তু ঠিক আর লেখা যায়? প্রায় পুরো তো মেরেই দিয়েছি। তবু আমরা কম্পিউটার প্রোগ্রামের অ্যালগরিদম আউটপুট দিয়েছে। অনেকটা ঐ একই ব্যাপার। টাকার এদিক ওদিক হয়তো। এই একই হল। টাকার এদিক ওদিক হয়তো। এই একই হল। টাকার এদিক ওদিক হয়তো। এই একই হল

কাগজের বেডিং ... । আমেরিকার প্রচুর গণ্ডগোলী শৌখিন গেছে। শুধু বুক জাহাজই নয়, প্লেনে ভাইজাগ যেন। বুক হবে। মানুষ নয়ে! কিন্তু পৃথিবীতে শয়তান তবু চিরকাল থেকে আসে। সেই আদিম কাল থেকে সন্ধ্যাতারা দুলবার সময় পর্যন্ত একই কথা।

রাত্রিরের ঘুম কেড়ে নিল ছাত্রদের চিন্তার জন্য। ঘরিকে সহোদর ঈশানদি আমার ছেলেটা আর সহোদর ঈশানদি আমার ছেলেটার বউ, গত বেড়ালবারীর পেছে সব। মানের বিয়ে হল কলকাতায়, সেখানেই ছেলেমানুষ বুজানে এখন আমেরিকায়। ছেলের চাকরির সূত্রে ওরা আছে এখন সান্ফ্রান্সিসকোতে। নিউ ইয়র্ক থেকে হাজার হাজার মাইল দূরের ক্যালিফোর্নিয়ায়। তারই একটা ছাত্রদের সান্ফ্রান্সিসকোতে। ওরা টেলিফোনে বলছে, ই. বেলা এ লিখছে, ভাল আছে। প্রচুর পুলিশ নিয়োছিল ছাত্রদের। শহরেটে পাসপোর্ট নিয়ে বেরোতে হচ্ছে। কিন্তু কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে ওরা ভাল আছে। ওরা বেড়াচ্ছে, গেট-টুগেদার করছে। গাড়ি নিয়ে ঘুরছে। ডিজনিল্যান্ড এ, হলিউড এ। ওরা বলছে, আমাদের এখানে এমন কিছু নয়, তোমরাই শুধু ভয় পাচ্ছ! আফগানিস্থানের কাবুলিওয়ালার কথা মনে পড়ে। 'খোকী তোমি শ্বশুরবাড়ি যাবে?' রবীন্দ্রনাথ ওঁর সাহিত্যের জনতিত্রে এই কাবুলিওয়ালাদের চরিত্রিনিধি রহমানকে অমর করে গেছেন। আজকাল কলকাতার ট্রাফিকে সেই বিশাল আলখেল্লা পরা মেওয়া ওলা কাবুলিওয়ালাদের আর বিশেষ চোখে পড়ে না। তবেছি, যে সব কাবুলিরা এখনও টিকে আছে, সুদের কারবার করে তারা নাকি এখন মুটের মুটের মালিক। আমরা তাদের দেখেও চিনতে পারি না। সারা পৃথিবীর লোক ছড়িয়ে কলকাতার রাস্তায়ে, কেউ ইংরেজ, কেউ জার্মান, কেউ ফ্রেঞ্চ, কেউ আইরীশ, কেউ রাশিয়ান, কেউ আমেরিকান, কেউ অস্ট্রেলিয়ান, কেউ আফ্রিকান, কেউ জাপান, কেউ চাইনীজ, কেউ পাকিস্তান, কেউ আফগান, কেউ পাকেটাইন ... এর মধ্যে আমাদের ছাত্রে চিনব কাকে?

কলকাতা! তুমি বড় উদার যে সবার জন্যেই তোমার মাটি, সবার জন্যেই তোমার চুলি, সবার জন্যেই তোমার আকাশ ...। প্রচুর অভিজ্ঞতা তোমার হলছে ... । প্রচুর কার্ল-ডাইভারসিটি ...কি দারুণ পলিটিশন

লক্ষ লক্ষ গাড়ি তোমার বুকের ওপর ধুলো উড়িয়ে চলে যায় ... মানুষের ভিড়ে মানুষের আইডেন্টি কে কোন দেশের, হিসেব নেই। ডিপিটীর জ্বালায় ফুটপাথ-এ হাঁটা যায় না। অনেক লম্বা কালো, ভগবান একেলো, রুপোয়া পাঁচলো ! তবু তুমি কলকাতা, আমাদের চির কলকাতা। মসজিদ, মন্দির, গির্জা সবই যে তোমার। কেউ চাইছে ঢাকা, অলী, দুর্গা পিস, কেউ খোদা, আল্লাহ, ...কেউ গড় যীশু ...। সবাইকেই তোমার সমান চোখে কলকাতা ... ।

রাত্রিরে ঘুম আসে না। সেই ঘুম না আসা অবস্থার ট্রিগিটিগি চিন্তার জাল কাটিতে কাটিতে বারুদ টেন্সন্স্ এ ঘুমাতে ঘুমাতে যেন কলকাতাকেই বন্ধু করে নিতে হয়। পুজো সংখ্যার লেখা নাইলে শেষ ও ভো হবে না। ইন্দ্রমুনিয়ার ভোগার চাইতে বলব টেনে নেওয়া অনেক স্বস্তির ব্যাপার। এই রকম লিখতে লিখতেই পুজো সংখ্যার আমন্ত্রণ লেখাগুলোর চাপের বোঝাটা আস্তে আস্তে শরতের নীল আকাশে ভেসে বেড়ানো হাল্কা মেঘের মতই হাল্কা হয়ে আসে। স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়তে থাকে। আর সেই মুহূর্তেই এক রাত্রিরে সাঁতারের আলমারীর ভেতরের লকার এর ছোট্ট লকার আমার ভেতরে ছাই ফ্রেঞ্চ ফাদুর পাশে আছে এক ফরাসী। লকারের সঙ্গের আরেক টিনটা আমার ভেতরে গেঁথে যায় ভেতে ইঞ্চি। আসলে এসব চিন্তা আমার নিজে আলমারীর ভাল্যাটা খুলে আলমারীর নীচের তাক থেকে কিছু খুঁজতে গিয়েই এই শক্তি। রাত তখন সাড়ে দশটা। হঠাৎ ভেসে গেল মাথা। মনে হল ভুল করতে করতে আমি ভেসে চীৎকার করি

ফটিক চাঁদ! ফটিক চাঁদ!

এই ফটিক চাঁদের কলকাতায় এ বাড়িতে আমরা পেয়ে আছি। দশ বছর বয়সে এসেছিল কাছে, এখন সে সব কিছুতেই একপাশে। সেই ছোট্ট ছেলেটা আস্তে আস্তে বড় হল। ওকো, মাস্টার খেলা, লাট্টু ঘুড়ি, পোড়া, মেয়েদের ঘুড়ি, এঁচোড়ের ডালনা থেকে ফ্রাইডরাইস্, বিরিয়ানী, কাবাব, টিকিটিকের সব শিখে গেছে।

ওদিকে আমার কন্যার নিজের জন্মস্থলটিতে ফোন্সানীর ও একজন শিকার। কোথায় না ছুটছে আমাদের ফটিক চাঁদ। ফাটাফাটী ইন্টারন্যাশনাল্, মিষ্ট সেক্রেটারিয়েট, পোস্টার কেটে, সব ওর মুখস্থ।

আমার কাকার ছুটির মেয়াদের শেষদিকে বোনাস ঘোষণা, কাগজের অফিসে সেই ঘটিক ঠিক ঈদের বড়দিনের পরে, ফাঁকিবাজির সংস্কৃতি। ঘটিক ঠিক ঝুড়ো সেদাই থেকে ছুটিগুলো সবসময়েই ফাঁকি। ঘোষণা হলেই এইটা বন্ধও হয়ে যায়। আবার টি ঠিক দিক্কিরী, আসলে মিস্ত্রিরী.

কয় আমাদের ঘটিক ঠিক। আমার ঠৈয়ামেটীরে ছুটে এল ঘটিকঠিক

আমার কথা নিজের আজ ঠিক বন্ধ সময় কোথায় ঠিক, এলে দুজ নিয়ে যায় আমাদের ঘটিক ঠিক ছুটে নীচে গেল। রাহে ওমুদের দোকান এখন সব বন্ধ হয়ে গেছে। শুধু একটা খোলাই খোলা আমাদের ডাক্তারবাবু একটা ঘোষণা বন্ধ করে চলে যাবেন। তখনো ঈদের পাবেন না। ডাক্তার সাবুর একটা জিনিসী দেই। অনুষ্ঠ আমাদের ফটিকঠিকের ফার্স্টএইড এর পর আমার দুলো বেঁধে ছুটিয়ে চল ডাক্তারের কাছে.

একটা লালিত্রের ভিতরে ঘোরে-ওয়ে আমার দুল ফোটে, ফুল নিয়ে কাদিয়ে ঘোর ইঁজি গাইড ফটিকের ঘোরেরের চক্ষু দুল, আমার বিশাল ব্যান্ডেজ। প্রচণ্ড ব্যথা। আপুকুলের দুক আর কন্ত এর দুক নিয়ে আর দু টো হয়ে লাগল। নিস্তব্ধতার মাঝে কাদিয়ে মাঝা ঘোরে ঘিং হয়ে ওরে ঘোরে যাবে। ঐ মাঝ ওপাশ ঘোরে পাশেই ঘোরে হয়ে এ। এই অবস্থায় নিয়ে এল ঘটিকঠিক ওরে। পাটা দুয়েক ঘোরেরীলায় ঘোরে ওলাম করে অনেক নিরাপদ। আমরা দু ঈশ্বরাঘোরে ঘোর ঘিং হয়ে ওরে ঘোরে যাবে।

ঘিং ঘুরেক পর, ডাক্তারঘোরেরের পাড়ার ডাক্তারের ঘোরের ঘোরে অনুষ্ঠ নিলেন। মাথায় হাইয়ে ঘোরেই বললেন, ঘি সাংঘাতিক! ঘটি সরুর দুয়ে, দুয়ার লাইন

ঘোরাঘোরেরের ঘুটিয়ে ডাক্তারও নিশ্চয় পড়ি আর ঘি? তাই ওলাম হাতে দু আর ওরে ... কথা ঘোরে ওরে

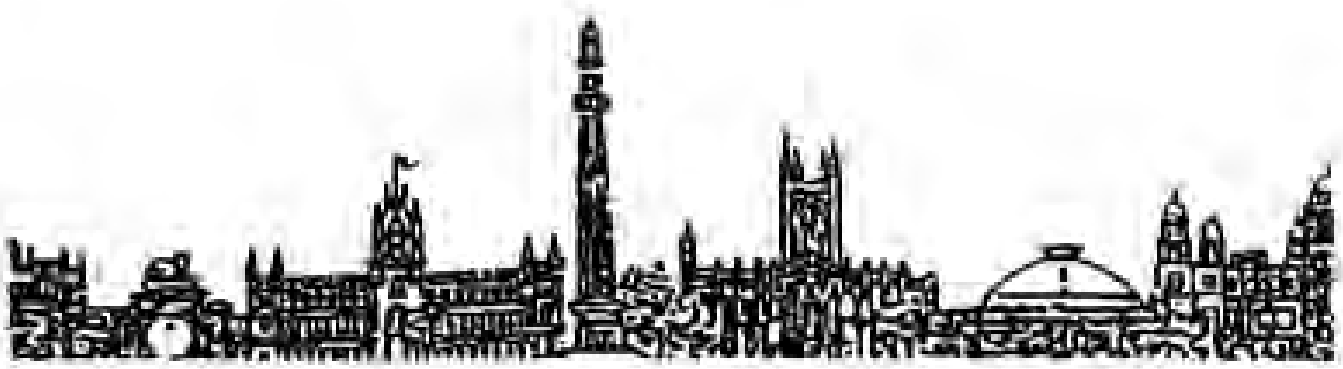

গল্প পড়ুন

দেবতার জন্ম

শিবরাম চক্রবর্তী

বাড়ি থেকে বেরুতে প্রায়ই দেরি হয়ে যায়। প্রথম পদক্ষেপেই পাথরটা তার অস্তিত্বের কথা প্রবলভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়। কদিন ধরেই ভাবছি কি করা যায়।

সেদিন বাড়ি থেকে বেরুবার আমার যেমন কোনো তাড়া ছিল না, অন্তত ঐরকম ভীষণভাবে অকস্মাৎ ধাবিত হব এমন অভিপ্রায়ও ছিল না আদৌ, কিন্তু পাথরটার সংঘর্ষে আমার গতিবেগকে সহসা এত দ্রুত করে দিল যে অন্যদিন থেকে মোটর আসছে দেখেও আত্মসম্বরণ করতে অক্ষম হলুম। কী ভাগ্যি, ড্রাইভারটা ছিলো বাঁশিয়ার—তাই রক্ষে।

সেদিন থেকেই ভাবছি কি করা যায়। আমার ভীষণ-পথের অন্তরায় এই একটুকরো পাথর যে এমন প্রতিবন্ধকতার দেখা দেবে তেমনটিন একদম কল্পনা করিনি। তাছাড়া, হঠাৎই এটা ভীষণভাবের সমস্যা হয়ে উঠেছে, কেননা আজকাল মোটর চলাচলটা বিশ্ব আমার

পরস্পরকে আর্জনের চোখে দেখবে এমন আশা আমি করতে পারি না।

তাই আশাটি একটি ছেলেদের হয়ে থাক, মুখ ও আকৃষ্ট নয় আমি। ও থাকলে আমি যেদিনির থাকব কিনা সন্দেহস্থল। তাই যখন আমার হয়েছিল, আমার আমার শিশু থেকে, যেদি রাত্রীয় তখন একলা রাতদুপুরে একটা ফোয়াল ফোলাপ্ত করে দেখে পড়তে হোলো।

একটা বড় গোছের বুড়ি, ওর সামনা অবশ্যই রাত্রার ওপর আমা ভুলেছিল। বহু পরিশ্রমের পর যখন ওটাকে সমূলে উৎপাটন করতে পেরেছি, তখন আমার হাত মুছে দেখি আমার প্রাণিনিধি রীতিমত জখম। কেন কুরুক্ষেত্র এতক্ষণ এঁদেরই শীতল ও সরল সমরসুচুটি আমার উদ্যমে উৎসাহ সঞ্চার করছিল।

টাকের সমতলের দিকে সন্দেহ বুড়িটা তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—আপনার কেউ হন এই গাছটা?

জনতার মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা গেল, কিন্তু কার উৎসুক্য আছে কি নেই বোঝা গেল না। তাই আমার ঘোষণা করতে হোলো —যদি দরকার তাহলে নিতে পারেন। অনায়াসেই নিতে পারেন। আমার এর চাইতে আর বেশি নিজেদের কিছু নেই। সব্জা আমি খুশি হব।

জনতার এক কোণ থেকে একজন এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলে — এটা উপড়ালেন কেন? কোনো অর্ডার পেয়েছেন নাকি?

আমি লোকটার দিকে একটু তাকালাম তারপর ঘাড় নেড়ে জানালাম —না, তা আনছেন তা নয়।

গাছটাকে মাস্তার এই নিরাপদ জোপে স্থানিত করা গেল। কিন্তু আমার কথায় কেন ওর প্রত্যয় হোলো না, কয়েকজন আগন্তুক মাথা নেড়ে সে আমার প্রশ্ন করলে — সত্যি বলছেন গাছটি? কোনো প্রত্যাবেশ-টিত্যাবেশ?

—কিছু না।

লোকটার হেঁচকুড়ুলকে একেবারে সরিয়ে নিয়ে ওপরে এসে মাকে বললাম চা বাশ চা তৈরি করতে। আমার জন্যই চা-বাশ। গাছটার সঙ্গে আত্মাকর্ষিতে কাজের হয়ে পড়েছিলাম—প্রায় প্রস্তরীভূত হয়ে গেছলাম, বলতে কি!

এরপর প্রায়ই বাড়ি থেকে বেরুতে এলে বেড়িয়ে ফিরতে বুড়িটার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, অনেক সময় হয় না, যখন আসে তখন খানিক। এখন ওকে আমি সর্বান্তঃকরণে মার্জনা করতে পেরেছি, কেননা আমাকে অপরাধ করার ক্ষমতা ওর আর নেই। সে-শৈবশক্তি ওর শেষ পেয়েছে।

আমাদের মধ্যে একজনের ক্ষমতা জন্মেছে এখন বলা যেতে পারে। এখন সময়ে অকস্মাৎ একদিন দেখলাম বুড়িটার আড়ি ফিরেছে, ঘুরোঘালি বুজে নিয়ে নিয়ে চাকটিকা দেখা দিয়েছে। আরা সকালে বিকালে ছোলা পাইপে রাত্রার জল ছিটোয়, খোরাপোল, আগেরই অত চেহারাটি এর ওপর পড়েছিল। ওর চেহারার শ্রীবৃদ্ধি দেখে সুখী হলাম।

— আপনার কিরকম বুঝছেন?

হাঁ৷ পেছনে থেকে প্রশ্নকারক হয়ে ফিরে তাকালাম। সেদিনের সেই অনুপস্থিতপু ভদ্রলোক।

জিজ্ঞাসা করলাম— আপনি কি সেই থেকেই এখানে পাহারা দিচ্ছেন নাকি? না, তোলো প্রত্যাবেশ-টিত্যাবেশ পেলেন?

— না না, তা কেন? এই পথেই আমার যাতায়াত ছিল।

ভদ্রলোক কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হন, কিন্তু অল্পক্ষণেই নিজেকে সামলে নিতে পারেন।

—বুড়িটা দেখছি আছে ঠিক। ছেড়ে দেবে না— কি বলেন?

প্রশ্নটা এইভাবে করলো যেন যে-রকম দামী জিনিসটা পথে পড়ে আছে আমি তার ন্যায্য মালিকের হোলাও মেলে না এবং ওর তত্ত্বাবধানের ভার ওটাকে আত্মসাৎ করবার মতলবে যেকোনো চক্রান্তের লিপ্ত, যেন ফেলে যাবার আগে হাতে বাড়িয়ে সবাই ফেলে দেয়ার। আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে জানালাম— না না, আপনার আরা প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে, সরকার অন্যায়ের তাদের নিয়ন্ত্রণ করে নিয়ে নিয়ে রাঁচীর অভিবিশালায় সমস্ত রেখে দিয়েছেন, তাছাড়া, আপনি নিজেই তখন এদিকে কড়া নজর রেখেছেন তখন তো কিছু করার কিছু নেইদের।

সে একটু হেসে বলল —আপনার যেমন কথা! দেখেছেন এদিকে কারা ওর পুজোর্চনা করে গেছে!

ভালো করে নিরীক্ষণ করি— সত্যিই, দেখিনি তো, এক বেলার মধ্যেই কারা এসে গাছটার সর্বাঙ্গে কেশ কয়ে সিঁদুর

দেখে দিয়ে গেছে।

আমি 'মানস প্রকাশ' করলাম— ভালোই হয়েছে। এতদিনে অন্তু ওর কাজ ফিরলো এবং অনেকটা সময়ও ফুটলো।

পাথরটার সম্বন্ধে পুলকিত হবার কথা, কিন্তু লোকটিকে বেশ ঈর্ষান্বিত দেখলাম। কপাল কুঁচকে সে বললে—সেই তো জয়! সেই সবকরায় যে ইতিহাসটা এটাকে লিখিয়ে ফেলে!

পরদিন সকালে উঠে দেখি কোথাও পাথরটার চিহ্নমাত্র নেই। ওর এই আকস্মিক অন্তর্ধানে আশ্চর্যই হলাম খুব। কে ওটাকে নিয়ে গেল, কোথায় নিয়ে গেল, ইত্যাকার নানাবিধ প্রশ্নের সমাধিতে উঁকি মেরেও কিন্তু কোনো সঠিক সমুত্তর পাওয়া গেল না। পাথরটার এরূপ অন্তর্ধানে এই পথ দিয়ে যাতায়াতকারী সেই লোকটি যে বেজায় প্রসন্ন বোধ করবে অনুমান করা কঠিন নয়। এরপর তেরো লোকটার জন্য একটু দুঃখই হলো;—কিন্তু, এ সেই অন্তর্জিজ্ঞাসুদের বর্ষবোধ!

আরেকদিন পরে পলিস হোড়ের আশ্চর্যতমা নিয়ে আসছি—না ভুল। এখানে বুড়িটাকে নিয়ে এসেছে যে! বুড়ির স্থূল আকৃতি আছের ঘোড়ায় এমনভাবে পুঁতেছে যে উপরের উদ্ধৃত পোশাকের মিটারের মধ্যে অনেক দেখে শিবলিঙ্গ বলে ওকে সন্দেহ হতে পারে। এই প্রয়োগ-নৈপুণ্য আর, তাকে বাহবাও দিতে হয়। বুড়িটার হাতিটাকে স্থূল বেলাশাড়া আকৃতিপ্রকাশের ছড়াছড়ি। কপালের দিকে এই পথে যে সব পুণ্যার্থীরা এসেছে তারা তাদেরই পথে সন্ধ্যায় পারলৌকিক পাথেয়-সঞ্চয়ের সুবর্ণসুযোগগ্রহণে এরে প্রহণ করেছে সহজেই বোঝা গেল। যাই হোক মহাসমারোহেই ইনি এখানে বিরাজ করছেন— অতঃপর এঁর পদস্খলন ঘটিবার সম্বন্ধে কারু দুশ্চিন্তার আর কোনো কারণ নেই।

বুড়িটার এই পদোন্নতিতে আন্তরিক খুশি হলাম। আমিই একদিন ওকে মুক্তি দিয়েছি, এখন সবাইকে ও মুক্তি বিতরণ করছে — ওর গৌরবে সে-তো আমারই বর্ণ। পৃথিবীর মুক্তে ওর জন্মদাতা জানি, এইজন্য মনে মনে নিজেদের একটা পুলক অনুভব না করে পারলাম না। এবং কৃতজ্ঞচিত্তে ওকে আশীর্বাদ করলাম।

সেই লোকটাকে আর দেখবার সন্ধান পেব ছিলো মাঝে মাঝে ভেবেছি। পথেঘাটে তার সঙ্গে দেখা হয়েছে, কিন্তু পাথরটার কথা ও আর পাড়ে না। পাথরটার পলায়নে মেথেইলাস বা মুহ্যমান হয়ে পড়বে, কিন্তু টলাটে ওকে প্রফুল্লই দেখেছি। এত বড় একটা বিচ্ছেদ-বেদনা যখন ও কাটিয়ে উঠতে পেরেছে তখন অন্য ওকে উতলা করে তোলার কি আছে।

মাঝে মাঝে কলকাতাতে শাল দিয়েই বাড়ি ফিরি, দাদা করি, দিনকে দিন বুড়িটার মর্যাদা বাড়ছে। একদিন দেখলাম পেটিকোট পরাণী এসে আসন গেড়েছে, পাঁজায় গন্ধ এবং বসন্তের পাখের তেলায় ওপর দিকে নাক-কান বাঁচিয়ে আধখানা ঘুরছে। ছাপা এবং কলেজিয়েটের ওপরে সন্তুষ্টবতই অত্যাচার।

যখন সন্তানী ছুটিয়ে, তখন আর ছুটিতে বেরি হবে না এবং অতিশয় অবিভিন্নিলম্বেই ইট-কাঠের মূর্তি ধরে প্রতিরক্ষণে অন্তরেণী হয়ে দেখা দেবে। বেরতা তখন নিশেষভাবে যানেণী হবেন এবং সর্বসাধারণের কাছ থেকে তাঁর তরফে খাজনা আদায় করবার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কারেমী হয়ে দাঁড়াবে।

এর কিছুদিন পরে একটা তিনির কলের ব্যাপারে কয়েক মাসের জন্য আমাকে ট্রান্সফার নেয়ে হোলো। অন্তর্ধানের পাশ দিয়ে গেলেও চলে আসলাম, যাবার আগে দেখবার অবসরটা পেয়ে যাই। যা অনুমান করেছিলাম তাই, সন্তানীর সমাগমে ভক্তের সমাবেশ হয়েছে। ঘটিলক্ষণ দীঁড়িয়ে ওদের আসল আলোচনা অনুসরণে যা বুঝলাম তার মর্ম এই যে —ইনি হচ্ছেন ত্রিলোকেশ্বর শিব, আকাৎ স্বয়ম্ভু, এঁকেদারে পাতাল ফুঁড়ে বেরিয়ে উঠেছেন— এঁর তুলা নেই। অতএব এঁর উপযুক্ত সম্বর্ধনা করতে হলে এখানে একটা মন্দির খাড়া না করলে চলে না।

একবার বাসনা হোলো, ত্রিলোকেশ্বর শিবের নিজমুখের ইতিহাস সবাইকে ডেকে বলে দিই কিন্তু জীবনীশক্তির কমা ছিল না এবং যতটি কতটা অসম্ভব হতে পারে জানতাম আর তা ছাড়া ট্রেনের দিনও বেশি নেই— ইত্যাদি বিবেচনা করে নিরস্ত হলাম। সেই লোকটিকে খবর না দিয়ে দেখলাম ভালোই করেছি, কেননা যতদূর শুনলাম হয়, বুড়িটাকে নিয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠা

কথাটা তার অভিধানে ছিল কিন্তু ইনি যে হতেন তোমাদের না তেমনই স্বর্গীয় পরিবারদের এবং অত্যন্তীয় ইতিমধ্যেই লক্ষ প্রতিষ্ঠ হয়েছেন, এই কারণে সে পুলকিত কিংবা চমৎকৃত, কী যেন বলা যায়।

অনেক মাস ধরে যখন বিজনের তখন অনবরতের মোড়কে আর ঢেলাই যায় না। মোটাটি একটা দলিল উঠেছে, পাঞ্চকটার আউলাতে কান পাতা যায় এবং ছাত্রের চিঠি ঠেলে ঢলা যুক্তায়। কিন্তু সে তবু কবিই নয়, তার চোখে বিশ্বিত হলাম সেই মনে আনেকজনের আবির্ভাবে, কেবলমাত্র আবির্ভাব নয়, কালের পরিবর্তন পর্যন্ত দেখে। প্রশ্নিতের হয়ত সে-ই সোকটা— প্রথমজন, সেই আদি ও অকৃত্রিম ইণ্ডিয়ান—সেকরা, তিলক এবং তন্ত্রাজের ভাগে আজে এখন আর ঢেলাই যায় না!

— একি ব্যাপার?

আমিই আজে পড়ে প্রশ্ন করলাম একদিন।

—আজ্ঞে, এই যাঁদাই নিজের সেবাযত্ন। সোকটি কিনীতভাবে জবাব দেয়— তা তো দেখতেই পাচ্ছি। দিদি নিশিপুজির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই জন্যেই বুঝি পাথরটার ওপর অত করে নজর রাখা হয়েছিল?

শিলাখণ্ডের প্রতি এত প্রীতিশীলতা যে অযৌক্তিক এবং একেবারেই নিরর্থক ছিল না, এইটা জেনেই সোকটি অকস্মাৎ তার ওপর পালশ করা হয়ে যায়, আমি শুদ্ধ হয়ে পড়ি।

কানে আঙুল দিয়ে সে বলল —এমন কথাটা বলবেন না। পাথর কি কখনই। শ্রীবিষ্ণু। সাক্ষাৎ দেবতা যে। ত্রিলোকেশ্বর শিব। ঠাকুরের সে ব্যবস্থার জানায়।

আমি হেসে ফেললাম —এত ভক্তি নেই, না।

এবার সে একটু কুণ্ঠিত হয়—সবাই তো বলে।

— তুমি নিজে কী বলো? তবু তো বলে নিয়ে যাওই তেল খুঁড়ে যাও না, টিউব-কলের মত এই নির্বাঞ্ছিত ব্যবস্থার নেমে গেছে। কিন্তু তোমার কী মনে হয়?

—কি জানি। তাই হয়তো হবে।

—কতদূর গেলে তেল খুঁড়েই দেখনি না তেল এখানে?

কিন্তু কেটে সোকটা বলল—এসব কথা কেন? ওরে অপরাধ হয়, যারা জ্ঞান অবতার—ইনি আমাদের জাগ্রত।

—মানে? কিরকম জাগ্রত শুনি?

—এই ধরুন না কেন। এবার তো কলকাতায় লালন হলাম, টাকে নিয়ে কিন্তু কথাই কিন্তু হচ্ছে না—

—তাই, তাতো কি মহানন্দী না কি, জানতাম না তো।

—খবরের কাগজেই দেখবেন নিশ্চয়ই লোক মরছে। কর্পোরেশন থেকে ছিটকে দেবার ত্রুটি নেই ,আমরা প্রত্যেক পাড়াতেই। কিন্তু আমাদের পাড়ায় এ-পর্যন্ত কাজ হয়নি কেবলমাত্র কৃপায়, আমরা কেউ টাকেও নিইনি কেবল যাবার চলাচল খেয়েছি। এ যদি জাগ্রত না হয় তবে আপনি আপনি আছে আপনি?

এর কি জবাব দেব তা চিন্তা করবার সময় ছিল না। আগে একবার এই রোগে সে কষ্ট পেয়েছিলাম এবং তা করে পৌঁছেছিলাম তাকে নানা ত্রিলোকনাথের অহিংসা তখন আমার আসা উঠেছে। —আমি এখন চলেছি। আমাকে একুনি টাকে নিতে হবে। আরোকাল এসে গাড়ি ডাকব। হাতে আর মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে মোটামোল আলোচনার উদ্দেশে বাহির হলাম।

পাথে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা, তাঁর কাছিয়ে সে বলল—আরে, তোমার চলেছো এমন হয়ে হয়ে!

—টাকা নিতে।

—টাকা নিতে তো ছাই হচ্ছে। টাকের বিস্তৃতি হয় না। তুমি বরং methotrimum 200 এক ডোজ খাও যে, কিং কোম্পানির থেকে —যদি টিকে থাকতে চাও! পরের হপ্তায় ঐ আরেক ডোজ, তারপরে আরেক—ব্যস, নিশ্চিন্তি। টাকে কেশ কয়েকে আঙুলের দেখা যায়, কিন্তু ফেরিওলিনের—দেখবে!

—বলো কি? জানতাম না তো।

—জানবে কোত্থেকে? কেবল দৌড়াদৌড়ি এই তো জেনেছো! অন্য কিছুতে কি আর তোমাদের নিশ্বেস আছে? আমি তোমিও-প্যাথি প্র্যাক্টিশ করেছি, আমি জানি।

—বেশ, তাই খাচ্ছি না হয়।

কিং কোম্পানিতে গিয়ে এক ডোজ ফুল পটির ফেরিওলিনের গলাধঃকরণ করলাম। তার একসপ্তাহ অনেকটা আক্রোশ হওয়া গেল। হালকা হয়ে গেলাম।

এর পরেই খবর নিয়ে উপরোপরি কয়েকটা শবযাত্রায় গেলা— নিশ্চয়ই এরা

বসন্ত রোগটা হয়েছে? ওঁ সর্বনাশ, আমাদের পা সিঁটিয়ে ওঠে, ওদের থেকে এইভাবে কত লক্ষ লক্ষই না বীজাণু আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে। ডোগি-ওপিনস গন্ধে পৌঁছতে না পৌঁছতেই এতক্ষণে এই সব আক্রান্ত রোগাণুর কাজ শুরু হয়ে গেছে নিশ্চয়। হাত পা সিঁটিয়ে আমার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে আসে—এই নিদারুণ বাস্তবের মিথ্যেমন নিয়েও আমার কষ্ট হয়।

অতি সাবধানে এক টুকরো প্রতীক্ষাপত্র লিখতে বসলুম ডিরিংসেক রোগ-এক কবিরাজের নাম লেখলাম। মেডিসিন পাবি কথা গেছে, কবিরাজটাই যা করি থাকে কেন—যে উপায়েই হোক সময় আগে আত্মরক্ষা। বিজ্ঞাপিত ঠিকানায় পৌঁছতেই দেখলাম কয়েকজন মিলে খুব হুড়ধুম করে ডাক্তার একটা মিলে কী যেন ঘটিয়েছে। কবিরাজকে আমার অবস্থা বলতেই তিনি আঙুল দেখিয়ে বললেন—ওই যে বাটা হচ্ছে। কলিনারিয়া সেকড়—খেটে খেতে হয়। ওর মত বাস্তবের অবার্থ প্রতিষেধক আর কিছু নেই মশাই!

বাবাজীবনের আই এর জল খেয়ে একটা বিদ্যা ভেকে উঠে বসে গেল। গায়ে জোর পড়িলোর না, আমটা ঝিম্ ঝিম্ করছিল, ঝর ঝর ঘাম—বসন্ত হওয়ার আগে এরকমই নাকি হয়। বাড়ি ফিরে মাকে বললাম—আজ আর কিছু খাব না, মা। বেহুটো ভালো নয়।

উনিও মুখে না বললেন—কী হয়েছে তোর?

—এখনি কিছু। ঘোমলে যাবে। —বসন্ত।

—বালাই বাট। আসতে দেই। বল কেন হতে যাবে? এই দুটুনির টুকরোটা হাতে বাঁধ নিচি। আমি তিরিশ বছর বাঁধছি, এই হাতে কত বসন্ত রোগীর ছোঁ পাঁচালাম, সেবা করলাম, কিন্তু বলতে নেই এখনি জোরে কোনোদিন হাত পর্যন্ত হয়নি— সে যম এটা তুই।

মা তাঁর হাতের তাবিটি খুলে দিলেন।

—তিরিশ বছরে একবারে হয়নি তোমার? বলো কি! খাও, খাও হাতে। এতক্ষণ বলোনি কেন? কিন্তু এক টুকরোয় কি হবে? তোর যে অনেকটা এগিয়ে গেছে। আমাকে আজ একটা দুটুনি দাও যদি হাতে আসিয়ে।

দুটুনি তো বাঁধলুম, কিন্তু বিছানার দিকে পরীক্ষাটা কেন অগ্রসর করতে লাগলো। নিজেকে রীতিমত জ্বরগ্রস্থিত মনে হোলো। অসময় নিয়ে ডাক্তার ডাকে পরীক্ষা করালাম, মুখেও দেখি দু-একটা ফুসকুড়ির মতো দেখা দিয়েছে। নিশ্চয়ই বসন্ত, তবে আর বাঁচন নেই, মাকে ডেকে দেখালাম।

মা বললেন—আর অনুমান না — ঠিক।

আমি বললাম —উঁহু। ঠিক নয়, নিতান্তই মনে অনুমান।

মা বললেন—অলক্ষুণে কথা মুখে আনিস নে। ও কিছু না, সকাল দিন ঘরে বসে আছিস একটু বাইরে থেকে বেড়িয়ে আয় দে।

এরকম বাজল আমার নিয়ে কি বেড়াতে ভালো লাগে? শেষটা বলছিল ওরা সবাই চলাফেরা খেয়ে নিরাপদে রয়েছে। আমিও তাই, বাপে বাড়ি! হয়তো ও চয়নিকার বীজাণুগুলো ভোলে কথা আছে, সেই যে, তা কে বলতে পারে? হাঁ, ওর যেমন কথা। ওসি ডেঙ্গ ব্যাকটিরেন্ট—অলক্ষ্যে লক্ষ লক্ষ ছড়িয়েই কিছু আর অসুখ হচ্ছে না। ডাক্তারা বলেন জোরে রোগ-প্রতিরোধের শক্তি কমায়—আমিও সেখানে আছি—সেই কারণ জোরেই ওদের পক্ষে একটা রয় সয়াছে—কিন্তু এই অবস্থাতেও সাধারণতের সেবাযত্নের জন্য নিশ্চয়ই জোর আমি পাবো তোমার?

এ সব ভাবনা মা ওদের সমাজে টিকে থেকেছি আমার উচিত ছিল, হয়তো তাতে আটকাতো। একুনি গিয়ে টিকেটা নিয়ে আসার দরকার। টিকে নিলে ওদেরি বসন্ত আক্রান্ত হয় না — বড় জোর হাল হয়ে দাঁড়ায় আর হলে তেমন ভয়ের কিছু নেই—ওতো শিশুদের ধাতেসাই হচ্ছে। বাস, যাই মেডিকেল কলেজের দিকেই বেরিয়ে পড়ি।

টিকে নিয়ে অপরাহ্নের শান্ত স্নিগ্ধ ফিরছে সোজাসুজি সন্ধ্যাকের কথাগুলো মনে পড়ল। হয়তো ঠিকই বলেছে সে। সত্যিই এক জায়গায় গিয়ে আর কোনো অভাব নেই, সেখানে বয়সের আগে থাকা সোয়াস্তিই হয়। এই তো আজ বেঁচে আছি, কিন্তু কাল যদি বসন্তে মারা যাই তখন কোথায় যাবো? শেকস্‌পীয়ারের সেই কথাটা — সেই ডুমিস্তা - হোরাশিও-এরকমের কথা জানী—না, এতেবারে কেবলি নয়। এই পৃথিবীর, এই জীবনের, সুন্দর সন্ধ্যালোক এবং তার বাইরের কথা

ম্যাজিসিয়ানের মৃত্যু হলে

অমর মিত্র

বাবার মৃত্যুর আগে বুলন কোনো মৃত্যু দ্যাখেনি। যে মানুষটা চলছিল, ফিরছিল, কথা বলছিল, হাসছিল, বুলনকে ম্যাজিক শেখাচ্ছিল নিয়ম করে সে-ই আচমকা মরে পড়ল পথের ধারে, কাউকে না বুঝতে দিয়ে মরেই গেল। মা বলে, তার বাবা চলে গেছে কাউকে না বলে। পাড়ার অনেকে বলে — ঘুম! মানুষটা চলে গেল কাউকে না বুঝতে দিয়ে। বুলনের কাকা, জেঠারা কলকাতা থেকে এসে অপেক্ষা করেছিল-আত্মীয়ের একটু জ্ঞানলাভও না সেরাই, চলে গেল!

বুলনের এখন, সেই শীতের পর, এই বর্ষাতে মনে হয় বাবা চলেই গেছে। তাদের ফেলে রেখে তার বাবা দীপেশ্বরনারায়ণ, যার ডাক নাম ছিল সেরাই, চলে গেছে অন্য কোথাও অচিনপুর। না হলে এতদিন হয়তে পারে, এটা একটা ঘাবু! ব্যবসার খুব নাম ছিল মানুষের হওয়ার। মানুষের দীপেশ্বরনারায়ণ, ম্যাজিসিয়ান ডি, এস। পারেনি হতে, কিন্তু তারা অনেক ম্যাজিক জানত, তাসের সব খেলা, আগুন নিয়ে হরেকরকম খেলা, এই ভ্যানিশ হচ্ছে এই নিয়ে আসছে, বাতাসে আঙুল ঘুরিয়ে কাগজে রবীন্দ্রনাথকে এঁকে ফেলা-এইসব। তার জানা বলত, আরো অনেক ম্যাজিক জানত, ভুলে গেছে সব সংসারের চাপে। বুলনকে বড় ম্যাজিসিয়ান করবে এই রকম আশা ছিল। বাবার ম্যাজিক এই বাড়িতে আর নেই। সমস্তদিন সে আর তার মা এত চুপচাপ হয়ে থাকে। বুলনের বিশ্বাসই হয় না বাবা আর ফিরবে না। সে ম্যাজিক নিয়ে বাবার সঙ্গে কথা বলতে পারবে না।

আশ্চর্য! কলকাতার মানুষটা অচিনের জন্য বেরল। সেদিন রোজ ধরে ছোটে যাচ্ছিল। ট্রেনের সময় হয়ে গিয়েছিল তখন, বেশ ঠে তবু বসে পড়েছিল রাস্তার ধারে, আছড়ানো বাঁধানো বেদির উপর। তখন সেদিন রোডে কত লোক। সবাই ছুটছে ট্রেনের জন্য, কেউ টের পায়নি ওই সময় বকুল গাছের বাঁধানো বেদিতে বসে তার বাবা দীপেশ্বরনারায়ণ, দীপেনবাবু অচেতনাতে চলে যাচ্ছে। সবার এত তাড়া ছিল যে, কেউ খেয়ালও করেনি দীপেনবাবু কেন বসল। সবার খুব তাড়া ছিল, এই ট্রেনটা না ধরতে পারলে আর ঘণ্টার মতো অপেক্ষা করতে হবে, তাতে অফিস পৌঁছে দেরি করার উপায় ছিল না কারোর তাই বুলনের বাবা চলে গেল একা একা, খুব গোপনে, নিঃশব্দে।

ট্রেন চলে যাওয়ার পর যারা সেই ট্রেন ধরতে পারেনি এবং পারেই ছিল তারা তাদের হাঁটার গতি ফিরিয়ে নিয়েছিল সময় পেয়েছিল হাতে তাই একজন অন্যকে বলাবলি করছিল, এই লোকটাকে নাকি সাহেবের ট্রেন যায়, এখানে এভাবে গায়ের গায়ে চলে পড়েছে কেন? সে তখন বলেছিল ও দাদা, এই যে দাদা।

বুলন আর তার মা যখন ছুটে যায় সেদিন রোডের বকুলতলায় তখন অনেক লোক। অনেকেই অফিস-যাত্রী, কিন্তু তখন অফিস যাওয়ার পরিকল্পনা স্থগিত করেছে। ডাক্তার এসেছিল সেখানেই। বুলন দেখেছিল সেবাব্রতে মাটির উপর, বাবাকে,

পড়েছে উঠতে বসতে ফুল ছড়িয়ে যায়, হেমন্তে আবার ফুলের উৎসব, মাথায় চুলে কাপড়টা একাকার হয়ে ফুল ধরে থেকে বসে পড়েছিল। তখন ছেলেবেলা। এতো উৎসব ঘরে পড়ার জন্য দু-একটা ফুল নেমে ফুটেছিল ওই অন্ধকারে নিজের।

ফুলমতি এই কুসুমপুরে নতুন। একদিন শুধু তারা নতুন কেন, অনেকেই নতুন। তাঁদের মাঠের উপর যখন উঠেছে পড়শন, পরে উঠেছে নতুন বসতি। ফুলমতির আসা ছেলেরা কেউ এখানে থাকে না, এদিকে তাদের জেলেনো জমিটা ছাড়াও নেই। বাবা আসা থেকে রাস্তার উপরে। পাড়ত্যাগ, যারা ছিল তাদেরকে সাদর ভালোবাসে তারা সবাই প্রায় অচেনা, অধো চেনা, অর্ধ চেনা মানুষ। ফুলমতির মা একদম অপেক্ষা করে, কলকাতায় এই ভাড়াটে বাড়িতে বুক জুড়ে থাকলেই ভাল হতো, তাহলে দুঃখ ফুলমতির বাবা বেঁচে থাকত, ওই পাড়ার সবাই বাবাকে ছোট থেকে বড় হতে দেখেছে, বাবার মাস্টারি দেখেছে কলকাতা। সবাই খুব ভালবাসত, তার লোকের ভালবাসা এড়িয়ে বাবা যেতে পারত না। পরে এই রকম বসে পড়লে বাবাকে নিয়ে হাসপাতালে চলে যেত।

ফুলমতি বলল — 'মা, আমি কি তাহলে মাস্টারিমিশান হবো না?

ফুলমতির মা চুপচাপ।

ফুলমতি বলল, বাবা বলত আমি নাকি সি. সি. সরকারের মতো মাস্টারিমিশান হবে উঠব। বাবা আমাকে সি. সি. সরকারের কাছে নিয়ে যাবে বলেছিল, উনি কী যে হয়ে গেল! মানুষ এভাবে মরে যায়!

ফুলমতির মা বলল — 'মাস্টারি তো সেই চলবে না ফুলমতি, আগে যেমন বাবা ছিল আমার ছাত্রী, এখন তো তোকে চাকরি বাকরি করতে হবে।

ফুলমতি চুপ করে থাকল। তার বাবা সরকারি চাকরি করত। বাবার চাকরিটা সে হয়তো পেতে পারে। তা ছাড়া, সে মাস্টারি তো দেখেছেই। মানুষ ভালবেসে পুষ্পে, ভালোবেসে নিয়ে পুষ্পত্ব করবে প্রার্থনীয়ে, সম্মানকে ঘরিয়ে নেবে আচমকা, পুষ্পত্ব হারবা। ফুলমতি আবার এক ধাক্কা হাসপাতাল হাসপাতাল এসে দাঁড়াবে মনে, তাদের সঙ্গে ভালবেসে কথা বলে ফুলমতি, পকেট থেকে বের করে হাতে লাল, নীল কলম, অসংখ্য কলম — শেষ নেই তার।

ফুলমতির মা বলল — 'তুই কাল লিখে আসি অফিসে, ওরা চিঠি দিয়েছে, দেখা কথা বলা, পরশুদিন ফুলমতি!

ঘাড় কাত করল ফুলমতি অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে। বাবা চলে যাওয়ার পর মাকে নিয়ে অনেকবার সে বাবার অফিসে, আলিপুরে গেছে। গেটে হাওড়া, হাওড়া থেকে লম্বা গঙ্গা পার হয়ে আবুধাবি, আবুধাবি থেকে বাবার অফিস, দশতলা বাড়ি, লিফটে চেপে বসলে — বাবার ঘর থেকে সমস্ত কলকাতা দেখা যেত। অনেক অনেক দূর দেখা যেত বাবার ঘরটির জানলা থেকে। এখন ওখানে অন্য একজন বসে। ফুলমতি গেলেও ঢুকতে দেবে না কখনো।

ফুলমতির মা বলল, — 'তুই চাকরি করতে পারবিনে!

— 'আর চেয়ে তুমি করলে তো ভাল হতো।

মা বলল, — 'আমি পারব না, আমার তোমো ইচ্ছে নেই ফুলমতি, তুই চাকরি করে আমাকে খাওয়াবি, আমি বসে বসে খেতে খেতে বুড়ি হয়ে যাব।

ফুলমতির বাবার চুলে বিলি কাটছিল ফুলমতির মা। তার মাথায় এখন আবার আগের মতো ঘন চুল। তার মায়ের মেয়েলি জামাকাপড় আবার ভালো লাগে। সেই মাথা থেকে হাতও সে সাদা তুলিয়ে। ওইভাবে প্রায়ই পারি বেরোতে যেতে চায় নিয়ে। কি সি এস, আইটি, ইঞ্জিনিয়ারের টিকা — না আসলে করতে গেলে হবো না।

মা বলল — তুই তো অনেক হয়ে গেছিস, নিজে চাকরি করবি, নাহিয়ে বি এ পারবি।

তাহলে আমার মাস্টারি?

ওর জন্যেই লিখতে হবে, মাস্টারিটাই তো সব নয়।

ফুলমতি মাথা ঝাঁকাল — 'না, মাস্টারিই সব, উনিয়নগুলোর বাবুদের এসএসসি মাস্টারি দেখতেন্সেন, আমি লিখব এই বলছে। মা মাস্টারিটা লিখতে হবে।

তুই কাল গিয়ে খোঁজ নে, এখন বাবাদের যেতে হবে, না হলে লোকে ভুলে যাবে।

ফুলমতি চুপ করে গেল। স্তব্ধ হয়ে গেল। এইতো অল্পদিন আগেও বাবা হুমহুম করে অফিস যেত, এরমধ্যেই বাবাকে ভুলে যাবে! ফুলমতি চোখ পেল অন্ধকারের বৃষ্টি নামল। বৃষ্টির ঝিরঝির শব্দ কানে এল তার।

ফুলমতির মা আস্তে বলল — 'তুলে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু না। এই হয়ে হয়।

ফুলমতি খুব গম্ভীর। ফুলমতির মা ফুলমতিকে অন্ধকারের মধ্যে দেখতে লাগল। আগে ওই বেতের চেয়ারটায় বসত ফুলমতির বাবা। ফুলমতি চোখটা বসত না, বরং বসত জানালার গায়ে, যা বুলিয়ে, তাও কতটুকু সময়। খুব ঝগড়াটে ছিল ফুলমতি। বাবার খুব পেটাই বিছানায় নিয়ে বসাত। এখন যেন ফুলমতির ঘুম পায় না, ঘোলে

থাকে অনেক পড়িয়ে পড়ি। সে আর তার মা অন্ধকারে বসে বাঁশেশ্বরনারায়ণ মাজিসিয়ানের কথা বলে। মা হাসতে হাসতে বলে — কী অদ্ভুত থাকতে যে ছেলে ধরা, এই দেখনায় আর হাতে একটা করে আসেন, তারপর সেই, তারপর তা আর একজনের পেটেই

— 'ধরা কেন ম্যাজিক করেন না মা?

— 'ফুলনের মা মল্লিকা বলে, কী জানি! খুব অল্প বয়সে চাকরিতে ঢুকেছিল লোকটা, সেই ছেলেবয় মফস্বলের চাকরি সাইকেলে করে মাইলের পর মাইল ঘুরতো আসা, বলয় গেল কই?

ফুলন তার মায়ের কাঁধে হাত রাখল, বলল — 'চাকরি কেন করতে গেল মামা?

মল্লিকা বলল — 'বাবুরে, চাকরি ছাড়া চলবে কী করে?

ফুলন বলল — মামা কেমন অদ্ভুত চলে গেল।

হ্।

তুমি আমি থুকতেই পারিনি।

না। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল ফুলনের মা।

আমরা কিন্তু জানতামই না।

জানলে যেতে পারত না মানুষটি।

ম্যাজিসিয়ানরা কি পরে কী হবে তা জানতে পারে?

মল্লিকা ছেলের পিঠে হাত দিল, বলল, সে তো ম্যাজিসিয়ানই জানবে।

ফুলন ঘুরে মাকে জড়িয়ে ধরে — 'মা তুমি আমাকে কখন ফাঁকি দিও না।

কী বলছিস?

আমার মনে তো মামা আসে।

হাসিল হাসল, ছাড় ফুলন।

না বলো কখন ফাঁকি দিবে।

মল্লিকা অন্যমনস্ক হয়ে গেল। তার একদম এরকমটা নয়, ফুলনের বাবা পঙ্গুত্বের পা দিয়েছিল। এই ছ-মাসের মল্লিকার বয়স গেছে, ফুলনের বাবার যায়নি। সাত মাসে ছেলেটি কত বড় হয়ে গেছে। এই সংসারে সবাই উঁচু মানুষ, ভারিক্কি। হাত-পা গোলগাল, তেজস্বী। বাঁশেশ্বরনারায়ণ ওই বয়সে ছিল। ধুলোমুঠো। ছেলেটা যখন তাকে আঁকড়ে ধরত — সে ভেসে। ভুলেই গেছে মল্লিকা। কিন্তু সে ছেলের কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল, বলল — তোর বাবা আমাদের ভুলে গেছে।

কেন, কেন মা?

মানুষটাকে ওইরকমই ছিল।

কে বলল?

মল্লিকা চুপ করে থাকে। সে ভাবেনি কখনও ছোট এই ফুলমুখপুত্রে এসে আছড়ে মানুষের ভেতরে বসতি গড়ে তুলবে। আজুলের বাঁশেশ্বরনারায়ণই জোর করে মা-বাবা, ভাই বোন, চেনা পাড়া, চেনা মানুষ ছেড়ে চলে এল এখানে। এর মনে সেই সময় কোনো খুশিও হয়নি। এখন মনে হয় অদ্ভুত এক নিষ্ঠুরতা ছিল মানুষটির ভিতরে, স্বার্থপরতা।

ফুলন আবার বলল — বাবা ভুলবেই পারবে না।

কিন্তু মানুষটা কোথায়? নিথর মল্লিকা ভাবে পড়ল — জানি ও।

ফুলন বলল — টাকা পাঠালে গেলে আমার ম্যাজিকের জিনিসপত্র কিনে দেবে কিন্তু মা।

— হবে, হবে।

বাবা বলত — আমি নাকি বর্ন ম্যাজিসিয়ান।

— সে তো বটেই। কত ম্যাজিক দেখাতিস তুই ফুলন, তোর দিকে তাকিয়ে আমরা ঘুমোতাম।... ।

কথা শেষ না করে মল্লিকা থেমে গেল।

দুই

ফুলন যাচ্ছে একা একা। এগারো বাকিটা জগতের তাকে একা যেতে হবে। ফুলন ঠিক সেই বয়সে পেরোল, যে সময় তার বাবা বেরত। সঙ্গে আইসিনি: টেবিলের যে জায়গায় বসত, সেখানেই বসেছিল সে খাওয়ার সময়। তারপর শার্ট-প্যান্ট পরে, জুতোর ফিতে বেঁধে, কাঁধে একটা ব্যাগ নিয়ে, ব্যাগের ভিতর টিফিন নিয়ে তার বাবার মতোই বলে উঠল, যাই।

মল্লিকা বলল — যাই বলতে নেই, বলতে হয় আসি।

অদ্ভুত বাঁশেশ্বরনারায়ণ, সবটাতেই যাই-যাই বলত। মল্লিকা আসে বলতে বলতে বাঁশেশ্বরনারায়ণ বলত — যাই বললেও বাঁশি আসি টিকবেলের মতো। হাসি। কী নিষ্ঠুর ছিল মানুষটা। যেদিন একেবারে চিরকালের মতো চলে গেল মল্লিকা ছিল হাসপাতালে। দুধ টাঙাতে গিয়ে পুড়ে গন্ধ বেরোচ্ছিল। খুব মনে আছে, হাত। রক্তমোক্ষণ খুব সামলাতে সামলাতে তখন বাঁশেশ্বর করছিল — যাই।

— টিফিন নিয়েছো? ভিতর থেকে জিজ্ঞেস করেছিল মল্লিকা।

— হ্যাঁ, যাই। বলে বেরিয়ে গিয়েছিল মানুষটা। ছিল সেটি টিফিন খেতে আওয়াজ পেয়েছিল। ফুলন সেই সময় ম্যাজেনাইন ফ্লোরের ঘরটিতে বসে পড়ছিল। মল্লিকা ডেকে উঠেছিল — ফুলন গেট তালা দে।

তালা লাগানোর শব্দও শুনেছিল মল্লিকা। সব যেন পরে যাচ্ছিল। ওই যে ফুলন বাঁদিকে ব্যাগ ঝুলিয়ে একটু হেলেদুলে এগোচ্ছে। আইসোলের গা দিয়েছে সবে। ওই যে ফুলন দাঁড়াল ঠিক সেই জায়গাটায় যেখানে বাবাও দাঁড়াত। ওই বাঁকের মুখে

জনমনুষ্যশূন্য একটি পাথর আছে। সেই পাথরে ঘাসা যেন সিঁদুর মাখিয়ে দিয়ে যায়, জল ঢেলে যায় ওদিক থেকে একটা বুড়ি এসে। বুড়ির মাথায় টিক সেই মনে হয়। বুলনের কাছ এখানে দাঁড়িয়ে পাথরটাকে নমস্কার করে একবার ঘুরে আসায়। অন্তিমের বুকটা হাত করে ওঠে, বুলনও যে ভাল মানুষ হয়ে নমস্কার করে

বুলনকে এক্ষেত্রে দীপেশ্বরনারায়ণের মতো লাগছে। এটাই কি দীপেশ্বরনারায়ণ আর তার ছেলে ভবেশ্বরনারায়ণের মধ্যে? সেই অন্ধকারে সাতাশেও কি বুলনের কাছ এইখানটায় দাঁড়িয়ে এইভাবেই ফিরে তাকিয়েছিল। তাইতে মোহনের সেদিন দেখতে পায়নি মানুষটা দীপেশ্বরনারায়ণ। বাড়িময় পোড়া ঘুঁটের গন্ধ ছড়িয়ে দিয়েছিল। নদিয়া ফিরছে ছিল।

বুলন একাএকা স্টেশনে এল। তার কাছ থেকে নটা ছুটিয়া ট্রেনে। বুলন সেই ট্রেনে উঠল। জানালায় ধারে বসল। বসে বাইরে তাকিয়ে থাকে। এই প্রথম একা একা যাচ্ছে সে। এই ট্রেনে চেনাশুনো কারও অস্তিত্বের কেউ নেই। যদি থাকে এই কামরায় হয়ত নেই। থাকলেও তারা কেউ কারও কাছের মানুষ ছিল না। আসলে কি পরস্পরের মধ্যে পড়া দীপেশ্বরনারায়ণকে দেখে তারা চলে আসবে স্টেশনে। ট্রেনে উঠেই তাদ খেলতে বসত?

বুলন জানালার বাইরে আকাশে মেঘের পাল দেখে দেখতে লাগল। কী ঘন! কী গম্ভীর! আকাশ যেন মাথে এসেছে পৃথিবীর দিগন্তের, তাই যেন সেই গোপনীয়। সজল ছায়া চারদিকে। তার কাছ যে জনমানব নেই। সেই অন্তরাল থেকে। বাবা একদিন একটা কথাকে হত্যারার মতো কথা বলেছিল মাস্টারমশাই নিয়ে, মনে বুলন, সব ছেড়ে বড় মাস্টারমশাই তো আকাশে, এই মেঘলি ছায়ায় ছোকুর, আচমকা চলে এল যেন! ছোয়ে খেলল কথা।

একটা মানুষ বুলনের পাশে এসে বসেছে, জিজ্ঞেস করল — কোথায় যাচ্ছ?

বুলন তাকায়, দেখল তারই বয়সী। মুখটা চেনা। সে বলল — বাবার অফিসে।

চলন্তি হয়ে গেল।

উঁম, চিঠি দিয়ে দেখা করতে হয়েছে।

তোমার মা এলেন?

বুলন মাথা নাড়ে। ট্রেন ক্রমশ ভারী হয়ে আসছে। সবাই যাচ্ছে কলকাতায়। কলকাতাতেই সব অফিস। কলকাতায় সবাই চাকরি করতে যায়। বুলনকে সেকেটা বলল — তুমি জিনিস পাবে বাবার অফিস?

আপনি কি ওই অফিসেই যান?

মাথা নাড়ে লোকটা — আমার ফাইটার্স, তোমার বাবার তো আলিপুর। বলতে বলতে লোকটা কাকে যেন দেখতে পেয়ে হাত দিয়ে উঁচল — এই যে মশলা, আসুন, দেখলেন একটু সরে বাব দেখি, তোমার বাবা এই কম্পার্টমেন্টে উঠত, তাকে ওইদিকে বলতে।

আমি কি তাহলে —?

না, না বলো, তুমি বরং আমাদের সঙ্গেই যেও। তোমার বাবা আমার ভালো মানুষ ছিল, মশলা আমার।

মশলা লোকটির মেদিনী খোঁচা। বুলনকে দেখে ভ্রু কুঞ্চিত চোখে তাকালেন, বললেন — খেলানগর থেকে পরে উঠবে না পরবার?

হাঁ, ও তাকে যাবে।

এ কে সরকার?

ওই যে মাস্টার দেখাতেন অন্তরেকার, ওই আমাদের সঙ্গে যেতেন অনেকবার, তাঁর ছেলে।

বাবা মাস্টার দেখাত?

হাঁ, ভাল দেখাত, মাতাকল ডিসট্রবটা খালি থাকত, একটা ঘুটো খেলা, প্রায়ই দেখাত।

বুলন তাকাতে তাকাতে টের পাচ্ছিল নতুন এসে বসা মশলা তাকে ছেলে দিচ্ছে। মশলা অন্য একজনের সঙ্গে উঁচু গলায় কথা বলছে ক্রিকেটে ভারতের হার নিয়ে। আর যার সঙ্গে কথা বলছে তাদের ওদিকের চেনা মানুষটি। কী হয়েছিল? না, একদিন ট্রেন বন্ধ হয়ে গেল মাঝপথে, মোবাইল কারোরই ছিল না, তো সেই দিন কার মাস্টার না দেখিয়েছিল বুলনের বাবা। একটিন ট্রেন ছিল না, প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে কলেন স্যালিশ করে তাক লাগিয়ে দিয়ে লাগল বুলনের বাবা।

বুলন বলল — আমিও জানি।

বাহ্, ভেরি হলো, তুমি প্রত্যেকদিন আমাদের মাস্টার দেখাবে অফিস থেকে, তোমার বাবার মতো পারো?

বুলন বলল — অফিসের ট্রেনে মাস্টার দেখান না।

তাহলে! লোকটা তাতলা হয়ে তাকিয়ে আছে।

আমি প্ল্যাটফর্মেও দেখান না।

তাহলে কোথায় দেখাবে?

স্টেজে। বলে বুলন বাইরে তাকিয়ে থাকল। ইস! বাবা যেন শহরেশ্বরীবাবার মতো মাস্টার খেলি করত। কে বলবে বাবাকে মাস্টার দেখাতে? বুলনকে তাতলা লোকটা — তুমি তো মাস্টার পাস?

— হাঁ।

— তাহলে চাকরির পাবে তার টাকাটা তোমার।

বুলন চুপ করে থাকল। জিজ্ঞেস না। ট্রেন ধীরে ধীরে চলছে, এই লাইনটায় এমনই রোজ আসেযাওয়া। বুলনের কথা থেকে সাড়া না পেয়ে লোকটি নিজেদের মধ্যে আলাপ জুড়ল। তারা বলতে লাগল — এইভাবে অসুস্থরা কেউ মারা গেলে বাড়ির সবার ফাঁসিনির অনেক ঝঞ্ঝাট হয়। বন্ধুর বাড়ি চাকরি ছিল হয়ত। এখন ছেলেটা চাকরি পেয়ে যাবে। শুনতে শুনতে বুলন আচমকা উঠে পড়ে।

এ কী, উঠলে কেন? জিজ্ঞেস করলেন সহযাত্রী মশায়।

এবারি তো নেমে যাব।

আহা, বসো বসো। বুলনকে ঠেলেই বসিয়ে দেন সহযাত্রী মশায়।

এই দুজনই তার আবার বয়সী। এই বয়সের অনেকেই যার বাবার বয়সেরই হবে। অসহায় তার লোকটি হাসে মনে মনে। কে কবে মারা গেছে সেই কথা নিয়ে।

বুলন দেখছিল চলন্ত ট্রেনের জানালাটিকে। দুজন মৃত্যুর কথা বলছে, দুজন বলছে অসুখের কথা। ওপরে চারজন তাস নিয়ে বসেছে। একজন সহযোদ্ধাদের সঙ্গে ঝগড়া করছে। তার বাবাই শুধু মারা গেছে ট্রেনের মধ্যে বসে, বাকি সবাই এইভাবেই যায়। কিন্তু এরা তাস খেলছে, অসুখ নিয়ে, চাকরি নিয়ে, ডিসেন্ট নিয়ে, অফিসের ফাইল নিয়ে কথা বলছে, সহযোদ্ধাদের সঙ্গে ঝগড়া করছে মারা গেছে কেমন করে, কীভাবে? মারা গিয়ে তারা কি এদের অসাবধানতার কথা নিয়ে যেতে পারছে? নাকি বাবাও এদের মতো করত, মাঝে মাঝে খেয়াল হলে মারা গেছে। হয়ত একবারই দেখিয়েছিল ট্রেন পড়ে হয়ে লাইনের উপর দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকল, তাই মনে হয়েছে এই শেষটা।

ট্রেন মিলুয়ায় পৌঁছালে নতুনপাড়ার সহযাত্রী মশায় বললেন — যেতে পারবে তো, তোমাকে একা ছেড়ে দিল কেন তোমার মা?

এমনি।

এমনি মানে?

আমি তো বড় হয়েছি।

সাবধানে যেয়ো, কলকাতা শহরটাতে খুব ভাল নয়, কত রকম লোক... আচ্ছা তুমি তো মাস্টারমশাই পাল, এইচ এস পড়ছ। এতে কি ভাল চাকরি হবে?

আমি তো মাস্টারমশাই জানি।

মাস্টারমশাই মানে, কী মাস্টারমশাই?

সব মাস্টারমশাই।

যে যে করে হেসে ওঠেন আরো তিন সহযাত্রী মশাই। বললেন — মাস্টারমশাই দিয়ে কি চাকরি হবে। আহা বালক একেবারে।

ট্রেন হাওড়ায় ঢুকতেই সবাই ব্যস্ত হতে লাগছে, গোছগাছ করতে করতে নেমে যেতে থাকে প্ল্যাটফর্মে। পাশাপাশি দুটি ট্রেন থেকে মানুষ নামায় প্ল্যাটফর্ম মুহূর্তে মানুষের আবার ভর্তি হয়ে গেল। বুলন খুঁজছে সহযাত্রী মশায়কে। কোথায় তিনি? বুলন নিশ্চয়তা হতে চায় প্ল্যাটফর্মে পা দিয়ে। কোন দিকে যাবে? ডান দিকে অবশ্য যাবে। পিছনের মানুষ তাকে ঠেলছে। মানুষের স্রোতে পা ভাসিয়ে এগোতে এগোতে বুলন বুঝল ডানদিক নয়। সামনে সবুজরঙে। পকা পায় হাতে হাল তো সাবওয়েতে নামতে হবেনা। সে ঘুরঘে তো হাল আসতে লাগল। মানুষজন সবাই ঊর্ধশ্বাসে ছুটছে। বুলন বুঝতে পারছে না কোনদিকে যাচ্ছে। সে তো একটি পথই চেনে। প্ল্যাটফর্ম থেকে নেমে লক্ষ্মীটা। এই পথ সেই পথ নয়। ভয় লাগল বুলনের। সে ঘরে যেতে লাগল আসবাবের দোকানের দিকে। কিন্তু পালাচ্ছিল না। এদিকে তো পালাবী হাল আরো কয়েকজন পাহাড় নিয়ে। এই সময় নিশেষরায় বুলনের হাত ধরল একজন। বুলন তাকে দেখতে পেল না মানুষের ভীড়ে, কিন্তু কণ্ঠস্বর শুনল, তার বাবা — এদিকে আয়।

বুলন চলতে লাগল। সে চলছিল না তাকে যেন কেউ টেনে নিয়ে উঠতে লাগল সাবওয়ের সিঁড়ি বেয়ে। বুলন ভীড়ের ভিতরেই মাঝে মধ্যে হাত ঝাঁকাচ্ছিল, তাড়াতাড়ি আয়।

লক্ষ্মীটায় এসে পৌঁছে সে শ্বাস নিল। কিন্তু লোকটা কোথায়, যে হাতে নিয়ে এল এইদিকে। তার বাবা! না হলে কে? বুলন আরো আরো জোরে হেঁটে এগিয়ে যাচ্ছে ওঠে। ছেলের একহাতে গিয়ে দাঁড়িয়ে আয়নায় চোখ মেলে নেয়। মেয়েরা আরো কত নীচে! ঘরের ভিতরে মেয়েরা ছায়া। শব্দ জল আসছে। আর বাবাও ঠিক এইভাবে পার হয়েছে। আচ্ছা তাকে কে নিয়ে এল লক্ষ্মীটা পর্যন্ত? সত্যিই বাবা! বুলনের চোখে জোল তারা হয়ে যেতে লাগল।

বাসুঘাটি থেকে বাসে চেপে আসিপুর সামনা পথ। দশতলা মস্ত বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে বুলনের পা দুটো থরথর করে। বুলন লিফটে-এ চেপে তার বাবার মতো ভয়ে উঠে যেল না-একবার। অফিসে ঢুকে দেখল বেশিরভাগ চেয়ার ফাঁকা। এখনো অফিস বসার সময় হয়নি। এই অফিসে তার বাবাকে খুব ভালবাসত তেমন একজন মানুষ আছে, দীপেন পাল। তাঁর ঘরেও তিনি নেই। আর তার জায়গায় বসে আছে অন্য মানুষ। বুলন ভিতরটা খুঁজে বাইরে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। একজন দু-জন করে এসে

[illegible] চালু করে দিচ্ছে কখন। মানুষজনের কষ্টকর ভাবনাকে আরও কষ্টকর করবার জন্যে [illegible] বসিয়ে রাখবার ব্যবস্থা। অনেকক্ষণ বাইরে অপেক্ষা করে বুলন আবার ভিতরে ঢোকে। আশ্চর্য! আজ অনেকে তাকে দেখেছে অফিসে ঢোকার সময়, কেউ বিশেষ কোনো প্রশ্ন করেনি, দু-একজন জেনেছে, একজন জিজ্ঞেস করেছে সে কেমন আছে — এইরকম। সবাই এত ব্যস্ত! কেউ কেউ তাকে আসতে চিনতেও পারেনি। দেখে ভিতরে ঢুকে গেছে। অথচ এরা অনেকে বসবার ঘরটায় পেতে ছুটি নিয়েছিল তাদের অনেক। পরে যখন মাকে নিয়ে এসেছে অনেকে বসিয়েছে তার টেবিলের সামনে। চা খাইয়েছে। আজ কী হলো!

বুলন ভিতরে ঢুকে খোঁজ করল বীরেন পালের। তিনি নেই। রথযাত্রা দেখতে পুরী গেছেন, ফিরবেন দেরি আছে, তিন সপ্তাহ তো বটে। বুলন তার ব্যাগ থেকে চিঠিটা বের করে বড়বাবুকে দেখাল। তিনি চিঠি উল্টে-পাল্টে দেখতে দেখতে বললেন — পাস সাহেব ফিরলে হবে, চিঠিতে তাঁর সই।

বুলন জিজ্ঞেস করে — আমার অবাকে আপনি চিনতেন স্যার?

বড়বাবু মাথা নাড়লেন, না, না আমি তো তিন মাস এসেছি। ডাই-ইন-হ্যাজারস কেস বিল্ডিংয়ের মতো পড়ে আছে দেখছি, তবে চালুরি হয়েই যে বলা যায় না, তুমি চাইল্ড জানো?

সে স্যার।

কম্পুটার শিখেছো?

না।

তাহলে কী জান?

মানসিক।

বড়বাবু মাথা নাড়তে লাগলেন — মানসিক, মানসিক নিয়ে কী হবে, তোমার বরং কম্পুটার শিখিয়ে দিলে

বুলন বড়বাবুর কথা শুনছিল না। জানালার বাইরে তাকায়। ঝাঁঝাল বৃষ্টি নেমেছে। তার কথা বলতে মানসিক। অফিসে অফিসে ঝাঁঝালো থাকে। বুলন ভাবে — তার তো আছে আরও, সাহেব আছে। ওদের বুলনের বাবা বলত, মানসিকেও তো সাহেব আছে, এমনি-এমনি হয়ে যায় নাকি?

কথা বলতে বলতে বড়বাবু আড়চোখে দেখে নিয়ে বুলনকে দেখলেন। জিজ্ঞেস করলেন — কী দেখছ?

বৃষ্টি স্যার, বেটন।

ভারী বৃষ্টি।

বুলন অবাক হচ্ছে, তাইতো, কোথায় বৃষ্টি। বৃষ্টি তো আসছে হাওয়া, ঝড়ের মতো কী দেখছিল। না, না, ওই তো কৌটা কৌটা এসে পড়ছে জানালার কাঁচের গায়ে। বুলন বলল — বৃষ্টি আসছে।

হাঁ, তুমি বসো আজ যাও।

আজকের টাকা-পয়সা?

পরে, পেয়ে যাবে। তোমার আগে যারা এসেছিল খুব খুঁতখুঁতে লোক ছিলেন, তাদের কাজ পেছ না।

বুলনের মুখ অন্ধকার হয়ে গেল।

বুলনের মুখ অন্ধকার দেখে বড়বাবু বললেন — খুব খুঁতে হওয়া অনিশ্চিত ভাল, তবে তাতে লোকে হয়রান হয়।

বুলন মাথা নাড়ল — উঁহু, আমার বাবা মানসিক জানত।

বড়বাবু বোধহয় কথাটা শুনতে পাননি, বললেন — এইরকম শুনেছি, আমি তো ওঁকে দেখিনি।

বুলন বৃষ্টির ধারা দেখছিল। ঝাঁঝালো অন্ধকার হয়ে এসেছে। অফিসটাও যেন চুপচাপ আজ। যারা আছে আজ কোনো কাজ হবে না। আশ্চর্য! কেউ তাকে জিজ্ঞেসই করছে না। ওই যে বৃদ্ধা সেদিন, আগের দিন ছিল, তাকে লজ্জা না করে বেরিয়ে গেল অফিস থেকে। ওই যে নিরক্ষর রায় কার সঙ্গে টাই পরার কথা বলছে অফিসেরই আজ নিয়ে। ওই যে হাসছে একটা লোক, তাকেও দেখেছিল বুলন তাদের বাড়িতে কবার বুড়ুল দিতে। অনেক লোকই চেনা। একজন খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে তাকে দেখে আবার চোখ নামিয়ে নিল কাগজে। বুলন ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল। সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। এই অফিসে কেউ সিঁড়ি ভেঙে নামে না। সবাই লিফটে, বুলন এ-তলা থেকে এক তলায় নামছে ঝুঁকে ঝুঁকে। অফিস এখন পুরোদমে চলছে। ওপরতলা কথায় বাড়িটা।

নীচে নেমে বুলন দেখল সত্যিই বৃষ্টি হচ্ছে। আকাশ ভেঙে জল নামছে এই শহরে। বেরোনোর মুখে অনেক মানুষ জড়ো দাঁড়িয়ে আছে, বৃষ্টি থামলে তারা পথে নামবে। বুলনের একদম ভাল লাগছিল না, সে বৃষ্টির ভিতরেই নেমে এল সবকিছুকে ঠেলে ঠেলে।

কে যেন বলল — ছাতায় কী হবে, দাঁড়াও খোকা।

বুলন সাড়া দিল না। বৃষ্টিতে স্নান করতে করতে এগোয় শূন্য পথে। ঠিক সেই সময় বৃষ্টির ভিতরে ডাক এল- বুলন, বুলন শোন।

বুলন ঘুরে তাকায়। আপনা পথে দাঁড়িয়ে থাকেন, কিন্তু ঠিক শার ছায়া ছাড়াই বৃষ্টির ভিতরে কেউ একজন এসে দাঁড়িয়েছে, চেনা লাগে, বলছে নতুন জন্মে ছিলাম, বাঁচালিনে!

কুলন বলল, ভাগ্যিস লাগছিল।

কেন?

চেনাযাবে সবাই ভুলে গেছে।

তাতে কী হয়েছে, এই তবয় ছেলে।

কেউ আমাকে চিনল না সেইজন্যে।

তাতে কী হলো?

আমি আত্মিক জানি, আত্মিকে এসব হয়।

কী হয়?

চেনা মানুষকে সবাই ভুলে যায়, মানুষরা দুষ্টিয়ে দেয়। কুলন দুটি হাত আকাশে তুলে চেঁচিয়ে উঠল, আমি ইনভিজিবল তবন, এটাও আত্মিক।

কী বলছিস?

আমেনা লোকজনকে চেনে সেজন্য তবে তুলল — আত্মিক আত্মিক, তব বিষ্ণু, সব মানুষকে, সব জায়গাকে চেনা জানে হবে।

তা আবার হয়, এ আত্মিক সব জায়গায় চলে না।

কুলন অবিশ্বাস আরা ঘরটির চিতরে একা আকাশে বলতে ইচ্ছিল নির্জন শাকশা উপর নিয়ে। কী নিকে পড়া। কুঁসছিল নদী। কুলন গর্জন করছিল।

ঘিন

সেদিন অনেক রাতে বাড়ি ফিরেছিল কুলন। চোরগোলে আঙুল ছুইয়ে ডেকে উঠেছিল, মা, কই গোপাত?

মনিরা তাকিয়েছিল তাকে দোষারত ডাকল বীপেশ্বরনারায়ণ, কুলনের বাবা।

ঘিন ঘেটেন তাপারে অন্ধকারে বাঁড়িয়েছিল কুলন। তার মাথার কোলকুনি সক এক ফালি চাঁদ। কুসুমপুর নিস্তব্ধ। সেটি খুলে কুলনকে ভিতরে টেনে নিল মনিরা। কুলন কাঁপছিল। তার ভাত কোথায়? মনিরা বাড়ে কুলন জানে না। ছেলে জানে না। মনিরা ভয় পেয়ে কুলনকে আঁকড়ে ধরল — দুইজনে ফিসফিস, চোখে কেন এলো ভাড়লাম কুলন।

কুলন বলল — আমি মাত্রিসিদ্ধান হয়েছি, তাদের বলেছে।

ধ্যাৎ, ধ্যাৎ! গায়ে দুম ঘরে পুড়ে যাচ্ছে।

কুলন বলল, সবার সাথে কথা হয়েছে মা।

আহ্! থুই থাম!

ওকনো জামাকাপড় পরিয়ে কুলনকে ঘুম পাড়িয়ে দিল মনিরা। তারপর একা বসে থাকল চোখে। রাত এগারোটা বাজতে উঠে বসল কুলন। চোখে এল বিছানা থেকে। মনিরার দিকে তাকিয়ে পাশে বসল। মনিরা ছেলের কপালে হাত দিল। না, জ্বর আসেনি।

কুলন বলল — বাবা খুব ঘুঁটপুটে ছিল না?

কে বলল?

বাবার হাতে মোকে হরকার হলো, আজ পেত না!

কে বলল?

তোমার মনে হয়নাল ছিল না মা?

এসব কী শুনে এসি?

অফিসের লোকের মনে কি লয়মায়া থাকে না?

জানি না।

মানুষকে সবাই ভুলে গেলে ভালো হয়, বাবাও কি ওইভাবে ভুলে গেছে?

আমি কিছু জানিনা কুলন, তবে তোর বাবাকে সবাইকে ভুলতে একটি মনে এসেছিল আত্মিক, তোর জন্যে অনুকরণ ভুলেই গিয়েছিল।

কুলন বলল — বাবা ট্রেনে আত্মিক দেখাত।

কে বলেছে তোকে কুলন? ডাইনসর কথে ওঠে মনিরা, তোর বাপ বেঁ বলায় সব ভেস্তে গিয়েছে।

কুলন হাসছিল তয়। তবে তা মনিরা বুঝছিল কুলন উঠে গিয়ে বারান্দার ভালা দিকে বাঁড়িয়েছিল। কুলন বলছিল আত্মিকই শিখায়। শিখে আসছিল তবে দেখে খুবে ট্রেনটা, সেখানে অনেকে তবু সবজায়গা বসায়। কুলন বলছিল আত্মিকই শিখবে। শিখে আসছিল তবে দেখে বলছিল অফিসবাড়ি। তবু ছবছে অনেকে পাশে টানেল থাল, যে এখন পুরীতে। কুলন বলছিল আত্মিক শিখবে, শিখে আসিল কথে দেখে তাব। তবু ঘটিবারে সে ছোট, একা আত্মিসিদ্ধান। কুলন বলল — আত্মিক ছাড়া বাবা বাঁচতে পারবে না। সে আত্মিক নিয়ে বাঁচবে।

তখন মনিরা বুঝতে পারছিল এই ছেলেও তবে আজার মতো হবে ভোনোদিন কুসুমপুর ফেলে ভলে যাবে ভেজাবে এর জন্য এসেছিল এখানে। মনিরা সেই নিমাটির তথা ভেবে কাঁদছিল গোপনে।

মাঠের কার্তিক

স্বপ্নময় চক্রবর্তী

মাঠপুকুর স্কুল নাম চন্দ্রকান্ত মাহাতো। কিন্তু অঞ্জলি মিত্তির থেকে চাঁদু বলে ডাকেন। অঞ্জলি বাবু হলেন অন্নপূর্ণা রাইস মিলের মালিক। ওই মিলের চিমনি দিয়ে এখন আর ধোঁয়া ওগরায় না। কখনো চাওয়ালে ধান শুকায় না, এমনি এমনি উনুন পড়ে থাকে। ঐ মিলটা বন্ধ হয়ে গেছে। ওই মিলটার যে পরিচয়, ঠিক তার সামনে একটা স্বর্ণচাঁপার গাছ আকাশছোঁয়া করে

বাড়িয়ে থাকে। তাই দেখে অঞ্জলিবাবুর দীর্ঘশ্বাস — মিলটা যখন চালু ছিল, বুঝলেন বুধো বাবু, তখন গাছে একটাও ফুল থাকতো নাই। সব মেয়েরা-টেয়েরা মেয়াদ্দোলাতলায় সব এক একটা ডাবু ফুল ধরে যেত। গাছের ফুল ছিঁড়ে, মাথায় লাগিয়ে, কী বলব বুধো বাবু —

বুধো বাবু মানে ব্রজ বাবু। ফুড ইন্সপেক্টর, এখানেই পোস্টিং। জয়রামপুর, মুলবাড়ী, পুরুলিয়া, লাইসেন্স টাঙ্গু, এই অঞ্চল ঘুরতে হয়। এইসব অঞ্চলে কয়েকটা রাইস মিল আছে। আগে রাইস মিল থেকে লেভি আদায় হত। তখন ব্রজবাবু-জোহারের কাজকর্ম ছিল। সেই কবে লেভি আদায় উঠে গেছে, কিন্তু সরকারী অফিসে যা হয়, পোস্টিং রয়ে গেছে। এই অঞ্চলে বেশ কয়েকটা রাইস মিল থাকায় ব্রজবাবুর এখানেই মাসের বেশ কয়েকটা দিন কেটে যেত, ফলে এখানেই একটা অফিস করেছিল। এখন ও ওর বাড়ি বর্ধমানেই থাকে, মাঝেমধ্যে এখানে আসে, কিন্তু অফিসটা রয়ে গেছে। ঐ অফিসে লিওন ইন্ডিয়া। ও এখন ঐ অফিসে বসেই ডাক্তারী করে। সহজ হোমিওপ্যাথি শিক্ষা বইটা কাছে রাখে। সচিত্র এ্যালোপ্যাথি শিক্ষাও আছে। গরুর চিকিৎসা করে, আবার গায়ের ব্যথা কমানোর জন্য বালাপড়া, নজর লাগার জন্য ঝালপড়া,

মৃত্যুকথা গাড়ীর জন্য ঘুলোপড়া এসবও করে। ইদ্রিস এক কথায় এ অঞ্চলের ঝোলা-ঝালরি-মুড়িদের মুখিয়া আসান।

ফলাদল এখানে এসে ইদ্রিস ফলদলের বাপ হয়ে, ছাড়া হয়ে। গাঁয়ের মানুষজনদের যে ইদ্রিসকে মাঝিলাগিয়া জর-ভক্তি করে, সেই ইদ্রিস আজ ছেলে-ছোকরাকে কলছে, সে তার বড় অফিসার বটে।

ফলাদল এখানে এসে একেবারে একজনের অন্তঃপুর্ণা রাইস মিলটিও খুয়ে যায়। মাইক্যাবাবুর সঙ্গে একটু গল্প-গাছা করে। কখনে কখনো মিলের অফিস আওয়ার বিত্তিরও আসেন, পরিদর্শনে করেন। বলিদর, এখানে আছে। ওখানে ফেয়ার, টেবিল, সিন্দুক, সবই আছে, শুধু টাকা-পয়সার লেনদেনের নেই আর। এখন আর সেটি নেই, আওয়ার মিত্তির অবুশ ফলকে খাটির বন্ধু করেন। সার ডাকেন। ফলে বলে — আমি আপনার ছেলের বয়েসী আর ইকবালে কেন? আওয়ার বাবু বলেন — সে কী গো, ছেলের বয়েসিই বটি, আর লাতির বয়েসিই বটি, সারকে সার ডাকব নাই?

ফল বলেছে — একার মিলটা খুলুন। খুব ভুলা থেকে এখন তেল বার করা হচ্ছে। চাল থেকে পয়সা হবে, তেল থেকেও পয়সা হবে। আওয়ারবাবু বলেন — তা আমি কী করব বলেন, ছেলেরা কেউ আর রাইস মিলের ঝামেলায় যেতে চায় না। ই সব লাইনে আর আসার। বড় বড় কারবার হোর রয়েছে পুরুলিয়া শহরে, হইলছে মন্দ না। ডাক্তারবাবুরা সব এক জায়গায় আসরের রাশা করেছে। মেজদি ওকালতিতে ফস্টীকলিরি করে। সেজ পুরুলিয়াতে বাড়ি-ঘর-দোর করেছে। তার ছেলে-মেয়েরা সব ইংলিশ মিডিয়ার ইস্কুলে পড়াশুনা করছে। ছোটটা ইঞ্জিনে থাকে ঘটে, তার দ্বারা মিল চালানো হবেক নাই। ঝামেলা হেক কম। মুনিস যারার ছিল কিনা। এখন অবিশ্যি করেছে। ও হে ইঞ্জিনে পি. ডি. ও. হল বলিতে খুব জানছি। আমরা দ্বারা আর লতুন করে মিল চালানো সম্ভব নয়। কী কালেলা হে, বারোস্, এক গাল দেয়ার নিয়ে যাও। তার পরে এটা লাও, ওটা লাও, বেনাস লাও, মেটিরেজেন লাও। পারব নাই। এখনকার যুগ হচ্ছে কম মুনিস, লাভ বেশি।

এসব শুনে মাইক্যাবাবুর মন ভাল থাকে না। মাইক্যাবু ফলদলকে নিজের গল্প বলে, ফলেরও গল্প বলে। আর আসে মিলের ধান ডাকোলের ডায়রাল। ওখানে ফলদলের জায়গাটা ছিল সুপরভাইজার। ও মাইক্যাবু হয়ে ফিরেছিল। ফল ঐ মিল চালু অবস্থায় দেখেছিল। তিনটি দিয়ে ধোঁয়া বেরোতো, অফলটাকে কী হেবস একটা ঘাড় তার পক্ষ ছড়ানো থাকতো। সারের মধ্যে গায়ে কাপড় মেকাবো ইঞ্জিন বাবু, বন সেন্ড হত। সিজেনটি কলা বেলায় হাতে আপিসারী ড্রেসটার উপেট-পাপেট দিত ঐ ধলা, কাজ করতে করতে গান করত। তকনো হলে মেশিনে যেত। মাইক্যাবু কী শাটা টেনে টেনে ঐ কাঁকালো চাহারাকে খুলত, খুলপুটি করত।

মাইক্যাবুও ফলকে হাসিকে নানারকা মিলের গল্প বলতো। ঐ যে পুকুরটা দেখছেন ঘুপো সার, এখন ঘিব মেরে পড়ে রইছে, এমন ছিল নাই। বখন গরমার দৌ থাকত, সব মেকেনগুলি ঐ পুকুরে কাপাত, কী ঘটাঘুটি, পুকুরের জল ছলছলাম, হলি, লুটোপুটি, জলের পুটিপুটি, ফেলা। ছেলের জন্য বখন উঠো আসত, জলে ফেলে থাকত খোপ দিয়া ধরে পড়া কার্তিকিয়াপারা ফুল।

অনেক দিন ধরে বলা মিলটাকেই দেখছে ফল। মাইক্যাবু নানারকমেই মিলটাকে জান্ত করে রেখ। মিলের গলিগরটার পাশের অফিসঘরে অন্তঃপুর্ণা রাইস মিল খুলতে হবে — আলকোহলের এই লেখাটা ভিরল হয়ে গেছে।

— মিল বখন বন্ধ হল, বুধলাম বুশোবাবু সারা, আর বুধারকম নাই তি কেতি উঁহারাদের হইল। তুন মেয়ে বইসে হইলেক সব। আর আমি বাবু। মাইক্যাবু মালিকের লাক। বুঝী কি বুইলতে পারি মেয়া পার্টি বাবুদের ঠিহে যা, পার্টির লক এল, মেয়েরা আপনে মোরা কলাসে, 'খুইলতে হবে খুইলতে হবে' বোলান করাসে, আপনে পোস্টার লিখা হয়। তারপর বাবুদের মেরে ঠিহিন্দি করাল, তারপর বর্ষার জলে খুইলতে হবে কারসে হুবে খুলো গেল। আপনিই মালিকের ঠেহে বলেন না — মিলটা তেন খোলে, এ্যা? — বখন বোঁড়া পুকুরলো টিউবিনে ভিব মারতে হাবে গেছে, ফুলমনির মায়ে-ঝিয়ে ইটভাটায় গেল, বর্ষায় আর ফিরা এল নাই।

মিল খোলার ব্যাপারে ফল তেন আওয়ার মিত্তিরকে বারবার বলতে যাবে। আওয়ার মিত্তির তো বলেই দিয়েছে ও উৎসাহী নয়। বলে দিতে পারে আপনার কেন এত উৎসাহ বলাই? তবুও বলেছিল ফল। বলেছিল — মাইক্যাবু নিজেকে এই

বিলের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছে। সব সময় এই বিলটার গন্ধ ওকে। আজকাল মিতির একথা কথা থেকে নিয়েই বলেছে — টাবু মহারাজার বন্ধ ওপারপড়া ঘাম। মিলটা আসার পর এই টাবুকে যে পাহারাদার দেখেছি। বি.টি.ও হলে হলে উনাকেই বানেজার বলাইব।

মাস্টারবাবু বলেছিল সিনিয়র কাম জুনো কাম মাটে? আজকাল টিচার্সরুমে ঢুকলে ঢোকে দুটো ছেড়ে, তিনটা ছেড়ে বলে যে ... জুনো কাম মাটে! যখন মিল চালু ছিল, যন বছরখন ঘুরো, গ্রামের ওঁরো, কত রকমের লাম যে যা ..... ফাটকি জোল, কালো জোল, কাক ডুবানি, শীতে পাল, কাটি কমল

তারপর জলা-পল্লা-ডাঙা-আইয়োরোটে জো আছেই। বাদরহিং, মেনিঞ্জাইটিসের সময় ইন্টিম ঢুকাতে, কী সুবাস যে যা .....

মাস্টারবাবুর সকালটা এরকমে কাটে সন্ধ্যেবেলা উঠে এক ঘটি জল পান্তা। তারপর জারিকেনে হাত কাটিয়া থেকে আনা গন্ধ তেল কয়েক ফোঁটা ঘটির ট্রিটমেন্টবেসিনের জলে মিশিয়ে নিয়ে পুরো ঘটির জলটাকে পরিষ্কার করে নেয়। সেই জল খানে ছিটিয়ে দেয় পুরি-ঘরে, তারপর মিল গেটে, ওপাশে, চারপাশে। জল ছিটোনোর সময় বিড়বিড় করে। কত পড়ে কিছু। বোধহয় ওর নিজস্ব ছোনো মন্ত্র। শুদ্ধ হয়ে তারপর ফুলগাছের ছিটিয়ে দেয়। ছোকরার জানা হয়ে গেলে কথা বলে। তারপর ফুল তুলতে যায় মাস্টারবাবু। পরিষ্কারের পেছনে কলা গাছেদের কাছে ফুল রয়েছে। একটা কাদু নিয়ে কাদু মেরে পরিষ্কারের বারান্দা, আর বন্ধ চারপাশে। দূর থেকে কয়লাগুড়ো উড়ে উড়ে এসে চারপাশে পড়ে, মাস্টারবাবু পরিষ্কার করে। তখন ওভেরবার আগে চারপাশ পরিষ্কার রাখতে হয়। মিতির অনাই বাথে মধ্যে এসে টাবু ফেলোসিন লেটিক ধরিয়ে হা করে দেয়। গন্ধটের কালো ফেলুর ফল তিনশ টিনির পরিষ্কার করে দেয়। আজকাল মিতির বলেন — আর কেন যে খাটিস টাবু, ঐ চারপাশ এত তকতকে রাখিস কেনে? কী হবেক? মাস্টারবাবু বলে — অইয়োশ্চি হইয়লে চইলবেক।

দুপুর বেলা পরিষ্কারের বারান্দায় তখন ঘামুক গেছে ও এলিয়ে দেয় মাস্টারবাবু, সাথে মধ্যেই হাতে তালি মেরে জল ঝাপ্ করে। পাখি তাড়ায়, ফেলে চারপাশে যন ওকেছে, আর গ্রামের পাখি এসে যন খেয়ে যাচ্ছে।

একদিন ছোটোবাবু একটা লোক নিয়ে এল, হাতে ফিতে। মাপজোক হল। বি.টি.ও হল হবে তখন ঘরে। কিছু ফেন্সি থাকবে, আর কিছু প্লাস্টিকের চেয়ার কেনা হবে।

এসব অনেকদিন যন পরপরে হৈ-চৈ চাঁড়া। মানুষজনের ঘুরে ঘুরে গালুক ফুলের মত টাটকা হাসি। সাজ গ্রামে গেছের গন্ধ, নতুন খড়ের। ফেল যাচ্ছে, মানুষ যাচ্ছে, সক্ত চাকলি - পাটিসাপটা হচ্ছে। সন্ধেন। আর এই নগরের সমস্তটাতেই কাঁকা মাঠের পোলন আলোর-কালার, যাচ্ছের কাটল, ইদুরের গর্ত থেকে পাহারা-ঘুঘু চড়াইয়ের সঙ্গে খুঁটে খুঁটে, গর্তে হাত ঢোকিয়ে যন খোঁজে পরিষ্কার ছেলে নিলেয়। মাস্টারবাবু তখন বেরিয়ে যায়, চৌকে ভবভালাস নেয় — হেই পাকা, সোয়াটক পেলিয়া, এই মানুষ, ইদুরের কন্তটা হল।

মাস্টারবাবুর নিজের সন্তান নেই। নিয়ে করেছিল, বউ ওকে দাস মন্ত্র করে কোন গোক্ত ধরনের কাছে চলে গেছে।

সেই অবে থেকে টাবু মহারাজ বিস্তিরদের মুন খাচ্ছে। সেই ছোটবেলায় বাপমরি করতে ঢুকেছিল। তারপর মিলে কাজ দিল ওরা। সেই থেকে মিল ছাড়েনি। অনু মন, তনু মনু। আরপোলার যেমন পাখি। জড়িয়ে আছে আছে মাস্টারবাবু একা একা চারচালের টিনের দিয়ে হাটে। একদিন ওকে দেখেছিল চারচালের টিনের ঝিমনির ছায়া পড়ে আছে টাদের আলোয়, সেই ঝিমনির ছায়াটাকে বারে বারে মাস্টারবাবু।

সন্ধ্যের পরই গ্রামে টিনের। মন্ত্র তখন রোদ্দুরের হং খায়। জগদীশপুর থেকে জামদেবপুর থেকে ঠাঁড়া ঠাঁড়া রাজন আসে, কড়াইবনা পুরুষ্ট হচ্ছে ভাজা মাটে। গন্ধের ভিতর কানের গন্ধ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে বাতাস। যন আলার টিপিক টিপিক। বাক্সগুলি নিয়ে নতুন চালের বাড়িয়া তৈরী হচ্ছে। নলে ঘরিচের গুঁড়ো ছিটানো সেরাই আজা এসে গেছে বিহার থেকে পলিথিনে করে, চায়ের দোকান গুলোতে সকাল-সন্ধ্যে জিলিপি ভাজা হচ্ছে।

মাস্টারবাবু এরকম সময় ছুবকে বলে — জানিসোন সাহা, ইরকম সময়ে মিলে কত যন ..... বক্সাকে বক্সা .....। খই গাছের গুলায়, নিশানে বেরাই হত। আর মোক ইদুর ধরা পইড়ত — তিন গন্ধা, চার গন্ধা, ইদুরের কালে। কোঁড়াগুলান দিয়া খেত। উনারা ইদুর খেইতে ভালবাসে। এই সময় হৈ করে মাস্টারবাবু।

মাইলস্টুন বী পায়ে একটা খুব আরামের লাফের সময় কেমনের সব চলে যায়। আগে কার্তিক মাসতো, এখন আর পাবে না। অনেকদিনই কার্তিক পায়ে না। মাঝে মাঝে নাবপড়ুলি করে। মধ্যযোগের আর ফসল পাওয়ার হয় না বটে, কিন্তু মাইলস্টুনকে মানায় না। খুঁড়ি কই? নবান্ন যৌ-এর সময় নয়, যৌ-এর আসল সময় চৈত্র মাস। যৌ-এও হয়। কিন্তু এদিকে নবান্নের পরই যৌ হয়ে যাবে। পৌষ-মাঘ মাসে বড় চাষের পর হাতে সময় থাকে চাষীদের। বাসাল, ঘুনিশ, ভাদুয়ারা, এরা সেকেলের বাড়িতে খাটে আর বিয়াসালল-এর সময় পায়। দু-চারবার বিয়াসালল নিয়ে ভাব-ভাবনা খেলেই এ অঞ্চলে যৌ নাচ শুরু হয়ে যায়। এই নিয়মের ব্যতিক্রমে যৌ হয়। মাইলস্টু নিজেই উদ্যোগ নিয়ে যৌ নাচ করান। দিল যখন চালু ছিল, তখন নিয়মের প্রতিবন্ধকের অনেকেরই নাচত। এখন দিল নেই, তবু যৌ হয় ঐ নিয়মের মাঠে। পর বছরের হয়েছে চলে যায়। চাষাড়ে বসে সেকেলে ফেলে।

মাইলস্টু ছলকে যৌ-এর গল্প করেছে অনেক। মাইলস্টু যৌ কে বলে জেনে। মাইলস্টু বলে — আগে যখন যৌ নাচ হত, তখন আসরের মাঝে মাঝে মশালের আলো জ্বালা হত। ছেলে-মেয়েরা সব ফুলঝুরি নিত। সেকেলেরা বুট ভাজা নিয়া আসরে বসিয়ত। বাজনার তালে তালে বুট ভাজা ছিটানিত। লাফের তালে ধুলা উড়িত। অসুরা বাজনা। এই বাজনা বাজলে ঘরে কেউ থাকতে পারতো। এই বাজনার তালে বিভিন্নের পাজর হতো শরীল আপে। আমি যখন আর্তিক লাফিয়েছি, তখন ফুলঝুরি পেয়েছি। সন্ধ্যা ট্রেনটিক বাহরে বেরিয়েছেলা, ও-মো-মো-মো কার্তিক বন্দনার গান গাইনে।

মাইলসে যে জন মহুর বাহন
চড়া দিয়া ধনুক বাবেছে
রাই আজ কি হবে হবেছে।

আর কার্তিকের বাজনা গাইনে —

গেছেন, কী কী গেছালেন
ওর আক ছেয়ে কেটে আক
কী গেছালেন, কী গেছালেন,
আক আক আক
গেছেন কী কী গেছালেন কী গেছালেন

মাইলস্টু একটা কাজলার গোলে বুরাত দিয়ে বাজাতে থাকে, আর কাঁকালে বাঁধে বাঁধা।

মাসে একবার ঘরে আসে ছল, আসতে হয়। আর মাসে এসেছিল এসে দেখল তখন ঘরটা ঠিক হয়েছে। মাইনবোর্ড হয়েছে। মাইনবোর্ডে লেখা হয়েছে অসম্পূর্ণ ইমিজ। একটা টিনের বোর্ডে কতগুলি পেরেক মারা। বীর হনুমান, জমি মেরা নাম, মজুরি, বাজা ভাতাকলাপ। একটা বাঁশের বেলিং। ঘেরা হয় ভীড় সামাল দেবার জন্য। মাইলস্টু জল খেয়া হয়ে পাশে হাত দিয়ে বসে আছে। ছল ওর কাছটা ভাঙল ধারাপাত। বলল — কী মাইলস্টু। চালু হয়ে গেল? মাইলস্টু হাতটা কপালে ছুঁইয়ে খুশিতে সালাম। ঘোমটা বলতে চায় বসতে ছিল।

— ভালই তো। তুমি এখানে কাজ করছ না?

— আইজ্ঞা। না করলে উপায় নাই।

— কি করতে হয়?

টিকিট বেচা, কাইন সামলে দেখা, সিটি বুকিন দেখা । ইহার নাম ম্যানেজারি বটে। বুঝিলেন?

— মাইনে পাচ্ছ?

— পাচ্ছলা কী কথন স্যার! কে আছে আমার? কিন্তু ই-বাজার থেকে হুকের লাই। কেউ বিয়াসালল করছে নাই। সবাই ইখানে ডি.ডি.ও সেলিমার করেছে। গান বেচা পড়লা ইখানে চলেছে। ছোক ছোক বিয়াসালুন খাই করাচ্ছে। কী সব শহর স্যার, ভাত হজম কাঁলা খাপা। আমাদের যৌ নাচে অসুর কিংবা হনুমান ভাত হজম আপা-ছাপা হোয় কিন্তু সেলিমার ওদের কাঁপাছাপা লাইটন বাজনের। সিখানে মেয়েছেলারাও নাচে। বড়ি শিখায়। আমাদের যৌ-এর লিডার আসলার মৃতি ভেলি ভেলি বলছে আছ, ভেবো আর, বিয়াসালল মাইনি আর, কেউ করে লিচ্ছে না, সবার ইখানে সপালপি ভাইয়ছেছে। যারা সেলিমা টিকিট কেটে দেইকছে, তারা তো দেইকছেই, যারা টিকিট কাটিয়ে পারছে, তারাও ইখানে ভীড় করছে।

সেদিন খুশুর খেলাটির বেশ ভোরবুর ছিল। ভোরবুরে ঘরেই ছল আর মাইলস্টু কথা বলছিল। খুশুরে ভিড়িও চলে না। বিকেল চারটের সময়, আর সাতটার সময়, দুবার শো। বেলা দুটোয় শীতবেলাতে উত্তরের বাতাস মাঝে মাঝে ঝাপট মারছিল। বাঁশের লাগাল অস্থায়ী ভিড়িও হলের টিনের শাটে ঘষা হচ্ছিল। কয়েকটা রাজা সিনেমার পোস্টার পড়েছে। ওদের এখন অন্ধকারজান হয়েছে। ওরা পড়তে পারছিল 'র এ ছলুই ন- খুন। ল এ আবার

ও আছে। কিন্তু ধন্য-র এ জাতে ডাইবক্ক ও এর ভালো ধন্য-র সিলে এটা হয়ে ঠিকমতো টিকাতে পারছিল না।

হরকাবাবু সেদিন টিফিনের পরে একটা অসুখ নিয়ে পড়েছেন। কীরকমে বলতে পারব না। ঘুমকে বললেন — লাবু, ঐ সোপকেসে ওষুধ আছে। ছোট্ট শিশিটা নাও তাড়াতাড়ি নিয়ে আসো। বাবুকে ওষুধটা খাওয়ার পরেই ঘুমিয়ে পড়লেন বাবু। বাবুর এ লাইন এখন উনি অন্য কাউকে দিয়েছেন।

ধ্রুব বলল — বড় হয়েছে হয়ে যাও। ঐ শিশিটা নিয়ে কি তোমরা সিন আর ধুয়ে ধুয়ে ব্যবহার করো?

অমরবাবু বলেন — ভাই বলে কি কাউকে তিনি লালটু হয়ে যেতে বলেছি? তিন তোলা ধুয়ে ফিনাইল ধুয়ে ঝকঝকে করে শুকিয়ে তবে আমাদের দিয়ে থাকে। আমি ছোট্ট জিনিসটাই নষ্ট হতে দিই নাই।

ধ্রুব বলল — এমনিও নষ্ট হবে, ওমনিও নষ্ট হবে। একদিন দুদিনের মধ্যে বড় বড় ব্যাকটিরিয়া খা মেরে টিনটিনে ভাঙা হবে। তখনকার এই নিলটার নাকি ছোট্ট ছোট্ট বাড়ি করে বিক্রি করা হবে। আচ্ছা কাকুর মেজ ছেলে কাকুটাকে বিয়ে, উনিই নাকি এসব বলছিলেন। আচ্ছা কাকু বলছিলেন।

— বটে?

আচ্ছাকাকু বিষয় ঘাবে বসে। তাতে আর আটটা হাসি ফেলে। এই বলে আচ্ছাকাকু একটা সিগারেট ধরালেন।

ধ্রুবদের বেইজিংটা ঘরে ঘরে। পরদিন সকালেরে বাস-এ পুরুলিয়া যাবার কথা। তাই ও আবার একটা সিনেমা দেখতে— নিজ চোখে দেখা যায়। স্পেশাল সিটি বলল ধ্রুব। আচ্ছাকাকু ব্যবস্থা করেছেন। পশ্চিমের থেকে ছেলেরা টেনে ওখানে বসাল। ধ্রুবদের একসঙ্গের হিরো-হিরোইনদের বস্তা ঝুলিয়ে ফেলে। অক্ষয়, মাধুরী, করিশমা কাপুর, অজিতা ঝুলিয়ে যায়। তবে শাহরুখকে ঠিক জিনিয়ে পারে।

হাফ টাইমে বাইরে এসে সিগারেট খাচ্ছিল ধ্রুব। দেখল আচ্ছাকাকু অনেকটা মাল টেনেছে। টলছে। ধ্রুবকে দেখে বলল — আরে, অজিতা জাতিক বটি। সেনাপতি জাতিক। তোরই একটা কাকু সিল ভেঙেছে। (ছোট্ট-বড়োর বাংলা-জ্ঞান) তাদ থেকে কম কাকে কাকু দুই। কাকুটা ডিভিও হলেন সিনেক। ওখানে ওপরটা ছোলাভাজা-বাদামভাজা, কুরিয়ারওলা বসেছে লোকেরা ছোলা-বাদাম খাচ্ছে, তাদ সিনেমের ডাইলগ দিচ্ছে। এরা আচ্ছাকাকুর ভাইপো-ঝোন দিচ্ছে। একটু পরে খুড়ি গোটালো সিনেমাদর্শক আচ্ছাকাকুকে ডেকে বলল — কী হে মাস্টার, ছবটা দিবের নাকি?

এটা হো মাস্টারমশাইরই ডাক মাস্টারমশাই ধ্রুব মামাতো ভাইবোনরা ডাকে আদি থেকে অভ্যাস পালটে। সবাই ডাকে তাতেও ধ্রুব রাগ করে না। সেটা থেকে ডাকে ডাকতে বারণ করেছে। মামাতো ভাই ডাকলে ভিনদেশ হলেও বাইরে বাড়িতে আচ্ছাকাকু ডাকবার আগেরা এরা এরা ডাকনাম অনুযায়ী ডাকে ডাকে ডাকে ডাকে ডাকে। মুখে ডাকে নেয়

— দেখেছ, ধ্রুব কী ডেঞ্জারাস ছোকরা ছোট্ট ডাকে

কী ডেঞ্জারাস বা ডেঞ্জারাস ডাকে ডাকে ডাকে —

নিবন্ধ

খ্রিষ্টান মধুসূদন ও জগজ্জননী দেবী দুর্গা

পীযূষকান্তি রায়

১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারি শনিবার সাবেকি বাঙ্গালাদেশে যশোহর জেলার কপোতাক্ষ নদীতীরে সাগরদাঁড়ি গ্রামে ধনী পিতামাতার সন্তোষে মধুসূদনের জন্ম। একমাত্র জীবিত সন্তান হওয়ায় কারণে অত্যধিক আদর, যত্ন ও আদুরের মাত্রা অতিরিক্ত হয়েছিল মধুসূদনের শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের সময়নাগুলি। আগের এমন পরিহাস, মাত্র তিনপক্ষাল বছর বয়সে নিদারুণ আঘিয়, রোগভোগ ও মৃত্যুশয়ার মধ্যে মধুসূদনের সহনশক্তির উপর নির্ভর করে আলিপুরের জেনারেল (পাওনা) হাসপাতালে ২৯.৬.১৮৭৩ রবিবার তাঁর জীবনের অবসান হয়েছিল। অবশ্য কবি হিসেবে চরম খ্যাতি লাভের সৌভাগ্য তাঁর সাংসারিক জীবনে নিদারুণ অনেক সাংসারিক পরিণতির মতো হয়ত কিছু সান্ত্বনা এনেছিল, যদিও অন্তিম দিনগুলিতে তা নিয়ে তিনি কিছু বলতেন না। তাঁর জীবনের বেদনার একমাত্র উপমা তাঁরই সৃষ্ট রক্ষোরাজ মহাবাহু রাবণ। রক্ষোকুলশূন্যকারী মেঘনাদ হত, একটু সময় কবি মধুসূদনটে ইন্দ্রজিতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনের পূর্ব মুহূর্তে রাবণের জীবনের চরম বেদনার মুহূর্ত—

অস্তগতি রক্ষোরাজ কহিলা কাতরে
ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে
এ বয়সের আমি তোমার নয়নে।
নদি রাজাসনে, পুত্র, তোমায় করিব
মহারাজা! কিন্তু বিধি - বুঝিবে কেমনে
তাঁর লীলা! তাড়াইলা যে সুখ আমারে।
ছিল আশা, রক্ষকুল রাজা - সিংহাসনে
জুড়াইব আঁখি, হবে .....

....দেখিনু - শিয়রে আমি সব যত্ন করি.
লঙ্কিতে কি এই কাজ? কেমনে বিধিবে,
হায়রে, কে কবে মোরে, কিসে কে যেমনে
পুনালক্ষাধামে যায়? কি সান্ত্বনাছলে
সান্ত্বনিব আজি তব, কে কবে আমারে?
'কোথা পুত্র পুত্রবধূ আমার'? ডাকিবে
যবে রাণী মন্দোদরী, 'কি সুখে আইলে
রাখি মোরে বিদ্যমানে, বক্ষকুলমণি'?—
কি করে বুঝাব তারে? হায়রে, কি করে?
হা পুত্র! হা বীরশ্রেষ্ঠ! ডিরজীবী হলে।
হা নাতঃ রাক্ষস লঙ্কা! কি লিখিলা
এ পীড়া ললাটে বিধি প্রবলের ছলে?"

মধুসূদনের জীবন-সায়াহ্নেও নিদারুণ নিষ্ঠুর ভবিতব্য একে একে যে তাঁর পৃথিবীকে এতদূর শূন্যতার রূপে তুলেছিল অক্লেশে লাগিয়া, কঠিন ব্যধি, সন্তানদের অবিবাহ চিন্তা ও অন্তিম শয্যিপেলে হেনরিয়েটার মৃত্যুর (২৯.৬.১৮৭৩) মর্ম নিয়ে তার প্রতিফলন বিলাপ ধ্বনি রূপে প্রকাশিত না হয়ে থাকলেও, বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়দের সঙ্গে কথোপকথনে উচ্চারিত তাঁর হৃদয়ের অন্তিম বেদনা। তবুও হেনরিয়েটার মৃত্যুদেহ সমাধিস্থ করে ফিরে বন্ধু মনোমোহন ঘোষ হাসপাতালে ফিরে গিয়ে মধুসূদনকে সে সংবাদ দিলে মানব জীবন সম্বন্ধে মহাকবের-এর উপলব্ধিতে প্রকাশযোগ্য সেই বিখ্যাত উক্তিটি তিনি নিশ্চুপকণ্ঠে গভীর আবেগে আবৃত্তি করলেন—

To morrow, and tomorrow, and

tomorrow
Creeps in this Petty Pace from day to day,
To the last syllable of recorded time,

Out, out, brief candle,
Life's but a walking shadow, a Poor player
That struts and frets his hour upon the stage
And then is heard no more. It is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury
Signifying nothing.

তাঁর জীবনসূত্রের এই দুই বিপরীত মেরুতে অবস্থান— একটি পরিবারে নিত্য-আসার একঘেয়ে সাদামাটা রূপে জীবনযাপনের এ মেলোড্রামাটিক পরিস্থিতিতে অবতরণ— জীবনের স্বাভাবিক পরিণতিরূপে আজ পর্যন্ত কেউ মেনে নিতে পারেননি। কবিপত্নী হ্রীকন্সটিটিউশনের সাহায্যের তালিকা-নির্দিষ্ট ব্রাকনল অনুদান থেকে-মধুসূদনের স্বাভাবিক পরিণতিতে যে মহাকবীয় বিশাল অনিবার্য তা মধুসূদনের জীবনে লক্ষণীয়ভাবে প্রযোজ্য। অবশ্য তাঁর এ পরিণতির নিমিত্ত হিসেবে কবির ক্রিশ্চিয়ান গ্রহণকেই নির্দেশ করার পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন তাঁর জীবনীকারগণ। যদি বলি এ স্বাভাবিক পরিণতিই স্বাভাবিকভাবে তাঁকে খান করেছে মধুসূদনের খ্রীষ্টান, তাহে হয়ত তা অনেকের ভালো লাগে মনে করবেন অনেকে।

যে কারণে হোক, সমসাময়িক কালের পাশ্চাত্য শিক্ষায় প্রভাবে শিক্ষিত বাঙালী সমাজদের মনে ক্রিশ্চিয়ানের প্রতি দুর্বলতার উদ্রেক যে হয়েছিল তা অনস্বীকার্য। এর পক্ষাতে সক্রিয় ছিল বাল্য কালের খেলার ইংরেজ পাদরিদের কৃপালাভ, হিন্দু সমাজের নানা অন্যায়-কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বা আক্রমণ কিছু। অনেকে আবার ব্রাহ্মধর্মও গ্রহণ করেছিলেন। যাঁরা ব্রাহ্ম হয়েছিলেন, তাঁদের পায় কেউই পাপের স্পর্শ পাননি, কারণ তা ছিল হিন্দু-সুলভের সংগেই শিক্ষাদিক্ষাত প্রতিবেশ সমাজসংস্কারের বিশেষ কিছু সংস্কার ও কুসংস্কারের বন্ধন মানেনা। অন্যপক্ষে খ্রিষ্টান হওয়া ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষার আরেক ধারা সম্পূর্ণ বিদেশী ধর্ম, বিজাতীয়ের ধর্ম, তাই কাপড়েরও ছোঁয়াচ।

শেষপর্যন্ত গৃহত্যাগের পরে মেট্রোপলিটান স্কুলে অধ্যয়ন গ্রহণ করে মধুসূদন খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন ১৮.১.১৮৪৩ তারিখে। তখন তাঁর বয়স মাত্র চব্বিশ বছর। বিষয়টি বিস্ময়কর যে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের অধিকাংশই খ্রিষ্ট ধর্মের প্রতি অনুরাগী হয়ে ওঠেননি, শুধু যুক্তি নির্ভর একটা মানসিকতার গঠনে সাহায্য করেছিল তারা। ১৮৪৫ পর্যন্ত অভিভূতের জন্য ঐ কলেজের দরজাও বন্ধ ছিল। তাই মধুসূদনের হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন এ বিষয়ে কোনো নিশ্চিত সংকেত করে না। তাঁর খ্রিষ্ট ধর্মগ্রহণের ব্যাপারে পাশ্চাত্যে সক্রিয় ছিল তিনটি কারণ। পিতা-মাতার সক্রিয় নিষ্ঠার দায় থেকে মুক্তি লাভ। হিন্দু কলেজে পড়ার সময় এক ফরাসীয় অভিনেত্রীর নন্দিনীর সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব এলে মধুসূদন তাতে অমত করলে তাঁকে কেন্দ্র করেনি। পাত্রে যখন তাঁর অজ্ঞাতে পাকা-দেখা হয়ে গেল, তখন এক বিষম পরিস্থিতির উদ্ভব হলো। এ বিষয়ে মধুসূদনের আত্মস্বীকৃতি কবি জনকৃষ্ণকে কবু তাঁর জীবনীকার যোগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে লিখে জানিয়েছিলেন— তখন মধুসূদন মায়াকে বলেছেন, —মা, কেন এ কাজ করিলে, আমি ত বিবাহ করিব না। মায়া পুত্রের কথায় দুঃখিত হইয়া তাহা ফ্রেঞ্চদিগের একজন ও তাঁহার অনেক প্রণয়ীদের অনেক সুখ্যাতি করিলেন। মধুসূদন সকল কথা শুনিয়া একটি অবশেষে বলিলেন —মা, তুমি যাহাই বল, বাঙ্গালীর মেয়ে রূপে-গুণে কখনই ইংরেজের মেয়ের পায়ারেও এককণার হতে পারে না।" বিবাহের ৫০/১২ দিন পূর্বে মধুসূদন খ্রিষ্টধর্ম অবলম্বন করেন। ... আর এক কথা মধুসূদন জনৈক আত্মীয়কে নিজেই বলিয়াছিলেন, "আমার বড় ইংলণ্ড দেখবার ইচ্ছে আছে, আমার পরের দেশ (ফ্রান্সকে) এমন সুন্দর করিয়া সাজান, যা আমি ফ্রান্সের নিজের দেশ কত সুন্দর। ৪৮.১১.৪২ তারিখে লেখা এক দীর্ঘপত্রে তিনি গৌরদাসকে লিখেছিলেন —

when I go to England -which period, I hope, is not very far (next cold season) I intend taking a picture of yours I am reading Tom Moore's life & my favourite Byron – a splendid book upon my word ! Oh ! how should I like to see you write my 'life' if I happen to be a great poet – which I am almost sure I shall be, if I can go to England আর পুনশ্চ লেখাই ২৯.১২.১৮৪২ তারিখে মধুসূদন পুনরায় গৌরদাসকে একটি দীর্ঘ পত্রে লিখলেন— At the expiration of three months from hence I am to be married dreadfulthough ! It throws up my blood and makes my hair stand like quills on the fearful porcupine ! My betrothed is the

daughter of a rich Zemindar. Poor girl! What a deal of misery is in store for her in the ever inexplorable womb of Futurity! You know my desire for leaving this country, is too firmly rooted to be removed. The sun may forget to rise, but I cannot removed it from my heart. Spend upon it – in the course of a year or two more, I must either be in England or cease to be at all – one of these must be done!' তিনি বর্ধমানে ফিরে ইংলন্ড যাওয়ার পথ সুগম হবে এ আশা নিয়তে বিলম্বিত ছিল তাঁর মনে। এ বিষয়ে কেবলরাম কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও পরে তাঁর উচ্চপদস্থ এক বন্ধুর নিকট মধুসূদন সম্বন্ধে আলাপের পরিপ্রেক্ষিতে ঐ অযোগ্য মধুসূদনকে বঙ্গদেশের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট করে দিতে বলে এসে সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। ঐ অযোগ্য মধুসূদনকে তাঁর উদ্দেশ্য সাধনে সাহায্য করবেন বলে আশ্বাসও দিয়েছিলেন। প্রজাহারাকে আরও একটি আশার উল্লেখ করে গেছেন তার জীবনীকারগণ। গোবীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় নাম উল্লেখ না করে বলেছেন— অপরদিকে তাঁহার পরিচিতা কোনো খ্রিষ্টধর্মাবলম্বিনী বালিকার প্রণয়েও তিনি একবার পক্ষপাতী ছিলেন। গৌরদাস বসাকও তাঁর স্মৃতি-রোমন্থনে লিখেছেন — He used always to tell me that he would rather die a benedict than wed an illiterate girl, and in those days an educated female was a rare a vis in our society, the one solitary exception being in the family of a native christian clergyman, but his hope in that quarter, if any, were nipped in the bud নগেন্দ্রনাথ সোম তো নাম ধামই লিখেছেন তাঁর বহু স্মৃতি গ্রন্থে যে তাঁর প্রণয়িনী ছিলেন মেরী: কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা মেরী। অধ্যাপক প্রমথনাথ সিংহী মহাশয়ের 'মাইকেল মধুসূদন ও একটি লন্ডনের ব্রহ্মচারিণীর সৌজন্যে এ কাহিনীটি বিশেষভাবে প্রচার লাভ করেছিল। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে সম্প্রতি গবেষণার পর এখন প্রমাণিত যে এ প্রেম কাহিনী সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভিত্তিহীন নিছক গল্প মাত্র। তাঁর বিলেত যাওয়ার বাসনা ও সেখানে যেতে পারলে তাদেরকে বড় কবি হওয়ার স্বপ্নও তাঁর পৃথিবীতে ছিল যেন এক অবশ্যম্ভাবী সত্য। তিনি বিলেত গেলেন অনেক পরে, কিন্তু কবিখ্যাতি তিনি লাভ করেছিলেন তার অনেক পূর্বেই। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে তাঁর মৃত্যুতিথি করে গেলেন — আরবী জাতির মতো কবিকুলে জন্মগ্রহণ করেছেন খ্রীষ্টাব্দের ও খ্রী মধুসূদন। কাল প্রসাদ ইউরোপ সমূহে, যুগপৎ বর্ধিতেছে যেথিয়া জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দেখ —তাহাতে নাম লেখে 'খ্রীমধুসূদন'।

আমরা স্থির নিশ্চিত, মধুসূদন খ্রিষ্টান হয়েছিলেন ইংলন্ড যাওয়ার সুবিধা হবে ভেবে আর তা করতে পারলেই কবিকুলে তাঁর নিশ্চিত আসন লাভ। কিন্তু বেথুন সাহেবের বাবাসাল তাঁকে ফিরে যাওয়াতে সাহায্য করল। পরমসুন্দরী ইংরেজি ভাষার প্রতি সমস্যা পরিহার করে তিনি ফিরে এসেছিলেন মাতৃভাষার ফিরে ছায়ায়। কিন্তু তারও পূর্বেই তো তিনি খ্রিষ্টান হয়ে গিয়েছিলেন। কবিখ্যাতির উদ্দীপনা না হয়ে থাকলেও ইংলন্ডযাত্রার সময় পাইবার জন্য একটি কবিতা লিখে দিলে (১৮৪৮-৪৯) বলে জানা গেছে। তার শিরোনাম ছিল HYMN বিজ্ঞানের অন্তরে কোন কথা ছিল (A Hindu Youth) / Composed by him - to be sung at his Baptism /

I

Long sunk in superstition's night,
By sin and satan driven
I saw not – cared not for the light
That leads the blind to heaven.

II

I sat in darkness, Reason's eye
Was shut – was closed on me
I hastened to Eternity
O'er Error's dreadful sea!

III

But now at length, thy grace, O Lord!
Bids all around me shine:
I drink Thy sweet - Thy Precious word, -
I Kneel before thy shrine!

IV

I have broken affection's tenderest ties,
For my blest saviour's sake
Lord! I for Thee forsake!

দুই

মধুসূদনকে খ্রিষ্ট কলেজ ছাড়তে হলো। জাতীয়তাবোধের অনুভূতি নিশ্চিহ্নে চলে গিয়ে ব্রাহ্মসমাজের অন্ধ তাঁর সেবাপরায়ণ করে তাদিকে মেয়ে ছাইলে মধুসূদন এবার ভর্তি হলেন মাদ্রাজের জন্য তিনটি শিক্ষকের বিদ্যালয়-এ।

এখানেই তিনি ইউরোপীয় অধ্যাপকদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা পরিচয় পেলেন ইংরেজি ও লাতিন ভাষায় সহজ। হোমার, ভার্জিল, দান্তে ও টাসোর মতো প্রাচীন কবি-প্রতিভার সৃষ্টিকারীদের মূল পাঠ গ্রহণ করে তিনি সমৃদ্ধ হলেন। লিংকন্স্ কলেজে মধুসূদন পড়েছিলেন চার বছর। ইতিমধ্যে স্বদেশীয়দের সঙ্গে সম্পর্কের ছিন্নতা বৃদ্ধি পেলে প্রাক্তনজনদের মধ্যে বন্ধু বলে করা বন্ধ করে দিলে এক অদ্বিতীয় পরিস্থিতির মধ্যে তিনি ১৮৪৮ সালের গুরুতে সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় সমুদ্র অপারেশনে অন্তরাল চলে গেলেন।

"অনুয়া মাতৃভাষানুরাগের সঙ্গে বাংলা শিক্ষা করে, জীবনে কখনও তারা বিস্মৃত হইতে পারে না। "এ আশু বাসনাটি মধুসূদনের" জীবনে অক্ষরে অক্ষরে ফলে গিয়েছিল। পরবর্তী জীবনের পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষা তাঁর জীবনকে সমৃদ্ধ করে তাঁকে পরিশীলিত করেছিল বটে। তা ফ্রান্সোয়েটোর তাঁর কালের তুলনায় ছিলেন অনেকটা এগিয়ে। তিনি হোমার, ভার্জিলের, মিলটন প্রভৃতি বাঙালি অধ্যাপকদের পাঠ করতেন ও অপেক্ষিত বুৎপত্তি অর্জন করতে পারতেন। বেঙ্গলী মধুসূদন মাত্র ৯/১০ বছরে মাতৃভাষার এ জগতকে আয়ত্ত করে তা ও তুলের বয়স্কদের নিকট তা পাঠ করে শুনিয়েছেন। তাঁর কলকাতীয়ের পরিচয়টিতে এমন ঘনঘটাই ঐতিহাসের বীজ হোপিত হয়েছিল। আকেল-গুলেমা, যা অংশ অবশ্যসূচীর প্রধান উপাদান, তাও ছিল তাঁর জীবনে সহজাত ধন। রামায়ণ ও মহাভারতের প্রভাব মধুসূদনের জীবনে যে কি পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করেছিল, তার ইয়ত্তা কোনো ব্যাখ্যায় সহজসাধ্য হবে না। সে সবেই অবশ্যই জীবনের পর্যায়ক্রমে সব সংকলিত খোলসারদের মধ্য দিয়ে যে সামাজিক পরিবেশের নিরসন ও বিশ্বকিরণী প্রতিষ্ঠা তাও মধুসূদনের চলনকে আরিষ্ট করে রেখেছিল তাঁর জীবনধারায়। কলকাতা, ইংলান্ড বা ফ্রান্স যেখানেই তিনি যেমন অবস্থানেই বাস করেছেন, তবু পরিবর্তনের পরে পরে তাঁর জীবনে সংস্কৃতির আবহাওয়া যাদের মুখের যেন তাঁর স্মৃতিকে নাড়া দিয়েছে, মাঝে মাঝে এলে অস্থিরতায়। দুর্বুদ্ধের জন্যই তিনি তা উপেক্ষা করতে পারতেন।

পারিপার্শ্বের বাঙালী জাতির আত্ম-চেতনার এক অনন্য জীবায়ন যেখানে মূর্তী মূর্তি ঈশ্বরীকরণ করে আরও কয়েকটি দিন অতিক্রম হয়েছেন সবেরই সজন-সন্তাবিত্বের। তাঁর আলমনী সংযোগ বাঙালির মাঝেমাঝে কালকুলের প্রবহমানী নৃত্যালয়ের মধ্যেই আত্মুত করে আসল – বৃদ্ধ-বনিতার অপেক্ষমান চেতন। নিজের সর্বীয় অন্তরেনই পেলেকার, আত্মবিহরণ জীবনকাল নিবন্ধিত হয়ে বিরাম থাকবে। যাদের মধুসূদনের সাথের বাঁচিয়ে আলমনী ও নিজের সর্বীয় ধনতে তেমনে আন্তরায়ন হয়ে ছেলেন। নিজস্বার ধনে তাঁর অন্তঃসত্ত্বা বহিত।

উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি পিতা-মাতার সঙ্গে কলকাতা এসেছিলেন কলকাতায় আর হিন্দু কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে। হিন্দু কলেজের হিন্দু ছাত্রের মতো মধুসূদন ও সুরাপান ও হিন্দুধর্ম নিন্দিত কার্যকলাপে অভ্যস্ত হয়েছিলেন। পরিণত বয়সে চালনালনে তিনি সম্পূর্ণ সাহেব হয়ে গেছেন। অধিকারী হিন্দিলের কলকে তাঁর মন খাটো হয়েছিল। সর্বদা ব্যাকরণের ছাত্রদের প্রতি কঠিন অভিনিক্ত ব্যবহার নিজেও তাঁর অনুভূতি প্রকাশ করেছেন। কেউ তাঁকে হিন্দিতের কলকে অনু বলে সম্বোধন করলে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করে তাঁর মনের ভাব পত্র লিখে জানাতেন। একবার হিন্দিন মধুসূদনই অন্যের পূজার দিনে বন্ধুদের সুরে ধুপাপ্রতিমা বর্জন করে আক্ত সংবেদ করতে পারতেন না। তাঁর হৃদয়ে সজনত সদা জাগ্রত ছিল একটা আকনা, হিন্দিধর্মত্যাগ করে তিনি আজন্ম লালিত হিন্দুর পরিধি থেকে সরিয়ে এসে নিয়েছিলেন। তাই দেবী জগদ্ধাত্রীর মূর্তির সম্মুখে দাঁড়িয়ে রহত মুহূর্তের জন্য হলেও অনুভব করতেন বিবেকের দংশন। বিজয়া বা কোজাগরী পূর্ণিমায় নিজের তাঁর হৃদয় টনেন হতো।

বিশেষভাবে লক্ষণীয়, তাঁর মহান কীর্তি 'মেঘনাদবধ' কাব্যে মধুসূদন গভীর আন্তরিকতায় সৃষ্টেই বলপ্রয়োগপরিণী অন্তঃকলহের। আপু ব্রহ্ম সময়ে লঙ্কাপতির জীবন রক্ষার জন্য জগজ্জয়ের দেবী দুর্গার নিকট কাতর প্রার্থনা করিয়া আত্ম-অনুভূতিতে নিবেদিতের এক হয়ে গেছে রীতিমতের সঙ্গে। আশেটি নিম্নরূপ :

অকালের পানে চাহি, কৃতাঞ্জলি পুটে,
আরাধিল রঘুবর,"তব পদাম্বুজে,
হরমনো অম্বার অম্বিকা জগৎ জিগারী,
অম্বিকে! ভুল না, দেবি, এ তব কিঙ্করে।
বর্ষরকুলেন্দ্র, মাতঃ, করে যে পশিনু,
আমার, ও রাঙা পদে অনিমিষ নাহে।
ভূলাও বর্ষের জন্য, মৃত্যুঞ্জয় চিতে,
অম্বাজনে, রক্ষ, সতি, এ রক্ষঃ সমরে,
প্রলয়ের ভাই এই নিশার সম্মুখে :-
দুর্গতির দমনে ধনি, নিস্তারিণী তুমি,
দেবকুলে, নিস্তারিণি! নিজের অধীনে
যহিষমর্দিনি, অম্বি দুর্গম্বর রাক্ষসে (বঙ্গ সর্গ)

কাব্যের অধিকাংশ পর্বে মধুসূদনের দুরন্ত সিজারী পুত্র ইতালিয়ংকালীন অভ্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনের মুহূর্তে ফিরিয়ে এনেছে। ফলিকা নগরবাসীদের অন্ত-ীতে আজ বিষাদ সমারোহের রূপ নিয়েছে। চিতাশয্যায় শতির শবদেহে এসে কাঁদছেন প্রতীচ্য সহমরণের জন্য। উচ্চারিত হলো কোথায় বঙ্গেনারীরা মিস উদ্বুদ্ধনি, ফলিকার অকাল আবহে ঝুড়ে উঠল হাহাকার।...."
এ পর্বে কবির স্মরণে এসেছে শান্ত অন্তঃপুরে দুর্গাপূজার দিনে দেবী পূজার উদ্যোগের কথা। অভ্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হলো। এখনেও পর্দানশীন বাঙালি স্ত্রী মধুসূদনের আকাঙ্ক্ষায় এসে মিজরার বেদনাবিধুর স্মৃতি —
কবি তার সিন্ধু নীরে, অশ্রুজলে এবে
বিসর্জিয়া লাকেন পরে আর্য অঙ্গনীরে
নিশুম্ভি প্রতিমা যেন বঙ্গনারী কিবলে
পরদিবসনিশি লয়ে কবিলা বিরাজে।

মধুসূদন ফলাহি নগরীতে বসবাসকালে কখনওবা নিঃসঙ্গতা আবার কখনওবা বান্ধবীদের কলকাকলীতে মুখরিত। সে মুহূর্তগুলিতেও বিরাম ছিল না তাঁর সৃষ্টি ও সাধনার আকাশে। দূরে ফিরে ইতিহাসে বিলিয়ে তাঁর পেছনে ফেলে আসা সুখের স্মৃতি, দুঃখের স্মৃতি। সে নিজেই কবির কথা তাবতে বহু কম চতুর্দশপদী কবিতাবলী। পরমোপলব্ধির আকাশে শ্রীপঞ্চমীতে কবি জগন্মাতার প্রতি অঞ্জলি প্রদানে লিখছেন :
নাহে দিন দূর মেরি, ঘরে দুরাগতে
নিশাবিরে দুরাগত, নিশ্চয়ির ছলে।
এ তব করুণ মূর্তি সুতল কবলে :-
কিন্তু চিরস্থায়ী পূজা তোমার জগতে।
অবেরণ-পাত্র যিনি রেখিলা কৌশলে
এ মানব -দেহ-সাজে, ...
কবির হৃদয়-ধন যে সুখ ভুঞ্জিবে,
সে সুখ-অঞ্জলি দেবে ও রাঙ্গা চরণে

পরম ভক্তির-ভরে চিরকাল দিয়ে
দল নিজে, যত দিন এ মর ভবনে
মন:-পদ্ম কোটে, পূজা, তুমি, মা পাইবে :-
কি তার অধিক দেহে ভবে, মহাজনে?
আশ্বিন মাসের কবির হৃদয়ে কোথায় দেবী পূজার আয়োজনের সাড়া। তাই স্মরণ করেছেন :
মৃন্ময়ীকে লয়ে এবে চিন্ময়ে হৃদয়।
এসেছেন নিতে উমা, কলাসের পরে,
মহিষমর্দিনী রূপে ভকতের ঘরে, ...
.....এক পক্ষে স্মরণেন। শত কলসী—
নক্ষত্রজননী যেন একত্রে গগনে!
কি স্মরণ। পূর্ব কথা কেন করে, স্মৃতি,
আনিয়ে যে রাখি-ঘায়া আজি-এ নয়নে?
ফলিবে কি পুনঃ সে পূর্ব ফলনি?

মিজরা বসবীর দিনের মনে পড়েছে পরবর্তিনী কবির সেই কোমলবিধুর মুহূর্তগুলি স্মৃতি। যেরেদিয়ে না ছাড়িলেন, যেতে দিতেই হয় দেবী পূর্ণাকে। তাই কবির অনুক্তি :
"যেরেদনা, রজনি, অধিক নয়ে তারা দলে
ফেলে তুমি যাইবারি, এ পরাণ যাবে?
উদিলে নির্মল রবি উদয় অচলে,
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে!
কার আন বিধি, সখি, নিয়ে অন্তকালে,
পেয়েছি উমায় আমি! কি সান্ত্বনা তবে—
তিনটি দিনেতে, কহ লো কাঙ্গা-কুন্তলে,
এ দীর্ঘ বিরহ-জ্বালা এ মন জুড়াবে?
তিন দিন জগদীশ ফলিলেছে যবে
দূর করি অন্ধকার; তমিস্রেরি বালী—
বিষ্টিয়ন এ সৃষ্টিরে এ কর্ম, কৃপাতে!
বিজয়া আমার মত হবে, আমি জানি,
নিশায় এ দীপ যথি।"— বলিলা কাতরে
নগরীর নিশা শেষে নিরীহের রাণী।

মধুসূদন বিলিয়ে পুত্রের অপ্রকাশ বাণী কবি কমলাল অন্যোপাধ্যায়ের তাঁরি, তাঁর প্রিয় বন্ধু ধরিমোহনের নিকট নিজের অভ্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনের মুহূর্তে ধরিয়ে এনেছে। তার অনেক পরে এক "জগদ্ধাত্রী পূজার দিনে মধুসূদন বন্ধুর বাড়ী গিয়েছিলেন। হরিমোহন লিখছেন — নিজের বসতবাটীতে পূজার সমারোহ দেখিয়া অত্যন্ত-পুলকিত হইয়া উঠিলেন — বলিলেন — আ! তুমি তোমার ভাই হইয়া দেখ তোমার সোনা পুত্র তোমার বাড়ী কি রূপ সাজাইয়াছে — তুমি একবার বর্ণালোক তাহা করিয়া আসিয়া দেখ। তোমার কুপুত্র, আমি নরাধম, তোমাকে কত কষ্ট দিয়াছি। অর্থাৎ মৃন্ময়ী জগদ্ধাত্রী ও গর্ভধারিণী জন্মের স্মৃতি মিলেমিশে একাকার।

ফিল

আলোচনার প্রথম ভাগে সুস্পষ্ট মধুসূদন পরিত্রাণে নিজের মহিমায় মুগ্ধ হয়ে যা কোনো খ্রিষ্টান মিশনারীর চেয়ে শত অথবা হিন্দু সমাজের নিকটে প্রতিবাদ জানানোর খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেননি। তাঁকে দীক্ষা গ্রহণে অনুষ্ঠানে পাইবার জন্য একটি জটিলমূলক তৎকাল তিনি রচনা করেন। এ কথাটি কলাম পাশ্চাত্যে আর্থ-সামাজিক বিশেষণটিকে বিশেষভাবে সম্পাই করার তাবনা যে তাঁর মধ্যে প্রবলভাবে সক্রিয় ছিল এ এমন কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মিশেলটির কাছ থেকে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন খ্রিষ্ট ধর্মে। বিদেশে যাওয়ার পর সুখ করার জন্য তিনি মন বিধু করতে প্রস্তুত ছিলেন। তাহলে তৎকালেই তার আগে তাঁর ধর্ম ভাবনা কি ছিল? মধুসূদন হরিমোহনই একদার কবিকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করে বলেছিলেন — আমি জগদ্ধাত্রীকে খ্রিষ্ট ধর্ম নিয়ে কোনো কার্য করিতে দেখি না, আপনি আধুনিক ব্রাহ্মজনী নহেন, হিন্দু ধর্মত বিশ্বাসী বিরাজেন। অথচ আপনিই

এক একটি ধর্ম আছে — আপনার ধর্ম কি? এ বিষয়ে মধুসূদন তাঁর সঙ্গে কোনও আলোচনা করতে অস্বীকার করে শুধু — বলেছিলেন — তোমাদের ইংলণ্ডের বিষয়ে তুমি এই মত বলিতে পার, Do to other as you wish they should do to you. ইহা অপেক্ষা উচ্চ ধর্ম নাই, ইহা বাইবেল করিয়া আছে বলিলে খ্রীষ্টিক খুব আছে। (স্মৃতিকথা : যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ - পৃষ্ঠা ৪১২) যোগেন্দ্রনাথ ঘোষই আবার উল্লেখ করেছেন — একবার (খ্রীষ্টিকপাড়ায়) আসলে খ্রীষ্টকোল পত্নী হেনরিয়েটাকে হিন্দু মতাবীন মাথা সিন্দুর ও চুড়ি পড়াতে উপহার দেন। তিনিও সীমন্তে সিন্দুর পরিয়াছিলেন। হেনরিয়েটা এমন সরলা ও পবিত্রহৃদয়া ছিলেন, যে পরিয়ে মাত্রেই তিনি খুশি হইতেন। হেনরিয়েটা কখনোই খ্রীষ্টান ছিলেন যে বিষয়ে সন্দেহ ছিলেন। নিষ্ঠাবিতা হিন্দু বিধবাদের মতো তাঁর মতো তাঁর সীমন্তে সিন্দুর পরা বিশেষ উপযোগের বিষয়ী। তা পরাতে স্বামী খুশি হবেন, আবার তিনিও খ্রিষ্টধর্মই গ্রহণ করেছিলেন। তবে কি হেনরিয়েটা অনুকূল করতেন, খ্রীষ্টান হয়েও, মধুসূদনের হিন্দুর আচার অনুষ্ঠান ও বিশ্বাস আচরণের উপরই বেশি পক্ষপাতিত্ব ছিল? প্রিয় বন্ধু রাজনারায়ণ বসু আলোচনা প্রসঙ্গে একবার মধুসূদনকে বলেছিলেন, — আমার এই সংস্কার অনিবার্যভাবে যে তোমার পরিবর্তে ও আমার ইংরেজের মতো হইলেও তোমার মনের সম্পূর্ণরূপে হিন্দু। তিনি বলিলেন — তুমি ঠিক আন্দাজ করিয়াছ। আমি হিন্দু, কিন্তু একটা সমাজে মেলিয়া না থাকিলে চলে না, এই জন্য খ্রীষ্টান সমাজে মেলিয়া আছি। বিশেষতঃ যখন খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করিয়াছি, তখন এই সমাজ দেখিয়া থাকা কর্তব্য। খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাস কি তা নিয়ের তিনি আমায় বলিলেন — Christianity is a civilising agency. I would fight like a crusader if any one would speak against it, but my real feeling is Hindu. মৃত্যুর আগের দিন বেলা: কৃষ্ণমোহনকে সঙ্গে নিয়ে আসিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনার পর অন্য প্রসঙ্গে করে তিনি বলেছিলেন, আমি যেই মহাসত্যের অন্বেষণে উপর নির্ভর করিয়া থাকিতেছি, তিনি যে পাপী-তাপীর উদ্ধারের জন্য খ্রীষ্টকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, আমি ইহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। লক্ষ্য করা যাচ্ছে মধুসূদনের খ্রীষ্টধর্মের প্রতি এক বিশ্লেষণাত্মক আনন্দিকতার কারণে খ্রীষ্টান সমাজে কা যাজক সম্প্রদায় তাঁর উপর প্রসন্ন ছিল না। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে কোথায় সমাধি দেওয়া যেতে পারে তা নিয়েও তত্ত্ব দেখা দিয়েছিল। তা শুনে তিনি কৃষ্ণমোহন ও রাজনারায়ণকে বলেছিলেন — মনুষ্যের তৈরী গোরের আমি বড় ভয় করি নে। আমি আমার ঈশ্বরের কাছে ফিরে যাচ্ছি। তিনি আমাকে তাঁর সর্বোত্তম বিধানে স্থলে লুকিয়ে রাখবেন। আপনারা যেখানে খুশি আমাকে সমাধিস্থ করতে পারেন। আপনাদের পরস্পরের সঙ্গে আমার কোনও অসদ্ভাব। আমার কবরের উপর যেন পড়িয়ে ওঠে বকুল ফুল।

(আলোর ফুলকি - শেফালী মুখোপাধ্যায় পৃষ্ঠা ১১১) কবি কবিকুলতিলক মধুসূদনের মৃত্যুর পরেও তাঁর সমাধিফলকের গোরাপি প্রদর্শিত হলো না। তাঁকে কোথায় সমাধি দেওয়া হবে? ডেভিড হেয়ারের নিজের জমি থাকায় ওখানেই তাঁর শেষ শয়ন দেয়া সমাধি নিয়ে সমস্যার মোকাবিলা করা হয়েছিল। খুব অল্পের মধ্যে সারা রাত পুরিশপ্রকল্প পরিবেশে মধুসূদনের আলীন দেহ পড়ে রইল হাসপাতালের মর্গে। পরের দিন বেলা: কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপের ফলে তাঁর মৃতদেহ খ্রী হেনরিয়েটার পাশেই সমাধি দেওয়া সম্ভব হয়েছিল।

মধুসূদন খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করিলেও পুরোপুরি খ্রিষ্টান হতে পারেননি। তাঁর ভক্তি আত্মসমর্পণ ও চিত্তের স্বাধীনতার অধিকারবোধের কারণে। বিশ্বর হেনরিয়েটার তিনি তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়ে থাকলেও চিত্তসমর্পণে বাধ্য করতে পারেননি। অন্যপক্ষে হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করে গেলেও শিকড়ের টান তাঁকে চরমভাবে সাড়া জীবন। তাই আজিন আগে সুদূর ভার্সাই নগরীতে বসেও দেবী দুর্গার প্রতি তাঁর নিজস্ব জিজ্ঞাসা ছিল — কবিতে কি মনে পড়ে সে পূর্ব জনমে? যদি পড়ি তাঁর সে ভক্তি চির কালপ্রদ ছিল দুখের দিনে, সুখের দিনে, তবে তা অতিশয়োক্তি হবে না। আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়। কবি মধুসূদন একবার দীক্ষাগ্রহণ অনুষ্ঠানে যাইবার জন্য একখানি খ্রিষ্টস্তুতি রচনা করে খ্রিষ্টধর্ম সম্পর্কিত কোনো কাহিনী বা ভাবনা নিয়ে রচনা করেননি একটিও কবিতা, কবিতা বা নাটক।

নিবন্ধ

কলকাতার থিয়েটারে নারী অভিনেত্রীর নিয়োগ ও তার প্রতিক্রিয়া

জগন্নাথ ঘোষ

কলকাতায় এমন একদিন ছিল, যখন থিয়েটারে নারী-অভিনেত্রী নিয়োগ নিয়ে প্রবল বিতর্ক জেগেছিল। এই বিতর্কে যোগ দিয়েছিলেন দুই দিকপাল বাঙালি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ব্যাপারটি বড়ই রোমাঞ্চকর।

১৮৭৩ সালের গোড়ায় একটি থিয়েটার প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়। থিয়েটারটির নাম বেঙ্গল থিয়েটার। এই থিয়েটারের মালিক ছিলেন ধনকুবের দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৌহিত্র শরৎচন্দ্র ঘোষ। তিনি ছিলেন সেকালের নামকরা অভিনেতা ও নাট্যকার-নাট্যকার। তিনি তাঁর প্রস্তাবিত থিয়েটারের জন্য মাইকেল মধুসূদন দত্তের কাছে একটি নাটক প্রার্থনা করেছিলেন। মধুসূদন শরৎচন্দ্রের প্রার্থনা মঞ্জুর করেছিলেন। তিনি

বেঙ্গল থিয়েটারের জন্য যে নাটক লেখেন তার নাম মায়াকানন। নাটকটি লিখে শেষ করার পরই নাট্যকার অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাই নাটকটি তিনি পরিমার্জনার অবকাশ পাননি। নাটকটি লিখে দেবার জন্য শরৎচন্দ্র নাট্যকারকে যথোপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদান করেছিলেন। মধুসূদনের প্রতি ছিল রঙ্গ-মঞ্চ প্রতিষ্ঠাতার গভীর আস্থা ও শ্রদ্ধা।

প্রস্তাবিত থিয়েটারটি যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় তার জন্য প্রতিষ্ঠাতা শরৎচন্দ্র একটি কমিটি গঠন করেন। সেই কমিটিতে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার, মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং স্বয়ং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। উক্ত কমিটির একটি সভায় আলোচনা প্রসঙ্গে মাইকেল মধুসূদন প্রস্তাব করেন, অভিনয়কে স্বাভাবিক ও সুন্দর করে তুলতে হলে নারী ভূমিকায় নারী-

অভিনেত্রী নিয়োগ করেনি। এই প্রস্তাবে অনেকের সম্মতি থাকলেও অমৃতলাল ছিলেন বিপক্ষে। তিনি প্রবল বিরোধিতা করেন এ প্রস্তাবের। তাঁর মতে, থিয়েটারে নারী-পুরুষের একত্র অভিনয় সামাজিক ভারসাম্যকে টলিয়ে দেবে। তার কারণ এইসব নটিদের পতিতাপল্লী থেকে আনতে হবে। বারাঙ্গনাদের সঙ্গে ভদ্রঘরানার পুরুষেরা অভিনয় করলে সেটা হবে প্রবল সামাজিক অপরাধ। তখন সেই অভিনয় সামাজিক পুরুষেরা দেখতে গেলে ঘটবে বিপত্তি। এই ছিল বিদ্যাসাগরের প্রতিবাদের সারমর্ম।

ইডিন পক্ষের সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে অন্যতম ছিল নারীশিক্ষা। এই ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের ছিল প্রধান ভূমিকা। তিনি বালিকাদের মেয়েদের স্কুল করেছিলেন, বিধবা বিবাহ প্রবর্তনে গভীরভাবে উদ্যোগী ছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে ও প্রসারে তাঁর ছিল বৈতিক ও আর্থিক সমর্থন। দুঃখের বিষয়, নারী-আন্দোলনের তালিকায় তিনি থেকে সরিয়ে রাখেন পতিতাদের; বর্তমানে তাঁরা অতিরিক্ত হয়েছেন পৌনকর্মী নারায়ণ। বারাঙ্গনারা উদ্যোগের আগামে তখন কোনও সামাজিক আন্দোলন দানা বাঁধেনি। এরই সমান্তরাল সাথে পরিষ্কার এটা পেশাদারি রঙ্গালয়ে নারী-অভিনেত্রী নিয়োগের প্রস্তাবে বিদ্যাসাগরের অমতটি প্রকাশ ছিল সাময়িক ঘটনা।

সৌভাগ্যের বিষয়, উক্ত থিয়েটার কমিটিতে যখন বসেছিলেন মধুসূদন দত্ত প্রসঙ্গক্রমে নায়-অভিনেত্রী নিয়োগ আগামে তাঁর সম্মতির কথা জানিয়েছিলেন তখন বিদ্যাসাগর ঘোষণার মধ্যে পড়েন। তিনি তখু এই নিয়োগে তাঁর অসম্মতিই জানাননি, সভা পরিত্যাগ করতেও দ্বিধা করেননি। তিনি ছিলেন আত্মমর্যাদা সম্পন্ন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। তিনি সভা পরিত্যাগ করলেও উক্ত থিয়েটার কমিটি নারী-অভিনেত্রী নিয়োগের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। প্রস্তাব মতো চারজন অভিনেত্রী গৃহীত হন। তাঁদের নাম জগত্তারিণী, গোলাপসুন্দরী, পরে কুসুমকুমারী নামে খ্যাত হন), এলোকেশী ও শ্যামা। কথা অনুযায়ী এঁদের আনানো হয়েছিল পতিতাপল্লী থেকে। যেদিন থিয়েটারের উদ্বোধন ঘটে ১৬ই আগস্ট, ১৮৭৩ তারিখে অভিনীত মধুসূদন দত্তের প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা'র অভিনয় নিয়ে। এই অভিনয়ে দেবযানী ও চিত্রলেখা চরিত্রদুটিতে অবতীর্ণ হন যথাক্রমে এলোকেশী ও জগত্তারিণী। বাকি স্ত্রী-চরিত্রগুলিতে অভিনয় করে পুরুষ অভিনেতারা। এই অভিনয়ে নারী-অভিনেত্রী নিয়োগ নিয়ে তৎকালীন বিশিষ্ট পত্রিকায় যে সমালোচনা প্রকাশিত হয়, তা খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। বিশিষ্ট ঐ পত্রিকা-গুলি হল হিন্দু পেট্রিয়ট, অমৃত বাজার পত্রিকা ও বঙ্গবাসী পত্রিকা। দেখা যাক ঐ পত্রিকাগুলিতে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯শে আগস্ট ১৮৭৩ তারিখের হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকায় নিম্নলিখিত মন্তব্য করা হয় —

Mr. Michael Madhusudan Dutta's classic drama of Sarmistha was selected for the first performance.

The actors performed their parts very creditably, the two actresses, who were professional women we are informed were most successful. We wish this dramatic corps had done without the actresses. It is true that professional women join the jalsas and natches, but we had hoped that the managers of Bengali Theatre would not bring themselves down to the level of the jalsa-walas.

প্রতিক্রিয়াটি পড়ে বুঝতে অসুবিধা হয় না, হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকা মনে করে, যাত্রা-ওয়ালাদের প্রসঙ্গেই নারী ও পুরুষ নিয়ে দল গঠন করে। গ্রামের অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত মানুষের কাছে ব্যাপারটি দূষণীয় নয়। কিন্তু থিয়েটার পরের অভিজাত পরিবেশে নটিকর্ম মানায় না। অতএব গ্রাম যাত্রাওয়ালাদের মতো থিয়েটার-ওয়ালারা যেন নারী অভিনেত্রী গ্রহণ করে। নারী অভিনেত্রীরা অভিনয়-নৈপুণ্য প্রদর্শন করলেও তাঁদের

থিয়েটারে গ্রহণ করা বর্জনীয়ই করিবে। থিয়েটার তাহাদের মাতৃসদনের সমকক্ষ হবে। এটা অনধিকার। মাতৃসদনের অধিনেত্রীরা (প্রতিষ্ঠাত্রীদের সমালোচনা)। এদের থিয়েটারে আসা অনুচিত. এই ছিল হিন্দু পেট্রিয়টের অভিযোগ।

ভারত সংস্কারক পত্রিকাও হিন্দু পেট্রিয়টের সুরে সুর মেলায়। ১১ আগস্ট ১৮৭৩ তারিখের ঐ পত্রিকা বেঙ্গল থিয়েটারে নারী-অভিনেত্রী নিয়োগ নিয়ে নিম্নলিখিত মন্তব্য করে —

অভিজাতদের একটি সম্প্রদায় তাদের রঙ্গালয় খোলা রেখেছে। এখন স্বাভাবতই তাদের সমকক্ষ একটি সম্প্রদায় নির্মাণ করিয়াছেন। তার পরিচালক তাদের দূর করিবেন বলিয়াই মনে হয়। এটি সম্ভবতঃ অভিনয় ব্যবসায়ে নারীদের অভিনেতাদিগের সঙ্গে যুবকদের ছিল। এ পর্যন্ত আমরা যাত্রা, নাচ, কীর্তন ইত্যাদিতেই কেবল মেয়েদিগকে দেখিতে পাইতাম, কিন্তু বিশিষ্ট সংগীত সম্প্রদায়গুলিতে সহিত একত্রাবস্থায় মেয়েদিগের অভিনয় এই প্রথম দেখিলাম। অভিনয়ের আপত্তিকর দর্শনা আপনার কথা বলে ইহাই যথেষ্ট।

যাত্রা, নাচ, কীর্তন ও মুখুর প্রায় অভিজাতির মনোরঞ্জন-প্রয়াস। সেখানে নিয়োগ স্বাভাবিক হলেও পরবর্তে মাতৃসদনে নাটমন্দিরে আসনলাভ অচল। কেবল থিয়েটারের ভদ্রপৃষ্ঠপোষক অভিনেতারা সেই নারীদের সংস্পর্শে এসিয়ে চলুন, এই ছিল ভারত সংস্কারক পত্রিকার অভিমত।

হিন্দু পেট্রিয়ট ও ভারত সংস্কারক পত্রিকা নারী-অভিনেত্রী নিয়োগজনিত সামাজিক প্রতিক্রিয়ার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেনি। অমৃতবাজারই প্রথম এই প্রসঙ্গের অবতারণা করে। ১৫ জানুয়ারি ১৮৭৪ তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় নিম্নোক্ত মন্তব্য করা হয় —

বেঙ্গল থিয়েটার আজ একটি নতুন জিনিস। জানুয়ারিতে উদ্বোধনের আগে অভিনীত হইবে অভিনয় সর্বাঙ্গসুন্দর হয়। কিন্তু এই উদ্বোধনের আনন্দময় সন্ধ্যে পরিচালক কর্তৃপক্ষ উদ্বোধনদিনের আগে অভিনীত হইবে আনন্দময়ের পাশ ও অবসর বৃদ্ধি হয় কিনা তাহা পরীক্ষা করেছেন। বেঙ্গল থিয়েটার কোম্পানী এই সুযোগ পরীক্ষায় প্রস্তুত হইয়াছেন। তাঁহাদের অভিনয়ে দর্শকদের আগের কোনোই অভিনয় দর্শনার অভাব হইবে পারেন। অভিনেতাদের উচ্চারণ ক্ষমিতে নিম্ন শ্রেণী সমাজের একজন মেয়েলোকের আবশ্যিকতা পরিমাণ করিয়ে হয়, অন্য হইলে সে অভিনয় আর সুন্দর হইবে না।

থিয়েটারে নারী-অভিনেত্রী নিয়োগের দ্বারা অভিনয় সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়। — একথা স্বীকার করেছে অমৃতবাজার পত্রিকা। কিন্তু এই সব অভিনেত্রী যেহেতু 'সমাজ-পরিত্যক্ত ও ঘৃণিতা' সেই হেতু এদের দ্বারা অভিনয় আনন্দময়ের পাশ ও অবসর বৃদ্ধির আশঙ্কা সৃষ্টি করতে পারে। এর ফলে দর্শকসমাজ আর থিয়েটারের প্রতি বিমুখ হয় তাহে সমূহ 'ক্ষতি'র সম্ভাবনা। এ সম্পর্কে থিয়েটার কর্তৃপক্ষ যেন সতর্ক থাকে, এই ছিল অমৃতবাজার পত্রিকার সতর্কবাণী। দেখা যাচ্ছে, অমৃতবাজার পত্রিকাই প্রথম সামাজিক শ্লাস ও অবসরের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছে।

বঙ্গবাসী পত্রিকায় বঙ্গরঙ্গে নারী-অভিনেত্রী নিয়োগের ঘটনাকে 'ব্যাঙ্গস্তুতি' অলংকারের সাহায্যে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। বঙ্গবাসী পত্রিকার সম্পাদক মহেন্দ্রনাথ বসু স্বয়ং একজন নাট্যকার ও বিশিষ্ট নাট্যসমালোচক। তিনি নারী অভিনেত্রী নিয়োগকে মেনে নিতে পারেননি। তিনি লিখেছেন —

বেঙ্গল থিয়েটারের অভিনয়। অবশেষে বিলাতী বাজনার মেয়ে গায়। ....কিসের জন্যে বঙ্গভূমির ঈদৃশ প্রকৃতি ঈদৃশ অবাধ্য শ্রেণির হয়। অবশেষে ভদ্রি পৌরুষটী (ছোকরা অভাব)। অভিনেতাদের মেয়ে সাজিয়া কর্তৃপক্ষ অতি সুকুমার অভাবের অভাব অভিনেতাদের। ইহা কি ঈশ্বরের আর অভাব সংসারের সম্পাদনের জন্য হয়? ইহার প্রতিবিধান আশু অবশ্য হইবে। প্রতিবিধান আর কি, অভাবের ঈদৃশ পরিবর্তন অভিনয়। যত ঈদৃশ অভিনয় অভাবের প্রতিবিধান, পুরুষ আর পুরুষ ও প্রকৃতির অভাব প্রকৃতির ঈদৃশ অভাবের প্রতিবিধান না হইয়া অভাবের ঘটায় অভাব হয়, অভাবের আর ঈদৃশ।

কিন্তু বেঙ্গল, অভিনয় কুলবালাদিগের ঈদৃশ অভিনয় নিজের অভাবে ও মুখস্থানের অভাব অভাব

[illegible] [illegible] [illegible] [

প্রশ্নসূচক চাবকার দৃশ্যগুলিকে অভিনয়-যুক্ত করিয়াছিল। তাহাদিগে অভিনয়ের প্রশংসা করে লেখা হয় — সকল ইংরাজের মনে ভারত অভিনয় করে করিবার ভয় হইয়াছিল। যে সাহিত্য জন্য থ্রোটোনিয়াকে মুক্ত করিয়াছিল। এমনকি রাজকুমারীর অভিনয়কেও এই পত্রিকা খাটো করে দেখেনি। নবীনচন্দ্রের থিয়েটারে নারী অভিনেত্রী নিয়োগের ঘটনাকে হিন্দু পাইয়োনিয়ার পত্রিকা সমাজ সংস্কারের ঘটনাগুলে বর্ণনা করে। প্রসঙ্গিক অংশটি নিম্নরূপ —

> দেশপ্রচলিত অজ্ঞানের মধ্যে একদল অভ্রান্তচিত্ত একটি স্বাধীন পরীক্ষা পরিচালনা করিতে অগ্রসর অভিনয় অবতীর্ণ হইয়াছি। এই সকল অভিনয়ের দেখিয়া কি দেশীয় দর্শকেরা ভারতের স্ত্রী ও কন্যাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য উৎসাহিত হইবেন না? হিন্দু হিতৈষী আমি এই কথাটা আমার দেশবাসীদের জিজ্ঞাসা করিতে চাই, এই যে দর্শিকা, যে নাট্যশালার এরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছে সে যদি অনুরোধে পিছিয়া হইত, তবে কি তাহার প্রতিভার অবমাননা করা হইত না? এই অভিনেত্রী শুধু কার্য করিয়া আসুন করিয়া নিয়াছে তাহা। গুরুদের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শিত করিয়াছেন বলিয়া যাঁহারা প্রত্যহিতৈষীকে দেখা সাহস করেন যাঁহাদের মনে এই দৃষ্টান্ত দ্বারাই কি প্রতীয়মান হইবে না যে, হিন্দু ইংরেজরাও যাঁহাদের অধীনের অন্য নিজস্বভাবের হিতসূত্র? এই অভিনয়ের দ্বারাই কি হিন্দু দর্শকদের নিকট প্রমাণিত হইবে না যে, অভিনয় দর্শন নারী নিযুক্তির ব্যবস্থার সমাজে অবতারণা করিলেই হয়? অভিনয়ের সমাজের ইংরেজদলের অভিনয় দর্শন এই বলে ও দৃষ্টান্ত দেখিয়াও যদি দেশের ইংলিশদের অন্তরঙ্গ প্রমাণ করে যে তাহারা অভিনয় করিবে ও ভিন্ন অভিনেত্রীর অভিনয় করিবে।

হিন্দু পাইয়োনিয়ার পত্রিকার হিন্দু ন্যাশনাল প্রতিষ্ঠাতার নবীনচন্দ্র বসুর থিয়েটারে নারী-অভিনেত্রী নিয়োগের ঘটনাটিকে সাহস ও নূতন দৃষ্টান্ত বলে অভিহিত করেছেন। শুধু তাই নয় নবীন চন্দ্র বসুকেও তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন এই বলে — এই সকল প্রগতিশীল কিন্তু ভদ্রো পরিচয় ইংরেজদের প্রতিক্রিয়ে উঠতি অভিনয় এই প্রচেষ্টার জন্য নাট্যশালার কর্তৃপক্ষিকে বসু নবীনচন্দ্র বসু ধন্যবাদের পাত্র। থিয়েটারস্থাপন এবং সেই থিয়েটারে নাট্যাভিনেত্রী নিয়োগের পাইয়োনিয়ার পত্রিকার 'নৈতিক বিপ্লব' নাম চিহ্নিত করেছিল। প্রকৃত তৎকালীন ইংলিশম্যান অ্যান্ড মিলিটারি ক্রনিকল পত্রিকায় বিদ্যাসুন্দর নাটকের অভিনয় নিয়ে প্রশংসাসূচক মন্তব্যের নিবেদিত্রা করা হয়। ১৮৫৭ সালে হিন্দু পাইয়োনিয়ার পত্রিকা বিদ্যাসুন্দর নাটকের অভিনয়কে নিয়ে যে প্রতিবেদন প্রকাশ করে তা যথেষ্ট আধুনিক প্রগতিশীল মনোভাবের পরিচয় দেয়। তখনও নারীশিক্ষা নিয়ে তত আন্দোলন দানা বাঁধেনি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষার ভেরিয়ার তখনও শোনা যায়নি। এইরকম পরিবেশে একটি পত্রিকা সমাজের নারী-অভিনেত্রী নিয়োগ নিয়ে উদার মনোভাব করতে দ্বিধা করেনি।

১৮৫৭ সালের পর দীর্ঘ ১৯ বছর অতিক্রান্ত হয়ে ১৮৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত গেরস থিয়েটারে নারী অভিনেত্রী নিয়োগ করা হয়। এই নিয়োগকে কিছু বিদ্যাসাগর ও বাইজেরের অনুকূলে দৃষ্টিতে অনেক বিতর্ক দেখা দেয়। অবশ্যই বাইজেরের অভিনয় করে গেরস থিয়েটারে নারী-অভিনেত্রী নিয়োগ করা হয়। দুঃখের বিষয় তৎকালীন ইংরাজি ও বাংলা সংবাদপত্রে এই নিয়োগের বিরুদ্ধে প্রবল সমালোচনার ঝড় হয়ে যায়। গেরস থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ এই ঝড়ে ভেঙে পড়েননি। পরিবর্তে তাঁরাই জয় হয়েছেন। গেরস থিয়েটারের ঠেকাবলি, এই ন্যাশনাল থিয়েটারে নারী-অভিনেত্রী নিয়োগ করা হয়। দুইটি নারীরা হলেন — অক্ষয়মণি, ক্ষেত্রমণি, নানুমণি, ধনিমণি ও রাজকুমারী। আর এই দলে ছোট থিয়েটারের গোলাপসুন্দরী। উপেন্দ্রনাথ দাসের শরৎ সরোজিনী নাটকের নির্দিষ্ট নারীচরিত্র মুকুন্দমণির ভূমিকার অভিনয়ের জন্য গোলাপসুন্দরী, মুকুন্দমণী, নামে অভিহিত হন। শরৎ-সরোজিনী প্রথম অভিনীত হয় এই ন্যাশনাল থিয়েটারে। অভিনয় রাত্রিটি ছিল জানুয়ারী ১৮৭৪। গোলাপসুন্দরী চলে আসেন বেঙ্গল থিয়েটার থেকে। বাংলা থিয়েটারে প্রথম নারী-অভিনেত্রী নিয়োগের ভূমিকা কেন নবীনচন্দ্র বসু।

প্রবাদ ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত লিটল থিয়েটারের বেঙ্গলী থিয়েটারে বিভক্ত হওয়ার তিনজন অভিনেত্রী। একের অন্যতম অমর দত্ত বিয়ের পর শ্রীমতী সেন হিসেবে পরিচিত হন। তাঁর নাম ছিল 'অপূর্বসুন্দরী'। এই নামেই তিনি থিয়েটারে অভিনয়ও করেছিলেন।

অমরা বাড়ি লিজকিনির প্রতিভা আবেদনের কারণে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনিও এসেছিলেন অভিনয়ের জন্য। প্রথম অভিনয়ে তাঁকে দেখে থিয়েটারে আসেন। তাঁর অভিনয় খাতি ও রূপের খাতি এবং প্রথম থেকে নাটকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভাব লিজকিনির কাছে পেতে চেয়েছিলেন। তাঁর শর্ত ছিল, লিজকিনির কাছে পেলে তিনি একটি থিয়েটার স্থাপন করবেন। কিন্তু থিয়েটারটির নাম লিজকিনির নামের সঙ্গে রাখতে হবে। একটি থিয়েটার হাতে পাবার আনন্দে লিজকিনি এবং তাঁর সহকর্মীরা একবাক্যে তাঁদের প্রস্তাবে সম্মতি দেন। কিন্তু থিয়েটার যখন খুলিতে হল, তখন থিয়েটারের নাম রাখা হল স্টার। একজন ব্যবসায়ীর নামে থিয়েটার খুলিতে হলে সমাজের কাছে অসম্মান হতে পারেন, এই আশঙ্কা লিজকিনির ছিল। মনের কোণে ৫ কোড টাকা দিয়ে বিনোদিনী তাঁর নাম-প্রভুদের দেওয়া বঞ্চনা ভুলতে চেয়েছিলেন। ১৮৮৯ সালে স্টারে অভিনীত হয় লিজকিনির 'চৈতন্যলীলা'। এই প্রতিযোগে লিজকিনি চৈতন্যদেবের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। অভিনয় দেখতে এসেন স্বয়ং লক্ষ্মণ পুরুষ স্বয়ং। তিনি চৈতন্যদেবের অভিনয় দেখে প্রশংসা করেছেন। লক্ষ্মণের পায়ের ধুলিও তুলিয়া খেয়েছেন। লিজকিনি তাঁকে প্রণিপাত করে বলেন, তিনি লিজকিনির মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, তোমার চৈতন্য হোক। লিজকিনি এরপরে আর বেশীদিন থিয়েটারে থাকেননি। তারপরও তিনি অনেকদিন জীবিত ছিলেন। কিন্তু থিয়েটারের সংস্পর্শ পুরোপুরি ছেড়ে দিয়েছিলেন তিনি।

রবীন্দ্রনাথ থেকে এসেও গিরীশ যুগের নটীরা সমাজের প্রতিটি সর্বস্তরের মনোরঞ্জনের পরও সক্রিয়রেছিলেন। তাঁর কাছে এরা অভিনয়ের ছাত্রীরা। অভিনেত্রী নিয়ে তাঁর সামাজিক কর্মনীতি নিয়ে কোনো কটাক্ষপাত করেনি। গিরীশ ভাদুড়ীর যুগে নটীরা এসেছেন বারাঙ্গনা পল্লী থেকে। কিন্তু তখন সমাজপ্রভুরা আর তাঁদের নিয়ে মনোরঞ্জন প্রস্তাব করেননি। ১৯৪৩ সালে পাশ্চাত্যের প্রতিযোগে পর থিয়েটারে ছিড় করলেন ভূপেন্দ্রের শিক্ষিত অভিনেত্রী বালু ও কন্যারা। সে কাহিনী এই আলোচনার বাইরে।

সুচিত্রা সেনের শেষ সাক্ষাৎকার

আশিসরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

আমাদের যৌবনে এমন একটা সময় গেছে যখন সুচিত্রা সেনের নাম শুনলেই জলতরঙ্গের মতো টুং টাং করে বেজে উঠত বুকের মাঝে। রাজকন্যার সেই বয়সে প্রেমিক হয়ে স্বপ্ন দেখতাম প্রেমিকা সুচিত্রাকে। একরাশ হিংসে হত সুচিত্রার প্রেমিক উত্তমকুমারের ওপর।

স্কুলের গণ্ডি ছেড়ে কলেজে পড়তে পড়তেই হঠাৎ সঙ্গীতের সাংঘাতিক ছোঁয়াচ লাগল সে-সময়কার জনপ্রিয় সিনেমার পত্রিকা 'উদয়াচল'-এর বাংলা ছায়াছবির পরিচালনা বিভাগে। উদয়াচলের অফিসে গান আর সিনেমার শিল্পীরা নিয়মিত আসতেন। আড্ডার হাটে আমরা তখন নির্বাক শ্রোতা। দর্শক।

সে-সব ছোলো থাক এখন। আসতে সুযোগ হলে বলা যাবে। সুচিত্রা সেনের কথা বলি। আমার তখন ষোল-সতেরো বয়স হবে। ছেচল্লিশ-সাতচল্লিশ সালের কথা বলছি। সুচিত্রা-উত্তমের 'সাড়ে চুয়াত্তর' আর 'অগ্নিপরীক্ষা' ছবি দুটো শেষ হয়ে গেছে একবারে টাটকা খবরটুকু আসতে আসতেই।

তারপর একে একে বছরে বছরে কত রোমান্টিক ছবি দেখেছি। যেমন —'সবার উপরে', 'শাপমোচন', 'শিল্পী', 'সাগরিকা', 'পথে হল দেরী', 'হারানো সুর', 'চাওয়া-পাওয়া', 'সপ্তপদী', 'দৃষ্টিদান' ইত্যাদি।

ছবিতে দেখা সেই রাজকন্যা সুচিত্রা সেনকে প্রথম চোখে দেখি 'উদয়াচল' আর বি এক্স ক্লে এ-র কাছেতে। আর প্রথম 'কথা বলি' গীতের গলদের সেবাশেষি। 'উদয়াচল' থেকে বেরিয়ে 'জলসা' পত্রিকায় আসি। সঙ্গীতের আরও সঙ্গে ওখানে চলছিল-সাংবাদিকতা। এক দল উদয়াচল-এর প্রতিযোগী হিসেবে জলসা-কে গড়ে তোলবার জন্য কী উদ্যমে ব্যস্ত।

সঙ্গীতশিল্পী সরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আর উৎপলা সেন সবার আগে এগিয়ে এলেন আমাকে সাহায্য করতে। তখন তেরাজলা সেনের বাড়িতে থাকতেন তখন সরীন্দ্রনাথ আর উৎপলাদি। আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন সুচিত্রা সেনের ১১৩ বি, লেকটেরি সুচিত্রা সেনের বাড়িতে। কোন সম্বৎসরে এখনও মনে আছে ৪৯-১৯৯৩।

যাই হোক, ফিরে আসি প্রথম দেখা সুচিত্রা সেনের ওখানে। উৎপলাদিকে ভীষণ ভয়ে ভয়ে ধরেছিলাম সুচিত্রার ছবি নিয়ে জলসার প্রথম সংখ্যার জন্যে অর্থাৎ প্রচ্ছদ করার। তিনি বি বি সি-তে বলতে সময় মাইকের সামনে বিশ ক্লোজ আপ ছবিটা আমাদের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'হাতের সামনে এ ছবিটা ছাড়া আর কিছু পেলাম না। এতে চলবে?'

উৎপলাদির হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে

আমি মাত্রাছন্দ প্রায় শিকেয় উঠে হাতে স্বর্গ পাওয়ার আনন্দে চেঁচিয়ে বলি, হাঁ-হাঁ এতেই চলবে। এর বেশি কিছু বলার সাহস হল না। তাছাড়া এখনকার সাপ্তাহিকদের মতো লাইলী বা চৌদ্দকটা ছিলায় না। মেয়েটির রিপোর্টিং করতেই পারতাম না। এটা কিন্তু আমার প্রশংসার দিক নয়। একেবারেই ডিসকোয়ালিফিকেশন।

তখনও সাপ্তাহিকদের তাঁর ওপর লেখা বারণ ছিল না। তোরহে শীতের দশকেরই ছবি 'তরঙ্গরাগ'-এর শুটিংয়ে উৎপলেন্দু-এর ক্যামেরাম্যান হেমেন মিত্র সুচিত্রা-উত্তমের একটা ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি নিয়ে অনুমতিতে আনমনা তুলে ফেলার পর থেকে মাত্রাব সুচিত্রার সেটে আসা তাঁর নিষেধ হয়ে যায়। আরও আগে 'জলসাঘর'-এর সম্পাদক কালীশের সঙ্গে মনোমালিন্য হয় ছবি তোলার ব্যাপার নিয়ে। যাই হোক, এ ঘটনার আগে তাঁর একটা ছবি (আর আর নেই) ওঠানো দেখতে গেছি টালিগঞ্জের তেল শুটিংয়ে। লাঞ্চের পর তাঁর নিজস্ব মেকআপ রুমে কথা হল কিছুক্ষণ। ভীষণ সুন্দর পরিবেশ তাঁর ড্রেসিংয়ে। একটা পরিষ্কার ভাব চারদিকে।

মেকআপ নেবার টেবিলটার ওপর অভিনেত্রীর ছবিতে টাঙানো রয়েছে লাল টুকটুকে জবাফুলের মালা। ধূপের মিষ্টি গন্ধে ভরে রয়েছে মেকআপ রুমটি। ওঁর একটা সাক্ষাৎকার নিতে চাইলাম। বললেন, 'এখন না। আমি নিজেই উৎপলাদির কাছে পাঠিয়ে দেব আমার সাক্ষাৎকারের লেখা।'

আমি অবাক হয়ে বলি, সে কি আমি তো কোন প্রশ্নই করলাম না আপনাকে! আপনি কী ভাবে না জেনে আমার প্রশ্নের উত্তর দেবেন?

হেসে বললেন, 'আপনাদের সব প্রশ্নই তো প্রায় এক। কবে জন্ম, কী ভাবে ছবির জগতে এলাম, কোন ছবিতে আপনি প্রথম অভিনয় করেন, কোন পছন্দসই ঘটনা, কী খেতে, কী পোশাক পরতে ভালবাসেন, আপনার অভিনীত কোন চরিত্রটা আপনার সব থেকে প্রিয় ইত্যাদি, ইত্যাদি।'

নিজে থেকে যখন জানতে চাইলেন, তখন আর তাঁকে বিরক্ত করলাম না। কিছুদিন পর সত্যিই তিনি পাঠিয়েছিলেন।

মাত্রাব সুচিত্রা লিখলেন — সাক্ষাৎকার, সাংবাদিকের প্রশ্ন এবং চলচ্চিত্র শিল্পীদের উত্তর বড় বেশি গোলমেলে আর প্রহসন মনে হয় আমার। আমাকে যদি প্রশ্ন করা হয়, কেন। আমি বলব, এই কেন-র কোন উত্তর নেই। কবে কোন ঘটনার মধ্যে দিয়ে আমার এ ধারণা হল আমি নিজেই জানি না। তাই এ বিষয়ে আপনাকে কিছুই বলা এবং লেখা আমার পক্ষে অসম্ভব।

মুশকিল হচ্ছে, পত্র-পত্রিকায় শিল্পীদের সাক্ষাৎকারের যে বিরাট স্তূপ হয় তা কখনও সঠিক পথ ধরে না। শিল্পীদের আসল চিন্তা খোঁজবার আগ্রহ বুঝতেই অনেকে প্রশ্নোত্তরের মধ্যে সীমিত নেই।

এর চেয়ে অনেক অরুণ। অবশ্যই সে আলোচনা এখানে অবান্তর। তার ওপর পত্রিকার স্বল্প পরিসর, যেহেতু অভিনেতা-অভিনেত্রীরা অনেকেই লেখক নন। গুছিয়ে লেখা ওঁদের সম্ভবও হয়ে ওঠে না। আসলে এমন কিছু প্রশ্ন থাকে, যেগুলোর জবাব সঠিক হয় না। জিজ্ঞাসা যা হয় তা নিতান্তই ভাসা ভাসা। মাঝখান থেকে মুশকিলে পড়েন শিল্পীদের ভক্ত, পাঠক-পাঠিকারা। ওঁদের প্রিয় শিল্পীদের সম্পর্কে একটা বিশেষ বিশ্বাসের বৃত্তের বাইরে আমার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন।

বলা যাক প্রথম দিন, ওঁভাবে ছবির

আমার আজকের এই পরিচিতি পেছনে কতটা বিস্তৃত ছড়িয়ে আছে?

'কতটা বিস্তৃত' বলতে কী বুঝব? তাহা তবে হয়তো এ প্রশ্নের শতের বাবদে সঠিক জবাব দেওয়া যায়। কিন্তু সেটা কি খানিকটা মিথ্যে বলা হবে না? আর যদি বলি, আমি যখন হাজরার উঠতি সাবলাশ গুলি তখনই বুঝতে পারি কতটা বিস্তৃত আমার পরিচিতি পেছনে ছড়িয়ে আছে। যেমন —

শালা চিত্রা সেনের কী দেমাক বাইরি ...। দেখতে দেখতে, অমনি ঘোমটা টেনে মুখ ঢেকে নিল — ছাহা, কী এমন অপরাধী যে — ইত্যাদি। কতটা বিস্তৃত এর উত্তর যদি এই হয় নিশ্চয়ই এও আর এক বিস্তৃত!

কত পারিশ্রমিক নিয়ে শিল্পী জীবনে শুরু? নিশ্চয়ই বিনিময় পারিশ্রমিক নিয়ে। প্রথম শুটিংয়ের অভিজ্ঞতা? অপরিচিত জগতে এসে সবার যা হয়, আমার ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই তা বাদে নতুন কিছু ঘটেনি। ভয়, বিস্ময়, আনন্দ সবই ছিল।

প্রথম দিকের সব ছবিই কি সাফল্য লাভ করেছিল? যদি না করে থাকে তাহলে আপনার মনে তার প্রতিক্রিয়া?

সাফল্যলাভ বলতে জীবনের সাফল্য বুঝব? অর্থকরী? সে ছবির প্রযোজকরা বলতেন। আর প্রথম দিকের ছবিতে অভিনয়ের সাফল্যলাভ করেছি কি না সে কথা বলতেন আমার দর্শকেরা।

পত্র-পত্রিকার সমালোচনা প্রসঙ্গে আপনার মতামত কী?

আমার অভিনীত ছবির, না আমার? আমার প্রসঙ্গে তো সর্বত্র। সেভাবে সমালোচনা কি কখনও হয়। অন্তত আমার ক্ষেত্রে হয়নি।

মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়ে আপনার প্রতিক্রিয়া কি?

খানিকটা বলতে এরপরে ভালোলাগার কথা বলতে পারি। আনন্দাশ্রুর কথা, আবেগে কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হওয়ার কথা। নইলে নিশ্চয়ই। সকালবেলায় আমাদের এক আত্মীয় স্টেটসম্যান খুলে মস্কোর সচিত্র খবর দেখান। খুশি হলাম। ভাল লাগল। তারপর ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙতে অজস্র টেলিফোন, ঘুমের মধ্যে ফোনের চলচ্চিত্র জগতের স্বজন-বন্ধুদের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বরে মুখরিত, বিরাট কিছু ঘটে গেছে।

আপনার ডাক নাম কি?

একটা, দুটো, সাতটা কি বলব নয়— অজস্র অজস্র, অনেক। যাদের ফাজলেরা যে নামে ডাকেন, সে তো একান্ত তাঁদের নিজস্ব। রোজ সকালে হাজারো চিঠি খুলি। কেউ ডাকেন 'সৃষ্টি', কেউ ডাকেন আর লজ্জা করছে।

কয়েকটি স্মরণীয় ঘটনা বলুন!

স্মরণীয় ঘটনার সংজ্ঞা কী হবে। শিল্পীদের জীবনের সব ঘটনাই কি স্মরণীয় নয়? সে তো অজস্রটি। একটা ঘটনার কথা বলি। একবার হ্যান্ডলুম হাউসে কাপড় কিনতে গেছি। একজন সেলস গার্লকে জিজ্ঞেস করলাম, অমুক কাপড় আছে?

অভিনয়ের মুখে কথা নেই। চোখ জোড়া স্থির অপলক। রীতিমতো নার্ভাস হয়ে উঠেছেন। মুখটা প্রায় কাগজের মতো সাদা হয়ে গেছে। পরে অনেকদিন মেয়েটি আমার ভীষণ ভক্ত।

শিল্পীর জীবনের অজস্র রহস্য তাঁর সৃষ্টির মধ্যেই আছে। আমার জীবনের সব কথা আমার অভিনীত চরিত্রগুলোকে ছকিয়ে ছিটিয়ে আছে সত্যকে ফুটিয়ে বলার তাগিদে। বাস্তব সত্যকে অবীকার করার চেষ্টা সেখানে নেই।

অতি সাধারণ কিম্বা অসাধারণ মানুষ, মানুষের সুখ আসাদ মনে হয় একেকটা ইতিহাস। ইতিহাসের আকাশ। আকাশের সেই রহস্য আমার চোখে আজীবন পরীক্ষার হাই। চাই নিবিড় আহ্বান —'খোল যে আকাশ, তুমি তব নীল যবনিকা'।

সুচিত্রা সেনের এই শেষ সাক্ষাৎকারটি পড়ে বোঝা যায়, তাঁর চিন্তা-ভাবনা কত স্বচ্ছ ছিল। তিনি কখনও সত্যকে অবীকার করেননি।

এখন তিনি প্রকাশ্যে এসেছেন মাত্র দুটি ছবির। তাঁর জন্য মুনমুন সেনের পাশাপাশি তাঁর দুই নাতনি রাইমা আর রিয়া অভিনয় করেছেন দিদি ও ভাসা ছবিতে।

এই তিন প্রজন্মের সাক্ষাৎকার নেবার সৌভাগ্য হয়েছে আমার অর্থপরাধী থাকে কাগজিকতার সূত্রে। একবারই বলেছি মাতৃদেবীর সুচিত্রার কথা। এবারে বলি তাঁর মেয়ে মুনমুনের কথা। পরে রাইমার কথায় আসব।

মেয়ে মুনমুনের চোখে মা সুচিত্রা সেন কেমন? মায়ের কথা বলতে গিয়ে মুনমুন প্রথমেই বলেন, আমার মার কথা আমার থেকেও বেশি জানেন আর সবাই। আমার শিশুকালে খুব কম পেয়েছি মাকে। চার - পাঁচ বছর বয়স থেকেই আমি পড়াশোনা করেছি কলকাতার বাইরে। প্রথমে দার্জিলিং। পরে বিলেতে।

বড় হয়ে মাকে একসময় জিজ্ঞেস করেছিলাম, কোন্ ছবিতে অভিনয় করে তুমি বেশি তৃপ্তি পেয়েছ? মা বলেছিলেন, 'এখনও আমি তেমন কোন চরিত্রে অভিনয় করিনি যাতে আমি পরিপূর্ণ তৃপ্তি পেয়েছি। তবে, 'সন্ধ্যারাগিণীর শিখা'-র চরিত্রটা আমার প্রিয় চরিত্রগুলোর মধ্যে একটা।'

'সন্ধ্যারাগিণীর শিখা'-র শেষ দৃশ্যে মা যেখানে মারা যাচ্ছেন, সেই শুটিংটা আমি দেখেছি। আমাকে জীবন নাড়া দিয়েছিল। ওই দৃশ্যটি অভিনয় করার কয়েক মুহূর্ত আগেও মা পরিচালক হরিদাস ভট্টাচার্যের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করে। কিন্তু সেই লাইট ফ্লোর, যখনি কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে মাথাটা নিচু করে পরক্ষণ মা মুখটা ওপরে তুললেন, তখন দেখি মায়ের দু'চোখ জলে ভরে গেছে। মুখের ভাব আর অন্তরতমের মধ্যে যেন একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম মায়ের মধ্যে। ছবির ওই দৃশ্যে মা যেভাবে মারা গেলেন তার মধ্যে কোন খুঁত ছিল না।

সিনেমা থেকে মা অবসর নিয়েছেন কতকাল। তবুও আজকাল যেখি আগ্রহে দেখা হয়, মা নাকি সব ছেড়ে ছুড়ে অধ্যাত্ম জীবন নিয়ে পড়ে আছেন পণ্ডিচেরিতে। কী মিথ্যে কথা। গতবছর সাতকুলার ছেলেরে ফ্ল্যাট বাড়িতে এখন আমরা থাকি মায়ের সঙ্গে পাশাপাশি। জানালা খুলে ফ্ল্যাট হলেও ছেলের দিকে মাতৃহৃদয় কেমন কাতর আছে। দেখলেই ইচ্ছে হয় মার কাছে যাই। মাও আসেন আমাদের কাছে।

মা এখন আর একা নয়। আমি ছাড়াও আমার দুই মেয়ে তাদের নিজেদের দেখছে। নাতনিদের সঙ্গে মায়ের খুব ভাব। রাইমা, রিয়া যখন যে ছবিতে কাজ করে সেই চরিত্রে কীভাবে অভিনয় করতে হবে সেটা মা নিজে বলে দেয়। তবে পরিচালকই যে সব তা মায়ের বলে জানা আছে।

রাইমা-রিয়ার অভিনয় মা সেটেও দেখতে পারেন না। একেক সময় মাকে জিজ্ঞেস করি, তুমি তো আমার বেলায় কিছুই দেখিয়ে দাওনি। তবু তোমার চোখের আশঙ্কা ছিল আমার অভিনয় করার সময়ে।

মা হেসে বলেন, 'তুই তো আমার মেয়ে। আর ওরা তোর মেয়ে। নিজে হাতে আমার অভিনয়ের নাড়ি-নক্ষত্র কী করে বলব বল?'

সত্যি, রাইমা আর রিয়া খুবই আমাদের ঔরসের নিদর্শন। রাইমা বড়। রিয়া ছোট। মুম্বাই থেকে হিন্দি ছবির অফার আগে এসেছে রিয়ার। ১৯৯৭-র শেষ ইউ হামেশা'-র। রিয়ার বয়স তখন ছিল সবেই সিক্সটিনে।

রিমিমা আর মায়ের 'সেন' পদবি বাঁচিয়ে খুব আশঙ্কা রিয়ার। বলেছিল আমায়, 'দেবব্রতা আমার পিতৃদত্ত পদবি। সেটা যেন থাকবে। সুচিত্রা সেনের নাতনি বা মুনমুন সেনের মেয়ে হিসেবে আমার

কবিতা-২

শর্তকাম

উত্তম বসু

ভালবাসা, আমরা চাই মহাপণে কেনা –
ভালবাসা মহাকাল বেলাভূমিরই প্রতিমা;
ঢেউ ও শিউর এমনই সরলরৈখী ঘুড়ি, আকাশেরা
গায়েদের অত্র মুখ চিরিয়ে ঝুলছে.
খুলনে খেয়ায় আর মাটির গন্ধের সঙ্গে
ঘটা নেড়ে খেয়ে কথালাভ পুরোহিত
পাপপুণ্যির তাদের হাতে রাখি পড়ছে ঢাকে।

মহাকালের গুরুন এসেছে আবহমান, আজকালে
টানার পাখনা, নিত্য কতো যে আকাশ,
আলো-কালো খেলা করে। নিত্যর বেহায়েরা
স্টেশন পেরিয়ে চলে যাওয়া
শুধু নিয়ে আসটুকু রেখে –
যে থাকে, যা থাকে, সেই তো শিকা।

দিনের পর দিন

রাম বসু

এত বড় আকাশ রয়েছে। আলো বাতি, উঠানে সাদাফুল
অনেক বিয়ান গাছ, পেয়ারা পলাশ বাঁচি অক্ষয়বট
অনেক না-বলা কথা, জলস্থল, চিঠি, অনেক ছাউনি
তারা সব জড়াজড়ি করে কথা বলে অন্ধকারে
অন্ধকারে এক হয়ে রয়।

কেবল মানুষ একা, জীবনে ওয়ারী, ঘুমের ভাষা, পৃথিবীর সবার
নিজের সঙ্গেই তার আলাপ-বিলাপ, ঘন্টা ভালবাসা
দেহ তার লিখিয়ে দিয়েছে দেহহীন বিশ্বর শরীর
রাত্রে ঘুমে ভয় পায়, দিনে হিংস্র ও পাগিষ্ঠ
বই বেঁধে তাড়াতাড়ি উঠে পড়তে দিয়ে কয়েকটা নক্ষত্র
বই ছেড়ে খপটি কাঠিটে

এই সব আধাআধী ইতিহাস ছড়িয়ে রয়েছে শিকড় নাকড়
এত আয়োজন প্রব দেশ মৃত্তিকা থেকে সকাল, পেয়ে
টিটে খানের মতন রাতারাতি উঠছে, পরিণামহীনতার গর্ত।
কার্টরিজগুলির মতো সবসময় নদী ছুটে যায়।

আমরা কি ত্রিকালজ্ঞ, নাকি নষ্ট হল নক্ষত্রমণ্ডল ?

কেশকাল ক্রমশই ছড়িয়ে পড়ছে মাটিক নিয়ে
আমাদের যাই থাকে টেনে নিয়ে যায় শীতল বিয়ন
কোথায় ? তা কেউ জানি না, জানতেও চাই না
মাতৃগর্ভে পাপড়ের নিচে ছাপা পড়ে আছে প্রশ্ন ও বিবেক

এতকাল গাছের মাথায় পাখি ছাড়া নিয়ে বাসাটুকু রেখে
এখন সে উড়ে গেলে টু-শব্দ না করে
এখন রয়েছে শুধু এই পেতে মাটিপাশে নিঃস্ব মহানতা
নিঃসঙ্গতা নদী মানুষের।

আজ আকাশে অজস্র ঢেউ নৌকা হয়ে যায়।

মানুষের কবন্ধনে মাঝেমধ্যে অসুখ একলা।

কলিকাতা – ক্যালকাটা কোলকাতার একটি অন্ধ্রবিস্তর পাঁচালী

রেবতী ভূষণ ঘোষ

শুন শুন মন দিয়া সাধু সর্বজন।
কলিকাতা সৃষ্টি কথা বিচিত্র কথন ॥
জোব চার্নক যবে যেথা খুলিলেন গাড়া
তাহার কাহিনি কিছু প্রথম কলিকাতা ॥
পশ্চিমে গোবিন্দপুর, দক্ষিণে সুতানুটি
মধ্যে গ্রাম কলিকাতা বিশ বাটিখানি ॥
জাহাজ ঘাটের উপকণ্ঠে ছিল, গঙ্গা জানি।
জঙ্গল-আকীর্ণ পথ হেয় গণ্ডগ্রামখানি ॥

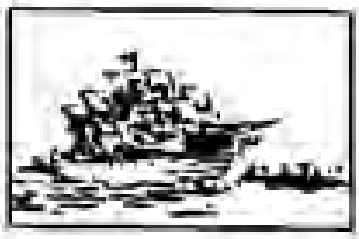

দক্ষিণরায়ের রাজা কিছুটা দক্ষিণে
গঙ্গাতীরে বসিত্রে পোলা বাজে, জলু দিনে ॥
আসিত আসরগঞ্জে কোরঙ্গ তরণী।
বিবিধ পসারী, পাশে বিচিত্র বাজনী ॥
হাথাই জাহাজী দিনে যার গঙ্গাস্নান
আসিল ইংরাজ সাথে সৈন্য সোলস্নান ॥
দুলিত মোগলা ধন কোম্পানি গুদামে
চাষাড়ের গুটি কিছু সেই আসবাসে ॥
শিবাপদ বৃক্ষতলে শুরু কারবার
পশম তৈল বৈদেশিকদানার বাজার ॥
আনকস্ত ছাড়ি বাজারস্ত ঘরে ঘোরা
গ্রাম কলিকাতা সহরে পরিণত জোরা ॥
স্যাহেব গোবিন্দপুরে সরকার চৌধুরী
সুতানুটি গোবিন্দ নবকৃষ্ণ রাজপুরী ॥

ফোর্টহাউস হাওড়া আসি বাণিজ্য কাজ সেরে
স্বদেশী বণিকদল এল ফিরে ঘরে ॥
বিধায় উৎকল আসা দূর সমুদ্রের
নূতন পত্তন হৈল এ বন্দরবাজার ॥
হিন্দিল বিবিধ জাতে অতিথে তোয়াজে
পরীধানে, পালওয়ান পাল্কীর বেহারা ॥

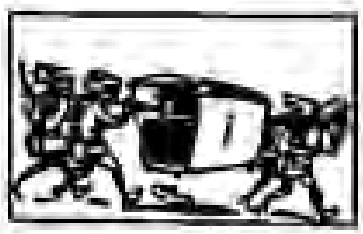

জাহাজীরা বিধি হয়ে উঠিল বক্ষতে
গ্রীনউইচ মধ্যগোলা মৈলেন গোয়ালন্দের পথে ॥

দেশী আর রাজধানী মিলি ঘাঁটিলাটি
কলিকাতা হইল বিশ্বনগরে কালপয়েন্ট ॥

ব্রুয়ার্থ ক্রিস্টোফার্স লাগোস ও সীলে
অন্তরাগে বন্ধু বিধি ভরেন প্রণয় ॥

অতঃপর শিল্পের লাগে বিপ্লবের ছোঁওয়া
হাওড়াশাটি অন্ধপক্ষি মৈলা করে যাওয়া ॥

মিটিয়র মোটরযান ক্রমে এল ছুটে
শিয়ালদহে বিদ্যুৎ ঘাটি ট্রাম চলে ছুটে ॥

এই মত বহু বর্ষ গিয়াছে কাটিয়া
বর্ষিল কত না জল ভাগীরথী দিয়া ॥

ইংরাজ তাড়িল দেশ ছাড়ি গিয়া ক্রমে
ক্রমশঃ ধরেছ আলো সেই কাটা দাগ ॥

যত জল তার মত ছোট বড় জল
শাসন-আসন পেতে নিয়েছি কোলপল ॥

সপ্তগ্রামি ছাড়িল হাওড়া নাম বদলের
ছুঁয়ি হুগলী পুলে ইংরাজির ঢেলে ॥

কোলকাতা নাম লাগি মৈল জল ঘোলা
জলঘর নিলামিকে মৈল লোটে গোলা ॥

ব্রকপিল এই প্রশ্নে কোলকাতা মহিমা
লন্ডনপতির তার নাহি বুঝি সীমা ॥

পশ্চী ও নিধনি যত সাধু ও তস্কর
বিরাজবিহীন রহে নিজ নিজ ঘর ॥

সকলের অন্তে তাঁর আছে কোলকোল পাতা
তেঁই তো মৈল জানা নাম কোলকাতা ॥

কলিকাতা পুরাণের নাহি উপাখ্যান
ভূষণ লইয়া অঙ্গে ভবনে পুরাণ ॥

শহর

অজিত বসু

শহর থেকে দূরে একদিন দুপুরে অন্ধকারে টিমটিম লাইনো আলোয় আবার ঘরে ফিরে আসবার দিনগুলি। কোথায় নিস্তব্ধতার বুক ফাটিয়ে অন্ধকার পথে ছুটে যায় ট্রেন। কানে বিকল হাত-পাওয়া গাড়িয়ে এঞ্জিনিং-এর কাজ — শব্দ ও আগুনের ফুলকি।

চাল নিরক্ষরতা মানে দু-একটি লেখাপড়ার কথা, যেন ফিসফাস। তারপর গম্ভীরভাবে অন্ধকারমাখা নিরক্ষরতা ছড়িয়ে পড়লাম্বিনে অন্তরিতার দেহে...

আমার অন্ধকার ঘুম কোন অচেনার অস্পষ্টতার ঠোঁটে... কোলাহল, ভিড়, হিজিবিজি, হর্নের, ট্রামবাস-যানবাহনের কানফাটানো আওয়াজ, ধুলো, মুখলপুটিতে ডুবে-যাওয়া-পথ-এই সব ছবি একে একে। এতদূরেও তাঁদের মতো শহরটা আমার সঙ্গে সঙ্গে চলে এসেছে।

আমি চাই না তাকে। কিন্তু হাত-ধরা নিরক্ষরতা ছাড়িয়ে দিল আমার কতগুলিকর প্রেমকে। কেন জানি চেতনার মধ্যে পড়িয়েও তার ভেতে পাওয়া মুর্তির গায়ে আমার চোখদুটো টপটপ ঝরল...

হয়... শেষ ট্রাম চলে যাচ্ছে। বিশ্রাম হুইসল। পালক হিজিবিজির হিংকার।

শহর। শহরের রাত। কোন আকাশ আতঙ্কের ওপর কাত হয়ে আছে।

ঘুম ভেঙে নিরক্ষরতা। স্তব্ধতম। শব্দহীন অন্ধতা। গায়ে, পরতায় পরতায় তাদের নিস্তব্ধ ডানা। আর উট-নিচু একঢেলেখেবড়ো পেরিয়ে আকাশ ছড়িয়ে দিয়েছে। হাত বাড়িয়ে দেন নিরক্ষরতা। আমার কুষ্ঠিত হাত কোন লোপাট কোটির থেকে বেরিয়ে আসে। বিশ্বাসঘাতক নানা সংশয় পেরিয়ে পঙ্গিত পায়ে এগিয়ে ছিন্নবিচ্ছিন্ন রূপসায়র।

কিন্তু কোন ঘুম ভেঙে চিনিয়ে আলো আমায় উটুক ঘাসকাটা খেকে ধুলোয় ধরপায়।

শহর, আমার শহর, গানের মতো, ভালবাসার মতো, আঁশা আঁশা আলোয় ঘুমে উঠল।

বিরক্তির নানা কটাকুটি বীভৎস করে তুলেছে আমায় – শুধু তারই মধ্যে আমার কাতর প্রার্থনায় চোখ জলে ঝাপসা, অস্পষ্ট, অন্ধকার!

শহর

শিশির সামন্ত

কলকাতাতে দিন শুরুবার অবধি
অনেক লোক, নাম কী তার 'ইন্দে'।
আষাঢ় কাওরা টাটকা দিনগুলো
কাউকে কিন্তু পরব তোরা করেনি আপ্যায়।
চাপানো তবক, বাঁচিয়ে রাখা ঘর।
দক্ষ ছিল, সজ্ঞি ছিলো, ধুরাপ তার
সাজানো গোছানো চতুর্দিকে এ কলকাতার;
খোলের মতো এ কলকাতা সাদাটে,
যারা এখন সবাই এখন বাঁচায়ে।

মাটি

বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায়

পরণে আট হাত ধুতি, কলঙ্কিনের জুতো —
ছিলেপুর ইস্টিশানে বসেছিলেন
সেই ভ্রমণকারী।
তাঁর সমস্ত শরীরে
ছিল বালুবেলার চোকলা ধুলো।

মাটি যে কখন কাছে ডাকে !

মাটি যদি ডাকে
ধুলো উড়িয়ে আসবে।
তারপর
উড়িয়ে নিয়ে যাবে ধুলোর মতো।

রক্তচন্দন

শক্তিপদ রাজগুরু

জীবনটা একটা নদীর মতই গতিময়। পাহাড়ের গহনে থেকে নেমে আসে নদীর ছোট এক প্রবাহ, তারপর তিন পাহাড়ের জলধারা এসে মেশে তাতে।

ক্রমশঃ সেই বিভিন্ন ধারার মিলিত প্রবাহ দুর্গম পাহাড়-অরণ্যপ্রদেশ অতিক্রম করে আসে প্রান্তরে। সেই প্রান্তর কখনও বন্ধুর, অনুর্বর রুক্ষ। সেই জলহীন রুক্ষ প্রান্তর পার হয়ে নদীর প্রবাহ আসে লোকালয়ে। চারদিকে জন সমুদ্ধ শস্যক্ষেত্র জনবসতি। মূল স্রোতটা এক পরিবেশ।

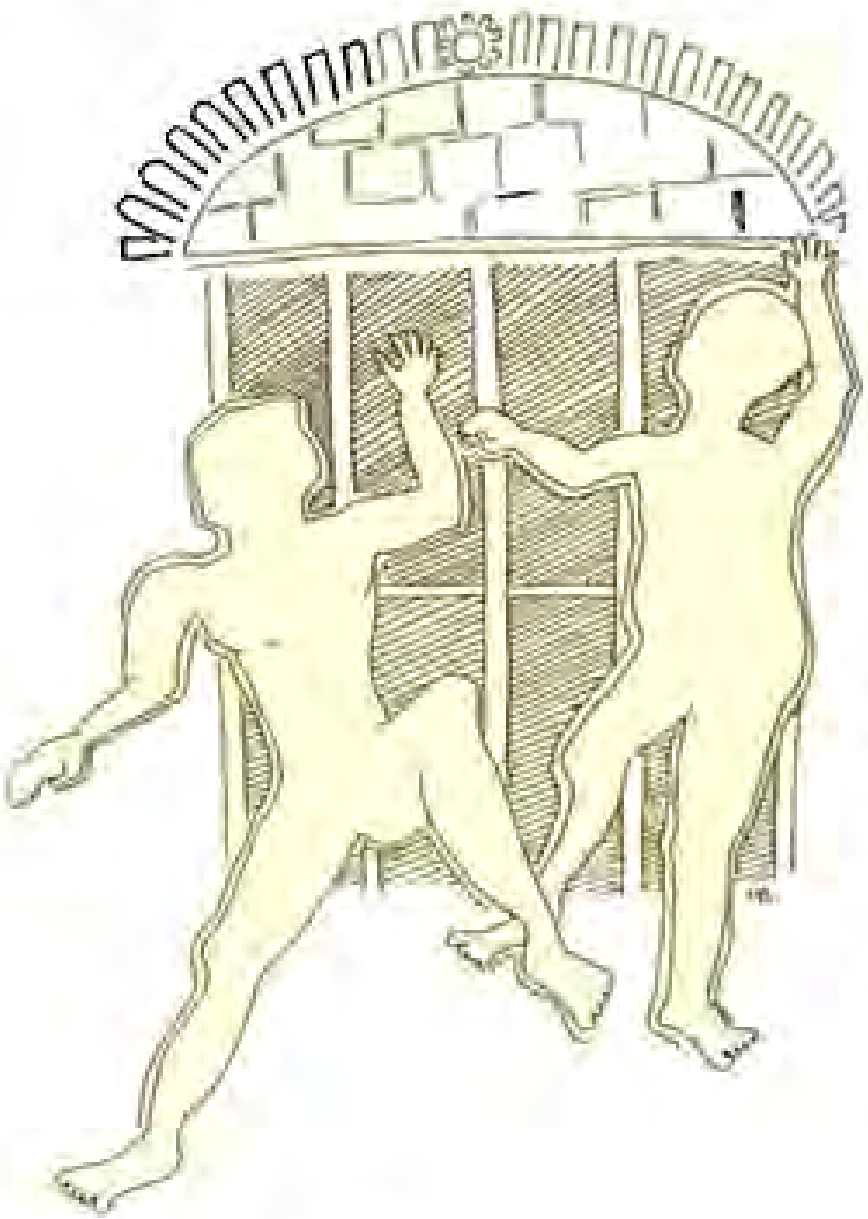

মানুষের কলকাকলি, ভরা জগৎ-সংসার ঔদাসিন্যতা। এই বিভিন্ন পরিবেশের মধ্য দিয়ে নদী বয়ে চলে। আশা-নিরাশার দোলায় দুলতে দুলতে চলে তার প্রবাহ কোন শাশ্বতের সন্ধানে।

বাবা মা ডাকত সুনীল বলে। বন্ধুরা ডাকত নীল বলে। কলকাতার উপকণ্ঠে একটা চুন-পলেস্তারা খসা বাড়িতে থাকতেন ভুবনবাবু। কোনও সওদাগরি অফিসে চাকরি করতেন। সামান্য মাইনে, সংসারে স্ত্রী ছেলে একটি মেয়ে চন্দনা। সুনীল স্কুলে পড়ে, মেয়েটিও বড় হচ্ছে। সংসারের খরচা মিটিয়ে দিন চালানো ক্রমশঃ কঠিন হয়ে যাচ্ছে, তবুও ভুবনবাবু প্রাণপণে চেষ্টা করেন।

এমনিতে সৎ-আদর্শবান মানুষ। গান্ধীজীর নীতিতে বিশ্বাসী। একসময়ে ভুবনবাবুও স্বপ্ন দেখতেন দেশের মুক্তিসংগ্রামে যোগ দেবেন। কিন্তু তা হয়ে উঠেনি। বিয়ে-থা করে সংসারী হতে হয়েছিল।

তবু সৎ ভাবেই জীবন যাপন করতেন।

অফিসে রিপোর্ট, ইস্কুলে পড়াশোনার দরকার ছিল, কিন্তু ভূতনাথবাবু এগোতে পারেনি। সুশীল যখন স্কুল-ফাইনাল দিয়েছে, তখনই তিনি বলেছেন —নাহ্ ভাবে বাঁচতে হবে।

কলেজে ভর্তি হয় সুশীল। মনে তখন অনেক আশা— বিয়ে পাশ করবে। কোথাও একটা ভাল কাজকর্ম পাবে। সংসারের সুরাহা হবে। কিন্তু সব স্বপ্ন কেমন শূন্যেই মিলিয়ে যায়। বাবার শরীর ভেঙে পড়ে, তবুও আশা ছাড়েনি সুশীল।

আজ সেই জীবন থেকে জনায়াসেই সে এক বিরাট জগতে নির্বাসিত হয়েছে নিজেদেরে। কখনই ভাবেনি সে কেলেঙ্কারীর মাটীতের মধ্যে।

জোসেফ কেনেডির পূর্বপুরুষ ছিলেন নীলকুঠির মালিক। জোন্সনীর আমলে ফোসেফের পিতৃদের ইংল্যান্ড থেকে এখানে এসে আসা অন্বেষণে বের হয়েছিলেন। জোন্সনীর নীলকর সাহেবদের আমলে। তখন তারাই দেশের হর্তা-কর্তা-বিধাতা। তারা তখন এখানে চাষীদের টিপ ছাপ সব দখল করে তাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নেয় জোর করে তাদের জমিতে নীল চাষ করাতে বাধ্য করেছিল। সেই নীল যেত ইউরোপের বাজারে। চড়া দামে বিক্রি করে ওরা মোটা মুনাফা করত, তার কিছুটা দিতে হত এদেশের চাষীদের।

জোসেফ কেনেডি জোন্সনীর সাহেবদের খুব কাছের মানুষ। তাই জোন্সনীর সাহেবরা জোসেফকে নিজীর্ণ জমিই দিয়েছিল যাতে সে সেখানে নীলের চাষ করে তাদেরই মাল দিতে পারে। জোসেফ এই পরিবার কম দেখে উপায়ান্তরেই তার পুঁজি জমিদারী গড়ে তুলে ফেল। নীলের চাষ করে তাদ পরিবার মনে প্রচুর ওটিপোজায় চাষেও শুরু করে। রেশম তৈরী করতে থাকে, জোন্সনী এত সন্তায় রেশম পেয়ে খুশি। তারা এই রেশমের কাপড় বুনিয়ে বিদেশে চালান দেয়।

জোসেফির তার লাভের অংশ পায়। জোসেফি এইভাবে প্রচুর অর্থই রোজগার করে। তার জোসেফ এই ব্যবসাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। ক্রমশঃ ওই পরিবার এখানেই বসিন্দা হয়ে যায়। তিনটি অঞ্চল থেকে জোসেফ পরিবারের কর্তৃত্বের কারবার চলছে এখানে। তারা জমিদারিও কিনে এখানে ক্রিশ্চিনদের একটা স্টেটমেন্ট গড়ে তোলে। ক্রমশঃ এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের সাথেই তারা জড়িয়ে যায়। এদেশেরই একজন হয়ে গেছে। তারাই এই আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে শিক্ষার বিস্তারের জন্য স্কুল গড়ে তোলে। গড়ে তোলে হাসপাতাল, এখানে চিকিৎসার কোনও সুবিধাই ছিল না। সাধারণ মানুষ বিনা-চিকিৎসাতেই মারা যেতো। জোসেফি পরিবার এখানকার মানুষকে সেই রোগ-যন্ত্রণার থেকে মুক্তি দেবার জন্যই নানা কাজ করেছেন, হাসপাতাল গড়েছেন।

সুদূর উপত্যকা —সবুজ, ঢেউ পাহাড়-বনের মধ্যে একটি ছোট্ট গ্রামকে ওঁরা সমৃদ্ধশালী করে তোলার চেষ্টা করেছেন। ওঁদের উদ্যোগেই এই সমুদ্রের থেকে শহর যাওয়ার রাস্তাটি পাকা হয়। এই জন্য পাহাড়ের বুক চিরে চলে গেছে এই গ্রামের পাশ দিয়ে। একটা চার্চও গড়ে তোলেন জোসেফি পরিবার।

ক্রমশঃ দিন বদলায়, কালের গতির সাথে সাথে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়। ইংরেজরা চলে যেতে শুরু ভারতবর্ষ ছেড়ে। শিল্পান্ন থেকে যায় অনেক রক্তাক্ত ইতিহাস। এই অঞ্চলেই তখন শিল্পীদের আস্তানা গড়ে উঠেছে। জমশঃ, পাহাড়ে, জঙ্গলে সবই সাধারণ মানুষ চায় ইংরেজ এবার এদেশ ছেড়ে চলে যাক। ইংরেজ তা চায় না। তাদের অত্যাচারের মাত্রা বাড়ে। তার এদেশের মানুষও বিদ্রোহের জন্য তৈরী হয়। আসে সংঘাত। আর জোসেফের পরিবারও এই সংগ্রামে ওই শিল্পীদেরই সাহায্য করে, তাদের আশ্রয় দেয়। কারণ জোসেফ বুঝেছিলেন তাঁকে এই দেশেই থাকতে হবে, তাঁর পূর্বপুরুষরা এখানেই বসবাস করেছেন। ইংল্যান্ড তাঁরা দেখেননি।

জোসেফ জো পুরোপুরি বাঙালীই হয়ে গেছেন, তাঁর পূর্বপুরুষ এখানে অনেক অত্যাচার করে নীলকুঠির প্রতিষ্ঠা করেছিল, রেশম চাষ করে বড়লোক হয়েছিল। জোসেফ জেন তারা পূর্বপুরুষদের এই পাপকে ক্ষমা করতে পারেননি। তাই ঈশ্বরবিশ্বাসী হয়ে মাঠে প্রার্থনা করতেন, জনসাধারণের উপকার, সেবার কাজ করতেন। ক্রমশঃ সংসার ছেড়ে ধর্মকর্ম-জীবনেরার কাজেই জড়িয়ে পড়েন। পাদ্রীর মতই জীবনযাপন করতে থাকেন।

মিঃ ঘোষেদের সংসার অবশ্য ছিল সুখের দিকে। একটি ছেলে ঘোষেদ পিটার আর একটি মেয়ে, শ্রী-ই সংসার দেখাশোনা করত। ঘোষেদ সংসারী হয়েও সংসারের কথা ভাবতেন না। প্রফেসরি কাটিয়ে তাঁর বেশীরভাগ সময়। তারপর, এলাকার বন্ধুদের নানা সমস্যাগুলোর দিকেও তাঁকে নজর দিতে হত।

ঘোষেদের স্ত্রীকেই সংসারের সবকিছু দেখভাল করতে হয়। অফিসজনার কাজ করে লোকজন, তবু মিসেস ঘোষেদ নিজেও এসবের তদারক করেন।

ছেলে পিটার ঘোষেদ ক্লাসের খুবলেই পড়ে। পড়াশোনায় পিটার খুবই ভাল, আর খেলাধুলাতেও টৌকস। তাদের ছেলেদের সঙ্গে ফুটবল খেলে। নদীতে নৌকায় বেড় বেড়ায় ওরা পাহাড়ী নদীতেই নৌকার বেগ, তীব্র স্রোতের সঙ্গে লড়াই করে জল তীরে পৌঁছে সর্বাঙ্গের পেছনে ফেলে। তীরধনুক নিয়ে পাখী শিকার করে। আবার ধনুকে একটা আছে, পিটারের খুব ইচ্ছা ধনুক দিয়ে শিকার করে, কিন্তু বাবা বলেন —

—অকারণে হত্যা করা পাপ।

—কিন্তু সেদিন রনুষকেকো চিতা বাঘকে মারলেন আপনি?

এলাকায় একটা চিতা বাঘ মানুষখেকো হয়ে গেল কিছু পশুখোর যাবার পর মানুষ মারতে শুরু করে। গ্রামের মানুষজন ভীত ত্রস্ত। চিতা বাঘটা চিনারঞ্জন মানুষ আর ঘুটো রুগাল ছেলেকের মারে।

তারপর মিঃ ঘোষেদ নিজেই তিন-চার দিন চেষ্টা করে শেষে চিতাবাঘটাকে গুলী করে মারেন। এলাকার মানুষজন নিশ্চিন্ত হয়। ছেলের কথায় মিঃ ঘোষেদ বলেন,

—বাঘটা মানুষ মারতে শুরু করেছিল। সে হয়ে উঠেছিল সমাজের শত্রু, তাই মানুষদের বাঁচানোর জন্য এটাকে মেরেছি। তাতে পাপ নেই। অবশ্য প্রচুর কারণ ছিল, অকারণে মারিনি।

পিটার বলে —তাহলে মানুষের সমাজের শত্রুকে মারলে পাপ নেই।

—না। বড় হও, তারপর বুঝবে মানুষের সমাজে শত্রু আরো।

পিটার ঘোষেদের বেজর স্কুলে পড়ছে। যা নাম রেখেছিল নিজের নামের সাথে মিলিয়ে লিজা ক্লারিস ঘোষেদ। লিজা বলেই ডাকত সকলে। ক্লারিস আবার স্কুলের গায়কদেরই নীর্দিত ছিল।

ফুটফুটে সুন্দর মেয়েটি, পিটারও তাকে খুবই ভালবাসতো, সাথে করে নিয়ে বেড়াতে যেতো।

ঘরের এক নতুন প্রতিবেশীও এসেছে কিছু দিন আগে। তাদের টিপঢাকার ওদিকে বড় রাস্তার পাশে বেশ কিছুটা জায়গা নিয়ে এক সর্দারজী সেপরিবারের পর এখানে এসে বড় কারবার করেছেন। সেই সর্দারজীর ছেলে হরমনস্ এখন পিটারের বন্ধু।

হরমনস্রা থাকে কলকাতায়। তার কোনও আত্মীয়ের কাছে। ছুটিতে এখানে এসে হরমনস্ও চলে আসে পিটারদের বাড়িতে। পিটারের মাও হরমনস্কে ভালবাসেন।

কেক পুডিং বানান ওর জন্য। পিটার লিজাও খুশি হয় হরমনস্ এলে। লিজা বলে —হরমনস্ ছুটি এলে মা কত নতুন নতুন খাবার করে। ছুটি তোমার ভালবে। আমাদেরও কেক মুখ বদলানো যাবে।

বলে হরমনস্ —তাহলে হরমোজ আসবো, লিজা।

এরা তিনজনে খেলা করে, হরমনস্ও কদিনে হেলে এই বাড়ির ছেলে হয়ে যায়, পিটারের মা বলেন

—হরমনস্, তুই আমার আরেকটা ছেলে।

—আন্টি! হরমনস্ও এই পরিবারটাকে হৃদি মুখে মেরে নেয়। ছুটি ফুরিয়ে গেলে হরমনস্ও ফিরে যায় পরিবে, এদেরও মন খারাপ হয়ে যায়। পিটারের মা বলে

—পিটার, লিজা, তাড়াতাড়ি এখানে পড়া শেষ করে যে, তবেই পরবে নিয়ে হোস্টেলে থেকে পড়বি, হরমনস্-এর সাথে তখন দেখা হবে।

পিটার-লিজারও মায় মেরে তারা এখানে পড়া শেষ করে পরবে দেখে, পড়াশুনা করছে, হরমনস্ও আসছে ছুটিতে হোস্টেলে দুই ভাই করে থাকবে তারা এখন। ভাই পড়াশুনায় ভাল মেয়ে তারা।

ক্লাসের একজন ছেলে জর্জিন বাজারের প্রার্থনার সময়, ছেলেটার নাম রবার্ট। সে এমনিই ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েছিল এখানে হাতে একটা ট্রানজেস্টর বাক্স, সেদিন ক্লাসের সামনে পাহাড়তলায় বসে আনমনে সে ট্রানজেস্টর বাজাচ্ছে। ছুটি প্রায়-

পাহাড়ের দিন শেষের ঢেউ হিমহাওয়ার আমেজ এনেছে, পাখিদের কলরব ঢেকে এই ঠান্ডাতার মধ্যে সোকটার ট্রানজেস্টরের সুর ওনে মনকে দাঁড়ালো লিটার। পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় সে, কুকুরটি কেন তাকে দুর্বার আকর্ষণে টানছে। এই সুর লিটারের মনে কী বিচিত্র সাড়া জাগে। সুর থামে। লিটার কথা বলে —বাজনা বাজাও তুমি।

লোকটা বলে —শিখলে তুমিও বাজাতে পারবে এই ট্রানজেস্টর।

— সত্যি? লিটার লোকটাকে দেখছে।

লিটারের বাবা চাকরির একজন অবাঙালি বাজনার লোক খুঁজছিলেন। জেনেশুনে এই ট্রানজেস্টর এনেছেন। নিজেও সুর তোলেন, কাজে হয়ে লোকটা হাল ছাড়িয়ে। তাই বলল —তুমি আমার বাজারে পার? কিনেছ তোমার নাম?

—নরসিং। পাহাড়ে ভিটেছিক লোক বিশেষ, স্ত্রী মারা গেছে, আর কেউ নেই। সব ছেড়ে বেচে হয়ে পড়লাম, ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে শান্তি পেলাম, তাই ঠাঠে বসে যা-মেরীদের বাজনা শেখাচ্ছিলাম।

—এখানে থাকবে? আমি বাজাবে।

— হাঁ। জায়গাটা খুব নিরুপদ্রব, নিশ্চয়ই থাকবো আমরা।

জেসেফের পরনে একটা পাদ্রীর পোশাকই, লোকটা তাই ওকে ফাদার বলে ডাকে।

জেসেফ বলল —তাহলে থাকো। লিটারও খুশি হয়। বলে সে, —আমাকে ট্রানজেস্টর বাজানো শেখাবে?

—নিশ্চয়ই। তুমি যদি শিখতে চাও আমি নিশ্চয়ই শেখাবো। এ তরিন বাজনা, এ বাজনা শিখতে গেলে কঠিন সাধনার দরকার। আর চাই ঈশ্বরের আশীর্বাদ।

ঈশ্বরের আশীর্বাদ তোমরা দিল লিটারের ওপর। সে এর মধ্যে বাবাকে বলে তার জন্য একটা সুন্দর ট্রানজেস্টর কিনিয়েছে শহর থেকে। আর নিজে সে বই বাজনা নিয়ে একার পড়েছে। কাছাকাছি একজন প্রতিবেশীন, একদিন গানের গিয়াকে পেয়ে কলকাতা নিয়ে শেখাতে থাকে। লিটারও চেষ্টা করে এই বাজনাটাকে আয়ত্ত করতে।

হরকলস্‌ও ছুটিতে আসে। সে লিটারের ট্রানজেস্টর ওনে মুগ্ধ। বলে হরকলস্‌

—বাজনা বাজাও তুমি লিটার!

লিজা বলে, — বাবা এখন এই নিয়েই পড়েছে, হরকলস্‌দাদা।

হরকলস্‌ বলে, —ঠিকমত শিখলে কলকাতার নামী ট্রানজেস্টর বাজিয়েদের মি ছুটি করে দেবে তুমি।

লিটারও তার দেখে সে নামকরা শিল্পী হবে। তার বাজনার ছুটে ওঠে এই সুন্দর প্রকৃতি—চারিদিকে নদী-ঝরনারা পাখীর কলরব।

সে এই ট্রানজেস্টর নিয়েই জগৎ ভুল করবে। সকলেই জানবে তার নাম। তার জানে আছে ট্রানজেস্টরের সুর। হঠাৎ ভয়ে কঠিন চিৎকারে লিটারের খেয়াল হয়, জেসেফ সামনে জেসেফের মুখটা ভেসে ওঠে। ওদিকে পাহাড় কাটার ট্রাকটাক শব্দ ওঠে, ভেসে হাতুড়ি পড়ছে পাথরের বুকে।

পাহাড় সমুদ্র ঘেরা নীলের এই মুক্ত জেলখানার নীলাশ্রী বন্দী, পায়ে লোহার গরু ভগ্ন পাথুরে মাটিতে কোদাল নিয়ে পাথর মাটি কাটছে। জেলার বুলিমাট কুকুর নিয়ে কাজের দেখাশোনা করছে। কঠিন মেজাজ তার। কয়েদীদের চাবুকও মাঝে মাঝে তার— খালিগায়ের পেশী। বন্দী কয়েদীরা খাটছে—কাজ করছে।

নীলাশ্রী তাদেরই একজন। পাহাড়ের উর্ধ্বাকাশে কয়েকটা বক উড়ে চলেছে। মুক্ত তারা —হঠাৎ একটা বাজ পাখী ওদের উপর ঝাপিয়ে পড়ে।

একটা বকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে— নীলশ্রী দেখে একটা পালক ঝরে পড়ছে আকাশে, রোদে ঝলে তারাই করছে। হাত দিয়ে মুখের পালকটাকে কুড়োতে যাবে। একটা শেকল পরা পা এসে তার পালক ভরা হাতটাকে মাটিতে চেপে ধরে হাসির নীল, দেখে একজন কয়েদি লিটার। নীলু ওকে মারতে যায়, লিটার দেখছে ওকে। সেও যেন এবার নীলকেও আঘাতই করবে। দুজনে ধস্তাধস্তি।

কিন্তু লিটারই হাত বাড়িয়ে দেয় — Friend ॥ - friend নীল ও তাকে উঠায় হাত বাড়িয়ে নিয়ে দেখছে ওকে। কিন্তু বলতে যাবে কিন্তু জেলারের গর্জন, কুকুরের তর্জন এগিয়ে আসছে ওরা কাজ করতে শুরু করে।

রাতে নীলু কয়েদিদের ঘরে, উপরের বাঙ্কে সেই লিটার, নীচে নীলু। নীলের ঘুম আসেনা, সে কি ভাবছে। উপরের বাঙ্ক

থেকে লিলির গলা শোনা যায় — friend. তবু ভাবছে- কী ভাবে পালাতে পারবে? হাইল নীল। লিলির কলে

—তোমার মনে প্রতিহিংসার জ্বালাটাই বড় হয়ে আছে। প্রতিশোধ নিতে চাও - তাই বেশ তবার আগেই দেখছ তা বুঝেছি তোমার ওই ঘরানাগুলোর নিচে ঢেকে রাখা দেখে.....। মনে তোমার অন্যরা জ্বালা—। কিন্তু কেন?

নীলের চোখে ভাসছে আইটিয়ের সেই কারখানার দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। নীল কারখানার নকশাকার। তাদের কোম্পানী নানা ডিজাইন তৈরী করায়। তার পাঁচ মাস কারখানার লাক-আউট চলছে। মাইনেও নেই। অন্যত্র কাজও পায়নি। আন্দোলনই চলছে কারখানার গেটে।

বাড়িতে খাবার যা আর ছোট বোন মিনি। কলেজে পড়ছে। বাবাও কঠিন রোগে শয্যাশায়ী, মিনারও কলেজের ফিস জমা দিতে পারে নি, তারও অনেক আগেই পড়া বন্ধ হয়েছে।

নীল মিনাকে ভালোবাসে খুবই, মিনাও। তাকে ছাড়া চলার ভাবনাই নাই। বাবারও রোগের ঠিক মত চিকিৎসা হয় না।

নীল মুদির দোকানে আর বাসি খায় ধারেতে কিছু পায়, কিন্তু মুদিও জানায় তারপরে টাকা পাইনি আর ধার বাকী দিতে পারবে না।

জানায় অসুখ কেন হয় না। মিনার কলেজ বন্ধ এসব ভাবনা ঘুরিয়ে না, অসহায় হয়ে বাড়ি ফেরে নীল। দেখে মা কাকে যেন বিদায় দিচ্ছে ভাবে, তারপরই সবই হয়েছে অসুস্থ হয় নীল মায়ের হাতে দুশো টাকার দুটি ছিল —তা নেই।

মা অকপট বলে —ওকে তোর বৌ-এর জন্য দেখেছি। আমার পরার দরকার নেই।

নীল বোঝে মা গভীর বিপত্তিই করেছে বলা হয়ে। সেই জন্য কেন নীলের অন্ন রোচে না, বোনোমতে উঠে পড়ে। তাকে একটা কিছু করতেই হবে।

নীল একটা কারখানার গেটে কাজের সন্ধানে। সেখানে অবস্থাও করুণ। বের হয়ে আসে পাশের দোকানে সিগারেট কিনতে গিয়ে আলাপ নিজের একসময় চেহারা দেখে যাচ্ছে যায়, সেই সুন্দর ফলটি আজ কেন আলোচনাতেই পরিণত হয়েছে।

এখানেই দেখা হয়ে যায় পুরোনো বন্ধু শেখরের সঙ্গে। শেখরের পরণে ভালো পোশাক, হাতে ব্যাগ, সেই নীলকে বলে —কেমন মনে হচ্ছে ভালো নেই দুই! নীলু তার অবস্থার কথা জানায়, শেখর বলে — চল, হাতে টনিক আছে খেয়ে দুই বলে কথা হবে। শেখরকে নিয়ে আসে একটা বস্তিতলা দুই রুমের বিল্ডিংএ। নীল অবাক হয় —এখানে থাকিস?

—হ্যাঁ।

তারা উপরে উঠছে। তিন-তলার ভাড়ার একটা সুন্দর ফ্লাট খোলা, ওটা শেখরের ফ্লাট ভেবে ঢুকতে যাবে নীল, শেখর বলে —এটা নয়, আরও উপরে।

কলতলার ছাদে উঠে আসে। ছাদের পশ্চিমে একটা ভালো ঘর। আগে শেখর নীলদের পাড়াতেই থাকতো। টাকি চলাচলে সে। তখন থেকেই চেনাজানা তারপর। তারপর অনেক দিন দেখা নাই, শেখর ওই পাড়া ছেড়ে চলে গেছে।

এখন নিজের গাড়ি করেছে। নিজেই চালায়। এখানে থাকে। ছয় মাসের বাইরে শেখরের দুই বন্ধু অপেক্ষায় আছে ভালো খবরের জন্য। শেখরকে দেখে ভালো খুশী। বলে ভালো খেয়েছো শেখর।

শেখর পকেটে হাতড়ে চাবি পায় না। দরজা খুলবে কি করে জানে না। কেন ভালো একটা তালা লাগায়নি। এ তালা ভাঙ্গায় কঠিন। নীল বলে —একটা তার হবে, আমি দেখছি।

শেখরের কোম্পানীও ভালো।

নীল বলে আমি নকশাকার এক কোম্পানির সেরা কারিগর — এসব আমার জন্যে জলভাত।

সে সবচেয়ে তালাটা খুলে ফেলে।

এবার আসল শেখরের ওর হাতের কাজ। বাবনের প্রথম থেকেই নীলকে ভালো লাগেনি - কিন্তু এবার ওর হাতের খেলা দেখে অবাক হয় আরও। অসহায় বলে - সাবাস্ দোস্ত।

তারা ঘরে বসে মদ্যপান করে, কথাবার্তাও হয়। শেখর আর অসহায়ই মাঝখানে বসে নীলের এখন চাকরির দরকার। দেখলে তো নীল কাজের ছেলে, ওটা হলেই বাকি সব অসুবিধা আসানের আশ্বাসে।

রাজন হাসতে হাসতে কথাটা বলে। তবু তার মনের অস্বস্তি যায় না। রাজন সাবধানী মানুষ। এদের কথাবার্তায় তবু মনের সন্দেহ যায় না। কিন্তু এখন অফিসে আসতে বলে এসেছে, দেখি কি করা যায়।

শেখরের খুশী।

নীলকে অনন্যায় বলে আজ সারাদিন এটায় ডুপ্লেক্সটার নীচে অপেক্ষা করবে। আজই হোমরুল অফিস এ নিয়ে আসবে।

পরদিন সকাল নটায় আবার আশা নিয়েই নীল অপেক্ষা করে ডুপ্লেক্সটার নীচে। দেখা হয় অনন্যার সঙ্গে মোটরে আসছে। অনন্যার নীলকে ইশারায় দেখায় মোটরে। নীল ও এদিকে আসে। অনন্যা ওর সঙ্গে মোটরের পরিচয় করিয়ে দেয়।

ওরা এবার টালীর এলাকার মধ্যে এক জীর্ণ বাড়ি ভাড়া নেয়েছে। অনন্যা আর শোভনগাঙ্গীর মত অনন্যা অফিসে। ওরা তিনজনে একটা ঘরে ঢুকলো।

নতুন দেখছে ঘরের মধ্যে কয়েকটা পুরোনো চেয়ার, টেবিলকে ঘিরে রাজন বসে আছে। মোটরে অনন্যার নীলকে নিয়ে ঢোকে।

নীল বলে —আপনাদের কারখানা কি এখানেই?

অনন্যার বলে নতুন আমাদের অফিস আসবে ।। হয়ে অফিসটা করা করি বেশী। আমাদের অফিস ছোট হয়ে পড়ে কিন্তু আমাদের কন্টাক্ট সব বিদেশীদের সঙ্গে।

মোটরে বলে রাজনদাই আমাদের বস। না মনে মনেজারাই বলা যেতে পারে।

নীল ওরার কাজটা -

রাজন বলে বিজির ব্যাপারেই —

মোটরে বলে — অনন্যারী - নীলার - লিখুকের ভালা -

রাজন বসে উঠে - আমাদু বার না করে অনন্যারই থেকে ফাইলটা বের করে।

একটা খাটী জরুরুত ছাপা মেরে আছে মোটরে। রাজন বলে -এটা পেলো কুইক!

নীল আমার বাঁচে থেকেই বাবা ছোট টিফিনের থেকে একটা ছোট যন্ত্র নিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে সই ভালা খুলে নিতে অনন্যার বলে

—আমার ওকায়। আপনারা ছোলেটি আজ আসে। চাকরি একটা পাও।

নীলের চাকরির পাকার খুশীই। নীলের চাকরি হয়ে যায়। মাসে দু হাজার টাকা মাইনে কাজ দেখাতে পারলে আরও বাড়বে। নাম শীঘ্রেই টাকা আরাধও পায়।

নীল এরদিন পর আবার একটা আজ পেয়েছে। বাড়ি ফেরে চাল ভাল আবার জন্য কল টিন নিয়ে। বাড়িতে সকলেই খুশী।

আজ নীল মিনাকে বলে দুই আবার কলেজে ভর্তি দিবে। অন্তত প্রাথমিক হয়েই হবে আবার উচ্চশিক্ষা হবে এবার।

জিনার আজ দেখে আবার ঠিক হয়ে গেছে আজ খুশী। বাবা বলে দেখবে নীলুর মা, নীলুই আমাদের সংসারের হাসি ফিরাবে।

পরের দিন নীল অফিসে গিয়ে দেখে অনন্যার, শোভন রয়েছে পাশাপাশি, ওরা খুব খুশী, অনন্যার বলে, পরশুদিন নীল খুব পরশের বুঝতে নাহলে ও আমার সঙ্গে সঙ্গে এক একটা ফাও হাতে আসতে পারে ভাবিনি

— দাও : নীল আবার হয়।

রাজন ফাইল খুলে বলে —ঠিক, সবদিকই এত খোলাখোলা কথা বলের সামনে যোক পড়ুক করি না।

অনন্যার বলে — নীল, মানে আমাদের একটা টেরার দেওয়া ছিল, সেই কাজটা পেয়েছি কিনা।

রাজন বলে, নীল আজই আমাদের বর্ধমানের প্রতিকে যেতে হবে, স্লুপিন তৈরী হয়ে এলো। দুদিনদিন ওখানে থাকতে হতে পারে। যন্ত্রপাতি নিয়ে তৈরী হয়ে এসো। আর এই একশ টাকা রাখো।

নীল খুশীই হয়।

শেখরই তার গাড়িতে চাকর নিয়ে যায়, বর্ধমানের প্রতিকে পাশের ঘরে অন্ধকারে গাড়ি থামিয়ে তিনবার হর্ন দিতে একটা লোক কোথা থেকে বের হয়ে আসে।

রাজন বলে — উঠে আয়।

লোকটি গাড়িতে ওঠে, শেখর গাড়ি চালিয়ে Highway ছেড়ে একটা সরু রাস্তা ধরে নিয়ে একটা পুরোনো গাড়িতে ওঠে।

একটা ঘরে মোমবাতি জ্বেলে সে একটা একটা চাবির ছাঁচ বের করে, একটা ছেনিও। রাজন বলে-মোশারফকে — ওঘরে চল, কথা আছে।

ওরা সবাই নীলের মামা ওদের লোকটার সঙ্গে কথা বলে, এখান এসে বলে,

—আজই রাতে Operation করতে হবে, মালিক থাকবে না, নীল, এই ছবি দেখে চাবি বানাও, জলদি — এবার নীল বুঝেছে এদের মতলবটা, নিশ্চই রাতে কোথাও সিন্দুক খুলে লুট করতে চাইছে, সে বলে —আমি একাজে নেই।

মামা গর্জে ওঠে — টাল ইট এখন টাকা পেতে সাধু সাজতে চাও চাঁদু, একজনে একবারের বেশিতে জায় কেরা হয় না এটে কথাটা বুঝিয়ে দে তুমি।

কলকাতা, যোগীনই বলে —টাকার দরকার নীল, মায়ের অনেক অপারেশান আছে, আমাদের বাঁচার জন্যে তাদের থেকে কিছু নিই, তারাও জানায় — আমরা চোর নই! সে - হাত ধরে নীল, একাজে অনেক আসবে। তাদু সেকথা কিপোস দিয়ে ভাবি। কাজ শুরু কর।

নীলও বুঝেছে কাজ না করলে এরা ছাড়বে না। তাই সে চাবি তৈরী করে।

এবার মামা ওষুধ নিয়ে ওইদিকের একটা ঘর ভাড়িয়ে নেয় —ওরই একটা ঘরে একটা আলমারি নীলকে খুলতে বলে — নীল আলমারির তালা খুলেছে, মামা তখনই নীলকে ঘরে তুলি বাইরে যায়।

নীলকে ঘরে বন্ধ করে ওরা আলমারি খুলেছে। অনেক আশা নিয়েই এসেছিল ওরা, অনেক টাকা পয়সার কথা, কিন্তু কিছুই নাই, সব ফাঁকা। ওরা হতাশ হয়েই ফেরে। নীল সবকথা এবার কিছুই জানে না।

পরদিন অফিসে যায়, অফিসটা খুব্বা - শিবু রয়েছে। নীলের কাছে এখন এদের কাজের সমস্যা কিছু প্রকাশ পেয়েছে। সেও বুঝেছে এদের দল থেকে বের হওয়াও মুস্কিল — তার ও টাকার দরকার।

পরের ভাড়া ঠিক হয়ে রাস্তার নীচে একটা পেট্রল পাম্পে টাকা লুট করতে হবে। ম্যানেজ ছলে ফেলে মামা ছব্বা শিবু ও সমর্থন করে অফিসের কাছে থেকে টাকা লুট করতে হবে নীল বলে — সে যদি টাকা না দেয়। মামা বলে 'না দিলে মারবে' চমকে ওঠে নীল — খুন খারাপি করবে এ আমার ওকে ফ্রেমেরেলা দিয়ে আজন করেই কাজ হবে। মামা চাইল কঠিন চাওনিতে। ছাড়াই বোঝায় নীলকে,

— না না, সেসব কিছু হবে না বলেই মনে হয়। চলবে। ফ্রেমেরেলাই দেব, নীল বলে বেরে রাজী আছি। তবে সমান হিস্যা আমাকেও চাই।

মামা হাসে ওঠে। কিন্তু নীলকে ছ দরকার। তাই রাজী হয়।

রাজীব রাত্রি, পেট্রল পাম্পের ঘরে মালিক বসে আছে। দু-তিনটি গাড়ি তেলটাইট ছেলে বেরো হলে আছে, হঠাৎ ঘরে ঢোকে মামা ধমকাল নিয়ে, মালি হকচকিয়ে যায়, আলমারির চাবি সে দেবে না।

মামা ওকে মেরেই ফেলে। চমকে ওঠে নীল চোখের সামনে মানুষটাকে মরতে দেখে। বন্ধুরাও কেউটে পড়ে যায় ভেতর থেকে কাউকে টেলিল টাল সবের - গাড়ির আলো পড়ে হকচকে যায়ে নীল ছুটে যায়, ওরা তখন টাকা নিয়ে ব্যস্ত আলমারি থেকে।

পরদিন অফিসে আসে নীল। অফিসে কেউ নেই বন্ধ। অনেক ডাকে নীল। ঘের ঘরে আসে। পথে ছব্বারা সবে দেখা। ওই-ই ওকে ডাকে সেই বাড়িতে নিয়ে যায়। মামা শিবু মন খারাপ তাদের ছব্বা খেলেছে। এবার নীল তার টাকার ভাগ চাইতে মামা হেসে উঠে ওকে মারতে আসে। নীল এবার মামাকে ধরে বেধড়কমার ফেলে। মামা ভীত। মালের অনেক ছব্বার টাকার ভাগ দেবার কথা স্বীকার করে। মামা বাস ফেলে বলে —এবার তাহলে তোমাকে আমাদেরই একজন বলে ভাবতে পারি। বিশ্বাস করতে পারি।

নীলের বাড়িতে এখন সবাই জানে নীল চাকরি করছে। মিনার জন্য নতুন শাড়ি-জামা, মায়ের শাড়ি—বাবার ওষুধ আসে। নীল মেসকে কলেজের ভাইনে নেয়।

মিনা বলে —সব টাকা তো আপনিই দিচ্ছিলেন। তোর? —তোমার জন্য চাকরি করছি তো, তবে এ চাকরিতে খুব খাটুনি, অন্য কাজের সন্ধান করছি। পেলে ছেড়েই দেব এই কাজ।

মিনা বলে —তুই ঠিক ভালো কাজ পাবি দাদা।

তবু নীলকে টাকার জন্য অফিস-এ আসতে হয়। এবার জানাজানি, ছব্বারা অন্য শিবু দুজনে মিলে খোঁজ আনে পাওয়া গাছেই একজনের বিশ্বাস প্রতীলকুমারের বাড়ো —সেখানে কেল কিছু অনেক টাকা জমা আছে।

বাচ্চন ওকথা শুনে বলল — কিন্তু ওখানে কড়া পাহারা— কুকুরও রাখা আছে।

নীলুর চোখে ওদের কথা। সে আর এক্ষুনি ডাক্তারটি, খুনের আসামি থাকতে চায় না। যেতে হয়ে আবে আসতে যা হয় হোক।

এদের পরিকল্পনা হয়ে যাচ্ছে। খুচন পাহারাদার একজনের স্ত্রী হাসপাতালে। রক্ত দরকার। আর কুকুরদের জন্য যে মাংস কেনা হয় সেই লোকটাকে আনছে আবেছে। সে তাদের কথামতো হাসপাতালের পিছন দিকের আসে খুনের ওষুধ মিশিয়ে রেখে সেই রাতে কুকুরগুলোকে ঘুমিয়ে থাকবে।

ডাক্তারকুমার ও বাড়িতে থাকবে না কদিন। আউটডোর বন্ধ; এর জন্য পরিবার যাবে। সব ব্যবস্থা প্রস্তুত। বাচ্চন দলবল নিয়ে সন্ধেরাত্রিদিন রাখার ওপর পাহারাটা দেখছে—দেখছে দুই পাহারাদারকে ও কুকুরগুলোকে। ওদের গাড়ি আছে দিন। তারা ব্যবস্থা করেছিল তাদের ওকে দেখতে এসেছিল।

সব প্ল্যান ছকে ফেলে। আর ঠিক হয় ওটার সবকটি কাজ করতে হবে। মোবাইলে পাওয়া জল খেয়ে ওঠে তখন নিচুর দিকে থেকে পাঁচিল টপকানো যাবে না।

প্ল্যান তৈরী। আজ রাতেই অপারেশন হবে। নীলরা বুঝেছে সেজন্যও বাচ্চন গাছের পাঁচিলকে ফোনাফোন দিয়ে অনেক কথাই বার্তালাপ করতে পারছে, কিন্তু খুনই কমছে। এমনকি খুনেখুনি কিছু হবে সে এদের মধ্যে থাকবে না।

গাড়ি কিনে আনছে নীল ডিজিটাল মানে। এ চাকরি করবে না। এমন টাকা আর দরকার নেই। কিন্তু বাড়িতে ঢুকে দেখে ভাক্তার এসেছে। কারার অবস্থা খুবই খারাপ। এখুনি নার্সিংহোমে পাঠানো হবে, না হলে বাঁচানো যাবে না।

মা বলে —আরে আ টাকা দিল দিদি যাবে। তারপর অনেক টাকা বের লাগবে। কি হবে। ভোর বাবাকে বাঁচা নীল।

নীলের মনে পড়ে বাচ্চনের কথা। ডাক্তারকুমারের ঘরে পালেরো-তিন লাখ অনেক টাকা আছে। পুলিশকে অনেক টাকার কথা বলতে পারবে না। এই টাকার কথা তাদের এক ভাগ চায় লাখ নিচেন সে পাবে। এই দেওয়ালের মত এ কাজটি করবে সে।

বাবাকে বাঁচাতে হবে। তারপর এই টাকার জন্য ব্যবস্থা করবে। নীল বলে — টাকার জন্য ভেবো না মা। বাবাকে সারিয়ে তুলবোই, প্রার্থনা না দিয়ে।

রাতের অন্ধকারে ওদের গ্রামে যত অপরাধ হয়েছে খুচনের একজন পাহারাদারকে কোন করে হাসপাতালে ডেকে আনে, সে চলে যায়। এবার তারা জল কলার মধ্যে নিচুর দিকের পাঁচিল টপকে ভিতরে ঢোকে। কুকুরগুলোকে মাংসগুলো খুনের ওষুধ মেশানো মাংসই দিয়েছে। অসুবিধা নেই।

বাচ্চন এদিকে দেউটির পাহারাদার জনটিকে বেঁধে রেখেছে। শিবু ফোনের লাইন কেটে দেয়। এরা ঘরে ঢুকছে — ঠাকুর ঘরে ঢুকে দেবীর মূর্তির পাঁচ সাজিয়ে ফের প্রণাম টানা। ঘরটা পার্টি দিয়ে পুটলি বেঁধে টাকা নিয়ে বের হয়ে আসার সময় নীল দেখে বাচ্চন ইচ্ছা করেই দারোয়ানকে সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল দিয়ে গুলি করে। সেখর গাড়ি নিয়ে বাইরে ছিল ওরা প্রচুর টাকা পেয়েই পুটলি গাড়িতে রেখে ঘরে পড়ে।

বাইপাসের হাইওয়েতে একজন পুলিশ মনে-হাইক নিয়ে আসা করেছে তাদের। ওরা পালাবার চেষ্টা করে, কিন্তু সাহেবটি বাইক নিয়ে ঘরে ফেলে তাদের। নীলদের বুক ধড়ফড়। এত টাকা সমেত ধরা পড়ে আবে তারা।

কিন্তু ট্রাফিক সাহেবটি সেখার ছেঁড়া শার্টের অংশটায় তাদের নাম্বার ছোট দেখা যাচ্ছে না। ওরা সরি বলে হাজারটা ছিঁড়েই ফেলে চলে যায়, খুশী তারা।

বাচ্চন তার প্রিয় বাইজী আসমানির বাড়িতে এসে খুশীতে মাতলিল করায়, টাকা পেয়েছে আজ অনেক। মদের কারবার নীলকে। মদের ঘোরে নীল আজ দেখছে আসমানিকে এত নীল ওড়না, তার মুখে সেই উঁচায় নাচ-গানের সুর।

কেমন কেন কেঁপে হয়ে পড়ে নীল। জল ফেলে ঘরে। পুলিশের হাতে ধরা পড়ে তাকে আনা হয়েছে ইনভেস্টিগেশনের জন্য। সেখান থেকে হাজতে পুরে দেয় পুলিশ। এবার ফাঁস ফেলে নীলের। সে বুঝেছে পুলিশ আজে ওই ডাক্তারকুমারের বাড়িতে ডাকাতি আর পাহারাদারকে খুনের জন্যই ধরেছে।

হাজতে মাতালের আড্ডা। নানা আলাপী। তাদেরই একজন মাতালের

লোক। সে নীলকে জানায় নীল জেল পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করুক কিন্তু প্রকাশ না করে।

তার বাড়িতে এই আশ্রম খবর পাওয়া মাত্রই সেখানে— কাকার চিকিৎসের টাকাও সেখে। প্রতিবাদে টাকা ফেরত তার মা পাঠায়, আর নীল যদি পুলিশের কাছে এদের খবর বলে দেয় নীল ছাড়া পাবে না, এদিকে তার বাবা-মাকে আশ্রমটি শেষ করে দেবে আর ইতিমধ্যে জানিয়েছে তার দুজনটী মেয়ে তিনির সর্বনাশ করে তাকেও শেষ করে দেবে। নীল মুখ না খুললে তার পরিবারের কোনো বিপদই হবে না। পরিস্থিতিটা বুঝবে তাদের আশ্রম আর ছাড়বে দুজনটি।

নীল ভেবেছে এই আশ্রম আর ছাড়বে দুজনেই সাধারণিক প্রকৃতির মানুষ তাই স্থির করে সে মুখ খুলবে না। অবশ্যতে বিচারের দিন স্থির হয়েছে।

এদিকে বাড়িতে খবর পায় তিনি, তারা. মাও। আশ্রমের বাবার চোখে জল সেখে— আমার ছেলে তিনা ডাকাত, খুনী। সেই পাপের ফল পেয়েছি! ভগবান হয় না?

তিনা বলে —এ সাজা নয় বাবা। এসব ষড়যন্ত্রই।

মা বলে —তাই হোক ঠাকুর।

তিনা বলে — তাই-ই। চল মা আমার নিজের বুদ্ধে সত্যি কথাটাই বলে আসবে। আমরা দাদা কখনও এসব কাজ করতে পারে না।

জেলখানাতে এসেছে নীলা মাকে নিয়ে। বাবাকে এদিকে দাঁড়িয়ে নীলা। আজ তিনা আরো যা জানতে চায় যে নীল বীরার কারণ কী ঘটা। তারা ভাবতে চায় না। নীল এ কাজ করেনি,তবে কেউ তাদের সাথে নীলকে এই ভাবে ষড়যন্ত্র করে ফাঁসিয়েছে। মা বলে — নীল, তুই এসব নিখা। তুই একাজ করিসনি।

নীলাও বলে —হেয়েকে তুমা কেউ ফাঁসিয়েছে। তুমা এসব সত্যি না মিথ্যা। তুমা-তুমা ধানা।

নীল আজ নীরব। সে কোনো কথাই প্রকাশ করতে পারে না ওদের সামনে। আদালতেও নীল সত্য কথা প্রকাশ করতে পারে না। ছাড়বা, আশ্রম এসেছে জেলখানে কিন্তু নীল চিনেছে ওদের। খুশী না করেই খুশী প্রকাশিত হয় গেল নীল।

নীল চুপ করে। আজকের কয়েদখানায় অনা আসামীরা ঘুমুচ্ছে। জেগে আছে মাত্র দুজন। নীল আর পিটার। পিটার শুনছে সব কথা নীরবে।

নীল বলে —খুন না করেই আমি খুনীর সাজা ভোগ করছি, এই দুই পাহাড়ানদের জন্য। তেবে থাকে সে পাশ পাহাড়ানদের দিকে। —এ জেল — ও জেল কখনি হয়ে এই নির্বাসনে এসেছি। বাড়ির কারও আর জানি না। এই পাহাড়ানদের জন্যই সব ছুটিয়ে গেল। যদি ফের হতে পারি ওদের ছাড়বো না।

কুকুরদের আওয়াজ. বুটের শব্দ শুনে পিটার থেকে উঠলো কয়ে. শুয়ে পড়ে আবার। জেলার দু-মিনিটে তেতরবাদে কুকুর নিয়ে ঘুরে চলে যায়। একজন পাহারাদারকে লাথির মারে — ঠিক সে শেষ বাইরে এদিকে দিয়ে ঠিক পাশে তলোয়ার। জনদের খানা লাগায় চার পাঁচ দিন।

কুকুরদের বাড়ায় আসে আবার তলোয়ার। জেলার বলে কুকুরদের আক্রমণের ডিউটি করব — খানা খাওয়া। কুকুরগুলোকে খেতে দেয় আসেন। জেলার এবার জল নিয়ে বসে।

পিটার আবার উঠে বসে, নীলও। পিটার বলে — তোমার আমার শত্রু এক। প্রতিশোধ নিতে হবে — তাই যেন হতে হবে এখান থেকে যে কোনো ভাবেই হোক। তাই হবে নীল। হাতে হাত মেলাও।

জেলার জল নিয়েছে। কুকুরগুলো ঘুমায়। আসে পাচ্ছে। পিটার নীলকে জানলা দিয়ে চোখের ইশারা। বলে — এই সময়ই যেতে হবে। জেলার নেশায় চুর। কুকুরগুলোও ঘুমায়ে কাবু। এমনি সময় অন্ধকারে পালাতে হবে। কিন্তু এই পায়ের বেড়ির তালা — হাতের তালাগুলো

নীল বলে —ওর জন্য ভেবো না পিটার। তালা আমার হাতের ছোঁয়ায় খুলে যাবে।

পিটার বলে —আগে যদি আমাদের তালাটার খুলতে পারো এবার।

সকাল হয়েছে। রান্নাঘরের সামনে কয়েদিরা চা-রুটির জন্য লাইন দিয়েছে। নীল-পিটারও রয়েছে। হঠাৎ নীল মাথা ঘুরে পড়ে যায়। কয়েদিরা চেঁচিয়ে ওঠে। নীলকে ধরাধরি করে হাসপাতালে এনে মুখে চোখে জল দিয়ে সুস্থ করে।

জেলার এসে পড়ে চীৎকার করে —

পাঞ্জা লেখা ছিপ্পটি বাড়ি দেয়া। এটাই ছিলো সাত—

নীল বলে— দেখার সহজার।

—আজ কিচেনের ডিউটি করো। কাল দেখা যাবেনি। কালকোট্টা বানাইস। চলে যায় সে। পিটার নীলের মধ্যে চোখের ইশারা হয়ে যায়।

কিচেনে নীল অলোয়াজের সঙ্গে কাজ করছে। অলোয়াজ বলে এরা আজ কী খিয়ে আসবে। গেল সাতদিনই আর বাকী দুদিন আর এই মকারঠোড়া এই নিয়েই কি সারা হয়। তাই যা হয় করি। দেখার মকারঠোড়ার বস্তা।

নীল দেখায় কাল ঠোড়োওলোকে। বলে নীল

—আইনে তো ভালোই পাস, আজ ইশটিক। হাতে তোলোয়ার। জানার সে।— আইনেতে হাত পড়ে না। তিন বছরের সব আইনের লিখা বই বাক্সেই পড়ে আছে।

নীল দেখছে বাক্সে রাখা চা-ওটা বড় বানটাকে। তাতে একটা তালা ঝুলছে। কিচেনের কাজে মন দেয় নীল।

রাতে পিটার আর নীল তাদের বাঙ্কে। শুধাই ফুসফুস। পিটার বলে —কার বন্দোবস্ত করেছো নীল যা যা বলেছিলাম? নীল বলে হ্যাঁ। বাটার পুরো আইনের টিনটা এই বাক্সে।

— আমি ব্যবস্থাও করেছি এই বাক্সে।

পিটার বলে গুড। আর মাত্র একদিন পরেই আমাদের শেষ ডিউটি।

জেলার কল নিয়ে কলকল। কুকুরওলোকে বাঁধছে তোলোয়ার। ওরা চিৎকার করছে খাবারের জন্য। তোলোয়ার খাবার দিচ্ছে তাদের। মেঘ আকাশে, বৃষ্টি আসে।

পিটার-নীলের ডিউটি হচ্ছে। অন্ধকার হলে বাঙ্ক থেকে নেমে নীল এর পায়ের তালা খোলা। হাতের সঙ্গে শিকলের টুংকারো ঝুলছে। নেমে সে পিটারের পায়ের তালা খোলে-হাতেরও। টুংকোটা হিপেই রাখা, ওটা খোলে যায়।

জেলার ঘরের দেখায় ঢুকেছে। কুকুরওলো থাকে। এই অবসরে পিটার, নীল তাদের ঘরের দরজার কাছে আসে। তালাবন্ধ ঘর। নীল বন্ধ তালা খুলে ফেলে।

পিটার বলে —আমিত্রের প্যাকেট?

সেই প্যাকেটটা নেয় এর হাতে নীল। দুজনে ঘরে ঢুকে যায়। কিচেনের পিছনে জোপঝাড়ের আড়ালে।

জেলারের চোখ যায়ে — তোলোয়ারকে ডাক পাড়ে। ঘড়িতে চারটে বাজে। বৃষ্টি নেমেছে। অন্ধকার রাত।

—এত সকালে খাবার নিলি?

—আমনি নিয়ে এলেন তাদের। ভালোদের ডিউটি পড়ব।

জেলার বলে —বুদ্ধু কাঁহিকা। এখনও লাস্ট চেক আপ হয়নি।

কাঁটাতারের বেড়া হেমাতাড়ি দিয়ে পার হয়ে এলো ওই বৃষ্টি কড়ো হাওয়ায় মাথে দৌড়চ্ছে ওরা। পিটার ঘরের পথে লম্বা গুড়ো ছিটিয়ে যেত। কুকুরওলো গুকলেই বন্ধও পাবে না। নাকে ঝালা ধরে যাবে। বড় আকাশের সাথী। জল আমার পায়ের ছাপও দেখতে পাবেনা।

ওরা দৌড়চ্ছে অন্ধকারে। দাঁড়াচ্ছে নীল। পড়ে যায়, পিছল পথে, আবার যাকে টেনে তোলে পিটার। একটু দূরেই নদী। নদী পার হয়ে গেলে কোনো ভয় নাই। হঠাৎ পাশাপাশি ঘড়ির শব্দ জানি প্রতিধ্বনি তোলে। চমকে ওঠে নীল ওরা টের পেয়েছে।

পিটার বলে —দৌড়ো।

পুলিশের সাইরেন বাজিয়ে মেড লাইট স্পট লাইট ফেলে আসছে জেলার — সাথে কুকুরওলো। এরা দৌড়চ্ছে। পিছনে জেলার। স্পটলাইটের তুরন্ত আলো জ্বলছে।

জেলার দেখে পড়ে। কুকুরওলোর আওয়াজ কাছে আসে। ছিটকে পড়েছে নীল। উঠতে পারে না। বলে তুমি পালাও পিটার। পিটার বলে আমি জানপিছ। আমার আগে পুলিশও একসঙ্গে তোমাকে ফেলে পালাবো না। বাঁচতে হয় দুজনে একসঙ্গে বাঁচবো, মরতে হয় একসঙ্গেই মরবো।

পিটার বুকে তুলে একটা ঝোপের আড়ালে আসে। হঠাৎ পিটারকে দেখে ফেলে জেলার। তাড়া করে আসে হাতে উদ্যত রিভলবার — গুলি করবো, দাঁড়াও — নয়তো।

পিটার ছুটে গিয়ে একটা গাছের আড়ালে লুকোয়। জেলার গ্রাহ্য ঠিক দেখতে পায় না। গাছের পাশ দিয়ে দৌড়ে এগিয়ে আসে হাতে রিভলবার।

শিল্প থেকে দেয় হয়ে হাতের শেকল দিয়ে জেলখানার বাথায় যা মারতে জেলার ছিটকে পড়ে — ওর হাতের রিভলবারটা পড়ে নিয়ে একটা গুলি ছোড় হয়। প্রহরী পাশে ভয়ে ভুকুরওলোও পালায়।

এবার পথ পরিষ্কার। শিটার নীলকে নিয়ে জোনোদরে নদীর ধারে নিয়ে জলে পড়ে। ভেসে যায় বুজনে নদীর স্রোতে।

সজ্ঞান হয়েছে, পাখীদের কলরবে, নদীর ধারে একটা গাছ-গাছালি ঘেরা বাড়ি- এ দেখা যায় জলে ভেজা শিটার আর নীলকে।

—কোথায় এলাম শিটার।

—পরে দেখা যাবে। ক্ষুধা পেয়ে মনে হচ্ছে। গ্রাম কাছেই আছে। কিন্তু —

হাতের শিকলের টুকরো দেখিয়ে বলে এতগুলো?

নীল পাথর দিয়ে ঘা মারতে শিটারের শিকল খুলে যায়। নীল এদের পালা বুনবাসী ভাল। এক ঘায়েই খালাস —ভালবাসে কায়া।

গ্রামে একটি তরুণী। উজাড় দৌকো বেয়ে জেলেদের গ্রাম। জাল বুনছে। বুড়োরাটি নৌকা করেছে জলে। নদীর ধারের গাছে একটা পুরোনো ট্রাকে মাছের ঝুড়ি— বস্তা ইত্যাদি। একজন মেটামত লোক বের ঘরে আসে তার থেকে।

মেয়েটা বলে — শহরের আড়ত থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে এসো বাবা।

—যাহে, পালাবি। মেয়ে হয়ে না। ভল নাকা। আর শোন কাল বৃষ্টিতে মুড়ি-চিঁড়ের প্যাকেটগুলো ওখানে যেতে পারে। রোদে দিয়ে নে—

মেয়েটা বলে —বাবা তোমাকে বলতে হবে না।

ওরা বুজনে গাড়ি নিয়ে চলে গেল।

একটা জোপের আড়াল থেকে শিটার ওই মেয়েটির দিকে উদাস চাহনিতে চেয়ে থাকে। দেখছে ওকে, নীল বলে। —কি দেখছ?

—ওই মেয়েটিকে। ও যেন ঠিক আমার একমাত্র মেয়ের মতই। ঠিক অবনি চঞ্চল।

—যেন। তোমার যেন এখন কোথায়?

—শহরে, আমার বন্ধু হরিদাস্ এই কাজই করে। সেও ওকে নিজের মেয়ের মত দেখে। কেমন আছে কে জানে।

দেখা যায় বুড়ো বন্ধুনা একটা বস্তাপেয়েছে ওপর মুড়ির ঘুটো প্যাকেট রেখে ভিতরে চলে যায়। নীল বলে মুড়ি টুড়ি হবে - খিদেও পেয়েছে।

শিটার দৌড়ে গিয়ে ঘুটিনটে প্যাকেটের একটা নিয়ে এসে কোপে ঢোকে।

—আয়।

নীল — শুধু মুড়ি।

ওদিকে বন্ধুনা ঘুটিনটে হাতে গুড় এনে রাখতে যায়ে, দেখে মুড়ির প্যাকেট নাই একটা। সন্দেহ হয়, এদিক ওদিক ছেলেও কাউকে দেখে না, বন্ধুনা কিছু কিছু করে - একটা প্যাকেট গেল কোথায়? কি ভেবে সে ভেতরে যায়।

নীল থেকে মেয়েটি নেই। বলে শিটার —মেয়েটা ওর থেকে ছিনিয়ে খেয়ে পালাবে! একটা প্যাকেট মানুষ কতক্ষণ খেতে পারে।

শিটারও দৌড়ে যায় আবার। ওদের পাশ নিয়ে আসছে —বন্ধুনা তৈরী ছিল, সে আড়ালে নজর রেখেছিল এদের শিটারকে বলা সবেও ধরে ফেলে, পরনে ছেলের পোষাক।

এবার ধরা পড়ে শিটার সব জানায় বন্ধুনাকে, বন্ধুনাও ওদের জন্য সহানুভূতি বোধ করে, বলে — দুটি করে খেতে হবে না। ভেতরে এসো। পেট ভরে খাবে।

বন্ধুনা ওদের খুজনকে খেতে দেয় মুড়ি-চিঁড়ে-জল-গুড়, খুজনে এতদিন জেলের ঘরে খাবারের খালার পর খাবার সুযোগ পেয়ে পেয়ালাগে গিলতে থাকে, বন্ধুনা দেখছে ওদের। ওর মায়ের আচলে কেন একটা ঝড় উঠেছে। হারানো অতীতের টিকগুলো ওর মনে ভীড় করে আসে। খুজনে খেয়ে যাচ্ছে। অনেকদিন ওদের ঠিকমত খাওয়া হয়নি, খাবারও এমন কিছুই না।

বন্ধুনার কথা ওর মাছের ব্যবসা খুনিবার জন্য নদীর ধারে এই জনমানবহীন জায়গাতেই বাড়ী একটা করেছে।

এখন থেকে মধুর বেশি দূরে নয়। এই নদীটাই একটু ঘুরে মধুমতে গিয়ে

দিগন্তে। সেই সময় থেকে জেলেরা নদীর বাঁক নদীতে যেতে, নানারকম মাছ, ইলিশ, ভেটকি, পমফ্রেট-এমনকি সরেস চিংড়ি মাছের ঝাঁকও নদীতে যেতে।

তুফান পার এই নদীতেই মাছ ধরার জন্য নিজের ট্রলার থেকে জেলেদের এনে এখানে রেখেছে। নৌকা-জাল এসবও আছে। ওরা জোয়ার ভাটা সবসময়ই নদীতে মাছ ধরে।

তাছাড়াও সমুদ্রের এদিক থেকেও জেলেরা বড় বড় নৌকা, ট্রলার নিয়ে মাছ ধরতে যায়, কয়েকদিন দূর সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে তারা ট্রলার, নৌকা ভর্তি মাছ আনে দুবেলার বাজারে।

বন্দুরার বাজার এই সব মাছ কেনে। রাতের মাছ আসে।

কিছু লোকজন এখানে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে মাল করে। পিটার, নীল কয়দিন এসব ইলিশ আনাজপত্র, মাছ খায়নি, নীল কিছুদিন জেলের কিশোর বয়সী ছেলেদের সঙ্গে কাজ করেছে। সে জানে এখানে এই পরিমাণ জেলার সমুদ্রের ইচ্ছা করেই তাদের ইলিশ ভাল সংরক্ষি দেয় না। সরকার কর্মীদের জন্য খাওয়া বাবদ যে টাকার বরাদ্দ করে সেই টাকার বেশ কিছুটা তার পকেটে ঢুকে যায়।

তারপর আনাজপত্র, জাল টানা, জাল সমুদ্রের দুদিন মাছের বরাদ্দ যা থাকে তার থেকেও তখন কিছুদিনতলো সরে যায়। তেল জলদার পড়ে না তারকারীতে। তারকারী শুধু নুন আর লঙ্কাতেই। এই দিয়েই একটা অখাদ্য রান্নাই তৈরী হয়।

ঢাল-খালি জলের দুপাই বিকৃষ্ট। তারী খেতে হয়েছে তাদের বরাবর পর বছর। এতদিন পর মুক্তি পেয়েছে, তবুও তারা সরকারী-ভাবে ছুটি পায়নি। পালিয়ে এসেছে, এতক্ষণ হয়তো এতদের পালানোর খবরও রটে গেছে।

ওরা তবু নেমে না, যে কাজ করার উদ্দেশ্যে জেল থেকে পালিয়েছে সেই কাজ না হওয়া অবধি তারা ঘরে ফেরে না।

খেয়ে হয়েছে ওরা। মিলেও মেশেছিল। কাল থেকে ভাল করে খেতে পায়নি।

তারপর এই উত্তেজনার মধ্যে, কারও সারা রাত নদীর প্রবল স্রোতে এতখানি পথ সাঁতার কেটে এসেছে। ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত। তাই খাবার দুটিই কমতে দেয়নি।

কিন্তু মেয়েটি নদীটাই পরাস্ত। তাই তাদের ফেলে এসে খেতে নিয়েছে। অবশ্য পিটার প্রথমে ভেবেছিল মেয়েটা ঠিকঠাক করে লোকজনকে জানাবে, তাই সে ভেবেছিল মেয়েটি যেখানে খেলেনা খেলেবাদ করবে তাকেও শেষ করে দেবে। জেলারের হাত থেকে ছিনিয়ে পড়া রিভলবারটা পিটার তুলিয়ে নিতে ভোলেনি। দরকার হলে সেটাকেই ব্যবহার করে এই মেয়েটাকে খানিয়ে দেবে।

কিন্তু অবাক হয় পিটার। নীলও দেখছে মেয়েটাকে।

বন্দুরা বলে —খুব খিদে পেয়েছে না।

নীল জানায় —হুঁ।

—এসো, এইখানে বসো খাবার দিচ্ছি।

ওরা প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেনি মেয়েটিকে। মেয়েটি বিশ্বাস করে নিতে দুজনের জন্য দু-থালা ভাত এনে দেখে তাদের ওরা দুজনে তাদিকে তাকিয়ে কী ভাবছে। এবার তাদের থালা দেখে তাদের তাকনা ঘুচে যায়। ভাত ....সাদা ধবধবে ভাত।

জেলে পেতো তারা, সেটা লাল চালের ভাত, তাতে নক-এলাচ-লবঙ্গের নিজ জাতীয় কিছু, ওরা এবার বলতে যাবে।

মেয়েটি বলে— হাত ধোও, হাত না ধুয়েই খাবে নাকি?

ওরা হাত ধুয়ে খেতে বসেছে। পেটটা যেন আগুন জ্বলছে। খেয়েই চলেছে। ভাত শেষ। মেয়েটি আরও এনে দেখে থালায় ভাত আর নেই। আরেক কোলাপু উঠেছে। ইলিশ মাছ, নদীর ইলিশ ইলিশই।

মেয়েটি বলে —ডাল এনে দিই, ভেটকি মাছও আছে।

তারা যেন ভাত খেতেও চাই। মেয়েটি আবার ভাত আনে। দুজনে অবিশ্বাস পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে ওঠে।

এবার পিটারের নজর পড়ে ভাতের হাঁড়ির দিকে। তাতে ভাত আর নেই। দুজনেই সব ভাত শেষ করেছে।

পিটার বলে — একি। দুজনেই সব ভাত শেষ করে দিলাম। তোমার তো কিছুই রইল না।

বন্দুরা হেসে বলে—আজ তো রয়েছে। এবেলা আজ মুড়ি টুড়ি দিয়েই চালিয়ে নেব।

পিটার বলে —আমাদের পরে তো খেতে হবে। এখন থেকে পরে কি করে।

যমুনা বলে —এখান থেকে ফেরার বাস তো ছাড়ে না।

—জানে?

যমুনা বলে —এখান থেকে পাঁচ মাইল গেলে শিবপুর শহরটা বাজার। বাজারের কাছ থেকেই শহরের বাস ছাড়ে। তবে কখন কখন বাস ছাড়ে তা জানি না।

শিটার ভাবছে কথাটা। এতটা পথ হেঁটে ফেরাও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, খুবই চিন্তার ভাষা। তারপর এতক্ষণে পুলিশও খবর পেয়ে গেছে। ওই থানাতেও খবর এসে যাবে। ফোনটা নদীর ধারেই থাকা। তারা নদীতে ফেলে এসেছে এদিকটায়, নিশ্চয়ই। এদিকের পুলিশকেও খবর পাঠিয়েছে ফোনার। তাই দিনের বেলায় নতুন মানুষ দুজনকে দেখলেই পুলিশ কিছু জানতে পারবে।

যমুনা দেখছে ওদের, বলে সে —এত কি ভাবছ?

শিটার বলে—না, কিছু না। শহরে যেতে হবে, এদিকের পথঘাট চিনি না।

নীল বলে—নতুন এসেছি তো?

যমুনা বলে—অর্থাৎ দিনের বেলায় বেরোয় না।

চমকে ওঠে নীল-শিটার। তাহলে কি মেয়েটা তাদের ব্যাপারে কিছু সন্দেহ করছে? কিন্তু যমুনা বলে —কে কোথায় তা জানি না, তবু তোমাদের দেখে মনে হয়েছে খুবই বিপদে পড়েছ তোমরা, তার নাই- তোমাদের কোনও ক্ষতিই হবে না।

একটু নিশ্চিন্ত হয় শিটার এর কথায়। শিটারের মনে পড়ে তার ফোনের কথা। ঠিক তো এখনই পাস করেছে। জানা না শিটার তার কোন ফোনে আছে। কতদিন দেখেনি তাকে।

যমুনা বলে, —আজকের দিনটা ওই গুদামেই থাকবে। রাতেও কাল ভোরে মালের ট্রাক যাবে, তোমাদের আগরতলা নামিয়ে দেবে।

—কেউ জানতে পারবে না?

—না গুদামে কেউ আসে না। তালি আমার কাছেই থাকে। তোমাদের কোনও ভয় নেই। আমি তোর রাত থেকে ট্রাকে তুলে দেব।

শিটারের, নীলেরও শরীর ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে। কাল থেকে তাদের ওপর মনের টেনশন কড় কমে গেছে, একটু বিশ্রাম নিতেই হবে।

শিটারের মনে হয় মেয়েটি এখন অবধি কোনো গোলমাল করেনি। নিজে না খেয়ে তাদের খাইয়েছে। তাকে বিশ্বাস করা যেতে পারে। তাই বলে শিটার। —ঠিক আছে। এখন তুমিই আমাদের রক্ষাকর্ত্রী।

যমুনা হাসে, বলে —তোমরা এখন একটু ওয়ে বিশ্রাম করবে।

গুদামটা বেশ বড়ই। যমুনা চাবি দিয়ে বন্ধ দরজা খুলে তাদের ভিতরে নিয়ে যায়। চারিদিকে বাল বাল মাল, মস্তবড় বড় বস্তা। চৌকার কাই। ডিজেলের বড় বড় ক্যান অনেক কিছুই রয়েছে। মাঝ মাঝখানে খুব্বনের আরাম করে শোয়ার জায়গাও রয়েছে।

বেশ কয়েকটা নতুন বস্তা খুলে কাটের সাহায্যে চেয়েও অনেক বেশী আরামদায়ক বিছানা তৈরী করে ওরা দুজন ওয়ে পড়ে।

পোষার কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা ঘুমিয়ে কাদা হয়ে যায়।

ঘুমে পড়ে সেই ঘুমানো নিশ্চিন্ত ভাব। ওর বাবা খুব্বন তখন গ্রামেরই মানুষের জায়গাজমি দখল করছে। জমিজায়গাও কিছু ছিল, একটা পাকা বাড়ি। ব্যবসা করে এখন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নিজের সামান্য অবস্থা থেকে অনেক উন্নতি করে এসব করেছে। তাই ছেলেটা কিছু বেশী। এমনিতে শান্ত মানুষ। স্ত্রী মারা যাবার পর মানুষকে নিয়েই তার মায়ের স্নেহ ভালোবাসা দিয়ে মানুষ করেছে।

সেই ছেলে যমুনা আজ বড় হয়েছে। এখন সেও প্রকৃতির অকৃপণ ঐশ্বর্যে যেন ঐশ্বর্যবতী হয়ে উঠেছে।

ঘুমানোর সময় নাই। আয়-ব্যবসা নিয়েই ব্যস্ত। এখন ব্যবসা বেশ ভাল উঠেছে।

এই নদীর একটা শাখা নদীর ধারে ছিল তার ধান। সেখানে থেকেই সমুদ্রের মাছের ব্যবসাই করতো। ক্রমশঃ সেই ব্যবসা বাড়ছে। নদীর আমদানিও হচ্ছে ভালো। তাই এবার খুব্বন ভাবছে সমুদ্রের কাছাকাছি, কোথাও মাছের আড়ত করবে।

যেখানে সহজেই সমুদ্রের মাছ পাওয়া যায় সেখানেই সে ব্যবসা করবে। জায়গার সন্ধানও করছে।

তুষার তার আড়তে একটি ছেলেকে রেখেছিল। নবীন, কাজের সন্ধানেই ঘুরছিল এখানে ওখানে। তখন অসহায় ছেলেটিকে সঙ্গে করে তুষারের। রাখে আড়তের কাজে লাগাবে।

নবীন এমনিতে শান্ত, কাজী। কিন্তু কাজে ফাঁকি তার ধাতে নেই। তাই কিছুদিনের মধ্যেই নবীনকে ভালো লেগে যায় তুষারের। নবীন তার বাড়িতেও আসতো কাজের জন্য। হিসাবপত্র নিয়ে আসতো। কখন কি করতে হবে এসব জানাতেও আসতো।

তুষার তেমন লেখাপড়া শেখেনি, নবীন লেখাপড়াও জানে। মনে হয়, ভদ্রঘরের ছেলেই। সে-ই তুষারের হিসাবপত্র দেখতো। আড়তের কাজও।

তার নজর সবদিকে। তাই তুষারের আড়তে চুরিও বন্ধ হয়ে অনেকটা। এখন কেশ লাভের মুখ দেখছে তুষার। আর এসব হয়েছে ওই নবীনের জন্যই। তাই নবীনের মাইনেও বাড়িয়ে দেয়। তুষার সর্দার মহাজনের কাছে গেলে নবীনই আড়ত দেখাশোনা করে। ওর বাড়িতে যমুনার কাছে টাকাকড়িও দিয়ে আসে।

আসলটা এইভাবেই জমে ওঠে যমুনার আর নবীনের। যমুনা প্রথমে নবীনকে এড়িয়ে থাকতেই চেয়েছিল। ওর সামনে বের হতো না।

তুষার বলেছে —আরে নবীনতো ভদ্রের ছেলে, এত লজ্জা কিসের তোর। সে-ই ওকে জলখাবার এনে দে।

যমুনার দেখেছে নবীনকে। ছেলেটা একদিনে শান্ত। ক্রমশঃ নবীন ও বাড়িতে আসে যায়, যমুনার মনে একটি অনিশ্চয়তা মনে ওঠে ওকের অজান্তেই।

যমুনার মনে আজকাল খুবীন সুর জাগে। তুষার মাসে মাসে শহরে যায়, মহাজনের কাছে দু-একদিন আরও হয় ফিরতে শহর দুকোশার সময়।

মেয়েটা বাড়িতে একা থাকে। অবশ্য পাড়াতে পুতুলের কাজের মেয়ে রয়েছে। সে এখন ছোখে ঠিক মত দেখতে পায় না। বয়স হয়েছে।

নবীনও জানে তিনদিনে আড়তের হিসাব শহর নিয়ে। সেদিন বৃষ্টি নেমেছে। বৈশাখ থেকে নেমেছে অকালের ধারায় বৃষ্টি। পথঘাটে লোক নাই। সন্ধ্যা নামে। নবীনও আটকে পড়েছে।

যমুনা ভাবে —আসে। যা খাক। বৃষ্টি ছাড়লে যেন যাবে। না হলে আবোলার নিয়ে নেয়ে ভাবে সে।

নবীন আটকে পড়েছে। আকাশে মেঘের গর্জন। জোরার শহরে শব্দে একটা বাজ পড়লো। যমুনা নিরুদ্ধ মুখে বলে — ভয় করছে! তুমি যেয়ো না নবীন। আজকে থেকে নবীন। — কি বলছ যমুনা! বাড়িতে মাসীও নাই।

যমুনা বলে —একলা থেকে যাবে এই দুর্যোগের রাতে? নবীন — তুমি খেয়ে নাও।

বৃষ্টি থামার নাম নেই। বাড়ছে। নবীন খেয়েই শেষ সেই দুর্যোগের রাতে আজ যমুনা নিজেকে সামলাতে পারে না। তার ঠোঁটের কামনার আগুন ওকাশ পায়। নবীনও তার আজকে অনেক কথাই দেখেছিল যমুনাকে নিয়ে। সে কখনো একটা ছবি এঁকেছিল।

আজ এই দুর্যোগের রাতে তাদের মনের সব কথা মুখে যায়। যমুনা আজ নিজেকে তুলে ধরে নবীনের হাতে: নবীনের মত যৌবনও তাকে ফিরিয়ে দিতে পারে না।

দুজনে প্রেমে পরিতৃপ্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। প্রকৃতিরও দুর্যোগও থেমে গেছে শেষ রাতে। সব মেঘ সরে গিয়ে মুক্ত আকাশে এখন তারার আলো জাগে। প্রকৃতিও যেন এখন শান্ত, স্নিগ্ধ।

হঠাৎ দরজায় ধাক্কার শব্দ শুনে যমুনা জেগে ওঠে। জানলা দিয়ে দেখে তারার আলোয় বাবা এসেছে শহর থেকে, জলখাবার নিয়ে।

—দরজা খোল। মহাজন ঘুমোচ্ছিল নাকি!

তুষারের এখন যোলআনার আলোই। স্ত্রী মারা যাবার পর থেকে তুষার রোজ রাতে একটু করে মদ্যপান করে। তবে বেহেড মাতাল সে হয় না।

বলে —দিন তার খাটা খাটুনির পর একটু মাল খেলে শরীরটা বেশ ফিট লাগে। জানটা তো চালা থাকে। তাই একটু করে খাই।

যমুনা সেটা জানে। তবে ইদানিং তুষারের মদের মাত্রা মাঝে মাঝে বেড়ে যায়।

আজ শহর থেকে বেশ মোটাকা নিয়েই ফিরছে তুষার। সেখানে মহাজন এখন

হিসাব নিয়ে গোলমাল বাধছে। দুজনজন গোলমালও ঘুটেছে। তারপর কত দামে মাল দেব। তারা দেব পছা ছোট যায়। তুষারের মাল তাজারে দেবা। তার আছেও টাটকা। সে মালের দুরুস্তী কারবার করে না।

তাই তার দাম বেশী। মহাজন সেই দাম দেবে না তাই নিয়েই ঝগড়া—তারপর তুষার বেশ রেগাই করে ফিরেছে।

—কি হলো। দরজা খোল।

শেষ অবধি দরজা খোলে বসুনা। নবীন তখন ফিরছে। পাকাবার পথ নাই। একেবারে হাতে নাতে ধরা পড়ে গেছে তারা।

তুষার ধাপাধাটা মোটাই গায়ে মাখে না। নবীনের থলেটিকে ধরে গর্জায় —শালা হারামির বাচ্চা—খুন করে দেব তোকে।

—আরা, ওর কোনো দোষ নাই। বসুনা বলে।

কিন্তু তুষার তখন উন্মাদ এইসব কথা সে বরদাস্ত করবে না। নবীনকে ফেলে উঠোনে ফেলে, ঝাঁপায় বসুনা—ওকে মেরো না বলা।

তুষার বলে —না, খুন হবে না, নবীন এখানে কেন কোন দিন দেখলে তোকে শেষই করে দেব। আহত নবীন ফের হয়ে যায়। তারপর আর ফেরেনি সে।

তুষার এখানে এসে নতুন আড়ত খুলেছে। বসুনা আর বিয়ে না করেনি। এখনও সে নবীনের আশাই দেখে। মনে হয় সে ফেরার দিন গিনে আসবে বলে কথা।

হঠাৎ নীলকে দেখে চমকে উঠেছিল বসুনা। নীলকে দেখলে অনেকটা নবীনের মতই। হয়তো নবীন আজও প্রায় ক্লান্ত আহত হয়ে এমনি পথে পথেই ঘুরছে।

তাই নীলকে দেখে বসুনা ফিরিয়ে দিতে পারেনি। তাদের আশ্রয় দিয়েছে।

পিটারও ভাবেনি কথাটা।

—তাই তো তাহলে।

বসুনা বলে —এই ছোট্ট গ্রামের কথা শুনবে মানা।

—নানা। চমকে ওঠে পিটার। তার মনে হয় ও বসুনা নয় তবে যেন। ওর চোখে জল আসে।

—বলো।

বসুনা বলে আজ দিন-রাতটা তোমরা আমাদের এই ওখানে লুকিয়ে থাকবে। ওখানেই খালার পৌঁছে দেব। এদিকে কেউ এখন যাবে না। তারপর ভালোর খেলায় তোমাদের পাহাড়ে যাবার একটা ব্যবস্থা হবে যাবে।

ওখানে বসুনা তাদের জন্য পুরোনো পাটী, জামা, সেদ্ধি আনে ওরা পরে সেই পোশাক। ওরা ওখানেই রয়েছে। নীল বলে। —পিটার, কোনো বিপদ হবে না তো। পিটার বলে —তোমরাও যেন যাবে নীল।

চমকে ওঠে নীল। তার মনে পড়ে কিনার কথা। হাজারে কিনার কালার মুখ মনে পড়ে। মনে সে হাঁ।

—না কোনোরকম বিপদে পড়তে কেউ চাইবে না নীল। একের ভালোবাসায় কোনো স্বার্থ নেই। নয়তো ওরা আমাদের খেতে দিত।

রাত হয়েছে। নীল ঘুমিয়ে পড়েছে। হঠাৎ কিসের শব্দে হাইল টুই নিয়ে কে ঢুকছে। নীল, পিটার সতর্ক হয়ে ওঠে। না ভয়ের কিছু নাই।

বসুনা এসেছে, হাতে খাবারের পাত্রেটি নিয়ে বলে —অন্ধকারে সাবধানে যেয় হয়ে এসে ওখিকের ট্রাকে লাশ কুড়ি-বস্তার শিছনে বসে পড়ো। ট্রাকটা শহরে যাবে। সেখানেথেকে নেমে পড়বে।

ওরা কেমন হয়ে আসে। অন্ধকারে ঢাকা ট্রাকে ওঠে। ওদিকে বসুনার বাবা বের হয়ে আসে সঙ্গে।

বাসী মাংসের ঝোলে থেকে মন করছে বমকে ওঠে বসুনার বাবা। কি হচ্ছে। বেশা করে আড়ি চালাচ্ছি।

—না না! বেশা ছাড়াবার জন্য খোকাটি ভালোই চলো এবার আমি যিট।

অন্ধকারে ট্রাকটা বের হয়ে যায়। পিছনে বসুনার টর্চের আলোয় দেখা যায় পিটার, নীল হাত নাড়ছে বসুনাকে।

ট্রাক চলছে। নীল ডাকে - পিটার!

পিটারের সাড়া নেই। সে যেন কি গভীর ভাবে ভাবছে।

—পিটার!

পিটার চমকে ওঠে —কে! ও ফ্রেন্ড!

—এত কি ভাবছিলে!

নীলের কথায় পিটার বলে —কেন আসা সেই হারানো দিনগুলোর কথা ফ্রেন্ড। পাহাড়ীর ছেলে আমি, বৃদ্ধ আর

আজকাল বেঁচে আছেন, কেন মার্চে, আমি জীবনে কোন আনন্দ করিনি। ভালবাসিকে জীবনে ভোগেছি। কিন্তু আমার সেই নিশ্চিন্ত সুখের জীবনকে ঘিরিয়ে দিল একটি মেয়ে। তোমার মত মিলা মেয়ে সে আমাকে ডেকে পাঠালো আমার প্রয়োজন করে। তার সঙ্গে আমার ডিপার্টমেন্টাল কাজের হবে—সেই রোজী—রোজীটি, —রোজীটি—একটা কেন কথা মুখ ফেকে ওঠে।

সেই মুহূর্তে আসছে একটা সাজোয়ারোনে। মিউজিক ডিরেক্টর ঢুকেছে বড় রেস্তরাঁয় তখন শিটারের পোশাকও ঝকঝকে, সুপুরুষ লাগল। আসছেকে খুব সুন্দর।

মিউজিক ডিরেক্টর ওয়েটারকে বলল —শিটার একটু ডিসটার্ব করো

শিটার ওর সঙ্গে ডিসটার্ব করে। দেখা যায় সুন্দরী একটি মেয়েকে। যুবতী, পরণে দামী পোশাক। সর্বাঙ্গে পরিচালনাই পরিচয় করিয়ে দেন—রোজী। এই শিটার পোয়েন্স। আমরা একে বলি মান উইথ এ গোল্ডেন ট্রাম্পেট, কারণ ওরান ডিসটিংগিসিবল। শিটার এই দিল রোজী—সেটি উইথ গোল্ডেন অরেঞ্জ। তোমার গোল্ডেন ট্রাম্পেট আর রোজীর গোল্ডেন অরেঞ্জ মিলে সারা কানাডাকে ঝলমলে সুন্দরে তুলবে এবার।

রোজীই শিটারের হাতটা তুলে নেয় নিজের হাতে। শিটারের সারা দেহে জাগে কি বিচিত্র শিহরণ জাগে। রোজী দেখছে শিটারকে — শিটারও যেন মন্ত্রমুগ্ধ। ওদিকে অর্কেস্ট্রার তখন উদ্দাম সুর চলেছে। মুক্তদের মধ্যে সেই সুরের অনুরণন।

ওই সুর যেন কোন স্বপ্নের সঙ্গে। দেখা যায় রোজীর ঘর। সাজানো বিছানা - ওদিকে টেবিলে জমি ওয়ালফ্লাওয়ার গোছানো, আবার রোজী-শিটার গান গাইছে মুক্তদের ওই সুরে সুরে, উদ্দাম প্রেমের গান।

দুজনে বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে। রোজীই কাছে টেনে নেয় শিটারকে— হঠাৎ চোখে পড়ে জমি ওয়ালফ্লাওয়ার গোছানো উপরের ছবিটা। রোজী বলে —ম্যাডাম কেমন সাজি সাজিয়ে রেখেছে আমাদের। সে ছবিটা সরিয়ে নিয়ে মুগ্ধ শিটারকে কাছে টেনে নিয়ে আলোটা নিভিয়ে দেয়।

সন্ধ্যা। একটা বড় হোটেলঘর। গোল্ডেন ট্রিপার সাইন চলছে। দেখা যায় হাতে সোনালী ঝুলের পরা দুটো পা—রোজীকে দেখা যায়।

মঞ্চে রোজী আর শিটার। দোকক ভোকলা করে এবার গোল্ডেন ট্রাম্পেট এবং গোল্ডেন অরেঞ্জ নিয়ে শিটার গোয়েন্স রোজি ডি সিলভা আসনাদের মনোরঞ্জন করবেন। তাদের অনুষ্ঠান শুরু হয়।

রোজীর গলায় দু একখানের কথা, বাকী ঘুরি ওলো রোজী শিটারের সাক্সোফোনের কাজে পুরে দেয়। আবার কোন নির্জনে শোনালো তার কথা হয়—পায় হারানোর বেদনা।

ক্লারিন পড়ছে, শিটারকে ডুবতে দেখে চাইল। হাতে সেই সাক্সোফোনের অঙ্গ। ক্লারিন দেখছে শিটারকে।

— শিটারের পোশাক খুলেই বেড়াবি নাকি?

শিটারের চেহারা ক্লান্ত, রুক্ষ। শিটার বাজনা রেখে বলে পরশার জন্যে।

—শরীরটা জন্যেই খুরছিল। না দাদা এই রোজী ডি সিলভার বাজনদার হতে তুই জন্মাসনি। তুই আর বড় মিউজিক কম্পোজারের ছবি। আমার তাই মনে— আমিও। তুই নিজের মিউজিক নিয়ে সাধনা কর, ওসব ছেড়ে দে। টাকার দরকার নেই আমাদের।

ক্লারিন বলে – হাত মুখ ধুয়ে নে। ছবিগুলো কেন করেছিল। তুই ওর সঙ্গে দেখা করবি। ও বলছিল রোজীর দল ছেড়ে দিতে।

বাইরের সামনে শিটার। রুক্ষ চেহারা - হাতে মদের গ্লাস আজ যেন আসরের আপেক্ষায় শিটারের হাত, আসছের শিটারকে সাবধান করে। রোজী তার সাক্সোফোনের কাজের মধ্যে দামী খুঁজি পাওয়ার করে — খবরটা যেন পুলিশকে দেয় সে সাহলে তার চরম সর্বনাশ হবে।

কিন্তু আসছের শিটার গর্জে ওঠে - এসব মিথ্যা —রোজী এসব করে না। সে শিটারকে ভালোবাসে। শিটারের কোন ক্ষতিই সে কোনদিন করবে না।

— ভুল! ভুল-

— না। গর্জে ওঠে আসছের শিটার। মদের গ্লাস ছোঁড়ে আয়নার সামনে কাচের গ্লাসটা যেন ভেঙে পড়ে।

হোটেলের ঘরে রোজী আর তার এক

বন্ধু সুরী, বুঝলে কথা হয়। মিঃ হ্যারিসনের সঙ্গে। দামী যুবতির ছেলিভারী নেবে বোর্ডীয়া আজই হ্যারিসনের হোটেলে। অনেক টাকার লেনদেন ও হয়। হ্যারিসনকে বলে — আজ রাত ন-টায় দেখা পাবে হোটেলে।

হ্যারিসন চলে যেতে বোর্ডী যেন খুশীতে মশগুল হয়ে। গায়ে হাত বুলিয়ে বুঝলে ঢুকছে।

আজ বোর্ডীর সঙ্গে অভ্যর্থনা করে ওকে ঘরে বলে —

—তোমার জন্য ছেড়ি ওর লিটল আছে লিটার।

বলে হলিউডের ডিরেক্টর মি হ্যারিসন এসেছেন —হোটেল-এ উঠেছেন। তোমার যাজনা শুনতে চান আজ রাত নটায় তোমার সাজগোজসহ নিয়ে যাবে।

লিটার যেন স্বপ্ন দেখছে। সে হলিউডে যাবে। অ্যাকেডেমিকায় নাচতে পারবে। আবেগ ভরে চুমুই খায় বোর্ডীকে।

বোর্ডী বলে —তোমাকে ভালোবাসি লিটার, তোমার জন্য আমি সবকিছুই করতে পারি ডার্লি ডিয়ার।

খুশী মনে লিটার আজ থেকে সেই হোটেলে। চারতলায় লিটার নিয়ে হ্যারিসনের স্যুটের দরজা খোলা দেখে ভিতরে ঢোকে। ঘর অন্ধকার। আলো জ্বালতেই লিটার দেখে সোফায় মিঃ হ্যারিসনের গুলিবিদ্ধ দেহ।

চমকে ওঠে সে। চেঁচাতে থাকে। ভয়ে ঘরে না লিটার। ফোন তোলেই ডায়াল। এদিকে পুলিশের সাইরেন।

পুলিশ এসে হোটেল ঘিরে ফেলে। লিটার ঘর থেকে বের হতে পারে, দেখে সামনে পুলিশ। ওকে ধরে ফেলে — ওর সাজগোজের দাম খুলতে হবে। লিটার তাবতেই পারে না যে ওর হিতৈষী বোর্ডীই কৌশলে সেই দামী যুবতির এখানে পাঠার ব্যবস্থা করেছিল হোটেলের ঘরে। লিটার জানে —উনি হলিউডের বড় মিউজিক ডিরেক্টর, মিঃ হ্যারিসন।

পুলিশই জানায় — না এটি খুন। উনি কৃষ্ণাঙ্গ এলাকার স্যাবলায়, মিঃ লিটার। এতদিন ধরে তুমিও এই কাজ করেছো — এবার ধরবার গোলধাঁধা খুলতে হবে মি লিটার!

বোর্ডী, সুরীও এসেছে লিটারের সঙ্গে দেখা করতে। পুলিশকে বোর্ডীই বলে — এসবের আমি কিছুই জানি না। লিটারকে জানতাম মিউজিশিয়ান হিসাবে। ও যে স্যাবলায় যায় জানতাম না। আর মিঃ হ্যারিসনের নামও শুনিনি —ওকে কেন মারতে যাবে ওই হোটেলে!

লিটার গর্জে ওঠে — বোর্ডী। এত বড় শয়তানি তুমি! তোমাকে বিশ্বাস করেছিলাম।

বোর্ডী বলে পুলিশকে —আমার যা বলার ছিল বলেছি অফিসার। এখন আপনারা কাজ আপনারা করুন।

ট্রাকটা চলেছে। আলো ফুটছে — লিটার বলে — চিনা গেছে ওই বোর্ডীর, আমাকে ফাঁসিয়েছে নীল। বলে —নেমে পড়তে হবে। ট্রাকটা স্লো হয় ব্রীজের আগায়। ওরা নেমে পড়ে। চলতে থাকে পথ ছেড়ে বনের পথে। বুঝলে চুপ করে দেখছে সকালের ঘুম ভাঙা। সবুজ পরিবেশকে। হঠাৎ একটা ট্রেন দেখা যায়। ট্রেন আসছে নীরব নির্জন পরিবেশে। লিটার বলে — ফ্রেড, শুনতে পাচ্ছ ওই ট্রেনের শব্দ। ওই শব্দের সঙ্গে মিশে আছে আমার ছেলেবেলার জড়িত-জড়িত। ওই ট্রেনে আমার মা আছেন এখনও।

নীল বলে —দেখা করবে না?

—না। মার শান্তির জীবনে অশান্তি আনতে চাই না।

নীল বলে — এর কাছে এসে না হয় খুব ঘেন্নাই তোমার দেখা দেবে আসবে লিটার। আমি এখানে অপেক্ষা করছি। তুমি ঘুরে এসো।

লিটার জঙ্গল থেকে এবার বের হয়ে পথ দিয়ে চলেছে। নীল দেখছে ওকে জঙ্গল থেকে। দেখা যায় এক ঝলক পুলিশ অফিসার ধীরে বাইকে আইরেন বাজিয়ে লিটারের দিকে আসছে। চমকে ওঠে লিটার। পালাবার পথ নাই। কাছে এসে গেছে পুলিশ। লিটার এবার ফায়ার করে পুলিশকেই।

পুলিশও প্রথমে কিছু বুঝতে পারেনি, গাড়ি থামিয়ে নেও নিজস্ব বের করে, লিটারের পুলিশে আঘাত হয়ে এবার নেও ওলি চালায়। লিটার এর বুকেই লেগেছে ওলিটা। সাবেস্টিও ঘাইও ঘুরিয়ে চলে যায় চালকের আসনে।

পকেট ঘরে পড়ে আছে লিটারের

রক্তাক্ত দেহটা, গলায় তার ক্রশটা দেয়া হয়ে পড়েছে। ছুটে যায় নীল।

—ফাদার!

নীল পাশের একটা জানা থেকে অল্প পানির জল নিয়ে তার মুখেচোখে দেয়। আঘাতের জায়গা থেকে আহত হয়েছে পিটার।

পিটার বলে —আমার সময় ফুরিয়ে আসছে ফ্রেন্ড, তুমি চলে যাও।

—না। তোমাকে ফেলে যাবো না।

নীলের কথায় পিটার মৃদুস্বরে শুধু বলে এই দুনিয়া ছেড়েই চলে যাচ্ছে ফ্রেন্ড। প্রতিশোধ নেওয়া হলো না — তোমার কাজ

নীল বলে — তোমার এতবড় অপরাধের যে করেছে তার বিচার আমি করবোই।

—পারবে! এই ক্রশটা নিয়ে পালাও হরকনস্ এর হোটেলে ফিরে ওর সঙ্গে দেখা করো।

আমার সন্দেহও দেখা হলো না এর কাছে — আর আমার যেন ফুরিয়ে এসেছে।

আর কথা বলতে পারে না, সব শেষ হয়ে যায় পিটারের। নীল দেখছে মৃত্যুর প্রশান্তিকে। গীর্জার ঘন্টা বাজছে যেন পিটারের জন্যই।

দেখা তার পুরোহিত গীর্জাকে — নীল পিটারের মৃতদেহটা নিয়ে এগিয়ে আসে, ঘন্টা বাজছে ঢং ঢং —

গীর্জার প্রাঙ্গণের নীচে বসে বৃদ্ধ যাজক বাইবেল পড়ছে। খুলা চার্চ—

নীল পিটারের দেহটা এনে বৃদ্ধ যাজকের সামনে রেখে নিজে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের এগিয়ে আসতে, ঘন্টা বাজছে ঢোকে, ঢোকে। তাদের দেখেন পিটারের মৃতদেহ।

— সরি সন্স। তার ক্রেস ইজেজ টেকেন — ভগবান তাঁর ভোগকে শান্তি দিন।

ঘন্টাটা ক্রমশঃ বাজছে। ঢং ঢং ঢং - রাতের গভীরে।

এসেছে নীল। অপেক্ষিতদের ভিড়কে ঠিক্তি একলা নিয়ে চলেছে নীল, খেয়াল তার কুক্ষ লোক তাকে অনুসরণ করছে। পুলিশের চর কি না কে জানে।

লোক খুটোর শেষ ছিনতাই-মারামারি এইসব কথাই। তারা নীলকে খাঁচাবন্দী পাখি ভেবেছে। তাই সুযোগমত ছোবলই মারার মতলবে হয়েছে।

নীল একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়ে। নির্জন গলিতে লোকগুটোও এবার ওকে ঘুরিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। নীল একটাকে লাথি মারতে সে ছিটকে পড়ে। অন্যটার গলা ধরেছে।

লোকটা উঁ উঁ করছে, অন্যটা লাথি খেয়ে উঠে পৌঁড়ে পালায়। নীল বলে — তার নিজের সেসেইটিস জানিস। আমি হরকনস্ এর লোক। লোকটা এবার চমকে উঠে —আয় আল্ কসুর মাপ কিজিয়ে সাব।

—হাকে ইনিস।

— কে বা কেন সব। তার খোঁজেই আছি।

নীল হরকনস্ এর ঠিকানা জানতো না। কিন্তু এবার সন্ধান পেয়ে হাজির সেখানে তারপর ছুটেছে।

বিশাল হোটেল ঝকঝকে পরিষ্কার।

রিসেপশনে এসে দাঁড়ায়। হরকনস্ এর নাম করতে জানায় উনি আছেন। ওর খুটে আসেন।

সারা চেহারায় ক্লান্তির ছাপ নিয়ে চলেছে নীল — নিজেই খুটি। একটা প্রহরী কম্বুক হাতে দাঁড়িয়ে আছে। নীল পিছে তাকেই ঘুষিতে নিয়ে ফেলে গেল। জীবন্ত নয় —একটা মূর্তিই।

এগিয়ে যায় নীল —হঠাৎ একটা বন্দুকধারী লোক এগিয়ে আসে। নীলকে দেখছে সে।

নীল চেঁচায় —হরকনস্!

অতর্কিতেই লোকটা নীলের মুখে একটা ঘুসি মেরে গর্জে ওঠে —নাম তার জানিস! এত বড় হিম্মত! কেটে যে।

নীল উঠে দাঁড়ায়। লোকটা নীলকে আবার আঘাত হানতে এলে নীল চকিতে সরে গিয়ে তার পেটেই একটা লাথি কষাতে ছিটকে পড়ে লোকটা, নীল দেখছে, হঠাৎ তার কাতরতা শোনে।

জ্ঞান হিরে মুখটা ঘুরে যায়। ঘুরে নিয়ে চাইল নীল, দেখে মুখোশ একজন বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যবতী লোক তার জন্যে এগিয়ে যেন, জ্ঞানে H অক্ষর চোখে পড়ে।

দেখছে তাকে নীল।

— কে তুমি। এখানে কেন এসেছ!

নীল পিটারের ক্রশটা দেয় তার

দেখায়, হরকলস্ দেখছে।

—এরো পিসিমের ক্রস। সে জোরায়।

হরকলস্ এর স্যুটের পেছনের বসে আছে নীল, সামনে হরকলস্। ঘর খুব গরীব।

হরকলস্ বলে —যবই ওনলায় নীল। এই ক্রস এখন তোমার কাছেই থাকে। পরে ওইলে ক্লারিসাকে দেবে। পিসিমকে তারা মিলোদেরে কেলে পাঠিয়েছিল, তারা তোমার সর্বনাশ করেছিল,তাদের জন্যে এক এক করে তোমাকেই নিতে হবে নীল। এ তোমার দায়িত্ব। পিসিমকে তুমিই কথা দিয়েছিলে।

নীল বলে —আমিও তাই চাই হরকলস্‌জী। কিন্তু একা, অসহায় তো নাই।

হরকলস্ বলে —যাতি এসব ব্যাপারে তোমাকে মদত দেবো। কিন্তু তোমার লড়াই তুমিই লড়বে এই চাই।

—তাই হবে। নীল বলে।

—বংশী। হরকলসের ডাকে সেই লোকটা আসে। হরকলস্ বলে

—বংশী এ নীল, পিসিমের ক্রেন্ড। ওর থাকার ব্যবস্থা করো সে — আর নীল, তুমি থাকবে না, পরে দেখা হবে।

বংশী নীলকে নিয়ে যায় তোটেলের একটা ঘরে। বলে বংশী —কিছু মনে করো না নীল, তুমি পিসিমের লোক। পিসির আমার ঘিঘড়ি লোক ছিল, এখন বেচে তুমিও আমার লোক।

দুজনে হাত মেলায়।

নীলের চোখের সামনে মা, মিলির কান্না ভরা মুখটা ভেসে ওঠে। জেলখানাতে এসেছে মা, মিলি।

—তুই বল নীল, এ আজ তুই করিস নি।

—না! না!

ধড়মড় করে উঠে পড়ে নীল। ঘর ফাঁকা — সাইডের দিকে সাইন স্কাপছে, মিলছে। সেই আলো-আঁধারিতে আবার ভয়ংকর হয়ে ওঠে। তখন মা-মোনের কাতরতা যেন নীলের কানে বাজে।

নীল এসেছে তাদের পুরোনো পাড়ায়। এখন আর চেনা যায় না পাড়াটা। বড় বড় বাড়ি উঠেছে। তাদের বাড়িটা ভেঙে এখন নতুন বাড়ি হয়ে গেছে। নীলকেও কেউ চেনে না। দু-একজন লোককে নীল শুধোয় —এখানে কিরণশঙ্কর থাকতো, তারা কোথায় জানেন?

কেউই কোনো খবর দিতে পারে না।

হতাশ নীল ফেরে রাস্তার ধারে সেই আমগাছের পাশের দোকান। বৃদ্ধ দোকানদারকেই শুধোয় — কিরণ শঙ্কর থাকতেন এখানে — একজন মাতাল দেখছে নীলকে।

বলে সে — পাখী উড়ে গেছে।

—মানে? অবাক হয় নীল।

লোকটা বলে — তুমিও কিরণবাবু এর পিছনে লাইন দিয়েছিলে? তা তোর কি। ওর মেয়েটা মেয়ে — যেমন লায়ক তেমনি ঘরও — এখন তো একেবারে লক্ষ্মী বাই — সেই মিলি বাঈ তোমনী —

নীল দোকানটায়ে ঢুকে যায়। মাতাল বলে

খুব জানা পেয়েছে। বাইজি আমিও জানা পেয়েছি। বলে যায় সে এবার। পাশের লোকটাও খুশের পায়ে ফেলে গেল। পাশের লোকজনও কেউ দেখল না বাবু। কিরণশঙ্কর মিলি ঢিকিৎসের ঢাকা গেলেন — তার স্ত্রীও। একলা মেয়েটাকে বাড়িওলা বের করে দিল। এখন শুনি সে নাকি বাঈজীটি হয়ে গেছে। পুরা পতিতার ঘরানার হয়ে গেছে।

নীল শুনছে কথাগুলো। তার মুখটা কঠিন হয়ে ওঠে।

চোখের সামনে ভেসে ওঠে ছাদহীন, আকাশের মুখ। এরই নীলাকে খুনি পাঠিয়েছে। কোনো টাকাও দেয়নি। তার মা যায় চলে গেছে মিলি ঢিকিৎসের, অসহায়ের, যেন আজ মহাযাত্রার পথে।

নীল সরে আসে। তার মনে ঝড় ওঠে। পিসাবেটের প্যাকি পকেট দিয়ে ঢলে দোকানদার। —বাবু, চেঞ্জটা নিন।

সে শুধু নীলের কানেও ঢোকে না। সে চলে যায়। দোকানদার বলে —আরজীত সে আসবী।

সন্ধ্যা। নীল চলেছে। একটি ট্রেন লাইনের দোকির মুখে দিশেহারা। একটি ট্রেন প্রচণ্ড শব্দ তুলে বেগে বের হয়ে যায়, দিশেহারা আবার শান্ত হয়ে যায়। পাশ আলোটা জ্বলছে।

নীল পার হয়ে এসেছে।

বাড়িটা পাড়া। দেখা যায় মীনা এখন বাড়িটায়। কোনো পৌরুষী এসেছে, মিনা বড় গান করছে, পেয়ার টাকা ওড়ায়।

অনুষ্ঠান শেষ হয়। পৌরুষী এবার যেতে হবে। মিনা ওকে এগিয়ে দিতে আসে, বারান্দা রেলিং এর নীচে ইট-পাথর পড়ে আছে, পৌরুষীর সঙ্গে মিনা সিঁড়ি দিয়ে নিচে রাস্তা থেকে একজনায় দেখে আসে, গাড়িতে তুলে দেয় ওকে মিনা। গাড়ি চলে যায়।

মিনা ঘুরে দেখে সামনে নীল। তীব্র ঘৃণা মিনা।

—আপনি!

নীল দেখেছে সবই। পরণে বাইজীদের পোশাক। পৌরুষীর আসর করাও দেখেছে সে।

মিনা সিঁড়ি ভেঙে সিঁড়িতে উঠছে, নীলও এগিয়ে আসে। কেন জানা কথাই আসছে থাকে নীল। তিনতলার রেলিং-এর কাছে এসেছে ওরা।

নীল আজ মিনাকে অভিযোগই করে এই নরকে আসার জন্য। মিনা জানায় তার মেসীনের অসহায় অসহায়ের কথা। নীল জানায় কি কর্তব্য করেছে! শুধু বাবার-কলমটা দিয়েছে সে পরিবারকে। মিনার কথার কিছুই ছিল না। শুধু তার বাঁচার জন্যই এই পথেই আসতে বাধ্য হয়েছিল।

—দিয়ে যেতে পারিনি!

—আমাকেই প্রয়োজনীয় পাই ছিল ভালো। কিন্তু পারিনি —

উত্তেজিত কণ্ঠে তাদের কথা হলে। দীর্ঘ রেলিং এর ধারে এসে পড়েছে মিনা — রেলিংটা শেষে নীচে সেই পাথরের উপর পড়ে মিনা।

নেমে আসে নীল। তখন আর কথার কিছুই নেই। মিনার আইডেন্টিটি ফিরিয়ে হয়। আমিও বাঁচতে চেয়েছিলাম দাদা — আমি বাঁচতে চাই - বাঁচতে চাই।

স্তব্ধ হয়ে আর মিনার বাঁচার শেষ চেষ্টাও। নীলের চোখে জল নামে।

ছাত্রত্ব-জীবনের মুখগুলো মনে পড়ে। নীলের হাতে মিনার রক্ত। নীল গর্জায় মিনা, তাদের কথা তোর এই পরিণতি হবেনের আমি হতে দেব না — তোর রক্ত হাতে সেই শপথ করেছি। ওঠে যা মোন।

এই শিটারের মোন ক্লারিসকে। আবেগের রাশী মোন নীল। একদমে কলেজে পড়ে। এই নীল, শিটারের বন্ধু।

নীল দেখছে অপরূপা সুন্দরী ক্লারিসকে।

ক্লারিসও দেখছে নীলকে।

হরকলস্ বলে —তোমরা কথা বলো। আমি অফিসে যাচ্ছি। হরকলস্ চলে যায়। এবার নীল শিটারের দেওয়া ক্রসটা তার হাতে।

—জন্মের সময় শিটার এটা তোমাকে দিতে বলেছিল।

কাঁদছে ক্লারিস। অস্ফুটস্বরে বলে

—শিটারের ভেলেনটি দেখে আমা কিছু বলেনি!

—না: উনি শুধু প্রার্থনাই করতেন।

ক্লারিস বলে তোমরি আমা। এত বড় শিল্পী এই মেয়েটার মতো মেয়ের পাল্লায় পড়ে কিনা শেষে এই ভাবে আমা গেল।

—মেয়েটা এখন কোথায়!

—পাশীদের ঘরেও ভয় করে। সে এখন নায়করা আমাদের হাসপাতালে। তার এত বড় জখমের অপরাধের কোনো শাস্তিই হল না - প্রায়শ্চিত্ত করলো শিটার। কাঁদছে সে। নীল বলে

—ক্লারিস বলে —মেয়েটার শাস্তি হয়েই। সেদিন সমস্তমে খুশী হয়ো আমি নীল। শিটারের আত্মাও শান্তি পাবে।

ক্লারিস বলে - তুমি আমার বন্ধু, আজ নিঃসঙ্গ জীবনে কেউ নেই, নীল বলে — তুমি একা নও ক্লারিস। একা নও।

ক্লারিস দেখছে নীলকে।

হরকলস্ এর অফিসে এসেছে নীল। নীল বলে —হরকলস্ আই, আমার কাজ এবার শুরু করতে চাই। ওই মেয়েটা, অপরাধ, মানস ...

হরকলস্ বলে — সেই অপরাধ হরকল, আজ এখন সুন্দরী বাঈজী হয়ে অনেক ওপরে উঠেছে নীল। ওদের সঙ্গে লড়তে হলে তোমাকে তৈরী হয়ে হবে। সেই নরক আমিই দেব তোমাকে। দেখা যায় বাঈজী - হরকলস্, নীলকে নিয়ে-আয়রাইন ব্যবসার কথা শেখাচ্ছে। ক্যামেরা - পরিচিত টেলিফোন, ঘড়ি দেয়ে ওঠা এসব শেখাচ্ছে।

নীলের হিসেবের ক্যালকির দেখে হরকলস্ও খুশী।

— তেমনি শুরু। এখন নিজের উপর নির্ভর করতে শেখো নীল। রিভলবার থেকে টার্গেটে গুলি ছোঁড়ার সময় জানবে এ জগতে তুমি একা, তোমার বল ওই অস্ত্র আর তোমার সামনে তোমার দুষমন — shoot at him – shoot !!

রিভলবারটা খুলো ছুড়ে দেয়, লুফে নিয়ে নীল ফুলস্ত আই-এ গুলি করতে থাকে একটানা পর একটা।

ক্লারিস এসেছে হরমনস্ এর কাছে তার অফিসে —কেমন আছো ভাইয়া। ডেকেছিলে ?

—যাইন, ইয়ং - এ মাসের হোটেলের ডার্টি তোমার কাপড়-কলেক্ট কি — একটা খাম এগিয়ে দে। ক্লারিস বলে —তোমার কাছে আর কত নোংরা ভাইয়া ?

হরমনস্ বলে —সবাইকে পাঞ্জাবের দাঙ্গার হাঙ্গামে এসেছিলাম ফেলে, তখন এইটুকু । তারপর ছাই পেলাম শিটায়কে - বেলও পেলাম।

ঢুকছে নীল। ক্লারিস বলে —আমি চলি ভাইয়া।

হরমনস্ বলে —বাসে ট্রামে যেও না, নীল তুমিই পৌঁছে দিয়ে এসো ক্লারিসকে।

নীল গাড়ি চালাচ্ছে। পাশে ক্লারিস। নীল দেখে ওকে। ক্লারিস দেখছে নীলকে। ক্লারিস বলে কথা বলছ না যে নীল।

নীল বলে — গাড়ি চালাবার সময় কথা বলতে নেই। এদিক ওদিকে লুকিয়ে তাকিয়ে আছে ? বলে ক্লারিস।

নীল কেন ধরা পড়ে গেছে। বলে সে — না তো, ইয়ে পথের দিকে তাকিয়ে।

—তোমার ট্রেনিং চলছে কেমনতর বেজল্ট বোঝ হুঁয়ে আছে ?

হাসে নীল। বলে সে দেখা যাক। বেশ হাসে জানতে পারবে।

ক্লারিস দেখছে নীলকে। বলে সে — এই থানে, থামো। এখানে ভেলপুরী ভালো। তারপর আমি আমরা হোটেলে যাবো।

কলার ঘাড়ে এসেছে কথা। গাড়ি থেকে নামে নীল- ক্লারিস।

ক্লারিস বলে — আজ কিন্তু আমিই তোমাকে খাওয়াবো।

সামনে ভেলপুরী নিয়ে ভোলাতে পারবে না ক্লারিস।

—তবে ? আর কি আছে এখানে ?

নীল দেখছে এদিক ওদিক। ক্লারিসের কাছে এসে দেখছে এক তরুণ বৈষ্ণব কন্যা সেইটিকে। বলে — কেন ! তুমি ! তুমি তো আছো।

—নীল-ক্লারিস খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

ওদের দুজনের খুশীর মনে জন্মিত হয়। ওই খানের মধ্যে ওরা দুজনে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

দেখা যায় খানের মধ্যে দু তিনটি মেয়েকে। ওরা দেখছে অবাক হয়ে ক্লারিস আর নীলের ব্যাপারটা। খানের শেষে ক্লারিসই দেখে ওদের। সেইই ডাকে হিন্দি, সীমা মেয়েরা আসে। নীলকে দেখতে থাকে।

ক্লারিস পরে নীলকে আমার হোস্টেলের বান্ধবী এরা। তুমি এদের সঙ্গে যেতে পারো। আমি এদের সঙ্গেই হোস্টেলে যাবো।

নীল বলে — আচ্ছা ! ওদেরকে এইভাবে বিমুগ্ধ করছি ক্লারিস।

মিলি বলে কে যে। বেশ হ্যান্ডসাম কিন্তু তা ভদ্রলোক বড়ো চলছে যে হোস্টেল প্রেম শর্ত ?

নীল চলছে, গাড়িতে উঠে বেশ হয়ে যায়। ক্লারিস বলে —সি ইউ টুমরো নীল !

মেয়েরা হাসে এ যে দেখছি বেশ এগিয়েছিস রে।

হরমনের ডিরেক্টরিয়ার সামনে অপেক্ষা করছে ক্লারিস, ঘড়ি দেখছে। বৃদ্ধটি বাথরুমে ছেলে আলাপ নিয়ে আছে। কেউ নিচ্ছি নাস্তা —

হঠাৎ একটা ঝামেলা একজন ছিটকে পড়ে। ঢাইল ক্লারিস। নীল ধরেছে ওকে - শিটি মারছিলি, এখন ঢি ঢি করছিস কেন ?

নীলকে দেখে ক্লারিস ছেলেটা ছাড়া পেয়েই পালায়।

ওরা দুজনে ঢুকেছে গাড়িতে সেই পাঞ্জাব ঘরে।

নীল ক্লারিস এখন কাছাকাছি এসেছে। ক্লারিসই ভেলপুরী আনে নাও।

—খানি ভেলপুরী।

—আর কি চাও নীল।

হঠাৎ ক্লারিসের বক্তব্য পড়ে

ডেলপুরীর আলোকে একটা মেয়ের ছবি — বিজ্ঞাপন - বাদ দোপেঞ্জা থিয়েটারে ছেলি মেয়েরা করছে। রোজীর ছবিটা দেখছে ক্লারিসা।

নীল ওঠেনি - কি ব্যাপার।

ক্লারিসা ছবিটা দেখিয়ে বলে —এই দেখ রোজী নীল। এর জন্য লন্ডনে এই ছবি ছাপানো। কথাটা মনে পড়লে মনে আমার কি কষ্ট ওঠে নীল। ওর কি নিষ্ঠুর? যে কোন পাপ করলেও না সে ক্ষমাপ্রার্থী আমাদের। আমি পাপী সমাজে মাথা উঁচু করে ঘুরছে।

নীলের চোখের সামনে পিটারের সেই দুষ্কৃতির সময়ের কথাগুলো ভাসে। নীল ক্লারিসাকে-কাছে টেনে নেয়। আজ গাড়ি ঠিক নিয়েছি করেন, রোজীর পাড়ি হবেই।

আদী ফাইকেল-পিরুল সাজ করছে। নিজের মনে গান গাইছে। ঢুকছে নীল। বাদী বলে — এসো মেয়ে। তা তোমার বিশ্বনের কথাগুলো?

নীল বলে ওকে হবে এবার বাদী, তোমার একটু সহায়তা চাই। পিটারের আলোকে বাদী এক পায়ে খাড়া। বলে সে

—পিওর! বলো কি সাহায্য?

ডিভলবার, পিরুল - ফাইকেল, বাদী হাজির! পিটার আমারও মোর ছিল।

নীল বলে সব আগাবে না, তোর একটু বুদ্ধি আর হাতের কাজ। ওটা আমাদেরই তুমি পাবে।

বাদী বলে —এতো বাদীর বাঁয় হাত কা খেল। ওই হবে নীল।

Hotel Golden Silver নিওন সাইন জ্বলছে। গাড়ির ভিড়। সুবেশ তরুণ-তরুণী ঢোকছে-বেরুচ্ছে। গেট মান সাজুট করে, দেখা যায় গাঢ়ীর মধ্যে বাদী পোশাকে নীল, বাদী চুকছে।

নাচের হল ফাঁকা। আলো জ্বলছে— তারপরে রঙীন আলোর ঝাড়ে, মোবাক ঘোষণা করে এবার রোজীর অনুষ্ঠান শুরু হবে।

আলো নিভে যায়। দেখা যায় উপরের গ্যালারীতে, সে ব্যাগ থেকে হ্যান্ড-গ্লাস বের করছে।

হলে ভিড়ের মধ্যে নীল ঘড়ি দেখে। রোজীর নাচ শুরু হয়। নাচখানা চলছে জোর লয়ে। কর্মকর্তা হাততালি দিচ্ছে, বাদীকে দেখা যায় মাথা ঝাঁকিয়ে নেচে চলে।

নীল ঘড়ি দেখছে। নাচ গান চলছে। রোজী আলোর নিশানা মত নাচছে — হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে কাচটা ভেঙে পড়ে একেবারে রোজীর উপরেই—

হলে কলরব—চীৎকার, রোজীর মেরুটি কাচের নীচে, রক্তের ধারা বইছে। সব শেষ।

নীলের কাছে বাদী — ওয়া মেয় হয়ে যায়।

ক্লারিসা এসেছে নীলের কাছে। সামনে কাগজটা, আজকের কাগজে রোজীর আকস্মিক মৃত্যুর খবর ছাপা হয়েছে।

ক্লারিসা বলে - নীল।

নীল বলে ক্লারিসা, ঘড়িটা ঠিকমত নাড়া দিয়েছি করেন।

ক্লারিসা বলে —আজ সকালে আমরা পাড়ি পাবে নীল। কিন্তু কাগজের সাথে কাচের পিক ঘড়ি কেটি কেটে ছিল।

নীল ক্লারিসাকে কাছে টেনে নেয়। — এমন ঈশ্বরেরই নিশান আই ডিয়ার। আজ ক্লারিসা নীলের বুকে মাথা রেখে শান্ত হয়েছে।

নীল বলে একজন গেল, এবার হয়তো, আপনের পালা।

ক্লারিসা বলে — কিন্তু আলো?

—সে তো আই ডিয়ার।

এয়ারপোর্টের অফিসে তখন কর্মব্যস্ততা। বহু গাড়ি পার্কিং করা হয়েছে। ওই পার্কিং জোনে উপরে-নীচের তেরোতম সেই পেখর একটা ফোটো নিয়ে গাড়ি খুঁজছে। সে গাড়ির মালিকদের কাছে পয়সা নেয়।

নীল তার গাড়ির কাছে এসে লক খুলতে পারলে বাদী স্যুটি, পেখর বলে সার গাড়ি সাফ করলাম টু ডলিয়া সার।

নীল পার্স বের করে টাকা দেয়, তারপরই তাকে দেখে তাকে-

— কার সাব!

নীল বলে —তুমি-তুমি পেখর না? আগে গাড়ি চালাতে?

পেখর দেখছে তাকে। নীল হলে গাড়িতে ওঠে।

পেখরও চিনেছে এবার — নীল না।

নীল ওকে গাড়িতে তুলে কাঁধ ধরে করে

পার্স খুলে একশো টাকা বের করে। বাস্ চেপে দুধ বন্ধ করে থাকবে, কালে আলে টাকা পাবে। এই আজ আর ভাবতে হবে না। দুধ খুলবে —

রিকশাওয়ালা বের করে বলে —দুধ টিনবিশেনের ঘর বন্ধ করে রোজে।

শেখর বলে — আ - না।

গাড়ি চলছে মহানন্দের আর দিয়ে। নীল ভাবছে

—সেই ফলপাল ছাদওয়া — আপন ছোট কোথায়? কোথায় থাকে তারা?

একবার শেখর বলে ওঠে এক নজরের বেইমান। আমাকেও ফোন দিয়ে ফোন পাঠিয়েছে। এখন ভিখ আসছি। ছাদওয়ালা এক বিরাট ওয়ালান ট্রেডিং করেন যদ। এখন তার অনেক টাকা। আজে আজে আলমনি বাবি এর ফোঁয়ে আর মেয়েকিল বানাবে। আপন এখানে নাই। এখন কলকাতার আছেন। কত বাড়িতে।

—আলমনি বাবি! কোথায় ওরে ফোন?

পার্কসার্কাসের এদিকে। ছলো দেখিয়ে দিচ্ছি।

গাড়িটা সেখানেই টার্ন করায় নীল। বলে

—চলো, সেই বাড়িটাই দেখে যাই।

নীলের ঘর, বংশীও রয়েছে। আলমনি সামনে বহুক মুসলমান ভিক্ষার ফেরিওয়াল করছে। শেওড়াফুলী আসলেন পরা বাড়ি গোছ লাগানো। বংশী বলে —বাবুদা ফোন ভাল হয়েছে। একটু আরও ভালও নামলে আলমনি বাবি এর আসরে যাবে —

আলমনি বাবি এর মুক্তরো চলছে। আলমনি আর একটি কলকাতাী মেয়েও নাচছে। ছাদওয়া আলমনির কাঁধের ওপর পাশ ফোন, টাকা মারছে।

চুকছে এবার রহমতাবাদের নতুন মেয়ে —

আজেও খুশিশ করে আলমনি। নতুন মেয়েটি বসছে এদিকে। ছাদওয়া টাকা ছোড়ে আলমনির দিকে।

শেখ আর নবাবজাদা নতুন মেয়েটিকেই নিয়ে বেশী আদর করে।

নতুন মেয়েটিকে বলে —আজ রাতে তোমারই মেহমান হবো। আলমনী বাবি তো শেঠজীরহাতের মোরা। তুমি ও যাবের মত আদরে।

মুক্তরো শেষ গান শেষ হতে ছাদওয়াকে আলমনি বলে —হয়ে চলুন শেঠজী, আজ রাতে আপনিই আমার মেহমান। ছাদওয়া বলে কিন্তু বাবি বাবু মুটোর আমাকে তোমাই হবে। অনেক কাজ আছে।

—আমি আসেন, আইয়ে। এরা ভিতরে চলে যায়।

—চলো, তোমার কামরায়।

বাড়ি। নীল ভাবে আছে। ঘড়িতে তেরটা বাজে। ছাদওয়ার গলায় শব্দ শোনা যায়।

— চলি আলমনি। কিছু ভিজেজে।

বের হতে যায়, ছাদওয়া। তোমাদের জানলা থেকে দেখে নীল ছাদওয়া শব্দ নিয়ে এদিকে আসে গাড়িনের চলেছে। একটা আলমারি চলেছে শব্দ তুলে।

নীল উঠে পড়ে। ছাদওয়া চলেছে শব্দ নিয়ে, তাদের নির্জন শব্দ।

—ছাদওয়ার ছাদোন শব্দ ওঠে, নীলও তার পাছনে শব্দ তুলেছে। একা এই তাদের ছাদে শব্দ তোলে। একটা ছাদ্য ছাদিনের ওদিকে তোল লাইন।

যেখানে আল গাড়িত ওয়েদার সেটিং করা হচ্ছে। গাড়িবান আলমারির শব্দ শোনা যায়। ছাদওয়া এই ভাবা শাড়িল দিয়ে তোল ইয়ারে ঢুকেছে, নীলও ঢুকে পড়ে উদ্বার রিকশাওয়ার হাতে ছাদওয়ার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলে —তোল শব্দ তাদের না ছাদওয়া। চুপ ছাদ তোওয়ালে ঘির দিয়ে দাঁড়াও।

—কে? কে তুমি?

এবার নীল তার পোশাকটি খুলে ফেলতে থাকে, ওদের ওটে ছাদওয়া।

—তুমি নীল।

নীল বলে —হ্যা। এত বড় বেইমান তোমরা। তোমাদের জন্য আজ আমার সব হারিয়ে গেছে। আমি খুনী আসামী সেজেছি—

—এসবের জন্য আমি নই আপনই দায়ী।

—তুমি নির্লজ্জ।

—হ্যা। বিশ্বাস করো।

—তোমাদের হাতে হাতে ফিরেছি।

অজানার হাতছানি, সেই আকর্ষণ কোথায়?

—জানি না।

বাঙ্কার ছেড়ে ওঠে নীল — বিদায় অতীত আশ্রয়। ছাদের। বলো কোথায় যাবো।

—জানি না (মাথা নাড়ছি)।

একটা বাঁ হাতের ঘুষিতে ছিটকে পড়ে ছাদের। মুখে রক্ত। ওকে টেনে তোলে — হাতে রিভলভার, নীল বলে —এর পর গুলিটাই শেষ করে দেবে। বলো কোথায় যাবো। বলো —কল কোম্পানির মধ্যে বাঁচি না বাঁচা —তোমাকে ওখানেও বাঁচতে দেবে না। মাথনকেই চাই। বলো — নাহলে —

বলছি। ছেড়ে দেবে আমাকে?

দেবো,

—ও আমে কার্শিয়াং-এ আসবে বলেছে। এখান আমাকে ছেড়ে দাও নীল। তোমার কথা কাউকে বলবো না। আমাকে ছেড়ে দাও।

তোমার এ উপকার জীবনে ভুলবো না।— হাঁ, মহা কৃতজ্ঞ ব্যক্তি তুমি।

হঠাৎ দেখা যায় দু-তিন জন সেপাই আসছে। লাল পাগড়ি শার্টিং করছে।

ওয়াশনের আড়ালে লুকোবার চেষ্টা নীল,এই ফাঁকে ছাদটা পেরিয়ে পালায়, ওয়াশনের পিছনে দেখা যায় না।

সেপাইটা চলে যায়। একটু বেরিয়ে নীল দেখে ছাদটা ফাঁকা। নীলও ছাদটা পেরিয়েছে।

ওয়াশন একটা ছুটে আসে, ফুটো ওয়াশনের মধ্যদিয়ে সরু পথ দিয়ে পালাবে ছাদটা— শিছনে নীল। কিন্তু ফুটো ওয়াশনের মধ্যে পড়ে ছাদটার সেটা চেপে যায় মুখ দিয়ে রক্ত — ঢিলে পড়ে প্রাণহীন দেহটা।

নীল দেখছে। বলে ওঠে, আসল, এবার তোমার পালা

হরকলম্ এর ফুটো দৈ ঠিক চলছে। ক্লারিসের পরীক্ষার ফল বের হয়েছে। অপারেশন নিয়ে পাশ করেছে সে। তাই আজ হরকলম্ পার্টির আয়োজন করেছে।

নীলও এসেছে। ক্লারিস জানায় হরকলম্কে এখন তাকে হোস্টেল ছেড়ে দিতে হবে। কাজকর্ম না করলে কলকাতায় থাকা যাবে না।

হরকলম্ বলে —কাজকর্ম না হয় আমার হোটেলেই করবে তুমি। তবে শুধু তাতেই নয়, এখন ঘর-সংসার করতে হবে বলিন।

হাসে ক্লারিস। আসার মত এক মেয়েকে ঘরের ঠিকানা কে দেবে বাবা।

হরকলম্ ঘরে ও মেয়ে পালের উপর ছেড়ে দে।

হরকলম্ দেখছে নীলকে। কি ভাবছে সে।

—এত কি ভাবছ ক্লারিস।

নীল আর ক্লারিস এসেছে সেই নদীর ধারে নির্জনে ক্লারিস চাইলে। বলে সে—

এবার শুরু হবে আমার আসল কাজ। নীলের জন্যই পড়াই। নীল যাবার পরে কেউ নেই — তাদের জীবনের দুঃখ কেমনটি যে ঘটে যায় —

—যা বুঝি ক্লারিস। আমিও নিঃসঙ্গ, একা। তাই একজনকে একান্তের পাশে পেতে চাই।

ক্লারিসের হাতখানা নীলের হাতে। বলে ক্লারিস —তোমার স্বপ্ন দেখি নীল। একজনকে নিয়ে ছোট্ট একটা ঘর বাঁধবো সে আমাকে ভালোবাসবে, দুজনের ভালোবাসায় সেই ঘর ভরা হয়ে উঠবে নীল।

নীল দেখছে ক্লারিসকে। বলে সে — মেলিনের স্বপ্ন আমিও দেখি ক্লারিস, তবে

—তবে?

—একটা কাজ বাকী, একজনের শেষ হিসাব চুকিয়ে তবে আমি মুক্ত হবো। সেদিন হয়তো তোমাকে পাশে পেতে পারবো। তাই অপেক্ষা করতেই হবে।

ক্লারিস দেখছে নীলকে। কি যেন ভাবছে নীল।

ক্লারিস বলে —তবে নীল, কাল হোস্টেল ছেড়ে চলে যাবো কার্শিয়াং বাড়ি। কবিন দেখা হবে না।

কথাটা শুনে চমকে ওঠে নীল। মনে পড়ে ছাদটার কথা। মাখন এখন কার্শিয়াংয়েই রয়েছে। নীল বলে —তাই বাকি। আমাকেও ওই দিকে যেতে হবে। সময় পেলে কার্শিয়াং চলে যাবো।

—সত্যি। তাহলে হোস্টেল দু-তিনি-এ এসো। ওখানে উঠবো আমরা কার্শিয়াংএ।

পাহাড়ের ঢালা। নীল চলেছে প্রাইভেট বাসে। বাসটা চলেছে। ক্লারিস

অনেকটা নামে এসে গেছে।

পাহাড়ের গায়ে লাগোয়া ওটা হোটেল।

পাহাড়ী কর্ণার ধরে নীল আর ক্লারিসা।

ওদের আসতে দেখে ওঠে। আজ নীল যেন ক্লারিসার কাছে আসতে চায়।

ক্লারিসা —কোথায় উঠেছো নীল?

নীল বলে —এখানেই দেখা হবে। তবে ঈশ্বর জানে। নীল কি ভাবছে। উঠে পড়ে সে। কেমন যেন অন্যমনস্ক সে। একটু তফাতে পাহাড়ী পথে একটা পাহাড়ী লোক ঝুড়ি নিয়ে আসছে। তাকেই শুধোয়

—আপনি থোম এর মার্ট-

— থোম আর না অর্ধেক! ওহি তো পাহাড়ীকা নীচে।

নীল আপনের মার্ট এর বাড়িটা দেখছে। এদিকে টিনের চালের ওপর মত। আপন মনে পাহাড়তলের দিকে যাচ্ছে।

নীল গাছের আড়াল থেকে একটু আগে খুলে টুকরো করা টেলিফোনিক ইন্টিকেশন দেখা করে। টেলি লোকে আপনকে দেখছে। ওর মুখটা পরিষ্কার- তারপরই একটা বিশ্বোরণের শব্দ। ছিটকে পড়ে আপন, বুকে গুলি। পাহাড়গুলো কড় কড় করে উঠে যায়।

ফুলের বেডে ছিটকে পড়েছে। চরিনিকে ফুল।

নীল যেন স্বপ্ন দেখছিল। ব্রাইফেল নামতে বলে এর সময়ে তোমাকে দুকি দেব না আপন। তুমি এলেছ ফুল -

তোমাকে এর জন্য আরও পরেই দিতে হবে। নামে আসে নীল। আপন তখনও পাহাড়াদের দলা নিচ্ছে।

হাতের বেলায় ওপাশে ঢুকেছে আপন।

একটা জায়গায় মাটি তুলে একটা গোপন বড় সিন্দুক খুলে টাকা সেটিওলো দেখছে। খুশিতে তার মুখ ঝলমলে ওঠে। হাতে করে টাকার বান্ডিল নিয়ে বুকে ধরে।

— এবার আমার। ক্রীশ্চনদের অনেকের সর্বনাশ করে এসব করেছি, সব আমার।

উপরে টিনের ছাদের ফাঁক দিয়ে দেখছে নীল ভিতরে আপনের এই টাকা ওলো। নীল সন্তর্পনে পাহাড়গুলো পা দিয়ে নীচে নামে — গুহাদের দরজা খোলা - নীল কয়েকটা পাথর নিয়ে খোপে ছোড়ে - একটা সেঁড়ি কুত্তা ছেকে ওঠে।

— কে কে! গুহাদে।

আপন রিভলবার হাতে ওপাশ থেকে বের হয়ে ছুটে যায় কোপের দিকে।

সেই ফাঁকে নীল গুহায় ঢুকে পড়ে।

কোপের এদিক ওদিক খুজছে আপন, কিছুই নেই।

হঠাৎ — আপন!

হঠাৎ পিছনে ওর নাম শুনে চাইল আপন। দেখে নীল। চমকে ওঠে আপন।

— তুমি! এখানে

— হিসেবটা চুকিয়ে নিতে এসেছি আপন।

আপন ঘুরে ওঠে —এত বড় সাহস!

রিভলবার তোলে সে, তার আগেই নীলের রিভলবার গর্জে ওঠে. আপনের রিভলবারটা ছিটকে পড়ে, হাতেও লাগলো লেগেছে আপনের। আপন এখন অন্য মানুষ। নিরস্ত্র। কাতর কণ্ঠে বলে —আমাকে মেরো না নীল। আমি কিছুই করিনি। তোমাকে অনেক টাকা দেবো। ওদিকে পা দিয়ে রিভলবারটা টানার চেষ্টা করে আপন।

একটা গুলিতে রিভলবারটা ছিটকে যায়। এগিয়ে আসছে নীল। আপন পিছিয়ে যেতে যেতে —মেরো না তোমাকে টাকা দেবো নীল, অনেক টাকা।

—তোমার টাকা তোর থাকবে।

—এঁা! এখানে -

দেখা যায় টাকার বান্ডিল পাহাড়ের খাদের ধারে রাখা — ওদিকে এগিয়ে যাচ্ছে আপন — রিভলবারের গুলিতে তালাটা খুলে যায়। উকিঝুকি মেটিওলো।

—আমার টাকা ! বাস্তুল হয়ে ওঠে আপন। নোটওলো হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে - আপন আবার জন্য পাগলের মত ছোটে আর পাহাড়ের উপর থেকে গভীর খাদে ছিটকে পড়ে।

এগিয়ে দেখে নীল —

পাহাড় - পাহাড় - উত্তাল ঝর্ণা, আজ ক্লারিসা এর গলায় সুর শোনা যায় এগিয়ে আসছে নীল, আজ সে যায় মুক্ত, স্বপ্নমুক্ত, নতুন মানুষ। ক্লারিসার গানে ধরা দেয় নিজেকে। ওদের নতুন জীবনের সুর ওঠে আকাশে বাতাসে।

গল্প

শোনভদ্রের উৎসব

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

তাঁর কৃপা তখন যে ভাবে এসে পড়ে-কেউ জানে না। তা নাহলে অমন যে ডাকসাইটে বিজ্ঞানের অধ্যাপক, অক্সফোর্ড থেকে সি এইচ ডি করে সেখানেই পড়াচ্ছেন, ভগবান-টগবান মানতেন না, পাঞ্চা সাহেব-সেই তিনি ওঙ্কারেশ্বরে এসে পরম কল্যাণময়ের কৃপা পেয়ে গেলেন। তারপর থেকে তিনি পুরোপুরি সাধু। অমলকণ্টকের পূজারী মহারাজ বলেছিলেন, জানেন ইনি কারা? যান না একবার ওঁর কাছে দেখুন —যদি কথা বলতে পারেন।

একটু চুপ করে থেকে নিজের মনে আবার বললেন, পারবেন না, ওঁর কাছে যেতেই পারবেন না। তা ছাড়া উনি কথাও বলেন না।

—কোথায় আছেন তিনি?

—এই তো কাছেই, কর্ণ মন্দিরে।

আমি গিয়েছিলাম। ধারে কাছে ঘেঁষতে পারিনি। ওঁর সঙ্গীরা যান দেখেছিল। তবে দূর থেকে দেখেছিলাম। ধ্যানস্থ। পদ্মাসনে বসে আছেন মন্দিরের মধ্যে। কারো সাহস নেই সেখানে যাবার। প্রত্যেক বছর নর্মদা পরিক্রমা করেন। বাকী সময় ওঁর অবস্থান এই কর্ণমন্দিরে।

সেদিন বিকেলে অমর কণ্টকের মন্দিরে বসেছিলাম, নর্মদাকুণ্ডে সেবায়েতদেবনন্দনজীর বসে আছেন। তিনি চেয়ে আছেন ওঁর কন্যা নর্মদার দিকে। নর্মদা মাঝির তৈরি মন্দিরের মধ্যে ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। তাতে হিমের পরশ। শাখাচ্ছের শীত যার যায় করেও যেতে চাইছে না যেন তাকে আর কিছুদিন। এর ওপর যদি একটু বৃষ্টি টৃষ্টি হয় তাহলে আর দেখতে হবে না। কাঁপিয়ে শীত পড়বে। সন্ধ্যের পরে ঠাণ্ডা থেকে ভেসে আসে বাঘের ডাক। আরও কত হিংস্র জন্তু আছে তার ইয়ত্তা নেই।

আমার চোখ-মুখে কৌতূহল দেখে ওরা ফুটে উঠেছিল, মহারাজ বললেন, ভয় কী! আমরা তো আছি। আর শোন, এটা তীর্থক্ষেত্র। শঙ্কর ও নর্মদার আবাসস্থল। এখানে ওসব বাঘ টাঘের ভয় নেই। তুমি বরং একটা কাজ করো। শোনমুড়া যা শোন নদীর উৎস সন্ধানে চলে যাও।

—কতো দূর?

— বেশি তো নয় - আট দশ মাইল। পায়ে হেঁটে যেতে হবে। বললেন, পূজারী মহারাজ।

বললাম —দু মাইল এলাম আর কী। যাব অবশ্য আমার।

হেসে ফেললেন পুরোহিত মশাই। বললেন, —তুমি তো আচ্ছা ফাজিল আছো!

—হ্যাঁ, তা আছি।

—তাহলে শোনমুড়া ঘুরে এস। অত সহজে নাম আর আসব বললে তাতটা সহজ কিন্তু নয়। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পায়ে চলার পথ। হারিয়ে যাবার ভয় নেই। পথের শেষ যে ঐ একটাই। আমি দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর বেরিয়ে পড়লাম। সূর্যদেব মাথার ওপরে। ঠাণ্ডা নেই। তবু দুপুরের এই রোদের তাপও যেন গায়ে

নেয় হিমেল হাওয়া। জঙ্গলের মধ্যে ঝিলমিলে আলোয় গাছের গায়ের রঙগুলো। গাছের ডালা থেকে ঝোপে ঝাড়ে ওষুধের গাছের আইনিবার। নাম না জানা পাখির ডাক মিশে পর্বতের সানুদেশের এই নির্জন নীরবে এক চমৎকার বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে। বড় বড় গাছের আড়ালে আড়ালে রোদের লুকোচুরি খেলা দেখে মনে হয় সূর্য যদি দেখতে থাকে তাহলে সে এখানে, সে এখানেই।

আমি একা এগিয়ে চলেছি অজানা পথে। গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। (আমার এক বন্ধু যত বছর পরপানে ঘুরে এসে বলেছেন, পরপানায় জঙ্গলের অনেকটাই সাফ হয়ে গেছে)। হাঁটছি একটু তাড়াতাড়ি। ফিরতে হবে সন্ধের আগেই। রাতের চেয়ে এখানে ভয় বেশি সাপের। জায়গা এগোচ্ছি জানি না। ঠিক পথে চলেছি কিনা তাও জানি না। পুরোহিত মশাই তবে দিয়েছেন, পথে চলা পথের রেখা ধরে এগিয়ে যাবে। এদিকে যাবে না, ওদিকেও যাবে না। ভয় তো সেই জন্যেই। অন্ধকার ঘনিয়ে এলে পথে চলা পথের রেখা যে ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে উঠবে। তখন?

হঠাৎ মনে হলো পায়ের তলায় শুকনো মাটি যেন একটু ভিজে ভিজে। পায়ের চাপে তলো পাতার যে মর্মর জাগে উঠেছিল তা তো আর নেই। এদিকে তো বেশ কিছুদিন বৃষ্টি হয়নি। তাহলে?

মনে হলো, পুরোহিত কী এখানে অতিক্রম করেনি। পথ-এদিকে চলেছে একদেঁকে। তাই ভেবেছে পথের মূলত্ব। আমি এগিয়ে চলেছি অবচেতনে পর্বতমুক্তার পূর্ব দিশায়। ধীরে ধীরে সেই পায়ে চলা পথ সংকীর্ণ হয়ে পর্যবসিত পাকদণ্ডীতে পরিণত হলো। হঠাৎ দেখি আমার পাশে পাশে চলেছে শীর্ণ জলধারা। সেই জলধারা কখনো অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে পাথরের আড়ালে আবার কখনো আবির্ভূত হচ্ছে জঙ্গলের গভীরে।

মনে পড়ল, পুরোহিত মশাই এর কথা। উনি বলেছিলেন, ঐ জলধারাকে দেখলে বুঝবে খুশি হয়ে দেবী দেখা দিয়েছে।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, ঐ শীর্ণ জলধারাই কি —

আমার কথা থামিয়ে দিয়ে উনি বলেছিলেন, ঠিকই বলেছো ঐ সলিল দেখেই কেন নদীর উৎস। আলো হো শেষ নদী বহু, নয়। তারতের পবিত্র সপ্তনদের অন্যতম এই শোন। অতি প্রাচীন। এর উল্লেখ রামায়ণ-মহাভারতেও পাবে। শোন নামের অন্য একটি নাম আছে।

— কী সেই নাম?

— হিরণ্যবাহ।

হঠাৎ চমকে উঠলাম। পায়ের তলায় জল। হাইইন্ডিং সতর্ক করে দিয়েছে আমায়। পায়ের তলায় মোজাপিচ্ছল সেই পাকদণ্ডীর সলিল ধারা। পথ ক্রমশ ঢালু হয়ে নিচের দিকে এসেছে। সেই সঙ্গে বেড়েছে স্রোতের টান। ঐ স্রোতধারায় পা দুটোকে না জানি কোথায় টেনে নিয়ে যাবে।

সেই ক্ষীণ জলধারা প্রচণ্ড বেগবতী পার্বত্য তটিনীর রূপ নিয়েছে। বলছে না কোনো কথা। পাথরের বাধা মানে না, মানে না পাথরের বাধা। তার কুলকুল শব্দ যেন ফিরতীপথের পাথরে ঝিকিমিকির নিরাবচ্ছিন্ন ধ্বনি।

স্রোতের গা ঘেঁষে অতি সাবধানে পাথরের দিকে সরে চলেছি। জানি না সামনে কী আছে। জানি শুধু আমি এগিয়ে চলেছি, শোন নদের উৎসে মুখ করে অমরকণ্টকের পূর্বে শীর্ষ মেখলার দিকে। শেষ যে শেষ হচ্ছেও হয় না। আর কতো দূর, আর কতো দেরি। মনে হলো, এইভাবে একা একা অজানায় যাওয়াটা ঠিক হয়নি। তাই বা কেন। পুরোহিত মশাই তো বলেই দিয়েছেন, ঐ জলধারার পাশে পাশে গেলেই পৌঁছে যাবো আমার লক্ষ্যস্থলে।

পাকদণ্ডীর সেই পথ অবশেষে শেষ হয়ে গেল। পৌঁছে গেলাম সোনভদ্রের প্রপাতশীর্ষে। পথের শেষ। পথ আর চলবে না। পায়ের নিচে এখানে দুর্বল প্রাচীরের মতো। তারই ভিতর থেকে শোনজল ভীমবেগে ঝাঁপিয়ে পড়েছে নিজের কায়ায় ডুবিতে। প্রপাতের দুধের মোহনা বেরিয়ে। মেঘের রেলিংএর তলা দিয়ে সেই প্রোতধারা ঠিকরে পড়ছে কোথায়, কত নিচে? কয়েক হাজার ফুট তো হবেই। ফেন এসে পড়েছে পড়ন্ত সেই জলধারার গায়ে। মনে হলো, রূপোর কিসের মালা লম্বা হতে হতে হারিয়ে গেছে গভীর কোন সমুদ্র গহ্বরের অন্ধকারে।

রেলিং ধরে নীচের দিকে দেখার চেষ্টা করলাম। দেখিনুর দেখা যায় না, শুধু কানে আসে জলধারার ভীমগর্জন। শোন যেখানে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সেখানে তার সমুদ্র অতলে। তার বড় বড় পাথরগুলি বুঝি সাদা ফুলে ঢাকা জঙ্গলের পরিত্র শোন নদকে।

থেকে পাঁচশ মাইল মানে পথের শুরু যে এখান থেকেই।

অযোধ্যাকান্দের দুই পথিক সে-নদীর মানে পথ সম্পূর্ণ ভিন্ন। পোন চলেছে উত্তর-পূর্ব দিকে, আর নর্মদা পশ্চিমে। শোনের কোলাহল মধ্যে দিয়ে পোন উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়ে রাজমহলের অতিক্রম ওপরে কৈমুর পর্বতশ্রেণীর বক্ষিন ঢিকে দিয়ে দিয়ে হয়েছে পূর্বমুখী। উত্তর প্রদেশের মির্জাপুর জেলায় পৌঁছে পোনের গতি উত্তর-পূর্ব দিকে। বিহারের রাজধানী পাটনায় আসেই সোনপুর। সেখান থেকে দশ মাইল দূরে পোন গিয়ে মিশেছে গঙ্গায়।

মহাভারতে জাহ্নবীসঙ্গম হাঁর বহুবারের পোনের কথা উল্লেখ করেছেন। গ্রীক পর্যটক মেগাস্থিনিস ও আরিয়ান তাদের মানের বিবরণীতে এই নদের উল্লেখ করেছেন। প্রাচীন পাটলিপুত্র নগরী ছিল পোন নদের তীরে। মগধের প্রাচীন রাজধানী রাজগৃহের পাশ দিয়েও প্রবাহিত ছিল এই নদ।

তাকিয়ে ছিলাম নীচের দিকে। পন্ত করে ঘরে আমি ঢেলিং। জলের ছিটায় পা টা ভিজে গেছে। বিকেল হাওয়া কী-পুনি লাগায়। নিচের সমুদ্র পহুরে নিলীন ঘরে গেছে পোন। কিন্তু অনেক নিচে দূরে মনুষ্যের ঘর-বাড়ি। কখন যে আমার পাশে আর একজন এসে দাঁড়িয়েছেন বুঝতে পারিনি। তাঁর কথায় চমকে উঠলাম, এই যে বুঝে দেখছেন — ঐ যে কেশরি গ্রাম।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম। পঁর পরনে গেরুয়া। মুখভরা সাধু। জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কোথা থেকে এলেন?

—কেন, ঐ যে আশ্রমের আলো!

— আশ্রম, এখানে!

—ঐ যে, ডান দিকে তাকান।

তাই তো! আমি খেয়ালই করিনি। সন্ধের অন্ধকারে তো আশ্রমের ঘর গাছ-পালার ঢাকা।

সাধুজী বললেন, —আসুন বেশ্ট খেয়েছে নিশ্চয়ই। একটু চলা যান।

সাধু আর কথা দিলেন থেকে। সারাদিন বসে ছিলাম আমি। উনি বললেন — শিরঙ্গীর প্রসাদ খেয়ে নিন।

সাধু বললেন, শোন বড় শক্তির নদ। প্রথমে নভনাদ থেকে শোনের সৃষ্টি।

সাধুর সঙ্গে হাঁটা মিনিট কথা মনে হলো যেন অনুত। মুহূর্তে পরিশ্রান্ত শরীর উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

সাধুজী বললেন, —আর দেরি করবেন না আমি।

কেন?

—সন্ধে হয়ে আসছে। অনেকটা পথ যাবেন। তা ছাড়া —

—তা ছাড়া কি?

—আরশটা তো তেমন ভালো না।

—মানে?

—সন্ধে হলেই জন্তুদের প্রাণীরা এখানে জল খেতে আসে।

—বাঘ আসে?

— আসেই তো। চিতা আসে, ভালুক আসে।

—তাহলে এখানে থাকেন কী করে?

—দেখছেন না, কী রকম শক্ত ঘরজা-জানলা। সব বন্ধ করে আমরা থাকি। তা ছাড়া ওরা জানে আমরা এখানে আছি। ওদের তেমনো কষ্টি কথায় — মহাভারতের আর কী।

আমি উঠে দাঁড়ালাম।

বেরিয়ে পড়ুন। অন্ধকার হলেই উৎরাই, এবার চড়াই। বড় রাস্তে। তাড়াতাড়ি যেতে পারবেন না।

আমি সাধুজীকে প্রণাম জানিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

সাধুজীর কথাই ঠিক। বেলার পথ সারাই কষ্টকর। একে চড়াই তার ওপর সারাদিন পিছল। পা ফেলতে রাজে সতর্ক হয়ে। এসে ছিলাম সহজ পথকেগে। একা আর তা নয়, পোনের জল ছুঁয়ে ওপর দিয়ে উঠছি। পোনের গর্জন আর নেই। এখন কুলকুল শব্দ। সূর্যাস্তের পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়েছেন। রং বদলে গেছে রোদের। হালকা গোলাপী রং। বাতাসের হিম গায়ের পাতলা পাওয়ার ভাব স্পর্শ বুলিয়ে দিয়ে পরিবেশকে ভরে তুলেছে শীতল।

আমার কপালে কিন্তু বিন্দু বিন্দু ঘাম। আমি চলার গতিটি কয়েক সঙ্গে তাড়াতাড়ি। পারছি না। যত জোর চালাতে চাইছি ততই যেন পিছিয়ে পড়ছি। মনের মধ্যে ভয় উঁকি মারছে ভয়। সাধুজী বলেছেন, সন্ধে হলেই জল খেতে আসবে বাঘ, ভালুকরা। চিতা যে কোন গাছে উঠে বসে আছে তা কে জানে। কথাটা মনে হতেই আমি তাড়াতাড়ি ইঁটিতে চেষ্টা করি।

সারারাত চড়াই। কষ্ট হবার কথা নয়। পায়ের তলায় যতক্ষণ মোহ পিছল পথ ছিল ততক্ষণ আমার মনের জোর এগোতে হচ্ছিল। চড়াই শেষ হতে মুখে হাসি ফুটিয়ে তোল পোনের তীর জলধারা।

দূরত্ব পঞ্চাশটুকু পার হয়ে এসেছি। এখন জঙ্গল আমার শরীরে। পশ্চিমের ঘরে ফেরার তাড়া। তাদের ঝিটিক মিটিক, বাতাস এসে দোল খাচ্ছে গাছের পাতার পাতায়। পথ ওঠে নিরালায়। অন্ধকার গুটি গুটি এগিয়ে আসছে। আমি আরও জোরে জোরে হাঁটি। জানি না কেন মাঝের ভাসে মনে চিন্তা আমার পাখা মেলছে কিনা। সন্ধ্যার মুখে অনেক দূরে জল খাবার ইচ্ছে হয় কিংবা দু হাত বাড়িয়ে ডালুক ধরি মেয়ে আসে আমার দিকে। আতঙ্কের স্রোত বয়ে যায় আমার গোটা শরীরে।

মনমার হাঁটার গতি এইটাই ৪৩ যে মনে হচ্ছে যেন ছুটছি। নজর আমার পায়ের তলা পথের রেখার ওপর। অন্ধকার আর চলার বিভিন্নে দিলে এই পথ রেখা হারিয়ে যাবে আমার চোখের সামনে থেকে। তার আগেই আমার পৌঁছতে হবে মন্দিরে।

হঠাৎ আমি আতঙ্কে কেঁপে উঠলাম। কিছু যেন ডেকে উঠল। কাছে। হ্যাঁ, আমার খুব কাছেই। কাকের ডাক আমি চিনি। কাক নয়। ছিপা কী ডাকে। সে ডাক কেমন? ডালুকও নয়। তাহলে ও ডাক কিসের?

আমি ছুটতে শুরু করি। দিনের আলো ম্লান হয়ে এসেছে। গোধূলির সিঁদুরে এই জঙ্গলে আমার কাছে ধীরে ধীরে বিভীষিকা হয়ে উঠছে। পশ্চিমের আলোটুকু এখন কম। চারদিকে অদ্ভুত একটা নীরবতা। মনের ভাষার ঘুম ভেঙেছে। এবার বোধ হয় টুঁটি ছিঁড়ে ফেলবেন। জল খাবার ইচ্ছে হলে মাঝেন শোনমুড়ায়। আমি হরি ওঁর সামনে পড়ি।

ডাকের ঠাণ্ডা স্রোত শিরদাঁড়া বেয়ে আমার শরীরের ওপর থেকে নিচের দিকে নেমে গেল। চোখের সামনে পথের যে রেখা দেখে এতক্ষণ চলছিলাম তা তো আর দেখতে পাচ্ছি না। হঠাৎ কেন শেষন থেকে জোরে জোরে পা ফেলে হেঁটে আসার শব্দ। এমন ভারী শরীর জন্তু। বাঘ নয়। বাঘ হলে নিঃশব্দে। নির্ঘাত ডালুক। আমি ছুটতে শুরু করলাম। খেয়ালও করলাম না, জঙ্গল ছাড়া হয়ে এসেছে। সামনে তৃণভূমি।

আমি পেছনে দিকে তাকাচ্ছি না। পথের রেখা কখন হারিয়ে গেছে। খালি মনে হচ্ছে, আমার পেছনে কেউ তেড়ে আসছে।

হঠাৎ থমকে দাঁড়ালাম। মনে হলো মাথার ভারটা অনেক কেটে গেছে। তাই তো, জঙ্গল নেই। মাথার ওপর নীল আকাশ। গোধূলি শেষ হয়ে এসেছে। অন্ধকার নামবে একটুই। আমার চারপাশে বড় বড় ঘাস মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এ তো সেই তৃণভূমি। আমি তাহলে এসে গেছি। কিন্তু মন্দির কোন দিকে? অন্ধকার ঘন হয়ে ওঠার আগেই আমার যে সেখানে পৌঁছতেই হবে।

কিন্তু কোন দিকে যাব? আমি অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকি। বুঝতে পারছি, এখানে এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকা মোটেই নিরাপদ নয়, তবু কিছু করতে পারছি না। কতক্ষণ এইভাবে দাঁড়িয়ে ছিলাম জানি না।

এদিকে আর বেটা, ওদিকে আর।

আমি চমকে তাকালাম। আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন একজন সাধু। বিশাল তার দেহ। পরনে আমার একটি কৌপিন। জলো জটাজুটে তাঁকে চিনতে আমার বিন্দুমাত্রও অসুবিধে হলো না। ইনিই তো অর্ধনগ্নদেহের সেই রাজকীয় সাধু। আমি এগিয়ে গেলাম তাঁর দিকে।

উনি আঙুল তুলে পথের নির্দেশ দিয়ে বললেন, ডর কী বেটা। সন্ধ্যা বাতিস হয়ে গেছে। সোজা এগিয়ে যা। সামনেই মন্দির।

এই সেখানে পথ থেকে আমি হারিয়ে গুরু করেছিলাম। একটু পরেই আমে এলো মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি। আনন্দটাকে প্রকাশ জানাতে হলে পেছন ফিরে দেখি, কেউ নেই। কোথায় গেলেন উনি। আতঙ্কের শরীর নিয়ে হাওয়ায় তো মিলিয়ে যেতে পারেন না।

আর একটু এগোতেই আমি পৌঁছে গেলাম। পুরোহিত মশাই বসেছিলেন। আমায় দেখে এগিয়ে এলেন, বললেন — এসে গেছো, আমার খুব চিন্তায় ফেলেছিলে। সন্ধে হয়ে গেলে পথ খুঁজে আসা মুশকিল। ঐ জঙ্গলে হারিয়ে যাবে কেউ।

—আমিও গিয়েছিলাম।

ভীষণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন পুরোহিত মশাই। আমি তড়াক্কণে এসে পড়েছি। হাঁফাচ্ছি। বললেন, —কী বলছ, হারিয়ে গিয়েছিলে?

—হ্যাঁ।

—তারপর? এলে কী করে?

অন্ধকারের মতো দাঁড়িয়ে তবে কাঁপছিলাম। হঠাৎ দেখি আমার সামনে কৌপিনধারী সেই সাধু। বললেন, ডর কী

এইটা, অর্থাৎ আমার প্রশ্নের উত্তরে হাত নেই। সোজা এগিয়ে যা। সামনেই মন্দির। এই বেরাবো শব্দ ধরে ধরে এলাম।

ইন্দ্রজিৎ বলে উঠল পুরোহিত লোকটার দুঃখ। সমবেদনা, —লোকটা তুমি চাঁকে দেখলে?

—হ্যাঁ।

কাজ অনেক বাকি, কাজ বিশেষজ্ঞের। দুহাত তুলে প্রণাম জানালেন পুরোহিত লোকটা। তারপর বললেন, তিনি কিন্তু আজ সকালেই অনেক পরিক্রমাতে বেরিয়ে গেছেন। উনারা শুরু করেছেন এই মন্দির থেকেই।

—সে কী! আমি তাহলে আজকে দেখলাম।

—বুঝতে পারেন না। তুমি তখন বলতে গেছিলে ওঁর সঙ্গে। তাই তখন শিলেশরা ওঁর কাল থেকে দেখা দিয়েছেন। আজ তোমার কাজের শুরু আমাদের দিয়ে শুরু করিয়ে দিন। কাজের আশীর্বাদ তোমরা আগে, তবে তা অর্জন তবে শিলেশরের।

অতি ভক্তি সহকারে পুরোহিত লোকটি-এর সঙ্গে, তার সঙ্গে আমি, তবে শিলেশরের।

বন্দী তোমরা উঠল মন্দিরে। আমরা শুরু হবে এখনই।

জটিল আবর্ত

উৎপলেন্দু মণ্ডল

বাণী আমার দিকে ফিরে রাগত স্বরে বলল — আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়, তুমি অন্য ব্যবস্থা দেখো।

— আমি কি ব্যবস্থা করব।

— যা হোক একটা ব্যবস্থা করো। একবারে সম্ভব নাকি সমস্ত কাজকর্ম ফেলে দিয়ে

বাণী স্কুলে পড়ায়। সামনেই পরীক্ষা। তারপর বাড়িতে বাড়িতে খাওয়া। আমাকে বসে বসে যোগ করে দিতে হয়। আমার বেশ পুলক লাগে, আমাদের দেখাদেখীর সংসারে নতুন অতিথি আসার জন্য। তিনি যতক্ষণ জেগে থাকেন, তার এই অস্তিত্ব মাকে প্রতিবাদে জাগ্রহিত করে রেখে। তিনি এখন ঘুমোচ্ছেন। বাণীর মর্নিং স্কুল। এখনই সেজেগুজে বেরি হবে হবে। যাওয়ার আগে আমার উপর ওকালতি গেল।

অথচ মোর-গুণ-দোষ-বিচারের আমার নয়। যার জন্য বাণীর এত দরকারি সে ওর নয়। আমাদের প্রেমের পথে অত বড় বাধা ছিলেন সেই মূর্তিমান। তিনি এখন আমার বাড়িতে। কারণ থাকার জায়গা নেই। আমার শ্বশুরালয়ে একা শ্বশুরমশাই এবং পুরোনো এক স্মৃতি। আমার আর এক শ্যালক — পশ্চিমবঙ্গের বাইরে।

হিমাদ্রি অসুস্থ মানসিকভাবে। বিবাহিত। একটি পুত্র-সন্তানের জনক। এই মুহূর্তে ছটফটানি। হিমাদ্রি ছেলের জন্য ব্যাকুল। পুরুষমানুষ ছটফটানির পর এরকম হয়ে যেতে পারে আমাকে ছিল না। অদ্ভুত লোক, মুখোশ পরিয়ে বসে

অনেকখানেক হুল ফুলের হয় না।

গত সপ্তাহে একেবারে শরীরের ভেতরকে দেখিয়েছিলাম। তিনি দেখেশুনে বলেছিলেন ব্রিঙ্কোনেমিয়া। আমি চুপ্পু ছেলে বললাম, — সে তো আমরা সবাই। ডাক্তারবাবু আমাকে বেশ গম্ভীরস্বরে বললেন — এ তা নয়, তা হলেও আমরা সাময়িক ঔষধপত্র দিই। একটা হালকা ওষুধ রাখি। এখানেই পেশেন্টের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য।

রাতে জানি মনের প্রেমজ্বর নিয়ে। অবশ্য আজকাল প্রেমজ্বর নিয়েই ডাক্তার বেশী। ঘটনাচক্রে সম্পর্কগুলো ভেঙে যাচ্ছে, কি আর করা যাবে। কিন্তু আমাদের উপর অভিশাপ যে হাল পড়ছে .... বাবা নিয়ত বলছে, আর আমাকে দিন নেই রাত নেই তার শিয়রে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে। সকালবেলা চা-টিকিন খাইয়ে বললাম ওষুধটা খেয়ে নিস। ওষুধের স্ট্রিপটা হাতে ধরে আছেন তো আছেন। এ তো আস্ত ছেলে নয় যে জোর করে খাইয়ে দেব। যেমন করে আমার ছেলেকে ওষুধ খাইয়ে দি। সেদিন আবার এক বন্ধু বলল, — জানিস এরা রিলিজ আনেকটিন সিরাপ করে। তাহলে আলখানেকের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে।

পরদিন আবার আর একজন সাইকিয়াট্রিস্টকে দেখলাম। তিনিও কিছু ওষুধপত্র লিখলেন, বললেন — সময় লাগবে। ওষুধ খেয়ে যেতে হবে। ডাক্তার তো বলেই খালাস। ওষুধ খেয়ে তার যে কি ফল। ওষুধ খেয়ে। সাইকিয়াট্রিস্ট ডাক্তারবাবু ভয় করে, এরা কত বলে থাকলেও তার ভয় লাগে। গভীর ঘুমের মধ্যে তলে যাচ্ছে, ছেলেরা দেখতে ইচ্ছে করছে। সৌমা আমার একদম কাঁদতে দেখে ভয় করছে আর দেখে হয় না। অথচ সৌমা একলম্বর ঢঙবাজার খুব নাওটা ছিল। তারও হাজার রাত জাগার কেন এরকম হল। এসব প্রশ্নের কি করে উত্তর দেব।

স্বামী-স্ত্রী ভাড়া বাড়িতে আছি। একটা ঘরে থাকি। স্কুলের কাছে বলে ভাড়া নিয়ে থাকতেন হিমাদ্রিরা। গত আষাঢ়ের শেষ। সকাল-বিকাল হাল্কা-হাল্কা আলো করে বসে থাকার ওদের ঘরের বারান্দায়। কবে থেকে হিমাদ্রি আমার সুহৃদার মতো বন্ধুত্ব তৈরী হয়েছিল, আমরা কেউ জানি না। রাতবেলায় একবার আমাদের ডাকা হয়েছিল, আমি যাইনি। স্বামী গিয়েছিল, পরে বলেছিল — স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া। ঝগড়ায় আমাদের মধ্যেও তো হয়। এর ভেতর কি আছে। বাবাই সঙ্গেই ঠিক ছিল। কি ঘটনা ঘটল যে রাত্রিটা নিয়ে সেরকম বাড়াবাড়ি।

আমি টেলিফোন করলাম, বার কয়েক চিঠি লিখলাম। জানলী এল না। শিক্ষকদের মেয়ে, শিক্ষিত হয়েও নিজের ভবিষ্যৎ, ছেলের ভবিষ্যতের জন্য এমন নড়ে যাচ্ছে। কিন্তু কারণ কিছুতেই এল না কেন। এদিকে সে নিয়মিত বলে যাচ্ছে, সোনাকে সেখতে ইচ্ছে করে। সোনার কাছে যাই। সাইকিয়াট্রিস্ট ওষুধ লিখলেন — খাচ্ছেন ঠিক মতো। খাচ্ছে ওষুধগুলো খেয়ে নিয়ে সুস্থ হোন।

পরদিন বাবা গাল ফুলে যায়। আমি আর বাবা ঠিক করলাম ঠিক আছে নিয়েই যাব। এত জ্বরে চলাচল মানা। নিয়েই গেলাম। সাত সকালে টেশনে গিয়ে বসে আছি, ওঁরা ট্রেন এলে তবে উঠব। ওঁরা ট্রেন আর আসে না। এদিকে বেলা হয়ে যাচ্ছে, স্কুলে গিয়ে বসি সইটা করতে হবে। এই সুযোগে ছেলেদের যখাইকের একটু বলা যাবে। বলা হয় না আবার ম্যানেজিং কমিটির মেম্বারয়া যদি রেজোলিউশন দেয়, তাহলে চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়বে। হিমাদ্রিকে যেতে তো থাকতে হবে! বউ না থাকলে খাওয়া-খাওয়া তো না হয়ে যাবে না। যেতে পারলে ভালো বড় বাড়ির, সেখানে অনেক কিছু ভেবে তাকে নিতে হয়েই।

চাকরি চলে গেলে এই বয়সে সে কোথায় যাবে। বয়সের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক জটিল হয়ে যায়। কিন্তু বয়স আর ঢালবি তো থেমে থাকে না। হিমাদ্রি এখন ফুলে আসছে না। স্কুলের সঙ্গে গরহাজির হয়ে যাচ্ছে। পরে কি করিস, ছাত্র এদের মধ্যে অ্যাডজাস্ট করতে পারবে! এক একটা মানুষের যে কি হয়। এখনকার ছাত্রদের ফুল মার্কসটার ওয়েটেজ অনেক আছে। বয়সের অর্ধেক দিন ছুটি। সকাল-বিকাল যখন পুজো করলে পড়ানোর অভাব হয় না।

এসব লোকের জেন যে মাথা খারাপ হয়! আসলে এখনকার সমাজটাই হয়তো এরকম। সব লোকের মাথা বিগড়ে যাচ্ছে। সমস্যার অভিশাপ যাবে কোথায়! যুক্তির দশক এখন অভিশাপের দশক হয়ে আসছে। আমাদের মাধ্যমিকপড়ুয়া এখন

বুঝতাম। কারোর ধার নিতে পারবে না। নিয়ে চায় না। না হলে নিজের বোন বাণী সে কেন এরকম করবে। আমি বুঝি নিয়ে বুঝছি, ছলনের কান্নাকাটি এসে আমাকে মোকাবিলা করতে পারছি না।

হিমাদ্রিদার উপর অনেক রাগ ছিল। আমাদের সেইসব দিনগুলিতে কত ঝড়-ঝঞ্ঝা গিয়েছিল এই হিমাদ্রিদা। বাণীকে পর্যন্ত ছেড়াই দেয়নি। বাণীর দোষ কি ছিল। কলা হিসেবে চাইতে দোষের তাল ছর। চাকরির এই আকালের বাজারে হিমাদ্রি ভাবতে পারেনি আমি চাকরি পাব এবং শেষ মুহূর্তপর্যন্ত।

বেশ মনে পড়ে হিমাদ্রিদা একবার আমার মুখের সামনে বলে দিয়েছিল — তুমি আর এসো না। কবর পাল্টাও ভাই না। কথা যদি না শোনো - তাহলে কিন্তু ভুগতে হবে। এই ভুগতে হবে — আমার মনে হল যেন পাড়ার মাস্তানদের মতো আমাকে ধমকি দিয়ে গেল। তারপর আর আমি যাইনি ওদের বাড়িতে। বাণীই আসত আমাদের বেশ কড়িতে। একদিন ঠিক কাজে চাকরি পেয়ে গেলাম। মাইনেপত্রের কলিকে কেরানি। সমস্ত দাটে ঘুরে ঘুরে। বাণী তখন আমার হলের বাড়ির ছোট্ট আয়নায়। তার কাছে গেলেই আমার প্রাণের আরাম। কোনো কোনো দিনোগে ওকে আবিষ্কার করি নতুন ভাবে। আমরা শুধু ভালোবাসায়। ভাবে সমাজকল্যাণীকৃত ঘর বাঁধব — সুইট হোম।

বাড়িতে বাণীর কথা তোলে দেখা হচ্ছে। বাবা কিংবা কুল মাস্টার। বাণীর কথা কেউ শোনে না। পাত্রের উপরকে এক কথায় জমিও নেই যে বাড়ি করব। চাকরি পাওয়ার আগে যা তোক টিউশনি করতাম। আজকাল সে সব ছেড়ে দিয়েছি। এখন শুধু স্বপ্ন দেখার সময়। তাতেই আনন্দ বেশী। কে আর মনের খুঁটে কোন আনায়।

বাণী বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষা দিচ্ছে। এ বাজারে চাকরি পাওয়া এইভাবে পরীক্ষা দিতে দিতে সময় আর বয়স দুটোই পেরিয়ে যাচ্ছে। আমের মধ্যে শুধু বি. টি. পাশ করেছে বাণী। এখন বলে, মাস্টারনী মাস্টারনী লাগে। বয়সের গাছপাথর বাণীরি স্কুলের মধ্যে একটাতে ম্যানেজ করে ঢুকে গেল। আমি মিনিমনি বসে পাঁচ মাসি।

সেদিন বসেছিলাম পার্কার পড়ে। মাথের ভাগায় চোখ কুলছে বিদ্যাসাগর সেতু। পাশদিক বলে, সেবেন্ড জানি ট্রীক। আমাদের অফিসের অনেকে ওদিক থেকে আসে। দূর থেকে ভাবি সুন্দর লাগে। প্রযুক্তি আর প্রয়োজনের সমাবস্থান। বীজনে কবি আর না কবি আমরা কিন্তু এগিয়ে আছি।

অনেকক্ষণ বসেছিলাম আমরা। গোধূলি গগনে মেঘে মেঘে সুবর্ণের খেলায়। তবু আমাদের সব কথা শেষ হয়নি। কি জানি। কিসের অন্বেষণে বসেছিলাম। সেইসব আশ্চর্য নীরব মাথায় কখন ডুবে যাচ্ছিলাম, ভাবছিলাম আর কি কখন কবে এমন সন্ধ্যা হবে ঠিক তখনই বাণী টিউন লাউটোন আলো যেমন মিয়মান থেকে অদ্ভুত এক চৈতন্যের উপরে নেয়, আমাদের ভালবাসার বীজন-মালার মত কত্র ফলল, — আর কত সন্ধ্যায় শিবপুরের দিকে একটা স্কুলে পরীক্ষা দিয়েছি, পেলে সেকেন্ড ক্লাসি ট্রীক দিয়ে তাড়াতাড়ি করতে হবে।

আমি পাত্র ছেলেদের মতো সব ছেড়ে দিলাম। স্কুল মানে ছোকেশন। টিমটাক নালিশটু লাগাতে পারলে বাণীর হয়ে যাবে। এ পর্যন্ত কোনো চাকরি আমার বার্থ হয়নি। পরের সপ্তাহে খালা জয়েনিং স্কুলের সেক্রেটারীদের ধরলাম। ছোকেশনের কথা জানালাম। আজ দিলে সব সাইজ। এমনিই শনি স্কুলের আমাদের অফিসের লিওন নারায়ণদার বাড়ি। নারায়ণদা বন্ধু ভাল। একদিন খবর এল এ সপ্তাহে হাওড়া জি.আই অফিসে পাঠাবেন পাঠাবেন। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমানুষকে ধরলাম। তিনি আমাকে চিনতে পারলেন। বললেন — এতো ওপেন সিক্রেট। ভয় নেই আমার। বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে টাকা পয়সা নিয়ে স্কুলকে দিলাম। বাণী এখন বীণাপাণি গার্লসের বড়ুন দিদিমনি, হাসপাতাল এখন আমাকে কল দেখাচ্ছে।

মা মেয়েটার অধো কৃতজ্ঞতাবোধ আছে। আমার সঙ্গে মিথ্যে কথেনি। যত পুজোর কলকাতায় আসে আমাদের বিদেশি। খুব শীঘ্রই বাড়ি করব। এই অবস্থায় মরার উপর খাড়ার ঘা। আজ সকালে বাড়িওয়ালাও তাগেদা করেছে। ভাড়াদেওয়ার খুব ভয়। পাগল লোক অনেক কিছুই করতে পারে। যদি সুইসাইড-টাইড করে তবে আইন-আদালত এর কাছেরায় ঘেরে জাতী হয়।

চলছে না বাণীর। এখানে থাকা যাবে না।

ছেলে বড় হচ্ছে। ছোটবেলা কত সর্বনেশে। ছোবলায় সারাক্ষণ পাগল করে। ছেলেটা শেষে বধে যাবে না তো? আমার এইসব ভীতি দেখছে এবং একটা স্পষ্ট ছাপ পড়ে যাচ্ছে ছেলেটির মাথায়। বাপী ছোবলকে ভালই বোঝে, শিশু-মনস্তত্ত্ব তো মৌটুসীর আয়নালিপি। ছেলেটাকে আর এলা বাড়িতে রাখা যাচ্ছে না; অথচ বাড়ির বাইরেও পাঠানো যাচ্ছে না। শুধু বলে যা তোমার মনে হয়ে যায়। কি জানি হয় পাছে কিসে কে কাকে।

ছোবল ছিমাদ্রিদের ওখানে গ্রামের স্কুলের দিকে নিয়ে যেতে শেষ-মেষ স্কুলে আর যেল না। গ্রামে গোটাই সামনে থেকে চলে এল; বাড়ি এসে সে কি হারা হারা। পুরুষবন্ধুর যে এত টানবাহ লাগে আগে বোঝেনি। অথচ এই মানুষটাকে দেখেছি, কি অসহিষ্ণু। কারো কোনো কৌতুক আমার সহ্য হয়ে না। বাপীর ছোবলা কৌতুক আমার সহ্য হয়। আমরা একসঙ্গে কলেজে পড়তাম। মেসের একঘেয়েমির থেকে মুক্তি খুঁজতে আমি ওদের আড্ডিয়ে যেতাম। কৌতুকই ডেকে নিয়ে যেত আমাকে। কৌতুক চুম্বকটি নিয়ে ছাইতে। চিঠি, টেলিগ্রাম নিয়েও কিছু করতে পারতি না।

স্বতন্ত্রমনস্কাইয়ের সাথে তো আর প্রেম হয় না। তিনি নিজেই বৃদ্ধ মানুষ। ছেলেমেয়েদের নিজস্ব সংসার হয়ে গেলে মানুষ বড় একলা হয়। আর এই একলার সময়ে এই বয়সে যদি পাগল ছেলেকে দেখাশোনা করতে হয়।

বাপীই ব্যবস্থা করল। পাশের দিন স্কুল থেকে ফিরে ওর এক-অভিভাবক-নিয়ে (মানে ছিমাদ্রিদা) সোজা কলকাতায়। আর পেয়ে আমিও সেই স্পটে। ছিমাদ্রিদার মুখোশ জলে টইটুম্বুর। নিজের নিরুপায় কান্নার আবেগ কলকাতার দিকে ধাবমান। আমাদের চলে যাওয়া দেখছে।

কি জানি কেন, নিজের অপরাধবোধ বড় প্রবল হল। কালই কন্যাবেলা ছিমাদ্রিদা বলছিল — আমি ভাল হয়ে যাব দেখো। সেদিন আর ওর মা আমার কাছে কিছু নিয়ে ভাবনে দেখে আমি চিপ হয়ে যাব।

পাগলও তো নিজেকে চিনতে পারে। পারে না শুধু বুদ্ধ লোক। এদের ছাজিয়ালয় বড় ঘুলো ঠিকানা। আমার ভয় লাগছে, আবার একদিন, ঠিক এভাবে ফেলে চলে যাবে না তো? কবী আর ওর অসিত ছোবে ছোবে না ফেলে চলে যেতে চাইছে হাসপাতালের চৌহদ্দি থেকে। আমিও। পাছে ওর আত্মাকে কষ্ট হয়ে। নিজনে ওর ছোবলেই সেদি ছিমাদ্রিদা সেভাবেই দাঁড়িয়ে। শেষ বিকেলের সূর্য ডাকছে। হসপিটালের সেবকরা গাছে ঘুড়ি লাগা। ছিন্ন ভিন্ন কাগজ হাওয়া বইছে। একটা বেলিকপ্টার ডেকে উঠল এ সময়। ডাবছিলাম এসব নিয়ে থাকবে ছিমাদ্রিদা। এই সময়ও আমি আবার ওকে ফেলে নিয়েই তো জীবন।

শূন্যতার ভাষা

প্রণব দত্ত

সান্ত্বনা জানাবার ভাষা নিজের কাছে নেই। তবুও একটা শূন্য আসন ছিল হয়তো শেষ মুহূর্তেও তার মন ভালবাসতে পারে নীলা। কিন্তু একবারও নিজেকে অবজ্ঞা করেই চলে গেল, কেবল যাওয়ার সময় বলেছিল, মাসখানেকের মধ্যে কাজ মিটিয়ে ফিরে হবে আমি আর ফিরব না। এরপরে যাওয়াটা নীলার কাছে অপ্রত্যাশিতই। কেবল সমীরই একটু বেশী আশা করেছিল। কারণ আজ সারাদিন যেমন ছটফট করছিল। বুকের ভিতরে নিরাপত্তার অভাব বোধ করছিল। তাওয়া অবাক একটা কষ্ট হচ্ছিল।

সকাল থেকেই মেঘলা হয়ে আছে আকাশটা। গুমোটে ভরপুর। হিমেল হাওয়া বইছিল থেকে থেকে। আকাশটা অফিস থেকে বলেছে, বিকাল পাঁচ ঘন্টার মধ্যে আজ শীতলাতলা দিন। এরকম সৌহার্দ্যপূর্ণ ছুটি আরও কয়েকদিন চলতে পারে।

এই বৃত্তান্তের মধ্যেও সামা ঘুম থেকে উঠবার অনেক আগেই তৈরী করে নিয়েছে নীলা। চা তৈরী করে নিয়মমতো সমীরের পাশে টেবিলে রেখেছে। বলেছে — খোকার চা হইল। তারপর চুপচাপ নিজের কাপ শুকিয়ে নিয়েছে। এই নীরবতা তার পরীক্ষা পরীক্ষা, ব্রাউজের ফাঁকে একটা পাতলা ব্লাউজ। সামা একটু আশ্চর্যান্বিত হতে চেয়েছিল। বলেছিল — দু-দুবার বাস পাল্টে তুমি যাবে অফিসে। পরে আসা, মোবাইলে পরে যাও। নাহলে শীতে খুব কষ্ট পাবে। শেষের সিদ্ধান্তটা পরে এসেছিল সমীরের। আসলে সে মনে মনে

ভাবতে চেয়েছিল — আজকের দিনটার জন্যেই ছেড়ে যেও না, প্রিজ। আজ আমার জীবনে এমন এক তাৎপর্যের দিন। কিন্তু বলতে পারেনি। আলমারী থেকে নিয়ে জলচৌকাতে আয়নার হাতে দেখছিল নীলার। নীলার আচরণে প্রথমে অতিরিক্ত কিছু না। একেবারে হাত পরিয়ে সে বলেছিল — অসুবিধা হবে না তোমার। মোড় থেকে একটা আয়োজিকা রাখে নেব।

কাল ইচ্ছে করেই বাড়ে নীলাদের ছয় জনপ্রিয়তের একটা জানায়নি সমীর। নিজস্ব অভিমান কাজ করেছিল। এরাদে নিজেকে হাল্কা করতে চায়নি। তার একমাত্র ঠিকানার! মনে মনে গোপন ইচ্ছা ছিল কাল প্রথমটা অন্যরকম কাটাতে। তার জন্য অফিসের পর পার্টিসাইমের আকে আসবে সামা। সেজন্য বাড়ি এসেছিল। শাওয়ার-হাওয়ার পর নিজের ঘরে এসে সিগারেট ধরিয়ে নীলাকে বলেছিল — ছেলে বাইরে বসে গল্প করি আমরা। এতদিন সুযোগ হয়ে ওঠেনি।

ঘরের বাইরের ছয়পরিসর বারান্দাটায় চক্রাকারে ঘুরে বসেছিল। এই বারান্দাটা পর করেই বানিয়েছিল সমীর। পছন্দ করে রঙ মিলিয়ে দোয়ার পছন্দমত লাগিয়েছে ভিসে। বারান্দাটা ঘেরাটোপ বেল-জোস্পানির বিস্তৃত বিল। এখানে বসে ঝরনের পানি

আসে। কয়েকটা পাখি ডানার শব্দ তুলে উড়াল দিল খুনো। পলাশ হারিয়ে গেল এই জ্যোৎস্নায়। কেমন রাজসিক হয়ে আছে সবুজ পরিবেশ।

সারা দেখল নীলা তখনো কথা শেষ করেনি। সাথের কথা যেন তার কানেই যায়নি। মনে হলো ভালবাসা জন্য খুশ হালানো হয়েছিল। এখন উৎকণ্ঠার মশাগুলো ঘরে পড়ছিল চারপাশে। আড়ন দিয়ে অর্ধচন্দ্র মশাগুলোকে একজায়গায় জমা করে হাত দিয়ে খোঁজাতে লাগছে নীলা। তার ফর্সা হাতে কম-বেশ। তখন থেকেই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল সে। বলল — তুমি আজ পার্টিটাইমের কাজে যেতে না?

সারা তখনও হঠকারী একটা সুযোগ পেয়ে গেল — যেতে যেতে যেন ভুলে গেল না। অফিস থেকে ফিরে এসেছি। বাড়ির জন্য মন-কেমন করছিল আজ। — তার সঙ্গেহেও যে পর পর দুদিন কামাই করলে। এরকম করলে চাকরি তোমার থাকবে না। এ কাজ করবার জন্য অনেক ছেলেরা ঘুরিয়ে আছে।

সারা এ প্রসঙ্গে গেল না। একটু চুপ থেকে বলল — জানো, আমার ইচ্ছে হচ্ছে তার কাছে আজকাল। মেজাজের কথা আজ কদিন ধরে পড়ছে খুব। মেজদা, বড়দা, আমার বাবাদের আগেই পরপর চলে গেল একাকে। ইচ্ছে ইচ্ছে কেমন আনমনা হয়ে যাই। মনে হয় খা আমি হয়ে আসছে। সামনের রাস্তাটা কেমন দীঘে নেমে যাচ্ছে যেন হয়।

আবেগে গেছের কথাগুলো প্রায় শেষ করতে পারল না সারা। দেখল নীলা তেমন চোখ মেলে তাকিয়ে আছে তার দিকে। সারা চোখে চোখ রাখতে পারে না। একসময় নীলা কোনোরকমে গলায় বলেছে — নিজেকেই খাইয়ে দিতে শেখ। না হয় দরজাটা ভেজিয়ে দাও। এত কষ্ট করে মশা মারা ধুপ জ্বালাবার। আমারও মশা চুকবে।

মনে মনে আহত হলেও চুপ করে গেল সারা। বাইরে বলা হল না। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বালতিটা টিপে তার নিয়ে সারা অন্ধকারান্তরে পাঁচিয়ে দাঁড়াল সামনের দিকে তাকিয়ে। বাসিন্দা ঝিলের জল জোৎস্নায় চেখে ওঠে আছে। হঠাৎ দুজনে মনে হাহাকার করে উঠল। তার মনে হল, ঠিক এই সময়টা আর কারোর না। চেতনায় নতুন রক্তের গন্ধ, সামনে নিছানো জোৎস্নার রাশি, পাখিদের ডানার শব্দ সব মুছে যাবে। অথচ সবকিছুই থাকবে কেবল সে থাকবে না। বাইরের হিম হাওয়ায় শিরশির করে উঠল শরীর। এখন নীলার মুখ অভিমানে চোখ ছলছল করে উঠল। সে কি বোঝে না কিছু। সারার এ জীবনযাপন নয় যেন মৃত্যুযাপনই সে করে চলেছে দীর্ঘদিন। দুই দাদা চলিশ বছর না-পার হতেই মারা গেল একাকে। আর আজ সারার চলিশতম জন্মদিন। চারপাশে অন্ধকারের জলরাশি নেমে এসেছে। আর সন্ধ্যা না হতেই তাদের বাড়িটা ডুবে যায় অন্ধকারে। সেইজন্য কাজের মধ্যে ডুবে থেকে সবকিছু ভুলে থাকতে চায় সারা। সেদিন অফিসের হেডক্লার্ক সরোজবাবু তার কথায় বলেছেন — এত একটা পরিবার অভিশপ্ত আমে একজন। আমি একটা পরিবারকে জানি যারা পঞ্চাশ পার হয়ে হয়েই পরিবারের প্রায় সবারই শেষ হয়ে গেল পটাপট। তারপর থেকে বলেছিলেন, — তোমাদের পরিবারে চল্লিশবছর বয়সটাই বিপজ্জনক। তারপর নানান অভিশপ্তদের গল্পে ঢুকে গিয়েছিলেন সরোজবাবু। চারপাশে টেবিলে টেবিলে পেপারক্লিপদের আলোচনা চলছিল পুরোদমে। সকলের আলোচনার বিষয় ছিলাম, নতুন জোকা একটা সুদর্শন ছেলেরার ছেলের সঙ্গে অফিসারি আছে। এসব কিছুই দেখছিল না সারা। মনে হচ্ছিল তার অবচেতন অভিমানের চোখবালে বীরদিন বন্ধ হয়ে থাকা ঘড়িটার মত অস্থিরতাহীন। সেদিন রাতে ঘুম হয়নি। সারা ছটফট করেছে বিছানায়। ছোথায় একটা ফুলপোকা ফরফর করে কপাটে কপাল করে ঘরে ঢোকে যাচ্ছিল। একসময় পাশে শোয়া নীলাকে উদ্দেশ্য করে সারা বলেছে — ঘুমিয়ে পড়েছ? মুখে কেমন লাগা জড়ানো অস্বস্তিকর শব্দ তুলে নীলা বলেছে — না, বলো।

সারা ফিসফিস করে গলায় আবেগ এনে বলেছে — একটা কথা বলব? আমার জন্য তোমার খুব ভাবনা হয় নাকো?

নীলা জড়ানো গলায় বলেছে — আলাদা করে কি আর ভাবনা হবে। নিজের থেকে কিছু আলাদা না আমি। ভাবতে চাইও না। কখনসখন তো ভাবনা আসে। একসময় আপনা থেকেই বুদবুদ কেটে কোথায় তলিয়ে যায় ভাবনাগুলো।

আলস্য ভরে মুখটা জোনাকিপোকা মশারির ছাদে উঠে গেছে। কি

উঠছিলো। তাদের শরীর নিস্তৃত ফলফলাসের নীল রঙের আলোর নিচে দাঁড়িয়েই নীলার হাতে কিছুটা জল হয়ে এল আমা। বলল — আমার কিন্তু একটা হয়ে গেলে তুমি খুব একা হয়ে যাবে। খুনা হয়ে যাবে তোমার চারপাশ।

আয়নোড়া ছেড়ে সামনের দিকে পা দিয়ে ওল নীলা। তার শরীর থেকে উঠে আসা একধরনের গন্ধ নড় জলে এসে নাকে লাগল সামার। আর একটা চাপা নিটিমিটি অনুভব উঠে এল শিরদাঁড়া বেয়ে। অনেকগুলো ঘুণাক্ষর, স্মৃতি ঝিলমিল করে উঠল সামার চোখে মোখে। ঢেকুরের মুখোমুখি হচ্ছে। অপৌরুষিক এক উচ্চারণের শব্দ। গঙ্গার পাড় থেকে আসা দামাল হাওয়ায় বাড়ি লাড়ি খাচ্ছে সামার হাতে ধরা আয়না। ঘুণ খাচ্ছে। চারপাশে চামচিকা পেত্নীর গন্ধ। প্রবল আতঙ্কে সামা হঠাৎ, আঁতকে ওঠল নীলাকে। অস্ফুটে বলল — আমায় ছেড়ে দেও না। আমার দু-হাতে আগলে রেখো। আমার কেউ নেই। নীলা বলল — উঃ লাগছে। ছাড়ো। তারপর আদের কথার খেই ধরে বলল — ভবিষ্যতের কথা কি কিছু বলা যায়? আমি কি থাকব, কেমন থাকব। দুহাতে আমার আদর নিয়ে ঘরে গেল। তাতেই বা কি করবার থাকবে আমার। তারপর থেমে বলল — আমার খুব পাচ্ছে। যা করবার তাড়াতাড়ি করো। এতগুলোই মুখ কেটি তার বারবার। কাল মিলনের সময়ও নীলার শরীর নিস্তৃত কোনো জ্যোৎস্না নেই। গন্ধ নেই। কম্পন নেই। আছে এগুলোই পালপালিত হয়ে সামা আর নিজের ঘরে অতন্দ্রিকর মুখে পড়ছে। তবুও ছাড়তে পারে না জোর করেও। একটা নেশা, এক অদ্ভুত টান তাকে মৃত্যুর কেন্দ্রে টেনে রাখে। সেখানে নীলার অস্থির পূর্বনির্ধারিত নিয়তির মতো আসাইন। নীলা যেন মুমুক্ষু অবস্থার শারীরটি করে চলেছে অস্থির এ মা থেকে এ ঘর। তার ধরনে তারা অভিনয়ের পরম্পর যেন তবে নিচ্ছে জানলা, দরজা, বেসবাল।

এই রাতের নিস্তব্ধতে খান খান করে দিয়ে একটা শিশু কেঁদে উঠল কোথাও। এক ধরনের জান্তব অবস্তিকর অনুভব ছড়িয়ে যাচ্ছিল সামার শিরা-উপশিরায়। অসহায় নিশ্চু গন্ধ তাকে পাগল করে দিল ক-মুহূর্ত। প্রবল বিরক্তের তার ফালাফালা করে দিতে ইচ্ছে হয় রাত্রির এই নিবিড় আয়োজন, তার সব পাপকে। সামা প্রবল আগিয়নে দলিত মথিত করে তুলল নীলাকে। সামার শরীরময় কাঁকড়া বিছের কামড়ের মতো ছলুনির টিক, অতি অনুভব। তার মধ্যেও নীলা ফোন হিস, নিশ্চলভাবে শুয়ে আছে। শুধুমাত্রই কেমন নির্লিপ্তভাবে বলল — তোমার মনে নিয়ে কবির খুরিয়ে আনো। বুড়োআনুষটা প্রায়ই চাকুরঘরে বসে খুনসুন করে কাঁদছে। বিড় বিড় করে একা। কোনো প্রার্থনা করে নাকি অভিশম্পাত বোঝা যায় না। এ বয়সে জরা আর অভিমানের কোনো তফাৎ থাকে না। খুবিন বাইরে ঘুরে এসেও বৃদ্ধা প্রাণ পাবে কিছুটা। বেরের জড় ফেলে এসে ছিটকে সরে এসে বলল সামা। কেমন আকাশের মতো একটা অকপাতের অনুভব ওড়িয়ে যাচ্ছে ওড়িয়ে। কোনো উত্তর করল না সামা। কেবল আস্ফুট গোঙানির মত বলল — আমার আজ যাব নাড়ি। আমার আজ যাব আজকার।

এখন দিনরোটে শেষ টান দিয়ে ফেলেছে পায়ে পিষিয়ে ফেলার সাধ। তারপর দরজা ঠেলে ঘরে এল। নীলার মদ-পর্ব শেষ হয়েছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ছে এক দৃষ্টে তাকিয়ে। পরনে হলুদ ডরেসের হাল-ফেসানার। সামার পরনের শরীরে চুমক আছাদন না তার। পরিবেশটা কলুষমুক্ত করার জন্য জোর করে সহজ হতে চাইল সামা। বলল — নিজের চেহারা কি দেখছ গভীরভাবে। অমনি বলল — তোমার ভারুন লাগছে আজ। এই ঘরটায় তোমাকে ভারুন মানায়। ঘাড় ঘিরিয়ে কোজুক ভরা হাসল নীলা। সামার এই নিরুদ্ধ পরিবেশটা ভাল লাগছিল না। আবার বলল — তোমার কি হয়েছে বলোতো? কোনো উচ্চারণ নেই। কি এক ভাল একা একা। আমার খুব অস্বস্তি হয়।

খাটে বসাই টানতে টানতে নীলা বলল — আমি তো আগামিকালই আসছি। তুমিই অযথা বিচলিত হও। বেশী মৈ ঠে আমার ভাল লাগে না কোনদিন।

আজ রাতটায় একে তাড়াতাড়ি ওতে ইচ্ছে করছিল না সামার। আবার মনে নানান কথা ভিড় করে আসছে। ইচ্ছে হচ্ছিল বুজনায় আবেগে আপ্লুত হতে। আবার কেমন ভয় ভয় করছিল তার। একটা বড় হার্ডলস্ দৌড়ের শেষ বাধা আজ হাতে টপকাতে চলেছে সামা। সরোজবাবু বলেছিলেন, আপনাদের পরিবারে চল্লিশ বছর বয়সটাই ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। আজ থেকে একটা নতুন পৃথিবী তার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে। আগামীর

আজ অফিসে তাকে ঘিরে খুব চৈ চৈ হয়েছিল। সাধারণ প্রত্যেকটা অর্ডারই বেরিয়েছে। তাতে আরও বেড়ে গেছে কাজের চাপ। সারা দুপুর ঘুরে ঘুরে ছোবেছে এবার তাহলে পার্টিটাইমের জন্যটা ছেড়ে দেবে। কোনো কাজেরই জন্যায়ে না আর। নীলাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমানোর কথা ভুলতেই হবে জীবনটা। অফিসের নিকনিক হবে। কল বেয়ে সকলে যাবে পুরী। এরকম প্রতিবারই পরীক্ষার দিনে বাবলা হয় নতুন নতুন জায়গায়। সেইজন্য টেনিসে টেনিসে আলোচনা চলছে। এসবের মধ্যেই এল বাসের প্রয়োজনের অর্ডারটা। সব ছেলেরা ঘিরে ধরেছে তাকে। রিসিভিং এর দৌলতে খুশবু ফতাবের। সে বলল্যা করে উঠল — এবার সাজানো নিকনিকের ব্যাটা স্পনসর করবে। আনন্দ ছড়িয়ে যাবে। অন্যজন বলল, — এবার কিন্তু বৌদিকে আনা চাই। কতদিন আর আমাদের থেকে লুকিয়ে রাখবেন। জানি, বেশী বয়সের বৌ হরকমুখী নীলার মতো। সুটি করলে সাংঘাতিক। সারা হাসিহাসি মুখ করে রেখেছিল। সারা আকাশে, বাতাসে, অফিস কফিরোডে কি উত্তেজনা। কিন্তু এই মুহূর্তে এত প্রশংসাগুলোর মধ্যেও কোথায় যেন খালি লাগছিল। হঠাৎ সেই আগের খালিত বোধটা পেয়ে বসছে তাকে। চমকালো এত ২৪, বিটির জীবন, সবকিছুই বাজারে কেনা সে আনবে না। তাবনাটা ঝিলিয়ে দিতে কেমন ফাঁকিয়ে দিচ্ছে সারাক্ষণ। এত কোলাহলের মধ্যেও নিজেকে একাকী লাগছে। কাজের পরিধির অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ল সে। হাজরা মোড় ছেড়ে বড় করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। বাসস্টপে কাজরে আসাতে ভিড়। হাজরা থেকে রাসবিহারি বলেও বড় সওয়ারি হচ্ছে। দাঁড়িয়ে রয়েছে সারি দিয়ে বাস-লরি-টেম্পু। একটা ঝিলিক চলে গেল বড় রাস্তা ধরে। মিছিল থেকে জলকেলাহল নানা ধ্বনি, সমস্যার কথা ছড়িয়ে দিচ্ছে বাতাসে। সারা আনমনে হাঁটে। মনে হয় কোথায় যেন যাওয়ার কথা ছিল, কি যেন করবার ছিল, করা হল না। হঠাৎ নীলার মুখটা মনে এল। আগে বাড়ি ফিরলে সে কি খুশি হবে। আজ খু-বন্ধুরও সারা আজ চেয়ারা-পাওয়া বুঝতে পারল না। ফোনে কাজের জন্য প্রপোজ নেই, অফিসেরা নেই। ভার মধ্যে যেন হিম জমছে আছে একটা সবজ।

সেদিন নিজের পরপরই খুশবুর পুরী গিয়েছিল অফিসের এল.টি.সি. নিয়ে। আনন্দটাই মাটি হল। হোটেলের জানালার পাওয়া গিয়েছিল খুব সুন্দর। সামনের বালকনিটা ছিল সমুদ্রমুখী। অনন্ত দৃষ্টিরেখা বরাবর রুপো-রঙ সমুদ্র, তার ঢেউ। দুপুরে স্নান থেকে দেখা যেত নানা মনুষ্যদের স্নানের দৃশ্য। সাগরেও খুব সতেজ লাগছিল নিজেকে। কিন্তু নীলা উজ্জীবনহীন। পত অনুরোধেও তাকে সমুদ্রে নামানো গেল না। একথা বলতে বলেছে — আমার অর ভাল্ল থেকে হাসপাতালি করে আনন্দ পেতে ভাল লাগে না। এই বালকনি থেকেই বেশ লাগে সমুদ্রকে। দুপুরি মাঝ স্নান করো। আমি এখান থেকেই দেখছি। জীবন সমস্যা হয়ে তার সেরেছিল সারা। মনে মনে কষ্ট পেয়েছে। একলার আনন্দ এসেছে, এ কি ফাঁকি তার জীবনে। এখন এক অপরিচয়ার নারীকে নিয়ে ভাসিতে হবে বাকি জীবন। এমনিতে একলার নিজের রচিত বিষয়েই ঢুকে ছিল সারা। বাবা মারিয়ের জায়গাটি আসার সে অনুভব করেছে তার সবার ফোনে ফোন সুরুতে পাওয়া কথার শব্দ। ড্রেসিং, সুপুরির জায়গাতে একটা অন্ধকার পাহুর তাকে টানে, ডাকে। অফিস অফিস থেকে ফিরে সারা ঘরের আলো জ্বালায়নি। অন্ধকারের প্রেমিক সেটা নিয়ে ঘরে থেকেছে বাড়ির বারান্দায়। রেডিওর নব ঘোরাতেই ভেসে বিটির আসে, শব্দকণি, তত আজানা মুখগুলো উজ্জীবিত হয়েছে মনে।

হাউস-মিসিস যেন ভুলে বাড়িটাকে সাজিয়েছিল সারা। বাড়ির পেছনদিকের আকাশে এই ভর পরিসর বালকনিটা বানিয়েছে। দরজা বন্ধ করে দিলে এখানে বাইরের শব্দ প্রায় আসে না। রাত বাড়তেই আকাশে ফুলে উঠেছে নক্ষত্র, ছায়াপথ। এখানে বসে পাশের ঘরের রেডিওর নব ঘুরিয়েছে সারা। তারপর একসময় রেডিও বন্ধ করে তাকিয়ে থেকেছে সামনের অন্ধকারের দিকে। তখনই একরকম দুঃসহের গ্রাস করে ফেলেছে তাকে। মনে হয়েছে, এখন পাশে একটা নারী থাকলে বেশ হত। পেলব মসৃণ হাত, মাথায় একগুচ্ছ কালো চুল, গভীর মধ্যে বিশ্বস চোখের এক নারী।

বাড়িতে পরপর দুটো শোকের ঘটনা ঘটার কেউ তার বিয়ের চেষ্টা করেনি। বাড়ির সকলে যেন ধরেই নিয়েছে সারা আর থাকবে না। এমন মৃত্যুময়, অন্ধকারিকার হাত উপহিতি। এখানে বসে একসময় ভাল লেগেছে, নিরালা এসেছে মনে। মনে মনে জেদ করেছে। বিয়ে সে করবেই সে করেই

হোক। তাহলে একজন নারী জন্মত হবে হয়ে কষ্ট পাবে তার অনুপস্থিতিতে। আর সৈশাখা হবে। এটুকু ভরসা তার অধিকার আছে পৃথিবীতে।

সেবার সমুদ্রে স্নান করতে করতে মনে হয়েছে কিন্তু এ কি অভিশাপ এল তার জীবনে! পাশে শীলার একজন ট্রাস্ট অভিনয়। একেকদিন রাতে খুব ছেড়ে খেলে সাথী এসেছে শীলা হোটেলের ব্যালকনিতে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। সামনে প্রসারিত তার দৃষ্টি কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। এই নির্জন রাতে অনিন্দ্যর সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়বার শব্দ হচ্ছে। তার মধ্যে স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকা শীলাকে কেমন অদ্ভুত লেগেছে। আপনমনে গান গাইছে শীলা। সাথীর ডাকে তাকাতে সাহস হয়নি। আলতোভাবে দরজা বন্ধ করে এসে আবার শুয়েছে বিছানায়। সেবার গিয়ে গোটা খানপাঁচেই আঁকা হয়েছিল। সাথী মনে মনে ভেবেছিল দুটিয়ে কদিন আলাপ করবে দুজন। সে বসে জন্য কিছু টানস এনেছিল আলাদা করে। কিন্তু হল উল্টোটা। শীলার আর্কেটিং-এ কোনো উৎসাহ নেই। কিছুটা ঘোরাঘুরি করে একসময় বলেছে — খুব টায়ার্ড লাগছে। ঘুম পাচ্ছে। তার ছেড়ে চলে হোটেলে ফিরে যায়। তারপাশে আলপে আর্কেটিং করছিল ঘোরাতে আলা নানা কম্পজিয়া। সাথী চাইছিল শীলাকে ওরকমে আপার করুক, সকলের জন্য গল্পে করে কিনিসপত্র কিনুক। শীলার এসবে কোনো আগ্রহ নেই।

বাড়ি ফিরে এসে আগেরো ঠিকঠাক করে উঠেছিল সাথী — আর শনি না আসে তবে যেসে কেন। আর তোপাও তোমার নিয়ে তার না। এরপর একজন হাসে আমি একা ঘুমব। শীলা হেসেছে — তুমি একথা হাস করছ। যে যেমন ভালবাসে। তুমি কি শাস্টারে পারবে? আর এর কমি করে হয়েছে কি? আমরা শরীর বাড়িবার কথা। এর থেকে তুমি বাড়িতে না থাকলে একা একা কত তুমি, তাতি, তোরা শালাই সেটাই ঠেক ভাল।

সেবার একজন প্রতিজ্ঞা করলেও এখন আবার শীলার সামনে নির্লজ্জের মত প্রস্তাবটা রাখল সাথী। বলল — ছল সামনের মাসে পুরী অব আসব। সেবারের মতো সমুদ্রের কাছে না থাকলে ছাড়াই না। আর এবার অফিসের যে সব ছেলে ছেকরারা আছে, তোরার অতিথি করে ছাড়বে। আরপর থেমে বলল — আমাদের মাঝেমধ্যে বাইরে যেতে হবেরা দরকার। বাড়িতে তো আমি বেরিয়ে গেলে মনুষ বলতে কুড়ি না। কাঁহাতক আর তোমার ভাল লাগে।

শীলাকে তার প্রপোজালের কথাটা বোঝাতে কথা কথাটা অস্থির হয়েছিল। ভোর করেই রাজি দিল সাথী। এই নিয়ে রাত ওরে শীলার সাথে গল্প করা যাবে। কলারি টাঙানোর শেষ করে অনেকক্ষণ ছেটি কাঁটা নিয়ে বিছানা আড়াল শীলা। তারপর যেন জনান্তিকে বলবার ভঙ্গে করে বলল — ব্যবসাগরের মাঝার বাড়িতে ছবার যেতে পারি কাল। তুমি অফিস থেকে ফিরে খাবার তৈরিয়ে খেয়ে নিও। কথাটায় কেমন চমকে উঠেছিল সাথী। আপেপে কিছু বলতে চেয়েছিল। কিন্তু নিজেকে জোর করে আটিয়ে নিতে পেরেছিল — বাড়িতে কেউ এসেছিল কি আজ? আর কালকেই যেতে হবে তোমাকে? মনে মনে বলতে চাইছিল, তুমি কি জান না শীলা কাল আমার জীবনের এমন এক মহার্ঘ দিন আমার অভিশপ্তত, কালকের দিনটা অন্তত আমাকে ছেড়ে থেক না।

একটু চুপ থেকে শীলা বলল — আজ মুখুয়ে অনেকক্ষণ এসেছিল। আমার ছেলে। আমা হাতখরচা পাঠিয়েছে। কাল মাস্তানো যেন অঞ্জলির নাম। আমার কাছথেকে থেকে লিখেছে। চিঠিটা এদিয়ে দেওয়াতেও সাথের পড়তে ইচ্ছে হল না। কালকে কথাটা শুনবার সঙ্গে সঙ্গে মুখের ভিতর ছিন্নভিন্ন হচ্ছে। মানুষটাকে এরসব লাগে হয় না সাথার। সেলফী হাতড়েছেন। নিজের ঘরি-আমা, বাজ-বালাসে আছে। তবুও হাত-পাতা ফলাবের। আজ একদিন টাকা ধার নিলে দেওয়ার নাম করবে না। মাসছয়েক আগে অফিসে এসে সাথার কাছ থেকে হাজার চারেক টাকা ধার করেছে। তেন ভুলেই গিয়েছে। লোকটার খুব খারাপ স্বভাব। বয়স্কজন থাকবে পয়লিশ্চা, পয়ত্রাটা কথাবে। মাথা এলেই ফটিন্ন হয়ে থাকে সাথা। ছল অফিসের ঠিকানাটা লিখে দাবার। সেদিন এসে এইরকম ভেজালার পরিচয়ের সম্বন্ধে কত কথা বলেছে সাথা। একসময় সন্দেহ করেছে — কতবারের বয়সের খারাপ লোগ আছে। কে আর প্রকাশ করে বলা। তোমাদের শরিবারটাই অভিশপ্ত। আমার ভাবীটার ভালাই খারাপ। সবই ভবিতব্য। একটু সাবধানে থেকো। সমুদ্র সহের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। কাটিয়ে থেকে আসা অফিসের সেকেন্ডম্যান মাথার গলার ঘরে আসছে।

একসময় সাধা আর পারেনি। ডাক্তারবাবু বলেছে — অফিসে এসে এসব আলোচনা করবেন না। এখানে না এসে বাড়িতে যাবেন। দুদুটো সাধার মুখে কথাগুলো ঘুরি মেরে গেল। চেঁচিয়ে উঠতে গিয়ে — তোমার এখানে না আসলে আমার মরে যাওয়া উচিত। এখনে খুন কেলেংকারী ছাড়া আর কিছু হবে না। আর তোমার ভবিষ্যৎ তো সকলের জানা ব্যাপার।

সাধা আর কথা বাড়ায়নি। পরদিন, অপরাহ্নে বেরিয়ে এসেছে অফিস থেকে। সারাদিন একনাগাড়ে ঘাম ঝরে গেছে শরীর। সাধার কথা শেষ কথাগুলো সারাক্ষণ তোলপাড় তুলেছে ভিতরে। তার অর্থ সকলের কাছে সাধার অবস্থান নিছকই একটি হাইড্রোজেনের বেলুন। ফুলা থেকে আরও ফুলবার মত নাই। বাড়ি এসে ইচ্ছে করেই নীলাকে এসব কথা জানায়নি। তবে সাধা স্থির জানে পরবার পুরুষবেশের চিন নীলা আবার বাড়ি গেলে মায়া সব ঘোলাবে তাকে সত্য-মিথ্যা মিশিয়ে। কিন্তু নীলা কখনও কিছু বলেনি এ প্রসঙ্গে। মাঝেমধ্যে মনে হয় নীলা রহস্যময় নিষ্ঠুর। তার কাছে সাধার মান-অপমানের কোনো দামই নেই। এখন নীলার মুখে মায়ার কথা শুনে রাগ হল। একটিও আলতু সাধাকে জানানোর প্রয়োজন বোধ করেনি অনুষ্ঠানের পরপরে। আর নীলা কখন হয়ে সেই সাধার বাড়িতে হাজিরার জন্য দু-পা বাড়িয়ে আছে। সাধা মনে মনে বলেছে — ওখানে তোমার কখনও ইচ্ছে হলে যাও। তবে শুনে রাখ, তোমার জামাটা একটা ছিঁড়। যেখে যেখে আমার কাছ থেকে কম করেও দশ হাজার টাকা ধার নিয়েছে। এবার টাকাটা ফেরত দেওয়ার কথাটা অন্তত মনে করিয়ে দিও। একেবারেই কথাটা বলে ফেলল সাধা। নিজের কানেই কথাগুলো কেমন ধারাল শোনাল। কিন্তু দেখল, নীলার চোখেমুখে মান-অপমানবোধ জিনিসটার রেখা। সে চাপা স্বরে উত্তর করল — এ ব্যাপারে আমার বলার কি আছে। তুমি টাকা দিয়েছ। কথা তুমিই আমাকে একসময় বলতে তুলিয়ে। আমি স্মৃতিতে তুলেও যেতে পারি। কিছুই আজকাল বেশিদিন মনে থাকে না। আর মনে রাখতেও চাই না।

নীলা যদি চেপে ধরে, কথাটা অন্তত তুলুক আজ আলার সন্ধ্যায়। কিন্তু তার এরকম নির্বোধ ব্যবহার বড় অসহ্য। যেমন এখন নির্বিকার আলমারার আয়নাটোড়া আঁচড়ায় নীলা। তারপর জড়ানো গলায় বলল, ঘুমুতে ঘুম হয়নি। বড় ঘুম পাচ্ছে। তুমি খেতবার সময় ঘরের লাইটটা অফ করে দিও।

নীলাকে আজ কত কথা বলবে ঠিক করে রেখেছিল সাধা। কিছুই বলা হল না। তবু একঘণ্টা-দেড়ঘণ্টার পর সহজ হতে চাইল সে। আজ — আজ, এখনে তুমি খুব আনন্দ পাবে। আমার এতদিনকার আশা পূর্ণ হয়েছে আজ। অফিসে প্রমোশন হয়েছে। সেইজন্য অফিসে আমাকে মিষ্টি সবাই টৈ টৈ করেছে। এবার কেন কিছু মাইনে বেশী পাব আমি। তাহলে আলাদা পার্টিটাইমের কাজটা ছেড়ে দেব। তোমার সঙ্গে এবার অনেক সময় কাটাব। নীলাটার জন্য তুলসা একসময় অন্যায়বোধ। আজকে অনেক কিছু বলে ফেলেছিল সাধা। একসময় লক্ষ্য করল নীলার নাক ডাকছে। ঘড়ীর মুখে তাকিয়ে দিয়েছে সে। এরপরেই সূর্য পৌঁছনের আগেই সূর্য ফেটে গিয়েছে।

এবারও তেমনই হল। নীলাকে বাধাতে গেল না। চলে গেল। বালতিনিয়ে মুখিয়ের মতো দাঁড়িয়ে সাধা দেখল হেলমাইটের বিলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে একসময় কুয়াশার অদৃশ্য হয়ে গেল নীলা। তখনই শূন্য হয়ে গেল চারপাশ। তখন নিঃস্তব্ধতা বুকের মধ্যে হাহাকার করে উঠল।

আজকের দিনটা মতোই বড় বিশ্রী হয়ে আছে। থেকে থেকে হাওয়ার ঝাপ্টাটা আড়ছে। হাওয়ার ছোঁয়া তরল কুয়াশা ছড়িয়ে পড়ছে চতুর্দিকে। মোদ্দুর মনে হয় আজ আর উঠবে না। বাড়িটা ঘরোয়ালি নিস্তব্ধতায় তলিয়ে আছে। হঠাৎ সাধার মনে হল চারপাশের এই একঘেয়ে দৃশ্যাবলী, মায়া পরিবেশ এসব কিছুই অভিশপ্তপুরীর ইঙ্গিত নয় কি! মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল।

সাধা ভেবেছিল আজ আর অফিসে যাবে না। গোটা দিন নীলার সঙ্গে আলাপচারে কাটাবে। মোদ্দুর অফিসের সিনেমা হলে একটা ফারুল ছবি এসেছে। দুজনে দেখবে। এমনকি রান্নে রান্না না করে বাইরেই খেয়ে নেবে কোথাও। কাল অফিসে কাজ ওছিয়ে আসবার সময় সেরকমই ঠিক করে এসেছিল সাধা। কিন্তু হল অন্যরকম।

এখন বাঁড় রাগ অন্যায় সংকল্প নিয়ে নিয়ে বাইরে বের হয়ে এল সাধা। সে অফিসেই যাবে। কিছুটা সময়লোনা হলেও

ওখানে হৈ-হল্লোড়ে কেউ মানে সবটা। এই মুহূর্তে এমন একজনের মানও মনে পড়ল না যার কাছে খোঁটা দিল কাটানো যায়। সান্ত্বনা।

পুকুরপাড়ে চায়ের মুড়িমুড়ি দিয়ে আমের বৌটা বাদাম আরম্ভ হয়েছে। একটা মোটরগাড়ি স্টার্ট হচ্ছে তার কর্কশ শব্দ ভেসে এল। আজ অফিসের মোটরের বেশী লোকজন আসবে না।

বাইরে বের হওয়ার সময় সান্ত্বনা দেখল মা ঠাকুরঘরে জপুজপু হয়ে দাসাজপ করছে। মা তার শাড়ির আঁচল দেখল। বলল — তোর অফিসের এই অবস্থাতেও অফিস যাওয়ার কি দরকার। বৌ তো আরও কথা চলছে না। চলে গেল এরকমভাবে।

মায়ের গলায় স্বরটা কেমন ভারী ভারী। কথাটা শেষ করে আবার বাসাজপ করে চলেছে মা। এই মুহূর্তে মাকে দেখে খুব কষ্ট হল সান্ত্বনার। মা কুরুশের ডিজাইন আ কেমন জপুজপু হয়ে বসে আছে। মাকে কখনও যেন দেখেনি। মায়ের হাঁপানির টান আছে। সহজেরাত কারির জন্য ঘুমাতে পারে না। আজ একসময় এই মা ছিল মায়ের প্রাণভোমরা। একটি শালিকে ঘেরেছিল খোঁটা বাড়ি। কলেজ জীবন পর্যন্ত বাবারা ভাই আটটার পর বাড়ি ফেরবার কথা কল্পনাই করেনি। একবার ভুল পাসিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমা দেখতে গিয়েছিল সান্ত্বনা। মায়ের কাছে ধরা পড়ে যায়। মা টানা এক সপ্তাহ কথা বলেনি তার সঙ্গে। সেই মা, বাবা মারা যাওয়ার পর থেকেই নিজেকে গুটিয়ে রাখে। দুই দাদার মৃত্যুর শোক মাকে একদম ভেঙেচুরে দেয়।

সান্ত্বনার এখন ইচ্ছা করছিল প্রবল আলিঙ্গনে মাকে জড়িয়ে ধরতে। বলতে ইচ্ছা করছিল — তুমি কিছু ভাব না তো। আমিতো আছি। সবকিছু আমার আগের মতো ভাবে দেখবে দেখ। কিন্তু কাজল বিধাদ্বন্দ্বে বলতে পারল না একথা। কেবল বলল — এত টাকা বাইরে পাঠে মোজাটাও আজ পরতে পারবে। তারপর প্রসঙ্গ পালটে বলল — নাশ্তা আজ আমাকে অফিসে খেতেই হবে। খুব দরকারি কাজ আছে কয়েকটা।

জোর করে মাকে খাইয়েছিল সান্ত্বনা। তখনই মা আবার ক্লান্ত গলায় বলল — আজ একটু আগে অফিস থেকে ফিরিস বাবা। রোজ জন্য একটু পরেরে করবে।

নিমেষে মুখের মধ্যে অনন্তের ঢেউ বয়ে গেল। চারপাশের এই আবহাওয়া পরিবেশ আর তার বিষাদময়তাটা ছুঁড়িয়ে চারপাশের গাছপালা, আকাশ, বাতাস যেন কথারাশি নিয়ে উঠল— তোমার জন্যদিনে অফিসিয়ন রইল সান্ত্বনা।

সান্ত্বনা কিন্তু বলতে পারল না। এত কষ্টের মধ্যেও একটা ছিনতিন কথা আনন্দলোক ছড়িয়ে গেল মনে। একজন মানুষ অন্তত জানতে পারে যে তার কথা ভাবছে। সে তার গর্বধারিণী মা।

বাইরে বের হতেই ঝোঁটা ঝোঁটা বৃষ্টি শুরু হল। সঙ্গে ছিনেল হাওয়া। আর যথেচ্ছ মেঘমল্লিকা। কটা আমা কুরুল উঠানে সাধনের শরীরটাকে ঘুরিয়ে দেখে নিচ্ছে। সান্ত্বনা মনে মনে বলল — ট্রেন, বাস আটকে দিয়ে খুব ভেন সরকার ঘর পাঁচা।

পুকুরের জলে পা দিয়েই একজনে হাওয়ায় সান্ত্বনা শরীর ঠাণ্ডা দিয়ে উঠল। নামতে ইচ্ছে করছে না জলে। মায়ামেয়ে কলাটা এসে পড়ল পুকুরের মধ্যে। কটা ছেলে লাফ দিয়ে জল থেকে কলাটা তুলে আনবার চেষ্টা করছে। কলাটা ভেসে যাচ্ছে কুয়াশা ছিঁড়ে ছিঁড়ে। কালো জলে কলাটার প্রতিবিম্ব ভাসছে। সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সান্ত্বনা। কিন্তু স্মৃতি তার ঘরে। ছবি হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে অতিরেকের চোখে চোখে। এই জলে মেঘলা আর তার ভাই-পা ছড়িয়ে কুরুক করে চিৎকারাহাতে জলে অনেকক্ষণ শুয়ে থাকতে পারত মেঘলা। বাড়ির সবচেয়ে একজন হাসাহাসি করত মেঘলা কলাই, শরীর ভাল থাকলে যে কি অসম্ভব হৈহৈ কুরমি না। নীচে জলের শীতলতা আর চোখের সামনে বিস্তৃত আকাশ। ঘন্টার পর ঘন্টা থাকলে মনটা অনেক হালু হয়ে যায়।

মেঘলা ছিল অসম্ভব প্রকৃতিপ্রিয়। আমাদের কথায়, হাসিতে ভরে রাখত বাড়ি। সে বড়মামার চলে যাওয়ার শোকটা ভুলিয়ে দিয়েছিল সকলকে। কিন্তু এ যেন মেঘলাও কেরেনি। জলে শোওয়া অবস্থাতেই ঠোঁক হয়। কুরুক ভেঙে যায়। পাড়ে তুলে এনে ডাক্তার ডাকবারও সময় পাওয়া যায়নি। পুকুরের পাড় থেকে লোকজন। বৌদি জল ভরা চোখে উপরনি-পাথরনি এঁকেছিল। মাকে ধরে ধরে বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল সে। সকলে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল বৌদিকে নিয়ে।

সেই বৌদি এখন অন্য মানুষ। শুধুমাত্র শরীরের এ দুশ্চরিত্রা যেন অন্য পৃথিবীর। একসময় বৌদির সঙ্গে দেখা হয়েছিল বাসে। তখন দাদা বিয়ে করেনি। অফিসের পর এক সহকর্মীর বাড়ি নিয়ে নিমন্ত্রণে যাচ্ছিল সেদিন।

অকৃতকার্যভাবে বৌদির সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। সাদা প্রথমে চিনতে পারেনি ওকে। বাসস্টপেতে দেখে বৌদিই সামনাসামনি এসে দাঁড়ায়। গলার আওয়াজ শুনে বলে উঠেছিল — কি গো কেমন আছ? উঃ কতদিন পরে দেখা হল। তোমাকে অনেকক্ষণ দেখেছি। বাসের ভিড়ে এগোতে পারিনি তোমার কাছে। তখন থেকেই ইশারা করছি।

সাদা ভূত দেখবার মতো চমকে উঠেছিল। প্রায় তিন-চার বছর পরে দেখা। পরনে মুড়ুয়া অনেকদিনের পরেই শ্বশুরবাড়ির পাট উঠিয়ে বৌদি বাপের বাড়ি ফিরে গিয়েছিল। তারপর একবার মাত্র এসেছিল মায়ের খুব অসুখের সময়। এরপর বৌদির নামে নানান ইতরামি কানে এসেছে। সাদাও মনে মনে ঘৃণা করেছে বৌদিকে একদিন।

ক্ষণিকের চমক কাটতেই সাদা বলেছিল — তুমি এখানে?

বৌদির শরীর-স্বাস্থ্য ভাল হয়েছে। হাতে শাঁখা, কপালে জলজলে সিঁদুরের টিপ। ব্লাউজ ঘরের বাড়ি নিজের শাড়ির আঁচল উড়ছিল হাওয়ায়।

সাদা লক্ষ্য করল এখন বৌদির কপাল মুখের উপর একটা কালো পর্দা পড়ল হঠাৎ। আড়ালকে গোপন করতে চাইল বৌদি। বলল — হলো কলব সব। তোমার শরীরটা কিন্তু খুব খারাপ হয়ে গিয়েছে। অন্য সময় হলে এ কথায় একটা কলের মতো আলাপচারিতায় নিজেকে ছড়িয়ে পড়তে হবে। এখন নানান কথা ভিড় করে আসছিল সাদার ভিতরে।

নিজেকে বাড়ানো হল না। সাদা ভেবেছিল কিছুতেই যাবে না বৌদির সঙ্গে। বরং উল্টে দু-কথা শুনিয়ে দেবে। পারল না। একটা জীবন কৌতূহল তাকে নেশার মতো অধিকে টানল। বৌদি জোর করেই একরকম নিয়ে গিয়েছিল ওর বাড়ি। বড় রাস্তার থেকে গলির একটু ভিতরে লাল-কালো রঙের মুখচেনা বাড়িটা। তার বদলে আর্থী ছিল না। অফিসের কাজে কোথায় বাইরে গিয়েছিল সে। ঘরের মেঝেতে জলচৌকি মেজেঘষে ধোয়া, টিভি ঝকঝকে তুলসীর কাজ, কালকাটিতে লাটিমটি সাজানো বইপত্তর। চারপাশে চোখ বুলিয়ে সাদা লক্ষ্য করল কোথাও মেয়েলির চিহ্নমাত্র নেই। সাদা বুঝের ঘরে একরকম আন্দাজ করা যাচ্ছিল ক্রমে। সাদা বলেই ফেলল — বেশ তো সুখেই আছ। তোমরা সকলেই স্বার্থপর।

একথায় বৌদি ম্লান হাসল — জানো, খুব শাস্তি নিয়েছি। না? তারপর অন্যমনে বলল— হ্যাঁ, শাস্তিটাই তো। কথাটাকে চাপা দিয়ে সহজ হতে চাইছিল বৌদি। বলল — মা, কেমন আছে? মা আসার কথা বলে? কতদিন মাকে দেখি না।

বৌদির নাকালমি দেখে সাদার রক্ত উঠে যাচ্ছিল মাথায়। হঠাৎ চিৎকার করে উঠল — তোমার এত অভিনয়। মাকে তুমি ঠকিয়েছ।

নিমেষে কেমন একটা বিপজ্জনক ঘটিয়ে গেল বৌদির চোখেমুখে। কেমন আক্রমণ হয়ে উঠল বৌদি। তারপর কান্নায় ভেঙে পড়ল। কান্না-গলায় বলল — তুমি ঠিকই বলছ। আমি অভিনয় করে যাচ্ছি আজও। আর পারছি না। কখন সে ঘাইয়ে যাকে সাদা ঘরে এনে বসিয়ে উঠি। অসহ্যকষ্টের আমার নিলতে জানে। তোমার কাছে ক্ষেত্রেতে ভালবাসতে বলে কোথাও যাই না পরাজয়ের। রাতের অন্ধকারে, জোৎস্নায় একটা মুখ, কিন্তু দিন স্মৃতি আমার সারা শরীরে বিষবিষ করে উঠতে থাকে। তারপর হঠাৎ আবেগে বৌদি সামনে মেলে ধরেছিল একটা খুটিনেল। বলেছিল — দেখ এই আমার অভিশপ্ত খুটিটিক।

সাদা দেখেছিল, সেখানে জমানো অনেকগুলি ঝিনুকের হার, আলপিন বাস, ট্রেনের টিকিট, টুকরো চিঠিপত্র। কত কি। সব আলার স্মৃতি। একটা সাদার যেন গলাকে আছে খুটিকেলের মূক অন্ধকারে। সেখানে সাদার প্রাণভোমরা এমন সযত্নলালিত।

সাদাও আবেগে কেমন ঝিকে উঠেছিল। কিছু বলতে চাইছিল সাদা। তাকে বলবার অবসর না দিয়ে বৌদি বলে চলল — তোমায় বলতে চাই সাদা। বাধা দিও না বলা শেষ হতে। প্রথমে ভেবেছিলাম ওঁর স্মৃতি নিয়েই কাটিয়ে দেব বাকী জীবন। কিন্তু এত একা থাকা খুব কষ্টের। পৃথিবীতে একটা মানুষের অন্তিত্ব অন্তত পাশে প্রয়োজন বেঁচে থাকতে। জীবনযাপনের এটা একটা আদিমতম শর্ত। তারপর অনেকক্ষণ নতুন স্বামীর প্রসঙ্গ করেছিল বৌদি। একসময় বলেছিল — আমি আসলে নেই সাদা। শুধু শরীরটাকে নিয়ে

পেতেছিল। এরকম খুব আপনজনকেই হয়। মনে হয় হয়ত লোকটাকে ঠকানোর এবারে। কিন্তু আমার এছাড়া কি বা করবার আছে বলো! বাড়ি ফেরবার পথে সারা রাস্তাটা বৌদির বলা কথাগুলো মনে পড়ছিল। রাস্তার পাশে ট্রলে দেওয়ার সময় বৌদি বলেছিল — তোমায় জোর করব না। মনে হলে আসবে। তোমাকে দেখলে তোমার দাদার জন্য টনটনে হয়।

ভাল একটা স্বপ্ন দেখতে দেখতে খুব জেগে গেলে যেমন স্বপ্ন আর বাস্তব গুলিয়ে যায়, তেমন এক বিচ্ছুত অভিজ্ঞতাতে সারা রাত হয়েছে সেদিন সারারাত।

এখন যেমন দীনার প্রতি অভিমানে চোখ ছলছল করে উঠল সারার। সেবার আকাশটা ফেটে গিয়ে একনাগাড় ঝোপ্পুর এসে পড়ল পুকুরে। সারা হঠাৎই লাফিয়ে পড়ল পুকুরের জলে। পুকুরের স্থির জল কেটে বয়ে যাচ্ছে শরীরে। তবুও সারা যেন একরকম তৃপ্তি পাচ্ছিল এই স্নানে।

আজ অফিসে এসেও স্বস্তি পেল না সারা। যা ভেবেছিল তাই হলো। অফিসে খুব কাজের পরিবেশ তৈরী হয়েছে ইতিমধ্যেই। নতুন অফিসার জয়েন করেছেন আজ। তিনি খুব কড়া মেজাজের মানুষ। যে কারণে একদম কাজ করে না কখনও, সারা অফিস মাতিয়ে রাখে যে হাসি আলোচনায় সেও আজ কাজের অছিলায় একবার কাঁচের সামনে মুখ নীচু করে বসে আছে। সারা কাছে ডেকে কিসসিস করে বলল— আগে চাকরিটা বাঁচাতে এসেছ। মিটে গিয়ে যাও। কথার অর্থটাই একটা হাসলো পালাপালি দিল সাহেবের নামে। মনটা বিষাদে ভরে গেল সারার। ফোনে টেবিলে কাজের পরিবেশ নেই। এই অবস্থাওয়াতেও আজ অনেক কর্মচারী এসেছে অফিসে।

সারা যখ ফেরে বসে থাকল নিজের চেয়ারে। আপনমনে বলল — আমার কেউ নেই, কিছু নেই। চারদিকের দেয়াল সারা ছবিটা যেন আরও প্রতিবিম্বিত হয়ে আসছে। এই ছবির সারা, বাইরে ঘরে যাওয়া আসা হাওয়া, রাস্তায় চলমান জনস্রোত এসব। আর আয়নার সামনে সে একদম একা। হঠাৎ শিরদাঁড়া কাঁপিয়ে কান্নাদের ঢেউ উঠে এল। মনে হল, সবকিছু চলবে আগেকার মতো। কেবল সেই থাকবে না। পড়ে থাকবে শূন্য আসন। সেখানে প্রতিবিম্বিত হবে কত নতুন নতুন মুখগুলো জলছবি। অনামিন হলে সারাও এতক্ষণে উটছু হয়ে যেতে বসত। কিন্তু আজ পাশুটে সাহেব থাকতেও একটুও ভয় হল না। কি মনে করে বাগ খুলিয়ে বেরিয়ে পড়ল সে। বাইরের জনস্রোত তাকে নিয়ে নিল। সারা নায়াগিন অহেতুক ঘুরল নানা জায়গায়। হিস্টোরিয়ার মাঠে শুয়ে রইল অনেকক্ষণ। একটা সিনেমা হলে গিয়ে অর্ধেক সিনেমা দেখে উঠে এল। সন্ধ্যা হতে একনজর বাড়ির দিকেই রওনা হল সারা। নিজের বাড়ির ব্যালকনিটা তাকে খুব টানছে আজ। যখানে হয়ত কিছুটা অন্ধ পেতে পারে সে।

একটা ঘুমকুম এই শীতে বাড়ির গোটের কাছটায় ঘুমঘুমি পাখিদের ওড়ে আছে। সারার পায়ের শব্দে একটু সরে গেল। বাড়িতে সেই একই দৃশ্য। বাড়ির মোরা অন্ধকারে ঘুমিয়ে আছে। এই জনমিনে গেটে অপেক্ষা করে নেই সারার জন্য। আরাম পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। টাদের আলোর তাদের বাড়িটা অতীন শোয়ে পরিত্র মতো লাগছে। মায়ের ঘরে গাইট জ্বলছিল কেবল। সারা এসে দাঁড়াতে সমবনয়ের বাড়িতে আজ জানেন কি এসে বসছা খুলল। মা খাটে বালিশে হেলান দিয়ে বসে আছে। তার ইাপানির টানটা নিশ্চয় বেড়েছে আবার। মহিলা বলল — সারারাতই প্রায় ঘরে আছে একনাগাড়ে। ডাক্তার ডেকে এনেছিলাম আমি। তিনি এসে ওষুধ দিয়েছেন। বেশ্বয় ঘুমুচ্ছে। সারা দেখল, কেমন হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছে মা। আধখোলা চোখে ঘুমন্ত মাকে এই মুহূর্তে কেমন অসহায় লাগছে। সারা আর দাঁড়াতে পারল না। বলল — মা ঘুমোচ্ছে ঘুমোক। ঝড়াঝড়ি হলে ডেকো আমাকে। তারপর কি মনে করে আবার বলল — আমার জন্য চায়ে করে রাখবার প্রয়োজন নেই। খেয়ে এসেছি আমি। কথাটা বলে ঘর সিঁড়ি টপকে উপরে এল সারা। জানে, পাটি পর্যন্ত ছড়ল না। ঘরের আলো জ্বালাতে ইচ্ছা হল না। প্রথম অন্ধকারে নিজেকে হারাতে পাশ্চা খোলার এগিয়ে গিল।

এখন পরিবেশ দেখে বোঝার উপায় নেই কেমন ভেঙ্গে গিয়েছিল গোটা দিন। শুক্লপক্ষের পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাতে হবে হয়ত। টাদের আলো পড়ে ব্যালকনিটাকে কেমন অলৌকিক করে তুলেছে। সারা মেঝেনায় ছায়া ছায়া পদচারণা। একটা চেয়ারটেনে উঠে এসে বসল সামনের গাছে। টাদের আলোর বিলোয় জল, গাছপালার

আকাশ মুহূর্তের মধ্যে কেমন বিষণ্ণ অন্ধকারে হয়ে যাচ্ছে। বড় ইনি নারীর মতো। একটা দুরন্ত তরঙ্গ হাতে যাওয়া প্রস্তরমূর্তির যেন ক্রমশঃ তলিয়ে যাচ্ছে সত্তা। চারপাশে প্রাগৈতিহাসিক অস্তিত্ব নিয়ে গাছপালা, প্রস্তরখণ্ড নিঃশব্দ নিস্তব্ধতায় চুপ আছে। আর আমার এতদিনকার বিলাসিতা ভরে গড়ে তোলা মৃদুতাগুলো, মস্তিষ্কের কোষে কোষে অনাবশ্যক জড়তাগুলো কিছুই ঝড়ঝঞ্ঝা নিয়ে তার বন্ধ্যা যেন মিলে মিশিয়ে একাকার, ভাসাভাসি এক আদিম গহ্বরে। অন্ধকার থেকে অন্ধকার যেন নিঃশীতলতায়। এমন সময় কার পদশব্দ উঠে এল বালকনিতে। ঘুরে উঠল একটা আবছা ছায়া। সাদা মূর্তিটাকে উঠল। সর্বশক্তি দিয়ে এবার চিৎকার করে উঠল — কে? কে ওখানে?

মুহূর্তেই আলো জ্বেলে দেওয়ার জন্য একে দাঁড়িয়েছে লীনা। তার পরনে ঘোরতর শোয়াক। সারায় দৃষ্টি যেমন ঘোলা ঘোলা। তার মাথার উপর কৃত্রিমতা ছায়া ফেলে রেখেছে। লীনা নিঃশব্দে বাড়িয়ে দিল সামনে। আমার মনে হল সে যেন মৃত্যুরই প্রতিচ্ছায়া। এমন পূর্ণাবয়বে আর যৌবনের মতো সাদা পোশাক।

আমার সমস্ত হাত ধরল লীনা। তেমন তরঙ্গ-হিম স্পর্শ। সেই স্পর্শের ভেতর দিয়ে শির শির করে নেমে গেল আমার শিরদাঁড়ায়। লীনা কিছু বলতে চাইল। কিন্তু তার আগেই অনেক শক্তি দিয়ে ওপাশের ঘরে লীনাকে প্রবল আলিঙ্গনে জড়াল আমি। বিলম্বিত কণ্ঠে শোনালো যেন — আমার বাঁচাও লীনা, আমি বাঁচতে চাই।

মোটামুটি

চঞ্চল চক্রবর্তী

কত্তা মোটা দিদি মুটি
সবাই বলেন তাকে ঝুটি ॥
সকলের কেনায় শেষের হাটে
কারেন তাঁরা ছোটাছুটি
জিজ্ঞেস করি কেমন আছেন ?
উত্তর দিলেন "মোটামুটি" ॥

সৌরভ

চঞ্চল চক্রবর্তী

Bat টি তার Gun
তার বলটি গোল গুলি
ভারতের গৌরব
গাঙ্গুলী সৌরভ Ganguly
অনেক আছে Record তাঁর
একটি হলো Man of the Match
তিনি Batting করেন যখন তিনি Catch
ধরা যখন পড়ে যাওয়ান Bat এক বলে
Dona Didi Stage
নৃত্যেরই তালে ॥

কাবুলি ছড়া

অনিতাভ চৌধুরী

(১)
এলাহা দিন পাল্টেন,
ফন্দিফিকির আঁটেন।
তালিবানের তালি,
মুখে দিল কালি –
আমেরিকা জাগেন।

(২)
মাথলো প্রেমের টুপি,
জর্জ (বিশ্ব) বুশ।
শান্তিকুমনের মাথায় হাত,
ঘোমাবনাত কাপ।

(৩)
আমেরিকা ক্রুদ্ধ,
লাগে-লাগে যুদ্ধ।
ঘেরে ঘেরে ভোঁতা পড়েন
রাদিয়ানের বুদ্ধ।

চুরি বিদ্যে মহাবিদ্যে

সুতপা গোপাল

ক্লাস এখন একটু শুরু হয়েছে। সোনালদার আসেনি সে। নাহলে সে অবশ্যই আর একজন সোনালদাকে তার কাছাকাছি। সোনালদাই তাকে এই অদ্ভুত নামটি দিয়েছিল এবং একমাত্র তিনি ই নামে ডেকে থাকেন তাঁর নাতনিটিকে।

সোনালদা বড় করে দুবুড়ি এবছরের নাতনির জন্মদিনে নেটবাস উপহার করেন। তাঁর নাতনি ফরেস্ট ডালে যেন্দী বেড়িয়ে এটি ডালভোই সোনালদার ভাল লাগে।

ক্লেমিটি ছিল বৃষ্টি কাল দিন। প্রায় সারাদিন ধরে টিপটিপ করে বর্ষাকালীর কবরুর পক্ষ। যেন মেঘ ধরেছে কবির কীকন বাজনো তাদের তাহাকে দুটি বর্ষামেঘের দূরত্ব ধ্বনি।

কবির তা দুবুড়ির হাত ধরে নিয়ে গেল। সোনালদু নাতনির ফলের হল খাওয়া দেখবেন। ছোট্ট নাতনির চলাফেরার সাথে আজ মানুষ বুড়ো দুবুড়ি হয়ে উঠলেন। নাতনি নিজে হাতে ধরে ফলের রস খেতে শিখে গেছে।

সোনালদু কোন্ড ড্রিংকস খাবার একটি প্লাইস কবির ফলের রসের বাটিতে ভরে নিয়ে নাতনির সাথে চুমুকুক পক্ষ তুলে রস পান করে চলেছেন।

ছোট্ট বছরের কবির সেকি আনন্দ। খুশিতে ঘুটঘুটে দুটি কবি ভাসল। সে ভাবছে এক মুক্তার খেলা।

কিন্তু ছোটদিনের সমাজের মর্মবেদনে ধরা পড়ছে না তার ছোট্ট দাদুভাইয়ের চুরি বিদ্যে মহাবিদ্যেটা।

দেখিনি তোমার মতো

তাপসী লিংহ

দেখেছি অনেক দুটি চোখ,
আর দেখেছি গোলাপ কত।
দেখেছি অনেক সুখরী,
তবে দেখিনি তোমার মতো।।
নিখল হাতে দেখিনি আমি
আমার প্রেমের পাখি,
দেখিয়েছে যা তুমুই তোমার
সুখর দুটি আঁখি।।
যে আনন্দ পাইনি আমি
রঙিন রস দেখে,
তাই পেয়েছি তোমার পাওয়ায়
মিষ্টি ক্ষণ চোখে।।
সাগরের নীল আমার মনে
জাগায়নি কোনো সাড়া।
তোমার নীল শাড়ি আমায়
করেছে দিশাহারা।।
দেখিনি যেমন কিছুই আমি
কালো চোখের মায়ে।
তোমার কালো কেশে আমার
চোখ ধাঁধিয়ে গেছে।।
তোমার আপেল মত রহস্য ভরে
নতুন ঢোকা মুখ,
তবু তোমায় ভালো লাগে
তোমার কানের দুল।।
কথায় কথায় দুইপুলি ধরা
কত না ভালোবাসি,
তবু তোমায় ভালোবাসি তোমার,
ঠোঁটের মিষ্টি হাসি।।
কথাদুটি ছিলেম আমি
অনেক বড় ধীর।
কিন্তু তোমার কুরুর খুকু,
মেরেছে আমায় তীর
তুমি মুখর আমীর ঘর,
আঁকো আমায় কল্পনাতে।
এতদিনেই হাঁপিয়ে যাবে তোমার,
পারব না যে হারাতে।।

কবিতা বিষয়ক

বীথি চট্টোপাধ্যায়

প্রেমের কবিতা লেখা বাকি কত বেলা ?
এত কবিতাতেও বুঝিবা ধরা যায় নেই
চট করে এরা জনপ্রিয়তা চায়
ছড়িল জীবনে এদের ছন্দ সোজা

এছাড়াও এরা তীব্র অনাধুনিক
আলোকের সুখে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলে
সবে যেপথ চলিল অতীতে,
এরা কি পড়েনি বেদনা যা পথাতিক ?

আমি কী করব এবার তুমিই বলো ?
অন্ধকারে বুকে যেদিন তোমার ঠোঁট
কোমরে জড়ানো দুখর নিপুণ হাত
কানে টেনে নিয়ে চোখে বলেছিলে চলো।

এই কথাগুলো খোলাখুলিভাবে লিখি
তোমার চুমুতে শিল্প জানতে চাই
পড়ি না সুন্দর ভাষে এমন কি আছি
তোমার নাম্বিতে শারীরিক ভাষা লিখি -

এ লেখায় আমাকে নিয়েই যবে
ছিঁড়ের ভাষায় প্রাণাত্মিক প্রিয় ঝুঁকি
অথচ সবাই জানবে মেয়েটা ছেলে
পাঠক ঐকায় কবিতা লিখল তবে ?

রসে ভাজা স্বদেশী ছড়া

শ্রী ভরদ্বাজ হালুইকর

রসেভাজা - স্বদেশী ছড়া
নোনতা মিঠে রয়ে করা -
ছোলে বুড়োর সবার ছড়া
ঠাঁসল সত্তা নাম !
হয়েছি আজ
হালুইকর ভরদ্বাজ -
স্মৃতিভ্রংশ ভুলে গেছি
পিতৃদত্ত নাম ॥

স্মার্টফোন

মানুষে ভাল, হায় রে খবর
বুটিশ বড় বুদ্ধিমান।
কুইট ইণ্ডিয়া
স্বাধীনতা - !
ভারতবর্ষ - পাকিস্তান ॥

বৃদ্ধাশ্রমে "মা"

বৃদ্ধাশ্রমে "মা" - রয়েছেন
বড় দুঃখে মরি
পুজো আসছে বসে বসে
টাকার হিসেব করি।
ঘটি - ছেলের পাড়ি জমা
হাজার টাকা দাম !
দশমীতে বৃদ্ধাশ্রমে
'মা' কে প্রণাম !

মাথায় হাত

বাজার থেকে মাল এনেছি
মোট কতটি বাটা -
সাতষট্টি-সুতরে বটি আছে
বটি বাজারের পাঁঠা।
পকেটস্থ অমৃতভাণ্ডে -
চারকড়ি ভাত
বটি হয়েছি ঘষছে গতরে
ঘরনীর মাথায় হাত।

পেটি ও বটি

ভাইটামিন সন্ধেতে আয়
মন্ত্র পড়েন ওঁ ঘাম ওঁ ঘাম
বটি এনেছেন আয় আয়।
বটিছে কতাল 'বাপ্' 'আয়' -
ঘরে-দোরে পেটি করেছেন
লাগল ভাইটামিন নিত্য খায়।

ঘুপ-কাটির বই

হাজার রকম ঘুপের ভাটি
বলা কেমন পরিপাটি
কোনটি নকল কোনটি খাঁটি
বোঝার উপায় কই ?
যে প্রকাশক ছাপিয়ে দাও
ভাল ঘুপের বই।

ডাক

বিষ্ণেন্দু পালিত

কার কণ্ঠস্বর শুনে এক রাতে পাশ ফিরলে তুমি,
মনে কি হচ্ছে জেনো, আগেও দেখেছ তার মুখ থেকে কাছে!
সুতরাং জেগে ওঠো, অবিশ্বাসী হাত রাখো ঠোঁটে ;
কারও কি চুম্বন ছিল, ভুল সম্বোধন, ফিরে পাওয়া
নিঃশ্বাসের স্পর্শ পেয়ে ছড়িয়েছে স্মৃতির স্মৃতিতে !

এখন অন্ধকারে মশারিও নিরাপত্তা সন্ধানে;
যেন এরকমই হবে, কেউ ঘুমে কেউ জেগে উঠে
নিজের একান্তে খুব চুপচাপ হেঁটে যাবে দরজার দিকে

কণ্ঠস্বরের জন্য ঘুরে আসছে এই প্রস্তাবও।

ভিখারিকে নিয়ে

অনিতাভ দাশগুপ্ত

ভিখারি কি ছবি আঁকে ? সারাদিনকাল গান শোনে ?
যায় এক্সেলোমে ?
তার কাছে পার্টি আসে ? কলকাতা পুরসভা আসে ?
না কি সে হেলেদুলে বসে জলে ভেজে,
কষ্ট পায়, কষ্ট পেতে পেতে ঘুমে ঢলে পড়ে
ধুলো ও পাথরে

কাঙ্গালা খুশি কি যাতে
এই ভিখারির দুঃখে
গলে যদি ভুলক্রমে লিখে ফেলি একটি স্তবক —
আমার কলমে কৃষ্ণ হোক।

গল্প

জীবনের পথে পথে

অজিত মণ্ডল

শীতের সন্ধ্যেবেলা। ভারী কনকনে হাওয়া বইছে। ট্রেনটা সেলামপুর স্টেশনে ঢুকে পড়ল। জোখা থেকে এক ঝাঁক ছুটির যাত্রী নামল। ভিড়ভাট্টা। ট্রেনের একটা জানলা ঘেঁষে ঠেলাঠেলি শুরু করে দেয়। পাসেঞ্জার আর কুলিদের মিলে রীতিমতো কুস্তি শুরু হল। টেনাহেঁচড়ে ইইইই আরও জমে উঠল, তখন আর একটি ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে, তীব্র হুইসেল বাজিয়ে।

তীরন্দাজ বাঙ্কা-বাক্সির ভেতরে কিংশুক রায়কে নিয়ে নবেন্দু যখন ট্রেনগাড়ির ভেতরের আসর থেকে বেরিয়ে এল, তার সঙ্গের বন্দুকটি তুলে এনেছিলো, পাঞ্জাবির বুক থেকে ঝরিয়ে পড়ছে মুখভর্তি পানের রস।

রায়ের হাতের বন্দুক টিন টিন করছিল। নবেন্দুর পরনে খাকির হাফ প্যান্ট ও হাফহাতা টি-শার্ট। মুখোশটা মুখখানা থেকে টিক টিক করছে।

অল্পেতেই ফাঁকা জায়গায় এসে নবেন্দু হাঁফ ছাড়ে। রায়ও হাত ছাড়িয়ে নেয়। সেই সময় নবেন্দুর ড্রাইভার বেণু হেসেই ফেলল যে। নবেন্দু চুলটুল ঠিক করে নিয়ে রায়ের দিকে চেয়ে ভারাক্রান্তির হাসি হাসে।

— ভুবনি, এর নাম কলকাতা। পোকামাকড়ের মতো কিলবিল করছে মানুষ। এই ভিড়ে টার্গেট হারি আর খুঁজে পাওয়া যাবেনি।

এবার রায়ই নবেন্দুর হাতটা শক্ত করে ধরে। তীক্ষ্ণ চোখে পায়ে পা লাগিয়ে ঘুরজন স্টেশন চত্বর থেকে বেরিয়ে এল।

অন্ধকার শেষ। বেলা আটটাতেও সকলের গায়ে গরম পোশাক। রায়ের গায়ে খুটো জামা আর একটা পাতলা চাদর। কলকাতার শীত তার কাছে শীতই মনে হয় না। এ সময় সংগ্রামপুরে ভোরের হাড়িয়ে

অন্যদিনের দুপুরেও ঠিক ঠিক করে কেঁপেছে। কিছুদিন ধরে টিনুরের হাতখরচ কাপটা নিজের সারা প্রাণটায় টানছে। তুলনায় কলকাতার শীত শীতই নয়। তবু সবার গায়ে ভারি গরম। শোনার চোখদুটো দেখতে তারও শীত করতে লাগল।

সেদিন থেকে মহাত্মা গান্ধী রোডের ফুটপাতে ঘরে চলা শুরু। মনোজ ইচ্ছে করেই ট্রামে-বাসে ওঠেনি। পকেটমার টিনে হাত দরকার। রাত্নুকে ঘরে রেখে হাজরা, পার্ক, নিউমার্কেট, বাজার দেখিয়ে তার নাম বলে দেয় যাতে প্রয়োজন বলে নিজে নিজেই চলাফেরা করতে পারে।

রাত্নুর মুখে রা নেই। দু-চোখ ভরে কেবল দেখেই যাচ্ছে। মনোজদার কথা তার কানে ঢুকছে, মাথায় নাড়ছে, কিন্তু অনেক কথা ভেতরে ঢুকছে না। সে কেবল চারপাশের গাড়ি বাড়ি দোকান আর পাশেপাশের উপচে পড়া গাড়ির চলাচল দেখছিল মুগ্ধ ভরে। এত বিস্ময় যে তার জীবনে অপেক্ষা করছিল, একথা সে ঘুণাক্ষরেও জানেনি।

মনোজ তাড়া দেয় —চা করে কি দেরি হচ্ছে রে, চল্ চল্।

— মনোজকাকা এতো অদ্ভুত! রাত্নু ফিস ফিস করে বলে।

— কত বড় শহর জানিস? সাতজন, তারপর সঙ্গে বেশি ভাব করবিনে। কখন খুনসুটি মে-ভাবে টৈরব পাবিনি। দুষ্কাই, দিল্লী, মাদ্রাজ তখন রাত্নুর চোখে গাড়ির মুখ আর দেখাই হচ্ছিল না। ছেলে বয়স পাড়াগাঁয় পড়ে থাকে। তাই পা ছোট্ট বোঝা করে ভিতরে বসিয়ে রেখে চোখের পলক ফেলে ওদিকে।

রাত্নুর পা সিক সিক করে ওঠে। কলকাতাকে মনে হয় রাক্ষসপুরী। হাজরিমে অঞ্জনা নিশ্চয় খীর পেরে আছে। তবু কত কী যে দেখার পলক ছড়িয়ে আছে চারপাশে। তাকে টানা গাড়ি চলছে পাশ দেয়ে। সন্ধ্যাপুরে ইস্কুলে পড়ার সময় শুনেছে পাতাল রেলের কথা, চলন্তসিঁড়ির কথা। সেসব যদি বলি কাউকে বিশ্বেস করবে না, ভাববে এত আজা মিথ্যেয়। একবারেই তো থাকতে হবে, মোকদমে যত-এর কাজ করতে হবে। তাতে অনেক সময়।

প্রাথমিকী এক ইস্কুলে ক্লাস নাইনের ছাত্র ছিল এই সেদিনও। প্রথম দুজনের মধ্যে তার স্থান। অঙ্ক-সিক্সানে ফলাফল প্রথম হয়েছে। এগমিনেই ঠি. তারপর বাঁই-পাড়ার শিক্ষকরাই সাহায্য করে দিতেন। একদিন এই কলকাতার কোনো কলেজে পড়বে স্বপ্ন দেখতো। হঠাৎ সব ওলোটপালোট হয়ে গেল। সংসারের একমাত্র অবলম্বন বাবা স্ট্রোকে মারা গেলেন। সালসা বুদ্ধিমে বাবী জমিতে সারা বছরের খোরাকীও হবেনা। বাজার ছিল এক মহাজনী খোলসের খুদকুঁড়ি অন্ন। খাতা লেখা, হিসেব রাখা, খাতকের বাড়িতে তাগাদা করা। সাতকড়ি মোটামুটি চলে যেত। বাবার মৃত্যুতে সংসারে অন্ধকার নেমে এল। ছোটবাবী, এক বিধি আর মা নিয়ে ছোট্ট সংসার হলেও এই বাজারে খরচ চালানো যে কত কঠিন, তা প্রথমে বুঝিনি মনে মনেই তারা হাতড়ে হাতড়ে টের পেয়েছে। প্রথম প্রথম বাবার মহাজনী-জাতিক খাদ প্রতিবেশীরা কিছু কিছু সাহায্য করেছে। সে নিজেও ইস্কুলে যাওয়া কমিয়ে দিলেও একেবারে বন্ধ করেনি। কিন্তু ভাঁড়ারে টান পড়তেই বুঝতে পারল, মোদ্দা উপায় নেই, তাকে মোকদমের কাজ করতেই হবে।

ছেলের ইস্কুলে পড়াশুনো বন্ধ হয়ে যাবে ভেবে মা কাঁদল অনেক। তার পীড়াপীড়িতে রাত্নু হাত-পকাইয়ের চরণ হরিপদ ঘোষের কাছে গিয়েছিল। জমাদারীর হরিপদকে গ্রামের অনেকেই ভয়ের রাত্নু মানা করে থাকে।

হরিপদ এক সময় পরিষদ প্রতিনিধি ছাড়ী ছিল। চরণ হরণের পর এখন চাকরিতে বাড়াবাড়ন্ত। তবে জনদরদী মনোভাব পরিচিতি। প্রথমে রাত্নুকে পরামর্শ দিল মিটিং-এ মিছিলে নিয়মিতো পরিচয় হবে। তার অনেকদিনের সাথ ইস্কুলের সেক্রেটারী হবারও। রাজনৈতিক পালপরামর্শ করে ঠিক হয়েছে বর্তমান প্রধান শিক্ষকটিকে আগে তাড়াতে হবে। লোকটা প্রতিক্রিয়াশীল। সুতরাং ছেলেদের মধ্যে গোপন আন্দোলন গড়ে তুলতে কিন্তু যথাযথী ছাত্র লাগানো হল। হরিপদ রাত্নুকে এই আন্দোলনে সক্রিয় হতে বলল।

হরিপদর কাছে অবশ্য কিছুই মেলেনি. শুধু ভবিষ্যতের আশায় এই প্রথম রাজনীতির বিশ্লেষণের ভাষায় পা বাড়ানোর দুঃসাহস তার হয়নি। সংসারের বোঝা তাকে টানতেই হবে, পড়াশুনোর চেয়ে এখন এটাই একমাত্র জরুরী কাজ।

রাত্নু ট্রামের ছাদ দেখতে দেখতে চাকা পার হচ্ছিল। একটা জল স্রোত ঘাড়ের ওপর এসে ঝেঁক করল। রাত্নুর ঘাড় ধরে দাঁড়কা

টাকা হারাল নবেন্দু। বাসের হ্যান্ডিলার ধরাধরি করে তাকে নিয়ে চলে গেল।

— আহা একটুনি হলেই তলায় যেতিস। এখন কত দেখবি, বেঁচে থাকলে?

— বড় চোট পেয়েছে বলেন কলে, জল খাব।

— নাও। এই টুকুন বেঁচেই গেছ। একি গাঁ গেরাম, কল চাইলি জল? চল চল দোকুর ঘড়ি দেখি ডাক্তার কখন আসবে ঘরে বসে। এই সোজা হাঁটলি বড়বাজার, তারপর ডিংপুর যেতে বাঁয়ে সোজা অরবিন্দোটোলা কেনারামবাবুর বিশালবাড়িটা বিরাট ডাক্তার। তীষণ রাশী মানু, দুটলি। কথা শুনে চলবি। কখন কি বলবে শুনবি। কপালদার না করবিনে।

নবেন কাকার মুখের দিকে তাকিয়ে তার কথা শুনতে শুনতে রাস্তা পথ চলতে থাকে। পঞ্চাশটী কদমেরও সঙ্গে ঝাঁকুনি লাগে। হাতের বাঁধন ঢাকে একটা পাটি, একটা জামা, একখানা গামছা আর নিচে পাটলিন একটা ছোট পুঁটলি। তার মা পুঁটলিটা খলের মধ্যে ঢুকিয়ে বলেছিল, বিয়ে খেয়ে খাস মামা।

বাজারের পা ঠেকল। ওরা এখন ডিংপুর ঢোকে পড়েছে। মানু কিছুতেই তাল রাখতে পারছে না। মাঝে মাঝে নিছিয়ে পড়ছে। হাঁটা, বলি তাদের পাঁয়ের জন্তা হচ্ছ, দেখিয়ে দিয়ে হাঁটা কাকে বলে।

নবেন ভাবছে অন্য কথা। কারখানার থেকে একটু লেট হলেই। পঞ্চাশের আগে ঘরে না ফিরতে পারলে হাজিরার পেয়ালে কড় আসে হয়। উপায় নেই। মানুকে কেনারামবাবুর কাছে রেখেই সোজা চিত্তরঞ্জন রোড কারখানার ছুটতে হবে। দুপুরের খাওয়া ওখানে পরীক্ষা হোটেলেই। এখন ফেলে যাওয়া অসম্ভব।

নবেন আর একবার তাকাল মিল। ট্রাম স্টপেজে একটা ট্রাম দাঁড়াতেই মানুকে পেছনে টেনে নিয়ে মানুকে ট্রামে তুলে দিল, নিজেও উঠে পড়ল। তীষণ ভাজানা হয়ে নিয়ে মানু ট্রামে উঠল। একটা খালি সিট পেয়ে বসে পড়ল। তারে টানা ট্রামগাড়ী খট্ খট্ করে এগিয়ে চলায় ঠিক ঘোড়াগাড়ীর মতোই। ছুটে চলল দুপাশের বাড়ী দোকানপাট পেছনে ফেলে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে গন্তব্যে পৌঁছে গেল তারা।

ঘোড়ার উঠোনে। ভালই লাগছে মানুর। এরা একটা আলাদি মিষ্টির দোকানের কাছে এসে দাঁড়ায়। ছোট গলি আর বড় রাস্তার সংযোগস্থলে দোকান। দোকানের ঠোকাটে পা রাখতেই কড়ুরি ভরভরাতির গন্ধ পেল মানু।

কাশে বসে আছে দোকানের মালিক কেনারাম চক্রবর্তী। বড় নীল হাফশার্ট আর ধুতি পরনে। পান চিবুচ্ছে। নবেন মানুকে সঙ্গে করে সামনে দাঁড়ায়। পূর্ব নির্দেশমতো মানু কেনারামের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে। নবেন বিগলিত হেসে বলে —আমার প্রতিবেশী। ভয় নেই। বিধবা মা আর তিন ভাইবোনের সংসার। বড় কষ্টের সংসার। মা লোকের বাড়িতে কাজ করে। এর কথাই আপনাকে বলেছিলাম।

কেনারাম এ কুচকে মানুর দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকে। পরিবারের কাছ থেকে পয়সা নেয় বিদেশে কাজে। নবেনের কথার কোনো উত্তর দেয় না। নবেন আর মানু খালিকের মুখের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকে।

দোকানে বিক্রিবাটা বেশ ভালই। মিষ্টির সঙ্গে চায়েরও বন্দোবস্ত আছে। মানু অবাক হয়ে দেখতে থাকে। কয়েকজন বিক্রেতা, দুটো বেঞ্চির খদ্দেরও বসে আছে। তীষণ গরম করে, পাখা থেকে ভরভরানি খুটে পাচ্ছে। তবু মানুশ্রেণীর অধিকাংশের সংখ্যাই বেশী। কিন্তু দোকানঘরখানা মোটেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয়। দেওয়ালে পলেস্তারার চাঁ মরলা হয়ে গেছে, আরশোলার ডিমপাড়ার ঘুলো আর ঝুল জমেছে। একখানা লম্বা টেবিলের দুপাশে চারখানা করে চেয়ার, আর দুখানা আলাদা চারখাটি টেবিলের দুখানা চেয়ার। এছাড়া দোকানের বাইরে একখানা বেঞ্চ। এটা গরমের পরিচ্ছিন্ন, নিরমিতো গ্রাহকের অপেক্ষারত্নের জন্য।

মানু দেখল, তারই বয়সী একটি ছেলে সাফ করছে, জল দেওয়া, বাসনপত্র ধোয়ার কাজ করতে করতে হাঁপিয়ে উঠেছে। কারার পরিবেশনের কাজ করছে আর একজন। তার বয়সও মানুর থেকে খুব বেশী নয় কিন্তু চোখমুখ কক্ষ আর চ্যাঙা। পরনে খুতি, হাঁটুর ওপর তুলে সিঁট দিয়েছে, গায়ে তীষণ ময়লা গেঞ্জি। সে বেশ চটপটে।

কাজের দুটি ছেলেই মাঝে মাঝে মুখ তুলে মানুকে দেখছিল। ওদের তুলনায় মানুর শরীর, মন নরম ঘাসের। বুদ্ধির লক্ষণ অনেক বেশি। ছেলে দুটির চোখে বিস্ময় ও কৌতূহলের কণা ক্রমে সে সন্ধুচিত হয়ে পড়ল।

হঠাৎ এক ঝাপ্টায় টিনের চাল ঝন্‌ঝন্‌ করে ওঠে। কোনোদিনের বা কাদামেশানো মাটি গোঁজের জানলা থেকে শান দোকড়ায় ছোপ পাখা ঘর ঘর শীস দিয়ে উঠছে।

—এই শশী, এদিকের টেবিলটা মুছে দে। ঝাপ্টায় ঝড়তে চুকছে সব। ঘরটা ভেজে হয়েছে।

জোড়া শরিফা ছেলেটার শশীর ঘরমন ফাঁকে ঠেলিয়ে ঢুকে যায় — যাচ্ছি বাবু, এদিকের বাকা বেঞ্চগুলো তুলে ঘরে দেই। এক হাতে কালির আমলাতে।

—আরে হারামজাদা, কথা না বলে কাজ কর। এদিকে খদ্দের বসে আছে। টেবিলগুলো কি আপনি সাফ করবে?

শশীর বাবা নীরব থাকে তা—যাচ্ছি বাবু। বাকাগুলি নেব কেন।

বাবুর দুটো অবহেলার মতো চোখ ঘুরে ওঠে, তীক্ষ্ণ রাগে দুই ভুরুর মাঝখানটা কুঁচকে যায়। শশী একটা পরিষ্কার ন্যাকড়া নিয়ে টেবিলটা মুছতে থাকে। এটো নিয়ে এটো মোছা! শশীর মুছাতের ভালু আসা। আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে ঘাসার ঘসঘসে ঘা। তার জন্য পাউডার ভাজাকাল লাগান সোডা পড়েনি। শরীরের ঘামে ঘামে নাই, মরলা শুরু হয়ে আছে। টেবিল মুছতে মুছতে সে বিনর্ব নির্বিকারে চোখে কয়েকবার বাবুর দিকে তাকাল।

পাশের টেবিলে বয়স্ক টাকপড়া একজন খদ্দের কচুরি চিবুতে চিবুতে বলে ওঠে— ছোঃ ছোঃ ভিজেকাল পালটে গেছে মশাই, ছেলে আর। এখন কথায় কথায় কাজ আজ করেটে। কখন কি হবে। কি সরকার মশাই বলিয়ে।

কোনোদিন কথন — না সব মশাই, এখন চৌড়াসের লাই দিলে মাথায় ওঠে। লাল মইনে দিই। সেদিনের পাই পরন্ত ছাড় নেই। আজটা তল দিয়ে যায়। দেখুন দেখি, বাবুর মনে, আর ও বাটা প্রেট মুছে চা খাচ্ছে। এদিকটা তো দেখবি।

একজন কোনোদিনে মুখের কাছে ঘনে ছা খাচ্ছিল। পরনে আলোনেলে পাঞ্জাবী-পাজামা, কাঁধে মুগুপা ঝাটিদের সাইড ব্যাগ, চোখে ফোটোক্রোমাটিক লেন্সের চশমা, তার প্লেটের পাশে একটা পাটির মুখপত্র। পাকেট থেকে দামী সিগারেট বের করে ধরাতে ধরাতে বাবুর গলায় বলে উঠল— কী করবে বোসবী, ওর বিজটা তো দেখবেন মশাই। আপনার এতবড় দোকান, টেবিল মোছা প্লেটধোয়া তো একজনেই করছে দেখছি। ছেলে মানুষকে শুধু শুধু খরচা।

কোনোদিন মুখরচনির কথায় কোনো গুরুত্ব না দিয়ে বাবুর গলায় বলে উঠল - বাবুর বাবুর। এসব নিয়ে তো আপনাকে ভাবতে হবে না। যা ঘরে মুখরোচন কত বাবে কত চলে। আপনার তো আনন্দে কাজ হাতে শুধু মিষ্টি ধরতে।

শশী নীরবে টেবিল মুছে যায়। খোয়া টিনের প্লেটগুলো টেবিলের এপর ডাই করে রাখে। সে ইতিমধ্যে বাবুর মনে আরও কয়েকবার দৃষ্টি বিনিময় করেছে। বাবু ওর চোখের দিকে তাকিয়ে অসহায় বোধ করছিল। খুব ইচ্ছে করছে, ওর কাছে গিয়ে ওকে সান্ত্বনা করে। ওরই সমবয়সী, অথচ কত তফাৎ।

নগেন আর বাবু একটা কোণ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। কোনোদিন তখনও সম্বন্ধি জানালেনি। খদ্দেরের আসা যাওয়া করছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর অধৈর্য হয়ে নগেন অনুচ্চ স্বরে ডাকল — বাবু।

কোনোদিন এবার ঘাড় ফেরাল। বাবুকে আরেকবার আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে নিল। মাথার ছেঁড়া অমুল চুলিয়ে চুল টানতে থাকল। তারপর বাচনভঙ্গি ভালো বাবুকে জিজ্ঞেস করল — নাম কি।

— জী রাবণচন্দ্র রায়।

— হুঁ, তোর চাল নাম কি।

— রাবু।

— কি জাত।

— রাজবংশী।

কোনোদিন রাবুর দিকে তাকিয়ে থাকে। ঘুমাতে না পারার জন্যে জিজ্ঞেস করে — কি জাত বললি।

— রাজবংশী, হিন্দু।

— আরে হাঁড়া, আমি জাত জিজ্ঞেস করেছি। জাত মানে জানিস্‌নে — বামুন, কায়েত, বোষ্টম, শাক্ত, ইত্যি, ভোম।

— হজোতি ওগুলা জাতে কয় কর্তা, জাতে কি ভাত জোটে না? ঘড় ঘড় কালতে কালতে একজন অতিবৃদ্ধ খদ্দের বলে উঠল। সুযোগ বুঝে শশী পাটির মুখপত্র বগলে চেপে বেরিয়ে যেতে যেতে কুট করল — জাতের নামে বজ্জাতি।

নগেন বলে উঠল — বাবু ওরা ছাবল তিলি। হঠাৎ দাম মাথা ঠাণ্ডার

চোখমুখ গম্ভীর করে কোনোদিন বলল — দুই খদ্দেরকে জল দিবি, বাসন দিবি। যা, কাজে লেগে যা। হাঁ, খুটিলিটি ঝামেলা

প্রথমদিন ট্রেনটার মুখ ঘোরাচ্ছে। রাত্রু মোটা পুটলিটা কাঁধে নিয়ে দালানের একটা কোণে দাঁড়িয়ে আছে। কি করবে ভাবছে। নতুন জায়গা, নতুন পরিবেশ, তার ওপর খিদে আর ক্লান্তিতে চোখের পাতা জুড়ে আসছে। কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, সে আছে মহাসোরগোলে। অগত্যা দালানের সিমেন্টে ঢালা একটা থামের গায়ে হেলান দিয়ে রাত্রু বসে পড়ল। সে ভেবে কূল পায় না, কেমন মুশকিল এরা! তখন থেকে চলছে তবু, কোথায় যেন বিন্দুটি স্থানী হয় না।

ক্লান্তিতে দুচোখ জুড়ে আসে। হঠাৎ তীব্র চীৎকারে সে চমকে উঠল। কানের পাশে কী কী করছে।

— এই যে ছাটের মড়া, খোঁয়া দিলে চিৎ হয়ে রিয়েছে। সকালবিন একটু পড়ি নেই। সকাল থেকে রাত অবধি খিচিয়ে কাজ করাচ্ছে, করতে করতে হাড়মাস কালি হয়ে গেল, তার বিনিময়ে দুর্ভিক্ষ। আর জন্মে কি পাপ করেছিলুম গা! যমে ঘুমুচ্ছে গাচ্ছে, একটু মরণ তার ইচ্ছায় নেই, আর পেত্নীটাও করে গান ধরেছে ভরদুপুরে।

এক নিশ্বাসে কথাগুলো শেষ করে একজন প্রৌঢ়াবয়সী স্ত্রীলোক জলজ্যান্ত পেত্নীদের ভলদিটা বারান্দায় ঝাড়ল। রাত্রু থামের আড়ালে থেকে ভয়ে ভয়ে উঁকি মারল। স্ত্রীলোকটির বিশাল বপু, চারদিকে থাক থাক চর্বি। কোমরে জিন্সে পাড়ি জড়ানো, প্রায় হাঁটুর কাছে উঠেছে। বড় বড় থামের মতো পা, আলাদা পায়ের পাতা। রাত্রু ভয়ে সিঁটিয়ে থাকে। অতিবিশাল থামের আড়ালে তাকে সহজে চোখে পড়বে না।

কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে স্ত্রীলোকটি আপন ভাবেই মুখ হয়ে যায়। সে উঠে বসে। নির্বিকার ভাবে আড়মোড়া ভাঙল। একটু লজ্জিত হয়ে বলল — তোমার ট্রেনটেন কি আছে?

— না আমার না। কটা বাজে মাঁ? এখন একখানা সিগে আমাকে কেরাপ করো। তারপর এটো সবগুলি দালানের বারান্দায় তো আমাকেই করতে হবে, এই মিনেসগুলোর জিম্মে।

— আহা, সে জানো ও রাত্রুকে এনেছি।

— কি? সে কোন জন্তু?

পৃথুল শরীরটা দুপাক ঘুরিয়ে যত্ন করে মার্বেলের মতো চোখ নিয়ে চারদিকে তাকায়। জন্তুটিকে না দেখতে পেয়ে ধমকের সুর — গাঁজার নাথ্যিটা খেয়েছে, ঘুড়ো জ্বাল।

কোনোরাম এবার সমস্বরালে চিৎকার করে ওঠে — গাজরটায় তো শোকা পড়েছে, চোখ দুটোও গেছে? না চিৎকারে নাথ খালি ছেলেটা কোথায় গেল।

— কি আবার পরের নিয়ে খেঁটা হচ্ছে, খাঁড়া কে খেতে পায় দেখি, মুখে ছাই দেব নিশ্চয় .....

রাত্রু এবার আত্মগোপন না করে পারল না। থামের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে তাদের কাছে এসে দাঁড়ায়। চোখ দুটো একসঙ্গে করে স্থূলকায়ীর দিকে তাকিয়েই নিচু করল।

কোনোরাম পৃথিবী একটু অন্ধকার হয়ে গেল। হঠাৎ কেন আলো নক্ষত্রচ্যুত হয়ে গেল। তার উন্মুক্ত বুকের ওপর বালতিটা টেনে নিয়ে কিছুক্ষণ চোখ বুঁজে নিজেকে ভরে।

— অ, এটি কর্তাদের জন্য। এই ছোঁড়া নাম কি?

— রাত্রুরাম

— তা মলো, গলায় তাবিজও নেই যে।

রাত্রুর গলা আরো আর ক্লান্তিতে ঝাঁঝালোভাবে শোনায়। তীব্রতা আরো বাড়ে যায়।

কোনোরাম হঠাৎ খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ল। চটপট জামাকাপড় খুলে কোনো কোনো আজকের শাড়িটা বের করে। গামছা তাকে নিয়ে রাত্রুকে তাড়া দিল — চলবে অনেক বেলা হল, চান করে আসি।

এখন গঙ্গা টইটুম্বুর। ভরা জোয়ার। গঙ্গার এদিকটায় ঘুটঘুটি শশ্মান, ছোটবড় অনেকগুলো দেবদেউল। ঘাটে জোয়ারের ঢেউ লাগছে। ঘোরে ফেরে যাচ্ছে ফুল ফেলাফলা শোড়াকাঠি, সেইসঙ্গে অজানা তীর থেকে ছড়িয়ে পড়া নতুন কড়ুমিশনা। কলকাতা ও আশপাশের যাবতীয় বর্জ্য এই শশ্মিত তথাকথিনীর স্রোতে মিশে যায়। স্থানে স্থানে পলিস্তরে সেগুলো জমা হয়ে তীরের অবয়বগুলো বিলম্বিত করে দেয়।

এই ঘাটটা বেশ বড়। দুদিকে ঘুটঘুটি শিলাখণ্ড ঘটিয়ে ছায়া বিস্তার করে আছে। পাশ ঘেঁষানো ঘাটের সিঁড়িগুলিও বেশ লম্বা। কোনোরাম একটা ছোট শিশি থেকে সরষের তেল নিয়ে প্রচুর পরিমাণে কানে নাকে এবং নাভিদেশে মেখেছিল, অবশিষ্ট নিয়ে থাবড়াতে থাবড়াতে এগোচ্ছিল।

রাত্রু অবাক হয়ে পিছন দেখছিল। কোনো সিঁড়ির পাশেরগুলির নিচে জল ঢোকেনি বড়

কাল এগারো ওপার করছে। বড় বড় কয়েকটা নৌকো ও ছেলে ডিঙি অনুকূল বাতাসে পাল তুলে চলেছে। অন্যান্য সময়ের ঘাটে পড়ন্ত দুপুরেও কিছু নারীপুরুষের ভীড়। বাসুর সমবয়সী কয়েকটা ছেলে তখনো মাতামাতি করছে। তারা ঘটি ছাড়িয়ে গাঙের মেটে স্রোতের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। কেউ কেউ চলন্ত শিমারের গায়ে বাঁকা টাঙ্গির ধরে ঝুলছে।

গাঙের এই চওড়া বুক, মোহনাসদৃশ, তবু মনে হয় এখানে দুই তীরের দূরত্ব বড় বড়ি মিল জায়গার চাইতে বেঁধে গেলছে। তাদের গ্রামেও নদী আছে। বাড়ি থেকে একটু দূরে সেই নদী। তার জল ঘোলা। স্রোতের ভাটার স্রোত বড়। কিন্তু সে বড় ভয়ংকর, তাতে জল করা যায় না। জলে কামট কুমীর। সেখানে শিমার লঞ্চ এত ঘন ঘন জলে ঢেউ তোলে না। দু তীরে বাঁধানো ঘাট নেই, মিল কারখানা জমজমাটও নেই।

বাসু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল বিস্ময়ভরা চোখে। কেনারামের ডাকে সম্বিত ফিরে এল — কি দেখিস হাঁ করে! চল আছে যে তাড়াতাড়ি। সাবধান, বেশি জলে নামিস নে। পাঁতার জানিস তো?

বাসু ঘাড় নাড়ে। আস্তে আস্তে নেমে যায়। হাঁটু জলে এসে পড়ে। কিছুক্ষণ যায় আর একটু। তারপর খাটের কাছেই একটুখানি পাঁতার কেটে নেয়। কেনারাম যায় বুঝতে পারে।

কেনারাম ডোঙার জলে দাঁড়িয়ে জলপান দেয়ে উঠল। একেবারে তেলচিটে একখিলি আয়নায় নিজ দাঁত খৈয়েরি দিয়ে মাজতে মাজতে মুখ ঘুরিয়ে দেখে নিয়ে বাসুকে ডাকা দেয়। পেছনের ছোট ঘাটিতে জল ছয়ে ঘটি সজোরে বিসর্জনিয়ে ডুবে গেল।

— ওক্কোথি কে হয় তোর?

বাসু ওপরদিকে দিকে তাকায়। তাদের টিন ছোঁয়ানড়ির ঝুপড়ি ঢাকা মুখখানার মধ্যে চোখদুটো প্রায় দেখাই যায় না। পরনের শরিষ মতো ঠেকায়। মুটো ঠোঁট প্রসারিত, দেখে বুঝতে হয় লোকটি খিঁচিখিঁচি হাসছে।

বাসু ঘাড় নাড়ল — এবার জোরে ডাক ছাড়।

— কতদিন হল? নতুন মনে হচ্ছে যেন।

বাসু আবার ঘাড় নাড়ল — আজই এসেছি।

— তাই বলো চাঁদ। ডাকেতি বিদ্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে?

বাসু এবার উত্তর দিল না। তার চোখের সামনে একজন প্রৌঢ়লোকের ছবি ভেসে উঠল। বিশাল চেহারা। পর্বতে বপুর ওপর একটা নরকঙ্কাল পাতলা, খাদের মতো মুটো পা। এক ভাল চর্বির ঢাকা মুখখানায় মুটো ছোট ছোট চোখ। মাথার চুল একদম নেই বললেই হয়।

— কত দেখে, কথা হয়েছে?

— এখনো ঠিক হয়নি, তাকে দেখে দেবে।

— আমার বাড়ি। এসব হয় নাকি? দুই খোকা, আরও খোকা।

হাফপ্যান্টটা ছেড়ে বাসু পায়ন্ত পরল। ঠিক সেই সময় কেনারামের ডাক এসে পৌঁছল — বাসু চলে আয়।

বাসু ঘাটে দাঁড়াল। ট্রিপ ভাঙছে। তীর দাঁদির কাজ বন্ধ হয়ে এসেছে। ঠিকাদার হাতে হাজিরা নিয়ে লঞ্চে উঠে গেল। হাসপাতাল নীরব নিস্তব্ধ হল। এতক্ষণ খেয়াল করেনি। এখন বুঝতে পারছে, প্রতিদিন বেলাগাড়ির সাইরেন, কোলাহল কল্পনাও করেনি। সমস্ত দুপুরটা তুলে সে উৎসুক হয়ে ওঠে। তার সামনে এখন নতুন দিগন্ত, নতুন জীবন, অজানা পুলিনবীথি রয়েছে!

তিন

রাওয়ার শব্দ ডুবে গেছে। কেনারামের বাড়িতে ট্রানজিস্টারে সবে শুরু হয়েছে। রান্নাও খাওয়া শেষে কেনারাম মিটি একতলা বিড়ি শেষে শেষে বলেছে। বিশাল শরীরের নিচে কাঠের সিঁড়ি অদৃশ্য। খাট অদৃশ্য দু পায়ের ফাঁকে থালা। উবু হয়ে বসেছে। থালার ভাতগুলো তরকারি হাঁড়ি গামলা থেকে নতুন মৌতাত সংগ্রহ।

বাসু খাওয়ার এক ফোলে একটা ছাত্র জলচৌকির ওপর বসেছিল। খোলা দরজা পথে চোখ যেতেই রাওয়ার এই বিচিত্র দৃশ্য সে দেখতে পেল। একবার চোখাচোখি হয়ে গেছে। ভীষণ তীব্র মোটা মোটা ভ্রূর নিচে চোখের তারায় ফুটে উঠেছে নিরক্তি।

— এবার মোড়া তোর বাপ কি বলছি।

— বাসু

—হাঁ, শোন এই হাঁড়ি আর গামলাটা ভেজে ধুয়ে নে আর বিড়ি।

হাঁড়ি থেকে পুরো একথালা ভাত নিয়ে তার মধ্যে অবশিষ্ট কয়েকখানি তরল তাতে

ছেলে গামলা ও হাঁড়িটা সরিয়ে নিল। অর্থাৎ এগুলো এখন ভাজা-পোড়ার পালা।

রাবু নির্বাক হয়ে বসে রইল। কি করবে ঠিক করতে পারে না। মিষ্টির দোকানে বয়ের কাজ আর বাড়িতে নি-হাতরের কাজে হয়ত তফাৎ কিছু নেই। তবু মেনে নেওয়া কঠিন।

দুবেলা খেলাধুলোর প্রতি হাজারবার করতে হবে, এমন আজাদ ইতিহাসে সে পেয়েছিল। তাতে রাবুর আপত্তি ছিল না। কিন্তু বাড়ির এঁটো বাসন মাজা-ধোয়ার অভ্যাস হয়ে ওঠেনি। কিন্তু কাজ তো করতে হবে। আর তবু বড় শিক্ষানবিশের কাজের থালা ঘটি বাটি মাজার কৌশল হয়ত জানা নেই। অন্তত বুড়োর তাতে জল এলো।

সে প্রথমে ভেবেছিল মিষ্টির দোকানেই খাওয়ার ব্যবস্থা হবে। মিষ্টি তৈরীর কারিগর একজন সেখানে থাকে। নাম নীলমণি বসুই। মেদিনীপুরের লোক। মশাগাই চেহারা। মিষ্টির দোকানের কারিগর সাধারণত যেমন হয়। ঢিলাঢালা ভুঁড়ি, ঘাড়ে কাঁধে একাকার আর সবসময়ে লোকটা ঘামছে, গায়ে গামছা। একটা গামছা পরেই শীত গ্রীষ্ম দিনের প্রায় সবটুকু সময় ছিবড়েদের ঘরে কাটায়। রাবু ওনেছে মিষ্টির কারিগরদের বেতনপাতা ভাল। কারিগরের দুর্নিরোধ্য প্রতাপই দোকানের সুনাম। মালিকরা তাদের খাতির করে। সে জন্য বড় ইচ্ছে সে কারিগর হয়। লেখাপড়া তো হল না। এখন কখন একটা লাইনে বেতে হবে যাতে যা আয় দুজাদিয়েদের সংসারটাকে সে দাঁড় করাতে পারে।

কারিগর হতে গেলে দোকানে থাকা চাই। দুদশ কারিগরের দিকদারে খাটতে হবে। তবে তো আস্তানাটি আসবে হয়। ট্রেনে মহাদেব সেটা ভালভাবেই বুঝিয়েছে। সে আপ্রাণ বুদ্ধি বরবার চেষ্টা করে।

রাবু কি করবে? দাঁড়া বললে এখান থেকে কোনদিন যেতাই নেই, না বলা। এখনই অসভ্যতা। সে ইতস্তত করতে থাকে।

— কি রে এলা বসি দুই?

তীক্ষ্ণ চিলস্বরে রাবুর কানে ধরে। খেলাধুলোর ঘুম ছুটিয়ে গেছে। ছিটিয়ে ঘরে উঠে পড়ে। সিঁড়ি এলাহাবাদীর চিৎকার সমানে চলেছে—যেমন বেপাড়ায় মিলনে তেমনি হয় সাহায্য।

রাবু অসহায় তীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। মুহূর্ত বিলম্ব না করে গামলা হাঁড়ি কড়াই নিয়ে কলতলায় গেল।

চোখ ফেটে জল বেরোবার উপক্রম। বাড়িতে মোলোদিন নিজের এঁটো থালা গেলাসও ধোয়নি, তা দিনই সব কাজ করে। তবে সংগোপনে বলেছিল সেখানে হেঁসেল মেয়ে থেকে সব কাজ করতে হবে। কিন্তু বলাও ছাড়িয়ে যাবে এমন কথা নয়। তবুও যন্ত্রণা ত সেখানেই।

কেলেঙ্কারের গলা শোনা যায় — রাবু তাড়াতাড়ি কর। দোকানে যেতে হবে।

চোখের জল ফেলে রাবু বড় হাঁড়ি গামলায় হাত লাগাল। অসম্ভব হাত। কিছুতেই পরিষ্কার হতে চায় না। তবু সাবধানে পালাপালা ঘুরো করে ঘসতে লাগল।

— এাই, তুই কে রে?

রাবু চমকে তাকাল। পরনে সাদা ফ্রক, কাঁধে ঝুল ব্যাগ, মাথায় বেণী বাঁধা এক কিশোরী মেয়ে বড় চোখে দাঁড়িয়ে আছে। শ্যামলা রঙ, ডাগর চোখের তারা, ছোট্ট একখানা মুখ। চোখে সন্দেহ ও কৌতূহলের বৃষ্টি।

রাবু লজ্জা পেল। নিতান্ত অন্তরঙ্গ একটা মেয়ের সামনে বসে বাসন মাজার মতো মেয়েলি কাজ করছে এটা ভাবতেই তার হাত গুটিয়ে আসে। আসলে এই সংস্কারেই তো বড় হয়ে উঠেছে সে।

রাবু মাথা নিচু করে বলল — আমি নতুন এসেছি। কাজ করি।

— কাজের লোক তুই। তা কি জন্যে তোকে আসতে হয় তুই তো জানিসনে! শুধু শালপাতার থালি তোলা আর নাকি! কতরকম ঝাঁকের থালি তুলতে ফেলে দিয়ে ছাই আর থালি নিলিয়ে নিতে হয়।

রাবু নিজের অজ্ঞতায় নিথর হয়ে পড়ে। আস্তে আস্তে বলে — থালি তো এখানে নেই।

মেয়েটি ভাল করে উঠল — থালি তো নেই। থালি কি বাড়িতে থাকে? ডাক্তার ওপর ডংপোহেশনের থালি পড়ে আছে, এক ঝোড়া থালি নিয়ে আয়।

অগত্যা রাবু উঠে দাঁড়ায়। আশে পাশে চোখ বুলাল, পেল না। মেয়েটি আবার খিল খিল করে হেসে বলল — আচ্ছা বাঁদরা তো, একটা বাটি নিয়ে যা না।

অত্যন্ত রাবু বাটি হাতে ডাক্তার থালি আনতে যায়। ফিরে এসে দেখল মেয়েটি চলে গেছে।

মেয়েটির চোখে সহানুভূতি ছিল। এই প্রথম অচেনা পরের তার দুচোখ ভরে জল এল। হাত ভাজা করে। ছাই থালিতে

হাতের আঙুল লম্বা হয়ে যায়, টান টান করে। চোখের ওপর ছায়ে মায় বিষণ্ণমুখ।

এক সময়ের আঙীয় প্রতিবেশীরা ভড়িয়ে হাজার ডাক দিয়ে হায়রান মানে। মায়ের মৃত্যুর পরও কিছুদিন টিন ওইখানে স্কুলে গিয়েছে। স্কুলে যেমন মনে না টিকেই, কিন্তু এইখানে খেলাধুলা আনুষঙ্গিক পরে সারাদিনই ছিলদিন। মায়ের পরলোকের ইতি ঘটে গেল।

আলাপর একদিন ছোরাহাতে, মাথায় ওপর আকাশভরা, ঘুরন্ত পৃথিবী একটু একটু করে জানছে; প্রতিবেশী নগেন মুখার হাত ধরে মায়ের নিরানন্দ আলপথে নেমে এল মায়ু। ফেলেদিন গ্রামের গণ্ডিরে যায়নি। ওরেছিল গ্রামের উত্তরদিকে সাত আটি মাইল পথ হাঁটলে নদী। নদী পেরিয়ে মহকুমা শহর, আর ইস্কুলটো সেকালে নিদালয়া সেলিল।

ফলকাতা খুব বড় শহর। তড়লোক মুখে শুনেছে। সেখানে মনুষজন হাঁটে না, ছুটে চলে। ধুলো মাটি আর ধোঁয়ার ভাবা। গন্ধের ধোঁয়ার প্রোশ ছালা করে। সেখানে কাছাড়ি সেকান বাহড়োপ, অফিস আছাড়ি, ট্রাম বাস মোটরের আয় আর মিছিল। চব্বিশ ঘণ্টা জমজমাট মেলা।

শেষ বিদায়ের সময়ে মায়ু আর দুর্ঘটনা ত্রাস করে মেখলে। মার মুখোশ ভরে জল টল টল করছে। চোখের পাতা নড়লেই ঝরে পড়বে। সে মুখ নিচু করে মনোন আঙুর দিয়ু দিয়ু আলপথে নেমে এল। মা কপালে হাত ঠেকিয়ে অনুজ্ঞা করে প্রার্থনা করল। নগেনের উদ্দেশে বলল — ঐকুমারো ছেলেটার দিকি একটু নজর মেরেন, মেরেদিন বলা মা ছেড়ে মোথাও যায়নি। ওলদারহাত দিয়ে, একটা চিঠি ডাকে দিও।

নগেন পেছনে ফিরে বলল — চিন্তা করবেনি বৌদি। তোমার ছেলে আমার ভাগ্নেভাইই থাকবে।

মায়ু ভয়ে আর পেছনে তাকায়নি। সে যেন বুঝতে পারে মা উঠানের দুখে আঁচল চেপে। প্রতিবেশী নগেনের পেছনে চলতে চলতে তখন তার দৃষ্টি সীমার বাইরে, গাছপালার ফাঁকে খুব আবছা সিঁদুর রংএর ঘড় হয়ে উঠেছে। অনুকরণী মাঠে সাঁঝালের ঝিংপোর ঝর্ণার সুর ভেসে আসে —

সাঁঝ যে ঘুমে নয়ন ভরে
আমি যে তোমা বা
ঘুমঘুড়ো আঁচলে বাঁধা
আলঞ্চন আমায় ঝিনিস না।

মায়ু চমকে ওঠে। সামলার ছেলের শড়বাসি ছাই মাখতে মাখতে হাতটা ধরে খেয়ে।

— আই ছোলোটা, তুই কাঁদছিস?

মায়ু মুখ তুলে দেখে, মেয়েটি স্কুলের ফ্রক ছেড়ে পুরোনো সার্ট জামা পরেছে। কোমরে হাত রেখে ঘাড় বেঁকিয়ে আছে লজ্জা জনছে।

— কই না ত। মায়ু তাড়াতাড়ি মাথা নিচু করে হাতটাকে চোখ করে।

— মায়ু কাঁদছিলাই ত —

— মোটেই না। লজ্জায় ছেলেকে নিজেকে শক্ত করে তোলে। চোখের আর্দ্রতা মুছে দেয়ে আর। ঠোঁটের হাসি তুলিয়ে সে বলল — তোমার নাম কি? কোন ইস্কুলে পড়?

মেয়েটি অবাক হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বলল — মিনিটি। আমাকে সবাই মিনি ডাকে। নিবুদের পাড়ি। দুই পড়ায় জনিস?

মায়ুর দুটো হাত ভরা হয়ে যায়, আনন্দটা বুকটুকে হাতড়ানে বুঝিয়ে আনে। মুখেতে ভাষা যোগা মানে না। এই সময়ে ছেলের খোঁজে তীরকার ছেলে এল — মিনি তোমার খোলা বয়েছে। খানি আয়।

আলাহাত হাতে একলাশ কাদা মেখে মুখে তখন উঠে দাঁড়াল, মায়ুর সমস্ত শরীর থর্ থর্ করে কাঁপছে। ছেলেরে দিয়ে টান টান করছে। ঘরের ছেলের মায়ু ঢুকিত নিল। মেঝেতে দিদি পেতে মিনি খেতে বসেছে। পাশে এয়ালশী তার থালায় মাংসের কাঁটি বেছে দিচ্ছে। মিনি হাসছে। মাংস সহ মুখের সিলিমলি আর মহুতের কথা আলোচনা করছে।

মায়ু নিঃশব্দে ঘরালাশ ভাবে ধাবের অন্ধকারে আসন করে। তার চোখে ঘুমি খাচ্ছেলেন, প্রাণের ছেলে ঘুপুরবেলা ঘুম কাকে বলে জানে না। পাশ ফাইনাল পেঁচে ছিল, ছুটির দিনে মাঠে আগুনে খেলাধুলোয় কেটে যেত ঘুপুরবেলা। সন্ধ্যাহাতে পড়ি দিনগুলো কাটে পড়াশুনোয়। ছাত্র ঐতিহ্যে দিনে স্কুল ফলত সকালে। সে সময়টা ছিল বড় সুখের। বেলা ঘড়েটির ঘাড়া ইস্কুল ছুটি হয়ে যেত। মৈলাহের ঘর যোগুর মাথার টিপর দিয়ে যেত প্রতিটি ঘুপুর। আর কতুনি মনুষের কিছুই তাকে ঘরে আটকে রাখতে পারত না।

বয়েলার আড়াল কোনটাতে ঘরে যে

ছেলে স্পষ্ট দেখতে পায়, এই বুড়ুবুড়লো মা সংসারের সব কাজকর্ম সেরে বুড়ুমো হাতে মুখে রঙেরই আয়নায় মুখখানা ঠাওর দেখেই নিয়ে বসেছে। এক মুহূর্ত বিরাম নেই, শুধু কাজের মধ্যে ডুবে থেকে সংসারের অভাবঅনটন, সব জ্বালা বিয়োগ ব্যথা ভুলে থাকার প্রাণান্ত চেষ্টা। মন্টুর ছোটোবাই শান্তনাদ আর নিজি কলম তুলে গেছে। মা কি তার কথা ভাবছে?

মন্টু আজ অনেক দূরে। মাইলেরই পর মাইল দেখতে পাচ্ছে না। কে জানে কতদিন কাপড় আনতে দেখা হবে। এক বাড়িতে না কি-এর কাজ করে, বাঁধুনির কাজও করতে হয়। বিরাট একান্নবর্তী সংসার। এত কাজ মায়! কখন যে অসুখে হোমিওপাথ করবে, মাকে আর কাজ করতে দেবে না। কি-এর কাজ করতে মা কোনোদিন চেয়েছিল?

— মন্টু কখন খেলতে জাবিস?

মন্টু দূরে আছে। আর দেখতে পাচ্ছে না। মন্টু দেখতে পায়, একটা ছেলে বিশেষ করে ইস্কুলের অন্যের মার। ছুটির পরেই টেনিসে কখন ছক সাজিয়ে কালোর স্যারের সঙ্গে বসে যায়। কোনোদিন স্যারের সঙ্গে না হইলে, অন্য দুএকজন ভারা মেটামুটি জানে তাদের হাত ধরে টানাটানি করে। জীবন কাজের নেশা অঙ্কের স্যারের। তাদের সংস্কৃতের স্যার বসে তার সঙ্গে পাশা নিয়ে কসাকসি। কখনোর মনে খেলা থেকে কিন্তু কোনদিন হতাশাগ্রস্ত করতে পারেনি মন্টু। তাই বলে এই পুরুষে মেয়েরা কিনা মন্টু খেলতে চায়। তাদের গ্রামে একথা যে শুনবে সেই আঁতকে উঠবে।

মন্টু ভয় পেয়ে জানতে, সে জানে না। আকাশ মাথায় তুলিয়ে ভয়ে ভয়ে মিনিকে জিজ্ঞেস করে, তুমি জানো?

মিনি হেসে কুটি কুটি হয়ে বলল, জানি কি রে আমি তো রোজ বড় মাকে হারাই। এই দাখ, তোকে আমি নতুন খেলা শিখিয়ে দেব।

মিনি ঘর থেকে একটা খুটলি নিয়ে এল। নীল আর লাল ছক আঁকা একটা জমাট সাইজের একখণ্ড কাপড় সামনে বিছিয়ে বসল। খুটি সাজিয়ে প্রথমে রাজা মন্ত্রী ঘোড়া নৌকা গজ চেনাল। একের বেশি ঘরে ছকে নিয়ে হয় দেখাল।

কি, বুঝলি কিছু? মন্টু হাসে নিরোধের হাসি। মিনি অধৈর্য হয়ে ধমকে উঠল— দুই একটা হাসা। আবার দাখ। ওটি হাতে নিয়ে দেখলি তো? এবার বল, কোনটা রাজা মন্ত্রী নৌকা ঘোড়া গজ। মন্টু গজটিকে বলল মন্ত্রী, মন্ত্রীকে গজ বলল। মিনি চিৎকার করে উঠল, ধাৎ আবার ভোলা!

এমনি সময় ছেলে এল মেয়ে গলার গলাগলি চিৎকার — ঘোড়ে ছেলে, এই তোর বাবা মারা! এদিই— এদিকে আয় ঘোড়া।

কলতলা থেকে একটা বড় ছেলেটি হাতে এলাকশী বেরিয়ে এল। তার চাঁচির মতো দুটো চোখ মন্টুর দিকে নিবদ্ধ হয়ে আছে।

ঘুড়ুটা কেঁপে উঠল মন্টুর। হাত থেকে রাজা নৌকো মন্ত্রী পড়ে গেল। মাকুন আবহকে মুখটা ঘুরিয়ে নেয়। মিনিও প্রথমে অন্যদিকে তাকিয়ে সামলে নিল। সেই প্রথমে এগিয়ে এসে ছেলেটির বেখল। ছেলেটির পেছনটায় কাটা বেরুল ওঠেনি, তেমনে তাকানোর চলন্ত ঘোড়ও আছে। একাদশী আর একদার চাকার দেখার আগেই মিনি চাপা গলায় বলে উঠল, আয় মা তুমি বড় চিৎকার করো। ওতো ছেলে মানুষ, ওকি পারে? তা ছাড়া শিখবার সময় কে দেবে?

— ইস্, মেয়ের বেশি দরদ উথলে উঠল। পরক্ষণে মিনি ঘাড়ফিরিয়ে আবার তুলনিলে। এরই ফাঁকে এদিকে তাক, ধাৎ কিরকমে মন্ত্রি, সাতের মতো দাঁড়িয়ে থাকিনে।

মিনি বড়দের মতো মন্টুকে ইঙ্গিত করে। মন্টু ভীত সন্ত্রস্ত প্রকাশ মুখে এগিয়ে যায়। একাদশী তার সুবিশাল শরীরে শাড়িটা নিতম্বদেশে হাঁটুর ওপর তুলে উবু হয়ে বসে বাজারে বসল। তার মোটা আঙুলের ফাঁকে মধ্যে যাদুগুলো যেন খেলনাকুড়ির মতো লাগল। সবশেষে বসল একাদশী যেন মাতাল। তার গলায় বিরক্তির স্বর ফুটে উঠছিল, এটা কি আসলমন্ত্রী হয়েছে? কাজ জানিসনে। কাজ শিখে তবে তো আসবি। মন ছেলে মরিনে নিবিনে। আবার ছমাস যেতে না যেতেই আমরার টাকা বাড়াও।। আজকাল সব ঢাঁকি মেয়ে ছেলেরা শিখেছে।

ইতিমধ্যে ছুন ছেলে ছেলেরা অভ্যাসবশেই ঝিড়ঝিড় করে বলে উঠল — আহ্ দিনরাত মাগীর খাঁড়ের মতো চিল্লাচিল্লি।

পাশ দিয়ে বাইরের কাজে যোদ্ধুরের

দিকে একবার তাকিয়ে রাজুর উদ্দেশে বলল

— কিরে দুপুরে একটু ঘরে নিলিনে।

— দুপুরে আমার ঘুম আসে না। রাজু আস্তে আস্তে বলল। তেমনভাবে চোখমুখেই বলল — তুই একটা রান্নাঘাল।

বাবু এ তিরস্কারের কারণ খুঁজে পায় না। তবে তখন কাঁক নেই বলে কথাটা বলা হল না।

একাদশী কাজকর্মগুলো শেষ করে বেতগুলো ধুয়ে মুছে দাওয়ার একপাশে বেতগুলো সাজিয়ে রেখে ঘরে ঢুকলো। একটা ইটবেরকরা ঘরের আড়াল থেকে রাজু তার চলাফেরা লক্ষ্য করছিল সন্তর্পণে। ঠিক এমনি সময়ে রাজুর চেয়ে পাঁচ-ছয় বছরের বড় একটা ছেলে ফুলপ্যান্ট শার্টপরা, কেরীঅ্যাকুয়েরের মতো চুলের ভারল, চোখে কালো চশমা, হিন্দি গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে বাড়ির ভেতর ঢুকল। হাতে একটা টিফিন ক্যারিয়ার. রাজুর দিকে জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে চোখ কুঁচকে তাকাল — তুই কে?

রাজু ভীত সন্ত্রস্ত গলায় বলল — আমার নাম রামচন্দ্র রায়। ভিতু যায় ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল, তারদিকে তাকিয়ে ছেলেটি জবাব করে জিগ্যেস করল

— সত্যকেষ্ট?

ভিতু কোনও উত্তর দিল না। ইংরেজি শব্দটার মানে রাজুর জানা নয়। সারা মেয়ে হাসি আরও খানিকক্ষণ ঘরঘর করে উঠল। রাজু মাথা নিচু করল। ছেলেটি আরও কাছে এসে খা ছেড়ে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে বলে উঠল — পাইছি। দেখ। মেটিরীপুর না ডোমরাড় ছাড়বার? ভর্তিদের জন্য আসা হল?

রাজুর মুখে কোন কথা নেই। সে মাটির দিকে চোখ নামিয়ে রেখেছিল। ছেলেটি একবার হা হা করে নাটকীয় আওয়াজ তুলে তার কাঁধে সশব্দে চাপড় বসিয়ে বলল, — ডোমরাডটা ভো সলমন খাঁর মতো। ঠিক আছে এস্তান। পরে কথা হবে।

একাদশী ঘর থেকে বেরিয়ে উঠল — এই মলকে, বৌদ্ধটাকে পেছনে লাগা হচ্ছে, বাঁদর।

— ওরে বাপস্! জোরীন। ভর্তির ওরফে মলকে লাফিয়ে উঠে নিজেদের ঘরের দিকে সুড়সুড় করে ছেটে পড়ল।

মলিকের যাওয়ার পর মিনি আস্তে আস্তে বলল — খবরদার, বাবার সঙ্গে মিশবিনে। কোনদিন ডাকলে যাবিনে।

বাবু কয় চোখের ওপর চোখ রেখে অবাক হয়ে বলল — কেন? মিনি বিরক্ত হয়ে বলল — বাবা স্কুলে যায় না, সারা খেলে, বিড়ি খায়। তার সঙ্গে মোটেও মিশবিনে, খারাপ হয়ে যাবিনে। এর আগে দুটো ছেলেকে বাবা খারাপ করেছে। বাবার হাতে খুব মার খেয়ে তারা পালিয়েছে। একজন আমাকে খারাপ কথাও বলেছিল। আমি কাউকে বলিনি। তুই মায়ার সঙ্গে কথা বলবিনে বুঝেছিস।

মিনি ভীষণ সতর্ক করে আস্তে আস্তে কথাগুলো শেষ করে মোটা মোটা চোখে তার দিকে তাকাল।

এবার মুখের রাজুর হাসি পেল। রামচন্দ্র নন্দ পাঁড়ের ছেলে। ভাইফোন মাকে ছেড়ে অজানা জায়গায় এসেছে সাতদিনের মুখে মুখটা তার মোচড়ান উঠেছিল। তারা মনে আছে ফেলে সুন্দর অজ গ্রামে, রাজুর কথা ভাবছে। সে ছাড়া সারাদিন অমনভাবে আর কে আছে!

মিনি তাকে চুপ করে থাকতে দেখে বলতে উঠল — কথাগুলো কি লাগে গেছে?

বাবু মাথা নাড়ে। তার মুখচোখ নিমুর মুখোশের সঙ্গে মিলমিশেই আরও নিচু করল। রাজুর চোখে মুখে ছিল সন্তোষ। তার পনেরো ষোল বছরের জেবনাতে গ্রাম্য সরলতার সঙ্গে মিশে আছে শ্যামল সৌন্দর্য। শহরে কপটতা, লোপনীয়তার স্পর্শ সেখানে নেই। রাজুকে তাই এভাবে দেখলে ভালো না লেগে উপায় নেই।

রাজুর অবনমিত মুখের দিকে আরও কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মিনি অস্পষ্ট স্বরে বলে উঠল — তুই একটা হাঁদা।

একটা বুনন খোলাশি আন্টি পরেছিল সে। তার শরীর ঘিরে ছিল সুবাস ছিল। লঘুপদে ছলে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ সেই সুগন্ধে রাজুর বুক ভরে আছে।

বারান্দা পেরিয়ে গেল একটা মেয়েলি মহুর পায়ে। অনেকগুলি শালিখ হঠাৎ পাখা ঝাপটিয়ে কিচমিচ করে উঠল। ছোট্ট গামছাতে বসে আছে একটা কাক। সে আধাটাকে দুপাশে ঝাঁকিয়ে ডোবা চোখে রাজুকে পর্যবেক্ষণ করছে। ঠিক এইসময় ঝোড়ো বাতাসের মতো হোড়শাড় করে একটা একটা আধুনিক ট্রেন চলে গেল দিটি বাজিয়ে। তার ঝাপটার শব্দে মলকটা উঠে গেল। রাজু চকিতে উঠে দাঁড়িয়ে কিছুদূর এগিয়ে যায়। দুটো পুরোনো বাড়ির

ফোকাসে ফোন রাখে। ট্রেনটি চলে গেল চোখের আড়ালে।

জানুয়ারি থেকে জমে গেছে। পাশের বাড়ির ছাদটা ক্রমশ বড় হতে হতে সামনের রাস্তা আটকিয়ে দাঁড়াল। ট্রেনের শব্দে ফোকাসের উঠে যাওয়া। ঘড়ির মতো ঘিরি তার একেলারী নিখুঁতে ফোন খেলছে। সেদিকে তাকিয়ে তার ভোর হয় — ঘিরি মা এক বেলায় ফুল দে।

ঘিরিকলোনির গায়ের অন্ধকার। বাড়ার চলাফেরার ভীড় বাড়ছে। কিন্তু নক্সাদারি খোপার পরিপাটি, নিখুঁত ঘরে ফ্রক-ফ্রকপরীদের। তারা গায়ের নিজস্ব ফোন ছেড়ে দিয়ে বসে আছে ঘনিষ্ঠ হয়ে। বিস্ময়ে সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে রাবু। এমন নির্লজ্জ ঘনিষ্ঠতা সে গ্রামের গ্রামে টুকিটা ফোনালাপেই দেখেছিল। ফোনগুলোর পেছনে ফ্রক ইঁটিয়ে হাঁটিয়ে ফোনগুলোকে সব দেখছিল। এই ঘিরিকলোনি ঘিনটনের পর থেকে গায়ারঘাটের আশেপাশে দেখা যায় মানুষের জটলা। সেখানে ঘোরা উঠছে। যাঁরা চলনের কষ্ট শুরু বাতাসে নিশে আছে। ফোনগুলো চলমুক্ত দৃষ্টিতে কয়েকবার চুকচুক করল। রাবুর দিকে আড় চোখে তাকাল। কিন্তু নিজেকে সামলে কমল শেষ পর্যন্ত। ঘিরিকলী ফোনগুলো বাচ্চাবুদ্ধিলপায়।

একটা পাখিকাকীরা ঘরিকলনি সবুজেরে ঘরি পাকল ছড়াতে ছড়াতে চলেছে। রাবু দেখল, ঘাঁদের ঘাটিয়াতে এক বৃদ্ধের মৃতদেহ, কপালে মুখে চন্দনের তিলক। বুকের ওপর সাদা ফুলের মালা। ঘটিলনি ধূপ ও আতরের গন্ধ ছড়িয়ে আছে ফ্রক ভরে গেল।

রাবুর মনে পড়ে যাবার কথা। হঠাৎ চলে গেলেন। ফুলের মালা নিয়ে ফোনগুলো থেকে বাড়ি ফিরেই সব শেষ। ডাক্তার ডাকবার সময় পাওয়া যায়নি। চোখের সামনে ঘটে গেল ফোনবাড়ি— মানুষটার খেল্।

রাবুদের গ্রামে প্রতিবছর ধানকাটা শেষ হলে মেয়েরা হাজির হয় বনে বনে। হলি খোলার আশপাশে ঘাঁবু ঘাটায়। সঙ্গে থুকুর মেয়েরা পাখি টিটুফোড়া। জড়িবুটি বেচে আর মালাটির খেল্ দেখায়। কি হাত সাফাই! এই আছে এই নেই। তার মধ্যেও ফোনটি করে অদৃশ্য হয়ে গেলেন হঠাৎ। রাবু কতদিন মায়ের কথা ভেবেছে। ঘুম ভেঙেই মনে হয়েছে মায়া সেই নাকি ফোনেকদিনের জন্যে বাইরে গেছে, বাবলার কাছে মালির বাবাকে মাঝে মাঝে পাঠানো দুধার বিয়ের জন্য।

তারা যখন ফোনে পৌঁছল, দু-একজন করে গ্রামের আসা সংখ্যা ফ্রক হয়েছে। পশ্চী ফোটি ধোয়া টেনিস ফোয়ার কাজ করছে। সে রাবুর দিকে তাকিয়ে হাসল। রাবু চটপট জামা খুলে ফেলল। গেঞ্জি গায়ে পরিফোনের কাজে ফোন দিল। রাবুর সঙ্গে তারক বলে সাকাদের সেই ফোনেটি। ঘরলে এ উঁচুফোনে রাবুর চেয়ে বড়। বিফোনে একটা মরলা ট্রাউজার আর ফ্রাম ফোকেও মরলা ফোনের গেঞ্জি পরে ঘাসের পরিফোন করছিল। মাঝে মাঝে সে পেছনের ঘিরিকলনির থেকে বিড়ি টুকে আনছে। তাকে ফোনগুলো চোখের আড়ালে যাচ্ছে বলে রাবু সঙ্গে ধমিষ্ঠ হয়ে যখনই সুযোগ কথা বলছে, দুধের দুর্গন্ধে রাবুর বমি উগলিয়ে উঠছে।

তারকের বয়স সতেরো আঠারোতে। গোঁফদাড়ি বেড়িয়েছে, সেই সঙ্গে ব্রণের আক্রমণ। বিড়ি খেয়ে খেয়ে ঠোঁট পুরো কালো, কিঞ্চিৎ মোটা। সেগুলোই মনে হয় ফোনগুলো। চোখদুটো অস্থির। ওর সঙ্গে ঘিরিকল-আঘিনার উঁচুফোনের খুব ভাব। তারক আর উঁচুফোন মুজন বাড়িগুলো ফোনফোনে থাকে।

উঁচুফোনের শরীর খলখলে, ফোনও ভুঁড়ি। আগুনের আগে একফোনের ফর্সা শরীর তামাটে। একটা আধময়লা গামছা ফোনফোনের নিচে, আর একটা সবসময়ে ঘাড়ে রাখা, ঘামে জবজবে শরীর মুছে মুছে তেলচিটে হয়ে গেছে। একটু ফাঁক পেলেই ঘ্রাণক আসে। উঁচুফোন মুখ থেকে বিড়ি নিয়ে খু-উ-উ করেই আবার তার মুখে গুঁজে দিয়ে চলে যায়।

রাবু লক্ষ্য করে তারক ঘিরিকল ঘরে ঢুকে নতুন সংযোগের স্থান পরীক্ষা করছে। উঁচুফোন ওর যত্নোযত্নের জন্য তাকিয়ে আছে। উঁচুফোনের ঘাম ঝরে পড়ছে সাদোসোর খাপায়। ঘিরি ঘিরির এই ফোনখানায় আছি, আরপোলা বিলাপে কোনও ঘরা নেই, আর অফিসাস ফোনগুলোর ইঁদুর নির্ঘাতে ফোনফোন খুয়ে ফেলেছে। এই সাদোস সময়ে ফোনফোনের তৈরি খাবারের প্রতি তার বিতৃষ্ণা জন্মে যায়।

বিড়ি খেতে তার না ভালো লাগে। বিশেষ করে পশ্চীর বয়সী ফোনফোনের। তার ফোন ঘিরিকলের ঘর থেকে ফোনফোন পর্যন্ত ঘরে ঘরে সাজানো পরিপাটি ঘিরির

আলাপ জোর দিয়ে চলছিলেন ঘরে। রাত্রও আজকাল হাতে পায় মিষ্টির বিড়িয়ে জগতে টুকে। এর অধিকাংশ তাদের গ্রামে কেউ দেখেনি। নামও শোনেনি। এর সঙ্গেশেরই তার নাম। হলে ঢোকালে, ভেঙে ভাজা, ঘুমানো তৈরি, কাঁচের তৈরি কারুকার্যের মিষ্টিই না রয়েছে। ফ্রিজেলের ঘরের আওকারখানাও দেখার মতো। কি রঙ্গরঙ্গ অবাস্তবিক, বিপজ্জনকও বটেই। কাচের ও প্লাস্টারের বড় বড় মূর্তি টানেল, কিশান জোয়ান আড়াই নামানো এঁকানো। এই আগুনের ছাপ শেষ হতে হতে কাহিনির নায়ক এলমেশীর জীব, জীবন যোগে আইসিলাগ, আজ তবে চলেছে, না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না।

রাত্রুর চোখ ছিলেন ঘরের দিকে ছিল। উত্তর একটা খুব বড় কাচের গ্লাসভোরে এক ভাল সন্দেশ নিয়ে বসেছে। ছেলেরটি চিটচিটে ছেকেতে বসে অর্ধাঙ্গ শরীরে মুখোসের ভাগ্য ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সুস্বাদু সন্দেশের ওপি পাকাচ্ছে। দাঁতাটিতে মুক্তোদের মাঝখানে বিড়ির টুকরো, ঠোকরে ভীষণ মহলা একটুকরো গামছা জড়ানো, ধুলো ছড়িয়ে রয়েছে।

আর শরীর মেয়ে অনিমার হাতের কৌটো পড়িয়ে পড়ছে। বাঁ হাতে বিড়ির টুকরোটা সুখটান মেরে ফেলে দেয়, পরক্ষণেই লালচিত্ত মুটো আঙুল ফোকরের মহলা গামছায় মুছে নিয়ে লালন হাতে ফেলে সন্দেশ তৈরিতে মনোযোগী হয়।

উত্তর ঘাড় নেড়ে রাত্রুকে ইঙ্গিতে ডাকল। কাছে এলেই বলল — এই যে, এক ভাল সন্দেশ নিয়ে বসেছে। তাড়াতাড়ি। যদু দেখতে পেলে রক্ষা রাখবে না।

রাত্রু উত্তরের ঘামঝরা শরীর দেখল। সেইসঙ্গে সে দেখতে পেল পশুর ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। রাত্রু ভয় পশুর কাছে গিয়ে সন্দেশটা ওর মুখে তুলে দেয়। পশু গভীর কৃতজ্ঞতায় হাসল, তার মুখে কালমাজায় ঝরে। রাত্রুও হাসে। কিন্তু পেছনে ফিরতেই তার পেটের ভেতরটা মুচড়ে ওঠতে দিয়ে দিয়ে ভয়ে ওঠে — ইস্ ভাগ্যে কেউ, সবার এক চোখের। রাত্রুর চোখ ফেরে জল আসে রাত্রুর, একটু ফোকরের সকারও হয়। পশু উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করে ওঠে— আই হারকলা রাত্রুকে মারলে কেন? গায়ের জোর বাপ্পও কখন তখন, রাত্রুকে বলে দেয়।

— আই পাগল কি হয়েছে তো? কেনারাম বাঁজখাই গলায় চীৎকার করে উঠল।

— যদু, হারকলা রাত্রুকে ....

তারপর রাত্রু কেনারামের কাছে গিয়ে আস্তে কি সব বলল। কেনারাম হিঁচকে উঠে দাঁড়াল।

— পাগলা এদিকে আয়। আয় বলছি।

পশুটা নালিশ মারপথে থেমে গেছে। সে রাত্রুর দিকে তাকাল। বেচারি অসহায় ভীতি ভেসে দাঁড়িয়ে আছে। পশু ভয়ে ভয়ে কেনারামের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই কেনারাম তার একটা কান মুচড়ে ধরে — হারামি, পাজি ভেল হয়েছে, দাঁ কর কৌটা, দাঁ কর। কোকরের মহা সরাসরি হচ্ছে।

পশুর চোখদুটো ভারে পূর্ণ হয়ে ওঠে। তার কান শরীর কাঁপতে থাকে। সে ভীতি ভেসে কোনো কথার জবাব দেয় না।

কেনারাম চীৎকার করে ওঠে। কানটা আরও জোরে মুচড়ে দেয়, তারপর একটা চড় কষিয়ে বলে ওঠে — ভেল কোনওদিন যদি দেখি, কানি মেরে মুখ কাত করে দেব। ভেজাক্ষরের দল। রাস্তায় কুড়িয়ে খেতিস। ভেকে কাজ নিলুম। এখন ভেলবদমাসি। পশুর মুখচোখ ফ্যাকাসে ওঠে। ভেল উত্তেজিত হয়ে কিছু বলতে যায়, এমনি সময় এলাকার একজন পরিচিত গণমান্য ব্যক্তির ঢুকতেই কেনারামের চেহারাটাই বদলে যায়। তিনি ভেতরে বসতে বসতে মুখটাকে খুশির মতো করে কথোপকথন শুরু করলেন।

— ভোকালীকে একটু পরিচালনা-টাচনা করুন মশাই। বুলো আর পড়া দুর্গকে করে গেছে। অবাস্তবিক।

কেনারামের দুঃখকথা শোনবার মতো হল। বিভূতি আর গৌরাঙ্গো মাখামাখি। কিশোরিনে আন্দিজের পাহাড়ি, নতুন ভাঁজকরা। পারজনে আর পাশের চাহনিতে কালো স্টুডিশোর আভোস — সর্বাঙ্গে সবচে ধুলোবালি নোংরা বাঁচিয়ে চেয়ারটা নাড়াচাড়ার পূর্ব দিয়ে নোংর দিয়ে খুটিয়ে কয়েকটা জায়গায় মহলা পরিষ্কার করে সন্তর্পণে বসলেন।

— দেখি, চারটে কচুরি আর একটা সন্দেশ। একটু তাড়াতাড়ি করিস। আজ আরশোলাও হয়েছে দেখছি। কেনারাম ভাটা ঠকঠক করল। এইসব ইনসেকটস্ খুব ছারখারুল মশাই।

তারপরেকের কথা বলার ভঙ্গিটিও বেশ

– খুব সুরেলা। ভীষণ কালো রঙের ওভারকোট একটা ছিপছিপে লম্বা এসে পল্টু টেবিলে বোঝা রাখা করতেই আশপাশের ভদ্রলোকেরা সেকেন্ডখানেক চোখ ফুঁড়ে গেল। বাবেন্দুমুখে আবার ভালো চাপা দিলেন।

পল্টুর অসহায়ের সবকটি আঙুল হারমোনিয়ামের রিডে। এরকমিতে ঘোরা করলো, মাথার চুলে পর্যন্ত ঘেমে না পড়ে লাগতে শুরু। পল্টু একটা নমস্কারে খুটো টেবিলের ওপর ডালকুত্তিয়ে এটা মুছে নিয়ে গেল।

ভদ্রলোকের গলায় স্বর ফিরে হয়ে উঠল — উঃ ছেলেটি কতদিন ধরে করছো? আর আঙুলগুলোর অবস্থা দেখেছেন কেদারবাবু? পর্যাপ্তও সুস্থ নেই, প্রোটিনের অভাব প্রকট। আরে মশাই, ছেলেগুলোকে পক্ষ ছাগলের মতো খাটিয়ে নিচ্ছেন, একটু ভালোমন্দ খেতে দেবেন!

কেদারবাবুর মুখখানা অন্ধকার গম্ভীর হয়ে উঠল। এইরকম দু-চারজন বাঁধা খদ্দের কেদারায় এলেই সে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। এদের মুখের ওপর কিছু বলাও যায় না। এই যে ভীষণ খুঁতখুতে শৌখীন লোকটির নাম সুবীর ঘোষ, একদা জনপ্রতিষ্ঠিত বিপ্লবের আর্থিক নেতা হিসেবে সারা মফস্বলে জেল খেটেছেন। কলেজের অধ্যাপক পোস্টে আজিকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। পুলিশের অত্যাচারে অন্ধ হয়ে যেতের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত মুচলেকা দিয়ে নিজে ছাড়া পেয়েছেন। কেদারবাবুর কলেজের চাকরিটিতে শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসভঙ্গভাবে ফিরে গেছেন। এখনও পর্যন্ত বিপ্লবের রক্ষণশীল ছাত্রসংগঠন উপর বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে থাকেন।

সুবীরবাবু নিতান্ত বিরক্ত মুখে কড়ায় সংশোধ খেয়ে উঠে গেলেন।

সন্ধ্যায় ধূপগুলো দেওয়ার ভার রাজেনের ওপর। সে হাতমুখ ধুয়ে মুছে ধুনুচি জ্বেলে ধোঁয়া করল। ভোরে থেকে গঙ্গাজল ছিটোনো দরজায়, কেদারায়ের আশায় আর আয়নার ফ্রেমটিতে শেওয়ালে ঝোলানো ছোট্ট একটা কাঠের বাক্সের মধ্যে রাখা লক্ষ্মী গণেশ আর কুলদেবতা মোটামুটি দিকে অভিবাদন প্রণাম করল।

কেদারায় অনেকক্ষণ মাথা ঠুকল, কপালে আঙুল ঠুকল। প্রণাম করতে করতে আয়নায় নিজেদের ঝোলানো ওদে শিরশিরিয়ে ভোরমুখ ভীতকালো।

নিজিলের গলি ওলতে পেয়ে রামুর বুকটি খানিক রাজায় গিয়ে পড়ল। ভীষণ নিজিল। আজ হাতে অনুষ্ঠের সাড়ি। বানান সাড়ি ভোলান। রামু ভাবল, নিজু বুঝল, নিজু বুঝল না, নিজু ভীষণভাবে ভোঁয়া তাকেও স্পর্শ করে গেল। কলকাতায় পা দেওয়ার পর এমনি অনেকটি নিজিল সে দেখেছে এ পর্যন্ত। নিজিলের একজন ছাপা লিফলেট নিজি আছে। রামুর হাতেও একটা গুঁজে দেল।

চার

দেখতে দেখতে তিন চারমাস কেটে গেল। ভোরবাতের দুপুর। রামু ওপরা সেরে নবে আয়নায় এসে বসেছে। আলোর আড়ালে বসে একটা বাংলা পত্রিকার কাগজ পড়ছে। ওর এই পড়ার ব্যাপারটার একদম ভালও নজর পড়েনি, পড়লেও ভেবেছে ভোরবাতের আগন্তুকের ছবিটিকি দেখে দুপুর ভৌতাটা। সেদিন সে হাতের কাছে পুরোনো ভোরবাতের আনন্দের পাতার পেয়ে তাতে ডুবে গেছে।

হঠাৎ ঘরের ভেতর থেকে মিনির কান্না আর চীৎকার শোনা গেল। মিনির মা অর্থাৎ কেদারায়-গিন্নির তারোধিক গলায়ে রামু চমকে উঠল। মিনি কাঁদো কাঁদো গলায় বারবার বলতে লাগল — আমি আর ভুলে যাবো না, পড়বও যাবো না। গিন্নিমণি মেয়ের টীক্ষ দেখতে চাইছে। না পারলে চামচের বাঁইয়ে পাঁচ কষিয়ে দেবে বলেছে।

কেদারায়-গিন্নি চেঁচিয়ে উঠল — পড়লেই হল। ভুলের বিদ্যেমণি ভবে আজকাল থাকবে না। সব বাড়িতে মাস্টার রেখে টীক্ষ হয় নাকি? আগে মিনিমণিকে বাইরে নিয়ে পোড়ে যেতে পারবেন?

মিনি ভীতের হয়ে বলে উঠল— মা তোমার পেঁয়াজি খাবারে?

— এক কাজ কর, তোর বাবাকে বল, তোর অঙ্কগুলো যদি কষে দিতে পারে।

— যেন বলেছে। বাবাকে একদিন একটা অঙ্ক বুঝিয়ে দেবার কথা বলতেই এমন ঘুঘুতে শুরু করল।

— তা কি করবে! নেশাভাঙ্গ করে রোজের মতো ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মাথা সেটা ঘরে গেছে, একলব্যী গজ গজ করতে লাগল।

— মাইনেপত্তর সন্ধ্যেবেলা মাসে আসেন, তুমি বাবাকে একটু পাঠাও।

— ওরে বাবা। ওই কুম্ভকর্ণ নিয়ে এখন কে জ্বালাবে! ভুই যাও ঠেলেঠুলে। একটু

থেমে বলল — আর একটু বেলা হোক, খুব ছাওলে বলিস।

দুজাইয়ের এক-একজনের বয়সে বৃত্তি করে খড় খড়। গুণতের অবস্থাও ভালোনয়তোনী নেই। অতি-কালার ছাল ছেড়ে গেছে, অবয়ব দেখা যায়। জানালার দরজাগুলো খুলে বিক্রি হয়ে গেছে। এক নাগোয়াড়ি প্রোপেটীর ঘন ঘন যাতায়াত করছে। বুজাই তার প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখছে। রামুর কানে বেটুকু এসেছে, অকারণী লোকটা লোকজন বানাতে চায়, বুজাই আর আনারালী মেয়েটা দিনের পর দিন লাভলাভের জটিল অঙ্ক কষে যাচ্ছে। ঘর কমাকষি চলছে।

রামুর হাতে পোয়ার ব্যবস্থা কেনারামের বাড়িতেই হয়েছে। একটা শাত বাই দশ ছোট ঘরের অর্ধে কেনারামের জানে। বাকিটা ঘিনিমপত্রের সঙ্গে চাকর-বাকরদের জন্য ব্যবহার হয়, সেখানেই রামু স্থান পেয়েছে। ছোট কামরা সাইজের ঘরে একটা মাত্র জানলা দরজা। তাও ছোট নয়বয়ে। মেঝেও সিমেন্ট উঠে গর্ত হয়েছে, ইঁদোগুলা বেরিয়ে গেছে। দেওয়ালের অধিকাংশে জায়গায় প্লাস্টার নেই। ছোনা বরা ইট বেরিয়ে পুরোনোদিনের চুনসুরকি ভরে কষে ছোপাও বিশপ্রকার ডাঁক তৈরি হয়েছে। তক্তাপোষ মেঝের উপর একটা পুরোনো চট বিছিয়ে তারপর রামুর জন্য কলকাতার কাঁথা বালিশ মশারির ছোট বোঝিল রাখা আছে।

রামু পারতপক্ষে দিনের বেলা এই কামরায় ঢোকে না। ওপরে গাছালায় একটা মাদুর খুঁজে নেওয়ার ঘরে ও পুরোনো বাড়িতে ওপরতলায় থেকে। দুখানা ইতিহাসগ্রন্থের বই সঙ্গে এনেছিল। একখানা ইন্ডিয়ার আর একটা আন্দামান বই। খুব গোপনে গুণতের পাতা গুল্টায়। ছোনারায়ে রামুর বিস্তিৎ আকর্ষণ নেই। কেনারাম-গিন্নির ছোটপাটি ইনলীলা অনেক কম হয়েছে। কেনারাম ব্যবসায় মনোযোগ দিয়েছে। আজকাল সাকরাবাদের পাওয়া জন্য কষ্টিকর মেটা একলশীকেও ভালো করেই বুঝিয়ে নিয়েছে।

বয়েকটি ছেলিবড় আকর্ষ আন্তাগোছা শেষ করে রামু ইতিহাস বইখানা নিয়ে একটা বাবের আরামে বসেছে। মনে মনে ভাবছিল পল্টু এলেই বেরিয়ে পড়বে, আজ ডাকের রিস্ট্রেশিয়ে মেমোরিয়ালে যাবার কথা। হঠাৎ মিনি এসে উপস্থিত। রামু ওর বই, কলমপত্র আড়াল করে তাড়াতাড়ি তাকে বসার চেয়ার দিল। মিনির চোখমুখ খুশিখুশি গভীর। সোফার অন্যের লিপিবদ্ধির ক্লাস। মিস্ট্রেসির হল ক্লাসের ফটিন পরিবর্তিত হওয়ায় তীষণ অসুবিধা হচ্ছে। মিনি সামনে এসে দাঁড়াল — রামুদা, আমার টিউটর সাহেবের বাড়িতে গিয়ে বলে আসবি আজ সন্ধেবেলা আসার জন্য। একদম ভোলে ভুল হয়। ঠিকানা লিখে।

একটা ছোট্টো কাগজে মোটা মোটা অক্ষরে লেখা ঠিকানা। ধর্মিপাড়ার কাছে একটা চায়ের নাম আর বাড়ির নম্বর। রামু জীবনে কোনোদিন এই চায়ের নাম শোনেনি, বাই এলাকায় কোনোদিন যায়নি। সে অসহায় চোখে মিনির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। এমনি সময় পল্টু এসে গেল। পল্টু বাস্তা চেনে। মিনি ড্রেসিং টেবিল থেকে একটা পাতা আর অক্ষরের বই নিয়ে এসে বলল — যদি সময় না ভাঙাতে পারেন, এই অঙ্কগুলো, আপত্তি মার্কিং করে ঠিক রেখেছি আছে, করে আনতে হবে বুঝলি?

রামু খুব ভালো করেই বুঝেছে, মায়া ভিক্টোরিয়ার অঙ্কগুলো অসাধ্য ছাই। বিনয়ে মুখে মিনিকে আশ্বস্ত করে বইখাতা হাতে নিয়ে সে উঠে দাঁড়াল। মিনির অঙ্কগুলো পাল্টে গেল। এখন আর ভোরবুম রীতিমত নিশ্চিন্ত প্রকৃতির। পাতলা লাল টুকটুকে ঠোঁটে একটুখানি হাসি আঁকিয়ে বলল — কাজটা ঠিক ঠিক পারলে হোকে কলা খেলা শিখিয়ে দেব।

পল্টুকে সঙ্গে নিয়ে রামু ধর্মিপাড়ার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল। রোদপড়ের দুপুর। রাস্তায় বিশেষ কারে ছোট ছোট গলিঘুঁজি অনেকটা দিনের বেলে লোকজনের চলাচল কম থাকে।

রামুর মনটা কিছুক্ষণ আগেও খারাপ ছিল। কিন্তু রাস্তায় পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনমরা ভাবটা ক্রমে ক্রমে দূরে সরে যেতে লাগল। কলকাতার রাস্তা কারো মন খারাপ রাখে না। রামুর এই উপলব্ধি কলকাতায় আসার প্রথম দিন থেকেই। পল্টুর কাছে তার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। সেকালের এই ছোট্ট স্কীকন ভাড়িয়ালী ছেলেটা কলকাতার রাস্তার সব নাড়ীনক্ষত্র জানে। গ্রামের ছেলে রামু অনুভিজ্ঞ, ঠিক করেছে পল্টুকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরবে দিনকতোর সে কলকাতা ঘুরে

সবকিছু দেখছে। এমন আশ্চর্য শহরে তার দিনগুলি খুব অভিনবাহিক হবে, সে স্বপ্নেও ভাবেনি।

এলাহাবাদীর দুর্ঘটনায়ের একটা ছবি তার খারাপ হয় না। কেনাকাটের সঙ্গে ঘুরেছে বেরানো আর বাড়ি সাজানোর ফলে রাত্রুর প্রতি তার কর্তব্যের অবহেলা হয়নি। এছাড়া সম্পত্তি তাদুর বিদ্যু অন্যদের প্রতিযোগিতা করে ফেলায় কেনাকাটের ব্যবহারের পরিবর্তন ঘটেছে। রাত্রুর হাতের লেখা ও খাতায় বিদেশ রাখার দক্ষতা তাকে অনেক ভয় দিয়েছে।

নবোদয়ালা প্রথম দুজন কি-প্রোকারার রাত্রুর সঙ্গে দেখা করেছে। প্রথম দুজনরা রাদু জীবন সমস্যা হয়ে কথা বলেছে। নবোদয়ালা তাকে সাহস দিয়েছে — খুব খারাপ লাগলে কাজ ছাড়তে বলেছে। তাদের কাজের অবসান কি? নিষ্ঠির মোকদ্দমা ওদেরে কম পাওনায় বেশি কাজ করিয়ে নেবার জন্য একমাত্র অন্তরায়ী ছেলেমেয়েদের, এলাহা মোকদ্দম অফিসেরা ভালো বেতন। ইউনিফরমাজি, কম্পার কম্পার ঘর্ষাক্ত, বাড়ির ঘরকি নেই। মাসকোরা, পাগল, একটু হাসিমুখ এদের সবচেয়ে বুঝোয় রাখা যায়।

একদিন মোকদ্দম কেস চালু। মুক্তন ঘর রাত্রা ছেড়ে বসিলদ্ধ গেল। রাত্রুর হাতে বিদিয় অনেক নই আর খাতা। সে গরিব দুপাশে অন্ধ অন্ধ পুরোনো বাড়ি দেখতে দেখতে খুশি মনে চলেছে। পন্টুর সঙ্গ রাত্রা মুক্তন, রাত্রুকে সে অন্তরঙ্গ পরিচয় আর রাত্রার নাম বলে যেতে লাগল।

— খুকি — ম খুকি — ঈক্ষ দাদা

ঈশ্বরায়ে রাদু আর পন্টু একসঙ্গে চমকে চোখ তুলে তাকাল। পন্টু হেসে ফেলল। একটা ভাঙাচোরা বাড়ির জোরালা থেকে খুব বড় একটা কালাকুয়া মাথা বেরিয়ে চিৎকার করছে। উত্তরাও শোনা গেল জানালা থেকে যা — ই। পন্টু রাদু দাঁড়িয়ে পড়ল। ঠানুমার বয়সী অবশ্য নাদুস নুদুস এক বুড়ী হাতে ঝোলা-পরার ঘটি নিয়ে এসে দাঁড়ালেন। দাঁড়ে কাঁথা ভাকাতুয়ার বাটিতে সেওলো ফেলে দিয়ে পাখিটা গলন সংগ্রহে ঠোকরাতে লাগল।

রাদু পন্টুর কোমরে খোঁচা দিল। মুক্তনেই যি যি করে হেসে উঠল। পন্টু কড় গলায় চীৎকার করে উঠল — খুকি — ম খুকি ...

জোরিওলা এক যুবতী বউ মাথায় নতুন সেটেলমেন্ট নিয়মের বাসনের ঝুড়ি নিয়ে একহাতে বাচ্চা বাঁধিয়ে খুশুরের নিরাপত্তা ভঙ্গ করতে করতে চলেছে। আর একজন জোরিওলা গলায় ঘুমোচ্ছি আসরাজ ভুলে গাড়লালির বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল। তার মাথায় কুড়িয়ে পথরে আসছে, তারা টিন নিচ্ছি।

কালকুয়ার ডাক শেষে মুক্তন খুশি। শোনা জীবনের এক করুণ কাহিনী শোনাচ্ছিল। তার নিজের এক পোষা কুকুর ছিল। অনেক কুকুর, রাত্রাতেই বাস, কিন্তু খুশুর আর রাত্রিকেলা পাখায়ার সময় ঠিক হাজির থাকত। পন্টু তার খাবার থেকে একমুঠো খাবার রেখে দিত। অবসরপ্রাপ্তার পর অনেক ঘন্টাখানেক পন্টুর সঙ্গে খেলা করত। পন্টু তাকে বাঁচাতে শিখিয়েছিল, বুকে হুঁড়ে দেওয়া বল মুখে করে নিয়ে আসত। একদিন রাতে তাদের আলোয় গাছের ধারে মুক্তন ছুটোছুটি করেছে। নিজের খেলাতেও তার পোষ্টনে মুগ্ধ হত, আদর করত। রাত্রায় তখন অন্য কুকুরদের সঙ্গ পছন্দ করত না। পন্টুর চলা বেড়ে গেল, মু চোখ জল ভরে আসে — তারপর একদিন ....

—কি হল? রাদু নির্দিষ্ট হয়ে তাকাল পন্টুর দিকে। পন্টু একটা লাইটপোস্টে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। গলা ধরা ধরা — একদিন মুখুরে এর খাবার নিয়ে বসে আছি মুক্তা এল না। অনেকক্ষণ পরে প্রতিবেশী বুশড়ির একটা বাচ্চা ছেলে খবর নিয়ে এল মুক্তা রাস্তায় বাসওলা পাঁড়ে ধাক্কা দিয়েছে।

রাদু পন্টুর দিকে ব্যথিত দৃষ্টিতে তাকালো। পন্টু জলা নিচু করে পায়ের রাস্তায় চোখ বুলাল। রাত্রুর জন্যে খুব খারাপ হয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে মুক্তন সামলে নিল। রাদু চলতে চলতে খুব আস্তে জিজ্ঞেস করল — কুকুরটার নাম মুক্তা দিয়েছিলি বুঝি?

— আমি দিইনি, ঠাকুমা দিয়েছিল। মুক্তা ঠাকুমাকে খুব পছন্দ করত। তবে ঠাকুমা খুব খুব না করলেও কোনওদিন ঘরে ঢুকতে দেয়নি। মুক্তা মরে গেলে ঠাকুমাও কেঁদেছিল।

সামনে চিত্তরঞ্জন এভেনিউ। মুক্তন বড় রাস্তা পার হয়ে আরও কয়েকটা গলি পেরিয়ে বাড়িপাড়ায় উপস্থিত হল। এখানে একটা পার্ক আছে, ওখানে অনেক ছেলেমেয়ে খেলাধুলো করছে। পন্টু তাদের

বাড়ি নম্বর মিলিয়ে একটা একটি পুরোনো বাড়ির নীচে এসে দাঁড়াল। একজন বয়স্কা স্ত্রীলোক জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল — কি চাই খোকা? পল্টু জিগ্যেস করল মনুমূদন সাহা এ বাড়িতে থাকেন? স্ত্রীলোকটি খুব মুখর ছিল বলল— হ্যাঁ, কিন্তু উনি তো এখন নেই। তোমরা কি ওনার ছাত্র?

— না, ওনার এক ছাত্রীর বাড়ি থেকে আমাদের পাঠিয়েছে, সন্ধ্যেবেলা উনি যদি যান, সেবাশ্রম হাসপাতালে আমের টাকা আছে। রাতু বিজ্ঞের মতো উত্তর দিল।

স্ত্রীলোকটি বড় সয়ানা। একবার ছেলে বলল — হয়ত হাই বলা, কিন্তু বাবা, উনি তো কালপরশু, বোনের বাড়ি গেছেন, আসতে সেই রাত দশটা বাজবে।

পল্টু দুর্ঘটনে একটুখানি ছেলে খেল ভারিক্কি মুরুব্বি বলল — তাহলে কি করা যাবে। চলি। চল রাতু। বলে ঘুরতে পা বাড়াল।

রাতুর হাতে বই আর খাতা। রাতু একবার পেছনে ফিরে দেখল, মাসির গৃহিণী হাসি হাসি মুখে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। আধার লাল পাড় ঘোমটার মধ্যে মুখখানা দেখে খুব ভালো লাগল। রাতুর মনে পড়ল ওর মার কথা।

হাঁটতে হাঁটতে পল্টু জিগ্যেস করল — কি করবি এখন, সিনেমায়রিয়ায় যাবি?

হঠাৎ সামনে হয় সাতজনের ছেলেদের একটা দল হৈ হৈ করতে করতে এগিয়ে আসছে। সবার-আগে দশ-বারো বছর বয়সী, হাতে কাপড়ের ফুটবল। ছেয়ারা পোশাক-আশাক দেখে বোঝা যায়, এরা ফুটবার বুপড়ির বাসিন্দা। কারো পায়ে জুতো নেই। অনেকের শীর্ণ খালি গা জল চুপ। কিন্তু কি উত্তেজনা, খুশিতে উজ্জ্বল চোখমুখ।

—আই পল্টা তোদের যাচ্ছিস —

একটা কালো-কোলো লম্বাটে হাড় জিরজিরে ছোপা ছেলে পল্টুর দিকে এগিয়ে এল। পল্টু হাসি মুখে জিগ্যেস করল — শানু তোদের মাঠ আছে? চোখার?

— বর্ডারপাড়া পার্কে। ও আমাদের সঙ্গে খেলবি। আমাদের একজন কম আছে।

পল্টু খুব আগ্রহের সঙ্গে রাতুর দিকে তাকালো— যাবি?

রাতু আড়চোখে দেখিয়ে বলল — তুই বলি চাস তা যা, আমার যাওয়া হবে না রে।

পল্টুর চোখে উত্তেজনা। সে রাতুকে বলল — বই খাতা বাড়িতে রেখে চলে আয়। পারবি তো? পথ মনে আছে?

— দেখি। বলে রাতু পা বাড়াল। পল্টু শানুর সঙ্গে পেছনে ফিরে চলল। রাতুর হাতে বইখাতা দেখে শানু একটু অবাক হয়েছিল। পল্টুকে জিগ্যেস করল — ইস্কুলে পড়ে? তোর সঙ্গে আলাপ হয়েছে বুঝি?

পল্টু মাথা নেড়ে বলল — নাহে, আমরা একসঙ্গে খেলবানে কাজ করি। ওর বাড়ি অনেকদূরে প্রায়ে।

ফুটবল খেলার ইচ্ছে রাতু ছিল না। বরিও ফুটবল তার প্রিয় খেলা। গ্রামে শীতকালে বনকাটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাঠে ফুটবল খেলার আয়োজন শুরু হয়ে যায়। বিকেলবেলা মাঠে মাঠে ছোটবড় ফুটবল পড়ে। উদ্যুক্ত মাঠে কারও কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই। খোলামেলা হওয়ায় ফুটবল ঢেলে জমাটে গায়ে লেগে যায়। খেলার নিয়মই কে রোমাঞ্চ করে। কি রোমাঞ্চ। আর কলকাতায় গলির রাস্তার পার্কে ফুটবল খেলা, ও অসম্ভব। চারদিকে বাড়ি, মানুষের ভীড়, ধুলো, নর্দমা— ফুটবল কিছু দূর ছাড়া ফুটবলটি কথা যায় না। ফুটবল কখনও গিয়ে পড়বে নোংরা নর্দমায় জলে, তখন যে কারও বাড়ির ছাদে, রাস্তায় চলন্ত গাড়ির নীচে। তখনও কারও কোনওরকম জানাকাপড়ে ছাপ এঁকে নিচ্ছে, কারও মাথায় দুষ্টু দিয়ে যাচ্ছে। খেলোয়াড়দের কোনো নিয়ম নেই, অনুশাসন নেই। অবশ্য এও এক উত্তেজনা, যার ছোঁয়া রাতুকেও স্পর্শ করে তখনও কখনও।

রাতু একা একা। অর্থাৎ বিনা বাধায় বাড়ি নিয়ে আসার তাগিদ নেই। বন্ধু বাড়ি ছেলে গলি পার হয়ে। কয়েকটা গলি পেরিয়ে আসার একটা রাস্তা। একটু হেটেই একটা বেড়ি পার্ক চোখে পড়ল। চোখুরের ভোজ নেই, হাওয়াও ছেড়েছে। উত্তর কলকাতার এই সব প্রাচীন রাস্তা যানবাহন ও ভীড়ের ব্যস্ততা তেমন নেই। চারদিকের প্রায় পঞ্চাশটী প্রাচীন বাড়িগুলো নিয়ে পুরোনো দিনের একটা ছবি এখনও ধরে রেখেছে। রাতু পার্কটার মধ্যে ঢুকল। অনেকগুলো সিমেন্টের বেঞ্চ। কয়েকজন বৃদ্ধ দুটি দলে ভাগ হয়ে নিজেদের মধ্যে গল্প করছে। একটা বেঞ্চে ভবঘুরে একজন চিৎ হয়ে চোখবুজে আছে। রাতু একটা নির্জন বেঞ্চ বেছে বসে পড়ল। তার বেঞ্চটার ঠিক পাশেই এক

বিরাট কুরুক্ষেত্র যায়। অনেকদিন এরকম কুরুক্ষেত্র যায় রাম্বু দেখেনি। তাল ঘাটি খোকা খোকা আগুনের কুলে জায়গাটা লাল হয়ে গেছে।

রাম্বু আস্তে বইটা খুলল। নিমির পাশ দেওয়া অক্ষরগুলোর ওপর চোখ বোলায়। হাতে পাতের পকেটে একটা ডিটেকশন প্রসাধনের থাকে। তলিয়ে অক্ষরগুলো ওপোকরার পড়ল, তারপর একে একে অর্থ বোঝল। উজ্জ্বলমালার চিকচিক উত্তরগুলো মেলানোর পর তার মুখে হাসি ফুটল। নিম্ন-সেকেন্ড ক্লাসের অঙ্ক বাবু আমে জানায়। নাইন-এ পড়ার সময় টেন-ইলেভেনের ক্লাসের অঙ্ক প্রাকটিস করত। অঙ্ক তার প্রিয় বিষয়। একশোয় আশা নিশ্চয়ই – একশ আশিনম্বর পেয়েছে। নিজের অঙ্কগুলো কপার পর নিজেকে কিছুটা রাজাধোক হল। তারপরই মনে আশা অনেক পর এত খুশির ঢেউ ছেলে পড়ছে থাকে।

রাম্বুর চোখের সামনে ফুটে ওঠে একটা পুরোনো ছবি। স্কুলের ছুটির পর বাড়ি ফেরার সেই পথ, হাতে বড়ি নিয়ে খাঁকা খাঁকা। ক্লাসের মাস্টারমশাইদের চশমায় ও উপোসের টুকরো টুকরো কথা। বিকেলের আলোয় রাঙা আর সেটা পথ পরে বাড়ি ফেরা। স্কুল থেকে আসার বাড়ি ফলা গাছেদের পথ। হেঁটে যেতে কোনও কষ্ট হয় না — গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীতে, অনুভূতির কষ্ট-বৈচিত্র্য পথের কষ্ট ভুলিয়ে দেয়। বাড়ি ফেরার পথে বিকেলে খুব খিদে পেত। আসে আসে কষ্টরা বাড়িয়ে ছেলে নিয়ে যায়। ওড়নুড়ি খুব খেয়ে কোন কোন বন্ধুকে অঙ্ক বুঝিয়ে দিত। পড়াশুনোর আলোচনায় বিকেলে কাল খানিক বন্ধ ছিল সর্বত্র।

রাম্বুর মনে পড়ছে শীতের দুপুরে ছুটির দিনে বলখেতের আল পথে কখন খোঁজা, আমবাগানের ভোরের আলোয় একা একা ঘুরে বেড়ানো, পুকুরে ছিপ ফেলে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকা, আর কখনও কখনও বাকলের বাড়ি হাকল ঘাটে উঁপুড় হয়ে থোকাক এরকরেকাথের গন্ধে মত হয়ে যাওয়া। সংসারের অভাব অনিয়মের আকলেও তা নিয়ে বাবা কোনোদিন মাকে ঝামাতে দেখেনি। মাও মুকমুকে সংসারের সমস্ত রকম কষ্টমুহিয়ে থেকে ছেলেমেয়েদের দূরে রাখার চেষ্টা করেছে।

আজ চারবছর হয়ে গেল গ্রামের স্কুল বা বাড়ির সঙ্গে রাম্বুর যোগ নেই। মাকে অবশ্যকটা চিঠি লিখেছে, গ্রামের বন্ধু বান্ধবকেও একটা দিয়েছে। এখানকার অভাবের জন্য ঘরসংসারের কথা আসে নেই। তার ছিল যা জানাতে পারলে খুশি পাবে, তাই কোনও চিঠিতে তার কষ্টের কথা লেখেনি।

এখন বিকেলের মেঘে আগ নেই। গা জুড়ানো বাতাসও ছেড়েছে। ঘামো শুকাচ্ছে। পাশের অলমুড়ি আলাপজনদের আনাগোনা শুরু হয়েছে। আস্তে আস্তে পার্কে ভীড় বাড়ছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাবা-মায়েরা বেরিয়েছে। শিশুরা নরম পা ফেলে ফেলে হাঁটছে। হাসি হাসি মুখ। হাওয়ায় চুল উড়ছে, রঙিন জামা উড়ছে। রাম্বু মুগ্ধ হয়ে দেখতে থাকে।

হঠাৎ রাম্বুর মনে হল, নিমি নিশ্চয়ই অঙ্কের টাস্ক নিয়ে আসছে। সে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। বড় রাস্তা পার হয়ে পশ্চিমের একটা গলির মুখে এসেই ওদের দেখা হয়। ট্রেডমেলি। সামনে খুটো ছেলেকে হাতে ছোজাদি নিয়ে ছুটে আসতে দেখে সে ভীষণ ভয় পেয়ে একটা বাড়ির খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল। সে উঁকি মেরে দেখল, ছেলেখুটোর পেছনে এক লম্বা লোক ছুটে আসছে, হাতে লাঠি গোছের কিছু। রাম্বু ভয়ঙ্কর অন্ধকারে দাঁড়িয়েছিল। বাড়ির ভেতরে যাওয়ার সাহস ছিল না। এমনি সময় খুটো ছেলেটা আশ্চর্যভাবে পড়া কৌশল ধরল, সেই সঙ্গে ভিখারির গালাগালি, ছুটোছুটি। একজন আপত্ত লুঙ্গি করে পরা বয়স্ক টাকমাথা ভদ্রলোক সিঁড়ি দিয়ে উপর নেমে এলেন। দরজা বন্ধ করতে গিয়ে রাম্বুকে দেখে স্তম্ভিত হলেন।

— কি চাই তোমার। চলে যাও, দরজা বন্ধ করবো।

— বাইরে খুব গণ্ডগোল, ভীষণ ভয় করছে বাবু।

— তাতে আমার কি করনি, তোমাকে তো আশ্রয় দিতে না।

— আমাকে এইখানে একটু দাঁড়িয়ে থাকতে দিন, গণ্ডগোল থামলে চলে যাব।

— না না এসব চলবে না। যাও চলে যাও।

রাম্বু ভীষণ নিরাশ পড়ল। চোখেমুখে অসহায়তা ফুটে উঠল। ভদ্রলোক দরজার পাল্লা সামান্য ফাঁক করে বিরক্তির সঙ্গে রাম্বুর দিকে তাকিয়ে রইল। বাইরে হল্লা চেঁচামেচি চলছে। নিম্ন থেকে অতি

আশিনডাঙায় বিক্রি করবে বিলক্ষণ বড়োর টিকেটে। দূর থেকে অনুমান আমার উঁচায় আসছে। উঁচায় পাকাই ভালোও বলেছে।

রামুর দুচোখ ভরে জল এল। তার সর্বাঙ্গ ঠাণ্ডাঘরে ঘর ঘর করে। কলকাতায় আসার পর এমন নিশ্চিন্তে সে ঘুমোয় নি। বাড়ির কর্তাটি রামুর ঠাণ্ডা লাগার কাঁপানো কাঁপানো চেহারা দেখে ভালবাসা হলেন সন্তুলয় এই ছেলে যে ছেলেটি পাথরোলাকারীদের মধ্যে কেউ নয়। তিনি নরজার পাশাপাশি বিল তুলে নিয়ে পুরোনো কালের ইজিচেয়ারে বসে পড়লেন। রামুকে ইঙ্গিত করলেন বসতে।

রামুর ভয়, সঙ্কোচ তখনও চুড়ান্ত পর্যায়ে। তার শরীরে কম্পন সুস্পষ্ট। কর্তাটি একটু সময় সুযোগ দিলেন।

— এস খোকা। এখানে বস। বাবার কোথায়?

রামু তার বাসস্থানের ঠিকানা বলল। ভদ্রলোক রামুর হাতে বইখাতার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন — কোন ক্লাসে পড়ো?

রামু ঘাড় নাড়লো— আমি পড়াশুনো করিনে। আমি যে বাড়িতে থাকি, সেই বাড়ির একটা মেয়ের বইখাতা। মলে রামু সংক্ষিপ্তভাবে সবই জানাল।

রামুর বলার ভঙ্গি,সারলা তাঁকে সন্তুষ্ট করে। তিনি রামুর মেসোর কথা তার মা-বাবা-ভাইবোনের কথা খুটিয়ে খুটিয়ে জেনে নিলেন। বারবার রামুর চেহারা চোখমুখ হাত খুটিয়ে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।

এই সময় সাইরেন বাজিয়ে পুলিশের ভ্যান আর একটা জীপ পাড়ায় ঢুকে পড়ল। আজে আজে গোলমালের আওয়াজ থেমে গেল। বাড়ির কর্তাটি লম্বালম্বা পায়ে ঘুরে বুক বাড়িয়ে দেখে নিলেন। তারপর রামুর দিকে ফিরে বললেন — পুলিশ এসে গেছে। এবার যাবার।

রামুর বুকটায় তখনও ঢিপ ঢিপ বন্ধ হয়নি। কর্তাভদ্রলোকটি তার দিকে সামলা হেসে অভয়ের সুরে বললেন — ভয় নেই। এখন যেতে পার। কোথাও জটিলতা দেখবে না। সোজা চলে যাও।

রামু ঘাড় নেড়ে বেরিয়ে পড়ল। বাইরে এসে দেখল, আজে কেন কিছু পুলিশ এসে আছে, কয়েকজন ছেলের লাঠি নিয়ে বলিতে টানা দিচ্ছে, জিজ্ঞাসাবাদ করছে। জীপের পুলিশ অফিসারটি ঘিরে কিছু কথাবার্তা লোক ও যুবক অভিযোগ জানাচ্ছে। রামু কোনদিকে না তাকিয়ে সেন বড় রাস্তার দিকেই পা চালাল। কলকাতার খানি রাস্তা তাকে অনুসরণ করেনও পাড়ার পাড়ার গোলমালের সময় বড় রাস্তাই যে বেশি নিরাপদ সেটা রামু হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারল।

যখন বাড়ি পৌঁছল তখন সূর্য ডুবডুবু। গঙ্গার জল লাল হয়ে গেছে। ঘাটে ঘাটে প্রমলিরাগীদের ভীড় বাড়ছে। মোবারক ও ফুটবলিন বিক্রেতাদের গলার এই মুহূর্তগুলো বেশ জমে ওঠে। বিশেষ করে নিরভোলা ঘাটের সামনে তাঁরা জমায়েত বিহারী খেলোয়াড়দের খান, রামায়ণ পাঠ, বেটি বেটি মোবারক কেনবেচা নিয়ে মেলার ভাব নেয়।

রামু বাড়িতে ঢুকেই মিনিকে খোঁজ করল। মিনির মা এখনও বাড়ি ফেরেনি, পাড়ার বন্ধুদের সঙ্গেও গঙ্গার ঘাটে বেড়াতে গেছে। রামু একলাফীয় হাতে খাতা বই নিয়ে চলল, সে একটু পশ্চিমের বাড়িয়ে যাচ্ছে।

রাওড়া ব্রিজের কাছাকাছি এক তুলনামূলক শান্ত আর ভারা ঠাণ্ডুলা থাকে। নিমাইদা-দা শ্মশান ছাড়িয়ে গেছে হয়। মহাশ্মশান। ব্রিজটিতে এসে রামুর পা ভারী হয়ে যায়। অজানা ভয় নিশ্চয় তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা পুড়ছে। পাশে ইলেকট্রিক চুল্লিতেও শবের লাইন। ভুল আর রামপ্রাণেশ্বরা গন্ধে এলাকায় বাতাস সবসময় ভারি হয়ে থাকে। এ একটাই যে দুর্গন্ধ নাকে ভুল হচ্ছে। সেক কারা বিয়োগব্যথায় আরা চত্বর জেন জনকজন পাতালের মতো অন্ধ, এর মধ্যেই বিলাপের আর্তনাদ। মৃতদেহ আসছে একের পর এক। চিতায় উঠছে। ব্রিজটার বুকফাটা কান্না থেকে থেকে ছড়িয়ে পড়ছে। আর একদল লোক ঘুপচি আর হাড়ালের চালা পড়ে আছে শ্মশানের লাগোয়া নিরবচ্ছিন্নভাবে অনিয়ার ঘণ্টাধ্বনিতে। তাদের মাটিমাখা বীভৎস অবয়ব। সাদুর মতন গুঞ্জন, উঁচায় গলার ভেসে পাই ছড়িয়ে পড়েছে মন্দিরের বাইরে, বিশে বাজে আকাশে, গঙ্গার স্রোতে।

অনাদিনের মতো আজও রামু মন্দিরের ভেতর ঢুকে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। নিপুণদেহী নরনারী বিশেষ করে বর্ষী উঁচায়ারোগীরা ভক্তিভরে মন্ত্রোচ্চারণ করছে, অঞ্জলি করছে, ঘণ্টা বাজিয়ে

অন্ধকারে জলছে, হর হর মহাদেও। এর মানে কী হয়? আরও মানে, দীর্ঘজীবন, দীর্ঘজীবী।

বাবু মন্দিরের চাতালে এসে দেখল, রাস্তার ওপর সারি সারি বসে থাকা ভিখিরিদের ভিড়ের পাশ দিয়ে ঘোড়ায় টানা খুচরো গাড়ি যাত্রীদের নিয়ে চলছে। সে এক মোক্ষম জায়গা। বিশালদেহী মহাদেবের চওড়া কাঁধে মোটা সোনার চেন ঝলমল করছে, হাতের আঙুলে হীরের আংটি, পাশে সাদাপাথর সহযোগিনী বিপুল ত্রিবেদিনী — উজাড়ই প্রণাম দিতে সেবকের পর্যবেক্ষণ করছে। ভিখিরিদের জোরদার উল্লাস, আশ্রয় অনুভব।

শ্রদ্ধালুদের প্রবেশমুখে বাবু আর এক ঘুরে দাঁড়ায়। ভিতরে যায় হচ্ছে। আওনের বিশাল গর্ভে ছাই হোমা উঠে আসছে আকাশে। অগোছালো মুণ্ডদেহ ঘিরে পুরোহিতা আর্যীয় পরিজনের আহা— প্রতিদিন এক দৃশ্য। যায় শেষ হলে গঙ্গাস্নান ও গঙ্গার কাছে প্রার্থনা করে শরীর পাবে ফিরে যেতে। তখন আর কেউ কাঁদবে না।

পাশাপাশি দুটো স্বপ্নান — একটি পুরোনো রীতি মেনে কাঠের চিতায় দাহ হয়। পাশেরটা বৈদ্যুতিক চুল্লি। দুটোর স্বপ্নানের বুকফাটা চিত্র। চিতায় দাহ করে সাধারণত আত্মজনেরা পরিচর। দাহ করার আগে নানান আচার-অনুষ্ঠান হয়। এদের শোক দুঃখের প্রকাশ সবই স্থূল ও আন্তরিক। কিন্তু চুল্লিতে যারা দাহ করে অনিচ্ছাসত্ত্বে স্বপ্নার পিছিয়ে থাকে। তারা সাধারণত কাঁদে না, অন্যদের কান্নাকাটি ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে থাকে, সময়মতো একমুঠো ছাই-এর পুঁটলি হাতে পাওয়ার অপেক্ষায়।

বাবু দেখল একটা পরবর্তী গাড়ী এইমাত্র বাঁ পাশিতে হয়েছে। সেখান থেকে তিন চার জনা চাইনিজ থেকে বাঙালি গড়নের স্ত্রীপুরুষ নামল। দুটি যুবক, সঙ্গবত ভাইবোন, দেখলে বোঝা যায় লম্বা সিঁড়িভাঙার নিশ্চপদে ফোন বুঝছে। তারা একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। বাবু আর দাঁড়ায় না। কিছু দূরে গেলে ফুলওয়ালার পাশ ঘেঁষে এক সারি কুপড়ি। তার একটিতে থাকে পল্টু আর তার ঠাকুমা।

পড়ন্ত রোদ্দুরের শেষ আলোর ঘরে ঠাকুমা খেজুরের পাতার চাটাই বুনছে। বাবু অবাক হল। এই কর্মচঞ্চল শহরে খেজুর গাছ কোথায় পেল ঠাকুমা। বাবুর বিস্ময় লক্ষ করে ঠাকুমা একগাল হাসল — বাবু আয়, পল্টু কই, ফোনমুখ সব ওইখা দিয়ে। দাদা না, আঙুর গাছের পাতা আমরি চাটাই বানাইমু।

হাতের ডালপা কাজখসে, আঙুলগুলো ওকিয়ে খোড়া কাঠ। এরমিধ্যেই যাতে কোমর ভেঙে গেছে, এখন চাটাই বুনছে মুখাটুকি আকখনে মাথা গুঁজে সেই প্রাচীন মেয়েমানুষ যুগের মতো। বাবুর দিকে হাসি হাসি চোখে তাকিয়ে বলল — একটুখানি খেস্ যাদু, তলো জলা শীতল অনছি, ঘরের সঙ্গে খইতে ভালো লাগব।

চকচকে বন্ধ গ্লাসে ছিপোস করল — মোর মিহো কই। ছলনা নাই যাদু কিছুই করব আমারে।

— পুটিমল খেলছে। এখুনি এসে যাবে। ঠাকুমাকে বাবু আশ্বস্ত করে।

— বড় ভয় লাগা আর তিন বুলে কেউ নাই। যদি মা মরা ছাওয়ালডারে লইয়া ঘর ভয়।

ঠাকুমা চাটাই বোনা বন্ধ রেখে আড়ি করে কুপড়ির ভেতর ঢুকে যায়। বাবু মুখোমুখি বসে ঝরঝরানা রেলের পাশে কুপড়িতে লাইনের মধ্যে পল্টু আর ঠাকুমা এসে ঘর বানিয়েছে। সবাকে ঠাঁই মেলে না। কেউ ঢাকনা তীব্র আবুক। কুপড়ির সংখ্যা বাড়লে মজাল আর পুলিশের নজর পড়ে। অসামাজিক কাজ কারবার শুরু হয়ে যায়।

পল্টুরা আগে ছিল হাওড়া ব্রিজের কাছে। ট্রাইবুনালের নীচে। তারও আগে গঙ্গার ওপারে শৌলমলের কাছে। ঘাটবর্দলের বেশকিছুদিন কেটেছে। বাংলাদেশ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে মোহের আবর্জনার মতো ভেসে আসা ঠেকতে ঠেকতে কলকাতায় পৌঁছেছে, সে এক সুদীর্ঘ যাযাবরের কাহিনী। উদ্বাস্তু শিবির থেকে বাবুদের ওস্তাগরদের বস্তাবাড়ি, পল্টু তখনও ঘুমের শিশু। বাবা অন্তিম রোগে মারা গেল। তারপর অকূল সমুদ্রে মাঝিহীন নৌকা। একদিন পল্টুর মাকে পাওয়া গেল জলতলের মধ্যে, একদল নরপশুর অত্যাচারে অচৈতন্যে। বিহ্বলগ্রস্ত ঠাকুমার মতো ঝিনুনিও সেই ছিল, অবশেষে গলায় দড়ি দিয়ে তবে শান্তি। ঝিনুনি পল্টুর কাছে ঝিনুনি ঠাকুমার কাছে বাবু শুনেছে, তাদের অসহায় জীবনের ইতিহাস।

ঘর বলতে রেললাইনের মধ্যে খুলতে যায় চার পাঁচ হাত। এইটুকু অবসরে কুপড়িবাসীদের সকলের সঙ্গে গল্প করার-সকলের স্থান। জায়গা ঝোঁটিয়ে পরিষ্কার। কোথাও পুজোর দেবী ঈশ্বর।

দেয়ালটা-লিখনটা যারা করেছিল, উত্তরপ্রদেশ থেকে, অভিবাসী বা ওরকমই কোনো আখ্যা-বিভূষিত উদ্বাস্তু. সেদিন রাত্রে তাদের সাথের কুড়ালে থেকে ভিক্ষা, কেউ কেউ আপাতদৃষ্টি পরিশ্রমী কুলিমুকুর। অন্যান্যদের অন্য কাজের কয়েকটা কুপত্রিও আছে সেওলোর সিটিও আছে, নানান বয়সী নারীপুরুষের অন্যান্যেনা। দুজু, আজন, পুরিয়া, লাহা ও পাঞ্জাব প্রেক। সেখানে সন্ধের পর থেকে গভীর রাত্রি পর্যন্ত ভিন ভাগ চলে। কয়েকজন অভিযাত্রী বাবা ও মায়ের সাথে পাশের ফ্ল্যাটের ছাত্রছাত্রী থেকে এখানে নিয়মিতো দর্শন দিতে আসে। ছবুকীবাবা, বাপদিবাবা, সোটা রহস্যের সন্ধানদাতার বিস্তৃতি দেখে শাহরুখ সর্বত্র হয়ে হাতে গলায় জড়ানোর মালা, গলায় ঝিনি পাথীদের বিদেশী ট্রান্সিস্টার, অনিমেষের সোনালী বাহুতের এইচ.এম.টি, এই সব ঠেকে আসর জমিয়ে বসে। নানান ইশারা, ইশকলা, হাতে ফোড়ার বই, ছাওড়ার টাইমটেবিল, হুটাৎ কজনকে পাড়ি ছাড়ানোর আলাদাকের আবির্ভাব, আবডালে লেনদেন, তারপর দুপয়সা বেরিয়ে গিয়ে গাড়ি চড়ে অদৃশ্য।

পল্টুদের ঘরের পাশে এরকম দুপনা ঘর। দিনেরবেলা চেনশন। হাতে ঘনশ্যামকম। রাতের ডিনারের হাত্তা সহ্য করতে না পেরে পল্টু তাদের দু পড়ি জন্য জোগাও সরিয়ে নিয়ে যেতে হয়। বাপমাটি খাদের পাশে একটা জায়গাও দেখা আছে। ঠাকুমা যেতে চায়নি। গঙ্গার ধার ছেড়ে বড়তে ইচ্ছে নেই। কয়েকদিন দুটো অন্যান্যী আড়িতে অনেকরাতের জন্য করে। এবার একটা ছেড়ে নেয়ে : যাদের সাথটা ছুটে আছে, শক্তিও নেই সাথের মানুষ। অনেক ঘুরে ঘুরে পল্টু এই জায়গাটা শেষ অবধি ছেয়ে ঠাকুমা নিশ্চিন্ত হয়েছে। শেষ কটা দিন এখানেই কাটাবার ইচ্ছা।

ভাড়া টিন-তিপলের ছাউনি, কাদায় লেপা মেঝা। এখানে ওখানে চট-পলিথিন দিয়ে কাঁচা-মোকের বন্ধ করা হয়েছে। ঘরটায় একটা মাত্র জানলার তাকের জায় অন্য জায়গায় টিনের কাঁপ। দরজাটিও টিন আর প্যাকিং বাক্সের কাঠের টুকরোয় তৈরি। ঘরের মধ্যে ঠাকুমা শোয়। পল্টু কখনও কখনও ঘরের বাইরে পাটিতেই রাত কাটায়। বর্ষায় বাদলে ঘরটাই তাদের শেষ আশ্রয়।

ঘরের সামনে মোকুলু বাবু বসে আছে। একটা ট্রেন চলে গেল। ঘড় ঘড় করে সামনে একটু ধুলো উড়িয়ে, জায়গাটার বাসি বাজারের মতো করে ছাইসেল দিতে দিতে রেলগাড়ি চলে গেল। বাবু যে ট্রেনে করে একদিন শিয়ালদায় নেমেছিল, তার সঙ্গে এর তুলনাই হয় না। অনেকটা খেলনার মতো এই সাতুলার ট্রেন চলে যাওয়া দেখতে বাবুর খুব ভালো লাগে। সামনে ঝিনুদের ভেলেই ওড়পাঞ্জার স্টেশন। বিরিরি যাত্রীবাহী ট্রেনটা এখন বেশ খালি। সব জানলা প্রায় ফাঁকা— দু-একজন করে বসে আছে। এরোপ্লেনে শেষ কামরার দাঁড়িয়ে থাকা লিপাহেটি টানছে। গাড়ির পেছন পেছন খুটিনাটি ছেলেমেয়ে ছুটে গেল কিছুদূর।

ঠাকুমা একটা থালায় চালের গোলায় জায় ওলোয়ো পাঁপর নিয়ে এল। বাবুর হাতে দিয়ে দিয়ে বলল — পল্টুর ব্যাপুনও নেয়া নাই, খেলা যায় খেলা

জল শেষ হয় না, পল্টু এসে হাজির। খালি হা। ঘাট থেকে এসেবারে হাত পা মুখ ধুয়ে মোছে ঘুরে এসেছে। জল এখনও ওঠেনি। ঘরে ঢুকে জামাটা ছুঁড়ে ফেলে, ছেঁড়া গামছায় সারা শরীর মুছে ফেলল। বাবুর দিকে তাকিয়ে বলল — আজ চার গোল খেলাম। দুই ছুটোছুটি সার হল।

পল্টুর অবস্থা দেখে বাবুর হাসি পেল। যেন যুদ্ধে পরাজিত সেনাপতি। জিতলে অবশ্যটা হত অন্যরকম। কপালে ঘাম, চুলগুলি, ঘর্ম — নানান অভিব্যক্তি দেখা যেত ওর মুখে। এখন চুপচাপ।

— এই মিনির আজকে ঘড়া বই কাকে কেবল দিদি বলল, কি বলল রে? পল্টু দাঁত বের করে হাসল — জল কাছে না গেলে পিপিসপিস্তি খুব নাছে যা রে?

এবার বাবুর পালা। সে মিটি মিটি হাসতে লাগল। প্রথমে ঝিনু বলল না। কিছুক্ষণ হাতে ঘাসে খেলল — শেন, আমি মিনির খুব অঙ্ক ওর আতার করে দিয়েছি। সবগুলোর হাইট আনলার মিলে গেছে। খুব মজা হবে। ও তো কোনদিন বুঝতে পারবে না আমি করেছি।

পল্টুর মুখোশ মোটা হয়ে যায়। বিস্ময়ে গলায় বাল উঠল —তুই আগের অঙ্ক জানিস?

বাবু ওর অবস্থা দেখে নিজেকে আর একটু মেলাল — ওহ্ এখন কি, আমি ক্লাস করলে ক্লাস টেনের ছেলেকেও অঙ্ক শেখাতে পারি।

পল্টুর কিছুদিন খুশখেয়ালে কেটেছে। সে এক ফেব্রুয়ারি-মার্চের পরীক্ষা ফুরনো। ঠাকুমা তখন প্রায়ই অসুস্থ ছিল। ফোড়-ফরীর ভয়ে পড়ে ছেড়ে দিয়েছে। ঠাকুমার শরীর অসুস্থ হওয়ায় সেবাশুশ্রূষার পুরি চুকিয়ে দিনরাত কাজের ফাঁকে ফাঁকে ঘোরাঘুরি শুরু করে দেয়। পড়াশুনো হাসপাতালে ফোনগুলি খুব মনোযোগ দেয়া ছিল না। ভালোও লাগত না।

ঠাকুমা পল্টুর সামনে পাঁপড় ভাজা দু দিতে গেল। সে সব পড়েই রইল।

— রাত্ন তুই কতদূর পড়েছিস রে?

রাত্ন মুহূর্তে স্থির হয়ে পড়ে। একটু সামলে বলল — সাইন থেটা টেন-এ উঠেছিলাম। আমি জার্মানির ছিলাম চুয়াল।

— জার্মানি মানে?

— ওহ্ কিছু না। রাত্ন কথার মোড় ফেরাল — আমাদের স্কুলে অঙ্কের টিচার ভালবাসু, ইতিহাসের শ্রীকরবাবু, ভূগোলের প্রমথনবাবু সবার আগাগোড়া খুব ভালোবাসতেন। রাত্নর কণ্ঠে বিষণ্ণতার ছোঁয়া লাগে।

—আচ্ছা, জলঙ্গীয়ার ফোনেও ব্যাঙ্কুট খেলা হয় না?

— হয়, মাঝখানে অনেক বুড়িনি কাজ আমি দেখেছি। তুই পরীক্ষা খেলা দেখেছিস?

রাত্ন জবাব দিল —ওহ্ বইয়ে পড়েছি, খুব নিষ্ঠুর খেলা।

— খুব নিষ্ঠুর খেলা হয়ে। খুব পরিশ্রম করতে হয়। তবে আমাকে আমে নাক খুব বীর মেনে চলতে হয়।

— তুই দেখেছিস?

— অনেকবার। ওয়েস্টার্ন ফোয়ারে প্রতিবছর হয়। তিনদিন ধরে। ওহ্ কী ভীড়! বাবা!

— আর একদিন। কবে হবে জানিস?

—ও ঠিক জেনে নেব।

পল্টুর চা জলখাবার শেষ হতেই রাত্ন বাইরে তাকিয়ে বলল — উঠি। পল্টুও রাত্নর সঙ্গে উঠে দাঁড়াল — চল্ আমিও একটু ঘুরে আসি।

ঠাকুমা চীৎকার করে বলল — পল্টু কাল, চাঁইর আসার ওক্তাবু আসিস।

— আচ্ছা আচ্ছা, আমি রিমিমনা।

রাত্ন বলল — ঠাকুমা আমি আসি।

—যাই কইতে নাই যালিক। আইস আইস আবার।

রাত্ন আর পল্টু ঝুপড়ির বাইরে এসে দেখতে পেল পাশের ঝুপড়ির ঝুলে থাকিয়ার বসে গ্রামে মন মেলে আছে। থাকিয়ার নিচে বুটো আলো জোড়ল, তোলাইও হতে পারে। ঈটুর ওপর লুচি ভুলে পাশেছে, তোলা লিকলিকে বাঁশ সাহায্য আটিয়ে বসে বুপড়ের পা টিপে দিচ্ছে। এরা ফোনের কাজ করে তবে সরকারি নয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের মনোরঞ্জনের সাহায্য করে, বিনিময়ে দশ দিল টাকা পায়। এরা সরকারি ফোনবের সাপোর্ট হিসেবেও কাজ করে, তার অপারেশনালদের খুশি করার জিনিস খোঁজে যাতে ফোনের কাজটা পাকা হয়।

বুপড়ের ফেন তোলা হচ্ছে, খেতে খেতে সেবাতী মন মজাতে গুন গুন করে। জানালা দরজে। ঘর একজনের হাত বাঁশ-এর পাটির হাতকাজে। বাঁশ সাহায্য পরনে সাদা ব্লাশা শাড়ি, কপালে সরু টিপ, ভীষণ মনিষী সময়ে জানীন পরপোষা ঝুলে আছে। ভীষণ ফোলা বাটিটা ভিন ভিন করে ঘামছে আর নিচু ঘরে বুপড়ের কি সব বলে যাচ্ছে।

রাত্ন আর পল্টু হঠাৎ রমণে ইউস চীৎকার চেঁচামেচিতে। সামনে এক বুপড়ি থেকে ফোনের সাহায্যের এক ছেলেমানুষ বউ ছুটে বেরিয়ে আর একটা বুপড়িতে ঢিয়ে ঢুকল। পেছনে ঘণ্ডামার্কা একজন তীর বেগে ধাওয়া করেছে। মুখে অশ্রাব্য ভাষা। ফোনা আর ফোনটা মাতাল হয়ে গেছে। বুপড়ির ভেতর ঢুকে মেয়েটাকে টেনে বের করে আনে। মেয়েটির শাড়ি খুলে গেছে, সায়া আছে তাই রক্ষে, গায়ের জামাটা ছেঁড়া। ঘণ্ডামার্কা লোকটা তার হাত ধরে টেনে নিজের বুপড়িতে ঢুকে দরজা বন্ধ করল। কিছুক্ষণ চীৎকার চলল, তারপর হঠাৎ চুপচাপ। আশপাশের বৌঝিরা ফিক ফিক করে হাসছে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে। বৃদ্ধারা মুখঝামটা দেয়।

পল্টু আর রাত্ন অবাক দাঁড়িয়েছিল। রাত্নর নিশ্চয় দেখে পল্টু দাঁত বের করে হাসল। কানে মুখ ঠেকে কয়েকটা কথা বলতেই রাত্ন ছিটকে সরে গেল। ভীষণ সঙ্কোচে কুঁকড়ে গেল। নারী-পুরুষের যৌনসম্পর্কের রহস্য পল্টু এই অবেলায় ফাঁস করল যা জেনে গ্রাম্য কিশোরের পক্ষে অস্বাভাবিক। রাত্নর মনে হল পল্টুর বয়সজ্ঞান জীবন-অভিজ্ঞতা তার চেয়ে অনেক গভীর পরিণত।

মেয়েদের সম্পর্কে রাত্ন অনভিজ্ঞ নয়, পল্টু জানা জানে। কিছুদিন আগে মিলিয়ে

নিয়ে কিছু বলতেই এইরকম হিংস্রভাবে তাড়িয়ে দেবে সেদিনও ভাবিয়ে তুলেছিল। পল্টু বেশ মজা পায় এতে। কম লেখাপড়া নিয়েও পল্টু যে জানে, তার কাছে রাতু শিশু। কিছুদিন আগে বিনির প্রসঙ্গে রাতু পল্টুর কাছেই প্রথম জানল মেয়েদের ঋতুস্রাবের কথা, তার ফল পাওয়া ঐসময় বিজ্ঞান পড়েও এর স্পষ্ট হয়নি তখন। পল্টুর জ্ঞান আবার পাঠ্য পুস্তকের ভাষায় নয়, জ্ঞান এক জীবনের ভাষায়, এমন কটু অভিজ্ঞতা যা বুকে নিয়ে ধন্যী স্কুটার ভয়ে ভোলে।

কিছুদূর যেতেই তারা তাদা পার্টির আওয়াজ শুনতে পেল। আইইটিটোলার দিকে যাওয়ার মধুবনপল্লীর সরু রাস্তায় সজ্জিত বিশাল একখানা ঘরোয়া গাড়িতে বর চলেছে বিয়ে করতে। দুপাশে গাড়িগাড়ির ভিড়। কুতুল নরনারীরা হেঁটে চলেছে। রঙিন সেলোফিন কাগজে মোড়া নানান মিষ্টির উপহার সাজিয়ে বিশাল ডালা মাথায় সারি সারি চলছে। বাজী পুড়ছে আর ঝিন্দি হিন্দী বাজনার সঙ্গে কিছু যুবকের উদ্দাম নৃত্য। পল্টু আর রাতু ঐদের কাছে চলে যায়। বরযাত্রী বিভিন্নের প্রকোষ্ঠে বসে বিয়ে দেখতে থাকে। পল্টুর দুই পা নাচের সঙ্গে তাল ঠুকছে। রাতুর কেন জানি ভাল লাগছিল দেখতে। হঠাৎ খেয়াল হল, রাত হয়েছে, এবার ফিরতে হবে।

— আমি যাচ্ছি, বেশি দেরী হলে বকবে।

— কে বিনি?

— দাদা, বিনিকে আমি ভয় পাই নাকি!

—বিনির সঙ্গে তোর খুব ভাব না?

— (মৌন)।

রাতু পল্টুকে আর খুঁচোল নিল না। ঐদিক পা চালাল। পল্টু ওর সঙ্গে কিছু পথ এগিয়ে গেল। ফিরিতে পল্টুর ভালো লাগে। যেমন ওর গৃহস্থের কুলপদ্মরা সুখারী মেয়ের সঙ্গে এত আগে কোনদিন ভাইবোন পরিচয়ে কথা বলার সৌভাগ্য হয়নি। রাতুর সঙ্গে বন্ধুত্বের ঘটিয়ে সেই সুযোগ পেয়ে সে ধন্য হয়ে গেছে।

কেলনারায়ণকে পল্টু মোটেই পছন্দ করে না। তবার কথায় কথায় ঝুপসির ছেলে আর বাবা মা তুলে গালাগালি চলে। কিন্তু বিনিকে দেখে পল্টুর মন ভরে যায়। বিনির হাসি, কথায় কি যে জাদু! পল্টুকে সেদিন বলেছিল — তুই এত বোকা কেন রে? সেটি ভাবে খাস না বুঝি? তার দরুণ ক্লাস ক্লাসে পল্টু লাফোয়ে ঘুরছে নুন নীচু করেছিল। সেদিন বিনি মুড়িতে আসার দেখে রাতু ও পল্টুকে ঘাইয়েছিল।

টুপ্পাস ইটিছিল বুঝন গলার ধার ঘেঁসে। একটা সিমেন্ট জল ঝোড়শাড় করে চলে গেল। সিমেন্টের আলো প্রতিপাতে ঝোলা ডালের ঢেউগুলি খান খান হয়ে যাচ্ছে। গাছের অবিশ্বাসে অন্ধকার জমাট হয়ে আছে। রাতু বলল — এবার ঘরে যা, রাত দেখা হয়ে। রাতু ঐদের এগিয়ে গেল। সেদিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল পল্টু। হঠাৎ নিরুপায়হীন ভালোবাসার কারণে পল্টুর বুকটাও সবটাই ভুল হয়ে গেল। সে যেন বুঝতে পারে রাতু আজ আছে কেলনারায়ণের ঘরের লোক হয়ে উঠেছে। বিনির সঙ্গে তার ঘুরোনো কথা হয়, সাক্ষাৎ হয়।

পল্টু আস্তুটি ভয়ে চলে উঠল — ভাবনায়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সেদিনের বিকেলে সোনারূপ ঘাওয়ার আগে বিনির হাসিমুখে ভুল ভেঙে কিরে আসতে বেশ নিশ্চিন্ত হল। সেদিন এইটিন এ্যাসেম্বলি-পার্টিশিপিট-কার্ডিনি তার কাছে কোন সমস্যাই নয়। শুধু একটু ভয় ছিলই। চর্চার অভাবে ভুল অঙ্কের টিচারেরই ভুল হয়ে যায়।

বেশ স্ফূর্তি মনেই সোনারূপের উদ্দেশে যাত্রা করে। বেশ কিছুদিন সে একা একাই বাসোয়াত করে। কেলনারায় কম ভয় এক কথা শিখানিয়া যাবে। পঞ্চায়ত নিয়ে মাতামাতি সহজে কাটে না। এ জন্য প্রতিদিনের কর্তিন।

পাকার ছাত্রা বয়ে যেতে যেতে রাতুর চোখের সামনে ভেসে ওঠেছিল নিজের ভূমিকা সারি। কিছুই আশাপ্রদ হয়নি। হাবার চোখমুখ, ভোজনের কথা, হাসি সবই স্পষ্ট। ওর স্বপ্ন ছিল একদিন পড়াশুনা শেষ করে সরাসরি চাকুরিতে যাবে। মা বাবাকে টাকা পয়সার অভাবে কষ্ট পেতে হবে না। তাই যেন শেষরক্ষা পেয়ে স্কুলে যেতে পারবে।

রাতু কিছুতেই জানতে পারে না, বাবা মারা গেছেন। রাতু স্পষ্ট দেখতে পায় বাবা সন্ধেবেলা কাজ থেকে ফিরে হাতপা ধুয়ে মুখ মুছে কিছুক্ষণের জন্য রাতুর কাছে এসে বসেছেন। রাতু কোলে পড়া মুখটা জমছে। ইতিহাস ভূগোল আর বাংলা ঘর করিয়া

হলো তবু অনেকক্ষণ ধরে বসে বসে ভাবলেন। রাত্রে অন্ধকারে বাবা আস্তে আস্তে বললেন— জানিস বাবা, বিপদে মতো বন্ধু নেই। আর তার সঙ্গে নেই সহিষ্ণুতার আলম্ব। মানুষ কে কিছুই বলে না, তুই কেন আমাকে মতো মারিয়ে বসলে। বাবা মাঝে মাঝে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লে পাশের প্রতিবেশের ওপর ভরে নিশ্চিন্ত নিতেন।

সারাদিন একলক্ষ্যে বসে মুদুরীর খাতা দেখা কাজ করতে করতে বাবা ঠুঁজো হয়ে গেছলেন। রাত্রে ভেবেছে, বাবা ছাত্রজীবনে খুবই মেধাবী ছিলেন, কিন্তু অনেকের মতোই সংসারের বোঝা কাঁধে এসে পড়েছিল বলে স্কুলের গণ্ডী পেরোতে পারেননি। বাবা কি বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর মতুরও এই পরিণতি হবে! মৃত্যুর আগে কিছুদিন ধরে তিনি রাত্রুর মাথায় এসে বসতেন। তবু তার পড়া মুখস্থ করা শুনে যেতেন, কোন উপদেশ দিতেন না। কিছুকাল আগে প্রেসারের অসুখে তিনি দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন, হঠাৎ তার গভীর ক্লান্তি তাঁকে আচ্ছন্ন করেছিল।

পাঁচ

রাত্রুকে প্রতিদিন ভোরে উঠেই দোকানে যেতে হয়। কেনাকাটের সৌজন্যে ইটা বেড়ে যায়। রাত্রুকে এখন সকালবেলা পড়াশোনার আগেপাছেও সামলাতে হয়। সকালে গরম সিঙ্গারা-পুরি-ফরকারি-চা বিক্রির ভীড় থাকে। আগে ভোরেই কেনাকাটের দোকানে এসে সাজাতে হত। খুব কষ্ট হত। সারারাত শীতের শেষায় শরু খুব সহজে ছাড়তো না। সিঁড়ির ঠোটপাটে ঠোক খুলতে হত। তারপর মোলায়েম প্রাতঃকৃত্য সেরেই দৌড়, দোকানের ঝাঁপ খোলা।

রাত্রুর চলাফেরার প্রথম কুয়াশা খুব সাবধানে পরিবেশন করে কোনোরাম আশ্রয় করেছে। ছেলেটাকে মেটামুটি নিরাপদেরো মনে হয়। বাড়ির বাসন মাজা, ঘাটকরমাস থেকে মুক্তি দিয়ে কেনাকাটের সম্পূর্ণ নিজস্ব পার্থটির করে নিল। এ ব্যাপারে সিঁড়ির সঙ্গে একটি ঘোটপাটো যুদ্ধও করতে হয়েছে, নিজস্ব বাসস্থানও করতে হয়েছে।

বিশেষ করে দোকানের হিসেব-নিকেশ, খুচরো কাজ সামলানোর ব্যাপারে এই চার পাঁচ মাসে রাত্রুর ঘাড়ে উঠে গেছে। তাকে পুরোপুরি নয়, কেননা মেসিকেও খুব সাহায্য। কেনাল ভোরের সকালের দিকটা দোকানের কর্তৃত্ব একরকম রাত্রুর দায়িত্বে। চুকলিদের তরফের দিক থেকে বাধা এসেছে। এতদিন এই ছিল কেনাকাটের ডানহাত। কাজেই হাতছাড়া হয়ে যেতে রাত্রুর বিরুদ্ধে কানভারানির চেষ্টা যে করেনি তা নয়, তুবার সে চেষ্টাও বিফলে গেছে পল্টুর সাক্ষীতে। পল্টু কখনই অন্যায়কে সহ্য করতে পারে না।

চৈত্রের মাসের শুরুতেই আকাশ গরম পড়েছে। রাত সাড়ে চারটে খুব ঘুরনি রাত্রুর। তবু আজ কেন বিকলী আগে, শাখা নেই। কলাইর মধ্যে ভোরের আগেই ভোলাকাটি নিভিয়ে দিতে হয়। গরমে ছটফটানি সকল।

আজি রাত্রুরোই ভার ঘুম ভাঙে। শুয়েই ভাবে ওঠে থাকতে ইচ্ছে করে না। আজের অন্ধকার পুরোপুরি পরিষ্কার হয়নি। পাখা ডিকুক। হিন্দুস্থানী ও উৎকল প্রবেশীয়দের কারও কারও সেটা কখন যা রাত্রু হাতে পাখার দিকে যেতে দেখা যায়। কেউ কেউ ভাবে পাখার ভার ছেলের ওটি হাতে ভালের ওপর চলেছে।

রাত্রু চার-পাঁচ মাস কলকাতায় আসিয়েও পাড়াগাঁয় কিরে ঘুম করার বাসনাটা এখনও ভুল করতে পারেনি। একাদশীর কড়াকড়িতে প্রথম প্রথম ভয় করতে হয়েছে শীতের ভোরে সে এক নিষ্ঠুর যন্ত্রণা। এরপর অভিজ্ঞতা পেতে সে সময়ের আগে ঘুম থেকে ওঠে। প্রাতঃকৃত্য সেরে ঘটিবাসনের জলে মাথা ভিজিয়ে ভেজা গামছা বেঁধে নিয়ে ওঠির প্রকাশ রাখতে হয় রোজ। সেটাই চলছে। ভোরে ওঠার বাড়িক এ বাড়ির আগের নেই। সুতরাং ধরা পড়ার সম্ভাবনার ভয়।

এর পরই একাদশীর ঘুম আসে। ঘুম থেকে উঠে সে প্রতিদিন সকালের স্নান সারে। উঠোনের এক কোণে কেথানে পাশাপাশি ঘুরে বাড়ির পরিসরে এক টুকরো আকাশ দেখা যায়। সেখানে দাঁড়িয়ে সূর্য প্রণাম করে। বিশালদেহী একাদশীর স্নানপর্ব সারাদিনে আরও দুবার হবে, দুপুর আর সন্ধে। বারো মাস, ছয় ঋতু এর ব্যতিক্রম নেই।

দীর্ঘ বাঁশি সারিয়ে চক্রবেলা গাড়িয়ে ইস্কিন হলে গেল। রাত্রু প্রস্তুত হয়েই ছিল। একাদশীর সূর্য প্রণাম সারার সঙ্গে সঙ্গে রাত্রু বেরিয়ে যেতে চেয়েছে কলল — জানিয়া, দোকানে যাচ্ছি।

— আসার সময় কিলোবাজারের

পাঁচমাথার আড্ডা ছাড়া এরকম ঝকঝকে দিনে নিয়ে আসবি।

— ঠিক আছে, কাল রাত্ন ওকে বেরিয়ে গেল। জামাকে লাগানো বেশিক্ষণ থাকলে গাড়ীঘরদোরে অটিকে যায়। বুড়োর যখন আছে, তোমার আড়াকে ছাড়াই ভালো। সকালে দোকানের সরিয়রটা পেয়ে সে একটু হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে।

রাত্রাত এসে শরীরটা জুড়িয়ে গেল। পাখার হাওয়ার মৃদু ঠোক সঙ্গীত হয়ে উঠল। সূর্যের নবীন আলো ছড়িয়ে পড়েছে চরাচরে। হঠাৎ মনে পড়ল, আজকাল আসাইবাবুর। আজ থেকেই অনেকে নিচ্ছি দিনে রাখবে। সেখানে জোগাড় ইলেনীং রাত্নুর একার সকালের সরিয়রটা ছেড়ে দিয়েছে। একটু বেলা করে দোকানে আসে। তবে সন্ধ্যে থেকে মধ্যরাত বা ভোরের পর্যন্ত আর নিয়মিতের ব্যতিক্রম একদম নড়চড় হয় না।

গরমের জন্য গরিদ হয়ে উঠেছে — ঝাপসী ও সেলসী জলের সরিমিশ্রণ! ব্রান্ডীদের ভীড় বাড়ছে। অসাধীকালের কথা ভেবে রাত্ন একটু চিন্তিত হয়ে ওঠে পা চালাল। পর পুনিন ঘরে আসাইবাবুকে নিয়ে বৈঠকির রাপারে কোনোরকম হিসেব নিকেশ করছে। সেশের হালচাল ও অবস্থার বদের ওপর আসাইয়ের আসর আপাতরনের ধরণ ও পরিমাণ নির্ভর করে। কোনরকম সমন্বিত সিদ্ধান্ত করে তিনি বরফ ছাড়া এবং আনুষঙ্গিক ছোকরা দ্রব্য সম্ভা — চানের ঘুঁড়ো, সুক্কি, আটা সংগ্রহ করেছে।

রাত্ন বিয়ে বৈঠকির অনেক ঘরনা জেনে গেছে। বিশেষ করে উঁচুদরে পালাপার্বনের দিনে বিয়ে বৈঠকে কী পরিমাণ ছোকরা দেলানো হয় সে সম্বন্ধে ও ওয়াকিবহাল হয়ে উঠেছে। প্রথম প্রথম নির্দিষ্ট হত, মনের দিক থেকে কিছুতেই নেমে নিয়ে পারত না। সব সময় মনে হত সে অন্যদের চিন্তাচ্ছে। সাধ্যমত চিনি আর চালের গুঁড়ো সঙ্গে নামমাত্র ছানা দিয়ে রসগোল্লা বা ছানার জিলিপিতে সুক্কির পরিমাণ নিয়ে কোনো গ্রন্থের অবলম্বন নেই। অনুতাপও নেই।

রাত্ন যখন পৌঁছোল, তারক দোকান খুলে ঝাঁট দিচ্ছে। নতুন একটা ছেলে কিছুদিন হল কাজে লেগেছে সেও হাজির হয় রাত্নর সঙ্গে সঙ্গে। ভীষণ রোগা হাসলা চেহারার, বশ-এগারো বছরের। দৈনন্দিন কৌটুম্বলে তার ঢাপা পড়েছে অবাক অর পাত্রিপার্থিক চশমে। সর্বদাই দিবর আর চলাফেরার মধ্যে অনিচ্ছুক ও অনাগ্রহ ঢীনাগটি। নাম শিবু। ওর পাশী নেই, মাস মুহূর্তের আগেও ছিল না। জোগাড় পাশী দিয়েছে— দাস। ওকে সংসর্গ করার কৃতিত্বও জোগাড়ের। পাশাপাশি আশেপাশে ওর আত্মজন। একদল ভাঙ্গড় কাপাস মুড়ানো ছেলেদের মধ্যে শিবুকে দেখা যেত। জোগাড় কাজের প্রস্তাব দিতেই রাজী হয়ে যায়। ওর পারিক ঠিকানা তারিকে বলেনি। কোথায় থাকে, কার সঙ্গে থাকে কে জানে।

রাত্নকে দেখে তারকের মুখ গম্ভীর হয়ে যায়। কেন কিছু দিন ধরে রাত্নর প্রতিপত্তি লক্ষ্য করে সে ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েছে। রাত্নর এসব কিছু মনে হয়নি। জিগ্যেস করল — পল্টু আসেনি?

— সেখানেই পাঠিয়েছি। লাট সাহেবের নাহি ঠিকানার ঠেকাগিরি আসে? তোমার টেবিল সাজাতে সাজাতে তারক গজ গজ করতে লাগল।

রাত্ন আর শিবু দুজনেই ওর সঙ্গে হাত লাগাল। জোগাড়ের নিকাল আর্জন করে দোকানের সেবকাসনের সরিয়র ভিন্নিৎ রাত্নর জীবনে এসে পড়লেও সরকারীদের সঙ্গে ব্যবহারে কোনো পরিবর্তন হয়নি। তারকের সঙ্গে আজ করতে করতে পল্টুর ঠাকুমার কথা হয়। মনে পড়ে গেল। বুড়ির শরীর ভালো যাচ্ছে না। পরপুনিন সর্দিকাশি জ্বরে পরাপাড়ী দেখে এসেছে। পল্টু ঠাকুমাকে ছেড়ে কোথাও যেত না। সেবিরও কোথাও সে আসেনি বলে রাত্ন তাদের বাড়িয়ে দিয়েছিল। ঠাকুমার পাশে বসেছিল আসকাশ। ঠাকুমার সেই একই কথা — মইরা গেলে আকাশ-প্রদীপ দেখাস, উপর দিয়ার হোগে সেই যাদু, পল্টুরে কল নিজহোগায় টিয়া সাজাইয়া আমার মুখে আগুন দিস, পুড়িয়ে আমারে পোড়াস না। রাত্ন অন্যমনস্ক হয়। ঠিক এই সময় পল্টু উঁপাছিবে। হাতে চোখ দুটো লাল, চুল উস্কোখুস্কো। রাত্ন পল্টুর নিজের মাজিয়ে জিগ্যেস করল —জিগে পল্টুর ভালো নেই?

— ঠাকুমার সন্ধ্যেবেলা খুব জ্বর ছিল, ভুল বকেছে। সারা রাত্রি মাথায় জল ঢেলেছি। দুধনের পট্টি বদিয়ে রাতি একজন ডাক্তারকে ডেকে এনেছিল। ওষুধে টাবলেট খাইয়ে জ্বরটা কমেছে, কিন্তু এখনও বেহুঁশ হয়ে আছে। ভুল বকছে।

পল্টু ইস্কিয় চোখ তুলে রাত্নর দিকে তাকিয়ে থাকল। রাত্ন কোনও সান্ত্বনার

রাস্তা খুঁজে পায় না। কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে জলাতঙ্কের চোখে পন্টু বলল —আমুর কাছে দুটি টাইম আছে। দুইশ একটু বলিস। রাজু ঘাড় নাড়ল সে কাউন্টারে টেবিলে মুখ পরাজয়ের ভিটোস। কিছুর সঙ্গে হাত লাগিয়ে পন্টু অঙ্কের ক্যালকুলেটর টেবিলে মোহর আঙ্ক করতে লাগল।

রাজুর ভয় করতে লাগল। কেনারামের পন্টুকে দুটি কখনই বন্ধুর করতে না। বুদ্ধি আসাই হওয়ার পর অবশ্য দুটি, তার কাল প্রায়ই বকুনি, পড়িকার আমরও মতে আজ কেরোসিন ওর। পিঠে-বাটির ভীড়। এখন দুটির কথা বললেই আগুন জ্বলে উঠবে।

হারুক মিষ্টির আলু সাজাচ্ছে। চশমেরোহ কড়াইটা এনে রেখেছে। অন্যদিনের চেয়ে এই মুহূর্তে মিষ্টি বিক্রির পরিমাণ বেশিই হয়ে থাকে। অঙ্কের অনেকেরই ঠক হয়ে গেছে। হারুক চারিদিক মতো মিষ্টি ওজন করে দিচ্ছে। রাজু কাউন্টারে বসে টাকাপয়সা হিসেব করে নিচ্ছে। পন্টু আর শিবু প্রতিদিনের নিজস্ব, মুহূর্তের পঙ্কের সাজাচ্ছে। পন্টুর চোখমুখ চিন্তায় আচ্ছন্ন। অন্যদিনের মতো আজে চটপটে ভাব নেই। হারুক মাঝে মাঝে তাড়া দিচ্ছে।

পন্টু কাঁপরে পড়ল। আসলে কেনারামের কাছে আজ দুটি নিয়েই দোকানে আসা। টাকুমা একা পড়ে আছে। অসুস্থ বেশি বুড়ি। জলটা ছটফট করছে বার। কেনারামের আসাকে দেরী রেখে সে রাজুর কাছে এসে দাঁড়ায়। ওর অসহায় দৃষ্টি রাজুকে বিদ্ধ করে। — কি করব, টাকুমাকে একা ফেলে এসেছি আমি ও দেরী করতে পারিনে। রাজুকে বুদ্ধির বুদ্ধির কথাটা বলিস ভাই।

পন্টু হাত ধুয়ে পায়েই হাতে মুখে বেরিয়ে গেল। রাজু মুহূর্তিলক্ষণ অঙ্কের পরখ নিতে নিতে পন্টুর চলে যাওয়া দেখল। তারকের মুখখানা নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে। তার দু-চোখ নিড়নিড় করছে। এই মুহূর্তে রাজু অসহায়। কেনারামের কেনাবেচা শুরু হয়ে গেছে। ভীড় বাড়ছে। ঠিক এই সময় কেনারাম এসে উপস্থিত। রাজু চেয়ার ছেড়ে কাউন্টারের পাশে দাঁড়িয়ে খাবারের দাম নিতে থাকে।

কেনারাম প্রথমে দুধ জালিয়ে পন্টু-পঙ্কের সামনে ঠক দুধিয়ে প্রণাম করে। কাউন্টার টেবিলে আঙুল ছুঁয়ে কপালে ঠুকল। তারপর চেয়ারে আসীন হয়ে বিভিন্নটার পরিমাণটা একনজরে পরখ করে।

কেনারাম এসে বুধবুনের কাজটা কেনারাম নিজের হাতে নায়ে। এখন সে প্রতিদিন সকালে ঠান করে দোকানে আসে। আসার পথে অবশ্যই একটা অঙ্কে পুড়িয়ে আসতে ভুল হয় না। চোখমুখ দেখলেই মানুষ হয়। বেলা চলকে চুল, পটিয়াও। বুড়ি আসা পরে আজ কেনারামকে খুশি খুশি দেখাচ্ছে।

রাজুকে আজ খুব ছুটোছুটি করতে হচ্ছে। তারক তার জায়গা ছেড়ে নড়বার লক্ষণ দেখাচ্ছে না। পন্টুর প্রতি রাজুর পক্ষপাতিত্বে তারক কোনোদিনই সন্তুষ্ট নয়। আজও, পন্টুর টাকুমার অসুস্থতার খবর জেনেও তার হাত লাগায়নি। পন্টুকে সে কোনোদিনই পছন্দ করেনি আর পন্টুও তারকের পাত্তাও সহ্য করেনি।

রাজুর প্রতি রাগী হলেও পন্টুর অনুপস্থিতি এ অবস্থায় অন্তত তারকের দিনে যাতে মর্জিমতের চোখে না পড়ে সেজন্যে সে চেষ্টা করল।

কেনারামের মুখে সুগন্ধি জর্দার পান, চোখদুটি রক্তাভ ও রক্তাক্ত। অঙ্কের পরখের ফাঁকে একদিক ওদিক তাকিয়ে ঠিক বুঝতে পারল। সঙ্গে সঙ্গে গর্জন উঠল— পন্টা হারামজাদা আসেনি। টিনেজে সবাই চমকে উঠল। রাজুর বুকের স্পন্দন দ্রুত হল। তারক আগ বাড়িয়ে বলল — সকালে এসেছিল, আপনার আসার একটু আগেই চলে গেছে, রাজুকে কি সব বলছিল। তারক টেবিলে রাজুকে একনজর দেখল। তার মুখ শুকিয়ে গেছে। একজনকে কটুক্তি-হেনস্থাই দিয়ে রাজু কাউন্টারের পাশে এসে দাঁড়াল। আস্তে আস্তে বলল — তার টাকুমার গেল পাঁচ দিন ধরে জ্বর, কাল রাতের জ্বান ছিল না, ওর যে কেউ নেই .....

— জেল, তুমি যেয়ে আছ গোপাল? খুব সেরি হয়েছে না? এত দেরি করে যদি সেখানেই আসলে পারিস। হারামজাদারা জেল এখানে শা না যেয়। হতভাগা পাজি ছোটলোক। দুটি দিনি, সময়-অসময়ে আছে তো। — বলেন জগাই, একজন বয়স্ক অভিভাবকের উদ্দেশে জলল, বুদ্ধির দুটি নিল, আজ আর কালে পরীর ভীড়, কি সব্বনাশের বুদ্ধি, আমাকে বিপদে ফেলে মজা দেখছে। ঠিক আছে, আমিও মজা দেখাব, মাইনের টাকা দিবিনে, আয় একবার .....

কেনারাম টাকাপয়সার হিসেব জানায়

কলকাতাই পক্ষপাতিত্ব দেখাল। ছত্রিশজন পরিশ্রমীদের কেউ সমর্থন করল, কেউই নীরবে চলে গেল, কেউবা পল্টুর ঠাকুরমার অনুপ্রেরণায় কথা তুলে সহানুভূতি দেখালো। এসব ক্ষেত্রে কেদারনাথ পরিস্থিতিকে সহজে বিচার্য করে না, আসল রায় পরবর্তীকালে, তবু কথা বলতে হলে।

তারক অসম্ভব দুর্বোধ্যতার সঙ্গে সমস্ত ব্যাপারটা দেখছিল। নিজের অজান্তেই সে আলার উপরে দিল। খগেনের হাতের মিষ্টির প্যাকেট তুলে নিতে নিতে বলল, — পল্টু তো ভাজ করছিল। হঠাৎ দুটির কথা বলেই চলে গেল, রাজুও কিছু বলল না।

কেদারনাথ রাজুর দিকে কটমট তাকিয়ে ঘনঘোষিত করলেন — খ। বজ্জাতগুলিকে কলকাতে হবে। বাঁদরকে বেশি নাই দিলে মাথায় ওঠে।

রাজুর জন্য মায়া বাঁ বাঁ করতে লাগল। প্রতিবাদ করার নেই, জেনেও সে বলে ফেলে — ডাক্তারকাকা, আমি তো পল্টুকে মেরে বসিনি।

— চোপ্ কেলস কথা নয়। আমি চোখ বুজে থাকিনে, সব বুঝতে পারি। হারামজাদারা হয়ে নিজু বলেছে খুব করে দেব।

রাজুর শরীরটা কেঁপে উঠল। উত্তেজনা রাজুর ধাতে নেই। এমনক্ষেত্রে সে দুর্বল হয়ে পড়ে, অসহায়তা আক্রান্ত করে। একটুখানি স্থির থেকে সে নিজেকে সামলে নিল।

টিওয়ার শুরু হয়ে গেছে — এই খোকা, আলু নিয়ে যাও, হাত চালিয়ে যেন যে, আর একজন কস্টমার অনেক দাঁড়িয়ে পড়েছে। রাজু পুতুলের মতো চলে যাবার পরিবেশন করে। নিজু এঁটো পেতে টেনিস সাফ করছে। এরমধ্যে ছেলেমানুষ। গলা খুব ভাবে চলছিল। সেও নির্বিকার, কোনো দিকে লক্ষ নেই। এর যে ঠেঁয়ারেটি, সে ব্যাপারেও কোনও কৌতূহল নেই। অসহায়তা এক মুহূর্ত সে দাঁড়িয়ে থাকেনি। তাকে দেখলে মনে হয়, এই পৌষেই পৃথিবীর নিষ্ঠুরতম অভিজ্ঞতা তার জীবনে ঘটে গেছে। কোনো কিছু তাকে বিচলিত করে না। গত মাসখানেক ধরে নিজু ঘর-এর কাজ করছে এখানে। ছেলেটার সহ্যশক্তির শক্তিতা। চুলে তেল নেই। আয়নাদাড়ি কাটে না।

আজ দোকানে সারা দিন জাহাজীবাবুর বিক্রিবাটা হলবে। আলাদা কলকাতা খোলা থাকবে। অন্যেদিন অন্যদিন কলুদি সিঙ্গারার শটি ঢুকেছে। বরিদের নতুন করে মিষ্টি খাওয়ার জন্য মহাসমারোহ নিয়ে বসেছে। রাজু আর তারক দুজন বিক্রির ভীড় সামলাচ্ছে। নিজুর টেনিস সাফ করার কাজ এখন আসার হাল্কা। বেলা দেড়টা হাজল। কেদারনাথ এতক্ষণে নিশ্বাস ফেলতে পারল। দু একজন খদ্দের আসছে-যাচ্ছে। সাধারণতই এরকম হলবে। আলাদা কলকাতা হলবে। কেদারনাথ ডাকল — রাজু, আমি খিদিরে আমি বাড়ি যাচ্ছি। দুপুরে এখানে খানি বসে থেকেছি। দোকান বন্ধ হবে না, আমি চারটের আসব।

রাজু ঘাড় নাড়ল। তারকদের সঙ্গে এর আগেও খেতে হয়েছে। কারিদের নিয়েই চলবে করে।

তারক রাজুর কানে কানে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস ফিস করে বলল — আজ কালো হরিণের মাংস, খাস তো?

রাজু বুঝতে না পেরে বলল — আমার সব কিছু হলে।

কেদারনাথ বিদেশ নিয়েশ করে রাজুকে ডেকে কেশ আদা মেলাতে বলল। রাজু হিসেব করে দু একটা সাদেশের করে দিল, তারপর খাবারের কথা বলতেই তারকবাবু সুন্দর করে নিয়ে নিল। কেদারনাথ এই সময় রাজুর দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। সে যে ফুলস টাঁক ক্লাসের সেরা ছাত্র ছিল নতেন দুবার কাছে তা জানতে পেরেছে।

প্রায় দুটো নাগাদ কলাপের খদ্দের কেমনে যেতে কেদারনাথ বাড়ি চলে গেল। পিনুর এইসময় প্রায়শই খেয়াল থাকে না। সে দাঁড়িয়ে জাহাজীবাবুর মিষ্টি বিক্রির ভীড় দেখছিল। রাজু তাকে বলল — তুই এখন যা, মাকে টিফিনটা দিবি।

পিনু মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে বলল, দুপুরে খাবার জন্যে কাকেটা, আলুটা আর তরকারি রেখে যাবুনা? আমার কাছে পয়সা নেই।

রাজু বিস্মিত হল। সে জিজ্ঞেস করল — একদিন খানি?

— না নিয়ে যাব।

—কবে, তোর বাড়িতে? তোর মা-বাবা বেঁচে আছে?

পিনু যেন উত্তর দেয় না। মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। তারক ওদের কথাবার্তা দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছিল। সে এগিয়ে এসে পিনুর সামনে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল। ওর আগ্রাসনমূলক চোখ দুটিতে জ্বলে উঠল —তুই যে বলেছিলি

বিরক্ত হয়ে উঠে যাচ্ছিল। তোর বাবা নেই, মা আছে — এখন মুখে কুলুপ এঁটে বসেছিল।

শিবু এবার করুণ চোখ তুলে তারকের দিকে তাকাল। তোমার উত্তর দিল না।

রাবু শিবুকে ভালো করে দেখল, খুবই শীর্ণ দুর্বল শরীর। গায়ের রামকাপড় ময়লাটে, কয়েক জায়গায় সেলাই, মাথার চুলে কতদিন তেল পড়েনি। রাবু তারকের উদ্দেশে ফিস ফিস করে বলল, ছেলেটা ভালো করে খেতে পায় না, মনে হয় ঘর গরিব। আচ্ছা, আমাদের ভাত থেকে একটু করে দিলে হয় না, তারকদা?

তারক আঁতকে উঠল — ওরে বাবা, ছোল ভাতবাড়ি ভাগ হলেও হবে পারে, কিন্তু ভাতে হবে কি বলো? ওদের একটি মুরগিরও ভাত খায়। কতদিন পায়নি কে জানে?

রাবু হেসে ওকে আশ্বস্ত করল — অতটা তো আমি বেশি খেতে পারব না, পেটটা গোলমাল করছে, সকালে মুখার পাতখানায় খেয়ে এসেছে। আমার ভাগের ভাতটাই বরং ওকে দিও।

তারক ভীষণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘাড় নাড়ল — ঠিক আছে, তোর ভাগের থেকেই দিস। তারক ভেতরে চলে গেল।

শিবুর মা মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, —যা ঢলে করে আর ভাতার জল খেকে। একটা গামলি নিয়ে যা, যা ভাতে ঢাল করবি। আমার দাঁড়া নেই। রাবু ভেতর ভেতরের ঘর থেকে একটা দিলি এনে বলল— যাও, আমার তেল যে কেল করে।

শিবু মায়ের তেল মেখে মলটি হাতে করে ভাতার জলে দিকে এগিয়ে গেল।

খাওয়ার পাঁড় নেই। দু-একজন খাওয়ার ইলতোলা বা সাদাদের ছুটি-ছাটের। রাবু একটি কাল আর সোনার সাজলজ্জে। তারক ঢাল করে এসেছে। কয়েক মিনিট মধ্যে শিবুও উপস্থিত। সারা গায়ে জল। হাফ প্যান্ট আর ছেড়া জামাটা ভিজে গেছে। মাথার চুল জলে চুপসে গেছে। রাবু মুখল গামছার অভাবে গা-মাথা মোছা হয়নি। প্যান্ট জামা খুলে চান করেছে ঠিকই কিন্তু গা বদলানোর হয়নি। কোনোরকম গা মোছা চান। রাবু নিজের টিফিন প্যাকেট পকেট থেকে বের করে নিয়ে বলল — আগে করে চুল আঁচড়ে নিয়মিটা রেখে দে। তোর মাথার চিরুনি নিই।

শিবু ঘিনা ভরে চিরুনিটা নিল। মোজাদের বাইরে ঘুটিপাতে দিয়ে আলতো করে করে চুল আঁচড়ে নিল। চুলের তেতো তেল জল চিরুনি বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল।

একটুবাদেই ভেতরের ঘর থেকে তারকের গলা শোনা গেল—রাবু খেতে আয়। শিবুকে ডাকল না। রাবু দেখল দোকানের ঠোঁটাতে ভেলান দিয়ে শিবু জলে দিকে তাকিয়ে আছে। তারার এক ভদ্রলোক বন্দনাদিকে দেখল বই-নিটির ঝুড়ি ঝুলিয়ে সেতুপথে চলেছে। মহীর নিকলন নিয়ে পরিক্রমায় পরিক্রমায় পড়াই। বিভাস নিজস্ব সৌমাদাস শীল কে কোন দিন অনুকরণ করবে বলা মুশকিল।

রাবু বিভিন্ন চিন্তাগুলো ঝেড়ে একটা ঝেঁকুনি মতো দিয়ে শরীর সীধে রাখল। কাঁধেরাজে কেন্দ্রবাদ ঝোলা নামিয়ে চলে গেছে। মাছের চালি কেন্দ্রহাম সরকারের নিজের কাছে রাখে। সকালবেলায় বিক্রি ভাটার টাকাপয়সা সে বাড়ি নিয়ে গেছে, সারাদিন শিবু বেঞ্চটি বাইরে রেখেছে মাঝবিভিন্ন মুদিবাজ জন।

রাবু ডাকল —তারকদা একটু শুনে যাও। তারক কাছে এলে সে বলল — শিবুকে আমার খাওয়ার বসিয়ে দাও। আমার তো শরীর ভালো না, মাথা ছিঁড়ে যাই খেয়েই কর্তব্য আমছি।

তারক বিড়িয়ে উঠল — সে সে হল, দুজনের খেয়ে দেওয়া হয়েছে। ওকে ভাত দুই বাবিনে সে আলাদা দুপেছি, সে হল।

রাবু মুখে এক চিলতে হাসি ফুটে উঠল —না না সাঁচা বলছি। আজ্ঞা ভেল, তখন ওদাই ঠিক একসাটি খাব। তবে এখন না, আগে তোমরা খেয়ে এস।

— লোকজন বন্ধ করে চলে, অবধারণা বন্ধ থাকলে কিছু হবে না। এখন তো ধরের নেই।

রাবু মাথা নাড়ল — বাবু জানতে পারলে ভীষণ গালাগালি দেবে। কি দরকার, তোমরা আগে খেয়ে এস।

হঠাৎ শিবুর চোখ অনুসরণ করে বলে উঠল —পন্টু আসছে। কি ব্যাপার, চোখমুখ ফুলিয়ে গেছে, কি হল?

রাবু এগিয়ে যায়। পন্টু বলল — ঠাকুমা হাসপাতালে। ডাক্তার গুরুত্ব ইনজেকশন দিয়েছে বলেছে। আমার কাছে যা ছিল সব শেষ। বাবুর কাছে এসেছি-যদি এদের থেকে কিছু দেয়।

—বাবু তো সাড়ে চারটের আগে আসবে না। ঠাকুমা এখন কেমন আছে রে?

— ভালো না। একটা দীর্ঘনিশ্বাস

বেরিয়ে এল।

ডাক্তারের খুশি একটা ধাক্কায় চুর হল না। সে বলল — পল্টু একটু বসি হল, আমরা খেয়ে নিই। পল্টু ঘাড় নাড়ল।

— দুপুরে খেয়েছিস? রাবু জিজ্ঞেস করল।

— খেয়েছি, তোরা খেয়ে আয়।

রাবু আবার ইনজেকশন করল। পল্টুর মুখ দেখে সন্দেহ হল। না খেয়েই ছুটোছুটি করছে, ওর মুখ বলছে। পল্টু তাকাল বোন—হাঁ, খেয়ে আয়।

ডাক্তার আগেই চলে গেছে। ডাক্তারের চীৎকারে ভাড়া দিয়ে জলপরী শিবুকে নিয়ে জিয়লে পা ডুবাল।

ঘরটা মাঝারি গোছের। একপাশে ইটের উনুন, ডিমোলের কাছ ঘুর। উপরেটাকে একটা ছোট্ট জানলা, এক টুকরো আকাশ দেখা যায়। পাশের পুরোনো ঘরে পড়া প্রাচীন ঘড়ির কাঁটার নর্দমা থেকে দুর্গন্ধ উঠে আসে। ঘরের অন্যখানে খাওয়ার জায়গা হয়েছে। কাত্যিয়ন নিতাই আগেই খেয়েদেয়ে জানলার ধারে ঘড়ির খাটিয়ায় বসে বিড়ি টানছে।

এলুমিনিয়ামের ছোট্ট ভাত বাড়া হয়েছে। ডাক্তারের ছোট্ট ভাত বেশি। রাবু তার প্লেট থেকে ভাত তুলে দেয় শিবুর পাতে। শিবু ভীষণ অস্বস্তিতে হয়ে বলল — বোনার তো কিছুই থাকল না। রাবু হেসে বলল — আমার পরীর ভাগ্যে নয়, এতেই চলবে। শিবু আর বাড়ল— আমি বেশি খেতে পারিনে।

খাবারের পর ছিল একটাই, ঘুমো। রাবু আশ্চর্য হয়ে দেখল, শিবু মাছিটাই বেশি খেতে পারে না। আসে ঢেউটেপুটে খেল বটে, তার শিবু নষ্টই করল। তারক বিড়িতে টান দিল — তার নাই কয়লি যে, পেট তার সয় হয়েনি? শিবু মাথা নিচু করে হাসল, উত্তর দিল না। রাবু অবশ্যই কম খেল। তারে খাওয়া দেখার তারক। তারক অনেক দুধের তার নিয়ে বাটি পুরা করল, সেই সঙ্গে মাছের ঝোলটুকু।

রাবু আগে উঠে পড়ল। তারক শিবুকে উঠতে দিল না— বস্, খেয়েনি, বালা বাসনগুলো একেবারে ধুয়ে, মুছে তবে যাবি।

রাবু ব্যাপারটা জানতাই। হাত মুখ ধুয়ে যখন বেরিয়ে এল, পল্টুকে দেখতে পেল না। কয়েকবার এদিক ওদিক তাকিয়ে ক্যাশ বাক্সের দিকে চোখ যেতেই বুকের ভেতর ধাঁৎ করে উঠল। বাক্সের তালা ভাঙা।

রাবু ছুটে গিয়ে বাক্সের তালা খুলে দেখল শূন্য। মাথা ঘুরে গেল। সে কি চীৎকার করবে নাকি পল্টুর পেছনে ছুটবে? সে এখন কোথায়? ঈশ্বরদা তোল হাসপাতালে, কেমন আছে, ঈশ্বরদা কি বাঁচবে না? শূন্য দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল খোলা বাক্সের দিকে। হঠাৎ পাগলের মতো বাবার আসন উল্টে দেখল, বেড়াল টাকা আর কাগজের গোছাটাও উধাও। রাবুর বাকিটা আসন কী কী করে উঠল। কি হবে? বাবু তাকে ছাড়বে না। পল্টু একি সর্বনাশের খাঁড়া কুলিয়ে গেল তার মাথার ওপর। চোখদুটো জ্বালে ভরে উঠল। বন্ধুদের আলোচনায় এই আকাশ।

একবার জানাল না বাবুকে এর প্রতিকার দিতে হবে। তারক বুঝিয়ে আসে। এ সুযোগ সে কি হারাবে?

রাবু দুইটুকরো দুধ গুঁড়ে ঢেলে উঠল। মার কথা মনে পড়ল, ছোট ভাই আর বিশ্বির মুখ ভেসে উঠল। অপরাধ লাঘবের কথা ভেবে সে কেঁদে উঠল।

অনেকক্ষণ বসেছিল জানে না, ইঞ্জিন ডাক্তারের গলা শোনা গেল — পল্টু কোথায়, চলে গেছে?

রাবু মুখ তুলল, চোখের জলে ভেসে গেছে। তখনও কাঁদছে। তারক বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল — কি হয়েছে রে? কাঁদছিস কেন? বাবা বাক্সে টাকা রাখা দেখে চীৎকার করে উঠল —পল্টু টাকা চুরি করে পালিয়েছে? কোনদিকে গেল? কখন গেল? কি রে কথা বলছিস না কেন?

নিতাই বুঝি মাতলামো অবলম্বনে ছুটে এল। শিবু কাদা মাখতে মাখতে উঠে এল। তারক একাই চীৎকার করতে লাগল— ডাকাতি, সিন্দুক লুটে ডাকাতি। ছেলে ছুরি দেখিয়ে বাক্স ভেঙেছে। চল খানায়। বাবুকে খবর দিতে হবে। কি ইলিশিৎ দিমি? আমি জানিনে বাপু। তোর পেয়ারের বন্ধু। ঠিক করে বল, কীভাবে নিল। কোনদিকে গেল হারামজাদা।

একজন বুজন ভাড়ে ছোট ভীড় জমে গেল। পাড়ার তিনটি ডকবয়ক ছেলে এসে নানারকম প্রশ্ন করতে লাগল। রাবু, তারক, নিতাই, শিবু কেউ ভাতের জেরা থেকে রক্ষা পেল না। রাবু ছাড়া আর সবাই মাথা নাড়ল। নিতাই বলল — রাবু নিশ্চয়ই লুকোচ্ছে। ও কথা বলছে না কেন?

রাজু আসলেই কেনারাম কখনো ভাবেনি। কিন্তু ভাবার মতো অবস্থা তার ছিল না। টাকাপয়সা চুরির ঘটনার সে যে জড়িয়ে পড়তে পারে তা স্বপ্নেও ভাবেনি।

ভীড় আরো আগে পাতলা হল। শেষ পর্যন্ত রাজুর মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরুল না। বেরোবেনা কথার মতো অবস্থা তখন ছিল না। কেনারামের রক্তচক্ষু অনে করে সবার বুক শুকিয়ে উঠেছে।

ঠিক সেই সময় কেনারামকে আসতে দেখা গেল। দূর থেকে দোকানের সামনে অস্বাভাবিক ভীড় ঠেঁয়ারেটি ওপর প্রথমে এসে গেল। যা ভাবা গেছিল তাই হল। কেনারাম ভেতরে বসতেই আরক সাধনী পাড়ার শুরু করল নালিশিযোগ কোনো ছিধা না করেই।

কেনারাম ঘাবড়াল না। বাক্স খুলে দেখল। ড্রোর খুলে তছনছ। কোনো যাদু করেই এসেছে। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল রাজুর দিকে কিছুক্ষণ কেটে গেল কর্তব্যস্থির করতে। নিজের গদায় আসে বসে কেনো নিশ্চলক তাকিয়ে থাকে। রাজু আরো নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে ভীত মেয়শাবকের মতো।

—তোর বিড়িগুলোর কাল কোথায় রেখেছিস? গর্জন করে উঠল কেনারাম। রাজু কেঁপে উঠল। ড্রোরটা শুকনো, ভীত, শঙ্কিত। এবারও মুখ থেকে কথা সরল না।

— চেঁচিয়ে দেখ? তাকে যে, তোর ঐ ড্রোরের ভাঙে কাল কেলে বেশি কম। নিশ্চয়ই খুচরোর ঝক্কাঝক্কি আছে। হারামজাদে ছোটলোকের দল, তোরা, বেইমান না খেয়েদের খেয়ে। আগে ওকে ধরে আনবি তবে চাকরি। মাইনেকড়িও পাবিনে। রাজুর গালে সপাটে একটা চড় বসাল কেনারাম, তার হাত ধরে আর ধাক্কা দিতে দিতে দোকানের বাইরে টেনে নিল।

দোকানের বাইরে আবার ভীড় জমেছে। রাজুর ড্রোর ফেটে জল বেরুল। সে যেন একদমই অজ্ঞান হয়ে যাবে। শেষ চেষ্টা করে বলে উঠল —আমাকে মারছেন কেন? আমি তো আপনার টাকা পয়সা নিইনি। পশ্চিমে ঠাকুমা খুব অসুস্থ, হাসপাতালে। টাকার দরকার বলছিল — কাদতে কাদতে সে কেঁপে কেপে উঠে হাটু মুড়ে বসে।

কেনারাম পশ্চিমে যাবা মা-র উদ্দেশে অশ্লীল গালাগাল দিতে দিতে উঠল — বেজন্মার ঠাকুমা মরছে তো তোর বাবা কচুর কিসের খাঁ। ওরা ফুটপাতে জন্মায় ফুটপাতে মরে। খুব হু। দরদ দেখানি তো তার করছে না। বিশ্বাসের মর্যাদা রাখে না ছোটলোক পাজি।

প্রতিবাদহীন আরও পাড়ার মতো রাজু কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। ড্রোর নিয়ে অবিরল জল পড়িয়ে ঘড়ে দুকের জামা ভিজে যাচ্ছে। কথাগুলি কানে সহ্যাসের আবার ভীড় পাতলা হয়ে যে যার চলে যায়। কেনারাম ঘিতেন কথাতে কথাতে দোকানে। এক পাঁচের একশ টাকার একটা আরিল ড্রোরে সব টাকাটা সে কড়ি নিয়ে গেছে। সকালের দুপুরে আসবার পথে আরেক জায়গা গেছ, আজ দুটো থেকে যাওয়ার সোজা বাড়ি। রাজুর বিড়িগুলো মিলিয়ে কত জোর তিনশ টাকা চুরি গেছে। কিন্তু কেনারাম সেটাকে খুলিয়ে বাঁশিয়ে হাজারও টাকা করল। উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট।

কেনারাম আবার গর্জে উঠল — ভাল চাস তো এখিকে পা বাড়াবিনে। আমা পুলিশ করলে হাজতবাস তোর ঠেকপুরুষ ঠেকাতে পারবে না।

রাজু আর দাঁড়াল না। নিশেষহারার মতো রাস্তায় পা বাড়াল, পিছনে ফিরেও তাকাল না। তাকালে দেখতে পেত একটা ছোট শীর্ণ ছেলে বেদনার্ত অপলায় তাকিয়ে আছে।

ঘটনার আকস্মিকতায় তাবক, নিতাই দুজনই স্তব্ধ হয়ে গেছে। হঠাৎ এমন তোলপাড় হয়ে সবকিছু ঘলটে যাবে স্বপ্নেও ভাবেনি। বিশেষ করে রাজুর প্রতি তাদের ঈর্ষা মাকলেও ওর সরল আন্তরিক আচরণে তারা কণীভূত ছিল। মালিকও ওর সততা আর ব্যবহারে এপর ক্রমশ নির্ভরশীল হয়ে উঠছিল। একজনের মেয়ে আর একজনের এমন ভয়ঙ্কর ভাবা কল্পনাও করেনি।

॥ ছয় ॥

চারদিকের অন্ধকার মনুষ রাত্রিক কেনারামে রাজুকে স্পর্শ করছিল না। উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটছিল। বুকের মধ্যে ঘড়ে উঠছে নিজস্ব একটা ঝীপ। সেখানে মনুষের লোভ বিদ্বেষ নিষ্ঠুরতা নেই। নির্জন নিশ্চয়ে সে শুধু একা।

সামনে মেট্রো রেলের ভূগর্ভ স্টেশন। একদল গায়েকদার মাটির গভীরে ঢুকছে আবার একদল উঠে আসছে। ঠিক নিশ্চয়ের মধ্যে যেমন লাখি মারি নিশ্চয়ে

পথে মিলিয়ে যায়, আকাশে মিলিয়ে যায়। অন্ধকার কি নিশ্চয়ে হয়ে গেল। রাত্রু ভাবে।

সকলেরই আছে —কেউ অফিসের তাড়ায়, কেউ বাড়ির দিকে, কারও কেবল কেনাকাটা বিনোদনের সন্ধানে। প্রতিটি মানুষের হাঁটাচলা চোখমুখের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন, কারও সঙ্গে কারও মিল নেই। দেখতে দেখতে রাত্রুর ইচ্ছে হল মেট্রো রেলে উঠে ঘুরে আসে। এর আগে পল্টুর সঙ্গে মেট্রো রেলে চড়ে কলকাতাটা আর বাকিরা শহরতলির ঘুরে এসেছে। জীবনে সে এক চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা। মাটির নীচে দিয়ে হাজার হাজার মানুষ নিঃস্পৃহ ভঙ্গিতে যাতায়াত করছে। তার তীব্রতম ইচ্ছে সত্ত্বেও মেট্রো রেলে কবে কোথায় যায়। এজন্য কোনও লোকজন বা কারখানার কাছ কোন শেষের কাছাকাছি।

অনেকক্ষণ হাঁটার পর খেয়াল হল সে নয়োনকারখানার মেসের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এখন তো তার ঘরে যাওয়ার কথা নয়। মেসে ঘিরতে সেই সন্ধে ছটায়। হঠাৎ পল্টুর প্রতি আক্রোশে তার মাথা গরম হয়ে যায়, অন্যরকম ক্রোধে কিপ্ত হয়ে ওঠে। সে রাস্তা পেরিয়ে অন্য পথ ধরল।

আবার পথ চলা, এবার নিমতোলার দিকে। ঘড়িটায় দশটা পেরিয়ে, প্রতিদিনের মোকানপাট গোটা মুখের লাল আটিকে ঘুমোবার মন্দির, আকাশ ছাড়িয়ে সার্চলাইটের রোল লাইনের রাতে মুখগুলির দারিদ্রে এসে উপস্থিত হল।

হাঁটার পরিশ্রমে ক্লান্ত হলেও মনটিকে কোন আরামের কাছে তা সামান্যই। কেনারামের মিথ্যে সন্দেহ তাকে ব্যথিত করেছে। পল্টুর টিফিন চুরির সঙ্গে তার যে কোনও যোগ নেই, ঘড়ঘড় নেই সে কথা তাকে প্রমাণ করতে হবে। কেনারামের কাছে পল্টুকে নিয়ে কটাক্ষোক্তি না করতে পারলে শান্তি নেই। তারপর মাথা উঁচু করে কেনারামের অন্যায় ত্যাগ করবে। আজই এই মুহূর্তে পল্টুকে ধরতে হবে। প্রয়োজন হলে আসর নিয়ে সমস্ত ঘটনা জানাবে।

রেললাইন ধরে কিছুদূর যেতেই বুধনকে একা এদিকে আসতে দেখল, তার সঙ্গী সুরজ মাহাতোকে সে দেখে, পল্টুর সঙ্গে খুব মেলামি, তাকে তিন তাসের খেলা শেখায়। বুধন কিছুদিন আগে হাওড়ার একটি প্লাস্টিক কারখানায় কাজ করত, এখন মুম্বাইয়ে এক ঠিকাদারের কাছে রেলওয়ের কাজ করে, কয়েকদিনের জন্যে কলকাতায় এসেছে।

সুরজের কাঁধে একটা বড়ি-ব্যাগ। পুরোনো বড়বড়ে পাঁচের খাটিয়া। মেলা বার শপাসের কাছাকাছি কর পরবর্তিত এই খাটিয়াগুলো ভাঙ্গ হয়ে থাকে, তার পায়সার ভাড়া পাওয়া যায়। বুধন রাত্রুর কাছে এসে বলল — খোকনবাবু চলছে কুথায়? পল্টুকে নাকি মারে তৈরি, আজি ফের মারা। কালন পর সে আবে হাসপাতাল হাসপাতালে চল্ ছয়া হ্যায়। ঘাবিয়ে হয়েছে সাথ।

রাত্রু পাঁড়িয়ে পড়ল — মাকুমা আরা গেছে। সারাজীবন জল পোকাতাপে বন্ধ এক প্রাচীন অবহেলাকারী বৃদ্ধার মুখ তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। গায় পাঁচ দিন আগেও তার হাতে তৈরি মুড়ির পাকেট খেয়ে এসেছে। পল্টুর মনের সেও মাকুমার বড় আদরের ছিল। কিন্তু সে এখন গল্প — ঠৈপথের বৌদিদের, বাংলাদেশের মধুর গল্প ঠিলে মাথের ঘোর লাগা চোখে বলে যেত। শ্রোতা হিসেবে রাত্রুর তুলনা নেই।

বুধন রাত্রুর কাঁধে হাত রেখে বলল — চল্ ভেইয়া জলদি যানা হোগা, পল্টু বহুত রোকে।

রাত্রু চোখহীন শূন্য দৃষ্টি মেলে তাকাল। মুখটা আগে তার গণ্ডায় চিহ্ন দাড়ানোর কড় ঘরে গেছে। একটু আগে কোন-মুহূর্তের যে উত্তাল তরঙ্গে তলিয়ে গিয়েছিল, আস্তে আস্তে সেখানে শান্ত হয়ে হয়ে আসছে বুক ভরে গেল। রাত্রু বুধনদের সঙ্গে পা মেলালো।

বুধন এরমধ্যে বকে গেছে। কেমন করে বুঝি অসুস্থ হল। তবে খুব বেশি ভোগায়নি। একটু কাশি জ্বর, পাড়ার কম্পাউন্ডারের ওষুধেই। নার্সিং নিয়েও শেষ পর্যন্ত বাড়াবাড়ি দেখে হাসপাতালের এমারজেন্সিতে। সেখানেই শেষ। ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনে একগাদা ওষুধ-ইঞ্জেকশন কিনে এনে আর মাকুমাকে বাঁচাতে পারেনি। ততক্ষণে চিরশীতল মরণঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে।

এমারজেন্সির বারান্দায় একটি বেঁড়া কাঁথায় ঢাকা মাকুমার প্রাণহীন দেহ পড়ে আছে। পাশেই এক ইঁটের ওপর মাথা রেখে পল্টু নিথর হয়ে বসে আছে। চোখে শূন্য দৃষ্টি।

বুধন আর সুরজ মিলে কাঁথা সমেতো বুড়ির মৃত শরীর ধরাধরি করে খাটিয়ার তুলে নিল। বুধন একখোছা দুধ ধরিয়ে

খাটিয়ার এক কোণে বেঁধে দিল।

রাবু পন্টুর পাশে বসে তার কাঁধে হাত রাখল। পন্টু ফেঁপে উঠল হাউ হাউ করে। রাবুও নিজেকে সামলাতে পারল না। ঠাকুমার খাস তেহমাখা মুখের দিকে তাকিয়ে সেও ফেঁপে উঠল। কিছুক্ষণ দুজনে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদল। হাসপাতালের জমাদারনি রোগীদের অভীষ্টজন রাবু আর পন্টুকে বুকের খুই নাড়ি ভেঙে সহানুভূতি জানিয়ে সান্ত্বনা দিল।

বুধন নিমতোলার চোখের আড় করে কিছু আইনকানুন তার জানা। সে জানে ডাক্তারের সার্টিফিকেট খোঁজ করল। পন্টুর পায়ে মাথা হাত বুলিয়ে জমাদার চাইল সার্টিফিকেট পেয়েছে কিনা। পন্টু কান্নাজলে চোখ ভাসিয়ে মাথা নাড়ল। অর্থাৎ এখনো পায়নি। এই এক জ্বালাতন। হাসপাতালের রীতি-নীতি দুর্নীতির খবর সে রাখে। তবুনি এমার্জেন্সির ডাক্তার আর অফিসবাবুদের সন্ধানে হনে গেল।

রাবু শান্ত হয়েছে। পন্টুর কান্নাও রুদ্ধ। রাবু জিগ্যেস করল —আচ্ছা আগে ঠাকুমা তখন বলেছিল?

পন্টুর মুখোশ দিয়ে অনেক জল গড়াল। সে মাথা নেড়ে বলল — শেষ দিকে কোনও কথাই বলতে পারেনি। কেবল তাকিয়ে থাকত। কথার সময় আমি শুনে দিলুম না। রবুর কিনারে দোকানে — পন্টু আবার মাথা গুঁজে কাঁদতে লাগল।

পন্টুর কান্না দেখে রাবুর বুকে কী যে কষ্ট হচ্ছিল, তবু শক্ত হয়ে বসে রইল। ঠাকুমার কোমল স্নিগ্ধ মুখখানা চোখে ভেসে উঠছে। চোখের পাতা বন্ধ, ঘুমিয়ে পড়লে যেমন দেখায়। কোনও কষ্টের আঁচড়ের ছাপ নেই, কিন্তু অভিমানের মৃদু প্রলেপ চোখে পড়ে।

ঠাকুমার ছেটিবেলাকার গল্প রাবুর চোখের সামনে ছবির মতোন ভেসে ওঠে। এক সুন্দর বিশোরী মেয়ের ভরে থাই থাই সমুদ্র বিশাল মাঠের মাঝে মাঝে ছেলেদের সঙ্গে গাই-বাছুর চরিয়ে বুপুরে বাড়ি ফিরছে। পুকুরে কাপড় ছেড়ে পুটি মৌরলা ধরছে। তারপর বিয়ে, স্বামীর মৃত্যু, একমাত্র ছেলেকে নিয়ে বাপের বাড়ি ফিরে আসা, আরও দুঃসহ দেশবিভাগের বিড়ম্বনা। বিধবা পুত্রবধূ আর নাতি পন্টুকে নিয়ে মেশে ফিরে ধান্ধাবাজ দেবরদের সঙ্গে কত লড়ে হয়ে গেছে দুঃখিনী ঠাকুমার মাথার ওপর দিয়ে।

একটু অসুবিধে হোল। অটোরিক্সে এরা চারজনই আছে, কিন্তু বুধন ও সুরজ উচ্চতায় রাবু আর পন্টুর থেকে বেশি হলে পাসপোর্টের প্রচলিত রীতি বলে গেল। আশপাশের কয়েকজন যাত্রীর পরামর্শ নিল বুধন আর সুরজ দুদিকে ঝাড় দিক, রাবু, পন্টু ওদের দুঁয়ে থাকবে। নিমতোলা অনেকখানি পথ, বুধন সুরজের পক্ষে একজন বুড়িকে বহন করা তেমন কিছু নয় কিন্তু রাবু ও পন্টুর পক্ষে কষ্টকর। একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বুধনকে বললেন — একটা কাজ করো, নাতি দুজন ঘাড়ে করে গেট পর্যন্ত নিয়ে যাক, তারপর তোমরা গেটের বাইরে থেকে স্কাশন পর্যন্ত নিয়ে যেও। কথাটা সকলের মনে ধেটে গেল। এছাড়া দুঁয়ে থেকে নিমতলো যেতে আসেই।

রাবু পন্টু দুজন ঠাকুমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। পন্টুর মুখোশ গড়িয়ে জলের ধারা। রাবুর মুখোশ চোখ শুকনো। বুধন ঘাড়ে তুলল। সে একজন হরিদোল দিল — যেমন যাত্রা হরিবোল। সুরজ আর বুধন হনে উঠল —রাম রাম সত্য হ্যায়। মৃদু গুঞ্জনে জনতাটা ভরে উঠল। রাবু আর পন্টু আতঙ্কিষ্ট অন্যমনস্ক ভাব নিয়ে সন্তর্পণে এগিয়ে চলল। বুপাশে সুরজ ও বুধন সতর্ক ভাবে গাড়িরা ধরে থাকতে যাতে নড়ে না যায়।

যথারীতি আলো ঝলে ব্রাহ্মণ দেওয়ালগুলি বিজলী আলো জ্বলে উঠেছে। কর্মিন ধরে প্রবল আশপাশ চলছে, মাঝখানে একদিন ঝড়বৃষ্টি হয়ে গেলেও গরম কিছু কমে নাটেনি।

অফিসকেরাণি মানুষের ঢল নেমেছে। গাড়ির জায়গাটা। লাগার ভীড় জমিয়ে চারজন প্রায় নীরবে শবদেহ নিয়ে চলেছে। সুরজ আর বুধন মাঝে মাঝে অনুজ্ঞা করে হনে চলেছে — রাম রাম সত্য হ্যায়

রাবু-পন্টু ওদের পা মিলিয়ে, ওদের ধরে রেখেছে। রাস্তাদের গাড়ির ধুলি, মানুষের কোলাহল তাদের স্পর্শ করছে না।

রাবুর মনে হল, এই পৃথিবীতে তার কেউ নেই, পন্টুর মতো সেও যেন কোনও আকর্ষনিয় মধ্যে ছেলে চলেছে কোনও এক অজানা লক্ষে। মলকাতা থেকে অনুতে ভাই মা আর দিদির মুখগুলো আস্পষ্ট কাশসা হয়ে আসে। কোনওদিন তাদের সঙ্গে আর দেখা হবে না। নির্মম উদাসীন জনবাস্তার রাজপথের

গোলকধাঁধার সে চিরদিন খুঁজেই মরবে, এ থেকে বেরোবার পথ সে কোনওদিন খুঁজে পাবে না।

অনেক পর অতিরিক্ত ভরে নিম্নযোগ্য ঘটি স্টিট থেকে ফুটেশ্বর মল্লিকের পাশেই নিম্নযোগ্য ঘাটে উপস্থিত হল। নিম্নযোগ্যর অনির্বাণ চিতার শান্তি, অপেক্ষমাণ শবদের জন্য শবযাত্রীর ভীড়ে দাঁড়াবার জায়গা পাওয়া ভার। ফুটেশ্বর মল্লিকে ভক্তদের আনাগোনার শেষ নেই। যা চার বাজছে ঘণ্টা, চামড়ার ব্যাগ আর সাধিলির ঝনঝনানি — হর হর মহাদেও। কৃপাপ্রার্থী কলকাতার বিশিষ্টজনী মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী স্ত্রী পুরুষের ভক্তের ঠেলাঠেলি, ভিখারীদের সারি আর সেই সঙ্গে ছোট ছোট পসারীর মেলায় জমজমাট। এরই মধ্যে এক একটি শবযাত্রীর ভিড়িল, অনুচ্চ ধ্বনিধ্বনি — বলো হরি হরিবোল। ভোমদের কাঠের বোঝা নিয়ে ছুটোছুটি, ঘৈয়েওয়ালী বামুনের গুরুগম্ভীর, নিরাভরণ বক্তব্যের মধ্যে আর শোনা যায় শোকাতুর প্রিয়জনদের বিলাপ আর হাহাকার। আকাশে উঠে যাচ্ছে কালো ধোঁয়া, শবদেহ, পোড়ানোর উৎকট দুর্গন্ধে এলাকাটা ছেয়ে আছে। এর ঠিক পাশের চত্বরে ইলেক্ট্রিক চুল্লিতেও নিঃশব্দে মানুষ কাজ চলছে।

কুপড়ির লাইন থেকে তিনচারটি ঘর আর ছেলেমেয়েরা এসে দাঁড়িয়েছে। আশপাশের কয়েকজন ঠাকুরমার অবয়বে শেকড়বাকড়ের মতো দেখতে জীর্ণ হয়েছে। মেয়েদের মধ্যে সন্ধ্যা, ঘুগনীরী, বীণা এসেছে। সন্ধ্যা চোখে আঁচল চেপে বৌপাড়িলে। ঘুগনীরী বয়স্কা প্রতীনা, পশুই আড় হয়ে হেলানে বসেছিল, তার কাছে বসে আঁচায় হাত বুলিয়ে মেয়েরী আদর সান্ত্বনা দিচ্ছে। তার হাতের স্নেহের স্পর্শ পেয়ে পশুই আবার কেঁদে উঠল। রাবু অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে। এইসব আদর ঘৃণা সে মোটেই সহ্য করতে পারে না।

লাহর কাজ শেষ হতে হতে সন্ধ্যা হয়ে এল। আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া চুকিয়ে একার ঘরে ফেরার পালা। চিতার জল ফেলে পশুই পেছনে ফিরল। বুকন ওর কাঁধে হাত রেখে বলল — ঘরমে চল্। পশুই যেতে যেতে রাবুর দিকে তাকাল — তুই বাবুর বাড়িতে ফিরবি তো?

রাবু থমকে দাঁড়াল। এক নিমেষে আজকের ঘটনা-দুর্ঘটনার ছবিগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠল। এতক্ষণ নিজের কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিল। পরদিন তার খাওয়া-থাকার ঠিকানা জানা নেই। সে ইতস্তত করে।

পশুই বলল— কিছু বলবি? রাবু মাথা নাড়ল। পশুই কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর আবার নিচু স্বরে বীরবে হাঁটতে থাকে। এক সময় পশুই তার কুপড়ি ঘরের দাওয়ায় উঠে ঠাকুমার হাতে যেন নতুন চাটাই পেতে রাবুকে বসতে বলে। সে নিজে উনুনের খুলিতে যেলাম নিয়ে বসে পড়ল।

অনেকক্ষণ নির্বাক থাকার পর পশুই অস্ফুট স্বরে বলে উঠল —আমি খুব অন্যায় করেছি রাবু। কি করব কোনও উপায় ছিল না .....

রাবু উত্তর দিল না। আজ যে কত রামুর আশ্রয় উপর নিয়ে বয়ে গেল পশুই কি তার কিছুমাত্র আন্দাজ করতে পারবে, বিনের এই শেষপ্রান্তে দিয়ে?

— বাবু হয়ত ভেবে গেছে না রে? খালায় খবর নিয়েছে? কিন্তু বলছিল সে জেল ভুই?

— খালায় খবর যেতেনি। রাবু বীরে বীরে বলল।

পশুই অবাক হল — জেল যেতেনি লালিস? আমি তো থানা-পুলিসের কথা মাথায় রেখেই তাদা ভেঙে টাকা নিয়েছি। রামুমাকে দাঁড়ালে ছাড়া আমার কোনও চিন্তা ছিল না। মাঝুমা বাঁচলে তবুও আমে যেতুম। পরে এসে কথা চাইতুম। আমার তো কারেছি।

রাবু পশুইর দিকে তাকায়। আবছা অন্ধকারে তার মুখখানা অস্পষ্ট, কিন্তু কয়েকটা কথাগুলো রাবুর বুকে বাজা দিল। পশুইকে নির্দোষ মনে হয়, তার আন্তরিক অনুশোচনা নিরুপায় চলচ্ছক্তির অনুভবকে দুমড়েমুচড়ে তাকে উচ্ছন্ন করে তুলল। রাবু সান্ত্বনার ভাষা খুঁজে পেল না।

সাকুলার ট্রেনে একটা খালি ইঞ্জিন হইসেল বাজিয়ে চলে যায়। কুপড়ির দরিতে ধুলোর আস্তরণ জমে। কেরোসিনের সন্ধ্যা, কাঠ, টিন, পলিথিনে তৈরি আবর্জনাকীর্ণ আস্তানার ফিকে আঁধারে মিশে চলে যায়। রেল লাইনের দু-পাঁচ হাত তফাতে দড়ি খাটিয়ায় মাদুরে নির্বিকার শুয়ে বসে থাকে, গল্প করে সারাদিনের পরিশ্রান্ত মেহনতী নারী-পুরুষ।

রাবু নিস্তব্ধতা ভেঙে আস্তে আস্তে বলল — বাবু আমাকে অপহরণ করে

ছাড়িয়ে দিয়েছে।

ঘাঁটাল চমকে পন্টু উঠে বসে। কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে বলে উঠল — তোকে কেন মারবে? তোর তো কোনও দোষ নেই।

রাবু হতাশ হয়ে মাথা নাড়ল — তোর জন্যে আমার ভাবি, তবুও ভাবলাম। আমি তোকে চুরি করতে সাহায্য করেছি।

পন্টুর নির্মাক চোখে পলীর ছবিটা ভাসতে থাকে। দু-হাতে মাথা চেপে সে আর একবার ফুঁপিয়ে ওঠে।

রাবু পন্টুর কাছে এসে তার কাঁধে হাত রেখে বলল — কাঁদছিস কেন? আমার কথা ছেড়ে দে। কিন্তু তোর কি হবে বলতো?

—এ ঠিক ঘাসেদের কাজ, রাবুর মাথে তোর নামে লাগিয়েছে। পন্টু ভাঙা ভাঙা স্বরে বলল। রাবু মাথা নেড়ে সায় দেয়।

আকাশ অনেকক্ষণ মুক্ত চুপচাপ। চিরকাল দুই কিশোর, একসঙ্গেই তারা বাসের কুপমণ্ডুক অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে। রাবুর জানলা, তার বাড়ি কা যেন জড়িয়ে ধিরে। পন্টুর অবস্থা তার চেয়ে কঠিন। এ পুলিশীতে তার আর কোনও আকর্ষণ রইল না। তবুও আলা ভালবাসার কিছু নেই। কিন্তু এই মুহূর্তে তারা দুজনেই সবচেয়ে আপনার। চুরির অপরাধ মাথায় নিয়ে রাবু কেন মুখে মেঘেদেরকমের জন্যে ধিরে দাঁড়াবে? ও তো পলিটাই কোনও দোষ করেনি। পন্টুর অবিশ্যি কী? ঠাকুরঘরে দাঁড়ানোর জন্য সে চুরি করেছিল, ধরা পড়ল না।

রাবু মাথা তুলেই দেখতে পায় মাথা আর পুলারী কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। পুলারীর হাতে মাটন আর জলভর্তি সেটাই, সন্ধ্যার হাতে একটা প্লেট সেটা-ভেলের টিন আর তার ওপর মুড়ানো দুধ-এক বান্ডিল আটার রুটি আর পাতা জলা। মাথা বলল — খেটা খা সোনা। তৈরি আছ তুমহারা।

সন্ধ্যার বয়স বেশি, চেহারাটাও ভাল। কিন্তু পুলারী নবীনা, এক বছরও পুরো হয়নি বিয়ে হয়েছে। বিকেলবেলা সে প্রতিদিন সজ্জাগোজ করে। সোহাগী মুখখানা কারখানা থেকে ফিরলে মুক্তন নিমতোলা ঘাটে তুলসীদাসের রামায়ণ গানের আসরে নিয়ে যাবে, কেলওদিন সিনেমা দেখতে যায়। আজ পুলারী সাজগোজ করেনি। সন্ধ্যে থেকে ঘুমোলা আর সে পন্টুদের সঙ্গে পলাপনে আলিয়েছে।

পুলারী মাটিতে জলের ছিটে দিয়ে জায়গাটা পরিষ্কার করে মাটন আর সেটাই রাখল। সন্ধ্যা মুক্তনের মাকখানে খাবার থালাটা রেখে একটু দুরে গিয়ে বসে পড়ল। অবাক পন্টু রাবু হাতমুখ ধুয়ে খেতে বসল।

পুলারী একপাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু সন্ধ্যা একান্ত আপনজনের মতো পরিবুদ্ধির কথা বলতে বলতে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। রাবু মুখভার মেলি কথা বলে না। সন্ধ্যার অনুরোধে পন্টু একখানা রুটী খেল।

খাওয়ার পর সন্ধ্যা সেটাবর্তন নিয়ে চলে গেল, পেছনে পুলারী মাটন হাতে নিজের ঘরে ঢুকল। এখন তার ডায়েরির পালা। আকাশে কৃষ্ণপক্ষের কাকচোট টাদের আলো। নিমতোলা ঘাটের শ্মশানযাত্রীদের হরিবোল ধ্বনি, ঘাটের আশপাশ অন্ধকার স্পষ্ট আড়াল করে আছে। সারাদিনে কারোরাত্ত শ্মশান সঙ্গীতের অধিকার বর্তায়ন। দুধপের গরি কাটে আলাদে। মাঝে মাঝে বৃষ্টি পড়িতে আসে, গলার দুরাস আকাশ ঢেকে আবার মিলে যায় চিরের আওনে। রাতের শেষে ঘরে ঢুকেই রোজ ঘুমিয়ে পড়ে। আজ রোজ চোখ।

পন্টু বলল — ঘুম আসছে না। চল আমেরিটোলা ঘাটে যাই। আজ রাতটাই শেষবার। রাবু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল — এখনে ওবি কিরে! শেষের জায়গা কোথায়?

— চল্ না দেখবি। পন্টু ঘরের ভেতর ঢুকে একটা চাদর মোর করে আনল। খরচার ছোট একটা চাদর জড়িয়ে রাবুকে সঙ্গে নিয়ে চলল।

নিমতোলা ঘাট থেকে আমেরি ঘুরে, আমেরিটোলা ঘাট। শ্মশানের ভীড় বাকরা এখানে নেই, তবে দিনের বেলা জনসাধারণের ভীড়ে জমজমাট থাকে। পাশে সিমেন্ট বেঞ্চী ঘাটে মজীদের দীর্ঘ লাইন। বিশেষ করে সকাল বেলা, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে স্নানের সে এক মহাপুণ্য। স্নানের পর উৎসর্গীয় পুরোহিত বসু পড়ে চন্দন চর্চিত করে দেয়। কপালে ত্রিপুকে পদ্মফুলের ত্রিদলের চন্দনের ছাপ নিয়ে, তুলসী সরণা ত্রিবার ভুলসীমালা গলে ফেরে। এইসব পাতা বাসন্তুদের কুল কোলাহলে ছাড়া লোকজন এখানে। বড় বড় কাঠের বাক্স, আরি কাঠের তৈরি ত্রিশূল তোরণের মতো, ভেতরে যাবতীয় প্রকৃতীর সরঞ্জাম। সকালবেলা এই চত্বরটা বাসের কলরবে পাতা পুরোহিত কুলপদ্মন নিয়ে বসে থাকে

পড়েছে।

পল্টু একটা বাঙ্কের ওপর বালিশ বিছিয়ে নিল। পাশাপাশি দুজন শুয়ে পড়ল। এখন অনেক রাত। রাস্তার গাছের ফোকরে বসে টাস নিজের দুঃখ বেচছে। জলের ছলাৎ ছল শব্দ ভেসে আসছে। অদূরে নিয়নালো মহানগরীর মহাকালের মহাযজ্ঞ অহর্নিশ আবর্তিত। দুজনের চোখে ঘুম নেই। ক্ষুধার উৎপাতও আছে বেশ। কিন্তু লোক এখানে প্রতিদিন শুয়ে থাকে, তাদের পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঢাকা না চলতে ঢাকা। পল্টু ভরসা করে — তোর জামাপ্যান্ট জিনিসপত্রগুলো কি করে আনলি?

—মেজদাকে দিয়ে আনালাম তাড়াতাড়ি। একটা নতুন চামড়ার ব্যাগ কয়েক বই খাতা আর পাজামা জামাপ্যান্ট।

— কি করবি কাজ খেকে?

রাম্বু এর উত্তর সারাদিন ধরেই খুঁজেছে। কোনো কূল সে দেখতে পায়নি। প্রতি মাসে হাতখরচ পঁচিশটাকা জেকে মাকে টাকা পাঠায়। বড় জোর তিন পঁচিশ জমেছে। তাহলে টাকাটা তার পকেটেই আছে। কিছুদিন আগে দুটিপাত থেকে একটা ছবিওয়ালা কিনে তাতে দেখেছে। খুবই সাধারণ টাকা, ধর্তব্যই নয়। অজকার ধুর্বোধ্যপথে ছোট জোনাকির মতো হাসছে। রাম্বু পাতের মশা তাড়াচ্ছিল, আস্তে আস্তে বলল — তুই কি করবি ভাবছিস?

পল্টু বলল — সুযোগ হলেই বড় ওদের পুরোনো জরদগবার একটা কারখানার চেষ্টা করব। দেখা যাক কি হয়। কিছু না পেলে রাস্তার পাশে খোমাই হলে যাব। কথা হয়েছে। একটু পেমে আবার বলল—তোর কথার জবাব।

আবার স্তব্ধতা। কাছাকাছি একজনের নাক ডাকছে। একটি মধ্যে পাঁচের আওয়াজের মধ্যে ঘড়িদেল বাজিয়ে গজার জল ঢেলে পাড় ভরে দিলেন। ঢেলে গেল। ঘড়িদেলের শব্দে রাম্বুর সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

শেষ রাতের ঠাণ্ডা বাতাসে চোখের পাতা জুড়ে আসে। রাম্বু স্বপ্ন দেখল, খুব ছোটবেলার তার বাবার হাত ধরে সে এক অচেনা গাঁয়ের পথ ধরে চলেছে। দুপাশে আমকাঁঠালের বাগান। কলের আরে অজস্র গাছের ডাল হাওয়ার বাতাসের মধ্যে। অনেক গাছ। ঘরে ঘরে কয়েকটা ঘরেও গাছেহার বুলোয়। বাবা দেখে হাসল। কিন্তু কথা বলে না। বাবা আছে। দিল — খোকা চল্। বড় হচ্ছে। আর ঘণ্টাখানেক হাঁটলেই আমার বাড়ি। দেখবেন কত আম আছে আমাদের। দিদিমা তোর জন্যে বসে আছে।

ভোরের রাম্বুর বুক দুলিয়ে ঘেটে। ট্রেনটের প্রথম ভোমুরে ঢোখ-মুখ জ্বালা করছে, গায়ের নিচে বই দুমড়ে। খোকা পড়ার মতো অবস্থা। সে শুকনো গলায় বলল —বাবা, জল খাবো। বলা রাম্বুর দিকে তাকাল; ব্যস্ত হয়ে চারপাশের প্রতিবেশী বাড়িগুলো দেখে নিয়ে বলল — চল ওই বাড়িটায়।

গলায় লালপেড়ে শাড়ির আঁচল জড়িয়ে একজন অল্পবয়সী বধূ পুজোর থালা নিয়ে বাড়ি ঢুকছে। রাম্বুদের দেখে দরজায় দাঁড়িয়ে পড়ল।

—বৌদি! সঙ্গে এটি কে?

—আমার ছেলে রাম্বু।

—আহা, তোমুরে মুখ শুকা হয়ে গেছে। এসো এসো বাবা।

—বৃপালিনী, বসার সময় নেই। শ্বশুর অসুস্থ। দুপুরের মধ্যে পৌঁছুতে হবে। তুমি খোকাকে একগ্লাস জল দাও, ঐ গাছে আমেরও ডাব।

—ওরে ছোট্ট না খেলে কোনোদিন এদিকে আসতে না! বৃপালিনী অভিমানে জল নিয়ে করল। তার মুটোট দীর্ঘায়িত হল। ২৪ প্রহরা কিন্তু দুখবাসন নিয়ে ফুরী, উঠোনে খুচোখে।

রাম্বু অবাক বিস্ময়ে হয়ে গেল। আমুকে বলল— খোকা, প্রণাম কর। ভাবি হয়।

রাম্বু আড়ষ্ট হয়ে কোনও রকমে মাথা নিচু করে প্রণাম সারল। আমুর লজ্জা দেখে বাবা হাসল। বৃপালিনী নামের তরুণী বউটি রাম্বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে লাগল। রাম্বুর বয়সে এ এক ভয়ংকর শাস্তি। শরীর মুচড়িয়ে রাম্বু মুক্তি পেতে চাইছে। কিন্তু বউটিও নাছোড়। অনেকক্ষণে রাম্বুই রক্ষা করল।

—বৃপালিনী ওকে ছেড়ে দাও। ভীষণ লাজুক ছেলে। রাম্বু হাঁফ ছেড়ে সরে দাঁড়াল। বৃপালিনী খুশি হল না। হঠাৎ নিস্তব্ধ হয়ে গেল। পরক্ষণেই মুখে হাসি টেনে বাবার দিকে চেয়ে বলল— তোমার ছেলেও ও লাজুক!

বাবার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। বৃপালিনী তাকিয়ে আছে। তার চোখেমুখে খুশির বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই।

—বৃপালিনী, দেরী হচ্ছে। খোকাকে

একজন যাত্রী। তাড়াতাড়ি খেয়ে হবে। তোমরা চড়ে গেলে খুব ভীড় হবে। জোনাস স্বামী কেবিনে। ওকে ডাকলেন।

— পাশের গ্রামে পালকিতে যেতে। ফিরতে রাত হবে।

কথাটি হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি ঘরের কোনের থেকে একটা মাদুর এনে তাকালার বিছিয়ে দিল।

—একটু বসে জিরিয়ে নাও।

বড় পেতলের বদনাতিতে করে জল আর থালায় নিয়ে এসে বলল— হাত মুখ ধুয়ে পা ধুয়ে বসো তোমরা।

মনা তাড়াতাড়ি বললেন —শোনো, আজকের বসলে চলবে না। অনেক মরশুমের, এখুনি বেরোতে হবে। কিন্তু মনা উদ্দেশে বলা সে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেছে, পরক্ষণেই দুটো কেরোসিন সাজিয়ে এনে উপস্থিত হল। বলা বাহুল্য ইতিমধ্যে জোনাসের নিজের হাত মুখ ধুয়ে খেয়ে নিয়েছেন। খুশির খোয়া, বলছেন বাবু—খুবই উপযোগী। বাবু আশ্বস্ত হলো। দুপালিনী একটি হাতপাখা এনে দুজনকে হাওয়া করা শুরু করতেই বলা পাখাটি এক্ষুনি নেওয়ার সময় দুজনের দুই হাত স্থির হয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। দুজনের পরস্পর ভীত দৃষ্টি বিনিময় মাদুর অতি বৈশাখের চোখ এড়ায়নি।

মাদুর জন্য বিনিময় হয়। উঠে বসে অনিশ্চয়তা দৃষ্টিতে চারদিকে তাকায়, আজকের চেতনার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে যাচ্ছে। উঠে বসে। অন্ধকার পুরোপুরি কাটেনি। অন্ধকারের সন্ধিক্ষণে কলুর শিবির চোখে ইতিমধ্যে পরদের পাকিদের মধ্যে থেকে কলরব জেগে ওঠে। দুএকজন রাস্তাঘাটে দেখা যাচ্ছে। জোয়ালের ওপর, গলা এখন জীবন্ত, পরদের পুরু আবরণ ভেদ করে আলো ফুটে উঠেছে। মনোরোগী মা।

পরদিনের দীর্ঘ ঘটনাবলী স্মৃতিপথে আসতেই বাবু উঠে দাঁড়াল। এখনই নায়েবকাকার কাছে যেতে হবে। সমস্ত কথা তাকে জানাতে। তাকে নিয়েই জোনাসের বাড়ী থেকে নিজের জামাকাপড়, চাদর, বই খাতাপত্র আনতে হবে। হঠাৎ মিনিকে মনে পড়ে। খালার মনা জোয়ালের নিচে ঢাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পড়ে।

পল্টু উঠে পড়েছে। সকালের মুখোমুখি মুখ পৃথিবীতে সব মানুষের এক। এক মুহূর্তে সকলেই সুখ-দুঃখের ঊর্ধ্বে সকল নিশ্বাস। গতদিনের দুর্ঘটনার ছাপ তার মুখে নেই। পল্টু জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকাল। পাশে নারায়ণী মুখ উৎকণ্ঠাকারী বাবুদের একমাত্র মুখ, কোলাহলের কুড়ি, মুখে একমুখে হাসি ও বিরক্তি, দাঁড়িয়ে আছে। বাবু বলল — পল্টু, আমি নায়েবকাকার কাছে যাচ্ছি।

এতক্ষণ পর যাবতীয় হয়ে পল্টু বাবু থেকে নেমে দাঁড়ায়। মাটি তখন ছোট ছোট ঢেউ খাচ্ছে পড়ছে। দুজন কয়েকটি বাস নেমে নিয়ে চোখ মুখ ধুয়ে নিল। একটা ট্রাইসলার পুলিশ-কক্ষ হলে মেরেই কয়েকটা ঢেউ এসে পা ভিজিয়ে দিল। আকাশগঙ্গা সূর্য উঁকি দিয়েছে আকাশে। জলপূর্ব জোয়ের ঠান্ডা বাতাস। ওরা বিছির একপাশে বসে পড়ল।

—জলকাদা ছেড়ে চলে যাওয়া নাকি সুযোগ নাই।

—কেমনতর? বাবু বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকায়।

—আমিনে। জনা কেনার মেলে — মেয়াই, আমাকে মেখানে খুশি। সুরক্ষা চাহার সঙ্গে মেয়াই মেতে পারি। পল্টু স্থির মতো বলল।

জলকাদায় পরিচিত জীবন ঘুটিপাথে মেতে ওঠা কিশোর পল্টু দেখ জলে জলকাদা পরে আর জনা মেখ জলে চিঠিতে মেখা মুম্বাই মায়ানগর নিয়ে পরদের কথাই মোতে। এর বাইরে যে এক বিপুল জনসমষ্টি বাস করে পল্টুর প্রতিজনার, জনমার তার স্থান নেই।

বাবুর সঙ্গে পল্টুর এখানে ওজাদ। হয়ত মনের মিলুতে পল্টুর সঙ্গে আর জীবন মেলে না। পল্টুর নিষ্পলিন জলতে পৃথিবীতে আর কেউ রইল না, কিন্তু বাবুর মাথার ওপর মা মিনি মেটিমাহিনের পরিচয়। পল্টুর মতো তাদের মেশনহরের হাতছানি মেয় মৈকি! তবে পরে নয়। পরদের অজানা রহস্যের মধ্যে আছে আকর্ষণ নিষ্ঠুরতা। মুহূর্মুহু ঘাতক পথে তারা ইতিমধ্যে এই পরদ জলকাদা, এর অন্তরঙ্গ আলমনের আড়ালে প্রতিনিয়ত চলছে নিষ্ঠুর আনন্দের উল্লাস। এর রহস্য মেখন আকৃষ্ট করে মেমনি এর নিষ্ঠুরতা তাকে দূরে সরিয়ে মেয়। পরদের পরিচিত জীবনযাপন মে কিছুতেই মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেনি।

—তুই নায়েব কাকার কাছে যাবি।

—হ্যাঁ। তুই কি চলবি?

— কুরুক্ষ চলার কাছে ভাগে।

অকস্মাৎই স্পষ্ট আলোকিত রাজপথে চলমান, অনুমেয় চলাচল ধীরে ধীরে স্তব্ধ হয়। নিয়োন গভীরের পাতালের মেট্রো সঙ্গে চলমানদের ও পথচারীদের বাস্তবতা, চারদিকের কোলাহল ভীত হয়ে ওঠে। বৃষ্টি ধারায় বন্ধুনিজেদের আলোকোজ্জ্বল প্রাণ। তীরবেগে বুজনে বুজনের দিকে তাকায়। রাবু উঠে পড়ল। পন্টুকেও উঠিয়ে দিল। একই সঙ্গে পা ফেলে অক্সফোর্ডিটোলা আটের বাইরে এসে দাঁড়ালো বুজন। এবার দুই দিকনীতি পথে বুজন পা বাড়াবার আগে রাবু পন্টুর হাতে হাত রেখে জানায় বলল—কলকাতায় থাকলে ফোন দেখা হবে। বোম্বাই যদি চলে যাও তার আগে আমাদের নিশ্চয়ই দেখা হবে। কলিনে থাকার ঠিকানা কি আছে? চলি রে।

রাবু পা বাড়ায়। পন্টুর মুখোশ ভাবে জল। সে প্রাণপণে আরো চাপছে। রাবুও চোখও ঝাপসা হয়ে এল। সে স্তব্ধ পা চলায়। কিছুদূর গিয়েই পেছনে ফিরে দেখল পন্টু দুহাতে চোখ মুছছে। কি ভেবে রাবু আবার পন্টুর কাছে এল। পন্টুর মুখোশ লাল। গভীর। রাবু তার কাঁধ ছোঁয়। রানিবাল থেকে কয়ে নিজের সঞ্চিত টাকা থেকে কিছুটাকা একটা সেটি পন্টুর পকেটে ঢুকিয়ে দেয়। আস্তে আস্তে বলল — সামান্য কটা টাকা রাখ, সাবধানে থাকিস। কখনও অসুবিধে হলে চিঠি এবার আর পেছনে ফিরে তাকাবার সাহস হল না।

পন্টুর নির্বাক দৃষ্টি তাকে অনুসরণ করল, যতক্ষণ এ মোড়ের বাঁকে সে মিলিয়ে গেল।

নিবন্ধ

ভিড় বাড়ছে, অস্বস্তিও

অমিত চক্রবর্তী

মাত্র ৩০ বছরে কলকাতার জনসংখ্যা কমেছে। এ বছরের জনগণনায় যে প্রাথমিক হিসেবটি পাওয়া গেছে তাতে শ্যামবাজার থেকে কালীঘাট, আমি কলকাতার ১০০টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৫০টি ওয়ার্ডে জনসংখ্যা কমেছে গত দশ বছরে। দক্ষিণ কলকাতার কোনো কোনো ওয়ার্ডে জনসংখ্যা হ্রাসের হার প্রায় ৩০ শতাংশ এসবে কলকাতাবাসীদের স্বস্তির কথা নেই যেহেতু সংলগ্ন কলকাতাকে নিয়ে যে বৃহত্তর কলকাতা —বাদ দৌলদি বারাকপুর থেকে ঠাকুরপুকুর, বরানগর থেকে বারুইপুর সেখানে লোকসংখ্যা বেড়েছে হু হু করে। ১৯৯১ সালে যে তিনটি অঞ্চল কলকাতা পুরসভার সঙ্গে যুক্ত হয়, সেই বজবজ, মেয়াদা এবং গড়ফা-মহিনগরের ৪১টি ওয়ার্ডের সবকটিতে লোকসংখ্যা বেড়েছে। বজবজের ১০৮ নং ওয়ার্ডের কলকাতার জনসংখ্যা ঠিক কতটা বাড়লো সেটা জানতে অবশ্য আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।

১৯৯৯ সালের ১২ই অক্টোবর। দিনটা স্মরণীয় কারণ এদিন আমাদের পৃথিবীর জনসংখ্যা ৬০০ কোটি ছাড়িয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে আমাদের দেশের লোকসংখ্যা ১০০ কোটি। অর্থাৎ এখন প্রতি ছজন মানুষের একজন ভারতবাসী। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার যে সামান্য অংশটুকু ভারতের বরাদ্দ হয়েছে তার নিরিখে আমাদের জনসংখ্যা যে নিয়ন্ত্রণে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

যে ঘড়ির লোকের কথা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে তাঁর নাম থমাস রবার্ট ম্যালথাস। জাতে ইংরেজ, পেশায় অর্থনীতিবিদ। ১৭৯৮ সালে জনসংখ্যাবৃদ্ধির উপর লম্বা-চওড়া এক প্রবন্ধ লিখলেন, যার সারমর্ম হল — মানুষ একদিন পৃথিবীর সমস্ত জমি চাষ করেও খাদ্যের অভাব মেটাতে পারবে না। কারণ, যে হারে খাদ্যের উৎপাদন বাড়ে, মানুষের সংখ্যা নাকি বাড়ে তার চেয়ে ঢের বেশি হারে। এখন থেকে দুশো বছর আগে ম্যালথাসের কপালগুলো ঘরিবাস টাকেছিল। সেটা পৃথিবীর মানুষের সংখ্যা তখন আজকের ওয়ার্ডের জনসংখ্যার চেয়েও অনেক কম। তাছাড়া, "আমেরিকা" নামে নতুন মহাদেশে উপনিবেশ স্থাপনের সন্ধান পেয়ে কাতারে কাতারে লোক ছুটছে ইউরোপ থেকে, সুতরাং জমির অভাবে মানুষ এতদিন নিদারুণ খাদ্যসংকটে পড়বে সেকথা মানতে তখন সবাই নারাজ।

তারপর গড় দিন যেতে লাগলো, মানুষের সংখ্যা যখন হুহু করে বাড়তে থাকলো। তখনই বোঝা গেল কী অসাধারণ দূরদৃষ্টি ছিল ম্যালথাসের। ১৮৩০ সালে যখন তিনি মারা যান, পৃথিবীর লোকসংখ্যা তখন ১০০ কোটির কিছু বেশি। সংখ্যাটা দ্বিগুণ হল একশো বছরের মধ্যেই এবং তা আবার দ্বিগুণ হতে সময় লাগলো পঞ্চাশ বছরের কম সময়। ঠিকহারে হিসাব করলে পৃথিবীর জনসংখ্যা ১০০ কোটিতে পৌঁছেছিল ১৮০৪ সালে, ২০০ কোটিতে পৌঁছলো ১৯২৭ সালে, ৪০০ কোটিতে পৌঁছলো ১৯৭৪-এ এবং ৪০০ কোটিতে পৌঁছেছিল ১৯৯৯ সালে। তেমন অঘটন না ঘটলে পৃথিবীর জনসংখ্যা ৮০০ কোটিতে পৌঁছবে মাত্র বছর পঁচিশের মধ্যে। সেদিন ঐ বিপুল মানুষের খাবারের জোগান অথবা বসবাসের ব্যবস্থা কোত্থেকে হবে তা নিয়ে ভাবতে ভাবতে ম্যালথাসকে এখন অনেকটাই মনে পড়ছে।

পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা কী হারে

হারে বেড়ে চলেছে তা সবচেয়ে ভাল টের পাওয়া যায় শহরগুলির দিকে নজর দিলে। কলকাতার কথা নিয়ে শুরু করেছি। আমাদের এই মহানগরীর জনসংখ্যা দেড়কোটি ছুঁই ছুঁই। কলকাতার চেয়েও দিল্লী, বাঙ্গালোর, মুম্বই, আহমেদাবাদে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এখন বেশি। জনসংখ্যা দ্রুত করে বাড়ছে ঢাকার, সাংহাই, ঢাকা, করাচি, জাকার্তা, লাগোস আর সাও-পাওলোর। খেয়াল করলে দেখা যাবে, এই সমস্ত শহরগুলির অবস্থান ভৌগলিক দিক থেকে দুর্বল দেশগুলোতে।

তাহলে আমরা দেখছি, এখন থেকে পঞ্চাশ বছর আগে পৃথিবীর মাত্র ৭টা শহরের লোকসংখ্যা ছিল ১০ লক্ষ বা তার বেশি। জনসংখ্যার ক্রম অনুযায়ী শহরগুলি হল নিউইয়র্ক, লন্ডন, প্যারিস, জার্মানীর রাইনল্যান্ড অঞ্চল, টোকিও-ইয়োকোহামা, সাংহাই আর বুয়েনস্ আয়ার্স। ঐসব শহরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বিবরণ থেকেই বোঝা যায় – শহরগুলি গড়ে উঠতে সময় নেওয়েছে পঞ্চাশীর পর পঞ্চাশী ধরে। এরপর শহরের জনসংখ্যাও বেড়েছে একটু একটু করে। উন্নয়নশীল দেশের শহরগুলির ক্ষেত্রে ঘটনাটা ঘটেছে ঠিক উল্টো। উনিশশো চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের দশকে স্বাধীনতা পাবার পর ঐসব দেশের মানুষ নেহাতই কপিবুকেরগাতে আপনার শহরে ভিড় করেছে। উনিশশো ষাট আর সত্তরের দশকে মানুষের শহরমুখী স্রোত চরম থেকে চরমতর হয়েছে। এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিনআমেরিকার শহরগুলির চেহারাই বদলে গেছে। শহরের মূল কেন্দ্রগুলি আরও বেশি করে ঘিঞ্জি হয়ে উঠেছে। এই মুহূর্তে পৃথিবীর ৪০টির বেশি শহরের লোকসংখ্যা ৫০ লক্ষের উপর। বিশেষজ্ঞদের ধারণা ২০২৫ সালে এই সংখ্যাটা হবে ৯০। এদের মধ্যে ৮০টির অবস্থান তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে।

উন্নয়নশীল দেশের শহরগুলিতে আশ্চর্যজনকভাবে জনসংখ্যা বাড়ার কারণ প্রথমত দুটো। প্রথমত এসব দেশে জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধি। এ শতাব্দীর গোড়ায় ইয়োরোপ আমেরিকায় চিকিৎসাব্যবস্থা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শিশুমৃত্যুর হার কমে আসে; স্বাভাবিক কারণেই তখন ওসব দেশের মানুষ আশপাশ থেকেই ছোট পরিবারের দিকে ঝুঁকছিলেন। শিশুমৃত্যুর সঙ্গে জন্মহারের এই সমানুপাত লক্ষ করা গেছে আমাদের দেশের কেরালাতেও। আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকলেও শিক্ষার প্রসার এবং জন্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কেরালা সব রাজ্যের থেকে এগিয়ে রয়েছে। অন্য রাজ্যের তুলনায় শিশুর মৃত্যুহারও ওখানে সবচেয়ে কম।

দুইশশো ত্রিশ বছরের পর গ্রীনল্যান্ডী ঐসবগুলি আবার পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ার ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলোর মানুষের গড় আয়ু যেমন বাড়লো, তেমনি ঐসব দেশে জন্মের জন্ম-বৃদ্ধি হারের ভারসাম্যও ক্রমে বড় হয়ে উঠলো। এর অবশ্যম্ভাবী ফল জনবিস্ফোরণ। অবশ্য সাম্প্রতিক নিয়ে পরিবার পরিকল্পনার কর্মসূচী ঘোষণার কথা রয়েছে উনিশশো সত্তরের দশকের গোড়ায়। এতে পরিবার পিছু সন্তানসংখ্যা অনেকে সংখ্যে নেই কিন্তু সমস্যাটা আসছে অন্য দিক থেকে। এশিয়া-আফ্রিকার দেশগুলিতে মোট জনসংখ্যার শতকরা অংশের বয়স আজ ১৫ র নিচে। স্বভাবতই মোট জনসংখ্যার নিরিখে মধ্যবয়সে সক্ষম মহিলার সংখ্যা আগের তুলনায় অনেক বেশি। উদাহরণ হিসাবে আফ্রিকার কথাই ধরা যাক। ১৯৭৫ সালে ঐ মহাদেশের মানুষের জন্মহার ছিল প্রতি হাজারে ৪৭ জন। সেবছর ওখানে মধ্যবয়সে সক্ষম মহিলার সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৫০ লক্ষ এবং সবচেয়ে শিশুর সংখ্যা ছিল ১ কোটি লক্ষ। জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞদের মতে, ২০২৫ সালে আফ্রিকার মানুষের জন্মহার কমে প্রতি হাজারে ২৪-এ নিচে দাঁড়াবে, কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে মধ্যবয়সে সক্ষম মহিলার সংখ্যা দ্বিগুণ দাঁড়াবে ৪০ কোটিতে। ফলে পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানে আর্থিক কারণেও ২০২৫ সালে আফ্রিকার মাটিতে জন্ম নেবে ৪ কোটি ৫০ লক্ষ শিশু।

দেশের জনসংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে শহরগুলিও জনসংখ্যা বাড়বে সেটাই স্বাভাবিক, যদিও গ্রামের তুলনায়

পরিবেশের নিত্যবন্ধুর হয়ে ওঠে। আমাদের, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির আর্থসামাজিক পরিস্থিতি গ্রামের মানুষকে আরও বেশি করে ঠেলে দিচ্ছে শহরের দিকে, যেখানে জমি প্রসঙ্গগুলি ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা আর মেটাতে পারছে না। লাতিন আমেরিকার ৭৫ শতাংশ মানুষ ইতিমধ্যেই শহরবাসী, আফ্রিকা, ইথিওপিয়া, নাইজেরিয়ার মতো দেশগুলোর একদিন ৪৫ শতাংশ মানুষ গ্রামে বাস করলেও ২০২০ সাল নাগাদ শহর আর গ্রামের মানুষের সংখ্যার বিশেষ তফাত থাকবে না। ঐসময় আফ্রিকায় শহরবাসীর সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে ৯০ কোটিতে!

তৃতীয় বিশ্বের শহরগুলোতে কাজকর্মে সুযোগ-সুবিধা যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাড়ছে তেমন কথা জোর করে বলা যায় না। বস্তুত এইসব শহরের ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ মানুষ আজও পূর্ণ অথবা আংশিক বেকার। পটারির ঠিকিটি বিক্রি, ভক্তিগান-আজানের সিকে কাজ, কন্ট্রাকটারি, রিকশর ধাক্কাধাক্কি কিংবা ক্রেডিট কার্ডের গ্রাহক খোঁজার মতন অনিশ্চিত জীবিকার ওপরে ঝুলতে হচ্ছে নাগরিকদের একটা বিরাট অংশকে।

শহরের ভিড় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে যে কমছে সে আর নতুন করে কী! ভিড় বাড়ার ফলে মানুষের মধ্যে প্রতিযোগিতা বাড়ছে, একে অন্যের সাহায্যে আসা তেমন করে এগিয়ে আসছে না। শহরের মানুষের মানসিক চাপ বাড়ার পেছনে ভিড়-এর প্রভাব অস্বীকার করার উপায় নেই।

একটা নির্দিষ্ট আয়তনে যত প্রাণী-প্রজাতির সংখ্যার খুব বেড়ে গেলে তাদের অনেকের মধ্যেই মড়ক লেগে যায়। নরওয়ে-ডেনমার্কে লেমিং নামে এক ধরনের ইঁদুর আছে – যাদের সংখ্যা খুব বেড়ে গেলে, নিজেরাই দিয়ে তারা সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে ডুবে মরে। নিজেদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রাণী-আচরণের মধ্যে সত্যিই প্রকৃতিদত্ত কোনও ব্যবস্থা আছে কিনা তা যাচাই করার উদ্দেশ্যে একবার আমেরিকার মেরিল্যান্ড উপকূলের কাছে ছোট্ট এক নির্জন দ্বীপের ইঁদুরদের উপর নজরদারি চালানো হয়। কোনো এক সময়ে অল্প কয়েকটি ইঁদুরকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল ঐ দ্বীপে। দ্বীপটিতে কোনও হিংস্র জন্তু না থাকায় বছর কয়েকের মধ্যে ইঁদুরদের সংখ্যা দাঁড়ালো প্রায় তিনশো। তাদের খাদ্যের ঘাটতি না থাকা সত্ত্বেও হঠাৎ করে ওদের মাথা গরম হয়ে গেল। বিজ্ঞানীরা যে দলটি ঐ দ্বীপে গিয়ে ইঁদুরদের সংখ্যাবৃদ্ধির উপর নজর রাখছিলেন তাঁরা দেখা ইঁদুরগুলির মুখোমুখি, ধাক্কাধাক্কি, আক্রমণাত্মক প্রবৃত্তি। কিছুদিন ইঁদুরদের খুটিয়ে পরীক্ষা করে তাঁরা লিখলেন – অপুষ্টি বা অন্য কোনও বিশেষ কারণে নয়, বরং সংখ্যার বেড়ে যাওয়ার ফলে পরস্পর পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগের ব্যাঘাত ঘটার ফলেই পারিপার্শ্বিক এমন কিছু প্রতিক্রিয়া হয়েছে যা ওদের পলায়নের কারণ। বস্তুত ঐ দ্বীপে ইঁদুরদের সংখ্যা কমতে কমতে যখন ৯০-তে এসে ঠেকলো, ওদের মৃত্যুর হারও আবার স্বাভাবিক স্তরে নেমে এল।

পরীক্ষাগারের চার দেয়ালের মধ্যে প্রাণী-আচরণের উপর ভিড়ের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেছেন জন কালহুন। প্রায় ২০ বছর ধরে ইঁদুরদের উপর পরীক্ষা চালিয়ে তিনি দেখেছেন বদ্ধ খাঁচায় ইঁদুরের সংখ্যা খুব বেড়ে গেলে অদ্ভুত সব অস্বাভাবিক আচরণ করতে থাকে ওরা। পুরুষ ইঁদুরদের মধ্যে আগ্রাসী মনোভাব তীব্র আকার ধারণ করে, অন্যদের সঙ্গে মারামারি করতে ব্যস্ত হয় এবং অনেকেই যেমন যেন জাদুঘরা হয়ে খাঁচার কোণে চুপচাপ পড়ে থাকে। অস্বাভাবিক ধরনের বিকৃতি নজরে আসে। এক জায়গায় অনেকে জড়ো হওয়ার ফলে ওরা যে জায়গা ছাড়ে তোলে, তারও অস্বাভাবিকত্বই তার প্রমাণ।

ভিড় মানুষের মনে কী জাতীয় প্রতিক্রিয়া আনায় তা জানার জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা কম হয়নি। দেখা গেছে, গরমের দিনে একটা বড় ঘরে অনেকে মিলে কাজ করার সময় তাদের অস্বস্তি লাগে, অপেক্ষাকৃত ছোট ঘরে কাজ করতে হলে গরমটা লাগে তার চেয়ে অনেক বেশি। শীতের দিনেও

একটি কথা, অর্থাৎ ডাবের মধ্যে যত না ছড়াবের পরিমাণ কমে এলে মানুষের পীড়াটা কমে বেশি। আবার অপরিচিত ও অপরিচিত মানুষদের মধ্যে একটা বড় গল্পের টুকরো দেওয়া থাকে সময় কাটিয়ে যাবার জন্যে। এই কারণেই।

ট্রাম কর্তৃপক্ষ, কলকাতায় পথে-ঘাটের ভিড়ে ভরা আর ট্রামিদের উৎপীড়ন — যেটি কৃত্রিম আর অনুমান

ট্রামিদের সঙ্গে চলতে চলতে কলকাতা সম্পর্কে গবেষণাকে সমৃদ্ধ করেছেন ইতিহাসের বিভিন্ন কলকাতার কথা তাঁরা একবার চিন্তা করুন। সেদিনের তিন কোটি পরিবারের অনেকেই যে অঞ্চলের কলকাতায় বসবাস করেন, সে কথা সবার করে বলা যায়।

নগরের ঊনপঞ্চাশ

কলকাতার খাল

অশোক সেনগুপ্ত

দুপাশে বাঁধানো দীর্ঘ খাল। স্বচ্ছ জলে রাজহংসীর মতো ভেসে বেড়াচ্ছে ফাইবার গ্লাসে ঢাকা নৌকা। খাল থেকে নদী, নদী থেকে সাগর সঙ্গমে যাবার পথে এক স্বপ্নসফর। এডিনবরা, প্যারিস, ভেনিস, ফ্লোরেন্স, ভিয়েনা, ব্রুসেলস, আমস্টারডাম, হামবুর্গ, কোপেনহেগেন, স্টকহোম, লেনিনগ্রাদ, মস্কো, ভলগোগ্রাদ, কিয়েভ, ওয়ারশ, বার্লিন, ব্রাসেলস, ব্রুসেলস, ব্রুসেলস, ব্রু

নদীতে এসে মেশা খাল। কচুরিপানা, শ্যাওলা, ওষধি, বাহি-অনুরঞ্জিত খাল বা খালপার নয়। ইউরোপের এই সব খালের উৎস যেন অনুভবের, গভীরতম যেন ভালোবাসা। আর মানুষও সেই অনীহাবোধকে সভয়ত্নে বহে সম্মান দিয়েছে। কলকারখানার নিষ্প্রয়োজন সংযোগাপাশ, মলমূত্র আবর্জনা নিক্ষেপের ছাড়পত্র নয় এই খাল। ইওরোপের খাল তাই পবিত্র, প্রকৃতিবান্ধব।

অথচ কারুর দুর্বল অর্থনৈতিক পরিকাঠামো তাহিবাহে। লেখনকার খালের হালও একদমকার খালের চেয়ে ভাল। কোথাও এই খাল কাজে লাগছে পণ্য-পরিবহনের জন্য। কোথাও বা খালে ভাসমান শান্তিবন্ধ নৌকেন্দ্র বসে বাজার-হাট। ফুলের জলসা থেকে আনাজপাতি, জানাকাপড় থেকে মাছ-মাংস। গাইকেল-ট্রলিতে পর্যটকদের নিয়ে যাওয়া হয় এই ভাসমান বাজার দেখাতে, চলে বিকিকিনি।

সত্যিই কি এই ছবি কলকাতায় একেবারেই দেখা সম্ভব নয়? গবেষণা পরীক্ষায় ছড়িয়ে আছে অজস্রখানেক খাল। অবহেলায় অপদস্থও হচ্ছে সবাই। একটু উদ্যোগী হলে এরাই হয়ে উঠতে পারে কলকাতার ভোল পালটে দিতে পারে। এমন পারেও ছিড় করতে পারে বিকালের কলকাতা। সড়কপথের পাশাপাশি মন্ত্রী ও পণ্য-পরিবহনের জন্য খুলে যেতে পারে বিকল্প জলপথ। একটা সময় কলকাতা এবং সংলগ্ন এলাকার জল গিয়ে পড়ত বিদ্যাধরী নদীতে। ১৮৫০ সালে নদীটি ১৭৩ মিটার চওড়া ছিল। নিয়মিত সংস্কারের ফলে ১৯৮৬ সালে নদীর প্রস্থ বেড়ে হয় ১২৯৭ মিটার। তারপরে নদীটি দ্রুত মজে যেতে থাকে। সেই সময়েও কলকাতার মলমূত্র জল বিদ্যাধরী দিয়ে কুলটি নদীতে পড়ত। সেই জল পৌঁছত হুগলি নদীতে। ইতিমধ্যে বিদ্যাধরী আর কুলটির মধ্যে যোগাযোগের জন্য যেখানে-সেখানে খাল কাটা হতে থাকে। ফলে বিদ্যাধরী সঙ্কীর্ণ হয়ে যায়। ১৯২৮ সালে বিদ্যাধরীর প্রস্থ ১২৩০ মিটার থেকে কমে হয় ২০০ মিটার হয়ে যায়। সেই সময়েই বিদ্যাধরীকে নৌ-চলাচল এবং মলমূত্র জল নিষ্কাশনের অনুপযুক্ত বলে ঘোষণা করা যায়। এখন এটি পুরোপুরি মরা খাল।

অষ্টাদশের এই নদীর জলেও এখন প্রাণ ছড়া। পানিহাটি, নিমাখী, সোনাপুকুর, ভাটেয়ায় এই ছড়াগুলি জীবনের চেহারা নিয়েছে। বেলেঘাটার উত্তরে এই সব খালের পাড়ে পাড়ে গড়িয়ে উঠেছে ইটভাটা। নির্মাণের আগে এই খাল সংস্কারের দাবিদাওয়া ওঠে। খাল কাটা হয়। বর্ষার পরে দেখা যায়, খালে মজলের স্তরই চওড়া পড়েছে।

বাংলা ১৮৫০ সালেই বিদ্যাধরী মজে গিয়ে কলকাতার বাঁধা দিয়ে সহজ জল নিষ্কাশনের পথ বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। জল নিকাশের জন্য পুরসভা চাষিদের কাছে বাড়তি জমি চায়। চাষিদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল, ভূগর্ভস্থ ও জল জলপথের ব্যবস্থা করা হবে। চাষিদের জমি অধিগ্রহণ করে পুরসভা তপসিয়া-বানতলা থেকে ঘুঘিয়াড়ি পর্যন্ত ১৭ মাইল দীর্ঘ খাল কাটার কাজ শুরু করে। চাষিদের যে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল, অনেকই পরে প্রশাসন তা রাখেনি। এই পরিস্থিতির কথা জানা যায় ১৯৫৫ সালের ১১ মার্চ সোনাকপুরের তিনটিলা গ্রামে 'টালিগঞ্জ, সোনারপুর, ডায়মন্ড হারবা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির' প্রচারপত্রে। খালগুলি বুজে যাওয়ার উপক্রম হওয়ায় প্রতিবেশ জানতে প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানে নামেন কমিটির সদস্যরা। তাতেও অবশ্য কাজের কাজ খুব একটা হয়নি। ১৯৫৬ সালে

পুরসভার একটি কমিটি ড্রেনগুলিকাদের নালা এবং খাল কাটার ভার রাজ্য সরকারের কাছে সুপারিশ করে। সেই সুপারিশ চটজলদি রূপায়ণ করা যায়নি। ১৮৫১ সালে শহরের নিকাশি জল ও বৃষ্টির জল পূর্ব দিকের বিল্ড ভূমি ও ধেড়িগুলিতে পাঠিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় পুরসভা। এইসব জলাভূমি ও খালের সবে মিলাধরী, কুলটি পর্যন্ত সংযোগ ছিল, যেখানে ছেড়ে শহরের জল জমত।

কলকাতা পুরসভার পুরোনো রেকর্ড ঘেঁটে দেখা যাচ্ছে, সেই ১৯০২ সাল থেকেই খালগুলি নিয়ে সমস্যা। ওই সময়ে নিকাশি সমস্যার সমাধানের জন্য কুলটি পর্যন্ত পুরো খাল কাটা হয় মজলা জল সরাসরি মিলাধরীতে ফেলার জন্য। তখনকে প্রথম থেকেই কলকাতা শহরে গড়ে উঠেছে পরিকল্পনাহীন ভাবে। প্রশাসকেরা যে কখন পেরেছেন, নিজেদের অসাধারণ পরিকল্পনা কার্যকর করেছেন। খেসার খরচ করেছেন সরকারি টাকা। উনিশশো ত্রিশের দশকে কয়েকজন জানী প্রযুক্তিবিদ নতুন

খাল কাটার [illegible]। [illegible]। [illegible] রেডিয়েটেশন ট্রাস্ট [illegible] বিরোধিতা [illegible] তাঁরা। তাঁদের [illegible] ছিল, এর ফলে দুটি প্রধান খাল হারাতলা এবং কুলটি খাল ক্রমে মজে যাবে। সেই আশঙ্কা যে অমূলক ছিল না, নব্বইয়ের দশকের শেষদিকে এসে প্রশাসকেরা তা বুঝতে পারলেন।

চল্লিশের দশকে তৎকালীন বাঙলা সরকারের স্বাস্থ্য-বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার সি এফ সি ত্রিফিথস একটি বিকল্প পরিকল্পনা তৈরী করেন। হাতোয়া ও কুলটি পর্যন্ত খালে মিলাধরী নদী, পুটিয়ারী নদী, সোনা খাল, মালঞ্চ নদী, বাকলকাঠী খাল সংস্কার করে কলকাতার জমা জল মিলাধরী নদী দিয়ে বার করে দিতে চেয়েছিলেন ত্রিফিথস। বিজনসেতুর বা মরশাহুল, বাঘাকপুর মহকুমা দক্ষিণাংশের চেহারাটা এখন আমূল পালটে গিয়েছে। তাই ত্রিফিথসের পরিকল্পনা বাস্তবসম্মত হলেও তা কার্যকর করার উপায় নেই।

খুব একটা বেশিদিনের কথা নয়, সত্তরের দশকেও কুলটিপুর তথা কেষ্টপুর খাল দিয়ে কড় এবং মাটির হাঁড়িভর্তি গরুরগাড়ি চলাচল করতে। ঘুগাতের লবণহ্রদের ফলে সেই কেষ্টপুর খাল এখন মজে গিয়েছে। বুজতে বসেছে টালির নালা, বাগমারি খাল, ভাঙন খাল। তুলনায় নতুন পদ্মপুকুর খাল, ডি ভর্তিউ এফ চ্যানেলের অবস্থা খারাপ। স্থানীয় মুখর ভাষায় এইসব খাল এলাকার বাসিন্দাদের কাছে মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছে। ভ্রাতেপ নেই প্রশাসকের।

গত শতাব্দীর মাঝের দশকেই নাহির খালের আয়তন বড় ও গভীরের মোট পরিমাণ ছিল ১৪০ লক্ষ ঘনমিটার। ১৯৭৩ থেকে বছরে ৯ লক্ষ ঘনমিটার করে পাঁক সরানোর কাজ শুরু হয়েছিল। ১৯৭৪ সালে খাল সংস্কারের ব্যাপারে কলকাতা পুরসভা একটি মাস্টার-প্ল্যান তৈরী করে। এটি রূপায়ণের ভার পড়ে সি. এম. ডি. এ-র উপরে। কাশীপুর থেকে কেলেঘাই পর্যন্ত অংশে খাল সংস্কারের দায়িত্ব নিয়েছিল হাতে রেখে সি এম ডি এ মানিকতলা ও তপসিয়া, টালিনালা, টালিগঞ্জের খাল-সংস্কারের দায়িত্ব দেয় যথাক্রমে সি আই টি এবং সি এম ডব্লিউ এস এ-র উপরে। ১৯৭৪ থেকে ১৯৭৭ পাঁক সরানোর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল মোট কোটি কাটা। এর পরে দু-দশকে খাল সংস্কারের ব্যাপারে অন্তত ৩০ বার সরকারি ঘোষণা হয়েছে।

১৯৯৭-এর গোড়ায় খাল-সংস্কারের জন্য রাজ্য সরকারের একটি প্রকল্পে যেন কেন্দ্রীয় সরকার খাল-সংস্কারের জন্য প্রাথমিকভাবে ৩১ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা অনুমোদন করেছে। কলকাতা

পুরসভা, সেচ ও জলপথ এবং সি এম ডি এ-তিন পর্যায়ে এই কাজ করবে। প্রকল্পের তত্ত্বাবধান করবে পুরসভা। কাজ দেখবে 'ক্যালকাটা রিভার কনজারভেশন ডিরেক্টরেটের' অফিসাররা আসেন মাঝে মাঝে।

খাল-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করে ১৯৯৭ সালে 'ক্যালকাটা এনভায়রনমেন্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যাণ্ড অ্যাকশন প্ল্যান' শীর্ষক যে 'সেনসাপ'-এর বিশেষজ্ঞরা মাস্টার সংস্কারের কাজে একটি রিপোর্ট দেয়। সেই সময়ে সেনসাপ-এর প্রতিনিধিদের সরকারি তরফে আশ্বাসও দেওয়া হয়। কয়েক বছর আগে, মুকুল সিন্হা পর্যটন এবং উন্নয়ন পর্যায়ের প্রতিনিধিদল 'ফোরাম ফর ক্যালকাটা' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যদের নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। একটি ফরাসি সংস্থাকে খাল-সংস্কারের দায়িত্ব দেওয়া হয়। অচিরেই থেমে যায় এই কাজ। খালগুলি নিয়ে চক্র-জলপথ চালু করার জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর জলপথ পরিবহন বিভাগ একটি বিস্তারিত রিপোর্ট দিয়েছিল পরিবহনমন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীকে। এই সময়েও সরকারি তরফে আশ্বাসের কথা।

১৯৮২ সালের ৭ জুলাই যুগান্তর পত্রিকায় আদিগঙ্গার সংস্কার ঘিরে অনেক সুফল মিলবে শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয়। তাতে লেখা ছিল, আদিগঙ্গা সংস্কারের কাজটিকে কেবল একটি নিকাশী পরিকল্পনা হিসেবে দেখলে ভুল হবে। একটিকে দেখতে হবে জলপথ, পিকনিক, বিনোদনটিকে নিয়ে একটা সামগ্রিক সেট-ও বলা-উচিত পরিকল্পনা হিসেবে, যার সম্ভাবনা সুদূরপ্রসারী। বেশিদূরের কথা বলার ওয়াটগঞ্জ আইটিসি থেকে ধাপিয়ে গেলে পর্যটন খাতের ১০ লক্ষ টাকার আগে এ খাতে কোনো আয়ই হবে না। অথচ, এই অংশটিই সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ এবং এর অবস্থান হচ্ছে পদ্মা থেকে পরিষ্কার পানি জলপথে ঢোকার মোহনায় নিকাশীর কাজকারবার ও মাল পরিবহনের এক বড় সম্ভাবনার সম্ভাবনা থাকছে পাশাপাশি। গত বিশ বছরে এই ধরনের অসংখ্য রিপোর্ট ও বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন সাময়িকপত্রে। পুরোনো কাগজের ফাইলেই রয়েছে সেই সব তালিকা। কয়েক বছর আগে কলকাতা পুরসভার ১ ২ ৩ ৪ নম্বর বরো ও উত্তর ২৪ পরগনার ৬টি পুরসভায় বেশ কিছু মানুষ নিয়ে খালগুলো বাঁচাও আন্দোলন কমিটি তৈরী করেন। তাঁরা নমস্কারের টুপ টাপ তৈরী করেন খাল সংস্কারের জন্য। সেই সময়েও সরকারের তরফে আশ্বাস দেওয়া হয়। কিন্তু কাজ হয়েছে হয়নি।

নিকাশী ব্যবস্থা বেহাল হওয়ার অন্যতম কারণ মাছের ভেড়ি। কৃষ্ণপুর খাল, মহেশ্বরের নিকাশি খাল, হাড়োয়া খালের ধারে-নজরের বাঁধ দিয়ে তৈরী ভেড়িগুলি ফলে বিভিন্ন নদীর মোহানাবরাবর পলিমাটি পরবর্তী নিচু জমিতে আসতে বাধা পেত। এ ছাড়াও বরাবরে বিভিন্ন ভেড়ি উদ্বৃত্ত জল বার করে দেওয়ার ফলে পার্শ্ববর্তী এলাকার চাষের জমি প্লাবিত হতে থাকল। সেচ বিভাগের

প্রাক্তন চিফ ইঞ্জিনিয়ার উইলিয়াম উইলকক্স এই সব ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করেন 'শয়তানি শিকল' হিসেবে।

বর্তমানে পরিস্থিতির কারণে খালের একটা বড় অংশ নিয়েছে বর্জ্যপদার্থের পাশ দিয়ে। খালের ধারে দখলদারদের স্থায়ি দখল জারি। শিল্প বুলন্ত টাকার উপর। ওপরে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ইন্ট এণ্ড পার্ক। এলাকার আদি-বাসিন্দারা অনেকেই সরে গিয়েছে। বিস্তৃত হচ্ছে অপরিকল্পিত নগরায়ন। নাকের ডগায় হাজা-মজা খাল। মশা-দুর্গন্ধ। খালের ধার দখল করে আছে বস্তি, জঞ্জাল আড়ত, খাটাল। সারে পাকের গা-ঘেঁষে ওই অপরিকল্পিত ঢালের খাল আরও কিছুটা এগিয়ে নীক নিয়েছে ডান দিকে। একটা অংশ চলে গিয়েছে টালির নালার দিকে। অন্য অংশ বাঘাযতীন স্টেশনের দিকে গিয়ে বাঁ-দিকে গিয়েছে। খালের বেশিরভাগ অংশেই এত চড়া পড়েছে যে জলাশয়-পরিবহনের সম্ভাবনা অঙ্কুরে নষ্ট। বাড়ছে খালের ধারে দখলদারদের দাপট। এলাকাটি মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের বিধানসভা কেন্দ্র ও আবার এক দাপুটে নেত্রী, পুরসভার প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়ের ওয়ার্ড। বুদ্ধদেব অবশ্য ভ্রূক্ষেপ নেই এদিকে। সব কিছু দেখেও ওঁরা চোখ বন্ধ করে রেখেছেন। খাল-সংস্কারের নামে প্রচুর অর্থব্যয় অপচয়। কিভাবে অপচয় হচ্ছে তা এই প্রতিবেদক বার বার জানিয়েছেন দেখেননি, সেচ দফতরের চিফ ইঞ্জিনিয়ার, কলকাতা পুরসভার মেয়র, মেয়র-পরিষদ (নিকাশী) - সকলকেই। কাজ হয়নি।

মাত্র কয়েক বছরে খাল কাটার জন্য কত টাকা খরচ হয়েছে, সেচ দফতর কলকাতা পুরসভা—এর সঠিক উত্তর যে তাদের কাছ থেকেই পাওয়া মুশকিল। পুরসভার বক্তব্য, দেখ সেচ দফতর, সি এম ডি এ-র। সেচ দফতরের কর্তারা দেখিয়েছেন অর্থাভাব, জমিজমার ঝুটি। কিন্তু পরপর ও পরপরলির খালগুলি ভালভাবে দেখলে যে কেউ বুঝবেন, অপরিকল্পনা আর অদূরদর্শিতার জন্য ভবিষ্যতে কী ভয়াবহ মাশুল দিতে হবে আমাদের। খালগুলি বুজে যাচ্ছে। এগুলি যেন প্রাকৃতিক ড্রেন। আর কিছুই নয়। কোথাও কোথাও খালের পাড় বিক্রিও হয়ে যাচ্ছে। কেউ আপত্তি করতে গেলে হেনস্থা হচ্ছেন দখলকারীদের হাতে।

আলীঘাটের কলিম্পং রেডটীহল্লন ভট্টাচার্য টালির নালার দৃশ্য নিয়ে চিন্তা করেছেন অনেক। বেঙ্গের দুই বিজ্ঞানপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও সলিলিল কুমার মিত্র ১৯২৯-এর ফেব্রুয়ারি মাসে অধিবেশনে ওই খাল সংস্কারের জন্য সরকারকে নির্দেশ দেন। অর্থাভাবের কারণে সরকার। কৃষ্ণনগরিদের নির্দেশে খাল, কলকারখানা, প্রাণিসম্পদ, কারা প্রভৃতি দফতরের রিপ্রিসেন্টেটিভ নেকেটারি এবং সি এম ডি এ-র প্রতিনিধিদের নিয়ে তৈরী হয় ৮ সদস্যের কমিটি। ১৮ মাসের মধ্যে সংস্কারের কাজ শেষ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন হাইকোর্ট। প্রতি পুজোর আগের আদেশ অমান্যকারীর নির্দেশটি দেওয়ার নির্দেশ দেয় আদালত। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

অনেক বছর আগে ড্রেনেজ পরিবহনের একটি পরিকল্পনা তৈরী করে কেন্দ্রীয় জল-পরিবহন বিভাগ। টিংপুর লকগেট থেকে উল্টোডাঙা, উল্টোডাঙা থেকে কৃষ্ণপুর খাল, কৃষ্ণপুর খাল থেকে কুলটি এবং কুলটি থেকে বুড়বলং — এই চার ভাগে বিভক্ত ছিল প্রকল্প। নির্দেশটি হল খুব খালগুলির দুপাশে বাস্তুহারা বহুতল পরিবার ঝুপড়ি বানিয়ে আছেন। তাদের বিকল্প বাসস্থানের প্রয়োজন হবে। খাল-সংস্কারের পরে তলে দুপাশে বাসগৃহ তুলে বৃক্ষরোপণ করে এলাকায় অক্সিজেন বাড়ানোর প্রস্তাবও দিয়েছিল কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রী সংস্থাটি। শেষ পর্যন্ত এদেরও বিন্দুমাত্র অগ্রগতি হয়নি।

২২৩ বছর আগে কর্নেল টলি যে খালের সংস্কার করেন, সেই খালের অনেকটাই আজ লুপ্ত হয়েছে এঁদো পুকুরে। কে বলবেন, চল্লিশের দশক পর্যন্ত এই খাল দিয়েই নিয়মিত চলেছে পণ্যবাহী নৌকো। এ সবই আজ ইতিহাস। খাল-সংস্কার নিয়ে যত বিশ বছরের যত বৈঠক, যত লেখালেখি হয়েছে, তা নিয়েই রীতিমত গবেষণা হতে পারে।

কলকাতায় গতি আনতে চাই আরও ফ্লাইওভার

সঞ্জয় সিকদার

শহরে ঢোকা বা পাতাল প্রবেশ এই দুই ছাড়া শহর কলকাতার আর কোনও বিকল্প নেই। কেমন কলকাতার অবস্থাটা এখন সেই রূপক গল্পের 'মানুষ মক্কেলে'র মতো, বছিলদের চাপে ফাটো ফাটো। মক্কেল মক্কেলকে খাওয়ার কোনও উপায় ছিল না, কিন্তু কলকাতা প্রসারিত হয়েছে নদীর পুবে এবং দক্ষিণে, উত্তরে যতটা সম্ভব। পশ্চিমে গঙ্গা, তাই বিস্তারের উপায় নেই। তবু গঙ্গার নদী পেরিয়ে শহর পাড়ি দিচ্ছে পশ্চিমেও।

সাধারণতো শহর যতই ছড়াক, প্রাণকেন্দ্র কিন্তু সেই আদি এবং অকৃত্রিম ফুল কলকাতার অংশটুকুই। তাই কাকভোর থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত মানুষের নিরন্তর দাপাদাপি সেই সাবেক কলকাতার এলাকাটুকুতেই। মানুষের নিরন্তর চাপ এবং যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি এই দুমুখো সমস্যা থেকে কলকাতা যদি মুক্তি পাবে কী ভাবে? সেই মুক্তির জন্য পুরো যাত্রা বা পাতাল রেল প্রবেশ— এই দুই ছাড়া কলকাতার সামনে আর কোনও বিকল্প নেই।

পাতাল প্রবেশের জন্য মাসকয়েক আগে দু-দশকের বেশী আগের দুর্ভোগ পোয়াতে হয়েছে। ১৪০ কোটি টাকা খরচের হিসাব করে মেট্রোরেলের যে প্রকল্পের সূচনা হয়েছিল, সিলদিহে লাইনের জন্য সেই কাজের প্রথম পর্যায় শেষ হয়েছে কয়েক হাজার কোটি টাকা খরচের পরে।

এর দুর্ভোগ, এত বছরের পরে কিন্তু মানুষ পেয়েছেন পাতালে নৃত্যের আনন্দ। স্বচ্ছন্দে এবং দ্রুতগতিতে ভ্রমণের স্বস্তি। শহর এবং শহরতলির মানুষ চলাফেরার একটি নতুন মানচিত্র আবিষ্কার করে ফেলেছেন। নতুন মেট্রো রেলের উপরে নির্ভর করে কম সময়ে, তুলনায় অনেক স্বস্তিতে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছনোর এই কৌশলটি এখন 'মেট্রো কট' বলে পরিচিত। যেমন ধরা যাক, উত্তরে নাগেরবাজার থেকে কেউ শক্তিগড় গড়িয়াহাটে যেতে চান, তিনি কী করবেন? নাগেরবাজার থেকে ট্যাক্সি বা বাস ধরে পৌঁছবেন সল্টলেক বা বেলগাছিয়া মেট্রো স্টেশনে, সেখান থেকে মেট্রোয় ময়দানমেট। পাতাল থেকে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে বাস-ট্রামে গড়িয়াহাটি একটুখানি পথ।

এই সুযোগ সন্ধানে যেমনতেই মেট্রো রেল সম্প্রসারণের দাবি এখন চোরাবালি হয়েছে। পরিষ্কার পথে মেট্রো রেল এগিয়ে যেতে পারে, এমন একটা সম্ভাবনাও সৃষ্টি হয়েছে আন্ডারপাস স্থান পাওয়ায় উত্তরের মানুষও চাইছেন, মেট্রো রেল টেনে নিয়ে যাওয়া হোক তারাতলা পর্যন্ত। একদা ঠিক, আদি পরিকল্পনা অনুসারে মল্লিকবাজার থেকে গঙ্গার নদীর বুকের গভীর দিয়ে যাওয়া পর্যন্ত মেট্রো রেল নিয়ে যেতে পারলে মানুষের সুবিধা আরও বেশি হত। কিংবা শহরের উত্তর থেকে দক্ষিণে আসা পড়ে থেকে শিয়ালদহ স্টেশনকে ঘুরে পাতাল যাত্রার ব্যবস্থা করতে পারলে তো কথাই ছিল

না। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে পরিবহণমন্ত্রীর সেই স্বপ্নপূরণের আশাই কোনও সম্ভাবনা নেই।

তারা কিভাবে পাথর উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই পরিবহণ, বিশেষজ্ঞদের চোখে ধরা পড়ে কলকাতায়। সেই পথ খুঁজে আনার জন্যই ফ্লাইওভার নির্মাণের। এই পথের সন্ধান অনেক আগেই করে ফেলেছেন ইউরোপের, আমেরিকার মানুষ। বাড়ির মতো একতলা, দেড়তলা, তিনতলা, চারতলা রাস্তা বানিয়ে ফেলেছেন তাঁরা। শিখিয়ে রাখেনি এশিয়ার আপন এবং অন্য দেশও। টাকার জোর পাওয়া এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতৃসুলভ কলকাতার ১৯৮৭ সালে এশিয়াডকে সামনে রেখে মিলিয়নে এক টাকা তখনকার দেড়শো কোটি ফ্লাইওভার বানিয়ে ফেলা হয়। ফ্লাইওভারের সুবিধা বুঝে ফেলার পরে আর পেছনে থাকেনি দিল্লী, নির্মিত ফ্লাইওভার নির্মাণ চলেছে। মুম্বই আধুনিকতার প্রশ্নে এই দেশে অগ্রণী। ওই বিশেষ পাথরের কর্মযজ্ঞ সামলে নিয়ে মুম্বই ফ্লাইওভার কলকাতার প্রথম করেছে প্রবলভাবে। গত দুবছরের মুম্বইতে যা চলছে, তাকে এককথায় বলা যেতে পারে ফ্লাইওভারের জাত। বাইশটি ফ্লাইওভার প্রায় তৈরি করে ফেলেছে মুম্বই। আধুনিকতার প্রশ্নে কলকাতা নিরুপদ্রব নিরুপদ্রব, আসলে এমন, নৌকা ভাসিয়েছি — দেখা যাক কোথায় গিয়ে ভেড়ে। কিন্তু ত্রুটি, পরিকল্পনার ত্রুটি সত্ত্বেও নিরুপদ্রব এবং জনপ্রিয় মোড় ফ্লাইওভারের জন্য বেশ খানিকটা জমি পাওয়া ও পাওয়াদের মানুষ পেয়েছেন। তাদেরও বাজার সরকার, সি এম ডি এ সিদ্ধান্ত কলকাতা পুরসভা আরও বেশিসংখ্যক ফ্লাইওভার নির্মাণের কাজে হেভেড়েছে। এই পাথর-ভাঙাকে পরিবহণের 'অপেক্ষা' বলে মেনে নেওয়া ছাড়া কারও কিছু ছিল না। এই পথে আর যাই হোক নাগরিক পরিষেবা বৃদ্ধির জন্য কোনও আশোলন হয় না।

যাই হোক, দেরিতে হলেও প্রশাসনের সহায়তায় কলকাতায় পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতির জন্যে ফ্লাইওভার নির্মাণ-সহ একগুচ্ছ প্রকল্পের সূচনা হয়েছে। প্রায় ৪০০ কোটি টাকার এই প্রকল্পের ১৮ শতাংশ কাজের বহন করবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। বাকিটা জোগান দেবে জাপান ব্যাঙ্ক অফ ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন। তবে মোট টাকা থেকে প্রায় ৯০ কোটি টাকা জাপানীরা কেটে নেবে পরামর্শদান, তদারকি এবং নকশা বানানোর জন্য। তিনটি পর্যায়ে প্রকল্পটি রূপায়িত হবে বলে জাপানী সংস্থার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চুক্তি হয়েছে। এই প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্ব এইচ আর ডি সি-র।

প্রথম পর্যায়ে খরচ ধরা হয়েছে ৯২ কোটি টাকা। এই টাকা দিয়ে পার্কস্ট্রিট, রফিক আহমেদ ও বালিগঞ্জের লকগেটে ফ্লাইওভার নির্মাণ করা হবে। এরমধ্যে মল্লিকবাজারে ফ্লাইওভার নির্মাণের জায়গায় ভূগর্ভস্থ বেশ কিছু সমস্যা সামনে এসেছে। সেই সব সমস্যার জট ছাড়ানোর চেষ্টাও চলছে। কোনও কোনও মহলের আশঙ্কা, শেষ পর্যন্ত এই প্রকল্পটি খুঁড়িয়ে হয়ে যেতে পারে। পার্কস্ট্রিটে ৩৮০ মিটার এবং জাস্টিস চন্দ্রমাধব লকগেটে ১৩৫১ মিটার মেয়োর ফ্লাইওভার নির্মাণ করা হবে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে পঞ্চিমবাংলায় ফ্লাইওভারের সংখ্যা করা হচ্ছে ৪৭০ মিটার এটির কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। শেষ হওয়ার কথা ২০০১ সালের মধ্যে। এছাড়া, পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হবে এলগিনরোড, শ্যামবাজার এলাকা, রাসবিহারীতে। প্রস্তুতিকমিটির ভাবনায় এই ব্যবস্থার নাম আর্ট সেন্টার ইনফ্রাস্ট্রাকচার। দ্বিতীয় পর্যায়ের সামগ্রিক খরচ ধরা হয়েছে ৯০ কোটি টাকা।

সবচেয়ে বেশি খরচ তৃতীয় পর্যায়ের কাজে ১৮০ কোটি টাকা। এই পর্যায়ের কাজ হিসাবে বেকবাগান থেকে রবীন্দ্রসদন পর্যন্ত আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোডের উপর ফ্লাইওভার নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। এটির দৈর্ঘ্য ২.৯ কিলোমিটার। ২০০৩ সালের মধ্যে এই ফ্লাইওভার নির্মাণের কাজ শেষ হওয়ার কথা। তৃতীয় পর্যায়ের প্রকল্পে কৌশলীয়ে একটি ফ্লাইওভার নির্মাণের সিদ্ধান্তও হয়েছে। কিন্তু এই ক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা দিয়েছে ভূগর্ভস্থ পানীয় জলের পাইপ লাইনে। ফ্লাইওভার যেখানে হওয়ার কথা, সেখানেই মাটির নীচে রয়েছে পানীয় জলের মূল পাইপ লাইন হয়েছে। এই সমস্যার সমাধান কীভাবে হবে তা এখনও ঠিক হয়নি।

গেলে, এই প্রকল্পের অর্থলগ্নিকারীও কিছুটা অনিশ্চিত অবস্থান নিয়ে বসেছেন।

জলপালী সমন্বয়তান্ত্রিক এই প্রকল্পের ফল হিসাবে পরিবহনটি ফ্লাইওভার, কেবলকার ফ্লাইওভার সহ কিছু কাজ শুরু হওয়ার পরেই বিতর্ক বাধানোর দিয়েছে। এই বিতর্ক দ্বিমাত্রিক (১) সমন্বয়নের প্রশ্নে, (২) নকশাকে কেন্দ্র করে।

প্রকল্পের সূচনা পর্বটিতেই প্রথম সরব হয়েছেন কলকাতা পুরসভার মেয়র সুব্রত মুখোপাধ্যায়। তাঁর আপত্তির মূল কারণ, কখন ইতিমধ্যে প্রকল্প রূপায়ণ করা হচ্ছে কলকাতা পুরসভাকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে। রাজ্য সরকার প্রকল্প রচনা এবং রূপায়ণে পুরসভাকে কোনও গুরুত্বই দিচ্ছে না। সুব্রত বাবুর এই আপত্তিকে কেন্দ্র করে জল ঘোলাও কম হয়নি। একসময় ক্ষুব্ধ মেয়র এই প্রকল্প বন্ধ করে দেওয়ার পর্যন্তও প্রকাশ দিয়েছিলেন।

এই প্রকল্প রচনার শুরুতে রাজ্য সরকার এবং কলকাতা পুরসভা দু-টিই ছিল বি পি এম তথা কমিউনিস্টদের দখলে। ফলে, কোনও সমস্যা দেখা দেয়নি। এখন ছিত্র বদল হয়েছে। কলকাতা পুরসভা এখন মূলত তৃণমূল কংগ্রেসের কর্তৃত্বাধীন। সঙ্গে রয়েছে বি জে পি। তাই কলকাতা পুরসভা এবং রাজ্য সরকারের মধ্যেকার এই বিরোধ রাজনৈতিক মাত্রাও পেয়ে গিয়েছে।

এই দেশে এটিই বড় সমস্যা। যে কোনও উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মূল রাজনীতি প্রশিক্ষণ তলে ছাড়িয়ে পড়ে। তবে নেহাত সুব্রত বাবুর বক্তব্য থেকে একটি জিনিস স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, স্থানীয় সমন্বয়তান্ত্রিক এই প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে সমন্বয়ের একটি ঘাটতি রয়েছে। এটি ঠিক যে, শহর কলকাতার যে কোনও প্রকল্পের তলা যা মানুষের সুবিধা কিংবা ভোগান্তি সেখানটাই কলকাতা পুরসভাকেই বইতে হবে। তাছাড়া, গড়ীন এই শহরের আটীন নীচের পরিষ্কিতি অত্যন্ত জটিল। তুলনীয় বিকাশী যানজট ব্যবস্থাপনায় পুরসভারই তাদাত্ত্বয়ে জ্ঞান নেই। নেই নির্দিষ্ট কোনও আপত্তিও। মাটির নীচ দিয়ে নিয়েছে পানীয় জলের লাইন, টেলিযোগাযোগের কেবল, বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যবস্থা। এই জটিল অবস্থার মধ্যে কাজ করতে গিয়ে কোনও বিপত্তি ঘটলে তার দায় পুরসভার উপরই প্রাথমিকভাবে বর্তাবে। সেইদিক থেকে মেয়র আপত্তি নিশ্চিতভাবে যুক্তিনির্ভর। এই ক্ষেত্রে ওভারলাপিং কাজ সরকার এটিকে কোনও রাজনৈতিক লড়াইয়ে নিয়ে যেতে চাইছেন না। বরং এখন গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় গড়িয়ে প্রকল্পটির বাস্তবায়নের উপরে।

দ্বিতীয় বিতর্কের মূলে রয়েছে ফ্লাইওভারগুলির নকশা। অতীতের অভিজ্ঞতায় আমাদের নানা প্রশ্ন উঠছে এই প্রসঙ্গটিকে ঘিরে। এই রূপায়ণে কোনও সন্দেহ নেই যে, নিয়মনিয়ন্ত্রণ ফ্লাইওভারের জন্য, জলপাই মোড় ফ্লাইওভারের জন্য সাধারণ মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য বেড়েছে। এই দু'টি ফ্লাইওভার থেকে মানুষের আগে এই ধরণের ফ্লাইওভার সম্পর্কে সচেতনতাও বেড়েছে। নিয়মকানুন ফ্লাইওভার তৈরি হওয়ার পরে নিত্যদিনের অভিজ্ঞতায় মানুষ বুঝতে পেরেছেন ফ্লাইওভারটিকে কীভাবে নিজের কাজে লাগিয়ে নিতে হবে। তেমনই উন্নত ইউনি টার্নগুলিকে ফ্লাইওভারের উপরে তুলে দেওয়া। একইভাবে আরও প্রশ্ন রয়েছে প্রস্তাবিত মোড় ফ্লাইওভার সম্পর্কে।

এখন তাই ফ্লাইওভার সম্পর্কে জনগণ-চেতনাই প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে। যেমন পরিকল্পনাটি ফ্লাইওভার দু-দিকেই সমস্যা সৃষ্টি করবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এই ফ্লাইওভার থেকে উত্তরমুখী গাড়িগুলি ক্রমে মাটিতে পড়বে আমহার্স্ট স্ট্রিটের মোড়ে। একইভাবে এই পাঁচমুখী রাস্তার মোড় সবথেকে প্রশ্ন তুলেছে। তাই ফ্লাইওভারের নীচেতে আরও দ্রুত গতি আনা শুরু হলে এখানে যানজট বাড়বে ছাড়া কমবে না। অন্যদিকেও একই ধরণের বিপত্তির আশঙ্কা করা হচ্ছে। চারদেলের এই ফ্লাইওভার থেকে যে গাড়িগুলি উত্তর থেকে নেমিয়ে নিয়ে মূল রাস্তায় পথ পাবে কীভাবে ? গড়িয়াহাট ব্রিজ এবং জলপাইয়ের রাস্তাগুলি কী এক সংখ্যক গাড়ি চলাচলের ক্ষমতা রাখে আছে ? তাহলে, ভবিষ্যতে গোলাপাকার অস্তিত্ব লুপ্ত হবে না তো ?

একইভাবে প্রশ্ন উঠেছে বেকবাগান ফ্লাইওভার সম্পর্কেও। মূল প্রশ্নটি হল, এত টাকা দিয়ে এই ফ্লাইওভারটি তৈরি করে যানে কিন্তু অন্যদিকে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলির সঙ্গে কোনও যোগাযোগ থাকবে না কেন? তা হলে এই ফ্লাইওভার কতখানি উপকারে লাগবে? তাই আপত্তি উঠেছে, এই ফ্লাইওভারের সঙ্গে যুক্ত করা হোক পার্ক স্ট্রিট এবং রীডস্ট্রিটকে। পার্ক স্ট্রিট থেকে ফ্লাইওভারে এসে-যাওয়ার ব্যবস্থা করলে অনেক মানুষ উপকৃত হবেন।

আর যখন ফ্লাইওভার যখন মাঝে নেওয়ার কথা হচ্ছে, তখন কলকাতার একটি ফ্লাইওভার কেন অসম্পূর্ণ হয়ে থাকবে তা নিয়েও। এই ফ্লাইওভারের একপাশে বলা হয়েছে, এখন তৈরি করা হলেও ভবিষ্যতে যাতে যোগ করে প্রসারিত করার ব্যবস্থা থাকবে। কিন্তু প্রশ্ন হল, এখনই নয় কেন?

ভবিষ্যতের যাতায়াতের নানাবিধ আর সেইভাবে ভুলতে চান না। কারণ, মহানগর আজই আগে থেকে ভাবনা-চিন্তা করে গার্ডেনরিচ যোগের ফ্লাইওভার নির্মাণের কাজ শুরু করে দিয়েছে। যদি ভবিষ্যতের সমস্যায় কেন্দ্র করে ফ্লাইওভার নির্মাণ এখনও কিছু বাঁও যাবার ভাবনা। তাই আপনি যাতায়াতে যে প্রকাশের কারণ হয়েছে, তা মুখ্যমন্ত্রীর ভোক - এমন দাবিও উঠেছে। রাজনৈতিক মহলে এমন একটি ভোকেও শোনা যাচ্ছে, আলিপুর, বিধাননগরের মতো প্রকল্প রচনার আগেই আলোচনা করলে তাও ভাল কারণ, জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার নিকটি জানতে পারবে প্রযুক্তিবিদেরা পরে আরও বেশি নিখুঁত নকশা রচনা করা সম্ভব হত।

এই প্রকল্প নিয়ে নানা প্রশ্ন ওঠায় রাজ্য বিধানসভার পরিবহণ বিষয়ক কমিটি প্রকল্পের বাস্তবায়িক খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে। কমিটির চেয়ারম্যান বিধায়ক সাধন পাণ্ডে বেশ কয়েকটি সংশোধনী প্রস্তাব নিয়ে পরিবহণ মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী এবং নির্মাণ সংস্থার কর্তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছেন। ঘনিষ্ঠমহলে সাধনবাবু বলেছেন, রাজ্য সরকারের মন্ত্রকগুলি ইতিমধ্যেই। ফলে, প্রশ্ন হচ্ছে যে, রাজ্য সরকার সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে এবং বাধা কাটিয়ে প্রকল্পটি রূপায়ণ করছে। এই মেগার চলতি নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ হবে না, কিন্তু একদিন শেষ হবে। এই আশাতেই বুক বাঁধা যায়।

এই প্রকল্পটি রূপায়িত হলেই কী কলকাতা বদলে যাবে? এই প্রশ্নের জবাবটি ইতিবাচক হবে - না পাবে না। কলকাতা আরও বহু সমস্যায় ফ্লাইওভার, এমনকি আরও। যদি সত্যিই তা হয়, তাহলেও সমস্যার মিটবে না। সমস্যা তখনই মিটবে যখন এই প্রকল্পগুলি মানুষ জনসাধারণ করতে পারবেন এখানে। শিয়ালদহ ফ্লাইওভার কোন ফ্লাইওভার নীচেকে যা হবে তাও, শিয়ালদহ স্টেশনের পাশ পাশ সব বাস, সেগুলি ঠিকে থাকলে কোনও প্রকল্পই মানুষকে স্বস্তি দিতে পারবে না। ফুটপাথ ব্যবহারের সুযোগ মানুষকেই দিতে হবে। বাসের গতি চলতে দিতে হবে অবাধে। তবেই কলকাতা গতি পাবে।

নিবন্ধের শুরুতেই বলা হয়েছিল, মেট্রো কলকাতা'-এর কথা। পরিবেশগত সুবিধা পেয়েছেন বলেই মাটির নীচে ঘনিষ্ঠ মেট্রোর নেই। সাধারণ মানুষ উপরে গড়াই বিশৃঙ্খল যেন না করেন, তুপরে শৃঙ্খলাপরায়ণ। মেট্রো কোন আমাদের এই শিক্ষাটি দিয়েছে, সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে শৃঙ্খলাপরায়ণ। তাঁরা বিশৃঙ্খলা হলে শাস্তিরোধ অবশ্যই।

কালের বসবধানে অতীতের স্বাক্ষর কলকাতার শিল্প সংস্কৃতি

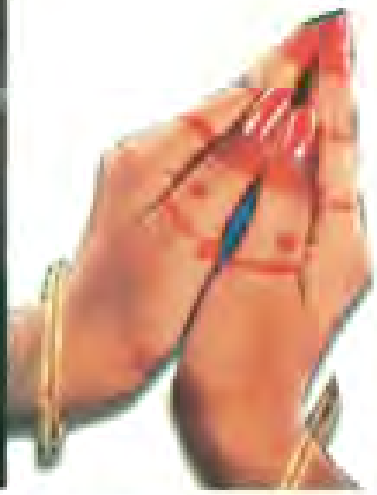

কলিকাতা পৌরসংস্থা
ঐতিহ্য রক্ষায় সচেষ্ট

ক ল কা তা

এক চলমান ঐতিহ্য

...ছুঁয়ে।
...ঐতিহ্যের উজ্জ্বল
...কলকাতা পেরিয়ে

...ও সচেতনতা নিয়ে।
...তাই, কলকাতাই অবলম্বন
...এ শহর দেখিয়ে এসেছে।
...ঐতিহ্যের ছাপ রয়েছে।
...ছাপ ঐতিহ্যের ছাপে গড়ে উঠেছিল
...ঐতিহ্যের মধ্যে এক সহাবস্থানের বাসভূমি
...এই কলকাতা। তাঁদের ঐতিহ্যের অনুসারী
...ছাপ রেখে গেছেন এই কলকাতাতেই
...। রবীন্দ্রনাথ, রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র কিংবা
...বিবেকানন্দ, জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র
...রায় — এঁরাই তো ঐতিহ্যসচেতনতার নাম। সত্যজিৎ
...রায় ও আমার ঠোঁটেরা এখানেই খুঁজে পেয়েছেন
...তাঁদের কাজের প্রেরণা। সমৃদ্ধ করেছেন
...আমাদের পৌরবোধের পরম্পরাকে।

সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে লালন করার মধ্যে দিয়ে আধুনিকতার ছোঁয়া সঠিক ছন্দে পা ফেলে কলকাতা লালন করে চলেছে এক অনন্য ভূমিকা। বিজ্ঞানসম্মত আর মেট্রো রেল এ-ভাবেই সেই ঐতিহ্যের ধারাকে বহন করে চলেছে গতিশীল কলকাতার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে।

আমরা আছি। আমরা থাকবো।

কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

কলকাতা পুরশ্রী

দীপাবলী সংখ্যা

ক ল কা তা

এক চলমান ঐতিহ্য

আমরা আছি। আমরা থাকবো।

কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

কলকাতা

পুরশ্রী

দীপাবলী সংখ্যা

ক ল কা তা

এক চলমান ঐতিহ্য

...ঐতিহ্য
...চলমান ঐতিহ্যে।
...প্রথম
...শেষ হয়ে
...
...সংস্কৃতির কিংবা
...কাজ, কলকাতাই সবচেয়ে
...বাড়ির বাড়াবাড়ি রূপ দেখিয়ে এসেছে।
...পুনর্জাগরণের ফসল এখানেই
...প্রথম এখানেই তার চর্চা শুরু হয়েছিল
...যাদের মধ্যে বহু মনীষীর জন্মভূমি
...এই কলকাতা। যাঁরা তাঁদের কর্মের মাধ্যমে
...স্বাক্ষর রেখেছেন এই কলকাতারই
...বিদ্যাসাগর, রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ কিংবা
...বিবেকানন্দ, জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র
...রায় — একমাত্র কয়েক প্রাতঃস্মরণীয় নাম। সাম্প্রতিক
...রায় ও মাদার টেরিজা এখানেই খুঁজে পেয়েছেন
...তাঁদের কাজের ভাষা। সমৃদ্ধতর করেছেন
...আমাদের যৌথবদ্ধ পরম্পরাকে।

সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে লালন করার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিকতার তালে সঠিক ছন্দে পা ফেলে কলকাতা পালন করে চলেছে এক অনন্য ভূমিকা। বিদ্যাসাগরী আর মেট্রো রেল এ-ভাবেই সেই ঐতিহ্যের ধারাকে বহন করে ক্রমবিকাশশীল কলকাতার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে।

আমরা আছি। আমরা থাকবো।

কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

...ঐতিহ্য

সূচী পত্র

পৃষ্ঠা

সম্পাদকীয়

গল্প

মা ঠাকুরী — শ্রীমিত্রা মিত্রা

প্রবন্ধ নিবন্ধ

এই বাসে ভাড়ুলগাঁয়ের অপূর্ব দাদা — প্রফুল্লেশ চক্রবর্তী

স্মরণ

মুখরোচক দুঃখহীন প্রতিশ্রুতিমুক্তুরের জন্যে — কবি অমিতেশ মাইতি।
অমিতেশ মাইতির কবিতা নিবেদন দিনে
প্রকাশক: ডঃ কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়

উত্তমস্মৃতি — শতরূপ মুখোপাধ্যায়
প্রতিবেদন
কলকাতা বই মেলা — নবারুণভট্টাচার্য
নন্দনালয় স্মরণ মেলা — হিমাদ্রি চট্টোপাধ্যায়

নিবন্ধ

বাবু আলয়ারের বিচিত্র কিস্তি — সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

প্রসঙ্গ মুখোপাধ্যায় * সত্যেনের নন্দনালয়
একটি বিতর্কিত রাষ্ট্রনীতি বিশ্লেষণের প্রতিবেদনিক পরিক্রমা * বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
এক নজরে অতীত কলকাতা কলা * কপিল ভট্টাচার্য
রচনা
কোলকাতায় কোন পৌষ্য * সীতা বন্দ্যোপাধ্যায়
রবি ঘোষের আত্মহত্যা পত্র * দ্বিতীয় ভট্টাচার্য

কোলকাতিক পরামর্শ * সুবল পটিক
অভিধান
শিশুদের ছড়াগুলি * পঙ্কজলাল ভট্টাচার্য
গল্প
অনিমেষের দীপ্তি * রবিশঙ্কর বল
ফোনালাপ ক্রমশ * বীণা চাকী
বাঁচতে চাই * শ্রী অমৃত কুমার সিংহ
বিদ্রোহিণী বর্ণিকা * ইন্দ্রের চট্টোপাধ্যায়
শান্তির ঘর সংসার * ডাঃ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী
ভূত * অভিজ্ঞান সেন
ঘরে ফেরা * অরূপ সরকার
উত্তরণ * অমিত চক্রবর্তী
শিউলিফোরের চিঠি * গৌতম ভট্টাচার্য

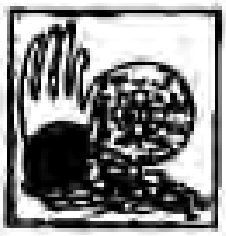

মুখোমুখি	•	মনোরঞ্জন ঘোষ	
ফলাফল	•	কৃষ্ণকিশোর বেদ	
কুলির কাটা হাত	•	মলিন চৌধুরী	
মিটির ঘরে আগুন	•	অরুন্ধতী সিংহ	

কবিতা : ছড়া

নলহাটি বেলাভে আমারি কৃষ্ণ বন্দী • প্রাণের নিশ্বাস দিয়ে/আমি পুরীর আকাশ •
কলিকাতায় একদিন ও ফটোগ্রাফ • আমি তুমি/ট্রামে বাসে রাজপথে • একটা গল্প চায়ের বিল
• ইলেকট্রিক প্রোব্লেম দুবরাজী

চিত্রলেখক

ট্রেনযাত্রার আগে কার্টুনিস্ট		হরিপদ বসু
প্রান্তিকের লিখেছে		বিপ্লব দত্ত
সম্পাদনা		
অঙ্কনে		সুপ্রভাত সাহানা
ছাপা		
ব্লক প্রস্তুতিতে		প্রবীর সিনহা

পত্রে পত্রোত্তরে

সৌম্যব্রত আচার্যের চিঠি আমাদের লেখা দীর্ঘ সম্পাদকীয়
অলকাতায় অনাচার প্রবীর ভট্টির চিঠিপত্র আলো

অক্ষরবর্তিকা লিপী মধুসূদন কুমার সিংহ/সুকুমার রায়/পরমেশ মিত্র/শেখর চট্টোপাধ্যায় অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (শিলিগুড়ি)/ শ্রীকান্ত ঘোষ (ঘুসি পুঁটিরা)/অমি ঘোষ আমাদের সংবাদদাতা (সভাপতি ও আমাদের ডাঃ বাবীন ঘোষের গৌরবে)

ছেদ-যতি-অলঙ্করণ সুনীল দাস / অনিচ্ছাতে সেনগুপ্ত চক্রবর্তী লাহিড়ি/মৈত্রেয়ী ভট্টাচার্যী/ইন্দ্রাণী চক্রবর্তী সমস্যাটি বলে পাঠিয়েছে বন্ধু তপন সেনগুপ্ত/কৃষ্ণা ভট্টাচার্যী/বন্ধন সরকার এবং একটি বেসরকারী সংস্থা এসোসিয়েশন (WBVHAA)

ভ্রম সংশোধন পাতা সংখ্যা অলঙ্করণে পুরুষী যে ৪ টি ভ্রমপ্রমাদের জন্য প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু কৃটিলতে সেগুলির ভ্রমপ্রমাদ চলছি হলো হয়েছে এবং ভ্রমগুলির নিবেদনের কারণ ইচ্ছা আমরা করছি। এ সম্পর্কে সব আমরা ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে আশা করছি — আমিশ্বাসকে এই কটির জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। সম্পাদক / পুরুষী

দীপাবলী
শারদীয়া
পুরুষী

প্রকাশনা উপসেন্টা মণ্ডলী
নিবেদ রায় (চেয়ারম্যান)
পবিত্র মুখোপাধ্যায় (সদস্য)
তাপস গঙ্গোপাধ্যায় (সদস্য)
অনুপ মিত্র (আহ্বায়ক)

সম্পাদক - অনুপ মিত্র
সহঃ সম্পাদক সুপ্রভাত সাহানা
সহযোগী পলাশ ভদ্র
প্রচ্ছদ গৌতম অঙ্কন

মূল্য ৩০ টাকা

শিল্পী সুবীর পাল অঙ্কিত মৃন্ময়ীর কার্ড আবহ।

"ইনট্রোস্পেকটিভ আলো"
কথাসাহিত্যিক শিল্পী অনিবাণ সেনগুপ্তের আঁকা মৃন্ময়ী

কলকাতা এখন শহরটা এক নতুন রূপ পেয়েছে। ঝলমলে, ঝকঝকে পরিষ্কার, জলবায়ুবিহীন চওড়া রাস্তাঘাট, সবুজ সুন্দর পরিবেশ, আর মিলেনিয়াম পার্ক এর মত নানা সুন্দর স্থান। এই মহানগরীর বাসিন্দাদের জানাই আমাদের বিনম্র প্রচেষ্টায়।

কলিকাতা পৌরসংস্থা

সম্পাদকীয়

যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥

এই বঙ্গে মাতৃসাধনার অপূর্ব ধারা

প্রণবেশ চক্রবর্তী

"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত" সম্পূর্ণ করে দেখি, সিমলা ছিল ১৮৮৪ সালের ১৭ই অক্টোবর, মঙ্গলবার। ছুল-প্রতিষেধের মহেন্দ্রনাথ দত্ত ও আরো কয়েকজন ব্রাহ্ম প্রতিবেশীরা এসেছেন। রাত্রে তাঁরা প্রতিবেশেরেই ছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবই ঘরে ছোকরাদের বিদ্যাসাগর খেতে বলেছিলেন তাঁরা। ভোরে ঘুম ভাঙবার পরে তাঁরা দেখছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবানের নাম করতে করতে ঘরের চারদিক ঘুরে বেড়াচ্ছেন। দেখতে দেখতে এটা থেমে গেল, মহেন্দ্রনাথ ও তাঁর বন্ধুরা গঙ্গাস্নান সেরে ফিরে এলেন। এলে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের বললেন — ছোকরা পঞ্চবটীতে গিয়ে ধ্যানে বসে। সন্ধ্যে দশটা নাগাদ শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটীতে এসে ব্রাহ্ম ভক্তদের বলছেন — ধ্যান করবার সময় হাতে মন্ত্র হতে হয়। ঈশ্বর ঈশ্বর বললে কি জলের মিষ্ট রস পাওয়া যায়? এরপর বলতে বলতে মহাসাধক ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়লেন — তাঁর সাধনার ধারা ফুটে বেরুল ঈশ্বর রামপ্রসাদের একটি গানের আলোয়। শ্রীরামকৃষ্ণ তন্ময় হয়ে গাইতে থাকেন — তুমি যে-তে মন বাসী হলে। হৃদি রত্নভোরের প্রদীপজ্বেলে। /ত্রিভুবন মন শূন্য তখন, দু-চার বুঝে কাজ না পেলে.....

সাধক রামপ্রসাদ সেনের গান শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠে প্রাণ-আবেগের সুরে যেমন প্রমূর্ত হয়ে উঠত, তেমনি সাধক কমলাকান্ত চক্রবর্তীর গানও শ্রীরামকৃষ্ণের মেরুদণ্ডের কাঠের সুরের ঝঙ্কারে ফিরে পেত বলীয়সী। আসলে ভক্তি সাধনার রসধারায় বিশ্বাসির সুসংগতির এক আনন্দময়তে তাঁরা সকলেই ছন্দ-তাল-লয়ের সীমাকে অতিক্রম করে আত্মটি নিবেদন করেছেন তাঁদের আরাধ্যের শ্রীচরণে।

এই বঙ্গের মাতৃসাধনা কীর্তনাঙ্গ ধরেই তন্ত্র ও মন্ত্রের কঠামোয় ছিল বন্দী। মহাপ্রভুর মাতৃভাবের কৃষ্ণপ্রেম আলমগীরী তন্ত্র ও মন্ত্রের বন্দিশালা থেকে মাতৃসাধনাকে মুক্ত করে ভক্তিভাবের প্রেমবন্দরে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন। মাতৃসাধনার সঙ্গে ভক্তিসাধনার অপূর্ব মিলনে এই বঙ্গে শক্তি আরাধনার যে অনন্যসাধারণ প্রবাহটি রচিত হল, সেখানে আর আচারসর্বস্ব তন্ত্রমন্ত্রের প্রাধান্য রইল না, পরিবর্তে ভক্তি ও প্রেমের মাধুর্যে রচিত হল মাতৃসাধনার একটি নতুন ধারা। সাধকের সঙ্গে যুক্ত হল হৃদয়-রচিত কথা সুরসৃষ্টি এবং সেই সৃষ্টির পথ ধরেই সাধনা হল আত্মমুক্ত। সিদ্ধিলাভের নিহিতার্থ হল ঈশ্বরত্ব।

সাধক রামপ্রসাদ সেন সেই সাধনা ও সৃষ্টির প্রথম পথিক প্রতিভাধর, তিনি প্রথমে জাগা গেঁথে মাতৃবন্দনা করেছেন, সুরের তুলি দিয়ে আরাধ্যা দেবীর চরণে অঞ্জলি নিবেদন করেছেন এবং চোখের জল দিয়ে প্রেমলোকের সঙ্গে মর্তলোকের মিলন-পথটি রচনা করেছেন।

পৌরাণিক নাম যার কুমারহট্ট — সেটাই গঙ্গাতীরবর্তী আজকের হালিশহর। এই পবিত্র ভূমিতেই এক বৈশাখমাসে জন্মগ্রহণ করেন (১৭২৩ সালে) রামপ্রসাদ সেন। আর এই

পরিবারভুক্তিতেই অন্তরতম করেছিলেন তাঁদের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শিক্ষাগুরু শ্রী শ্রী ঈশ্বরপুরীর। এ এক অদ্ভুত যোগাযোগ। পিতা বাসুদেব ছেলে ছিলেন বৈরাগ্যবান পুরুষ, তাঁর মাতা সংসারী মেয়ে ছিলেন তাঁদের দুহিতাটী। অতি অল্প বয়সেই প্রতিবেশীরা রামপ্রসাদ সংস্কৃত, বাংলা, উর্দু ও ফারসী ভাষায় পণ্ডিতা অর্জন করেন। সেই সঙ্গে তাঁর মধ্যে অন্তরে অধ্যাত্মশক্তির বিকাশও ঘটতে থাকে।

রামপ্রসাদকে আকারে তাঁর অনেকে হিন্দী, কিন্তু তাঁর ভাষা থেকেই সংস্কৃতবিদদের তাঁর শ্রেষ্ঠ যায়। তাই পণ্ডিত পিতামাতা তাঁদের পরম আদরের পুত্রকে সংসারমুখী করে তোলার জন্যে অল্প বয়সেই দুর্গাচরণ মুখার্জীর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু কাকে বিয়ে দিলেন পিতামাতা? তাঁদের সন্তান যে সবাই মাতৃভাবের বিভোর থাকেন, অন্তরের অধিষ্ঠাত্রীশক্তির সঙ্গে মাতৃভাবের মিলন ঘটিয়ে রামপ্রসাদ গানা করেন — আমায় দাও মা তবিলদারী, আমি নিমক হারাম নই শঙ্করী। এবার আমি যে ভাবে যে গাবে থাকি, নফরী করু নাহি তুলি।

এরপরেই সংসারবিমুখ রামপ্রসাদের দিন কাটছিল। হঠাৎই একদিন তাঁর পিতৃদেব ইহলোক ত্যাগ করলেন। ফলে সংসারের যাবতীয় বোঝা এসে পড়ল সংসার-উদাসীন রামপ্রসাদের উপর। তাই কলকাতায় এসে একটী চাকরির সন্ধানে। চাকরিও জুটে গেল। গঙ্গাতীরের অধিবাসী দুর্গাচরণ মিত্রের সেরেস্তায় মুহুরির কাজ পেলেন তিনি। অফিস যেতেন তিন টাকা। সবাই তিনি মাতৃভাবে বিভোর, সবাই তিনি সৃষ্টির আনন্দেই তন্ময়, সবাই তিনি কবিতায় ও সুরে সৃষ্টির আনন্দ নিবেদন করে চলেছেন তাঁর মাতাকে — তিনি কী চাকরি করবেন? হিসেবের খাতা নিয়ে কখন সেরেস্তায় বসেন, কখনও তিনি খাতের নিলমুখলই দেখতে পান সেই খাতায় পাতায়। তাই অন্তরতম কবি হিসেবের খাতাতেই লিখতে থাকেন একটির পর একটী শ্যামাসঙ্গীত। সেরেস্তার খাতায় হিসেবের কাজে শুধু দেখা হতে থাকে মাতৃ-আরাধনার গান আর গান।

একদিন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর নজর পড়ল সেই খাতার উপর, তিনি তো এই অনাসৃষ্টি কাণ্ড দেখে ক্ষেপে আগুন। রামপ্রসাদকে ডাকলেন — নির্বোধ তুমি, গান লিখে এত দামি খাতাগুলি নষ্ট করছো কেন? ঘটনাটা কানাকানি হতে হতে একদিন কলিকাতার কানে গিয়ে পৌঁছল। সবাই ভাবল, এবার রামপ্রসাদের চাকরিটা গেল। কিন্তু সুপ্রসন্নময় রামপ্রসাদ নির্বিকার, নির্ভীক। তিনি ওই খাতাটি নিয়ে জমিদারের সামনে গিয়ে হাজির হলেন। জমিদারবাবু হিসেবের খাতায় লেখা ওই গানগুলি পড়তে পড়তে বিস্ময়ে ও ভক্তিপ্লুত হয়ে গেলেন। এমন ভক্তিরসের অপরূপ সৃষ্টি তিনি আগে কখনও দেখেননি। মুখোপাধ্যায় মিত্র সেদিনই বুঝেছিলেন এই সাধকের অন্তরে রয়েছে অনন্ত সৃষ্টির অনুভব। তা না হলে এমন গান কি কোনও মানুষ রচনা করতে পারে? নিরক্ষরাই এক অনাস্বাদিত রসের সন্ধান পেলেন এই খাতার মধ্যে। তিনি খাতায় পড়তে থাকেন সেই নিস্বাহ গানটী — আমায় দাও মা তবিলদারী/আমি নিমক হারাম নই শঙ্করী।

রাতের আঁধারে আচ্ছন্নচক্ষু জমিদার ডাকলেন, রামপ্রসাদকে — রামপ্রসাদ! তুমি ঐশ্বরিক ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান। এই হিসেবের খাতা তোমার জন্য নয়নি, তুমি তোমার সাধনার সিদ্ধিলাভ করো, এই আমি চাই। যে দিন তিন এখানে কাজ করে গেছে, তাই তুমি আমার সারাজীবন থেকে পাবে। যেখে নিয়ে যাও, সেখানে থেকেই শ্যামাসঙ্গীতের সাধনা করো।

হালিশহর ফিরে এলেন রামপ্রসাদ, ভুল নিলেন মাতৃসাধনার জ্যোতির্ময়ত্বে। মনের কথা আর সুরে মাটি-নদী-আকাশও যেন মেতে উঠল, মানুষের মনে মনে একটি প্রশ্নিত হতে থাকে রামপ্রসাদী গানের সুরলহরী।

একদিন মহীয়সী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদের সাধনা ও সৃষ্টির কথা, মহারাজা সাগরে রামপ্রসাদকে আনতে লোক পাঠালেন, তাঁর সভাকবির আসন অলঙ্কৃত করার জন্য মাতৃভাবে বিভোর কবিকে আনতে মহারাজার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি তাঁর সৃষ্টির সন্ধানে ডুবে আছেন সাধনার গভীরে, আর গাইছেন — তুমি যে মা আমার কালী বলে। শেষ পর্যন্ত মহারাজা নিজেই এলেন হালিশহরে রামপ্রসাদের সন্ধানে আসতে, রামপ্রসাদের গান শুনে মুগ্ধ হতে। মহারাজা তাঁকে 'কবিরঞ্জন' উপাধিতে ভূষিত করলেন। কিন্তু এ সব তাঁর কাছে অর্থহীন। কারণ তিনি গাইছেন — এই সংসার ধোকার টাটি /ও ভাই আনন্দ বাজারে লুটি। দিনান্তে মাতৃনাম গাইতে ডুবে আছেন, আর আত্মগতভাবে গান করছেন — এমন দিন কি হবে মা তারা / যবে তারা তারা বলে, তারা বেয়ে ঝরবে ধারা।

একটানা পনেরো বছর ধরে সাধনা করে তিনি গভীর অভিনিবেশ সিদ্ধিলাভ করলেন। কন্যাজ্ঞান ত্যাগ হয়ে তিনি মাতৃ-সন্ধানে তাদের আত্মগোপন বলেন — যে (মা) যে ভাবের বিষয়, তার বাড়ীত অ-ভাবে কি করতে পারে? তাই দেখি, মাতৃ-দৃষ্টিতে রামপ্রসাদ নিজেদের মেয়েটী যখন ছোট্ট গেল, তখন রামপ্রসাদ আর বালিকা-কন্যা জগদীশ্বরী ভাবে। মেয়ে বাঁধার আছে হাত লাগিয়েছেন। আবার নিজের রামপ্রসাদ মাতৃসঙ্গীত গাইতে গাইতে মেয়ে সেঁধে হলেছেন। ইতিমধ্যে জগদীশ্বরী চলে গেছেন শ্বশুরি বিভাগ। আর তারা নিস্তারিণী শাস্ত্রী-মা সন্তানরা হয়ে বালিকা-কন্যার মেয়ে রামপ্রসাদের মেয়ে বাঁধার কাজে সাহায্য করছেন। তাই আনন্দাবেগে ভাসতে ভাসতে রামপ্রসাদ গান ধরলেন — মা তবে ছলিয়ে তনয়া লংপাকে সেঁধে গেলেন, মায়ের মেয়ে। তাঁর কাছে কোনো তীর্থ নেই। সর্বশিল্প

নিশ্চয় গেয়ে ইঁর সংখ্যা ও বৃদ্ধিতে। তিনি গান ভালো — আর ধারে কি আশপাশ কালী/মায়ের ভক্তরাও পড়ে যাচ্ছে গান-গান-গানময়ী।

১৮৭৫ সাল। ফেব্রুয়ারি ছিল কালীপ্রতিমা বিসর্জনের দিন। জানাশিই কলকাতার অতিথি সকলকে ডেকে বললেন — আজ মায়ের বিসর্জনের সঙ্গে আমারও হবে বিসর্জন। অতিথি সভিয় ঘটলও তাই। নিজের প্রদর্শনালয়ের সৃষ্টি সেই মাতৃমূর্তীদের মাঝখানে জানাশিই বাজনায় পুষ্পাঞ্জলি গলায় আত্মহত্যা নিশ্চিন্তে হয়ে নিমগ্নিলের জন্য শ্যামাসংগীতের গান গাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

কর্মজীবন কেটেছে কলকাতা মহকুমার অতিরিক্ত ডাক্তারের চাকরি। তাদের মফস্বলের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ডাক্তারি করে। ডাক্তার মজুমদারই এখানে প্রথম আসেন। পেশার দায়ে প্রামের কমলাকান্ত ভট্টাচার্য শিবাবাড়ি থেকে নিজের গ্রামে ফেরার পথে এই ডাক্তার প্রভুর যখন এসে পৌঁছালেন, তখন নিশুতি-রাতের আঁধারে মেশে এসেছে সন্ধ্যার ধূসরতাকে অন্ধকার। হঠাৎই সেই অন্ধকার ভেদ করে এমনই ডাক্তারের ডাকাত এসে তাঁর পথিকের করে দাঁড়াল, বলল — ডাক্তার, তোমার পুটুলিতে কী আছে, দিগগির বের করে দাও। শিবাবাড়ি থেকে পাওয়া মধ্যমাসের ফলা ছিল এই পুটুলিতে এবং টাকাও ছিল সামান্য কয়েকটা। নিরুপায় কমলাকান্ত মর্মাহতের মন কিছু ফুলে দিলেন ডাকাতদের হাতে।

ডাক্তারের সব কিছু হরণ করার পর ডাকাতদলের সর্দার একটা সন্দেহের মধ্যে পড়ল। তার মনে হয়, এই ব্রাহ্মণ ডাক্তারের চেনা এবং ব্রাহ্মণও তাদের চেনে। তাই সে ধমকের দিয়ে প্রশ্ন করল — ঠাকুর, তোমার তো চেনা মনে হচ্ছে, তোমার তুমি কে?

ব্রাহ্মণ ডাক্তারের ভয়ে ইঁর দিলেন, — আমার নাম কমলাকান্ত ভট্টাচার্য। বাড়ি কাঁটা গ্রামে।

এই উত্তর শুনেই ডাকাত-সর্দার বুঝতে পারল, এই ব্রাহ্মণ তাদের পরিচিত। ডাকাতরা। তার অন্ধকার সহযোগীদের কাছে সর্দার কঠিন নিয়ম —এই ব্রাহ্মণকে ছেড়ে দেওয়া যাবে না। একে খতম করা দরকার। যেমন ভাবনা, তেমনি কাজ। ডাকাতের দল ডাক্তার খাড়া করি নিয়ে গেছে একটু দূরে একটা নির্জন জায়গায় নিয়ে গেল। সর্দার ইঙ্গিত করার সঙ্গে সঙ্গেই খতম করে দেওয়া হবে।

এমন সময় কমলাকান্ত বললেন — সর্দারকে — দেখ ভাই, তোমরা আমি কাছ পাই না। শুধু আমার আগে জীবনের শেষ গানটা গেয়ে নেবে চাই। আমাকে এই সুযোগটুকু দাও।

সর্দার ভাবল এ আর বেশি কথা কি? একটা গান বইতো নয়। তাই অনুমতি দিয়ে বলল — বেশ ঠাকুর, তোমার যা গান করবার।

সাধক রামপ্রসাদ তাঁর অন্তর্দেবীর কথার ভাষা দিয়ে যে সঙ্গীত সৃষ্টি করেছেন এবং সেই সৃষ্টিকে জীবন করে তুলেছেন যে সুরের মাধুর্যে, জীবনের সেই অন্তিম লগ্নে তাঁর সেই সুরটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন যে সর্দারের মুখ — যার কিছু নাই শ্যামা-মা তোমার/কেবল মুটি চরণ সার।/তনি ভাব নিয়েছে ত্রিপুরারি/সেথে হলাম সাহস ভারা।/জাতি-বন্ধু-সুতদারা/সুখের সবার সবাই তারা। /বিপদজালে কেউ কারো নেই — /কর যারি করুণাময়ের তারা।

এ তো গান নয়, তুলসের কঠীর থেকে উৎসারিত এ যেন আত্মনিবেদন। তাঁর সুরের মন্ত্রে প্রকৃতিও যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। মনে হল সেই মর্মভেদী গান শোনার জন্য ডাকাতদের মুখ নিশ্চেতনের স্তব্ধতায় যেন কঠিন হয়ে গেল। এই গান শুনতে শুনতে এক সময় ডাকাতদের মুখোশ খেসে নেমে এল অন্তরের ধারা। তারপর? তারপর হঠাৎই তারা মাথার অস্ত্র ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ছুটে এল ব্রাহ্মণের কাছে এবং তার বাঁধন খুলে দিয়ে আর্তস্বরে বলে উঠল — তুমি পালিয়ে যাও ঠাকুর, তুমি পালিয়ে যাও! সন্ধ্যাসর্দার ব্রাহ্মণের কাছে নতজানু হতে লাগল — অতি ঘোর ভোর নিলাম। তোমাকে খতম করে আমরা যাবের অপরাধ চাইতেও নিষ্কৃতি। তাতেপরই ডাকাতরা সন্ধ্যাসর্দার কাছের অনুরোধ জানাল — ক্ষমা করো ঠাকুর! সন্ধ্যাসর্দার জীবন শেষ করে দিয়ে চাই। তুমিই আমাদের গুরু। আমাদের দীক্ষা দাও। পথ দেখাও। সেই সন্ধ্যার থেকে কমলাকান্তের শিষ্য।

ডাকাতরাও ডাকাতি ছাড়তে পারে, পাপের পথ ছাড়তে পারে তারা। এই ঘটনা ছড়িয়ে পড়তে দূর-দূরান্তে। সাধক কমলাকান্তের নাম ক্রমে ক্রমে ছড়িয়ে পড়ে মাতৃসাধক হিসেবে।

বর্তমানে অবিভক্ত-কাঞ্চনে সাধক কমলাকান্ত অনুমানিক ১৭৭৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রামেশ্বর ভট্টাচার্য ছিলেন ধর্মপ্রাণ, মাতা শঙ্করীদেবী ছিলেন সাধক সন্তানিকা। তাঁদের দুই পুত্র — কমলাকান্ত ও শ্যামাকান্ত। শিশুকে অবস্থা দুটোতে কমলাকান্ত মা ও ভাইকে নিয়ে গেল আসেন মাতুলালয়ে, চাঁদাডাঙায়। এই গ্রামগ্রামেই কমলাকান্তের আদ্য শেষ সাধনের ও কবিসত্তার। পুথিপড়ে বিদ্যার দিকে তাঁর ঝোঁক ছিল না। তিনি মাতৃভাবে বিভোর হয়ে গান রচনা করতেন এবং সেই গান গেয়ে তাঁর মন সৃষ্টির আনন্দে সারাক্ষণ বিহ্বল হয়ে থাকতেন। বিয়ে হয়েছিল পূর্ণিমার সঙ্গে। দুঃখী প্রতিবেশীর মধ্যে ছিলেন তাঁকে দেখে কথায় কথায় গান বাঁধতেন। তিনি গান করেন — কমলাকান্তের মন কেন কেন কেন?/কালী বিনে কে আছে তোমার? তিনি বিয়ে করেছিলেন, কিন্তু অকালেই তাঁর পত্নীবিয়োগ ঘটে। সংসারের মোহ অনায়াসে কমলাকান্ত গান করেন — কালী! মন ভুলনি নারী/শ্যামাপদে নিষ্ঠা আছে যেমন/তাদৃশী তারা দিলা তাদৃশী সেবা।

সাধক কমলাকান্তের সাধনাপীঠে লাভ করি কাঞ্চনপল্লী। মায়ের ও পত্নীর মৃত্যুর পর তিনি এখানে চলে আসেন। এখানে

ইল-এরে রাখেরিলী, কুল-এরে রাখেরিলী, এরিলী-এরে রাখেরিলী এসেছে। এরকম অদ্ভুত মাতৃনামীয় বাক্যবন্ধগুলো ও লাইনের সংখ্যায় গদ্য করে এনেছে বিপুল ঐশ্বর্য।

স্ত্রী বিয়োগের পর তিনি সন্ন্যাসীর বেশে এশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়ান, আর তাঁর অন্তরে প্রাণ-আকাঙ্ক্ষিত মাতৃনামীয়ে বুদ্ধ হয়ে বেশের সর্বত্রগামের মানুষ। শেষ পর্যন্ত প্রাণে ফিরে এসে তিনি ছিন্নীয়দের বিয়ে করেন — কিন্তু তাতে তাঁর কালীসাধনে কিছু মাত্র বিঘ্নিত হয়নি। তিনি গান করেন শ্মশানে বসে, — গান কালী, জ্ঞান কালী, প্রাণ কালী, আমার মে। অবশেষে একদিন তিনি তাঁর সৃষ্টির উপাদানে লাভ করলেন সংগীতের সিদ্ধি। বর্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্র সিংহাসনে কৃষ্ণনগরের কবির কাছে ছুটে এসে গ্রহণ করলেন তাঁর শিষ্যত্ব। তারপর বর্ধমান শহরের আগাই কোটালহাটে তাঁর জন্যে মহারাজা তৈরি করে দিলেন মাতৃমন্দির এবং আশ্রম। ধীরে ধীরে বাইরের জগৎকে বিস্মৃত করে সাধক ডুব দিলেন নিজের অন্তর্লোকে। তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হল —আপনারে আপনি দেখ, দেখ না মন কারু ঘরে/যা চাবে, এইখনে পাবে, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।

জীবনের শেষ লগ্নে তিনি গঙ্গাতীরে বসেননি, যদিও গুপ্তপ্রেসের গঙ্গা এসে আটি ক্রোশ দূরে উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁর ঘরে। তাঁরাই এসে ধরা দিয়েছিলেন তাঁরই কাছে। সাধক কমলাকান্তের সৃষ্টিমন্ত্র ও সাধনপথের সাক্ষী হয়ে আছেন বর্ধমানের কোটালহাটি শ্মশান। মানুষকে কালীসাধনের পদ্ধতিতে দীক্ষিত করে গেছেন।

কবিসাধকের মুক্তপুরুষ পিতা কমল কবিসাধকে কবি নজরুল ইসলাম যখন চিঠিতে লিখেছিলেন, তা জানতে পেরে আমাদের এক অনুসন্ধিৎসু সোহাগকবি জীবনের ইতিবৃত্ত জানতে চেয়ে আমাদের হাত লিখিয়ে কখন জীবনে কবিসাধনার উপযোগ ঘটিয়েছিলেন এবং সাহিত্যসৃষ্টির অনুপ্রেরণা সম্পর্কে অন্তর জীবনের সাধনকর্মীদের মুখোমুখি করেছিলেন, সেটিও এক পরম বিস্ময়ের কবিতা। ১৯১৩ সালে বাঙালি পাঠকদের নাম লিখিয়ে হুগলি মোহসিনে ভর্তি হন। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে তিনি তাঁর তিন বছরের সৈনিক-জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে এসে দাঁড়ালেন জীবনযুদ্ধের সৈনিক রূপে। তিনি বিদ্রোহী কবি, তিনি যৌবনের কবি, তিনি সাহিত্যাকাশের ধূমকেতু এসবই সত্য, ঠিক ততখানিই সত্য তিনি সত্য ও মঙ্গলের পূজারী, তিনি ধর্মীয় গোড়ামির বিরুদ্ধে সুতীব্র প্রতিবাদ এবং তিনি মর্মান্তিক মাতৃসাধক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সমগ্র অন্নকাতর যখন ক্ষুধার আর্তনাদে কম্পমান, সেই দুঃসময়ে কবি কলকাতা থেকে গাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন, দক্ষিণেশ্বর মাতৃমন্দিরে। সেখানেই হয়েছেন তিনি কালবয়। শোক-দুঃখ-যন্ত্রণায় বিদ্ধ কবি তাঁর সৃষ্টির মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন সান্ত্বনার সম্বল। প্রমীলাদেবী কোম্পানির কথা তিনি যে অমল শ্যামা-সংগীত রচনা করেন, তা যেন রামপ্রসাদ-কমলাকান্তেরই একজন সার্থক উত্তরসাধকের সৃষ্টি।

সৃষ্টিসুখের উল্লাসে তিনি রচনা করেন — আলো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন/আঁধার কাল দেখে মের মুক পেতে দিব, তাঁর হাতে অরুণ-বীজন। তাঁর সার্থক জীবনের অপরূপ সৃষ্টি এই গানটি,

— মহাকালের কোলে এসে যেমনি হল মহাকালী/অমনি শিবের জন্ম মেখে হল হল মার অঙ্গের ছাই।/তবু মায়ের জন্ম কি হয়েছে, সে যে ছড়িয়ে আছে চরাচরময়।/মায়ের অঙ্গের আমরাই ছাই নিয়ে সৃষ্টি-প্রতীপ ছাড়ি।

কবি নজরুল একদানের কলমটিতে হল ধারণ নজরুলে। তাই তাঁর মাতৃসাধনা পরিণত হয় তাঁর ঐশ্বর্যসাধনে। তেমনি করে বুক ছাড়িয়ে তিনি গেয়ে ওঠেন —

বুকের রক্ত আসন ঘরে মেয়েরা যা ছুই আসন ছাড়ি।/মায়েরা। দুঃখ দেওয়ার ছলে মা, তোর তুফান ঝড় নাও দেখেছি।/পূজা ঘরে পাঠিয়ে মেয়ে, (মা গো) এলাম তোর জন্যে এলে।/বুকের মাঝে আসন পাতা, বস মা দেখা দুঃখ-সুখদায়ী।

কবিসাধকার সৃষ্টি মহিমায় এই ভাবে আত্মপ্রকাশ যে মাতৃসাধনার সূচনা করেছিলেন, কমলাকান্ত যার নাম ভক্তিতীর্থ করেছিলেন, কবি নজরুল তাকেই দিয়েছিলেন পূর্ণতা। তাই বিদ্রোহী কবি শান্ত সমাহিত হন তাঁর মাতৃসাধনায়।

আমরা সৃষ্টির সন্ধানে সাধনায় যে ধারাটিকে অনুসরণ করতে প্রয়াসী হয়েছি, সেই ধারার অন্তর্ভুক্ত আরও কয়েকজন সাধকের নাম অবশ্যই পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়। প্রথমেই অমলা সাহিত্যের মহারাজা রাজকৃষ্ণ রায়ের পত্নী-রানী শ্রীমতীর সহধর্ম-পুত্র মহারাজ রাজকৃষ্ণের নাম স্মরণ করতে পারি — তিনি রাজা হয়েও ছিলেন যোগী, সিংহাসনে বসেও ছিলেন ধ্যান ও প্রার্থী। বর্ধমানের এই মাতৃসাধিনী সাধনার সর্বাঙ্গীণের ধারাধারা ছিল গুপ্তন উপাসনা। তাঁর রচিত বিখ্যাত একটি গান — ছাড়ে সেই যে পরমানন্দময়ীরে আনে।

আদুলের ঐশ্বরিক-মহারাজের সাধনার সর্বাঙ্গীণই ছিল তমল উপাসনা। তাঁর রচিত গানগুলি মাতৃসাধনের আকাশে চিরকালের অক্ষয় সম্পদ। তিনি বিশ্বজনের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেন — প্রেমিক হলে শোনাবে মুক্তি/ধর্মান্ধতি অক্ষিকলে, ঘুচে যে মায়া যাবে চলে, জ্ঞান তুলে যে পরাতলে।

(১ নিবন্ধী পৃষ্ঠা-সংখ্যা)

সুখহীন দুঃখহীন অগ্নি পরিমণ্ডলের কাছে যেন সে কোথাও আছে

মাত্র উনত্রিশ বছর বয়সেই মৃত্যুকে বেছে নেয় যে বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক অভিষেক মাইতির ঠাকুরদা। ১৩৮৭ সে 'অভিষেক কবি' শীর্ষক কাব্য সংকলনের প্রথম সম্পাদনা করেছেন অভিষেক। তাঁর রচনায় একক কাব্যগ্রন্থ 'মালা শিকারের গান' প্রকাশিত হয় মাত্র পঁচিশ বছরের আয়ুষ্কালে। কবিতার পাশাপাশি প্রবন্ধ এবং ছোট উপন্যাসও লিখেছেন অভিষেক। মৃত্যুর ৮ নভেম্বর ১৯৮১ সালে পুলিশ সবুজ ফল করতে গিয়ে গ্রেপ্তার করে অভিষেক মাইতিকে। কিছুক্ষণ পরে থানার সিঁড়িতে পড়ে থাকতে দেখা যায় অভিষেককে। নিষ্প্রাণ দেহ।

কোনও নির্মেঘ দিনে

অভিষেক মাইতি

ধূসর ধূসরের ঘ্রাণে ডুবে যেতে-যেতে
অনেকদিন আমি সেই মেঘের দেখা পাইনি -
যার কোমল একদিন
জড়িয়ে দিয়েছে পরীরে
এখন বৃষ্টিহীন দিনের ভিতর থেকে রাশ হোসে
রুক্ষ মাটি পরিমলমায়
বাড়ি দিচ্ছ করবে — নীরব রক্তক্ষরণ আমাকে প্রেমিক করে
এ জীবনে আরও একবার আরও একবার
প্রথমবার মতো ছোঁবে উঠতে চাই
নদীর গভীরে শিউরে ওঠে তখন পুরোনো স্মৃতি ...
তোমাকে বলার কথা এই
অসীম এক আনুষ দীন করে নিজে অন্যকে
অসংখ্য অসমাপ্ত কবিতার মতো উঠতে জোয়ার
তুলে ধরছি অস্তাচলের পথ

এখন শুধুমাত্র আমি তার ভালোবাসাকেও পাচ্ছি না !

উত্তমস্মৃতি — সতত সুখের

অধ্যাপক ডঃ কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়

১৯৭৮ সাল হবে, মহালয়ার কয়েক দিন আগের এক বিকেল। কি রকমের মনে, আমাদের সেই মিলিত পরিবারে পুরোনো বাড়িতে বাবা কোর্টের ছুটি হলেই ঐ সময় তিন ভেতলার বারিন্দে চা-র আড্ডায় ছোট ভাইদের ঝুঁড়ি আসতো। সেই ছিপছিপে সুদর্শন বাবাকে সাদা-মুখে ওরে ঘিরে বসলে আমাদের ভাইবোন।

শরতের শুরু মেঘের আকাশ কাঁপিয়ে, নীল আর কাঁচা রোদ্দুরকে বুক ভেতে ভালোবাসতে ভেতে আসছিল ঐ সময় কার্তিকের কাশফুলি হাওয়া। ঠাণ্ডা হাওয়া।

পাড়াতে ঢুকি। ভাবে ঘুরি। ভেবেছিল কয়েক বছর আগে একটা কাঁপড়ের ঠিকুজুলের ঘোরে ভেবেছি নিজে ছুটো আছি এবং বুঝতে পারছে। আমাকে খুব ভালো আসতে দেখেই, সিগারেট ধরিয়ে, ঠে ভেবেছি নিজে।

একবছরের আগে পেরুই আমাদের কালীঘাট শ্যামবাজারে বাড়ির সিঁড়েরোয়ে বসে বুড়োর সাথে (আমার ছোট ভাই সুনীত) একেবারে ঝাড়পোঁছ হয়ে বাড়িতে আসা জন্যে। সুনীতের বাড়িতেই ভেবে হয় পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকটায় তরুণ প্রথম ভক্ত এড়িয়ে নামে। ('ভেবেছা জীবন' ইত্যাদি)।

— আপনি, বড়দা! কবে এলেন?

— ঘণ্টাখানেক এ সময়টা আসা হয়।

— দাদা সুনীত বলছিল বাড়ি।

— তুই?

— বড়দা, মা, বৌদি, বৌমা আর উল্টোরথের ক্যামেরাম্যান, এরা সব এসেছেন। আমি অবশ্য কালকেই হাজরিবাগ অফি বেরিয়ে, তারপর এখান থেকে ভেলে চলে যাব কলকাতা। বাঁচার শ্যামলী'তে দাদা করছেন, জানেন বো?

শরীরটা নিয়ে ওদের ওরা এতোদিন ব্যস্তিগত ভাক্তার বেরি নিয়ে বলেছেন, পলেরো দিন নিন।

— ভাল। পেরো, আমি বাজার ভেবেই সন্ধে আসছি। তুমি আদাজ করবে, আর আমরা এখানে উত্তমদাকে টেলিপ্রেস্ট ক্লাবে কালকে নিয়ে যাব। ভোমনের সন্ধায় ক্লাবে ঘরে কালীর সংস্কৃতিবান মানুষ ওঁকে কাছাকাছি পেলে খুশি হবে। আমি ওই ক্লাবে গান-বাজনা-থিয়েটার করি, আমার পুরোনো বন্ধুদের নিয়ে একটা দিন বেশ কাটে। জানিস তো আমি, সুনীত ছেলেবেলায় এখানে সেজ জ্যাঠামশায়ের কাছে ছিলাম। তাক চলি, ঘন্টাখানেকের ভেতরে আসছি। ছোমনে ভাগলপুরিদের আগুন এবার জামার পোছন দিকে ধরে নেবে।

ঠকল লজ্জা। পেয়ে মুখ নামাল।

— দাদা, আমাদের বড়দা, আমে সুনীতের বড়দা, কৃষ্ণলাল মুখার্জি - শিক্ষক-ধারাত্ত অধ্যাপক।

আমি সলজ্জোত্তে পাঞ্জাবিতে বাড়িতে হাত দিয়ে বলি — আমি এর কোনোটাই নই তবে ভেতলা স্কুলের ক্লাস ফ্রাইবারিতে একটা ছোটখাটো মাস্টারি করি, এই আর কি —

ধবধবে আদির পাঞ্জাবি, পায়ে বার্নিশ চটল, একটা পাটি থেকে পা খুলে রাখা পায়ের পাতায় জরিপাড় কোঁচাটা লটিয়ে আছে মাটিতে। অমন নিলিপ্তমন মুখে সেই ফুল তোলানো মন ভোলানো হাসি — উত্তমকুমার! উফ্, কতো মনে হয় 'মুখ' হলছে। একটা অন্তত গন্ধ বিমল

আসবে। উত্তমকুমার বাইক ঘুরিয়ে সেই বৃষ্টি-বিহ্বলতা আলোকের অভিমুখে, কালীঘাটে নিশার নিমেষের 'হুম' ধ্বনিটা চলছিল।

কি এইচ ইউ-এর অন্তরালবর্তী বাড়ালি ৩টি তালপাতা হোসপাইপের উত্তমকুমার ইয়াজদ দেখতে (আর্টিফ্যাক্ট) পেয়েছে এবং হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল উত্তমকুমার।

— আমাদের এখানে টেলিফোনটা একবার দেখে নাও তো। অর্ধেকদিনের মধ্যেই বাড়িছে। ঘড়িঘড়ানো ঐ ফ্লাবে ঘড়িঘড়ানো মুখোশদের খুব ঘুমনাম হয়। গলা-বাজনা বিছেয়ার হবে। সেই নিওনটি পাবে। ভাল বোলো। আপনি যদি আমাদের মাঠে একদিনকার বাড়ালি-ভাড়ালি ডাইনের ব্যবস্থাটা এবার পায়ের ধুলো দেন

— না সে হয়ে যাবে, কিন্তু আমার শর্তটা মোটাই

— সাতে থেকে বৃষ্টি নিয়েছেন কে কলকাতায় থাকবেই আমি ওকে এনেছি। আমি-আমার বন্ধুরা হয়ে আপনার বাড়িতে পাই ওখানে প্রায় রোজই — বেশি দূর বিয়োটারের সামনে হারগুরি ফ্লাবের লাল বাড়ালিটা খেলছেন। এখানে বিশেষ করে বাঙালিরা আপনাকে কাছে পেলে খুশি হবে। তাহলে আমি আজ বিকেলে কি আসব, সেক্রেটারি মানে ফ্লাবের অনুমোদনকে নিয়ে। উনি এখানকার সেক্রেটারি বিজ্ঞাপনের নির্দিষ্ট কর্মী।

— আসুন, তখন হয়তো নাই না।

— না, না তেমনে অসুবিধা হবে না। আসবার সময় হোটেলের দু-চারটে সিঁড়ি লাগিয়েই এসব।

উত্তমকুমার তখন আসলে কলকাতা শর্বরীর উপরের টান। আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে। নারিকেল কুড়োর আকাশ থেকে উঠে আসছে। হাজার হাজার বাঙালির ঘর ফেরানো অভিনেতার জোলসের চলন-চিত্রিক শহরে আসনের অতীত ঐতিহ্যের নিমেষায় আকাশ।

অনুরাগ ও সংস্কৃতি-সম্পর্কের বুদ্ধিজীবী (শ্রীনিবাস চক্রবর্তী)। নিয়ে (ফোরকোর্ট পোর্টিকিসের আন্টারমোশায়)। বিয়েবাড়ি যেমোয়। পাঁচটা বাজে। সেজেগুজে নকল আসল বুঁজোর টানা লম্বা সারাদিনের ফেলিং। পেছনে মুখোশটা একদিনের চলন পাশে, পাশেরটাকে ডাইনিং টেবিল, চেয়ার। এরপর পাশের সেকেন্ড হোড ক্লাব। পুরোর আবছা মাস আসছে। মাইকের বিকেল ঝিং ঝিং ঝিংটার মধ্যেদিন - বৃন্দাবনা - কলিংবেল ঝাঁকছে। একা-টানার বুঁজোটা টেনেছে কেন এই গাড়িওলো এখানে থাকবে এত অনেক মেয়ে আছে না বাড়ালিটা বাড়ালি ছেলেদের ঝিং। আজিবন্ধু বলে তাঁর আবার কালীর ছুনীর বাড়ালিরা

সে বছরের পুরো পেটা পাড়াগেয়েদের আমার বৃষ্টির ঘনিষ্ঠতাকে বাধা এরকমটি সারি সারিদের ছবিতে মতো।

উত্তম এসেন। পিছনে আরি বছরের ছেলে গৌতম। বৃষ্টি-পাঞ্জাবিতে বেশ নায়ক-নায়ক দেখাচ্ছে। সকলকে হলঘরের ঢুকে ঢুকতে ঢুকতে এক্সেলারে ঝিংবু গৌতম মহাকে দেখে ঝিং ঝাঁ-চিক্কিয়ে। উত্তমকুমার ঝটিতি চাইতেই নকলে বহু কাছে আসতে। এলো সে গৌতম নয়। বাবার ছোকের বাড়াটিছে। উত্তমকুমার এগোন।

— তুমুল একটু আগেই গাড়িতে পাঞ্জাবি রেখে ফিরল।

— আপনি?

— না আমি আর বাইরি। গৌরী গিয়েছিল।

ঘরের ছোয়াল এল।

— আপনাদের অনুষ্ঠানে বাল চাইক খেকের হো।

— আপনি না চাইলে দেব না।

— উঁহু! বাইরের ঝিং ভাল লাগবে না। এক ঘন্টার বেশি থাকা যাবে না। হবে তো?

ঘটনা বিমানের বুদ্ধিমান মানুষ। ঝটিজ্ঞানীদের ভক্ত। বুধ মেশে অনারি রাগে ফলেন — ঠোকর!

গৌরী এলেন। গ্রীনরুম ঘরে গেলে দুধ। ঘনশ্যামসুন্দর, আসল আমুদে ছেলে আমার নিয়ে গ্রেস বলছেন — ঠেকুলেন আমি চলে যে।

অনুরাগটি আর বসিয়ে রাখতে চান, — আপনি না খেলে তো আমন্ত্রণ উত্তমকুমার।

এবার সকলে নায়কেরছিতে ঝটিনি ঢোকে। পরনিন সন্ধে নামার আগেই দুখান গাড়ি নিয়ে এলাম। সঙ্গে ক্লাবের ট্রেজারার আমার ছেলেবেলাকে বহু বাঙালিদেরকে জুলার সভাপতি নিয়ে পাশে, সম্পাদক টেনিস-পাড়ি ক্লাবের মৌসুমি ঘর।

— না বলে দিলেন — সবের কলিং ঝুঁ ঝুঁ ঝুঁ। ফোনো আরে না হয় বুঝো নিই সভাপতিই হলে গেছে। ঘনশ্যামদা ফোনে ফোনে যাবে। অনেক তাড়াতাড়ি ঠাণ্ড আসিস।

— হাঁ ঝুঁ! আমার আশ্বাস নিলাম সেই গৌরাঙ্গী মেয়েদের ৩টিতে বাড়িছে-ঝটিজ্ঞান খুব আমার ফোনে আসে ছাড়ে ছাড়ছে।

— এই ঝুঁ ঝুঁ। বড়ো ঝটিজ উত্তমকুমার গাড়ির ঝুটিয়েরের সিঁড়িতে এরকম কলি দিয়ে দিয়ে ঝুলেছি — গোপুলিয়া সিরাজদে, ঝুলপুকুরি, ঝড়ঝলাল, ইলেকট্রিক লো কল, ঝটিজ সিনেমের ঝিংবন্ধুকে ঝিং ফোনে গাড়াগাড়ুলে। দু-একটি গৌরাঙ্গিকে ঝুনিয়ে পাড়াগাড়ী, সোকলকলেজে দুখ পাড়িয়ে ঝুলনাতে ঝটিজ চেনে — কাল, পরের সে কোই মেয়েকলি ঝিয়া ফোনে, ফোনে ঝুলে ঝুক আমাদের ক্লাবের ফোনের আমন্ত্রণ এলে আমেরিকায় আসে। ঝুকবয়সী, ঝিংঝুনুনি, ঝুকাতে ঝুক আমাদিলি ফোনাক। আমি পুজোর আগে, মানে কালীপুজো পর্যন্ত ঝুনির নাম ঝুলনাতে ঝিংি-ফোনো পান গোছে ফোন ফোনে ঝুখ। আর বন্ধুক। তাই 'ঝুক' টান ঝিংে সাহেবাকে। এটা ইউ লি-র একটা

হলেন এবং তখনই ছুটিয়ে আনেন।

তখনই — ঠিকই যে তি, যে হাত এই সেই হাত

উদ্ভাসন মাত্রেই প্রতিশব্দিত হলেন। এই হলেখনীর শব্দপ্রয়োগ অনুত। সৌমিত্র সেনগুপ্ত ট্রাজেডির বিশিষ্ট সমস্যাগুলি, প্রতিনিয়তের দর্শনবিহারে উপস্থিত। প্রত্যেকটি ভাবপ্রতিটি সমান সমান প্রায়, কাউকেই কিছু বেশিও হতে পারে।

বিজয়া, বীরেন, একলা, আকাশবাণী, তেজস্ক বিভূতি, বুদ্ধদেবিকা এরা ছিটের মধ্যেকার প্রতিভাগ প্রতিমা সাজাচ্ছে। আলো ছিটে ছবিগুলি বুদ্ধদেবিকা। উদ্ভাসনকুমার এসেছেন তাদে সমাধানের হাতে মুখ তুলতে।

প্রতি তখন বিভিন্নে কবিটি — আজ মোদে হাসা ছিলাম আনন্দ-মোদে মহতের একাধারে উদ্ভাসনকুমারকে হাতের কি.সি.প্রসাদকে বুলিয়ে অবসর দে পা কম উদ্ভাসে আজ সমস্যের আছে প্রসাদকে হাতখানে চুমকিয়া আলা তাকতা বি। আমাদের নিজের নিজেদের তো কালা বেশ ইসী কথাতে হয় তয়া হয়ে 'দুঃখ' ইসি উদ্ভাসনা কথা ছাকলিত কা হিসে হয়। হয় সম্ভ কাহাকেটি বলবাই হিসি ছিল্প কা উদ্ভাসে নিজাসে তাদে নিজীপাকে সমান উদ্ভাসনটি কলা ছিলকা পুরাদি ইচ্ছা থেকে আপন হাতের আতর হয়সব্ দে আনন্দ বি। আজ শয়ান নাই জানাই ইসি কি মেসবস্তুমার যে প্রেক্ষাগারে উদ্ভাসনা তি হিসেবে সহ কা সুবলা পাচক গ্রীন। হয় সম্ভ উদ্ভাসে রিফ্রেসেন্ট করেছে আজ যে নাসাসিদি হোসহার যে ওভাসনার উদ্ভাসনাকে সুর দেকর কলা যে যাবে। উদ্ভাসনা সালক্ষ থেকে বলছেন — আমি কা জানি, তা নিয়ে আমার চিন্তিত দিন দেবার নয়ে। এখানে বাই হোক আগে তুমি গান, তারপর দেখি, যদি পারি ——

আসরে সেই সাইত ছাড়া আর হসি। মনে হয় লজ্জাবও ছিলেন। উদ্ভাসনাকের আহ্বানের বাণী হচ্ছে সেই আনন্দসঙ্গত।

গান শুরু করি। আমারই লেখা, সুর দেওয়া। গাইব তিন-চার মাস এখানে আসরের আসরের এখানে বেড়াচ্ছি, তিন্ন হয়েছে — যদুমন শ্রী বীর কুমা সে মিত্র আইীয় বৈদেহী।

প্রতিবেশী উদ্ভাসনের (লাহিড়ী) ঘরোয়া প্রতিভাসন আজ নিবি। এই মেজাজের সমস্যার হেসেই নিয়ে আইছি। উদ্ভাসনার সেই আসর সেকের সম্ভিত হয়নি হোসবার নয়।

হাসপাতালেই উনি আমাকে আসন করে বসালেন — তুমি কেমন ভাবে গান করো যে তখনী। মুহূর্তে নবম-পুরুষালি মেসস্তুমার মতো সোনার মুকের গলা।

প্রতীতী-উদ্ভাস সালাপনে এসেন প্রতিমা দেখছে। বিভূতি (কালীর ছেলে, মামা ইন্ডি.লি.-এ নামী চিত্রশিল্পী, বিবাহ আটিস্ট কল্পিলাকারের লিখা) আলাপন নিজিলে — আমাকেও পোর্টার জলাতে।

প্রতিমার সামনে কোঁচা হাতে দাঁড়ালেন নায়ক। গভীর অনোযোগে দেখলেন আলপনা - আলো, আজবাহার।

এবার আলাপন। প্রায় আট-এশ জনের মতো অতিথির জন্য বড় গদি ঔদাসের ছোট সাজানো মিটি। কালীর কাকমাসি, পোড়া ডাক্তার (মোহার মতো লাল বালিশ মুখের মত, কাঁচা পোরা), অজন্তাশ্রী চপ, রাজড়ি, এইসব। উদ্ভাসনা সকলে বলে গেলেন — প্রতি। এসেছে।

— এ আবার কী এলন, কালীর স্পেশাল মিঠাই। বিখ্যাত সোনদন, মোহনিয়ার জলযোগ আর অমৃত ভাতার থেকে আনা। নিন মৌমি শুরু করুন।

আমি তখনকণে একটি জলাই চপ মুখে পুরে ফেলেছি। উদ্ভাসনা নিজেকে আমার দিকে ঝেরে হাসলেন। একটা কৌতুকের মিটিমিটি আলোর দু-চোখের আকাশ। পাওয়া দাওয়া চলছে। আমরা একটা উদ্ভাসনার ছবি তুলেছে। (একখানা আপনি, একখানা তুমি আসছেন) একসঙ্গে থেকে কথা নিয়ে জানা তাদে কি হাসিমিলাস। হাওয়ার ঢেউ আমার লাগ করছে।

— নিলয়াই।

হাসপাতাল প্রায় ঔদাসের (শেষের দেকে)। উদ্ভাসনা সাতদিন নামনাহি হয়েছেন। উদ্ভাস-পুরিয়া প্রতি তবু কেন, উদ্ভাস কুমারকে মহাসিন্ধুর জোতির্বলয়ে দেখে আমরা নিকাশ প্রায়, জয়ন্ত গাঙ্গুলি, ছবি বিশ্বাস, সৌমিত্র, মলিনা, ছায়া দেবী, সন্ধ্যারানী, বুদ্ধিয়া, তুলসী, বীরাজ, অনিলবরণ এদের মতো আকাশের চন্দ্রাতপের তলায় আমাদের অভিনয়, সামাজিক কালায় এ গানের সুরের যে ঐতিহ্যপথ পেরিয়ে এসেছি সেটা বাঙালি কালচিকতা ও একটা গোটা জাতির সহিত্য, সৌজন্য, রুচি, শিষ্টাচারেরই বিচিত্র লীলাবলন।

তখন বিকেলের নরম, নাগাদাল, আকাশ বাসা নমিক হলছে। উদ্ভাসনা সমিতার বিকেলের হাল-চলিকর দেখতে আসতেন। সেইসব কথা মনে হতে লাগলো। সন্ধ্যা মেকআপ নিজের পাশের ঘরে। আমি ইজিচেয়ারে শুয়ে মৃদু মৃদু দোল খাচ্ছি।

না, শেষের কথা আগে বলব না। উদ্ভাসনকুমার যে বক্তব্য রেখে গেলেন, সেই সম্বন্ধেই বোধহয় তখন প্রতি সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকায় সঙ্গীত-সমালোচনা লিখি। শ্যামল গাঙ্গুলি সেম্পাদক, এই বোধ হয় সেদিন চলে গেছেন। আমার নিকাশ প্রায়, সৌমিত্র পরিচালিত 'শেষের কবিতা' প্রতিত নাটক হবে (রবীন্দ্রসদন) — প্রেস আর্ট দিয়ে গাড়িয়েছে। ছেলেটি সৌমিত্র কলাম, বাবা, দেব পর্যন্ত আসছেন

"দেখা হবে পার্ক স্ট্রিটে"

সেই মহানায়কের শেষ যাত্রাপথ।

ফুলমালার বিপুল সম্ভার —

জনতার অশ্রুজলে ভারী।

পথপার্শ্বে দেবদারু-সুপুরি মুমূর্ষালিপটাস

গাছের ডালে ডালে লোক আর লোক।

এই পথ যদি না শেষ হয়.....

পথ শেষ হয় না সত্যিই।"

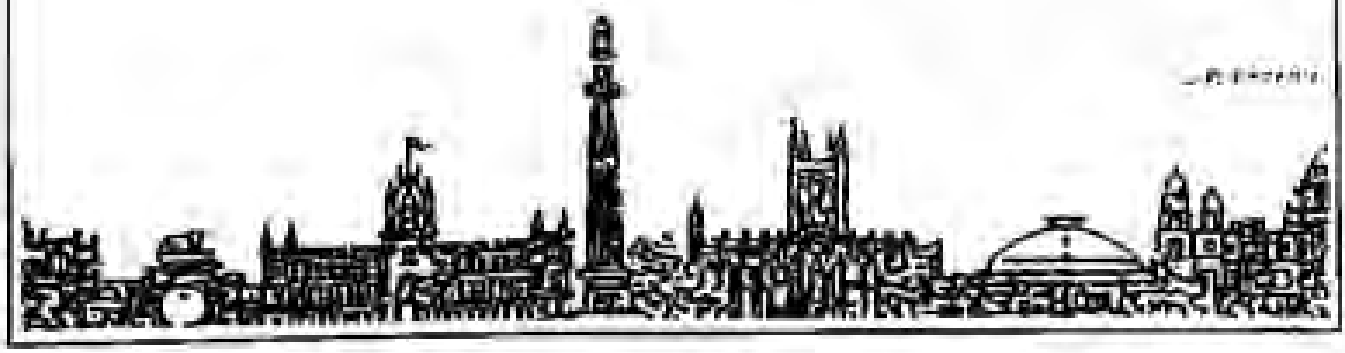

"এই শহরে বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দীনবন্ধু মিত্র (কলকাতাতেও বাড়ি ছিল), হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বসবাস করেছেন. এঁদের বাড়ি সংরক্ষণ করা যাবে বলে মনে করি না। এগুলিকে 'হেরিটেজ' মনে করলে তা করা যেত। এগুলি যে 'হেরিটেজ' ও সংরক্ষণযোগ্য, তা চিহ্নিত করার মানসিকতাও কমই দেখি।"

কলকাতা কী চায়

মহাশ্বেতা দেবী

কলকাতা শহরের বয়স খুব বেশি নয়। কলকাতার প্রথম ঐতিহাসিক পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয় ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর। পুরোনোকে ধ্বংস করে নতুন গড়ার যে উন্মাদনা তখন দেখা গিয়েছিল, তার ফলে কলকাতার ইতিহাসই আজকে না পৃথিবীর কিছু শহর/নগর, যার বয়স ৮০০/১০০০, সেখানেও দেখা যায় প্রতিনিয়ত ঐতিহ্য ধ্বংস করা হচ্ছে।

এ বছরের নভেম্বর-ডিসেম্বরে কলকাতার পরপর দুটি (সাধারণ নির্বাচনে। রাজনীতিকদের ভাষণে ঐতিহ্য। সে বিষয়ে কলকাতা কর্পোরেশন যথেষ্ট সচেতন হয়ে পড়ে। ভাবুন তো, যে কলকাতা হেরিটেজ, তা নিয়েও এতদিন কেউ কিছু ভাবেননি। ১৯৭৭ সালে পৌরসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর প্রথম কাজ হয়ে ওঠে ঐতিহ্য রক্ষা। ১৯৭৮ সালে পৌরসভা ঐতিহ্য রক্ষার জন্য একটি কমিটি গঠন করে। কমিটির সভাপতি ছিলেন জ্যোতি বসু। কমিটি ১৯৭৯ সালে ৩৭৮টি বাড়ি ও স্থাপত্যের তালিকা প্রকাশ করে। তার মধ্যে ১৯৮০ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ১৯৮১ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ১৯৮২ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ১৯৮৩ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ১৯৮৪ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ১৯৮৫ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ১৯৮৬ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ১৯৮৭ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ১৯৮৮ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ১৯৮৯ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ১৯৯০ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ১৯৯১ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ১৯৯২ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ১৯৯৩ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ১৯৯৪ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ১৯৯৫ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ১৯৯৬ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ১৯৯৭ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ১৯৯৮ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ১৯৯৯ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০০০ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০০১ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০০২ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০০৩ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০০৪ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০০৫ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০০৬ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০০৭ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০০৮ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০০৯ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০১০ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০১১ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০১২ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০১৩ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০১৪ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০১৫ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০১৬ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০১৭ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০১৮ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০১৯ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০২০ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০২১ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০২২ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০২৩ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০২৪ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০২৫ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০২৬ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০২৭ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০২৮ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০২৯ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০৩০ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০৩১ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০৩২ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০৩৩ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০৩৪ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০৩৫ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০৩৬ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০৩৭ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০৩৮ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০৩৯ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০৪০ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০৪১ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০৪২ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০৪৩ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০৪৪ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০৪৫ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০৪৬ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০৪৭ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০৪৮ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০৪৯ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০৫০ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০৫১ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০৫২ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০৫৩ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০৫৪ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০৫৫ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০৫৬ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০৫৭ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০৫৮ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০৫৯ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০৬০ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০৬১ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০৬২ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০৬৩ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০৬৪ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০৬৫ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০৬৬ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০৬৭ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০৬৮ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০৬৯ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০৭০ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০৭১ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০৭২ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০৭৩ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০৭৪ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০৭৫ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০৭৬ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০৭৭ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০৭৮ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০৭৯ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০৮০ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০৮১ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০৮২ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০৮৩ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০৮৪ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০৮৫ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০৮৬ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০৮৭ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০৮৮ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০৮৯ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০৯০ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০৯১ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০৯২ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০৯৩ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০৯৪ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০৯৫ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০৯৬ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০৯৭ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০৯৮ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২০৯৯ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ২১০০ সালে ৩৭টি বাড়ি ও স্থাপত্যকে সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়।

কী বা আছে, তা আমরা ভাল চোখে সবসময় দেখতে পাই না। কলকাতা পুরসভার, শহরের দক্ষিণ-পূর্বে বিস্তীর্ণ এলাকার সমস্ত রাস্তাগুলির কিছু উন্নতি করে শহরের যানবাহনে আরও গতি আনার জন্য পুরসভা যে পরিকল্পনা নিয়েছে তার কথা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু কতদিন ধরে এই পরিকল্পনাটি আছে? মনোহরপুকুর রোডকে চওড়া করেই আমরা দেখেছি। আজ ডাল আলুরাস্তার উৎস নেই বলে বৃহৎ অধিবাসীরা আজও বিভাসার নামটুকুও ভুলতে পারেনি।

দু-মাস আগে পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে এক বাড়ির দিকে ফুটপাথের যে হাল দেখেছি, তা কহতব্য নয়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনের ফুটপাথের যেমনই অবস্থা হোক। ফুটপাথে যেখানে আছে, তা যেমনটি থাকে না কেন?

এ শহরে নেই বিপদীদের জন্য যথেষ্ট আলোর ব্যবস্থা। সবই তো সরকারের বিদেশের আলো নিয়ে চৌরঙ্গি না। তা করতে সরকার, এখনিই সরকার, শহরে অন্তত একশোটি 'ঘরোয়া দিয়ে

> *"আজ শহরের যে চেহারা, তাকে ২%, ৩% করে হাল ফেরাবার কাজ শুরু করলেও অনেক হয়। বিজন সেতুর দক্ষিণ দিকে জঞ্জালের গাড়ি ও জঞ্জাল যেমন সরানোই যায়। এমন ছোট ছোট কাজ দেখলেও ভরসা পাব, এই তো।"*

ব্যবহার করার সুলভ শৌচালয়'। পুরসভা মনে করলেই তা করতে পারেন।

ফুটপাথের কথায় মনে হল, হাইকোর্ট অঞ্চলে ফুটপাথগুলি হয় জবরদখল নয় ধুলোয়।

পুরসভার কাজ এমন হবে বলে আশা করি, যাতে পথ, ফুটপাথ, নিচের যানবাহন সবই, তারা পৌরজনের সুফল বুঝতে পারবে।

১৯৪৭ থেকে এ শহরে যাঁরা কর্মী এ পরে এসে স্বাধীনতাকে দিল না, নিশ্চয়ই দেখতে চাইবেন দিল।

যে চেহারায় কিসিমে দিয়ে রাখা যাবে না। সরাসরি কাজে কেউই আসা করে না। আজ শহরের যে চেহারা, তাকে ২%, ৩% করে হাল ফেরাবার কাজে শুরু করলেও অনেক হয়। বিজন সেতুর দক্ষিণ দিকে জঞ্জালের গাড়ি ও জঞ্জাল যেমন সরানোই যায়। এমন ছোট ছোট কাজ দেখলেও ভরসা পাব, এই তো। ৭৫ পরে আমরা আর কি আশা করব।

কলকাতা এ সব চায়।

সন্ত্রাসবাদ দেশে দেশে

হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়

দু হাজার সালে সারা পৃথিবীতে গত ৫ বছরের সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে ৪২৫টি, যা ১৯৯৯ সালের থেকে ৮ শতাংশ বেশি। এই আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে গত বছর মারা গিয়েছেন ৪৩৪জন, আহতের সংখ্যা ৭৯১, যেখানে ১৯৯৯ সালের মৃত এবং আহতের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৫৩ এবং ৩৩৩।

দেশে দেশে গত বছর সন্ত্রাসবাদী হামলার কিছু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল —

আফ্রিকা মহাদেশ

১৩৩৩ সালে আফ্রিকায় সন্ত্রাসবাদী হামলার মূল লক্ষ্য ছিলেন বিদেশী পর্যটকেরা। আফ্রিকায় সন্ত্রাসবাদী হামলার তালিকা লক্ষ করা যায় ১৯৯৪ সাল থেকে। দেখা যায়, এই মহাদেশের অন্তর্গত দেশগুলির আন্তর্জাতীয় যোগাযোগের সুযোগ নিয়ে ঔপনিবেশ করে কিছু আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী সংগঠন। আফ্রিকায় সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সঙ্গে যে সব শ্রেণীর যুক্ত থাকার খবর পাওয়া গিয়েছে সেগুলি হল — ভাড়া-কারখা, সেবাদিক ফিলিপাইন এবং কিছু ইন্ডিপেনিয়ান সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী।

আঙ্গোলা

এঙ্গোলায় ইথনোলিথিক স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় থেকে এদেশের সংঘাত-অঞ্চলে প্রশিক্ষিত হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে এঙ্গোলা সরকারের সঙ্গে সেখানকার 'ন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর টোটাল ইন্ডিপেন্ডেন্স অব এঙ্গোলার' যুদ্ধ লড়াই চলছে। স্বাধীনতাকামী গ্রুপকে সংক্ষেপে চিহ্নিত করা হয় 'ইউনিটা' নামে। তারা পর্তুগালের সঙ্গে কাছে আসায় হোসেনে মন্ত্রীসভা পরিবর্তন, ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক প্রেসিডেন্টের গাড়ি, এবং সেখানকার দুটি বিমান ধ্বংসে। গত ২৪শে মে তারা অপহরণ করে তিনজন পর্তুগিজ এবং একজন এয়ারলাইন্সের প্রতিনিধিকে তাদের বন্দিশ করেরা আইনি আন্দোলন।

বিনি

বিনিন আফ্রিকার নিজের নিয়ন্ত্রণে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে চলেছে। সেপ্টেম্বরে রিপাবলিক্যান গার্ড ইউনিটের ৪৫ (জন) মুক্তন বিদেশি অফিসার পুরোহিতকে অপহরণ করে দিন-মাসের নিয়োগের মুক্ত করে নেয়।

নাইজিরিয়া

এঙ্গোলার মুহূর্তের জাত সেপ্টেম্বর নাইজিরিয়াতেও। সেখানে 'ইউনিটি' প্রায়শই আঘাত হানছে শুরু করে সীমান্ত অঞ্চলে। এরা এসেই নিশ্চিত যে, প্রদূনত বিদেশী হওয়ার অপরাধে ধরে ও জানুয়ারি হত্যা করে তিনজন ব্রিটিশ নিক্ষককে।

নাইজেরিয়া

নাইজেরিয়ার সন্ত্রাসবাদীরা সরকারের স্থানীয় এবং বিদেশীদের মধ্যে যারা তেল উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত তাদের অপহরণ করে থাকে। এপ্রিলের পর বছরেই ৪৩জন বিদেশীসহ প্রায় ৫০০ জনকে অপহরণ করেছে বলে জানা গিয়েছে। সবচেয়ে সোচ্চারিত ঘটনাটি ঘটেছে গত বছরের ৩১শে জুলাই। সেদিন অত্যাধুনিক অস্ত্রসহ হামলা চালিয়ে সন্ত্রাসবাদীরা ১৮৫জনকে অপহরণ করে তাদের মধ্যে আমেরিকান এবং ব্রিটিশ নাগরিকেরাও ছিলেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কয়েকটি সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল

আবু সিয়াফ অপারেশনস্ (এ.এস.ও)

এদের নেতৃত্বে রয়েছে সর্বদাই অসন্তুষ্ট। ১৯৭৯ সালে নি.এল.ও. থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই সংগঠনের জন্ম হয়। এদের আস্তানা ছড়িয়ে আছে বিশ্বের কুড়িটি দেশে। ইতিমধ্যেই তারা হত্যা করেছে ২০০ জন মানুষকে। এদের আক্রমণের মূল লক্ষ্য হল, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইজরায়েল, আধুনিক পাশ্চাত্যকরণ এবং বিভিন্ন আরব দেশ। আন্তর্জাতিক মহলের অনুমানের ভিত্তিতে লক্ষ করা গিয়েছে তাদের এবং চিহ্নিতকরণ। ১৯৮৯ সালে একটি বিমান হাইজ্যাক করে তারা নিয়ে যায়। ১৯৯৬ সালে এদের দুটো হেলিকপ্টার লক্ষ করা যায় ইরাকে। এরা বিভিন্ন দেশের সহায়তা পেয়ে থাকে ইরাক, লিবিয়া, সিরিয়া থেকে।

আবু আব্বাস গ্রুপ (এ.এস.জি)

আবারে ছোট হলেও এই ইসলামিক সেনাবাহিনী গ্রুপটি মূলত সন্ত্রাস চালায় ফিলিপিন্স এর দক্ষিণ প্রান্তে। এদের সঙ্গে আলকায়দা-নেটওয়ার্কের যুক্তরাষ্ট্রিসিদের যোগাযোগ আছে। প্রায়শই এদের সদস্যেরা আফগানিস্তান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে যায়। ১৯৯১ সালে মোরো ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আবদুরাজিক আবুবকর জঞ্জালনি-র নেতৃত্বে। তিনি ১৯৯৮ সালে ১৮ই অক্টোবর এক বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান। বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ শুরু করে ফিলিপাইনের এবং সুলু আর্চিপেলাগো-র স্বাধীন ইসলামিক রাষ্ট্র তৈরির উদ্দেশ্যে তারা তাদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালিয়ে থাকে। গতবছর তারা একজন

জীবাণু বোমা?
ট্রিপল এন্টিবায়োটিক
নিয়ে রাখুন।

"এই মুহূর্তে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে কমপক্ষে পঞ্চাশটি সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী ব্যাপকভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে চলেছে। এদের অর্থবল ও অস্ত্রবলের হিসেব পর্যালোচনা করলে অবাক হয়ে যেতে হয়। মূলত অস্ত্র-ব্যবসায়ীদের মদতে এদের আকার ক্রমশই বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হয়ে উঠছে।"

হয় ও অন্যদের সাহায্য পেয়ে থাকে বলেই অনুমান করা হয়। এদের কার্যকলাপ ফ্রান্স, জার্মানি, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস, সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, ইতালি, স্পেন, পর্তুগাল, গ্রিস, তুরস্ক, ডেনমার্ক, সুইডেন, নরওয়ে, ফিনল্যান্ড, আইসল্যান্ড, লুক্সেমবার্গ, মোনাকো, মাল্টা, সাইপ্রাস, আন্দোরা, লিচেনস্টাইন, সান মারিনো ও ভ্যাটিকান সিটি ছাড়া ইউরোপের প্রায় সব দেশেই ছড়িয়ে আছে। ইউরোপের বাইরে এদের কার্যকলাপ আছে আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, জাপান, ইসরায়েল, তুরস্ক, মিশর, লেবানন, সিরিয়া, ইরান, ইরাক, সৌদি আরব, কুয়েত, ইয়েমেন, ওমান, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, কাতার, বাহরিন, জর্ডন, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভুটান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিন্স, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, ব্রুনেই, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, লাওস, মায়ানমার, দক্ষিণ কোরিয়া, উত্তর কোরিয়া, তাইওয়ান, হংকং, চিলি, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, পেরু, বলিভিয়া, প্যারাগুয়ে, উরুগুয়ে, ইকুয়েডর, কলম্বিয়া, ভেনেজুয়েলা, কোস্টারিকা, নিকারাগুয়া, হন্ডুরাস, এল সালভাদর, গুয়াতেমালা, মেক্সিকো, কিউবা, জামাইকা, হাইতি, ডোমিনিকান রিপাবলিক, পুয়ের্তো রিকো, ত্রিনিদাদ ও টোবাগো, ভেনেজুয়েলা, গায়ানা, সুরিনাম, ফরাসি গায়ানা, নাইজেরিয়া, ঘানা, আইভরি কোস্ট, লাইবেরিয়া, সিয়েরা লিওন, গিনি, সেনেগাল, গাম্বিয়া, গিনি-বিসাউ, মালি, বুরকিনা ফাসো, নাইজার, টোগো, বেনিন, মরক্কো, আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া, লিবিয়া, মিশর, সুদান, ইথিওপিয়া, ইরিত্রিয়া, জিবুতি, সোমালিয়া, কেনিয়া, উগান্ডা, রুয়ান্ডা, বুরুন্ডি, তানজানিয়া, মোজাম্বিক, জিম্বাবোয়ে, জাম্বিয়া, মালাউই, নামিবিয়া, বতসোয়ানা, দক্ষিণ আফ্রিকা, লেসোথো, সোয়াজিল্যান্ড, মাদাগাস্কার, মরিশাস, কমোরোস, সেশেলস, অ্যাঙ্গোলা, কঙ্গো, গ্যাবন, ইকুয়েটোরিয়াল গিনি, ক্যামেরুন, নাইজেরিয়া, চাদ

বাবু কালচারের বিভিন্ন দিক

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

প্রথমে একটি সংজ্ঞিকে টানা-হেঁচড়ে টিকে থাকা থেকে উদ্ধার করেছেন একদা ছাত্রের একটি অফিসে কাজে নিযুক্ত করেন। সেখানে প্রায়ই সকাল ১০টা ১১টা নাগাদ্ধি ছাত্রটি তখন সুযুক্ত হয়েছেন। গুরুদেব এসে ছাত্রটি কাছে ছুটে যেতে আড়ালে ডেকে এনে তার মুখোমুখি বসে অনেকক্ষণ ধরে নীচু গলায় গল্পগুজব করতেন। এরকমই ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এলাকায়, কলকাতা শহরে এই অফিস ছাড়া নেই। সেখানে টাকাপয়সা লেনদেনেরও অনেক সুযোগ। এইরকম একটা দেশলের মুখে মুখে ঘটি হয়েছিল। সেই সুত্রে ঐ কাজের ছাত্রটি দুটি গ্রাম হাতে পেয়ে তখন কলকাতা শহরের নিজে একদম মাঝে দুটি ছিল অস্থায়ত্ত। পাশেই একে ব্রাহ্মণদের হাতে গ্রাম একটি খুবসোজন ভূমন হয়ে গেল। এই কিংবদন্তির নায়ক ছিল রামদুলাল।

এই রামদুলালের মতো-না মুক্তাগাছি কলকাতায় পৌঁছোবার কিছুদিনের মধ্যেই মারা যায়। শিশু রামদুলালের ঘরে ছিল তার মাতামহ ও মাতামহী। মাতামহের খেলা ছিল ভিক্ষে করা, তিনিও বেঁচেছিলেন না আর বেশিদিন। বৃদ্ধা মাতামহী প্রথমে ঠেকিয়ে মদনমোহন দত্ত লেনে একে একটি বাচ্চাদাইয়ের বাড়িতে রাঁধুনির চাকরি খোঁজেন। রান্নাঘরের পাশে রামদুলালও একটা থাকার জায়গা পেয়ে গেল। মদনমোহন দত্তের বাড়ির ছেলেরা পুরু-শিক্ষকদের কাছে লেখাপড়া করত, রামদুলালও বসে থাকত তাদের পাশে।

কিছুদিনের মধ্যেই সে বাংলা পড়তে এবং কিছু কিছু ইংরিজি শব্দ বলতে শিখে গেল। ছেলেটির আগ্রহ দেখে মদনমোহন তাকে মাসিক পাঁচ টাকা মাইনেতে একটি চাকরি দিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই কাকে নিজে থেকে রামদুলালের পদোন্নতি হল, আর মাইনে হল দশ টাকা। কলকাতা তখনও এখন অনেক জায়গা আজও, জায়গা থেকে নামানো জিনিসপত্র নিলাম হত সেখানেই। রামদুলাল তার কোম্পানির পাশ থেকে সেখানে উপস্থিত থাকত এবং হিসেবপত্র বুঝে নিত। একদিন একটা ডুবে যাওয়া জাহাজ নিলামে চড়িয়েছিল। রামদুলালের কী খেয়াল হল সে সেই নিলামে ডাক দিতে লাগল। সেই ডুবে যাওয়া জাহাজে কী কী জিনিস আছে সে কখনও রামদুলালের চোখে দেখাই নেই। অনিশ্চয়তার মাতামহ খেলাটি, তবু সেই জন্যেই রামদুলাল তিনে নিল পাঁচ হাজার টাকায়। কয়েকটা জাহাজপত্র সই হয়েছে, এমন সময় একজন ইংরেজ সেখানে ছুটে এল।

নিলাম শেষ হয়ে গেলে সে রামদুলালের কাছ থেকে সেই জাহাজ কিনল, তিনগুণ, চল্লিশ টাকায় কিনে

নিয়ে আসি। শেষ পর্যন্ত রাজবল্লভ বিক্রি করতে বাধ্য হন এক লক্ষ টাকায়। অথচ কলকাতার বিডিটে এই জিনিশটি হাজার টাকারও কম মূল্যবানেরই আদালতের প্রাণ, আসল দুখ ঘটনা এ সম্পর্কে কিছুই জানে না। যা রাজবল্লভ ফিরে এসে তার সম্পত্তির সম্পূর্ণ তালিকাটিই খুলে বসল। তখন পুরো ৫৩ লক্ষ টাকাই তুলে দিল তার হাতে সরকার পুরস্কার হিসেবে। ৮৯৯৯৯৯৯ পুরো টাকাটাই ফিরিয়ে দিলেন রাজবল্লভকে।

সেই টাকায় রাজবল্লভ আবার এজেন্সির ব্যবসা শুরু করলেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই কলকাতার ধনী ব্যক্তি-সমাজের অন্যতম প্রধান হয়ে উঠলেন। হিসাবিদারে ও সম্পত্তিতে তাঁর মোট টাকা দাঁড়ায় কলকাতায় তাঁর সম্পত্তির মূল্য ছিল এক কোটি তেইশ লক্ষ টাকা। একালের টাকার সঙ্গে সেকালের টাকার দাম ছিল এখনকার চেয়েও বেশি।

এই রাজবল্লভের মতন তখন অনেক ধনকুবের জন্মান বিদেশি থেকে গিয়ে ধনী কিংবা জমিদার হয়ে উঠেছিল এবং পুরুষেই। কলকাতা তখন রাজবল্লভের মতন সাহেব দেখিয়ে আসা যেমনটি। কারণ তার ইংরেজীটাই ছিল সত্য। চুরি, জালিয়াতি, প্রবঞ্চনা এবং খুন, এই সবই ছিল রাতারাতি ধনী হয়ে ওঠার পক্ষে কয়েকটি অবশ্যপ্রিয় অস্ত্র। ১৯৮১-তে প্রকাশিত The Native Aristocracy And Country of India নামের বইটিতে কলকাতায় অনুসন্ধানের যে সব পরিসংখ্যান পাওয়া যাচ্ছে, তাতে দেখা যায় যে ইংরেজের বাঙালি করে এবং এ দেশের সাধারণ কানুষদের চকিতেই কিছু কিছু ধনকুর ও গুরুকর ব্যক্তি হয়ে ওঠবার কিংবা রাজা হয়ে উঠেছেন।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একেবারে প্রথম আমলে একজন খুব প্রতিপত্তিশালী কর্মচারী ছিল গোবিন্দরাম মিত্র। তাকে মেজর চেম্বার্স একে চাকরি দিয়েছিলেন। এই গোবিন্দরাম ক্রমশ কলকাতায় পত্তনের প্রথম দেশীয় ট্যাক্স-আদায়ের হয়েছিল। সেই অভিযুগে তাকেই কলকাতার প্রথম এজেন্সীর মেয়র বলা যেতে পারে।

> *"বড় বড় সাহেবরা কী রকম ঘুষ নিতেন, তারও একটা হিসেব পাওয়া যায়। সিরাজউদ্দৌলাকে সরিয়ে মিরজাফরকে নবাবের গদিতে বসাবার জন্য ক্লাইভ পেয়েছিলেন ২১১,৫০০ পাউন্ড, ওয়াটস ১১৭,০০ পাউন্ড, কিলপ্যাট্রিক ৬০,৭৫০ পাউন্ড ইত্যাদি। আবার মিরজাফরের মৃত্যুর পর তার ছেলেকে নবাবি দেবার জন্য ক্লাইভ আবার ঘুষ পেয়েছিলেন ৫৮,৩৩৩ পাউন্ড।"*

গোবিন্দরাম ছিলেন কোম্পানির সাহেব-কর্মচারীদের আস্থা ও বিশ্বাসের পাত্র। তাঁর নাম ছিল ব্ল্যাক জমিদার বা ব্ল্যাক জেন্টু। গোবিন্দরাম স্থানীয় লোক-জনদের ওপর অত্যাচার করে, জুলুম চালিয়ে বহু টাকা আদায় করত এবং সেই টাকার অনেকটা অংশই সে নিজের পকেটে জমত। গোবিন্দরামের মাইনে ছিল মাসে পঞ্চাশ টাকা, কিন্তু তার চলনচলন ছিল বিলাতী জমিদারদের মতন। কুমোরটুলিতে বিরাট বাড়ি বানিয়েছিল সে এবং চিৎপুরে নবরত্ন মন্দির বা নাট-নিকেতনের প্রতিষ্ঠা করেছিল। ব্রাহ্মসমাজ ট্রাজেডি-প্যাথ হলও জেনে আমরা এক সময় গোবিন্দরামের ওপরওয়ালা হিসেবে নিযুক্ত হয়ে লিন্ডসিনের নবাবী গোবিন্দরামের নামে প্রতিযোগিতার অভিযোগ আনলেন। কোম্পানির প্রাপ্য ঘর টাকা সে আত্মসাৎ করেছে। গোবিন্দরামের কাছে হিসেব চাওয়া হলে সে প্রথমে যে কাগজপত্র দাখিল করে তাতে ঘাটতি ধরা পড়ে। ফলে এজেন্সি ঘর তছরুপের তথ্য সংগ্রহ করে প্রমাণ করলেন যে গোবিন্দরাম কোম্পানিকে মোট কতগুলো টাকা ফাঁকি দিয়েছে। এবং তখনকার দিনের ঘুষ ছোটখাটো ছিলেন যে অনেক বেশি টাকা আদায় করে বিপুল সম্পত্তি করেছে। এ জন্য তাকে চাবুক মারার শাস্তি ও তাকে নিয়ে তার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হোক। গোবিন্দরামের অবশ্য কোনো শাস্তিই হয়নি। কারণ সে এক লক্ষ টাকা ঘুষ দিয়েছিল। কোম্পানির অনেক বড়কর্তাকে সে নিয়মিত ঘুষ দিত বলেও শোনা যায়। কাউন্সিলের অনেক সদস্যই এই ব্ল্যাক জমিদারের বন্ধু ছিল। গোবিন্দরাম তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের লিখিত উত্তর দিয়েছিলেন দুবার, সে দুটোই কোম্পানির ইতিহাসে দেখা। তাতেই ধরা, সেগুলো লিখে দিয়েছিল তার চুরির ব্যাপারে ভোলে ইংরেজ।

রামচাঁদ নামে কোম্পানির আর একজন কর্মচারীর নাম জানা যায়। তার মাইনে ছিল ষাট টাকা। মৃত্যুর সময় তার সম্পত্তির মূল্য ছিল এক কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা। নবাব সিরাজউদ্দৌলার কোলাঘাট দুর্গটির জিম্মাটা অবশ্য পেয়েছিল এই রামচাঁদ। আর ক্লাইভের বক্সিগিরি কর্মচারী মুনসি নবকৃষ্ণ, (পরে রাজা) এরও মাইনে ছিল ষাট টাকা। পলাশির

ম্যানহোলের ঢাকনি খুলে রাখুন

ছিল পাঁচ পাইপের বেশি। বড় বড় সাহেবরা এই রকম দুই নিগ্রোহোরও একটা হিসেবে পাওয়া যায়। ভিক্টোরিয়াকে সরিয়ে ভিক্টোরিয়ার নবাবের পদবিতে বসাবার জন্য ক্রাইক নেগোসিয়েশন ১১১,৪০০ পাউন্ড, ব্রাউনিস ১১৭,০০ পাউন্ড, কিলপ্যাট্রিক ৯৯,৭৫০ পাউন্ড ইত্যাদি। অবশ্য ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পর তাঁর ছেলেকে নবাবি খেতাব দেবার সময় ক্রাইক ব্রাদার্সের দাবি ছিল মাত্র ৩৫,০০০ পাউন্ড। অথচ ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ইতিহাসে এই ক্রাইক ব্রাদার্সের নাম খুব খোদাইকরে লেখা আছে। ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের সময় ক্রাইক ব্রাদার্স ৭৫,৫৫০ পাউন্ড, ভিক্টোরিয়ার জুবিলির উৎসবের সময়ে ক্রাইক ব্রাদার্স ৭৮,৫৫৩ পাউন্ড, ইলবার্টের সময় ৬৫,৩৩৭ পাউন্ড। এরা ছাড়াও পঁচিশ-তিরিশ হাজার পাউন্ড পেয়েছিলেন এমন অনেকেই।

সেকালে কোম্পানির চাকরি পাওয়াটা ছিল ভাগ্যের একটা উজ্জ্বল দিক। মুঘল আমলে কোম্পানি এদেশে ব্যবসা করতে এসে ছোট ছোট বন্দরে ঘাঁটি গেড়ে বসেছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশ থেকে জাহাজ ভরে ভরে নিজের মালপত্র, সওদা এবং ট্রেড-গুডস নিয়ে যেত ইংলন্ডে। কিন্তু সেই সময়ে দূরে ইংলন্ড থেকে এদেশে এসে বিক্রি করার মতন বিশেষ কোনো জিনিস ছিল না। কিন্তু প্রত্যেকটি সমুদ্রযাত্রে খালি জায়গা অনেক থেকেই নিরাপদ নয়। খালি জায়গা সমস্তটাই জলে ভর্তি থাকে। সেইজন্য প্রথম জাহাজগুলিতে মাটি এবং ঘাস জমা হত। বন্দরগুলি মাটি এবং ঘাস সেই মাটি থেকে যখনই সম্ভব হত, সেখানে চলত ব্যবসা। সেই ব্যবসায় ভারতের তিনটি জিনিসের জন্য ইংলন্ডে খুব চাহিদা ছিল। তার মধ্যে তুলো ছিল সবচেয়ে বড় জিনিস। তারপর ছিল নীল এবং তৃতীয় ছিল সোরা। সোরা

বিধবার পরিবারগুলির মধ্যে বড় ভাসুরের হিস্যাই হচ্ছে নুন। বিশিষ্টি নুন খেয়ে সে মহলের কাজগুলি ইংরেজদের এগজাম করছে। তবু হিন্দু বিধবারা সেই নুন স্পর্শ করছে না।

কলকাতার এই নয়া ধনী-শ্রেণী অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে কোনো উৎপাদনমূলক ব্যবসায়ে নামেনি, নিজস্ব কোনো শিল্প-বাণিজ্যের দিকে ঝোঁকেনি। তারা ইংরেজদের কাছে বানানি কিংবা দুধের ব্যবসাই করছে। শুধু ঘর বাড়ে এক ধনী মধ্যবিত্তশ্রেণীর সমস্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে কয়েক কোটি টাকা ধার দিয়েছিল। এরা কেউ কেউ বড় বড় জমিদারী কিনে নিয়ে সমাজে সম্ভ্রান্ত হয়ে উঠলেন এক সময়ে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে হিন্দুস্থানি, ফরাসডাঙ্গা, চন্দননগরে ইংরেজদের সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্যই প্রায় করায়ত্ত করেছিল। ইংরেজরাও সেইরকম জীবন-যাপনই শুরু করেছিল। ইংরেজ বিপুল অর্থসম্পদ পেয়ে বসে ঘুরে গিয়েছিল তাদের, সেই সব অধিকাংশে ইংরেজেরাই শিক্ষা-সংস্কৃতিতে কোনো বালাই ছিল না। মদ্যপান ও বাঈজিবাড়ে হাজার টাকা খরচ করাই কালের যতন। এক-একজনের পঁচিশ-ত্রিশটি জন দাস-দাসী ছিল। বিশটি ঘোড়ার গাড়ি-পালকীর সংখ্যা ছিল একজনে সচরাচর জন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে কলকাতায় ইংরেজ পুরুষের সংখ্যা ছিল চার হাজার, আর মহিলা মাত্র আড়াই শো। অধিকাংশ ইংরেজই এ দেশী মেয়েদের রক্ষিতা হিসেবে রাখত। বৈধভাবে তাদের মধ্যে কেউ কেউ স্ত্রীর মর্যাদা পেয়ে গেছে। সুপ্রিম কোর্টের অ্যাটর্নি উইলিয়াম হিকি তাঁর স্ত্রী সালটোর মৃত্যুর পর একজন এদেশীয় উপপত্নী রেখেছিলেন, তার নাম 'জবানালী'। পার্ক সার্কাসের একটি কবরখানায় একটি ছিল বছরের মেয়ের সমাধির ওপর লেখা আছে, 'মোস্ট লভেবলি অ্যান্ড বিলাভেড ডটার অব হেনরি ও বিবি আন্না বিবিজান।' সিপাহী বিদ্রোহের পর বিবি মেয়েদের সঙ্গে এ ধরনের সাহেব আদেখটা কমে যায়।

ইংল্যান্ড থেকেও দলে দলে ফি-বছরই শ্রেণীর ভিতো সংগ্রহ করে মেয়েরা স্বামী ধরার আশায় চলে আসত কলকাতায়। জাহাজ ভাড়া ছিল পাঁচ হাজার টাকার কাছাকাছি। এই টাকাটা উসুল করার জন্য তারা অষ্টাদশ শতাব্দীর স্বামী ধরার আশায় নিজেদের নতুন মেতে উঠত প্রতিযোগিতায়। ইংরেজ-পাড়ার প্রতিটি সোসে থাকত পার্টি এবং বৈ-যজ্ঞের। মেয়েদের উপলক্ষ করে পুরুষদের ডুয়েলে লড়াই হত মাঝে মাঝে। এই সবের ওপরে হেস্টিংস ও ফিলিপ ফ্রান্সিস-এর ডুয়েলের কাহিনীটাই বেশি বিখ্যাত। যদিও ডুয়েলটি ছিল অন্য কারণের। সেই ঘটনার পর কর্নওয়ালিস লাইব্রেরির আড়াআড়ি একটি রাস্তার নামই হয়ে গিয়েছিল ডুয়েলস এভিনিউ।

খুন, জোচ্চুরি এবং সাধারণ মানুষকে নিপীড়ন করে যে সব ইংরেজ হঠাৎ বড়লোক হয়ে উঠত, তাদেরও বলা হত নবাব। এরা ঘুষ্যাতে টাকা ওড়াত এবং এদের দেখে কবার জন্য আরও অনেকে হতাশার ছিল। ভাড়াটে, পার্টি, উপঢৌকন ও মেয়েদের পালাগানেও উপার্জন করত বহু টাকা। পার্টিতে বিকাল এক একটি নিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য ফি নিত ১৫ থেকে ২০ মিনিট। ইংরেজদের একটা সাধারণ থিয়েটারের টিকিটের দাম ছিল ১২ মিনি। টিকিটলেকের ফি ১০ মিনি। চতুর্দিকে ফর্দুধুমার ছড়াছড়ি। সেকালে একজন পর্যটক মন্তব্য করেছিলেন, Gold mohurs are dealt about in Calcutta as ball counters in England.

যদি বাঙালি ধনীরাও প্রথমদিকে অনুকরণ করত এই ধরনের ইংরেজদের। এই বাঙালি বাবুশ্রেণীর খেলো সংস্কৃতি-বোধ ছিল না। শিক্ষাদীক্ষাও ছিল না। সাহেবদের সঙ্গে পাল্লা দিতে টাকা খরচ করাটাই এদের বিরাট কৃতিত্ব বলে মনে করত। জোলজোহের দিতে কিংবা, আগে যাবের প্রাদ্ধে এক একজন খরচ করেছে লক্ষ-লক্ষ টাকা। এক বাবু ভাদ্র গোবিন্দ বেক্রোসের বিয়ে দেবার জন্য খরচ করেছিল দু-লাখ টাকা।

সেই সময় থেকেই দুর্গাপূজো বাঙালির প্রধান উৎসব হয়ে ওঠে। এই দুর্গোৎসবে কিন্তু ধর্মের ব্যাপার ছিল অকিঞ্চিৎকর।

এক একজন ধনী হাত বাড়িয়ে দুর্গোৎসবের জন্য টাকা খরচ করেছে, কার চেয়ে কম বিলাসিতার প্রয়োজন করেছে, সেই নিয়েই ছিল আসল বিষয়। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র দুর্গোৎসবের সময় বড় বড় সাহেবদের নেমন্তন্ন করতেন এবং তাদের মনোরঞ্জনের জন্য বাঈ-বাজনা ও বাইনাচের ব্যবস্থা করতেন। ঠনঠনে কলকাতার রাজা নবকৃষ্ণ এবং অন্যান্য ধনীরাও দুর্গোৎসবের সময় বিশিষ্ট অতিথিদের জন্য অষ্ট্রীল নাচগান এবং বারবনিতার ব্যবস্থাই বেশি জোর দিতেন।

বড় গাছের নিচে কোন মেলের ব্যবসা জমবে, সেই নিয়ে এই সব এক একটি গজেন্দ্রগামিনীকে নিয়ে বাবু মোসাহেব, বাঈজি এবং অষ্ট্রীলরা জোড়ের ভিড় জমাত। এদের মনোরঞ্জনের জন্য বহু পেশাদারীও গজিয়ে উঠল পাড়ায়। বাবুদের পক্ষে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে রাত কাটানো ছিল লজ্জার ব্যাপার। পেশাদারের নিয়ে তুলি করা হত উচ্চ অভিজাতদের ঘরে। তাদের উপরেই পেশাদারের প্রভুর চাহিদা ছিল। এক বাবু শ্রাদ্ধবাড়ী পুজোর সময় এক হাজার পেশাদারকে দাসি পার্টি দিয়েছিলেন। পুলিশের ঘাড়ে বাবুরা ইয়ার-বন্ধু ও পেশাদারের ভিড় পালন করার ভার দিতেন। কলকাতার গলা সেইসব রাতে নাচ-গান-বাজনা জমজমাট। এই

মহানগরীর তিন ভাগই জল।
বোমা ফাটবেনা।

নি ব ন্ধ

"গ্রামে শত শত পরিবার ধ্বংস হয়েছে কলকাতায় ধনীদের এক রাত্রির ফুর্তির টাকা জোগাবার জন্য। সেই সময় থেকেই সহায়-সম্বলহীন মানুষদের যাত্রা শুরু হল কলকাতার দিকে।"

মুচলেকা। এক জায়গায় ইংরেজ লর্ড বলেছেন, তিনি হিন্দিস্থানী ছাড়া আর কিছু বুঝতে পারেন না। ঔপনিবেশের আগে, একদিন কৃষক ও অর্থকুল প্রোলেটারিকে সঙ্গে নিয়ে একটা জনপদ নিজেদের করায়ত্তে নিয়ে সবাই মিলে দেশের কাঠামোটি নির্মাণ করেছিলেন প্রায়।

এক সময় ব্রাহ্মণে নামে মিথি লাল জাতী বেশি জনসংখ্যা ছিল। লোকে তাদের বলে ছিনতাই। এক জনের ভূমাধিকারীর মোহরাদের দাম ছাড়ি টাকা। তাদেরকে ফলিয়াক অর্থাৎ ছাড়ি এবং বিয়াদের প্রচলন করতে থাকে। নট-ব্রাহ্মণদের শিক্ষা-সংস্কার নিয়ে অনুভূলাল কাজ করে লিখেছিলেন — ছাড়ি আর ও রকমের ঘুষের ইতিহাস/বিভিন্ন কড়িতে যাই খাইতে দিতেন/ বিবাহ খাইয়া মোর জন্মিয়াছে ছাড়ি/৭টা বলে নিয়ে আয় বি-হাইড ছাড়ি/ তখন ছাড়ি ছিল ঘোড়ার ঔষধ/পাঁচ সাত ছাড়িতেও সারে না এর।

'ছাড়ি' অর্থাৎ প্রথার অভিযোগী বিদেশিনী নারী। সত্তুল মাকালেরা ঠিক কখন সালের ব্যবহার জানতেই না। পরিচিতিবোধ ছিল না, অল্প বয়সেই মারা যেত অনেকে। কলীয়ারা বিয়ে এবং ইন্দিরাজ মুখোপাধ্যায়ের মতন লিখবার বাঙালিরা হয়ারাদের ফলেই অন্ধকারে আলো জ্বলে। মুখরোচক ও পলাশ শ্রেণীর কলীয়া যখন প্রমিনার হয়ে বসল, তখন তারা আর একরকমভাবে দেশ ও সমাজের ক্ষতি করেছে। এরা বসে থাকত কলকাতায়, কর্মচারীদের দিয়ে জমিদারি পরিচালনা করত। সেইসব কর্মচারীরা কড়াকড়িভাবে যে প্রজাদের শোষণ-পীড়ন করত, এই সব জমিদাররা তার খবরও রাখত না, প্রায়ও করত না। জমিদারির আয়ে এরা কলকাতায় বিলাস-বাসিকাতের প্রতিযোগিতা চালাত নিজেদের মধ্যে। প্রথমে শত শত পরিবার ধ্বংস হয়েছে কলকাতায় ধনীদের এক রাত্রির ফুর্তির টাকা জোগাবার জন্য। সেই সময় থেকেই সহায়-সম্বলহীন মানুষদের যাত্রা শুরু হল কলকাতার দিকে।

সেটা অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে কলকাতায় অনেক বাঙালি ধনী হয়ে উঠেছে। এরা এই শহরের অনেক অঞ্চল বড় বড় প্রাসাদে ভরিয়ে দিয়েছে কিন্তু তাদের অধিকাংশেরই ইতিহাস কালিমালিপ্ত। কিন্তু দয়া-দানে ও রক্ষিত-নিধনে তারা দেশের জন্য কিছুই করেনি। উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশকে এই অবস্থার কিছুটা বদল হয়। মাঝে মাঝে একটা শিক্ষিত শ্রেণী গড়ে ওঠে। বড়লোকের ছেলেদের মধ্যেও কারোকে পড়ার ঝোঁক চালু হয়। ইংরেজি সাহিত্যের মাধ্যমে তারা বাস্তবাদি শাসক-নির্ধারিত ইংরেজদের চলনে সমাজ-পত্রের ইলাস্ট ও ইউরোপীয় সভ্যতা বিষয়ে জানতে পারে। এরাই ধর্ম ও সমাজসংস্কারে ব্রতী হয়। দেশীয় ভাষিকদের নিজস্ব পত্র-পত্রিকা বেরোয়ত থাকে, বাংলা ও ইংরিজিতে অনেক সুরুচ লেখকের আবির্ভাব হয় এই সময়ে। ধর্মপাল-বিরোধী আন্দোলনও এক হয়, তাতে অবশ্য অনেকে কান দেয়নি। তবে শিক্ষিত উচ্চবিত্ত সমাজে ভালো পরিবারী নিয়ে বাবিয়ানা নিশ্চলীয় ও ক্রমশ পরিহারযোগ্য হয়।

সত্তর দশকে কলকাতার বাবু-কালচারের কথা ছড়িয়ে পড়েছিল, যে বাবু কালচার কথাটি ঔপনিবেশিক ব্যঙ্গাত্মক। ঠাকুর ও রায়চৌধুরীদের নিয়ে নানারকম কাহিনী আজো-প্রচলিত। এই সব ইতিহাস গল্পই মানুষদের বেশি আকৃষ্ট করে। কিন্তু এই বাবু-কালচারেরই কোনো কোনো প্রতিনিধি ধর্ম-সংস্কার ও সমাজ-সংস্কারে অগ্রণী ভূমিকা নেন। শিক্ষা-বাণিজ্যেও তাঁরা ঋণ দিতে শুরু করেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর কম বিলাসী পুরুষ ছিলেন না। তবু তাঁকে উচ্চৈঃস্বরে বিলাতি শিক্ষাপতি। এক সময় তাঁরই ব্যবসায়ীদের মধ্যে তাঁর স্থান ছিল দ্বিতীয়। তখন দ্বিতীয় ছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র, তাঁরও বাংলা ছিল চমৎকার।

এখন থেকে কলকাতায় আর একটি শ্রেণিবর্গের প্রাধান্য দেখা যায়। কলকাতায় ব্যারিস্টার শিক্ষানবিশরাও সঙ্ঘ গড়তে এগিয়ে। তাদেরও প্রথম পুরুষ ও মহিলা প্রায় পুরোপুরি পাশ্চাত্য। আলোপাশি তিনিদেরও প্রথম পাশ করা ডাক্তার হয়ে বেরোয় বাঙালিরা। ইংরেজদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে বাঙালিরা নিজেদের সাহিত্যে সমান পদ লাভ করে। বাঙালি লেখকরা ইংরিজিতে লিখেই ইংরেজদের এই ব্যাপারে ভুলের সমালোচনা করতে পারে।

১৮৮৯ সালে কেওড়াতে ব্যারিস্টার এসেছিলেন বন-ঐশ্বর্যে পূর্ণ দার্জিলিং শহর প্রবাসে। বিখ্যাত ব্যারিস্টার এবং জমিদার প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাঁকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন নিজের প্রাসাদে। মহারাজের সম্বর্ধনার উপলক্ষ্যে সমবেত নাচগান হয়েছিল, তাঁকে বলতে দেওয়া হয়েছিল একটি চমৎকার ব্যারিস্টারি নিয়ে। তাঁর সামনে রাখা ছিল মণিমুক্তো খচিত তলা এক একটি তলোয়ার। সেওয়ান মহারাজের সেই তলোয়ারটি তুলে নিয়ে তিনি বিশ্লেষণ করেছিলেন, বাঙালিরা এখনও তলোয়ার ব্যবহার করে থাকি।

প্রসন্নকুমার ঠাকুর উত্তর দিয়েছিলেন — না। বাঙালিরা অনেকদিন ধরেই তলোয়ার ব্যবহার করতে জানে না। কিন্তু বাঙালিরা এখন কলম ব্যবহার করে। আর তলোয়ার ব্যবহার করার প্রয়োজনও আমাদের নেই।

পরে অবশ্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে বাপক্ষ বয়ান শুরু করেন সবার বাঙালিরাই প্রথম বোমা বানাতে শুরু করে।

প্রসঙ্গ ঃ মূল্যবোধ

সায়নদেব মজুমদার

আজকাল মূল্যবোধের প্রশ্ন প্রায় প্রত্যহিক আলোচ্য হয়ে উঠেছে। আধুনিক যুগজীবনে মূল্যবোধের অবিশ্বাস্য ও অকল্পনীয় পরিবর্তনের প্রশ্নে সমাজ সচেতন মূল্যবোধের বিভিন্ন উপাদান যেমন ঐতিহ্য, প্রেরণা, মূল্যবোধের ভিত্তিভূমি ও বিশ্বাস ভাবাবেগ-আবেগের মূল্য কতখানি আছে—এই পরিপ্রেক্ষিতে 'মূল্যবোধ' বিষয়টির যথাযথ অনুসন্ধান একান্ত জরুরি হয়ে উঠেছে।

সৃষ্টিলগ্নের প্রথম মানুষের সৃষ্টি হয় প্রকৃতির শারীরিক আঘাত নিয়েই। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বাসনাহত, ক্ষুন্নচরিত্র, কণ্ঠিতোর, ব্যক্তিমনীষারা প্রকৃতির মতন উঁচুতে ওঠে এবং শ্রীক্ষ থেকে উঁচুতরে হয় সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই। আর সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে তাল রেখে কালের ক্রমপরিবর্তনের ধারা চলতে থাকে, উঁচুর থেকে উঁচুতরে হয় মানবসভ্যতা। এগিয়ে যেতে থাকে মানুষ। মানুষের এই অক্লান্ত-অগ্রগতির সঙ্গী হল বস্তুসাধী সভ্যতার বিস্ময়কীর্ণ শক্তি। মানুষের জীবনকে জীবনযাত্রার স্তরে করতে লাগল এক বিস্ময়-চেতনা। এইভাবে জীবনযাত্রার উঁচুতি ও অন্তরে মিশ্র চেতনার প্রভাব যুগের সমস্তরেই চলতে থাকে এই বর্তমান সভ্যতা। আজও এই আধুনিক মানুষ এই বৈশবীয়োগে পৌঁছেনায় মুখরিত। জীবন-সংগ্রামে ক্লান্ত, রিক্ত, বিকল। নতুন করে মূল্যবোধের সন্ধানে ছুটে চলতেই যেন আজকী, জীবনে শান্তি করেও মানুষের চেতনায় আজও। মূল্যবোধের এই ক্রোজাল-যুগে, আশা-আকাঙ্ক্ষী মূল্যবোধের কথা তাই বড় বেশি করে মনে পড়ে।

> *"সাম্প্রতিককালে এই পৃথিবীতে*
> *বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে*
> *এই শাশ্বত মূল্যবোধের অভাব।*
> *যন্ত্রনির্ভর সভ্যতায়*
> *মানুষ জীবনযাত্রায় যান্ত্রিক হয়ে উঠছে।*
> *কর্মের প্রাচুর্য থাকলেও*
> *মর্মের দারিদ্র বড় বেশি করে চোখে পড়ছে।"*

মানুষে মানুষে, হৃদয়ের, ভালবাসা, কর্তব্যবোধ, দায়িত্ববোধ নিয়েই আজ ও যুগে মূল্যবোধের। এরা এই অন্তর্নিহিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটি মানুষকে ধর্মে ও কর্মে সচেতন করে তোলে। তোলেনা একটি বৈশিষ্ট্যের অনুপস্থিতি বা বজায় মূল্যবোধকে টেনে নিয়ে তোলে। অন্যথা আমরা পৌঁছে অবস্থায়, অর্থাৎ অধুনার নাস্তিক্যের মধ্যে পড়ে। অধুনা মানুষ জীবনযাত্রায় যান্ত্রিক হয়ে উঠেছে। জন্মের অনুপূর্ব দাবানলের আগের সংখ্যা বহু বেশি করে চোখে পড়ছে। প্রাচুর্যে ভরপুরটি (বস্তুগত ও সংস্কারগত এই ক্ষেত্রেদ্বিধাতেও) কালের সর্বত্রই প্রাণের অভাবকে। আত্মকেন্দ্রিকতা, দুর্নিবারী বাজারে মানুষ ক্রমে একাকী। সাম্প্রদায়িকতার ধারালো হাত মানবিকতায়, ভালবাসার স্পৃহা অসম্পৃক্ত। মানুষে-মানুষে হিংসায় ক্ষুন্নতা আজ অন্তর্নিহিত। আজকের দুঃখ আর সুখের বিভিন্নতায় কৃত্রিমতার প্রাধান্য উচ্চকণ্ঠিত। ব্যক্তিজীবনে, সমাজজীবনে, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে আজ মূল্যবোধের কথা। আত্মকেন্দ্রিকতা আমাদের মূল্যবোধে আঘাত হানছে ক্রমাগত। ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, জয়-পরাজয়ই আজ বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। মূল্যবোধের অভাব-বোধই। সমস্যা থেকেই সভ্যতার অন্তরতম আমাদের প্রশ্ন করতে শুরু করেছে। প্রতিমুহূর্তে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রবল চাপ প্রতিনিয়ত করতে করতে নিরন্তর সংগ্রাম করে চলা মানুষ প্রায়ের ক্ষেত্রে অনিচ্ছাকৃতই নিজের মূল্যবোধকে বিসর্জন দিচ্ছে। সাম্প্রতিক যান্ত্রিক সভ্যতার ফলে মানুষ যন্ত্রের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হওয়ায় আমাদের নৈতিক মূল্যবোধকে। জীবন বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিকৃত। জীবিকার স্ব স্ব ক্ষেত্রে ফলত দারিদ্র ও অর্জিত পালনের বিধি বর্তমান।

অনুষ্ঠান মানসিকতা, নৈতিকতা, ভালবাসা, কর্তব্যবোধ প্রভৃতি নিয়েই আজ ও যুগে মূল্যবোধের। এরা এই অন্তর্নিহিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটি মানুষকে ধর্মে ও কর্মে সচেতন করে তোলে। তোলেনা একটি বৈশিষ্ট্যের অনুপস্থিতি বা বজায় মূল্যবোধকে টেনে নিয়ে তোলে। অন্যথা আমরা পৌঁছে অবস্থায়, অর্থাৎ অধুনার নাস্তিক্যের মধ্যে পড়ে। অধুনা মানুষ জীবনযাত্রায় যান্ত্রিক হয়ে উঠেছে। জন্মের অনুপূর্ব দাবানলের আগের সংখ্যা বহু বেশি করে চোখে পড়ছে। প্রাচুর্যে ভরপুরটি (বস্তুগত ও সংস্কারগত এই ক্ষেত্রেদ্বিধাতেও) কালের সর্বত্রই প্রাণের অভাবকে। আত্মকেন্দ্রিকতা, দুর্নিবারী বাজারে মানুষ একাকী। সাম্প্রদায়িকতার ধারালো হাত মানবিকতায়, ভালবাসার স্পৃহা অসম্পৃক্ত। মানুষে-মানুষে হিংসায় ক্ষুন্নতা আজ অন্তর্নিহিত। আমাদের দুঃখ আর সুখের বিভিন্নতায় কৃত্রিমতার প্রাধান্য উচ্চকণ্ঠিত। ব্যক্তিজীবনে, সমাজজীবনে, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে আজ মূল্যবোধের কথা। আত্মকেন্দ্রিকতা আমাদের মূল্যবোধে আঘাত হানছে ক্রমাগত। ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, জয়-পরাজয়ই আজ বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। মূল্যবোধের অভাব-বোধই। সমস্যা থেকেই সভ্যতার অন্তরতম আমাদের প্রশ্ন করতে শুরু করেছে। প্রতিমুহূর্তে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রবল চাপ প্রতিনিয়ত করতে করতে নিরন্তর সংগ্রাম করে চলা মানুষ প্রায়ের ক্ষেত্রে অনিচ্ছাকৃতই নিজের মূল্যবোধকে বিসর্জন দিচ্ছে। সাম্প্রতিক যান্ত্রিক সভ্যতার ফলে মানুষ যন্ত্রের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হওয়ায় আমাদের নৈতিক মূল্যবোধকে। জীবন বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিকৃত। জীবিকার স্ব স্ব ক্ষেত্রে ফলত দারিদ্র ও অর্জিত পালনের বিধি বর্তমান।

সে সমস্ত সমস্যা থেকেই চিরকালের জন্যে মুক্তি করতে হয়। ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক এমনকি নিজস্ব সৃষ্টির ক্ষেত্রে এমনটি হয়েছে। এর মর্মকথা হলো এটাই যে আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থান্বেষী। যখন এক জীবনের সঙ্গে আর এক জীবনের সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে ওই মূল্যবোধের অভাবেই অন্যথা বিরোধাবসানের পথটাই খুঁজি। রাষ্ট্রিগত, দেশগত, শিক্ষার সমস্ত সম্পর্কের জটিলতার নিরসনে এটাই স্থায়ী ও কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে। সমস্ত বিশ্বের এই মূল্যবোধের অভাব আজকের বিশ্বেরও সংকট — এইজন্য আজ আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ক্ষমাহীনতা, পরস্পরের দোষ-ত্রুটি মার্জনাহীনতার মনোভাব আজ ভয়ানকভাবে এসে দেখা দিয়েছে। জাতীয়তার নামের মূল্যবোধের অভিমানকে নিজস্বতার নিজস্ব দোষগুণ শত্রু-মিত্রতার ভাবে আমরা দোষের গুরু-গুরুত্বটাকে বড়ো করে দেখি। কিন্তু কিভাবে এসব ছিনিয়ে আনা যাবে সেই আত্মিক, নৈতিক মূল্যবোধ? এই ভাবনাকে আজ আমরা সাধনা করি। মনীষীদের জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তাঁরা ব্যক্তির মূল্যবোধ-জাগরণের উপরেই জোর দিয়েছেন, সকল সমস্যার মূল কারণ এই মূল্যবোধহীনতা — এ মত পোষণ করেছেন। আজ এসবের মূলোচ্ছেদ প্রয়োজন। আজ এসবের মূলোচ্ছেদ অত্যন্ত প্রয়োজন। রাষ্ট্রি বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, মহাত্মাজীর মতো নৈতিক মূল্যবোধের

> *"মানুষকে না ভালোবাসলে*
> *প্রকৃত মানুষ হওয়া যায় না-*
> *এই বোধটুকুই*
> *আজকের প্রজন্ম, আগামী প্রজন্ম*
> *সকলের মনে স্থাপন করাই*
> *আজ সবচেয়ে জরুরি। কর্মী না হয়ে*
> *ধর্মভীরু হওয়াই আজ দায়।"*

পুজারী জাতীয় মনীষীদের জীবনোপলব্ধির অনুসরণ করা নয়, জীবনচর্যার মূল ভিত্তে হবে। এঁদের জীবনের আলোকে মানুষের মধ্যে মূল্যবোধের সঞ্চার ঘটাতে হবে। এই সঞ্চারণের ধারাই মানুষ ধর্ম ও দেশকে জানবে, ভালোবাসবে। বুঝতে শিখবে একটিকে নিলে কি করে অন্যটি হারাতে হয়। মানুষকে না ভালোবাসলে প্রকৃত মানুষ হওয়া যায় না- এই বোধটুকুই আজকের প্রজন্ম, আগামী প্রজন্ম সকলের মনে স্থাপন করাই আজ সবচেয়ে জরুরি। কর্মী না হয়ে ধর্মভীরু হওয়াই আজ দায়। স্বামীজীর ভাষায় 'জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর' — এই চেতনাকেই উপের ধরতে আজ জরুরি। তাই স্বামীজীর আদর্শ মানুষের মাধ্যমে, মূল্যবোধের নতুন করে সঞ্চারণের দায়ে, বিশ্ব মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। প্রয়োজন মনোভাবের। সে মনোভাবই নিজের অজান্তে মূল মূল্যবোধকে জাগাতে পারে, মূল্যবোধ মূল্যবোধকে হাতে ধরে এক নতুন মানুষের জন্ম দিতে পারে। এই মূল্যবোধের অভাবেই আমরা বারবার ব্যর্থ হচ্ছি। বিশ্ব-মানবিকতার অভাব মূল্যবোধের অভাবেই আমরা খুঁজে পাচ্ছি আমাদের ঐক্যবদ্ধের পথ। ঐক্যবদ্ধের আমাদের নিজস্বতার সচিত্রায়নের মধ্যেকার ব্যক্তি মূল্যবোধ আজ বড়ো বেশি ক্ষুণ্ণ হচ্ছে, ভালোবাসাই আজ বড় দরকার। তবু আশার কথা এটাই যে ছাত্রসমাজ তবু এর ব্যতিক্রম। এখানে মূল্যবোধকে বড়ো করে দেখার আকুতিরই সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। প্রয়োজনে জীবিকার প্রাথমিক মূল্যকে বড় করে জীবনের মূল্য মূল্যবোধে আমরা ফিরে যেতে চাই — এ মৌল শপথের স্বপ্নও দেখা যাচ্ছে। 'ছাত্রসমাজে সেই মূল্যে কারণ জনপ্রিয়' — অভিযোগের এ প্রসঙ্গটিও 'ধর্ম' ও আমাদের মূল্যবোধের পথে ওঠা জীবনের ধর্ম কিন্তু আমাদের নয়,এই এক ধরনের।

একটি বিতর্কিত রাজকীয় বিবাহের ঐতিহাসিক দলিল

ডাঃ বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[illegible]
[illegible]
[illegible]

নিয়োজিত হন, কিন্তু নাজমের হাতে (৭৯) এক গুরুত্বপূর্ণ জার্মান দৌত্যমণ্ডলের পরিচালনার ভার দেওয়া হয় এই ভাই রাজাকে সিংহাসনের উপযুক্ত করে তোলার জন্য ব্রিটিশ সরকার নিয়োগ করলেন একজন ইংরেজ ডাক্তারকে। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে কোয়েসিয়াতের ১৮বছরীয় অধিপতির দেখাশোনার ভার নিল মি. ডব্লিউ সি হ্যামিল্টন (Lt. Col J. C Hamilton) এই পরিচয় দেওয়া হল। 'ইংরিশ রাজের প্রতিনিধি' হিসাবে কর্নেল হ্যামিল্টন মহারাজাকে কোয়েসিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিস্তৃত বর্ণনা দেন।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে কর্নেল হ্যামিল্টন নিযুক্ত কোয়েসিয়ার অধিবাসীদের পক্ষে, পরবর্তী সময়ে এদের একে অন্যের মধ্যে এই দলের পরিচয় নিম্নরূপ — মিঃ ব্রিয়ারলি, মিঃ মেসনারে, মিঃ ডব্লিউ ডে. হারপার ও মিঃ এস. ব্রাউন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ থেকে কোয়েসিয়ার অধিবাসীর পদে নিযুক্ত হন লর্ড এইচ. ইউজিন ব্রাউন (Lord Lilch Brown) তিনি ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ৮ই নভেম্বর, অর্থাৎ মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ সাবালক হয়ে কোয়েসিয়ার রাজসভার অধিকার গ্রহণ করার পরেই এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা নভেম্বর কোয়েসিয়ার রাজ্যের রাজস্বসহ সমাজসহ পরিচালনার জন্য একজন ডেপুটি কমিশনার নিয়োগ করা হয়। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাস থেকে কোয়েসিয়াতের ডেপুটি কমিশনার পদে নিযুক্ত হন জে.জি.বি.বি. ডালটন (J.G.B.T Dalton)। তিনিই প্রকৃতপক্ষে কোয়েসিয়ার মহারাজকে উপযুক্ত ইংরেজ হিসাবে গড়ে তোলার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। ডালটন যে মহারাজ সাবালক হয়ে তাঁর রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন, তারপরে তিনিই ছিলেন কোয়েসিয়ার প্রকৃত শাসক তথা রাজার অভিভাবক।

মহারাজ রাজা হলেও সাম্রাজ্যের রাজধানী যেত বাড়ি এখনই এক পাকের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেছে আর এক রাজধানী-জলায়। হাওয়াসীন প্রাকৃতিসাজের রাজা ও আমাদ্র প্রকাশক কোয়েসিয়ার জন্য সুনীতি, ভালো-আলো, শিক্ষা-দীক্ষা ও ধর্মান্ধ-ধারিত্রে অনুকরণীয়। বিদ্যুৎ, ছড়িশীলা, ও মুখলী। কিন্তু এই 'রাজ-ফেরীদের' মেলবন্ধন ঘটার আগে ঘটনার ঘনঘটায় রচিত হয়েছে এক অনবদ্য ইতিহাস।

নাবালক রাজার নামে কোয়েসিয়ার রাজ্য পরিচালনা করছেন ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধি কর্নেল জে. সি. হ্যামিল্টন। বলিও রাজ-অন্তঃপুরের কর্তৃত্ব নিয়োজিত রাজমাতা মহারানী কাদেম্বরী, রানী বৃন্দাবতী এবং নিকুঞ্জিনী আই-এর উপর। নাবালক রাজার শিক্ষাভারবহনের অর্পিত ছিল ব্রিটিশ সরকারের, তাঁরা অবশ্য নিজ রাজের ভবীশ্বরকে নিজেদের হাতে তৈরী করতে চেয়েছিলেন, যাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিশ্বস্ততা অনুগতীয় মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের শিক্ষার সুফল। প্রথমে পরিচয় বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে প্রাথমিক পাঠ শেষ করার পর ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারি মাত্র পাঁচ বছর বয়স বছরের সময় মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণকে পাঠানো হয় বারাণসীর Wards Institution-এ। সেখান থেকে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে পাঠানো হয় বীরিপুরে — পাদ্রি জনসিয়েটে স্কুলে শিক্ষালাভ করার জন্য। কোয়েসিয়ার সাহিত্যে পাঠানোও উপরি তরফের মহারাজের প্রতি বড়ো নজর রেখেছিলেন কোয়েসিয়ার অধিবাসী কর্নেল হ্যামিল। মহারাজার প্রতি সপ্তাহে দুটি চিঠি লিখে মহারাজার নাবী কাশীরাম নৃপেন্দ্রনারায়ণকে কর্নেল হ্যামিল এক চিঠিতে লিখেছিলেন, মহারাজের ভবিষ্যৎ এবং অন্যান্য রাজকর্মের প্রতি লক্ষ রাখবেন, অন্যথিতির ফলে মহারাজের কোনো ত্রুটি যেন মহারাজার সাহিত্যে না আসতে পারে এবং এমনভাবে দেখাশোনা করবেন যেন একজন অভিভাবক নিয়ে তাঁর সন্তানের কাজকর্মের উপর নজর রাখেন।[১৬]

কিন্তু কোনো কারণে শিক্ষালাভ অবশ্যই মহারাজার শিক্ষা সম্পূর্ণ রূপে না হলে ভারে ব্রিটিশ সরকার সিদ্ধান্ত নিলেন যে উচ্চতর শিক্ষার জন্য মহারাজাকে লন্ডনে পাঠানো হবে। কিন্তু এতে বাদ সাধলেন রাজমাতা ও রাজমহিষীকৃষ্ণ, তাঁদের আশঙ্কা হল যে বিদেশের ঐশ্বর্যপূর্ণ জীবনযাত্রার মোহে পড়ে মহারাজ তাঁর পরিচয় তত্ত্বাবধান পূর্ণ করবেন আর পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রভাবে ঝুঁকে পড়বে বীর আর্যীয়-স্বজনের প্রতি টান। তাছাড়াও, জাতি ও ধর্ম বিসর্জন দিতে হবে 'কালাপানি' পার হলে, এমন অবস্থায় মহারাজকে কোনোক্রমেই লন্ডনে পাঠানো চলতে পারে না। না, এ প্রস্তাব অসম্ভব — রানী কমলো ঘাড় না কোনো রাজমহিষী(দেই)। এই প্রস্তাব নিয়ে অন্তঃপুর আন্দোলন সেক্রেটারি গভর্নর স্যার রিচার্ড টেম্পল (Sir Richard Temple) যান। এসেছিলেন কোয়েসিয়ার রাজধানীতে, রাজমাতার সঙ্গে আলোচনা করতে। এই সম্পর্কে স্যার রিচার্ড টেম্পল লিখেছেন, রাজমাতা ও মহিষীদের সঙ্গে আলোচনায় তাঁরা এই অভিপ্রায় বার বার প্রকাশ করেছিলেন যে মহারাজা ইংলন্ড গেলে তিনি আর কোয়েসিয়ায় ফিরে আসবেন না এবং এমন শান্ত ভেবেছিল পরিবারের পরিবর্তনের তিনি আর নিজের আত্মীয় বলে ভাবতে পারবেন না।[১৭]

অবশ্য অনেক বুদ্ধিবিবেচনার পর অবশেষে রাজমাতা রাজি হলেন মহারাজাকে শিক্ষার পাঠাতে, কিন্তু একটি শর্তে, যা হল মহারাজের ফিরে নিয়ে তাদের ফিরে আসতে হবে। ব্রিটিশ

আদালতের ভেতরে ঢাপল এক নতুন মাত্রিক, আর সেই হল নজরুলীয় বিচার ইতিহাসের সূচনা।

কোর্টবিচারের অভিজ্ঞতাকে যেমন শিক্ষায়, কবিতে, চিত্রকলায় ইত্যাদি এক প্রজ্ঞাজাত ও নব প্রকাশক রূপকার পরিণত করতে চেয়েছিলেন ইংরিজি সাহিত্যের, সেই অভিজ্ঞতাকে তিনি পরিবর্তী জীবনে তিনিও গ্রহণ করেছেন নানাভাবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য গ্রন্থ ইন্ডিয়ান প্রাচীন গ্রন্থে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও কবিতে আধুনিকা, তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাবধারায় মিলন ঘটিয়ে এক জীবনে এক নতুন জীবীবন্ধনের রাজপথ। সেই করণ এলাহাই প্রয়োজন নজরুলের জন্য। হাসী অনুরূপ কথা খুঁজতে গেলে বেরিয়ে পড়বে। এ যেন জলকন্যার 'পাথিহীন' ছেড়ে দিয়ে রাজী হওয়ার মোল পায়ীর অনুসন্ধান করা। প্রায় সেইরকম অসহায়ই তখন ব্রিটিশ সরকারের, তবে 'পাথিহীন' পরিবর্তে সরকারের প্রতিনিধি রূপে নজরুলের জন্য জন্য খোঁজার কাজির দেওয়া হল কোর্টবিহনের রাজের নায়েব-আহিলকার বা মহকুমা প্রশাসক যাদবচন্দ্র চক্রবর্তীকে। কলকাতার বিশ্ব মহলে যাদবচন্দ্র চক্রবর্তীর খ্যাতি ও সুনাম যথেষ্ট, তাই ইংরেজী পাঠালো হল এই কাজে। কলকাতার উচ্চমহলে অনেকে অনুসন্ধান করলেন যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী, কিন্তু মনের মতো মেয়ে আর খুঁজে পান না। অতঃপর একদিন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের অনুরাগী প্রসন্নকুমার কাছে যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী শোনেন কেশব-কন্যা সুনীতির কথা। এমন এক পাত্রীই সন্ধান করছিলেন যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী। বংশ-মৌলিনা, অভিজাত্য, শিক্ষা ও রুচি — সবদিক থেকেই সুনীতি নজরুলের বৃদ্ধিপ্রজ্ঞাবধূর উপযুক্ত। সবৌপরি সুনীতিদেবী আধুনিক মন পাশ্চাত্য। শিক্ষায় দিক্ষিতা, বয়সও তাঁর তখন মাত্র ১৩ বছর। জন্ম ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে। তবুও নজরুলের চেয়ে মাত্র ১৩ বছরের বড়। তাই বিবাহের সংবাদ নিয়ে যখন চক্রবর্তী ছুটলেন কোচবিহারের কমিশনার কর্ণ ইডেনের প্রাইভেট বাংলো।

কমিশনার কর্ণ ইডেন কোচবিহারের তৎকালীন ডেপুটি কমিশনার মিঃ ডাল্টনকে এই বিয়ের ব্যাপারে যোগাযোগ করতে বললেন এবং ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে কেশবপুত্র সেনের মেয়ের সম্প্রদান আদায়ের জন্য চাপও সৃষ্টি করলেন।

১৮৭৭ সালের ১৯শে নভেম্বর, কেশবচন্দ্র সেনের নতুন বাড়ি 'কমল কুটীর' বা সিমি কটেজের (বর্তমানে ব্রিটোরিয়া ইনস্টিটিউশন) মুখ-চন্দ্রে ও কেশবচন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠপুত্র উপস্থিতে আয়োজিত এক প্রীতি-সম্মেলনে কোচবিহারের ডেপুটি কমিশনার মিঃ ডাল্টন কেশবচন্দ্রের কাছে যাদবচন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে সুনীতিদেবীর বিয়ের প্রস্তাব তোলেন। কিন্তু আগাতে বিশ্বিত কেশবচন্দ্র সেদিন এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার সময় পাননি, স্বভাবতই কোনো মতামতও সেদিন তিনি দেননি। কিন্তু ব্রহ্মানন্দের মহাপ্রয়াণের জন্য যেহেতু দিন মাত্র পক্ষকাল করা সম্ভব নয়, তাই ব্রিটিশ সরকারের আগ্রহকে তার বড় হাসানো দিতে থাকেন মিঃ ডাল্টন। অবশেষে তাঁর সরকারি অনুরোধ ও দূত হিসাবে যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী ও মিঃ ডাল্টন। কেশবচন্দ্র পড়েন দ্বিধায়, মনস্থির করতে তাঁর সময় লাগে, যদিও প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি এই বিয়ের প্রস্তাবে তাঁর অমতের কথা আগেই জানিয়েছেন। এই বিয়ে এড়ানোর জন্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র নানা যুক্তি দেখিয়েছেন, এই সম্পর্কে সুনীতিদেবী তাঁর আত্মজীবনীতে (The Autobiography of an Indian Princess) লিখেছেন, এই বিয়েতে প্রস্তাব তাঁকে যখন তাঁকে অবাক দিয়ে হলো তখনও তিনি অভিভূত হয়েছিলেন। তিনি তখনও জন্মদিনের বিয়ে নিয়ে বা সাংসারিক সমস্যা নিয়ে ভাবা আরম্ভ করেন নি, ইচ্ছে তখন সবটাই পূর্ণ ছিল ইশ্বর সাধীন আরাধনায়, সেই কারণে তিনি এই প্রস্তাবে খুবই অবাক হন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার এবং কোচবিহার রাজকে সঙ্গে-প্রতিনিধি নাকোচ করেন, ইংরে প্রস্তাব নিয়ে বার বার তিনি আসতে থাকেন, তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে থাকেন এবং একথা বোঝাতে চেষ্টা করেন যে যুব-মহারাজ এবং তাদের ঘরে বিয়ে হওয়াটা একান্ত বিয়ের ভাগ্যের বিষয়। তাঁকে নিয়ে বার বার আবেদন জানানোর ফলেই একটি চিঠিতে তিনি একথাও লিখেছেন যে, ছবিটি খুব সুন্দরীও নয় — এমনকি উচ্চতাতেও বড় এবং সেই কারণে তাঁকে যুব-মহারাজের উপযুক্ত কনেও নয়।[১১]

কিন্তু কেশবচন্দ্র সেনের কাছে আপত্তির কারণেও ব্রিটিশ সরকার হাল ছাড়েননি। তাঁরা বোঝাতেই চেয়েছিলেন এই বিয়ে দেওয়ার জন্য কেশবচন্দ্রকে চাপ দিতে কেশবচন্দ্র সেনের মতোও ব্যক্তি যে হিন্দু রাজপরিবারে ব্রাহ্ম-মেয়ের বিয়ে হলে তার আগের কেশবচন্দ্র সেনের মতো লোকের মেয়ে, না না, এ অসম্ভব। তাছাড়া রয়েছে আইনগত ও সামাজিক বাধা। কেশব সেন নিজে ব্রাহ্ম ধর্মমতের প্রচারক ও তাদের প্রবক্তা হলে নিজের মেয়েকে হিন্দু ধর্মমতে বিয়ে দেবেন কীভাবে, তাও আবার হিন্দু রাজার সঙ্গে।

অন্যদিকে এই বিয়েতে প্রস্তুত জানাজানি হতেই কেশব সেনের নিকট-পরিবারের মধ্যেও অনেক অনুরাগী ও বন্ধু নানা আপত্তি তুলেছেন ইতিমধ্যেই, বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সাময়িক-পত্রে এই বিয়ে নিয়ে মুক্ত হয়েছে নানা বিতর্ক, এমনকী কেশব সেনের নামে নানা কুৎসা প্রচারও করা হচ্ছে। কেশব সেনের

বিরুদ্ধপক্ষীয়দের আশঙ্কা ছিল, যে এই আইনের বিধিবদ্ধ ফলে ব্রাহ্মসমাজের প্রসারের পথে সকল বাধা দূর হয়ে যাবে। অবশ্যে এই বিয়ের কথা শুনলেই বিরক্ত হয়ে উঠতেন — যেন্ট্র প্রায়ই সন্ধিক্ষণে চন্দ্রীর কলমটা হাতে নিয়ে সমাজসংস্কারে ঝুঁকে হাতেন আবার কেউবা অনুরাধী-চিন্তা ব্রাহ্মদের ধারাই সমালোচনা করতেন। এদের মধ্যে একজন ছিলেন কেশবচন্দ্র সেনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং তাঁর আশঙ্কা ছিল যে বিদেশে এই খবর তাঁর দেশের কেশবচন্দ্র সেনের সম্মানহানি ঘটাবে।[৫১]

কিন্তু বিয়ের ব্যাপারে কোন এই সিদ্ধান্তিতা বা আশঙ্কার কেশবচন্দ্রের সমালোচকদের এই বিয়েতে আপত্তি ছিল মূলত তিনটি কারণে। এই সম্পর্কে কেশবচন্দ্র সেনের জীবনীকার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার তাঁর গ্রন্থে (The Life and Teachings of Keshub Chunder Sen) লিখেছেন, প্রথমত এই বিয়ে ব্রাহ্মসমাজের বিবাহ-আইন মোতাবেক অনুষ্ঠিত হয় নি, দ্বিতীয়ত কন্যার বয়সটি ১৪ বছর পূর্ণ হয়নি এবং মহারাজার বয়সও ১৬ বছর পূর্ণ হয়নি। তৃতীয়ত তাঁদের আশঙ্কা যে পৌত্তলিকতার রীতি এই বিয়েতে অনুসৃত হবে। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেছেন, যে যেহেতু মহারাজা ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী নন, তাই তাঁর একজন ব্রাহ্মসমাজপতির কন্যাকে বিবাহ করা অনুচিত। অনুরূপ কোচবিহার রাজ-পরিবারের ঐতিহ্য অনুযায়ী মহারাজা বহু-বিবাহ করতে পারেন তাই ব্রাহ্ম-বিবাহ আইন অনুযায়ী অধিবাহে বাধা দেওয়া সম্পর্কে কেশবের নিশ্চয়তা নেই।[৫২]

এই ব্রাহ্মবিবাহ আইনটি কী? এই আইন হল ভারত সরকারের ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের হিন্দুবিবাহ সংক্রান্ত আইনের একটি ধারা — যা পাশ হয়ে কেশব সেনের উৎসাহে ব্রাহ্ম-বিবাহ বন্ধের আসরে। তখনকার যে আইন ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত গৃহীত হয়েছে, সেটি আইনের পরিশেষী সংস্করণকে মনে করা হলে তা হবে প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মসমাজের নিজের নিয়োজিতা তথা। এই আইন (Hindu Marriage Act III of 1872) অনুযায়ী পাত্রীর বয়স ১৪ বছরের কম এবং পাত্রের বয়স ১৮ বছরের কম হলে সে বিয়ে আইনত সিদ্ধ হবে না। এ ছাড়াও ব্রাহ্ম-সমাজে এক বিয়ের প্রচলন করা হয়েছে বিশেষত হিন্দুধর্মের অনুমোদিত বহু বিবাহের প্রতিরোধেই, সেখানে যেখানে হিন্দু রাজা তাঁর ধর্মবিশ্বাসানুযায়ী এবং রাজ-পরিবারের ঐতিহ্য অনুসারে অধিবাহে আগ্রহী হলে ব্রাহ্মসমাজের রীতি অনুযায়ী এই অধিবাহ রোধ করা যাবে না — কারণ কোচবিহার হচ্ছেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তরাজ্য নয়, বরং এটি একটি স্বাধীন রাজ-মিত্র রাজ্য।

সমস্ত দিক বিবেচনা করে কেশব শেষে বিবাহ পড়েন। এই বিয়ে ও সাগরের মধ্যে কেশব শেষ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়ার জন্য তাঁর অনুরাগ দেখবার আশ্বাসনায় বসেন। এ সম্পর্কে সুনীতিদেবী তাঁর অবশ্যকীয়তে বলেছেন — আমার বিয়ে বিশেষভাবে মন দিয়ে যারে যারে ধ্যানে বসেছেন এবং অবশেষে তাঁর আত্মার কেশবের বাণী অন্তরে উপলব্ধি করেছেন, যে এই বিবাহ দেশের যাবতীয় উন্নতির পথে সহায়ক হবে। এইভাবে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, এই নিলন হল ঈশ্বরীয় অনুমোদন এবং যদি তিনি এই তরুণ পাত্রকে বিয়ে করতে আমাকে অনুমতি দেন তাহলে তিনি নিশ্চয়ই আশীর্বাদ করবেন।[৫৩]

কিন্তু নিশ্চয়তার নির্দেশ পেয়েও কেশব সেনের বিরুদ্ধপক্ষীয়রা এই বিয়ের বিরোধিতায় বিরত হলেন না। অবশ্য সুনীতি দিয়ে আশঙ্কা কেশব সেন পাত্রপক্ষের কাছে কয়েকটি শর্ত আরোপ করবেন বিবাহে বাধাদেন, শর্তগুলি হল। (১) রাজা হবেন তখন একেশ্বরবাদী বলিয়া লিখিত দিবেন। (২) ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি তথা তাঁদের বিবাহ অনুসারে বিবাহ হইবে (তাহাতে পৌত্তলিকতা দোষ-বিমুক্ত থাকিবে এমন আয়োজন থাকিতে পারে)। (৩) পাত্র-পাত্রী উভয়ের বয়ঃক্রমে বিবাহ করিবেন। যদি ডাক্তারি পরীক্ষা করা না যায়, তবে একেত্রে কেবল বয়সের জন্য হইবে, পরে কন্যারাজ বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিলে বিবাহ সম্পাদিত হইবে। (৪) বিবাহ-পদ্ধতিতে ব্রাহ্মধর্ম সম্পর্কিত নিয়ম পরিপালিত হইবে।[৫৪]

কেশব শুদ্ধ সেনের এই শর্তাবলীর অন্তর্ভুক্তিতে ব্রিটিশ সরকার উৎসাহিত হয়ে কোচবিহারের মেখুলি অধিবাসী মহারাজ কেশবচন্দ্র সেনকে এক চিঠিতে জানান যে তাঁর অন্তত পাঁচই পাঠিয়ে হবে, তবে এই বিয়ে যাতে তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করতে হবে বলেন মহারাজাকে মার্চ মাসেই ইংলন্ড যেতে হবে এবং প্রজাতান্ত্রিক কারণেই মহারাজাকে অবিবাহিত অবস্থায় পাঠানো ঠিক হবে না বলেই সরকারের পক্ষে এই বাধ্যতা। পরিশেষে, মেখুলি অধিবাসীর মিঃ ডাকীন তাঁর চিঠিতে এমনও লেখেন যে — আমি জানি যে আগামী এই মার্চে বিয়ের ব্যবস্থা হবে এবং আপনার কন্যার ১৪ বছর পরিপূর্ণ করার পূর্বে বিবাহে বাধা হওয়া আপনার পক্ষে অত্যন্ত অমর্যাদাকর। কিন্তু আপনি পরিস্থিতির অনুধাবন করে এ কথা স্বীকার করবেন যে এ ছাড়া অন্য উপায় নেই, তাছাড়া এই বিয়ে প্রকৃত অর্থে বিয়ে হবে না বরং তা হবে কেবল পবিত্র আশীর্বাদ অনুষ্ঠান, তাছা এই অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক পরেই ইউরোপ রওয়ানা হবেন।[৫৫]

'পবিত্র আশীর্বাদ' অনুষ্ঠানে ব্রাহ্ম

করেই ঘোষণা করেছি তখন বিয়ের পরিবর্তে পবিত্র বন্ধনের অনুষ্ঠান — অর্থাৎ আইনতঃ শাদি তাহলেই বিবাহের আইনসিদ্ধ করার ব্যবস্থা। ভারত-সম্রাজ্ঞীর ব্রিটিশ সরকার

— 'অন্যথা রাজদণ্ডাদি সেও নিম্নলিখিত প্রকার লইয়া সেরেস্তাদারে চলিয়া যেবেন। (১) বিবাহের পূর্বে বা পরে পত্নী-পরিবার সহিত কোনো পৌত্তলিক সংস্রব রাখিবেন না। (২) জিহোবাভগবান মূর্তি, ছবি বা প্রতিমা হাতে পাইবে না। (৩) মূর্তির নমুনা বাটীতে আনা যাবে না। (৪) কোনো যন্ত্র পরিবর্তন বা পরিবর্তিত হইবে না। পাত্রী-পক্ষ কৃতনিয়ম হইবার পূর্বে কোনপ্রকার ওজর আপত্তিতে সাক্ষাৎ দিলেন এবং সম্বন্ধে বিশুদ্ধাত্মা একিক ওমিক হইবেন।' উক্ত তালিম — কেশবের আপত্তি করিবার প্রয়োজন নাই, পৌত্তলিক প্রথা বাদ দিয়া ত্রিশূবিবাহ পদ্ধতি অনুযায়ী কার্য করা হইবে।[১৪৮]

অবশেষে রাজমতেই বিয়ে হবে এই বিষয়ে কেশব সেনের মনে দৃঢ়প্রত্যয় হয়। কিন্তু কেশব সেনের বিরুদ্ধবাদীরা কোনো যুক্তিই মানতে নারাজ। তাঁরা সোচ্চারে আলোচনা করছে থাকেন যে এই বিয়ের ফলে ব্রাহ্মসমাজের ঐতিহ্য পরাজয় ঘটবে এবং কেশব সেন তাঁর ভাবশিষ্যের জন্যই এই বিয়েতে আগ্রহী হয়েছেন। কেশব সেনের বিরোধীপক্ষের নেতৃত্ব দিচ্ছেন শিবনাথ শাস্ত্রীর নাম হয়ত উল্লেখ্য। তাঁর সম্পাদনায় একবছর 'সমদর্শী' পত্রিকায় তিনি ব্রাহ্মসমাজে কেশব সেনকে আক্রমণ করে চলেছেন। পূর্ববঙ্গের সুদূর পল্লীতে বসে জনসাধারণে বিদ্বেষপূর্ণ চোখাচোখা প্রবন্ধ লেখা বিরোধীপক্ষীয়দের কথা কোথাতে কেশব সেনের চরিত্র নিয়ে নানা কুৎসা প্রচার করে চলেছেন। কেশব সেনকে আক্রমণ করবার কোনো সুযোগ না নিয়ে, সক্রিয় ঘটনার কোনো বিশ্লেষণ না করেই একশ্রেণী কেশব সেনের অনুগামীরা অনবরত নানা কুৎসা প্রচার করেছেন কেশব সেনের বিরুদ্ধে। অবশ্য চিঠিতে কেশব সেনকে এই নিয়ে খেপে খেপানোর জন্য নানা উপদেশ দেওয়া হয়ে থাকে, আবার কারো কারো চিঠিতে কেশবের নানা চিঠিও। অসংখ্য চিঠিতে থাকে নানা কটুক্তি, নিন্দা ও কুৎসা। কেশব সেনের ছাই নির্বিশেষে সেনের উপর ক্রুদ্ধ সেন এইসব চিঠির প্রায় প্রত্যেক যুক্তি-পূর্ণ চিঠি খুঁজে কেশব সেনের হাতে পড়াতে — যাতে কেশব সেন নিজে সেগুলির উত্তর দিতে পারেন, কিন্তু বিরোধ সেন এমন একখানি চিঠিও পাননি যাতে যুক্তিপূর্ণ আলোচনার অবকাশ ছিল।

এই অবস্থায় অবশেষে কোচবিহার রাজ-পুরোহিতের তাঁর সন্তানের নিয়ে ৫৫জনের বিদেশ ২৭শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৮ সালে। তার পরেরদিন, ২৮শে ফেব্রুয়ারি এক বিশেষ ট্রেনে কোচবিহার যাওয়ার ব্যবস্থা হল কুচবিহারের ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন নিয়ে কেশবচন্দ্র সেনের। কিন্তু ২৮শে ফেব্রুয়ারি, শনিবার সকালে একখানি টেলিগ্রাম আসে কোচবিহার রাজপ্রাসাদ থেকে, তাতে বলা হয় যে বিয়েতে যে ব্রাহ্ম অনুষ্ঠানবিধি করা করা হয়েছে তা অনুসরণ করা সম্ভব হবে না। অনুরূপ আরও একটি সংবাদ আসে ২৫শে ফেব্রুয়ারি, কলকাতার যাত্রা করার কিছুক্ষণ আগে। কেশব সেন এই সংবাদে হতবাক। একখানি প্রতিবাদ-পত্র পাঠান, এজন্যই এমন ঠুনকো কারণ কারণে কলকাতাতে বিশেষ ট্রেন বাতিল করা যায়, কিন্তু তখন খুব দেরী হয়ে গেছে। তাই ২৪শে ফেব্রুয়ারি, সোমবার কেশব সেন সুনীতিদেবী ও অন্যান্য আত্মীয়দের নিয়ে কোচবিহারের উদ্দেশে রওনা দিলেন।

শেষ সময়ে বিয়ে ভেঙে দেওয়ার নায়ক ছিলেন কোচবিহার রাজ সরকারের প্রধান অমাত্য বা দেওয়ান হরিমোহন বসু। সুনীতিদেবী এ সম্পর্কে লিখেছেন তাঁর আত্মজীবনীতে — রাজসরকারে এমন একজন অমাত্য ছিলেন যিনি আর ইংরেজ অমাত্যদের তুলনায় ছিলেন অত্যন্ত কর্মকুশলী এবং ক্ষমতাশালী। ইনি হলেন দেওয়ান হরিমোহন বসু। তিনি এই বিয়ের পক্ষে ছিলেন না, তবুও তিনি মনে করছেন তাঁকে উপেক্ষা করা হয়েছে। তিনি আমার পিতার অনুষ্ঠানগুলির প্রতি সমাদর প্রদর্শনে অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলেন, তিনি একজন অসাধারণ ব্যক্তি। তাঁর একটি চিঠি আমি পেয়েছি। তাতে তিনি আমার পিতার সঙ্গে যা কিছু ব্যবহার করেছিলেন তার জন্য ক্ষমা চেয়েছেন। তিনি এখনো জীবিত আছেন

ও নিরীশ্বরবাদীতা সম্পর্কে যেসব লেখালেখির পরও তাঁরা উদ্বিগ্ন হননি।[১১]

তাছাড়া এই তিনটি পরিবর্তনকে ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখের ঘোষণাপত্র এবং ২৪ তারিখের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সেবকের প্রবন্ধে সমর্থন করা হয়। অবশ্য এরও পরিবর্তন হল, সপ্তপদীগমনের বেদমন্ত্র বেদমন্ত্র ছেড়েবিবাহ পদ্ধতিতে পড়া যে হয়েছিল ইচ্ছে অভ্রান্তভাবে জানা হয়ে ওঠেনি সেই অভ্রান্তভাবে শেষ হল কেশব ব্রাহ্মসমাজীদের অভ্রান্তভাবে। অবশ্যই বিবেচনে কেশব বলে, ১৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁর শিক্ষা ও সাধীন-পরিচালনার ভিত্তে কলকাতা থেকে ছোড়বিহার এসে পৌঁছলেন। এঁরা কলকাতা থেকে প্রথমশ্রেণি পর্যন্ত বিশেষ ট্রেনে আসেন, সেখান থেকে এঁদের পাল্কি ও পালকিতে করে ছোড়বিহার আনা হয়। বলাবাহুল্য অভ্রান্তভাবে করার জন্য যে প্রাক্কল নির্দিষ্ট হয়েছিল সেখানে তিনি এই মার্চ পর্যন্ত অবস্থান করেন। সেখান থেকে ছোড়বিহার রাজপরিবারের রীতি অনুযায়ী এঁকে পোড়াবাড়ি সমুদ্রতটে রাজকরতিতে নিয়ে আসা হয়।[১২]

অভ্রান্তভাবে বিবাহের উদ্যোগে ছোড়বিহার সেক্রেটারি অপরাধ সাহেব, আলো জ্বালানো কর্তাদের যে এক মোহনীয় জগৎ। কিন্তু জাতী সভাপতিকে অভ্রান্তভাবে করা হয়েছে, সেখানে যেন কর্তব্যের পরিবেশ। সে অভ্রান্তভাবে ছিল না প্রণয়ের স্পর্শ এবং তা ছিল রাজকর্মচারীদের নিষ্ঠুরই কর্তব্য সম্পাদন করা। ব্রিটিশ ভারতের ছোড়বিহার রাজ্যের সেক্রেটারিয়েট পদাধিকারে ছোড়বিহারে একজন কেশব সেনকে নিজেদের ধর্মান্তর করতে পারলেই বিয়ের সব ব্যবস্থা নিজেদের হাতেনাতে, বিশেষত বিশ্বাসেই করা যায়। এই বিয়ের প্রণালী নিয়ে আলোচনার জন্য কেশব সেনের পক্ষ থেকে প্রতাপ মজুমদার ব্রাহ্মপরিবারের বা এঁদের প্রতিনিধিদের এই ব্যাপারে আলোচনা করার কোনো মতভেদ দেখা যায়নি।

বিয়ের দিন স্থির হয়েছে ১৯ মার্চ, ১৮৭৮, বুধবার। বিয়ের দুদিন আগে অর্থাৎ সোমবার এঁরা ঘাট কোচবিহারের দেওয়ান বাসিন্দাদের জন্য ব্রাহ্মপরিবারের একেকজন

> *"কিন্তু কিছু হোক বা না হোক, সুনীতিদেবীও কেশব সেনের কন্যা, তিনি প্রণামীর জন্য দেওয়া স্বর্ণমুদ্রা দুটি কুলপুরোহিতের পায়ে না রেখে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেললেন। সমবেত সকলেই এই ঘটনায় হতচকিত!"*

শ্বশুর সঙ্গে কথা বলে কেশব সেনকে জানালেন যে বিবাহবীতিতে কিছুটা হিন্দুরীতি অনুযায়ীই হবে। এতে কেশব সেন প্রথম আপত্তি জানালেও কিন্তু তাতে কোনো ফল হয়েছিল বলে মনে হয় না। কারণ ব্রাহ্মপরিবার হিন্দুমতে বিয়ের আনুষঙ্গিক জন্যই সবকিছুর ব্যবস্থা করেছিলেন। তাছাড়া, একদিকে বিয়ের উৎসবে কেশব সহ ছোড়বিহার ভোলপাড়, অন্যদিকে কেশব ইতিমধ্যে বিয়ে হবে তা নিয়ে ব্রাহ্মপক্ষ আর অব্রাহ্মপক্ষের মধ্যের চলেছে তুমুল আলোচনা।

বিয়ের আগের দিন, অর্থাৎ ১৪ই মার্চ, ১৮৭৮, রবিবার, হিন্দুমতে অধিবাসের দিন। ব্রাহ্মপরিবারে আজই আয়োজনে পত্নীকে নেওয়ার জন্য পালকি এল। সাতসকালে পুরু পুরু বকে বরণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিকের কাজ থেকে বিদায় নিয়ে সুনীতিদেবী চললেন অধিবাসের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে, সঙ্গে গেল ছোট বোন বিন্দু বা জিনীতা। অন্য পালকিতে মা, দিদিমা ও আর সব মহিলা। যথারীতি স্ত্রী-আচার শেষে জামী বরযাত্রীদের অপেক্ষমান জলযানে বাজ-কুলপুরোহিতের হিন্দু প্রথানুযায়ী হাতকড়ে তুলে দেওয়া হয়, সেইজন্য সুনীতিদেবীর হাতে বুটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে তুলসীর জন্য কুলপুরোহিতকে স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে তুলসী দিতে বলা হল। কিন্তু তাঁকে বলানো সুনীতিদেবীর দিদিমা, তিনি বললেন — আমাদের মেয়ে কোনো তুলসী মেয়ে না। মহারাজার দিদিমা উত্তর করলেন — মেয়ে তবে প্রশ্ন কিছুই নয়। কিন্তু কিছু হোক বা না হোক, সুনীতিদেবীও কেশব সেনের কন্যা, তিনি প্রণামীর জন্য দেওয়া স্বর্ণমুদ্রা দুটি কুলপুরোহিতের পায়ে না রেখে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেললেন। সমবেত সকলেই এই ঘটনায় হতচকিত। বাজমাতা ফোরেই নিশ্বাসরুদ্ধ।

রাজপুরোহিতের চক্ষুস্থির বিস্ময়ে বিস্ফারিত, রাজপুরীর পুরুতঠাকুর আশঙ্কায় নির্বাক — এমন কোনো ঘটনা এর আগে কখনও ঘটেনি রাজপ্রাসাদে বা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। প্রকৃত মেজিস্ত্রের মতো ব্যাপারটা ওখানেই শেষ হয়, তার কোনো অর্থনীতি খোঁজেনি সেদিন।

কিন্তু ঘটনাটা এখানেও শেষ হয়নি। বিয়ের বিলেই ঘটে ঘটনার সূত্রপাত। যেন পদ্ধতিতে বিয়ে হবে তা নিয়ে কেশব সেন আর ব্রাহ্ম-পরিবারের মধ্যে যেসব চলছে কথাকাটি, তার জের অন্তঃপুরেও চলতে লাগল। সেদিন সন্ধ্যেবেলা মহারাজার মা আর সুনীতিদেবীর মাঝের ঘরে বিয়ের পদ্ধতি নিয়ে শুরু হল কথাবার্তা। সুনীতিদেবীর কথাতেই শোনা যাক সে মুখের ইতিহাস — মহারাজার মা আমাকে প্রশ্নে আটকে জর্জরিত করে তুলছিলেন। তাঁর কথার মধ্যে একটি কথার

আমার আজও স্পষ্ট মনে আছে, তিনি (মহারাজার মা) আমার মাকে বলছেন, 'আপনি কি বলতে চান যে আপনি আপনার মেয়েকে ভালবাসেন? তা হলে কীভাবে বোঝা যাবে যখন আপনি আপনার মেয়েকে একজন মহারাজকে বিয়ে করতে দিচ্ছেন না। যদি আপনার মেয়ে আমার ছেলেকে হিন্দুধর্মে বিয়ে না করে তাহলে আপনার মেয়ে মহারানী হতে পারবে না।' আমার মা পাল্টা বলে কিন্তু মৃদুস্বরে বললেন যদি আপনার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে না হয় তাহলে আমি অবশ্যই দুঃখিত হব নিশ্চয়ই এবং বোম্বাইয়ের ছেড়ে চলে যাব, কিন্তু আমার মেয়ে কখনই হিন্দুধর্মে বিয়ে করতে পারে না।'[১৬]

কথায় বলে 'কেরোসিন রসিকতা' অর্থাৎ ক্লাস করে অনেক বারা, কিন্তু এই বিয়েতে বিঘ্ন তো পদে পদে। এ তো ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে তৈরী কোনো নাটকের ক্লাইমাক্স বা চরম মুহূর্ত। তখন এটি কোনো নাটক নয় — সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক সত্য। যে ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার, বোম্বাইয়ের রাজ্যপরিবার আর ব্রাহ্ম সমাজের নেতা কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা সহ তাঁর আত্মীয়স্বজন। ঘটনার চরম পরিণতির দিকে তাকিয়ে তৎপক্ষ করছেন সবাই। এই রাজকীয় নাটকের পাত্র বা পাত্রীপক্ষের কেউই পরাজয় স্বীকার করতে রাজী নন। উৎসব, আনন্দে মুখর সমগ্র বোম্বাইয়ের পথে ঘাটে উৎকণ্ঠায় প্রহর গুণছে চরম মুহূর্তের। রাজমাতা ছেলের নিশ্চয়তা, অন্যপক্ষ নতুন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে ঘাবড়ায়নি। কিন্তু সমাধানের পথ কারও জানা নেই, দুপক্ষই অনড় দাঁড়িয়ে তাঁদের অবস্থান নিশ্চয়তে। সমস্ত রাজপুরীতে বিরাজ করছে অদ্ভুত পরিবেশ।

—'উভয়পক্ষেরই অনুরোধ পর। রাজমাতা হিন্দুমতে না হলে বিয়ের সিঁড়ি থেকে ছেলে ফুলে যেতেন। অর্থাৎ বিয়েটা ভেঙে যাবে। অন্যপক্ষের শেষ কথা — কৃষ্ণ পয়েন্ট নেই। বিয়ে যাবে তো ভেঙে যাক। মহারাজা কেশব সেনের মেয়েকে বিয়ে হিন্দুমতে হবে। এতো একজনীয় ব্যাপার। এরপরই বোধহয় বলে রাজার রাজায় যুদ্ধ হয় প্রাণ যায় উলুখাগড়ার। হিন্দুধর্ম আর ব্রাহ্মধর্মের পাল্লা ভারী নিয়ে দুইদিকে দর-কষাকষি চলছে।'[১৭]

কিশোর-কিশোরীর মনের খবরও পাওয়া যায় বৈকি। আর তাদের মনের খবরই তো সমস্ত ঘটনাকে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। অবশ্যেষে সন্ধিস্থ কিশোর আর কেউ নয়, স্বয়ং মেয়ের এক অভিভাবক। হলেনই বা তিনি বয়সে কিশোর — তবুও তো মহারাজা! তাঁরই বিয়ে নিয়ে এই উদ্ভাপোত্তেজনার খবর তাঁর কানেও পৌঁছেছে। এবার তিনি এই নাটকীয় মুহূর্তে অবতীর্ণ হলেন ঔপন্যাসিকের ভাষায়। অবশ্য সমাজসেবিকা ও রাজকীয় মর্যাদার মহিলারা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর ঘোষণা করলেন — আপনারা ছাড়ানোর আমার কথা ভেবে ভাবুন। আমি ভেবে দেখি। যদি আমাকে এই মেয়েকে বিয়ে করতে হয়, তাহলে আমাকে জানাবেন। অন্যথা আমার ঘোড়া তৈরি থাকবে আমি আন্তর্জাতিক সকালেই চিরকালের মতো কোচবিহার ছেড়ে চলে যাব। আমি যদি এই মেয়েকে বিয়ে করতে না পারি তাহলে আর কাউকেই বিয়ে করব না।'[১৮]

রাজকীয় আঙ্গীনায় তাঁর শেষ কথা বলে মহারাজা চলে গেলেন নিজের ঘরে। উৎকণ্ঠিত সেদিই আর এই অভিনয়ের দিন গোনার কাজ খুঁজে পান না উৎকণ্ঠায়। অবশেষে একদিন কোচবিহারের মেয়ে আসে শুভদৃষ্টির শীতলতায়। অবশেষে শুরু বিয়ের এ বিয়ে আর হবে না। তৎকালীন ভারতের খানিকটা সর্বনা পাওয়া আর এই মহানাটকের মহান নায়িকা সুনীতিদেবীর আত্মজীবনীতে — মুখে ফুলে মেয়ে এল মহীতে নীরবতা। থেমে গেল সানাইয়ের মূর্ছনা আর শঙ্খধ্বনি। জনমনের কোলাহল পরিণত হল আলাপচারিতে, হইচই মন কিন্তু গেল থেমে। সানাইবাদকেরা চলে গেলেন। রওশন চৌকি থেকে এবং পরের প্রকৃত অর্থেই হয়ে গেল নীরব, একে একে নিভে গেল

চারপাশের অন্ধকার আলোকে সজ্জিত। [১১]

অন্যান্য ওজনের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়েছে সারা কোর্টহিয়ারে। এ ঘটনায় তাঁর শৈশবে গেল অন্ধকারাচ্ছন্ন মন্দিরপ্রাঙ্গণে দাসদের হতবুদ্ধিকর ভোর রোমান্সটি গাঢ়তরভাবে রয়েছে। হতভাগ্য ভোরোনাকে গাজনির সাথে তিনার্ড টেম্পল (See Richard Temple) কোর্টবিহারের রেসুটি কমিশনার মিঃ ব্রাসটিনকে টেলিগ্রামের যোগাযোগ করে নির্দেশ দিলেন, কন্যাদায়ের ক্ষেত্রে হিন্দু হয়েছে হতভাগিনী আমার অনুযায়ী বিয়ে সম্পন্ন করুন। (Let the marriage be performed according to the rites as settled in Calcutta) নির্দেশ পেয়েই মিঃবিহি হয়ে মিঃ ব্রাসটিন ছুটলেন মহারাজা ভোরেন্দ্র নারায়ণের কাছে। মহারাজা তখন ঈশ্বরের নির্দেশ জানতে আকুল আগ্রহে ধ্যানমগ্ন। সেই অবস্থাতেই মিঃ ব্রাসটিন তাঁকে ধাক্কা দিয়ে বললেন — মিঃ সেন এই বিয়ে আজ রাতেই সম্পন্ন করতে হবে। আপনি ভোরোনার হিন্দু করবেন, সেইভাবেই বিয়ে অনুষ্ঠিত হবে। আমি নিজে সেখানে উপস্থিত থাকব যাতে কোনোরকম দুর্ব্যবহার না করা হয়। আপনি তাড়াতাড়ি আসুন। আমাদের আর এক মুহূর্ত সময় নেই নষ্ট করার। আজ ঠিনটেই আর একটি শুভ মুহূর্ত আছে, তখনই বিয়েটা হয়ে যাক। [১২]

মিঃ ব্রাসটিন এরকম জোর করেই মহারাজা ভোরেন্দ্র নারায়ণকে নিয়ে একেবারে বিয়ের আসরে হাজির হলেন। বিয়ে সেই রাতেই হবে, খবর পৌঁছে গেল গ্রামপুরীতেও। নেমানো আলো জ্বালার ঝলমলে হল একে একে, মাঙ্গলিকী বলাই আর অন্য আবাহন নতুন করে থেকে উঠল আর এক পুলকময়ী সুরে। হঠাৎ যেন কোন যাদুমন্ত্রের ছোঁয়ায় ঘুম থেকে মহারাজকুমারে জেগে ওঠে কোর্টবিহার রাজপ্রাসাদ ও সেই সঙ্গে সমস্ত শহর। কিন্তু তবু একটা জোরাই যায় — ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধির জেদের প্রতিশ্রুতিই কি ঠিকমত পালিত হয়েছিল? না, তা হয়নি পুরোপুরি। বিয়ের আসরে পালিত নানা আবাহ-অনুষ্ঠান সম্পর্কে জিরাটীয় পণ্ডী লিখেছেন —

রাজসভার বিবাহসভায় সকলে উপস্থিত হইলেন। সেখানে বিয়ের পোরোহিত্য করিবেন ও কন্যাদানের মন্ত্র এবং মন্ত্রোচ্চারণকারীর কোলাহল। বিবাহমণ্ডপে একদল ব্রাহ্মণ পুরোহিত উপস্থিত। মধ্যস্থলে রাজপুরুষ ও বর-সিংহের পাঠ এবং স্বয়ংবেশী রাজা-দেশবার মন্ত্র। কেহ পুরোহিত, কেহ ভক্তবেশে। মর্যাদার সম্মানে অনিয়া রাজপাত্রের লোকেরা প্রবেশ করিয়াছেন পরস্পর এবং তাহা জানানোর পত্র রহিলেন। তখন একটি কোলাহল আরম্ভ হইল যে, বিয়েটি আর বন্ধ করা যায় না। পরে বিয়ের ঘটি এবং রাজা-দেবতাদিগকে সাক্ষীরূপে রাখা অনুরোধ করা হইল। রেসুটি কমিশনার বরকে আনাইতে পাঠাইলেন। কিন্তু পাত্রপক্ষীয় চতুর বীর দেবতেরা বলিল, উহারা দেবতা নহে, রক্তমাংসের বিহ বিশেষ। অবশেষে ব্রাহ্মণ-পুরোহিতগণ ব্রাহ্ম পুরোহিতের সহিত মিলিয়া শৌত্রলিক আগে শান্তিধারাপূর্বক বিবাহের মন্ত্র পড়িলেন। শেষে কন্যা অন্তঃপুরে গমন করিলে, পরে জেনে হোমের ছলে পুরোহিতদিগের নিকট অনেকক্ষণ বসিয়াছিলেন। পরে অন্তঃপুরে পাত্র-পাত্রীরা নিকট বিবাহ-পরিচয়া এবং প্রার্থনা পরিচয় হয়, এবং আবার আমন্ত্রিতদিগকে উপঢৌকন দান করেন।

এইরূপে বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হইল বটে, কিন্তু জোরে পক্ষের আরা ভাল লাগিল না। [১৩]

অর্থাৎ, উভয়পক্ষের অনুষ্ঠিত পদ্ধতিতে বিয়ে কোনোপক্ষই তাঁদের রীতি সম্পূর্ণভাবে পালন করতে পারলেন না। বিয়ে হল খানিকটা হিন্দুমতে, খানিকটা ব্রাহ্মমতে। অথচ ব্রিটিশ আমলাদের কাছে বাহবা দেওয়া হয়েছিল যে ব্রাহ্মমতেই বিয়ে হবে। এই সম্পর্কে হরেন্দ্র সিংহেরও করেছেন জেলার ঐতিহাসিক প্রত্নতত্ত্বের ব্রজসুন্দর। তিনি লিখেছেন — বিবাহের এজেন্সিকরণের বহিরা সাক্ষীরূপে আহূত হয়েছিল, সভায় যে সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের ব্যক্তি ছিলেন সকলেই এই পক্ষপাতে ছিলেন। কিন্তু ঘটনাটি সম্পূর্ণরূপে তখন হয়ে যে, যে হিন্দুমতে বিয়ে দেওয়ার জন্য ব্রাহ্মপরিবার বদ্ধপরিকর ছিলেন তাদের সেই আশাও পূরণ হয়নি; অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের দ্বারা বিয়ে পরিচালনা নিঃসন্দেহে অধিক্ষু ব্যবস্থা; এমনটি যদি কোরেন্দ্রর পক্ষের সমস্ত আনাই অনুযায়ী হতে তাহলে হিন্দু-প্রাণে বিয়েটি প্রকৃতপক্ষে এই বিয়েতে অনুষ্ঠান হয়েছে তা কোর্টবিহার গেজেটিয়ার পরিচয়ের বাইরে এ কোনোরূপ কোনো সাক্ষী কারোরই অস্তিত্ব করেছে পাওয়া যায় সত্ত্বেও কোর্টবিহারের রেসুটি কমিশনার ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে সরকারপক্ষে লেখেন যে এই বিয়ে হিন্দু ধর্মানুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়েছে। [১৪]

এখানেও সত্য ঢাকা পড়ে গেল ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধি এই বিয়েকে হিন্দু বিয়ে বলে সরকারপক্ষে ঘোষণা করেছেন। তবে বাস্তব ঘটনাটি সম্পূর্ণ প্রতিনিধিত্বে। হিন্দু প্রথা কোর্টবিহারের ব্রাহ্মরাজা হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করে ব্রহ্ম ধর্মমতে বিয়ে করেছেন এই কথা জানার ফলে ভোরোনার মহারাজার প্রজাগুলির মধ্যে এই বিয়ে সম্বন্ধের মনে যেটুকু ভয়ের আশঙ্কা ছিল এমনকী ব্রাহ্মপরিবার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশেরও আশঙ্কা ছিল, সিদ্ধান্তটাই বাস্তবে এই ধরনের অবাঞ্ছিত ঘটনার ব্রিটিশ সরকার বা তাদের প্রশাসকদিগেরই এমন ঘটনা ঘটাবে এই ধরনের কথা প্রচার হলেও ব্রিটিশ সরকারের নিরপেক্ষতার ভাবিষ্যতে তা অন্ন করে ফেলে। এমন

আশঙ্কাতেই এই বিয়েকে আনুষ্ঠানিক হিন্দু বিয়ে বলে সব স্থানে ঘোষণা করা হয়েছিল।

এই বিয়েকে হিন্দু-বিয়ে বলে ঘোষণা করার মোট ৪৬টি কারণ ছিল, সেটি হচ্ছে—৪৫। ইতঃপূর্বেও ব্রাহ্ম বিয়ের আইন (Brahmo Marriage Act) বলে যেসব আইন ছিল না — এমন নয়। যে সিল ইংরেজীতে আমরা পেয়েছি সেটি ছিল 'হিন্দু বিবাহ আইন'-এর ১৮৭২ সালের এক সংশোধনী মাত্র। (Act III of 1872) তারপরেই এটিকে 'ব্রাহ্ম বিবাহ আইন' বলা হয়। যদিও এতে হিন্দু বিবাহ আইন সংশোধন করে বিবাহযোগ্যা কন্যার বয়স নূনতম ১৪ বছর করা হয়েছিল। এই আশঙ্কাই সরকারি দৃষ্টিভঙ্গির হিসেবে আইনত এই বিয়েকে হিন্দু বিয়ে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল।

এই বিয়েকে 'হিন্দু বিবাহ আইন মোতাবেক' বলার অন্যও একটি কারণ ছিল, তা হল অন্যান্য সংস্কারিকাদের চাপ। কোর্টশিপের প্রথা তখনও ব্রিটিশ সরকারের অধীনস্থ রাজ্য নয় — তাই সেখানে ১৮৭২ সালের বিবাহ-আইনও প্রযোজ্য নয়, এবং যেহেতু বিয়েটা কোর্টশিপের বাইরে হয়েছে তাই সেখানে অন্য যেসব কোনো আইন প্রযোগ করা যায় না। কোর্টশিপের রাজ্যের প্রচলিত আইন অনুযায়ী বিয়ে না হলে কোর্টশিপের রাজ্যের উত্তরাধিকারিণী হতে পারেন না মুন্সীগিন্নী, অর্থাৎ এঁকে অভ্যাসী হলে বীকৃতি দিয়েই আইনসঙ্গত বলা যেতে পারে, এই অবস্থায় কথা কোর্টশিপের রাজসভার ওকালতী স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, [যদি সে (মুন্সীগিন্নী) আমার ছেলেকে হিন্দুমতে বিয়ে না করে তাহলে সে রাজ্যের উত্তরাধিকারিণী হতে পারবে না।][১৮৮]

এই ১৮৭২ সিল বিবাহ-আইনে ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধি এই বিয়েকে 'হিন্দু বিয়ে' বলে ঘোষণা করেছিলেন সমস্ত চরম প্রতিবৈধিক, অনিশ্চয়তা ও উত্তরাধিকারের সূত্র বজায় রাখতে। ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধি কোম্পানি ভুল বা মিথ্যা বিবৃতি দিয়েছেন এমন মনে করার কোনো কারণ নেই, বরং তিনি সঠিক বিষয় বলে ইচ্ছাকৃতভাবেই এই ধরনের ঘোষণা করেছিলেন, কোর্টশিপের রাজপরিবার ও ব্রিটিশ সরকার উভয়েরই মান বাঁচাতে। কিন্তু এখানেই কথা হলেও অতিরিক্ত — অর্থাৎ কোম্পানি কোম্পানি অবস্থা তখন কী দাঁড়াল? কোর্টশিপের মুন্সীগিন্নীদের বিয়ে শেষ হয়ে না হতেই কোম্পানি কোম্পানির বিরুদ্ধপক্ষীয়রা কোম্পানি থেকে কোম্পানির কোম্পানিদের দেশকে 'ব্রাহ্মসমাজের' সদস্য ও ব্রাহ্মবিবাহের আওতাধীন পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ২১শে মার্চ, বৃহস্পতিবার এই মর্মে এক সভা আহ্বান করলেন কোম্পানি কোম্পানির বিরোধীরা। কিন্তু চূড়ান্ত হৈ-হট্টগোলের সভা মুলতুবী হয়ে যায়। সভা থেকে কোম্পানি দেশকে সরানো যাবে না বুঝতে পেরে কোম্পানি কোম্পানির বিরোধীরা ২৪শে মার্চ, রবিবার সকালবেলা ব্রাহ্মসমিতির দরজা বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করেন, কিন্তু কোম্পানি কোম্পানি অনুগামীদের প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়ে বিরোধীরা ব্রাহ্মসমিতি কার্যালয় পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। কিন্তু 'ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তাঁরা ১৪ই মে তারিখে কলকাতার 'টাউন হলে' এক সভা আহ্বান করে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' নামে নতুন প্রতিষ্ঠানের সূচনা করেন। এছাড়াও কোম্পানি কোম্পানির বিরোধীরা ব্রিটিশ সরকারের কাছে কোম্পানিদের নামে কোর্টশিপের রাজ্যের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত অভিযোগ এনে কোম্পানী চিঠি লিখেছিলেন, কিন্তু কোম্পানি বিবাহের কার্যক্রম পর এই অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হয়।

সভা করে কোম্পানির কোম্পানি কোম্পানি হয়ে পড়েন, কিন্তু এসবের প্রতিবাদে তিনি কোনো প্রকাশ্য বিবৃতি বা আলাপ করেননি। যদিও মহারাজা নৃসিংহনারায়ণ লাভ থেকে বেশ কিছু এসে ১৮৮০ সালের ১০শে অক্টোবর কলকাতার ব্রাহ্মসমিতির বিশেষ অধিবেশন ও আদিব্রাহ্মসমাজের সামনে মহারাজা নৃসিংহনারায়ণ ও মুন্সীগিন্নীদের বিয়ে হয় সম্পূর্ণ ব্রাহ্মমতে। কিন্তু যে 'পথে নিতে' এর আলোকে, সেই বিয়ে সম্পর্কে কোম্পানি কোম্পানি কোম্পানির বিরুদ্ধে অনুসন্ধানে জানা যায় যে — প্রচলিত ব্রাহ্মমতে কোম্পানি ইংরেজ কর্তৃপক্ষ কোম্পানি কোম্পানির কাছ থেকে কোম্পানি প্রতিশ্রুতি আদায় করে নেওয়াছিলেন, যে কোনো অবস্থাতেই তিনি কোম্পানি এই বিবাহের মধ্যে কয়খানি হিন্দুধর্মের বা ব্রাহ্মধর্ম আছে তা নিয়ে আদৌ মাথা ঘামাবেন না। ১৮৭৮ সালে মিস কব-এর (Miss Cobb) কাছে কোম্পানি কোম্পানি তিনি নিজে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। তিনি লিখেছেন ব্রিটিশ সরকার আমাকে একজন ব্রাহ্মসমাজের নেতা হিসাবে পরিচয়দানে কোনোও আমাকে কলকাতে কোম্পানিদের একটি ব্রাহ্মমত স্বার্থ কলকাতে এবং আমাকেও অনুরোধ করেছিলেন যাতে এই বিয়েতে আমি কোনোরকম আপত্তি না তুলে কলকাতে সম্মতি দিই। আমাকে এমন আশ্বাসও দেওয়া হয়েছিল যে সরকার হিন্দুধর্মের প্রতি আস্থা নেই কিন্তু রাজনৈতিক কারণেই তাঁরা পাশ্চাত্য সংস্কারকে হিন্দুধর্মের বিরোধিতা করা সম্ভব নয়।[১৮৯] এই আশ্বাসেই কোম্পানি কোম্পানি কোর্টশিপের বিয়ের সম্পর্কে কোনো প্রতিবাদ বিবৃতি দেননি। তাছাড়া কোম্পানি কোম্পানি কোম্পানি

"হিন্দু এবং ব্রাহ্মসমাজের বিয়ে সংক্রান্ত আচারের এমন পারস্পরিক সহাবস্থানের নজির আর নেই ইতিহাসের পাতায়। বিয়ের প্রণালী কতদূর হলেও এবং এত সব বাধা-বিঘ্ন ঘটলেও এই রাজযোটকের মনের মিল ছিল সুগভীর।"

বুঝিয়েছেন, তাহার অনুরোধ কখনও ফেলিতে পারিবেন না। অতীব চিন্তায় নিমগ্ন এবং মুহ্যমান মহারাজ। বিবাহটি যদি নিতান্তই অবশ্যম্ভাবী হইয়াছে, তবে তাহাতে এত বিঘ্ন ঘটিল কেন? তাহার উত্তরে তিনি একস্থানে লিখিয়া গিয়াছেন — ব্রিটিশ ইহা অনুমোদন করেন, সুতরাং অন্যান্য প্রতিবাদ ও পরীক্ষা সত্ত্বেও বিশুদ্ধ প্রাচ্যরীতি অনুসারে তাহা সম্পাদনের জন্য তিনি অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তখন পড়িল বাধে পড়িয়া, সে প্রদেশী পরিবারিও হইয়া গেল এবং বিবাহের দিবসে মহারাজ অসুস্থতা ভোগ বিশ্রিত হইয়া উঠায় সৌন্দর্য নষ্ট করিয়া ফেলিল।[১৮]

একই বিবাহে ব্রাহ্মমত ও ব্রাহ্মমত অনুসৃত হয়েছিল তাই প্রতিই নতুন মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ও সুনীতিদেবীর বিয়ে। মহারাজা যেমন পালন করেছিলেন হিন্দু আচার-নীতি, তেমনি সুনীতিদেবীও পালন করেছিলেন ব্রাহ্ম-ধর্মমত। এই প্রসঙ্গে সুনীতিদেবী তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন — আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম আমার ধর্মমত পালন করেছিলাম। আমাদের বিয়েতে আমাদের ধর্মবিশ্বাসের অনুযায়ী যেসব রীতিপদ্ধতি ব্রাহ্ম মতমতের আচারনুযায়ী অনুসরণ করেছিলেন আমাদের যেমনি মহারাজার সমস্ত হিন্দু পুরোহিতেরাও উপস্থিত ছিলেন।[১৯]

হিন্দু এবং ব্রাহ্মমতের বিয়ে সংক্রান্ত আচারের এমন পারস্পরিক সহাবস্থানের নজির আর নেই ইতিহাসের পাতায়। বিয়ের প্রণালী কতদূর হলেও এবং এত সব বাধা-বিঘ্ন ঘটলেও এই রাজযোটকের মনের মিল ছিল সুগভীর। ১৮৭৮ সালের ১লা মার্চ থেকে ১৯১১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৩ বছর ৬ মাসের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ এই দুই ব্যক্তিত্বের সাধী ও সুহৃদ রেখে গেছেন পারস্পরিক সহমর্মিতার নিদর্শনের কথা। ব্যক্তিত্ব আলাদা হলেও মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ এবং মহারানী সুনীতির পারস্পরিক মনের মেলবন্ধন ঘটাতে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পেরেছে ব্যক্তিত্বই। ১৯১১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ নারায়ণের দেহাবসান হয়, কিন্তু তাঁর কীর্তি অমর হয়ে আছে আজও কোচবিহারের ইতিহাসে। তাঁরই প্রতিষ্ঠিত কলকাতার রিপ্রেজেন্টেটিভ ইনস্টিটিউশন আর কলেজ এবং কোচবিহারের ভিক্টোরিয়া কলেজ (বর্তমানে রাজেন্দ্রকলেজ নামে কলেজ) আজও কালের সাক্ষী হয়ে সগর্বে গেয়ে চলেছে মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ও মহারানী সুনীতিদেবীর জয়গান। কোনো ব্যক্তিই পারেনি তাঁদের পারস্পরিক বিচ্ছিন্ন করতে, মনের মিলন তাঁদের ছিল বড়ই মধুর।

নির্দেশিকা

(১) বিয়ের নাম — কোচবিহার পত্রিকা, ১৯৮৪। পৃঃ ৮১-৮২।

(২) Sunity Devee — The Autobiography of an Indian Princes. 1921. P45.

"During any interview with the Rajah's mother, these ladies expressed anxiety regarding the Rajah's visiting England, which they deprecated on the grounds that after seeing Europe he would never care for such a place as Cooch Behar, nor for such quiet homely people as his relatives.

(৩) Sunity Devee — The Autobiography of an Indian Princes. 1921. P46-47

"When the marriage was first suggested my father was very surprised. He never gave a thought to worldly or family affairs, his mind was too full of his religious work and he refused the offer. But the Government and the representatives of the State would not be discouraged. They continued writing to my father, interviewing him, and sending messages urging that the marriage of the young prince and myself was most desirable. My father repeatedly refused. In one of his letters he said that I was neither very pretty nor highly educated, and therefore I was not a suitable bride for the young Maharajah."

(৪) P. C. Mozoomdar — The Life & Teachings of Keshub Chunder Sen. 1931. P204

"Prospects of the Brahmo Samaj would be greatly muted by such an alliance. Many feel a strong repulsion at the very mention of the match. some we are afraid, out of personal disloyalty, but others no doubt out of honourable conscientious motives. Amongst these were a number of Keshub's English friends, who anticipated the report would affect his reputation on their part of the world."

(৫) P. C. Mozoomdar — The Life & Teachings of Keshub Chunder Sen. 1931. P205

"The protestors took exception to the proposed marriage, firstly

because it was not to be celebrated according to the Marriage Act of the Brahmo Somaj, and Secondly, because the girl was under her fourteenth year, and the Maharaja was not yet known. In the third place, they feared that dilatorious, or at all events authentic rites and ceremonies were likely to be introduced. They also pointed out that the Maharaja not being a Brahmo should not marry the daughter of the Brahmo leader, and they argued that as the custom of polygamy was long in use in the royal family of Cooch Behar the proposed marriage, being independent of the provisions of the Act, gave no guarantee against the injection of that evil."

(২) **Sunity Devee** — The autobiography of an Indian Princes. 1921. P47

"My father with troubled mind prayed and prayed until at last he obtained light from above and resolved that the marriage would be for the spiritual good of the country. Thus he became in the end persuaded that such a union was Divine command, and if he allowed me to marry the young ruler he would be fulfilling the will of God."

(৩) সিদ্ধান্ত পত্রী (প্রকাশ) — ব্রাহ্মবিবাহের সমাজ - কেশব চরিত, ৪৪ শ্রী, পৃঃ ১৯৭।

(৮) Sunity Devee — The autobiography of an Indian Princes. 1921. P51

"I know it will seem difficult to you to arrange for a wedding on the 6th of March, and also that the idea of marrying your daughter before she has completed her fourteenth year is repugnant to you. But consider the circumstances, and that in fact the marriage will not be a marriage in the ordinary acceptance of the term but a solemn betrothal, the Rajah proceeding to Europe immediately after the ceremony."

(২) **Sunity Devee** — The autobiography of an Indian Princes. 1921. P52-53

"My dear Sir,

I have been asked to let you know what my honest opinion is on the subject of polygamy.

In reply I beg to inform you that it has always been my opinion that no man should take more than one wife, and I can assure you that I hold that opinion still.

I give below a statement of my religious views and opinions. I believe in one God and I am in heart a Theist.

Yours truly
Nripendranarayan Bhup"

(১০) ত্রিগুণ সেন — ব্রাহ্মবিবাহের ব্যবস্থা, ১৯৮৭ — পৃঃ ৮৪-৮৫।

(১১) **Sunity Devee** — The autobiography of an Indian Princes. 1921. P54-55

"After a few minutes my father said, 'Sunity, this is a present from the Maharajah to you.' I looked up and as I did so I met the Maharajah's eyes fixed on me full of love, and I blushed, from that the moment future husband and I loved each other. He was so handsome and so charming."

(১২) Ibid P55.

"One thing is certain, I shall not change any religion. Yet, Bina, I love the Maharajah and will marry not one else."

(১৩) শরৎকুমার ঘোষ — শরিষাবাড়ির রাজবংশ সমাজের, ১৯৮৪ — পৃঃ ২৮১।

(১৪) P. C. Mazumdar — The Life and teachings of Keshub Chunder Sen. 1931. P 206-207

"There was to be a Brahma Divine Service, a few essential Brahmo rites such as 'invocation (upasana), marriage vows (adhana pradan) and prayer' (prarthana) and also a few Hindu rites, minus idolatry. These rites, however, and the accompanying sankha resolutions (Mantras) were to be settled beforehand. A description of the rites was subsequently printed and each party had a copy to be used at the time of the wedding."

(১৫) সিদ্ধান্ত পত্রী (প্রকাশ) — ব্রাহ্মবিবাহের সমাজ - কেশব চরিত, ৪৪, শ্রী, পৃঃ ১৯৭।

(১৬) **Sunity Devee** — The autobiography of an Indian Princes. 1921. P 58

"There was one person who was very subtle in his opposition and more powerful than any English Official. This was the Dewan, the late Calica Das Dutt, Prime Minister. He was not in favour of the marriage, because he thought he had been ignored. He was an influential follower of my father's and yet all correspondence relating to the marriage went through Jadav Babu, who was only a junior officer. His quite interference is shown in the following letter written by Mr. Dalton to Mr. Chakrabarty —

My dear Jadav Babu,

The Dewan tell me that he has already written to you regarding my view as to the intent of Baba Keshub Chunder Sen's Party coming to Cooch Behar for the wedding. Of course, my object is to avoid any unnecessary display of Brahmoism. In marrying a Brahmo girl the Rajah makes a great concession to enlightened ideas, but it is most desirable that

this conversion should be achieved as much as possible in the eyes of his relatives at Cooch Behar and elsewhere, who are still wedded to the old superstitions, and who would look with horror upon any departure from the old Hindu formula.

(১৭) বিবাহের নাম — কেশবচন্দ্র সেন গ্রন্থাবলী, ১৯৮৮ — পৃঃ ৮৭।

(১৮) **Harendranarayan Chowdhuri** — The Cooch Behar State & its Land Revenue Settlement, 1903, P 422.

"The bride accompanied by her parents arrived at Cooch Behar from Calcutta on the 27th February. They travelled by Special train from Calcutta to Haldibari, whence carriages and pallis carried them to Cooch Behar. The bride remained in the house which had been prepared for her reception until the night of the 5th March, when according to the custom of the Cooch Behar family, she was conducted to the Rajbari in procession."

(১৯) **Sunity Devee** — The autobiography of an Indian Princes, 1921, P 64.

"Maharaja's mother came and spoke to my mother most harshly. One of her remarks I still remember, 'Do you mean to say you love your daughter? How can you when you do not wish her to marry a Maharajah? If she does not marry my son according to Hindu rites she will not be the Maharani.'

My mother answered gently but very firmly : 'I shall be sorry if my daughter does not marry your son, and I shall take her away from Cooch Behar, but my daughter shall never marry any one according to Hindu rites.'

(১৯) বিবাহের নাম — কেশবচন্দ্র সেন গ্রন্থাবলী, ১৯৮৮ — পৃঃ ৮৯।

(২১) **Sunity Devee** — The autobiography of an Indian Princes, 1921, P 64-65.

"Now give good heed to my words. I am going to bed. If I am to marry this girl, wake me up. Other wise have my horse in readiness, for I shall ride away from Cooch Behar for good and all tomorrow morning. If I cannot marry this girl, I will marry no one."

(২২) Ibid P64.

"Gradually silence reigned. The music and the sound of the Conch shells ceased. The voice of the crowd was hushed. All of a sudden everything stopped. The musicians left the platforms and the town became perfectly quiet, the illuminations were extinguished one by one."

(২৩) **Sunity Devee** — The autobiography of an Indian Princes, 1921, P 66.

"Mr Sen, the wedding must and shall take place tonight. The service shall be exactly as you wish. I'll be there to see that it is not interfered with, come quickly. We have not a moment to lose. There is another auspicious hour at 3 a.m. Let it be then."

(২৪) সিভিলিয়ন পত্নী (ইন্দিরা) — ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল - কেশব চরিত, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২০৪।

(২৫) **P. C. Mazoomdar** — The life & Teachings of Keshub Chunder Sen, 1931, P210.

"The theistic character of the marriage was very much marred, almost every Brahmo present was deeply mortified. But there was some comfort in the thought that the Hindu character of the marriage, the character which officials meant to give it, was also gone. The presence of non-Brahmos present officiating at the ceremony was surely un-Hindu, the bride leaving the scene at the time of the worship of fire was equally un-Hindu. The fact is the marriage ceremonies in the form they took place gave satisfaction to no party, neither to the friends to Cooch Behar family, nor to the friends of Keshub Chunder Sen. The Deputy Commissioner of Cooch Behar, nevertheless, as representative of the British Government, wrote to the papers declaring the marriage to be a Hindu Marriage."

(২৬) **Sunity Devee** — The autobiography of an Indian Princes, 1921, P64.

"If she does not marry my son according to Hindu rites she will not be the Maharani."

(২৭) বিবাহের নাম — কেশবচন্দ্র সেন গ্রন্থাবলী, ১৯৮৮ — পৃঃ ১১-১২।

"I was assured that the Rajah had no faith in Hinduism, but a public renunciation of the Hindu faith was objected to on political grounds. The British Government sought me and my daughter. Christian government that knew me thoroughly to be a Brahmo leader, proposed the alliance, and the weighty interest of a state were pressed upon me with a view to induce me to accept the proposal and make the needful concession."

(২৮) সিভিলিয়ন পত্নী (ইন্দিরা) — ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল - কেশব চরিত, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২০৭।

(২৯) **Sunity Devee** — The autobiography of an Indian Princes, 1921, P67.

"I went through the ceremony with perfect confidence. The Service was performed by Rev. Gour Govind Roy, who was one of the staunchest missionaries of our church, and all the Maharajah's Hindu priests were also Present."

এক নজরে অতীত কামতারাজ্য

স্বপন হালদার

আজ থেকে প্রায় আড়াই শতক আগে কামতারাজ্যের পতন হয়েছিল। তার ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই আমাদের কামতারাজ্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা দরকার। তবে তার আগে কামতারাজ্যের ইতিহাস রচনার উপাদান সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন।

কামতারাজ্যের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে আমাদের প্রধান অবলম্বন হল কিছু তাম্রশাসন, কিছু মুদ্রা, কিছু শিলালিপি এবং কিছু বিদেশী পর্যটকের বিবরণ। তাম্রশাসনগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল বিশ্বসিংহের তাম্রশাসন। এটি ১৫৫৫ শকাব্দে (১৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে) প্রদত্ত হয়েছিল। এই তাম্রশাসনটি বিশ্বসিংহের পুত্র নরনারায়ণের রাজত্বকালে ১৫৮৭ শকাব্দে (১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে) উৎকীর্ণ করা হয়েছিল। এই তাম্রশাসনটি থেকে কামতারাজ্যের ইতিহাসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। এছাড়া কামতারাজ্যের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে আরও কিছু তাম্রশাসন ব্যবহার করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে রয়েছে ১৫৭৭ শকাব্দে (১৬৫৫ খ্রিস্টাব্দে) উৎকীর্ণ নরনারায়ণের তাম্রশাসন, ১৫৮৭ শকাব্দে (১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে) উৎকীর্ণ লক্ষ্মীনারায়ণের তাম্রশাসন এবং ১৬১৫ শকাব্দে (১৬৯৩ খ্রিস্টাব্দে) উৎকীর্ণ বলিনারায়ণের তাম্রশাসন। এই তাম্রশাসনগুলি ছাড়াও কামতারাজ্যের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে কিছু মুদ্রা ব্যবহার করা হয়েছে। এই মুদ্রাগুলির মধ্যে রয়েছে নরনারায়ণের মুদ্রা, লক্ষ্মীনারায়ণের মুদ্রা, বলিনারায়ণের মুদ্রা এবং প্রাণনারায়ণের মুদ্রা। এই মুদ্রাগুলি থেকে কামতারাজ্যের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে বিশেষ সাহায্য পাওয়া যায়। কামতারাজ্যের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে কিছু শিলালিপিও ব্যবহার করা হয়েছে। এই শিলালিপিগুলির মধ্যে রয়েছে কামতেশ্বর শিবমন্দিরের শিলালিপি, কোচবিহার রাজবাড়ির শিলালিপি এবং কোচবিহার শহরের কাছে অবস্থিত মদনমোহন মন্দিরের শিলালিপি। এই শিলালিপিগুলি থেকে কামতারাজ্যের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। কামতারাজ্যের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে কিছু বিদেশী পর্যটকের বিবরণও ব্যবহার করা হয়েছে। এই পর্যটকদের মধ্যে রয়েছেন ফ্রান্সিস বুকানন হ্যামিলটন, রালফ ফিচ এবং সিজার ফ্রেডরিক। এই পর্যটকদের বিবরণ থেকে কামতারাজ্যের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়।

কামতারাজ্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। এই কিংবদন্তীগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল বিশ্বসিংহের কাহিনী। বিশ্বসিংহ ছিলেন কোচ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ছিলেন হাজো রাজ্যের রাজা। তিনি ১৫১৫ খ্রিস্টাব্দে কামতা রাজ্য জয় করে সেখানে নিজের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কামতা রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করেন কামতাপুরে। তিনি কামতাপুরে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। তিনি কামতাপুরে একটি মন্দির নির্মাণ করেন। তিনি কামতাপুরে একটি পুকুর খনন করেন। তিনি কামতাপুরে একটি বাজার স্থাপন করেন। তিনি কামতাপুরে একটি স্কুল স্থাপন করেন। তিনি কামতাপুরে একটি হাসপাতাল স্থাপন করেন। তিনি কামতাপুরে একটি ডাকঘর স্থাপন করেন। তিনি কামতাপুরে একটি টেলিগ্রাফ অফিস স্থাপন করেন। তিনি কামতাপুরে একটি টেলিফোন এক্সচেঞ্জ স্থাপন করেন। তিনি কামতাপুরে একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করেন। তিনি কামতাপুরে একটি জলের ট্যাঙ্ক স্থাপন করেন। তিনি কামতাপুরে একটি রাস্তা নির্মাণ করেন। তিনি কামতাপুরে একটি সেতু নির্মাণ করেন। তিনি কামতাপুরে একটি বাঁধ নির্মাণ করেন। তিনি কামতাপুরে একটি খাল খনন করেন। তিনি কামতাপুরে একটি নদী খনন করেন। তিনি কামতাপুরে একটি হ্রদ খনন

পুরিয়ে ৬৫ কর্মচারী পড়ে উঠতে পারে।

পলাশের পর তারাক ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে ক্ষমতায় বসেন। পঞ্চাশের দুর্ভার পর ইনি পুত্র ৩৪জন বাজা হন। ইনি আমলে ভয়ের রাজত্ব সময়ে ইনি দুষ্ট হয়েছিল।

১৪১৩ খ্রিষ্টাব্দে ৩৪জনের দুর্ভার পর উত্তরাধিকার সূত্রে মৃত্যুক কামরাপুরের রাজা হন। কিন্তু, তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। ফলে দুর্ভার পর কামতাপুরের রাজনৈতিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়। এই সুযোগে নীলাম্বর কামতারাজা দখল করে নেন, রাজ্যের সূচনা করেন। তিনি কামেশ্বর উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।

নীলাম্বরের দুর্ভার পর তাঁর উত্তরাধিকারী বলরাম কামতাপুরের সিংহাসনে বসেন। তাঁর আমলে কলমুদ্ধি রাজ্য কামতারাজ্যের উপর আক্রমণ করে। এরপর ১৪৯৩ খ্রিষ্টাব্দে চক্রধ্বজ কামতাপুরের সিংহাসনে বসেন।

চক্রধ্বজের দুর্ভার পর নীলাম্বর কামতাপুর আক্রমণ করে (১৪৯৩ খ্রিষ্টাব্দে)। ঐ সময় গৌড়েশ্বরের সঙ্গে হাবসিদের সংঘাত চলছিল। তিনি রাজ্য-ঘাটি, দুর্গ ইত্যাদির সংস্কার করেন রাজ্যরক্ষার্থীদের নিয়োগ দিয়ে পারেননি।

১৪৯৫ খ্রিষ্টাব্দে আলাউদ্দিন হুসেন শাহ গৌড়ের অধিপতি হন। সিংহাসনে বসেই তিনি উড়িষ্যা দখল করেন। সিংহের মৃত্যুসনদের মধ্যে তাঁর আমলে বহু হিন্দু-মন্দির পুনর্নির্মিত হয়েছিল। তাঁর আমলে কেশব মিশ্র পুরাতন হিন্দু-পদ্ধতিতে এবং অনুশাসনের সূচনা হয়েছিল। হিজলাদেব হলেন পালের দুই হিন্দু সেনাপতির এক যাঁকে নিজের সপক্ষে আনতে পেরেছিলেন। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের রক্ষক ও হিন্দুদের রক্ষা করার জন্য তাঁকে হিজলাদেবকে হত্যা করতে হয়েছিল। তিনি ঐ দুই সেনাপতি — মন্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। ফলে সালে ১৪৯৮ খ্রিষ্টাব্দে কামতারাজ্য আক্রমণ করে। হুসেন শাহ ২৪ হাজার পদাতিক, প্রায় হাজার অশ্বারোহী এবং শতর নৌবাহিনী নিয়ে অবস্থা আক্রমণ করেন। কোচবাহিনীর মূল পরিচয় ছিলেন হুসেন শাহের শ্যালক মুলুকে গাজী। এছাড়া তিনজন সেনাধ্যক্ষ ছিল তাঁর। মজলিস গাজী, ভালু সেরবরম এবং দিয়ানুদ্ধি।

> *"ক্ষুদ্র জাতির উপর বৃহৎ জাতির অত্যাচার।*
> *ভাষার প্রতি নিপীড়ন।*
> *শিল্পির শাসকদের উদাসীনতা, দারিদ্র, শোষণ।*
> *তাই এ সবের পরিপ্রেক্ষিতেই*
> *আজ আত্মমর্যাদার প্রশ্ন তুলেছে।*
> *সুষ্ঠুভাবে এর মীমাংসা*
> *একান্ত প্রয়োজন।*
> *নচেৎ বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং*
> *সন্ত্রাসবাদই প্রশ্রয় পাবে।"*

বিহির দিক থেকে কামতাপুর আক্রমণ হুসেন শাহের পক্ষে সুবিধাজনক ছিল না। তিনি দুর্গের মধ্যে থেকে বহুদিন ধরে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারেন। যুদ্ধের ফলাফল কারোর পক্ষেই সুনিশ্চিত না হওয়ায় হুসেন শাহ এক সন্ধিপত্র প্রস্তাব করেন। নীলাম্বর তাতে সম্মতি জানান। ঠিক হয় যে, যুবরাজ সন্ধিস্বরূপ নীলাম্বরকে আলাদে ডাকেন — হাতি, ঘোড়া, কৌরানী বিনিময় হবেন। নীলাম্বর খুশি হন। কিন্তু মহিলা ছদ্মবেশে সুরক্ষিত দেহরক্ষী আলাদে ডাকে এবং কোচ-বাহিনী অন্ধকারের সুযোগে না দিলেই নীলাম্বরসহ সমস্ত রাজপরিবারকে বন্দী করে ফেলে। তাঁদের বন্দী করে গৌড়ে নিয়ে আসা হয়। হুসেন শাহ তাঁদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেন এবং ইতিহাসে উল্লেখ নেই।

হুসেন শাহের সেনাপতি আলাউদ্দিন কামতাপুরে অবস্থান করে শাসনকার্য চালান। সমস্ত কামতা রাজ্যে হিন্দু শাসনের পতন ঘটায়। বহু মন্দির লুপ্ত করে।

পৃথিবীর ইতিহাসে সিজোফ্রেনিয়া কর্তৃক কোনোদিন ও উপমহাদেশের ভোটে কোনোদিন রাজনৈতিক ভাবপ্রতিফলনে ভোগেনিনিই আমরা এখানে এ। এরপর ১৪০৯ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে নলাম্বর অবশ্য রাজবংশ সম্রাটের কামতাপুর পুনরুদ্ধার করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর দুর্গাদেব কামতারাজ হন। তাঁকে পরাজিত করে বিশ্বসিংহ কোচ-রাজ্যের পত্তন ঘটান।

ইতিপূর্ব থেকে সেই ছিন্নভিন্ন সমাজে চলেছে। ক্ষুদ্র জাতির উপর বৃহৎ জাতির অত্যাচার। ভাষার প্রতি নিপীড়ন। শিল্পির শাসকদের উদাসীনতা, দারিদ্র, শোষণ। তাই এ সবের পরিপ্রেক্ষিতেই আজ আত্মমর্যাদার প্রশ্ন তুলেছে। সুষ্ঠুভাবে এর মীমাংসা একান্ত প্রয়োজন। নচেৎ বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং সন্ত্রাসবাদই প্রশ্রয় পাবে।

কোলকাতার কোলপোঁছা

গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

লো

কোলকাতার কোলপোঁছা

— নতুন ফটিকটাদ এসেছে। একটা হৈচৈ ফেলে উঠতেই ভিড়টা এক নিমেষেই ফেঁপে উঠল। সবচেয়ে সামনে ফোলার গালে একজন বুড়োমতো লোক, মনে হয় অবজারভেটরির থেকেই, ঝুঁকিয়ে ঝুঁকিয়ে আর বলতে বলতে চলল — বাপসকল, মনে রেখো—এইসব। ফটিকটাদদের বসুমুদ্দুর আর পথেঘাটে নিয়ে কোলকাতার 'জনগণ': আর এই জনগণের ওপরে হয়েছেন যাঁরা, তাঁরা নিজেরা রাত করতে পারেন কিন্তু রাতকে দিন করতে জানেন না। জনগণ হঠাৎই আলো পাওয়ায়। অন্ধকারে কীসব দেখতে পেয়ে হল্লা জুড়ে দেয়। তাই তো 'হাঁকডাকুকা'র নাম হয়েছে 'আলোকায়ন'। আর কপাকপ ছাপ মারার নাম হয়েছে 'ফোটো'।

ভোলা দেখল এই বৃদ্ধ অনেকটা সময় ধরে ওঁর মনের কথা বলতে থাকবেন এবং মানুষের অভাবনীয় ওর সঙ্গী হবেন ঠিক করেছেন। হাই স্কুলের গন্ধ থেকে বুদ্ধির হাওয়া ছাড়িয়ে নিয়ে ভোলা বলে উঠল —এরই নাম কোলকাতা হিস্টোরিয়ম হল।

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে নাকের ওপর থেকে চশমা নামিয়ে ভোলার হাতখানা ধরে ফেলে বললেন, ঠিক বলেছ ভাই, এরই নাম হিস্টোরিয়ম — হয়ে যে গেছে একবিংশ শতাব্দী, তবে তোমরা হিস্টোরিয়ম হবে না? তোমরা একটা কিছু কর্ম না, বাপু — আমরা তো পারলাম না।

এবার আত্মসমালোচনা শুরু হবে বুঝে, ভোলা এক দৌড়ে গিয়ে ট্রামটায় ঝুলে ট্রামে চড়ে বসল।

রবীন্দ্রসদন কোলকাতা ময়দানের মৌতাতে মজতে গিয়ে ভোলারাম বোস প্রায় ঘুলিয়ে মনে গেল। ঠিক করল একদিন পরে বলতে গেলে প্রায় একযুগ পরে কোলকাতায় এসেছে। মার কাছ থেকে ভোরবেলায় গাড়ীটা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। মার কাছে গাড়ীটা নিতে হলো। কিন্তু মায়ের কাছে ফেরার হলেও প্রাক্‌মুহূর্তে ফোন করে।

ঠিক করল পকেটের একটি টাকা এই ময়দানে খরচ করে হলেও কী আছে তা জেনে নেবে। এই ভেবে এক বন্ধিমা পাখির মতিকের মাটিতে পাতা হটের 'উড়ুক্কু-মানচিত্র বাংপটি' রাখা খাঁচাটার কাছে গেল। পাখিটা নেচে নেচে ঘুরঘুর করে উড়ে এসে কার্ড তুলল, তাতে লেখা — বিয়ের মূল ঘুটিছে।

— আঁ! বলে আঁতকে উঠে ভোলা সেখান থেকে সে-হাওয়া। আবার বলে বিসা — ঘুটিছে! এর চেয়ে ঐ যে সেতারটা আমের খেপে যায় করছে নকল নিয়ে - ওকে ঐ জিনিসটা দিলে হয়! কান ঘুটোর ছিদ্র হত। থরু গে, মরুক গে — বলে, ভোলা ছিটকে মাঝখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই দেখতে লাগল। ধ যাবা, একেই বলে কোলকাতা-ময়দান। ঘুচলো-খাওয়া একটা শালপাতার ঠোঙা থেকে আরম্ভ করে, নল দিয়ে টেনে সরবত খাওয়া পর্যন্ত, কী হৈ-হল্লার মধ্যেই না চলছে সব কিছু।

এই সবেরই মাঝখানে জমুমেন্টটা দাঁড়িয়ে আছে যেন একটা তালপাতার সেপাই। 'ঘটাই সজ্জাও আর ভালো লাও, ও জিনিস আর চলবে না, ওর সিঁড়িতে একটা টি.ভি. সেট বসিয়ে দিলে বরং অনের বেলেল্লাপনাটা বাইরে চালান করে দেওয়া যেত। মনে মনে কথাগুলো বলে ভোলা হাসতে লাগল।

হঠাৎ কানে এল — বঙ্গসংস্কৃতি কথাটা। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল সিনেমায় দেখা কয়েকটা আধুনিক ধরনের ছেলেমেয়ে, জিভ দিয়ে হাঃ, ঃ হাঃ, শব্দ করে কালমুড়ি আর চুড়মুড় খাচ্ছে আর — বলছে ঐ তাই নাকি! ধরনের কথার পিঠে বলা হচ্ছে আমরা দিচ্ছে। একটি ছেলে, ভালো করি জিনস আর টিশার্ট পরা পরা, বলছে — বুঝে। আমার বলে জিনস কলকাতা বাংলা! মাইরি। তখন ভোলা হি হি করে হেসে ফেলায়ই এরা ঘুরে গাছে ওকে দেখে ফেলে ঐ গাছেরই মতো। ঐদিকে একটা ভোলাকে পাচ্ছে ওপর বলে আরো জিনিসের। ঐটি — মাল?

প্রাক্‌কালের জলদূরে যে! চলে আসুন, এক ভাঁড় হয়ে যাক। ভোলা মাথা নেড়ে ঠাঁপটা পথ ধরে হনহনিয়ে হেঁটে যায় গান্ধীজীর মূর্তির কাছে। দাঁড়ায় হাসে — জাতির বাঙালির মূর্তি! হায়রে বাঙালি! সেই — কূপ বাঙালিই থেকে গেলিরে ভাইসব!

আজ আবার পড়িশে রবিঠাকুরের জন্মদিন। দুর্গা — রবীন্দ্রসদনের দিকে পা বাড়াল ভোলা ময়দানে, সেই-সেই করে গাছের ফুল টুপটাপ পড়ে পড়ে পাচ্ছে: সেটা ভোলে ভালো না হয়ে, তাদের ভুলিয়ে রাখা, ঘুটির ভালো, সাজানো টাকা ঘটির ভালো।

রবীন্দ্রসদনের ভিতরে ঢুকে একদল ভোলাকে, ভাবলেশহীন সেই মানুষ থেকেই শুরু হয়ে গেছে। একে একে হয়ে গেছে ঠাঁ পড়ে গেছে, ভাবে মাঝে মাঝে ঘুরিয়ে রাখা, কিন্তু তাদের ভালো — সবার ভোলাদাদুর কথা গেছে মনে বসন্তের এই সমীরণে ভোলা গে ঠা-ঠা এ না হলে কবি। ভোলাও হয়ে হয়ে হয়ে হঠাৎ সে থমকে থেমে যায়। পাথরের এই শিল্পশৈলী কেন বসানো? একজন বাস্তুশাস্ত্রজ্ঞ ডেকে জিজ্ঞেস করল —দাদা, এই শিলাখোড়টা কে এখানে গাঁড় লোকটি তো হতভম্ব!

— বলেন কী, মশাই! এ ঐ রবীন্দ্রনাথের মূর্তি — রবীন্দ্রসদনের সামনে এটা বসে মূর্তি হয়ে পাবে ভোলাদাদা। ভালো ঘুরিয়ে ভালো ভোলাদাদা।

রবি ঘোষের আড্ডার গপ্পো

চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য

ঘটনাস্থল আমাদের বাড়ি থেকে মাত্র কয়েকশো গজ দক্ষিণে ঐতিহ্যমণ্ডিত ছাতুবাবুর বাজার। কেন্দ্রবিন্দুতে বেশির ভাগের সঙ্গেই ঐসব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা জড়িত ছিল। ঐতিহাসিকরা ঐসব ঘটনাই বাঁচিয়ে নিয়ে অমর্ত্য ইতিহাস লিখেছেন হয়তো। পাঠক-পাঠিকাদের জন্য সেই সব গল্পগুলিই কয়েকটি তুলে দেওয়া হল এখানে। বিনামূল্যে বাহুল্যেই।

******

যাত্রাসম্রাট তখন উঠতি ক্রিকেটার ছিলেন। ইচ্ছে হল বাবাকে একবার দেখাই পেশাদারদের খাটিয়ে কী জিনিস। পাশে খেলতে খুব ভয় পেতে হয়তো তাই দুখলা টিকিট জোগাড় করে বাবার হাতে তুলে দিলাম। বাবা আর পিসেমশাই দুজনে যাবেন। ইন ফাই, বাংলা ভাগ হবার পর ওঁদের দুজনেরই আর খেলা-টেলা দেখা হয়নি। দুজনে ড্রেসিংরুমে ঢোকেন খেলা দেখতে। সেবার যাত্রাসম্রাট খুব ভাল খেলেছিলেন। আমি মনে মনে তুষ্ট। বাবার খেলা দেখতে যাওয়াটা বৃথা যায়নি বলে। সন্ধেবেলা বাবা বাড়ি ফিরে দেখি বাবা আর পিসেমশাই জোরালো গল্প করছেন। কাঁচুমাচু মুখে (বাবার সামনে মুখ তুলে কথা বলার সাহস আমাদের কারুর ছিল না।) বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম — বাবা, খেলা দেখতে গেছিলেন? বাবা গম্ভীর মুখে বললেন — হুঁ! আবার জিজ্ঞেস করলাম — যাত্রাসম্রাটের খেলা কেমন দেখলেন? বাবা গম্ভীর মুখে রায় দিলেন — উঁ... এ অ অ... তবে ঢাকার রমনার মাঠে আমাদের শোনা যেমন খারাপ, সেইরকম কিছু না। বলেই পিসেমশাই এর দিকে চেয়ে সমর্থনের আশায় জিজ্ঞেস করলেন — কি বলো? পিসেমশাই তত্ত্বোধিক গম্ভীর মুখে গলাটা নীচে নামিয়ে ঘাড় দুলিয়ে বাবার প্রতি সমর্থনসূচক ভাব দেখিয়ে বললেন — হুঁ অ অঃ।

******

আমার পিসিমা তখন বিধবা। পিসিমাকে নিয়ে ট্রামে করে যাচ্ছি এক আত্মীয়ের বাড়ি। গাড়ি মোটামুটি ফাঁকা। আমার বসার জায়গা নেই বটে তবে পিসিমার বসার মতো সিট খালি আছে। সেই সিটে এক ভদ্রলোক বসে। পিসিমাকে বারবার বলি — বসো না। পিসিমা বলেন — না ঠিক আছে। জিজ্ঞেসই করলাম না। শেষে জিজ্ঞেস করলাম — তুমি বসবে না আমি? পিসিমা বললেন — তাহলে তো হয়। আমার পিসিমা ওপরে কোনও কথা বললেন — আমার পাশে বসো। তোমার জায়গা নাই। পিসিমা বললেন — ধুর, জায়গার কথা কে ভাবছে তো পৌরুষকে প্রশ্ন করলে এ কাগজ লিখে নেবে আগে পাশে বসে যাও। ঘটি এই হাত পাশে নিয়ে আসে।

******

আমার সোনাকাকার ক্রিকেট খুব খারাপ, দেখতে গেছি একবার। সোনাকাকা ব্যাটিং (যে খুব ভাল না — একটু সাবধানে ওভারগুলো সোনাকাকার পৌরুষ ঢেকে ঢিল।

ট্রেনারকে ট্রেনারকে বলালেন — আমি অসুস্থ! আমি অসুস্থ! তোমার ভেনেজুয়েলীয়ের ভিসা ক্যানসেল করে দিতে পারি। অর্থাৎ, স্ট্রীককে ঠিকঠাক আনার ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

*****

আমাদের এক বন্ধু ছিল। তার ডাক নাম কবি মুখার্জি। তার সঙ্গে আমাদের আড্ডা জমত প্রতিদিন প্রায় মোটামুটি। একদিন আমরা অন্ধকারের প্রায়ে ঢুকেছি। দেখি কবি গম্ভীর মুখে বসে আছে একা। সাধারণ অর্থেক কেউ একা থাকে না। আমাদের দেখেই সে গুটিয়ে উঠল — কবি, তোমা এসে গেছিস? বলেই আমাদের টেবিলে একা ছেলেদের মধ্যে একজনকে আমল আম করে খুঁজি। হৈ হৈ..... একেবারে শান্তিনিকেতন আর কী! সন্ধ্যাটাকে অনেক কষ্ট করে পার করি। শেষে জমল ভালো। কবি একা একা বসে থাকছিল। ইন্টারভিউকের টেবিলে আরা বসেছিল তারা সব বড় বড় কোম্পানির এক্সিকিউটিভ। তারা নিজেদের মধ্যে গল্পগাছা করছিল। কেউ হয়তো বলছে, —এবার সাজনে বড় চান্স পেয়েছি। পাশের টেবিল থেকে কবি কুট কাটল — হাসির জন্যেও লাইন দেখনি! সম্পূর্ণ অচেনা লোকের মুখ থেকে একথা শুনে আলোচনাকারীরা হতবাক! আড্ডা কবির দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল —কী বললেন? কবি জবাব দিল — কিছু না। ভদ্রলোকের ছেলে নিজের পায়ের তাল খাচ্ছি। তখন অন্য টেবিলের ছেলেরা আবার নিজেদের কথায় মশগুল হয়ে গেল। কথা বলতে বলতে হঠাৎ একজন বলল —রামদুর্গে সন্ধ্যেবেলার সময়ে কেমন হয়, বুঝলি! জমজমি ব্যস্ততা — হাসিখুশি আলাপ জমাতে দেখি। বক্তা তখন বিরক্ত হয়ে বলছে — কী বললেন? কবি তখন উত্তর দিচ্ছে — কিছু না। ভদ্রলোকের ছেলে নিজের পায়ের তাল খাচ্ছি। একবার বার তিনেকের পরে একজন বিরক্তিবিরক্ত হয়ে কবির

"বাবা একদম পছন্দ করতেন না
আমার নাটক করা।
ঘরের মেয়ে বনের মোষ তাড়ানো।
এ নিয়ে প্রচুর বকাঝকা করেছেন। মা আমার
পক্ষ নিয়ে কিছু বলতে গেলে
উনি ঝাঁকিয়ে উঠতেন — থামো তুমি,
উনি ওভিন্যাতা হইবেন! ওভিন্যাতা!
তোমায় পোলাপানে কাঁচ অ্যাকবার আয়না দিয়া
নিজের মুখখান দ্যাখতে।
ওই রকম বান্দরের মতন মুখ লইয়া
ওভিন্যাতা হওন যায় না।"

কলার চেপে ধরে। কবি তখন ঘাপ চেয়ে নেয়। তখন থেকে গুম হয়ে বসে ছিল সে। এখন আমাদের চুকতে দেখেই প্রতিশোধস্পৃহা জেগে ওঠে তার। তারই জলজ্যান্ত ওই খুনি। ভাগ্যিস ওই বলার মধ্যে দু-একজন আমার মুখ চিনত। ব্যাপারটা আর বেশিদূর গড়াল না।

*****

এই কবি মুখার্জির অনেক গল্পই আছে। একবার আমরা তিন-চার-জন বন্ধু মিলে ভিক্টোরিয়ার বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছি। এটা ৩টা বেজেছে। এমন সময় কবি একটা জায়গা ফাঁকা পেয়ে বসল। একেবারে গায়ের প্রান্তটি ঘেঁষে, যেখানে ভাল হয় তোমরা বাসযাত্রীর প্রবীণ অবসরপ্রাপ্ত প্রাইমারি শিক্ষক হবেন, টাকাটা নিয়ে আসছিলেন। কবি এগিয়ে দিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করল — কি ভালো আছেন? ভদ্রলোক একটু অন্যমনস্ক মুখে বললেন — হ্যাঁ। কিন্তু আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না। কবি গম্ভীর মুখে বলল —আমিও না। বলেই একে পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

*****

একবার আমি, পুলু (সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়) আর তপেন (দত্ত) কোথায় যেন যাচ্ছি ঠিক করে গ্রামের পথে। পথে দেখি অনেকটা ঠ্যাঙাড়ে কোথাই বাস যাচ্ছে। ফলে রাস্তা প্রায় বন্ধ। গাড়ি থেকে গলা বাড়িয়ে এক ঠ্যাঙাড়েকে জিজ্ঞেস করলাম — হাঁরে ভাই। অ্যাতো বাস যে সে যাচ্ছে, তা দেখে আসে? ঠ্যাঙাড়েরা নির্বিকার উত্তর — আর যে কখন কী দরকারে পড়ে যায় কি ঠিক আছে বাবু। সন্ধ্যার হলে আপনারেও যে নিতে পারি একখান বাস। আমি চুপ। পুলু বলল — কেমন। আর লাগবে আমি?

*****

একবার কোথায় ঠিক মনে নেই, বেশ পান-ভোজনের ব্যবস্থা হয়েছে। আমি, পুলু বসে রয়েছি। একটু হাতের নিচে

"পরবর্তীকালে নাটকে যখন একটু-আধটু নাম হয়েছে বাবার হৃদয় অনেক নরম হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমার অভিনয়টা আর দেখে যেতে পারেননি, এই দুঃখটা আমার মনে চিরকাল রয়ে গেছে।"

একজন বেশি মদ্যপানের ফলে একটু পেটরোগা হয়ে গেছে। তাকে বাবলের ছোট পেটা হয়েছে। কিন্তু সে কিছুতেই ছোট থেকে বাবার দুধে মুখ আদৌ নিয়ে যেতে পারছে না। কখনও বাবার মুখ হাত চলে যাচ্ছে নাকে, কখনও যাচ্ছে কপালে, কখনও বা গালে। আমি পুতুলকে বললাম — একটা মজা দেখবি? একটা গ্লাসে অনেক জল এনে ওর হাতে ধরিয়ে দে। পুতু সেই ব্যবস্থা করল। আর অমনি আরাল লোকটির হাতের গ্লাস ঠিক পৌঁছে গেল মুখে। একটুও এদিক ওদিক হল না। এক চুমুকে গ্লাস শেষ। সবাই আর হেসে বাঁচে না।

***

যারা একদম পছন্দ করতেন না আমার নাটক করা। অনেক খেয়ে অনেক মেরে তাড়ানো। এ নিয়ে প্রচুর বকাঝকা করেছেন। যা আমার পক্ষ নিয়ে কিছু বলতে গেলে উনি ঝাঁঝিয়ে উঠতেন — জানো তুমি, উনি ওডিনারি হয়ে গেছেন! ওডিনারি! ভেবেছো পোলাপানে কও অ্যাকটিং আরেকটা কিছা নিজের মুখখান থাকতে। এই রকম বাবলের জন্য দুধ লইয়া ওডিনারি হওন যাই না। ওডিনারি হইতে গালে বুর্গিসনের মতন ছাবরার প্রয়োজন বুঝলানা?

কিন্তু নাটকের নেশা তখন ভূতের মতন চেপে বসেছে আমার মাথায়। এসব কথা কি আর কানে ঢোকে? সারাদিন নাটক নিয়ে মেতে থাকি আর গভীর রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে বাড়িতে ঢুকি। একদিন বাড়িতে বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে দেখি বাবা পায়চারি করছেন বাড়ির সামনে। আমায় দেখে বললেন — জানও (দাঁড়াও)। তারপর বারান্দার দোতলার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে একটি পুঁটলি দেখিয়ে বললেন, ওইটার ভইতে একখান জামা, একখান পাঞ্জাবি আর পঞ্চাশ টাকা আছে। এই বাড়ির ধরলা আইজ থিকা তোমার জইন্যা বন্ধ। নিজের বন্দোবস্ত নিজে করো গিয়া। বলে আমার দরজা বন্ধ করে দিলেন। আমি নির্বিবাদে পুঁটলি বগলে জমে টাকাটা পকেটে পুরে দোতলার পাঁচিল টপকে বাড়িতে ঢুকে গেলাম। মা জেগেই ছিলেন। চুপিচুপি আমায় খাইয়ে-দাইয়ে শোবার বন্দোবস্ত করে দিলেন। এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি পরেও হয়েছে।

পরবর্তীকালে নাটকে যখন একটু-আধটু নাম হয়েছে বাবার হৃদয় অনেক নরম হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমার অভিনয়টা আর দেখে যেতে পারেননি, এই দুঃখটা আমার মনে চিরকাল রয়ে গেছে।

শ্রী কোষ্ঠকাঠিন্য ঘরামি

সুমন ঘটক

এক মেডিকেলস্টোরে ঔষধ কিনতে একটি লোক এসে ডাক্তারকে বলল।

ডাক্তারবাবু মেডিকেলস্টোর বন্ধুদের জন্য কিছু ঔষধ তৈরি করছিলেন। তিনি ঘাড়টা ঘুরিয়ে লোকটার দিকে তাকালেন। তারপর চশমাটা ঠিক করে নিয়ে ভালো করে লোকটাকে দেখলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন — কী নাম? আর কোষ্ঠকাঠিন্য ধরেছে?

মেডিকেলস্টোরে ঢুকেই লোকটা প্রথম — দাদাকে আগে দেখেছে আগে ভিড় করে আছে কোষ্ঠকাঠিন্য আছে? মেডিকেলস্টোর ডাক্তারবাবুর কথা শুনে হাসিমুখে বলল — ইয়েস, আমি এখনো বুঝতে পারিনি, কাকে কোষ্ঠকাঠিন্য ধরেছে।

একটু ভয়ে ভয়ে বলল — আমার মানে, আমিই কী কোষ্ঠকাঠিন্য ধরেছি।

মেডিকেলস্টোর যেন বাস্তব করলেন — কী যে বলো সব। এতে কোষ্ঠকাঠিন্য হয়ে লোকের আসার অভ্যাস। তাহলে, তুই যে বলছিস, তুই কি যে তৈরি করিস।

কোষ্ঠকাঠিন্য দুষ্টু হাসির সাথে উত্তর দেয়— আমার, আমাদের পাড়ায় শ্রী ধরণীধর খুব জনপ্রিয়। তিনি কি পুরস্কারটি পাননি না। নিশ্চয়ই পান। পুরোহিত সবাই অভিনয় ছাড়াই করেন। অর্থাৎ আমিও তাই। আমরা ঠাকুরদা ঘর তৈরিও করে থাকেন। যারা ছিলেন পুরস্কারটি অভিনয়ের দিক। কিন্তু সেই প্রকৃত ঘরামি ছিলেন, তাই আমিও ধরেছি।

মেডিকেলস্টোরে ডোর ঢুকানোর ক্লাসে ছাত্রির হেসে। কোষ্ঠকাঠিন্য ঠিক মিনিমাম থেকে আরও এগিয়ে যায়— স্যার, ছোটবেলায় আমার ছিল কোষ্ঠকাঠিন্য। সবাই আমাকে কোষ্ঠকাঠিন্য বলে ডাকত। আর সেই থেকে আমি হয়ে পড়েছি কোষ্ঠকাঠিন্য ঘরামি।

আবার হাসির বন্যা। তবে এই কথাতে মেডিকেলস্টোরও যোগ দেন। বলাবাহুল্য কোষ্ঠ কাঠিন্যে আর সহপাঠীদের কাছ থেকে কোষ্ঠকে নানাপ্রকার হয়েছিল।

প্র তি যো গি তা

শিখরের ছায়ায়

শঙ্করলাল ভট্টাচার্য

শিখরে নিজের অস্তিত্বের একটা বড় অংশই দেওয়ালের ওপারে রাত কাটাচ্ছে।

একাগ্রতাই যোগ। একাগ্রতা অর্থে বড় হবে এই ভাবে হিমালয়ের প্রকৃতিকে দুহাতে বুকের ভেতর আগলে রাখছে। ছোটো ছোটো মনের আর্তিগুলোকে নিয়ে ঐশ্বর্য ছেড়ে সেইদিনে একাগ্রতার দিকে তাকিয়েছিলেন অনেক মানুষ, তাঁরা মনে করেছিলেন আজ, যদি কোটি কল্প পর, শিখরটির নিজেকে ফুরাবে। তাঁদের সুখের বিনাশের ছোঁয়া লাগা কুয়াশা শিখরের কঠিন আড়াল থেকে মেলিয়ে নিজের মনে হওয়ার কথা নয়। তাঁদের বেলাভূমির ধারে একাগ্রতাই ঢেউ ভাঙা, আকাশ, ঝোড়ো-হাওয়া। কিন্তু মুখে এখন যাঁরা হিমুকন্দ হাতিয়েছিলেন এই কুয়াশা আসছে দিকে। কিন্তু একাগ্রতাই ফিরে এসেছিল একাগ্রতা নিয়ে তাঁর এই পুরোনো অনুভূতি—ঢুকেছি বন্ধ এবা।

আর এখন ঢুকোয় উঠে এসে বিকেল, রোদ-নিভেই অন্ধকারে পথে নিজেকেই বন্ধ নিজের ঠেকাতে লাগল আলসির।

আলসির এর বয়স-কুয়াশাটা পাশে রেখে ঢুকোয় বসলেন। একাগ্রতাই ক্রমের হয়ে ওঠা দেখে এসেছেন একাকার, তার সঙ্গে এই দৃশ্যটা মেলানো বড় কঠিন। ধরলেন শেরপা তাং সিরি যেমন বলে — মেয়েলোকের দিকে ওরা আসে হল কুয়াশা সাঁতরেদের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসবের দিকে যাওয়া। দু বছর আগে তাং সিরির ভাই বরফ চাপা পড়ে মারা গেছে সেপ্তারের ৮৫৭৭ ফুটের ক্যাম্পের কাছে ঘুটি নিয়ে, এর সঙ্গে আরও ছজন অভিযাত্রক। আলসির নিজে এবং আরও সাতজনের কলকাতায় ফিরে গেছেন। সব শুনে তাং সিরি চুপচাপ খুব কাঁদল, তারপর চোখের জল মুছে বলেছিল — মুখে কী? আমের কোলে ওঠে আছে না। ভোর সকালে সূর্যকিরণে ওর মুখটায় হবে।

অন্ধকার আলো ঠেলাতে ঠেলাতে ওপাশে উঠে এ কোন অন্ধকারে এসে পড়লেন তিনি? ঘন্টা দুয়েক আগেও আলো দেখেছেন তিনি একাগ্রতাকে পাশে আর্তিন একটা ছবি তোলার কথা বলেছিল আলসির এর ইন্সটামাটিক ক্যামেরাটা ওর হাতে দিয়ে বলেছিলেন, তুমি তো জান, ছবি তোলার হাত আমার ভাল না। তুমিই বরং তুলোটা করো কাজেলায়।

ও ক্যামেরাটা নিয়ে বলল — তুলো নয়, আমি আপনাকেই নিয়ে চাই শিখরের পশ্চাদপটে। আর্তিন জায়গেরা ঠোক বাগল ঠিকই, কিন্তু পরিষ্কার টেপা হল না। মাত্র দু-চুটি মুখে পাঁতিতে অন্ধকারের আড়াল প্রায়ুমেরের গলা শোনা গেল — জর্জ আমি আপনাকে দেখতে পাচ্ছি না। আপনার আর আমার মধ্যে একটা কুয়াশার ঢেউ রইছে। আলসি কোথায়?

কুয়াশার ঢেউয়ে পড়ার অভিজ্ঞতা কম নেই আলসির। তবে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এমন বিভিন্নতার আগে দেখেননি কখনও। ওঁর আর আর্তিনের মধ্যে কুয়াশার দেওয়ালটা হঠাৎ শক্ত হয়ে গেল কেন। আলসি ওঁর টুথব্রাশটা নিয়ে সামনের দিকে নাড়তেন একটু, যেন কুয়াশা ঠাট্টা হঠাৎ বন্ধু নিজের মনে হলো এবং সেই সঙ্গে মনে হলো ঘোর আর্তিনের ভয় — ওর! আলসি একাকার? এই ভিন ঠাট্টা! এই কুয়াশার ওপর ওঠা-নামা পাহাড়ে ঢাঁদ ওঠার নয়।

আলসি ক্যামেরাটা ফেরত দেওয়ার পরেই ওঁকে ঘিরে ধরেছিলেন — একাগ্রতাই ছোট্ট টুকি হাতে আলসি ঢাঁদ তুলতে চাইল কেন। ঈশ্বরে আর্তিন যে বলেছিল যা একদম আলসির কাছে বাজছে — তেন জানিল ভর্ক, হয়ে ওই একাগ্রতাকে একটু নিজে আলসাতে ঢাকে বন্ধ নিজের ধারণা।

আর্তিনটি প্রশ্ন করেছিলেন আলসি, — আজে? আমাকে, না একাগ্রতাকে?

আর্তিনের উত্তরটা প্রশ্নে ঠিকই ছিল — আপনাকে।

আরও বুজন কুয়াশা ফেটে যেতে লাগল একাগ্রতার জন্য জোর পায়ে এগিয়ে থাকলেন। কুয়াশার ঢাকা ঢুকোয় ঘাঁকে

কে কোথায়, কোন দুঃখে, তার সামনে উপস্থিত এখন শুধু ঝরনের ওপর ঝুঁকে আছে কুয়াশের পশম। স্নান ঘরে বাথার জন্য আর কোনও দুঃখ কথা নেই। মালবির মনে পড়েছিল বুখারা আগে ট্রিপোলিয়ার জেনারেল দার্লিন এদের নেতৃত্বের সেই অভিযানের অন্তিম পর্ব। সাতাশ হাজার ফুটেরও ওপরে এসে মনে হল গিরিপুর অন্ধকারের জটাতে চলে যাচ্ছে ক্রমশ। এভারেস্ট তখনও ঝলমল করছে আলোর গায়ে, কিন্তু তিন আরোহীর চারে থাকে জড় হইয়ে, অন্ধকার ছড়াচ্ছে। মালবি হেলমেটের টর্চটা বের করে পায়ের দিকে তখন পাহাড়ে চলার কষ্ট শুরু হল, পা পড়ার মতো অন্ধকারের চাঙড় পড়া শুরু হল, মালবির চোখ কিন্তু নড়ে না এভারেস্ট থেকে শেষে ওই প্রেক্ষিতের মুখে গোল মেরে। আর তখন ঝঁঝিয়ে ট্রকি দিয়েছিল ওই সহজ প্রশ্নটা — আমি কেন ওই চূড়োটার দিকে উঠতে চাই?

এভারেস্ট অভিযানে যাবার আগের অনেক আগে অভিযান এই প্রশ্নটা করে ছিল একজন, সাউথের সাংবাদিক বৈঠকে।

— মিস্টার মালবি, আপনি জগতের এক সেরা এভারেস্ট অভিযাত্রী। তার বার আপনি কিরে এসেছেন এই শিখরের দ্বার থেকে, মৃত্যুরও অপছায়া থেকে। তবুও আপনি কেন যাবেন। কেন চান এই শিখরে ফিরে উঠতে? কেন? কী জন্য?

দীর্ঘ প্রশ্নের উত্তরে তখন পুরোটা সব আবার, দাদা, উপেক্ষা তুলে নিয়ে মালবি ওঁর সাথে, সাদার কণ্ঠে শুধু এটুকুই বললেন — যেহেতু ওটা আছে। বিজয় ইটস দেয়ার।

মুহূর্তে আর কুয়াশের আবরণের ঢালা পড়ে গোল হইয়ে পৌ পৌ করে ছুটে চলা ঝড়ের আওয়াজে। অন্ধকারকে, মালবির মনে পড়ল অন্ধকারের নৈঃশব্দ এবং আওয়াজ দুই-ই। শব্দ না থাকলে অন্ধকারকে বেশিরভাগ মনে হয়, আলোর শব্দের শব্দটি হলে অন্ধকারকে উপাদান সমুদ্রের ঢেউ মনে হয়। এখন যে অন্ধটা ক্রমশ বলবৃদ্ধি করছে তেমন একটা ভয়াবহ অর্থের কথা এর আগে মেরিন মেলভিল লিখেছিলেন ওঁর 'মবিডিক' উপন্যাসে। ঠিক তো? নিজেরেই মনে মনে প্রশ্ন করলেন মালবি। তারপর জাগেত্তি করলেন —আরা, কী যখন উপন্যাস। অন্ধ লোকে প্রায় কখনই আসে না এদিক। নাকি এভারেস্ট আরোহণে গেলে কোনও সঙ্গে শুনেছেন এদির কথা?

শব্দটা বাড়ছিল। মালবির একটু টিকে হল আর্টিনের জন্য। শিখরে চড়ার সঙ্গী হওয়ার কথা ছিল ওঁরেরই, মালবি সেবা আরোহী—মালবিকে বাদ দিলে তো হয়েছেই। তবু মালবি আশাকেরা আর্টিনকে প্রোপোজিশন, আপনাদের মেয়াদটিয়ে ওর চমৎকার হাত রেখে। শিখরের হাতছানির কাছে এসেও অভিজ্ঞান সিদ্ধিজয়ের সমস্যা নিয়ে তিনি ফিরে যাচ্ছেন এটা না। পরবর্তীর সেই ছিল অভিজ্ঞতার বিষ মাথাকে ঘোরার নয়।

সবাই যেন চমকে উঠেছিল। কেন, ওরেন নয়? মালবি বলেছিলেন, এই যের শর্টকুকুরে আমার শুধু দুটো প্রার্থনা এখন। একটু পরিশ্রমের আবহাওয়া আর যথেষ্ট অক্সিজেন। প্রথমটা আমার হাতের মধ্যে নেই, দ্বিতীয়টা হাতে রাখতে আমাদুকে আমার সহজার।

এরপর কেউ আর প্রশ্ন তোলেননি, ওরেন নিরাশ হলেও তেনজিং মালবির বুদ্ধিমত্তার তারিফ করেছিলেন।

অন্ধকারে নরম মাংসের ওপর ছুরোর স্পর্শের মতো অন্ধকারে প্রায় স্বাভাবিক মতো মালবি ভাবলেন, আমাদু। আর সঙ্গে সঙ্গে ছবিগুলো হলেন প্রায় ওঁদের পাশ থেকে আর্টিনের স্বর শুনে — হ্যাঁ, ডার্লি।

মালবি প্রেমে ফেললেন — তুমি এত ভাবে? বললেন বটে তুমি এত ভাবে? কিন্তু বললেন তার ভিন্নতার কথা। ঝড়ের আওয়াজ যেন কয়ে সাদার চলাচলটা ভিন্নভাবে বাঁধিয়ে বসিয়েছে। ঝড় থেকে আর্টিনের কথা ভেসে এল — ডার্লি?

—বলো, ডার্লি।

— একটা কথা জানাতে ইচ্ছে হচ্ছে তোমাকে

— বলো, শুনছি।

— আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি আমরা

— কেন? কী জন্য?

— এই শেষ চড়াইটে সঙ্গী হলেছেন হলে।

— কিন্তু চূড়োয় তো এখনও, আমাদু।

— না হওয়ে পারলেও, ডার্লি

এক প্রচণ্ড হাসির ঝড়কে কথা বন্ধ হয়ে গেল আর্টিনের। কবির কথেই ছেলেমানুষ 'আইটেম ছোট'-এ ধরেছে। ঝড়ার পাহাড়ি জগৎ। ওকে কথা বন্ধ করার জন্য বললেন মালবি, কিন্তু প্রবল ঝড়ে নিজের গলার নিজে শুনতে পেলেন না। ওঁর মনে হল এই ঝড় থামের পেছে ফেলার আগেই ওদের চড়ে বসাতে হবে চূড়োয়। এভারেস্টে এর পৌঁছনোর আর কোনও অনুষ্ঠানই নেবার নয় নিজেকে এ জগতকে। অন্ধকারে শিখর আজন্ন হয়ে আছে, কিন্তু নিচে তাকালে হয়তো বিদ্যুৎ চমকের মতো খেলে এল একটা দৃশ্য— নিচে কার নিচে পঞ্চম শিবিরে ওরেলার ওঁদের চলার শব্দের দিকে চেয়ে মুখগীনে চোখ রেখে বসে।

মালবি নিজেরে বললেন, শুধু ওদের জন্যই আমাকে চূড়োতে নিয়ে যাঁড়াতে হবে একবার।

অন্ধ চূড়োয় বসে এখন মালবি দেখছেন কথার বাঁ নেয়েছে। বাঁ ডানি হাওয়া হচ্ছে, তাতে আর হতাশ হবার কী ছিল। কিন্তু এ তো নিমন্ত্রণে হাত। অনুরে কোথাও না কোথাও আলোয় আলোয় পাহাড়। আর পৃথিবীর এই উচ্চতম শূন্যে ঝড়ের দিকে হাত। এমন রাত, যা মোর মনে হয় সারা জগতেই বুঝিবা নাই। মালবি ক্যামেরার পকেট হাতড়ে ছোট্ট টেপটা বার করতে গেলেন, তারপর হয়তো কী ভেবে আর বার করলেন না। ওঁর হঠাৎই খেয়াল হল যে অন্ধকারও এক ধরনের আলো। নরম্যাদিকে আলো আর

কতটুকু? যেটুকু আছে তা তারার মতো বিন্দু, ঈশ্বর মতো শূন্য। আর অনন্ত থেকে অনন্তে বিস্তারিত রয়েছে সমুদ্রের মতো, আকাশের মতো অন্ধকার।

শূন্যের অন্ধকারে বসে মালবিকা ভাবে— অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ আলোরই সীমা নেই। মহাকালের তিন কালই তিন-তিনটি অনন্ত। অতীতেরও অতীত আছে, তার অতীত... অতীত ... অনন্ত অতীত আছে। ভবিষ্যতেরই বা শেষ কোথায়? ওর কোথায়? বর্তমানই বা কোথায় বিস্তৃত অতীত থেকে? কোথায় বা সুদূর ভবিষ্যতে? শূন্যের তীর্থে এই যে মুহূর্তগুলো, এর কি কোনও অতীত হয়, বা ভবিষ্যৎ? এই আদি-অন্তহীন বর্তমানই কি মহাকাল নয়? মহাকাল কি সময়ের পরিমাপ, না সময়ের অবসান? যার শুরু নেই, শেষ নেই, তার অস্তিত্বই বা কী? ইমানুয়েল কাণ্ট কী বুঝতেন কাল বলতে? কী বুঝতেন অস্তি বেদমি?

খানিই অন্ধকারে এভাবেই শূন্যে বসে ডক্টর মালবিকা পূর্ণ বিশ্বাস হল যে তিনি মহাকাল দেখতে পাচ্ছেন। অন্তত মহাকালকে স্পর্শ করছেন। আর এইটি মনে হতেই তাঁর চারপাশের অন্ধকার মুছে নিয়ে এক অনির্বচনীয় আলোয় ডুবে গেল চরাচর। হিমালয়ের শূন্য থেকে শূন্যে খেলে যেন আলোর ঢেউ, শূন্যগুলি তখন আর নিষ্ফল শূন্য নয়, যেন সেই অলৌকিক হিন্দু কবিতার মতো — নিগূঢ় মাসি।

মালবিকা দেখলেন সুনীল আকাশ বিস্তীর্ণ হচ্ছে মহাকাশের অন্ধকারে, সূর্যের রশ্মি হারিয়ে যাচ্ছে আলোকবর্ষ দূরের তারার কিরিচে, ছটোর ধ্বনি ঝঙ্কারিত হচ্ছে নিস্তব্ধ আলোক প্রতিধ্বনিতে, পৃথিবীর গান কখনো কখনো মহর্ষিশ্রেষ্ঠ মহাজীবনকে, পৃথিবীর উচ্ছ্বাসের বুদ্বুদে মনে করছে মহাকালতরঙ্গের অনন্ত বৃত্তের এই হচ্ছে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কেন্দ্র। মালবিকার মনে পড়ল অধিবাসনে বেরোনোর আগে পণ্ডিতজির কী অনুভূতি হয়েছিল সেই বাঙালিবাবুটির মুখে। কী যেন নাম ভদ্রলোকের? অনাদিমোহন দাস, তাই তো! নাকি ঈশ্বরদাস সেন? নাকি হরিদাস মজিলপুর? এই তিন নামের যেকোনও একটা হবে। কিন্তু কথাটা তো নয়। বলেছিলেন — এ হল সেই হিন্দু দার্শনিক শঙ্করাচার্যের কথা। বলেছেন বিশ্বেশ্বরমন্দিরে। মালবিকা অদ্ভুত সেই শ্লোকটি লাটিন ভাষায় টুকে নিয়ে বলেছিলেন — এবার এর ইংরেজি তর্জমা দিন, আমার দরকার হবে। অনাদিবাবু আকাশের দিকে চোখ তুলে একটু ভেবে তখন অনুবাদটি শুনিয়েছিলেন যেন এ তাঁর নিজের কথা। এখন সেই সংস্কৃত শ্লোকটা নিয়ে এল মালবিকা। তিনি অন্ধকার আলোয় মহাকাল দেখতে দেখতে উচ্চারণ করলেন কয়েক বার-করা সংস্কৃত শব্দগুলো। ইংরেজি আভিধানিক হিন্দু দার্শনিকের কথাগুলো শোনাল এরকম— শান্তা মহান্তো নিবসন্তি সন্তো বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ। তীর্ণা স্বয়ং ভীমভবার্ণবং জনানহেতুনান্যানপি তারয়ন্তঃ ॥

তারপর টুকে রাখা ইংরেজি তর্জমাটাও উচ্চারণ করলেন ফোনেবেলায় কথা শেখানিয়ানের 'দা টেম্পেস্ট' নাটকের প্রাক্‌পাঠের প্রবিষ্টের সংলাপ বলার ধরনে। বলতে বলতে কী এক আবেশে চোখ বুজে আসল মালবিকার। আলোর সমুদ্রে তখন হালকা মেঘ হয়ে ভাসল প্রথম বিস্ফারণ— হাত ছেড়ে ছেড়ে করে দিচ্ছে, যেন সাত সুর এক এক করে আলো আলো মিলছে, তৈরি হচ্ছে মন-মন সুর বা হচ্ছ, তারপর লয় হচ্ছ, সব সুর জলতরঙ্গের ঝঙ্কারগুলিতে নামে ও দুটিতে অন্ধকারীয় মিলনে, শব্দস্পর্শ ও সমবৃত্তে মিলছে ও মিলছে এক কথায়। এক সময় মালবিকার মনে হল তিনি তাঁর প্রিয় বোধহোটের 'স্যুপিরিয়র' সিম্ফোনি শুনছেন মহাকালের অ্যাকাডিমিহোয়ের বসে। তাঁর কান ভরে আছে। হৃদয় উদ্বেল। মনে কোথায় যেন এক অবারণ অনিবৃত্তি আনন্দ, মালবিকা আবৃত্তি করলেন—

There are souls calm and great, who bring good to others quietly and unasked as does the Spring. They have already crossed the dreadful ocean of life themselves and help others to cross it spontaneously and without any motive.

পণ্ডিতজির সেই বাঙালি ভদ্রলোকও বলেছিলেন যে, যে-মুহূর্তে প্রথম এক্সপেডিশনের এই শিখরে পৌঁছবে সেই সব হয়ে উঠবে। পৃথিবীর সমস্ত কৃষ্ণত্ব থেকে যে পৃথিবীর দিকে ফেরানো সে জলসেচনের ঘটনাস্থল দেখতে পাবে সে তখন নিশ্চিহ্ন, তিন প্রজন্মের মনের কল্পনা যেন মানুষ হয়ে ওঠ

একদম চুপচাপ বসে থাকতে হবে আর্তু, অর্টিনেরা আসবি বোঝা যাবে পাঁচমিনিট এগোনোর সেই আলোর জন্য নিজেকে তিনিয়ে দিয়ে তেন্ত্র কান খুলে বসে রইলেন। পুরিবীর পুরো এই ভোর প্রকৃতিকে অবাস্তব মেকল মালবিকা, একটা ঘোরের মধ্যে হল চোখের দুবার-চশমা খুলে ফেলে খোলা চোখে শরৎ প্রভাত এই নিয়ে-বসে বস্তুটি ঠিক কী।

কিন্তু এই ঐতিহাসিক আজটা করতে পারলেন না মালবি, তাঁকের এই অন্ধকারে সামান্য খোলার অর্থ অন্ধত। দুপায়ে খোলাকে বসলে তিনি ফোটির ডিজাইনের পকেট হাতড়ে বার করে আনলেন ওঁর ক্যামেরা, কিন্তু তা দিয়ে এই দিগন্তে একটি ছবিও তোলা যায় না। জগতের সমস্তকে অন্ধিত পাওয়া বলে এতদিন যে অন্ধকারকে তিনি চেনতেন, মিলিয়ে যাবার আগে এসেছেন সেই অন্ধের শিকারই এখন ওঁর কাছে নিজস্ব ছেটপুরী। একদা উঁচু আশা নিয়ে কতিপয় অভিযাত্রীর লাশ দেখে এসেছিলেন মালবি, এখন পরা হল নামবার পথে একজনই বোধহয় তবে থাকতে দেখবেন না তো অর্টিনকে! সেখানেও কি একাই অদ্ভুত আঁধার এক!

মালবি শক্ত করে মুঠোয় ধরে রেখে ছিলেন ওঁর ক্যামেরাটি। আলো থাক, না-থাক, এই সব বীভৎসর মুখচ্ছবি তুলে নিয়ে যেতেই হবে ওঁকে সমস্তদের জন্যে। কিন্তু অর্থাৎ খুঁজে পাওয়া চাই তোমরা অর্টিনকে।

চুমুল কাঁপের মধ্যে, কিছুটা নিজেই, কিছুটা ঘরণা, কিছুটা আরণীর অন্ধকারের মধ্যে ৫৯০০৭ ফুট থেকে আর্ত মালবি একটু একটু করে নামতে শুরু করলেন। কিন্তু অন্ধকারও যেন পিছু ছাড়ে না। ফলে কোথাকে কোথায় এসে নামছেন তা সব সময় স্পষ্ট ঠাহর করাও হয় না। শুধু পর্বতারোহণের অভিজ্ঞতা আর এভারেস্টের পরিপার্শ্ব-জ্ঞান থেকে তিনি বৈশলিয়া, বৈশলিয়ানবর্ষ খুঁজে নিয়ে কখনও আইসে, কখনও পাঁয়ে, কখনও ঘুপচে, কখনও নিচু এমিয়ে-পিছিয়ে হাঁটে না থেমে অগ্রসরণ করতে থাকলেন। তাঁর স্থির বিশ্বাস এই পথেই তিনি ফের পাবে ফেলবেন অর্টিনকে এবং নিজে ও বুত।

হঠাৎ কখন ঘুমাবের কবলে বৃটিশ স্পাইক কখন অন্তর্হিত হয়েছে। মালবি পকেট টর্চ বার করে বস্তুটির ওপর আলো ফেলে দেখলেন। ঘোর অন্ধকারের মধ্যে টর্চের আলো যেন একটি দুত বুধ, — অর্টিনের।

এই প্রথম পাঁচের মধ্যেও মালবি অনুভব করলেন আরও পাঁচের এক ধ্রুবতা চলাচল করছে ওঁর মেরুদণ্ডের একধার থেকে অন্য ধারে। ওঁর মনে হল মাথাটা একটু উঁচোচে, পা দুটো আরি হয়ে উঠেছে। এই পরিস্থিতি নিয়ে যত নিশ্চিন্তে ক্যামেরা মেরুদণ্ড দরকার এখন। মালবি তাড়াহুড়ি ফেলে বার করলেন ওঁর ক্যামেরা, এবার ফোটির পাশপকেট থেকে কিন্তু বুকের মধ্যে ভয়—এই আলোতে কী ছবি আর উঠবে!

তবু অর্টিনের মুখ তাক করে ক্যামেরা ফোকাস করলেন মালবি। আর তখন ফের শিখরের সেই অনির্বচনীয় আলোর আকাশ বদলে যাচ্ছে উজ্জ্বলিত হয়ে উঠল। জগতের সেই অবাক রাত্রি সম্পূর্ণ মুছে নিয়ে সূর্যের আলোয় অর্থশিখর এভারেস্ট ফের ফিরে এল নিজের জায়গায়। সেই আলোতে অপূর্ব সুন্দর দেখাল অর্টিনের তরুণ বুধ, মালবি ধ্রুবী থেকে ধরে ফেলে একই ফ্রেমে এভারেস্ট ও অর্টিনকে রেখে একটা ছবি তোলেন। সেটা তোলা হয়ে আরও সুনিশ্চিত হওয়ার জন্য তিন এক্সপোজারে ফের একটা ছবি নিলেন। তারপর ফোকাস খুব কাছে দিয়ে আকাশের দিকে চোখ তুলে দেখা, আলোয় তরলমেঘে অর্টিনের শুধু মুখটুকু তোলার উদ্যোগ করলেন মালবি। ক্যামেরার চোখ রেখে বুকটা কিছুক্ষণ থেকে শরীর টেনার আগে তিনি হঠাৎ নিচু হয়ে ওর পায়ের জুতো খুলে নিলেন। এখন তো আর ঘুমাবকবরে ছোঁড়ার চোখ আমাদের নিশ্চয় নেই!

চলমটা খুলে নিয়েই দেখলেন অর্টিন বড় বড় করে চোখ মেলে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। নিচের পাথরের মতো ঠোকদুটোর দু-কোঁটা রক্তও যেন তাজা ঘুমাব হয়ে চোখের কোণে জিকচিক করছে। মালবি ঘুমাবের নিশ্চয়তার মধ্যে এসে ফিরে পেয়েছেন খুই ফিরে ফিরে। আর তিনি নিচের সেই কিশোরের থেকে নেমে এসে এই অন্ধ থেকে কী করে অন্ধকারময় এভারেস্ট-শীর্ষে উঠলেন তাই ভাবতে ভাবতে ওঁর মনে পড়ল খুঁ আর অনুপমের কথা। তিনি একটা টুস তৈরি হয়ে অভিযানের কথায়। তিনি বলবেন, ফোটির পকেটটি খেলে বাচ্চার উদ্যোগ করলেন।

কিন্তু পা তেন আর চলে না। কোমর থেকে এত অসাড় আর ভারশূন্য হয়ে পড়ছে পায়ে। আর এক প্রবল ক্লান্তিকে একটু একটু করে বুকের মধ্যে। অক্সিজেন সিলিন্ডারটা কি বিকল হয়ে গেল? তিনি ঘেরাটোপের ভেতরে আর্তিন যেন ডাকাতাকি পাইপে। এখন নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের উপায় একটাই — সংক্ষিপ্তসার সময়ে, বস্তুর সেকেন্ড সময়ে, পকেট নিবিয়ে দিয়ে পৌঁছনো।

কিন্তু এ হল এভারেস্ট। যেতে যতটা যেতে কোনো আগে জয় নিশ্চয়তার ভার এর থেকে যেতে নামা। শুধু নামা। নামা মানে নামাই তো নয়, উঁচুতলের জন্মের মতো উঁচুর পৃথিবী নিচিবার্ত্তি ফিরিয়ে দেবার জন্য ফের করে নেওয়া। সেই শক্ত করে নামতে নামতে মালবি দেখলেন তিনি ফের ঔষধালয়ে প্রবেশ করছেন। নিটোল, নিরেট অন্ধকার, ছাদে ছাদে আকাশের আলোর তারা অন্ধকার। ফ্রিজিনের অক্সিজেনের ছোটপাত্রটা পায়াড়ে প্রত্যয় সময় যে কুয়াশা পাকে পাকে ফেরে, তার ভেতর যে ঘরা আলো, তেমন অন্ধকারকে সবই এভারেস্ট-ভারই বলে মনে হয়ে।

পায়ে টান ধরছে বলে এক-আকবার পা-ও আছাড় মালবির, একটা নালার পাথরের গোড়া থেকে খসে পড়ছে ফের মুহূর্তে আরক ঘুমুড়ুল দিয়ে পাথরের গায়ে তা মেরে ঘুমুলেন কিছুক্ষণ। তারপর লাফিয়ে ছুঁড়লেন পাথের এক ঘর

দিকে। কাশফুল পাথরটা সেটা পাথর ফসকে নিচে পড়ল। মালরি সেটা টেনে তুলতে নিচে চাইতেই মৃত, মাঝারী আকারের কেউকেটা বরফে মোড়া ঘাসে একটি দেহ উপুড় হয়ে পড়ে।

নিজের ঘোর সমস্যার মধ্যে একটা উদ্ধার আশা অনুভব করলেন মালরি। শিবিরে প্রাথমিক ঘোর কাটিয়েই একটা বড় ভ্রম ঠিক দিল ওঁর মনে। এই ২৮০০০ ফুট উচ্চতায় তিনি আর অভিযাত্রী ছাড়া আর কেউ যা উঠে পেরেছেন আজিমে। [illegible] ১৯২১ সালে, তারপর ১৯৩৩ সালে। তাদের পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে ঠিক উচ্চতা ২৮০০০ ফুট হবে। মন ঘুরিয়ে দেখল [illegible] ঠিকে ফিরে যাবে। মালরি আর ভাবলেন। কিন্তু সেখানেও এই এভারেস্টে উঠে আসার [illegible] ওদের কেউই পর্যন্ত পৌঁছতে পারেননি। তাহলে এই ২৮০০০ ফুটের উচ্চতায় নিচের এই মানুষটি কে?

মালরি ঝড়ের অবতরণের কথা ভুলে গেলেন। এই মুহূর্তে ওঁর কাছে সব ছোট হয়ে গেল। দাঁড়ালেন তিনি দেহটির পাশে নিচু হয়ে একবারটি দাঁড়ালেন। মানুষটিকে শেষ অভিবাদন জানানো এবং ওঁর মুখের একটা ছবি তুলে নিয়ে যাবেন নিচে। তিনি ধরি ওটিকে দিয়ে [illegible] নামতে লাগলেন। নিচের ঘাসের ওই এক টুকরোর দিকে। আর উপর [illegible] তখন চোখ পড়ে গেল তাঁর। কিন্তু [illegible] কী এর আগে সেই পর্যটকের দেওয়ালা ঘড়ি নয়। যেন ছোটখোলা [illegible] ছাইতে ছাইতে বেরিয়ে আসা [illegible]

একটা ঝড়ও উঠল তখন, যাতে চারপাশে [illegible] একটা গোধূলিলোকের নীলাভ আলো ছড়াল, আর মালরির অনুভূতি হল তিনি ডুবসাঁতার। পাথরের পা থেকে পড়ে যাচ্ছে নয়, তা ঘটছে তা কল্পনার হাওয়ায় ভেসে বেড়ায়।

মালরির নিজেকে পাখি মনে হল। তবে ঈগলের পাখি, যে উঁচুতে উঁচুতে, ভাসতে ভাসতে পড়েও যাচ্ছে। শেষে মালরি এসে পড়লেন সেই লাশের পাশেই, যেখানে নামার জন্যই এত ব্যস্ত হয়েছিলেন [illegible] পাশে পড়ে [illegible] পরীক্ষা করে [illegible] সেই মতো এর [illegible] মুখ ঢুকতে পড়ল [illegible] এভারেস্ট বিজয়ী [illegible] — [illegible], হে ঈশ্বর!

[illegible] একটু করে মুখ দিয়ে দেহটির পাশে [illegible]। কিন্তু তবু [illegible] হয়ে পড়েন না। সারা শরীর যেন [illegible]

মালরি এবার [illegible] শরীরের [illegible] দিয়ে পাশের দেহে একবারে পাশে এসে পড়লেন। অনেক কষ্টে [illegible] শেপসাকটি থেকে [illegible] বার করে নিলেন। [illegible] দোমড়ানো দুই পকেটে [illegible] পকেটকে [illegible] দিয়ে উপুড় [illegible] দিলেন ঠিক তাই। [illegible] হাতে ধরে বসলেন এই [illegible] এক [illegible] চোখ তুলে দেখলেন, সকালের রোদে [illegible] ডেন। নিচে পঞ্চম-শিবিরের বন্ধুদের উদ্দেশে হাত নাড়লেন। তারপর প্রিয় [illegible] সেই সৃষ্টি 'রিকুইয়েম'-এর একটা সুর গাইতে গাইতে ওঁর [illegible] মালরির মুখের মধ্যে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়লেন। ওইভাবে শুয়ে শুয়েও বুঝতে পারলেন আবহাওয়া বদলে গিয়ে [illegible] দিনের উদয় হচ্ছে ধীরে। কিন্তু [illegible] বন্ধ আরাম আর শান্তি [illegible] উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতে। ধীরে [illegible] নিশ্চিন্ত, মুখ গুঁজে শুয়ে। আর [illegible] এভারেস্ট শৃঙ্গ পড়ে আছে শিশুর [illegible] খেলনা ভাঙা খেলনার মতো।

মণিকার গ্রীষ্ম

নলিনাক্ষ রায়

তুলেই দিয়েছিলাম।

— অতীনদা আসেনি এখনও ?

— না। মনে হচ্ছে, এখন আসতে পারবে না।

— অতীনদার বড় প্রিয় এই ছবিটা।

আমি কোনো কথা বললাম না।

— আর অপেক্ষা করবে ? টিকিট কি তোমার কাছে ?

— এই টিকিট এর কাছেই।

— তাহলে ঢুকে পড়া যাক।

আমরা হলে ঢোকার জন্য পা বাড়ালাম। উদ্ধালক হঠাৎ ঘাবড়িয়ে পড়ে অবাক চোখের ওপরে চোখ রেখে বলল — তোমাকে ভীষণ চেনা চেনা দেখাচ্ছে।

— ও কিছু না।

— আগে কোথাও দেখেছিলে ?

— না। সারা দিন বাড়িতেই ছিলাম।

— তাহলে ?

— অতীনের জন্য অপেক্ষা করতে করতে... আমি জানি, কথাটা ঠুনকো শোনাচ্ছিল, তাই বলেছিলাম এর কোনো মানে নেই। তবুও কি সত্যিই চেনা চেনা ছিলাম ? মনে নেই।

'আমার উইথ মোনিকা' অতীনের খুব প্রিয় ছবি। বিধি আগাডাকারনের নাম শুনলেই ও পাগল। অতীনের মনে এক অদ্ভুতের প্রতীক্ষা রয়েছে। বিধি আগাডাকারনের পাশে ও আর কাউকেই ভাবতে পারে না। 'আমার উইথ মোনিকা', 'এভরিডে স্টুবেরিজ' ও যে কতবার দেখেছে। দৃশ্যের পর দৃশ্য মুখস্থ বলে দেওয়া যায়।

ছবি দেখে বেরিয়ে উদ্ধালক বলল — কফি খাবে ?

আমরা হলের সামনের পার্কে কফিতে নিয়ে আসলাম। উদ্ধালক কফির আড়ার দিয়ে এসে উশখুশিয়ে হয়ে উঠল — একজন মানুষের ছবিতে এত মুগ্ধতা ছিল আমার জীবনের অন্যতম প্রকাশ, বাবামার ছাড়া আর কেউ নেই। তোমার কেমন লাগল ?

আমি শুধু হাসলাম।

উদ্ধালক কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বলল — অতীনদাকে কেন ফোন করছ ?

— ভুল বলছ ?

— আমার মোবাইলে।

— না থাক।

— কেন ?

— তখন খুব ব্যস্ত থাকবে। তাদের কাজ কথাটি বলতে পারবে না। কফি এল। আমরা চুপচাপ বসে ভরিদ কাপে চুমুক দিচ্ছিলাম। উদ্ধালক তার সঙ্গে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছিল। কফিতে চুমুক দিতে দিতে বাবার ভিতরে কেমন এক ছায়া ঘনিয়ে আসছিল, কেন এক পরীর নেশা আমাকে অধিকার করে নিচ্ছে। আমি হঠাৎই উদ্ধালককে জিজ্ঞেস করলাম — বৈশিনী কাকে বলে তুমি জানো ?

— হ্যাঁ ?

— তুমি জানো ?

উদ্ধালক কোনো কথা বলে না।

— বাৎস্যায়ন বলেছেন, যে নারী স্বামীকে প্রাধান্য না করে নিজের সুখে যা অন্য আরেকজন অন্য পুরুষের সঙ্গে মিলিত হয়, সে-ই বৈশিনী।

— হঠাৎ বৈশিনী নিয়ে এত মনে আগ্রহ কেন ?

— এমনি।

— তোমাকে আজ খুব অন্য দেখাচ্ছে মণিকা।

— ও কিছু নয়। সারাদিন বাড়িতে শুয়েবসে থাকলেও মানুষ অন্য হয়।

— কেমন লাগল ?

— দারুণ। অন্ধকারেই ছেলে ফেললাম — অপরূপিনি এক বৈশিনী।

— বাপরে কি বলো তো ?

— হ্যাঁ ?

— হঠাৎ বৈশিনী নিয়ে পড়লে কেন ?

আচ্ছা উদ্ধালক, এই যে লিঙ্গের ওপর বাৎস্যায়ন কয়েকটা লিঙ্গের কথা বলেছেন তুমি বলতে পারো।

— বাৎস্যায়ন তো লিঙ্গের কথাই বলেছেন।

— শুধু পুরুষ-লিঙ্গ ? তোমার মনের মধ্যে কি কেউ ঢুকে যায় ? যে দুটো পরীর লিঙ্গের কথা, তাদের তো সারাজীবন অপেক্ষা করে কেওয়া যায়। কিন্তু একটা মন যদি অন্য একটা মনের ভিতরে ঢুকে যায়, তাকে তুমি আলাদা করবে কীভাবে ?

— আমার তোমাকে কোনো কথা এখনও বৈশিনী হয়নি। উদ্ধালক হাসতে হাসতে আবার সিগারেট ধরাল।

— ধরো একটি মেয়ে তার মনের ভিতরে অন্য এক পুরুষ ঢুকে গেছে, তাকে কি তুমি বৈশিনী বলবে ? সেই পুরুষ কে, তার জানা যায় না। জানার উপায় নেই। মেয়েটিও বলবে না। এই মেয়েটি কি বৈশিনী ?

উদ্ধালক চুপ করে থাকে। সিগারেটের ধোঁয়া আমাদের দুজনকে অবগুণ্ঠন করে নেয়। অনেক পরে উদ্ধালক বলে — আমি জানি না মণিকা। এই মেয়েটিকে বৈশিনী বলা যায় কিনা, আমি জানি না।

আমার আর কথা বলতে ইচ্ছা করে না। চোখ দুটো ঝেপসে এল। উদ্ধালক বিল মিটিয়ে দিল।

অতীনের উদ্দেশ্যে মনে মনে একটা চিঠি লিখছিলাম — জানো তো বাৎস্যায়ন নামে একজন পুরুষকেই দেখা। বৈশিনী শব্দটি করে পরীর বাৎস্যায়ন তা জানতেন না। অতীন, আমার মনের ভিতরে লক্ষ্য-লক্ষ্যই একজন পুরুষকে ঢুকিয়ে দেখেছি, এর কথা তুমি কখনও জানতে পারবে না। সে প্রথম আমার মুখে হাত দেখেছিল, আমাকে চুম্বন করেছিল, পরীদের জাগরণে সে প্রথম আমাকে ভিজিয়েছিল। তবু নেই, সে আজ আর বেঁচে নেই। কিন্তু এক একদিন সে যেন অনন্ত ঘুম ভেঙে জেগে উঠে। এর পর আমি তার সঙ্গে 'আমার উইথ মনিকা' দেখতে যাব।

জ্যোৎস্নার জন্য

লীনা চাকী

লোকটা ঈষৎ ঝোঁকে চলে এখনও দাঁড়ায় নি। ডিহাইড্রেশন করছে খুব। চোখ বন্ধ। মুখে কষ। হাত দুটো সামনে ঝুলছে। সারা শরীর ঘামে ভিজে একাকার। ঠোঁট দুটো ফাটা। মাঝে মাঝে জিভ বের করে ঠোঁট চাটছে।

প্রথম একটা লোককে দেখতে পেয়ে ভয় হয়। ভাবে মনে, সে ঈশ্বরপ্রেরিত দেবদূত বা আর-কিছু। তারপর বোঝে একটা জিন্দা লাশ। তারপরে জিন্দা এই লোকটার কাছাকাছি কিভাবে যাওয়া যায়।

দূরত্ব লোকটাকে দেখতে পায় বোঝাই যুবকের ডিহাইড্রেশন হয়েছে। তবুও সে ঘোলাটে নজর দিগন্তপ্রসারী রুক্ষ অসমতলে ঘুরে ঘোলাটিলা ছেড়েছি গ্রামে এখনও মানুষ আছে। তারা জানাই এই গ্রামে আসবার ঘোড়ে কথা হয়েছিলাম। হাত ধরাধরি করে আসবে গ্রামে ঘোলাটিলাতে। তারপর দুজনে ঘোলাটিলাতে পৌঁছে ঘোলাটিলা — কিন্তু আসার হাতের কাছে তাদের যেন পেয়ে যায়। যত দ্রুত সম্ভব ঘোলাটিলা থেকেই এই মরুভূমি অঞ্চলের চৌহদ্দির বাইরে চলে যেতে হবে তাদের। এখানে থাকা হবে মানে মৃত্যু। তবে একটা ভালো লক্ষণ দেখতে পেয়েছিল। কারণ গ্রামের মানুষ 'জিন্দা লাশ' বা 'ডিহাইড্রেশন' শব্দটা শোনাতে চায় না। তবে আমি একটা লক্ষ্য ঠিক করে নিয়ে হবে এখনকার।

তারপরে যা কিছু ঘটেছিল, এই লোকটাকে দেখার পর। তাকে ঘোলাটিলা মৃত মনে হয়েছিল। সুতরাং ছেলেটা, যুবকটি পাশে দাঁড়াতে। তার উদ্ধার ছেলেটা যার নাম প্রভাত, সে আমাকে আর পুরু জঙ্গলে হরিণ দেখিয়েছিল, আসলেও, অনন্তমূলের ফলও চিনিয়েছিল। কালজিরা চালিত আর মহুয়ার আর অনেক বুনোর আরোগ্য আদি ঔষধীগুলো হাতে যায়। আমাদের হাতে নেমে আসে। ওরে বুকটিতে নলা একটি গাছের ছাল। অনেক কথা বলেছিল। আমলেও, অনন্তমূল, কালমেঘ, তারপর মূলে লাল আটা ছোপ ছোপ প্লাস্টিক ব্যাগে ভরে দিয়েছিল। চুল কাঁচকা। আমার মোহের কাছাকাছি ছেলেটি নাড়ি-হাত মুখছিল পাশেই। আমাদের, তিন ঘন্টার কি আরো কি বাদ! ... ...

ঔষধগুলো আমাদের পরিচয়ে আছে ঔষধ দিয়ে বলেছিলেন — প্রভাত আপনাদের জন্যপুর জঙ্গলটা পার করে দেবে। ওর বাড়িও এদিকে। সেই ছেলে ঘণ্টাখানেক পরে, ঐ জঙ্গলেই ওরা, সালসিরি গ্রামের ছেলে বলে পরিচয় দিয়েছিলাম। তখনও ওকে নিয়ে কোন ছেলের ছায়াটা আমার আসেনি। সে পর্যন্ত যা কিছু আচরণ হয়, তাতে কোনো বিশেষত্ব ছিল না। গাছের ছবির হাতে পেয়েছি কিন্তু বিপদের আগেই গন্ধকারেরা তার খোঁজেই থাকে। সেলেই টপ করে হাতে লাগিয়ে দেয়। এটা ওরই আদিম ছবিত্রের থেকে থাকি। তার সকলেরা যে রক্তমাংসের ছবিত্র পাওয়া যাবে তা নয় অনেক অবস্থায় বলে সৃষ্টিও করা হয় ছবিত্র। আমি যে ছেলে বলি, নবীন ছেলের মো। তাই ঠিক তুলনাই হয় না। প্রান্তরিক এবং আকর্ষণটুকু কোনো ঠিক খুঁজে পাওয়া পারি না। আমি তাই ছবিত্রের মোতো থাকি।

প্রভাতের হাই ভাল লাগে তাকে নিয়ে মো ভয় জেগে যায় না। তাই তখনও কর্মস্থ সেল মুখবুরে ভেবেছে ছিলাম ও স্ত্রী হয়ত ভালো, কতদূর পর্যন্ত আসতে পারবে — এ সব ভাবছিলাম আমরা কৌতূহলে।

ভরপুর জঙ্গল নাকি এরে একটা

ধরলাম মিষ্টির দোকানে। ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়ে আমরা সেখানে। প্রভাত খেতে চাইছিল না। লজ্জা ভেঙে আমরা তিনজন জোর করছিলাম। ও একটা যেন এবারে গেল। জিজ্ঞেস করলাম — কাকে? বলল — মা-কে! মালা খিলখিল করে বলল — এই যে বলছিল ওরা খুব পড়ায়! বাড়িয়ে বলে! বললাম — মনে হয়েছে বাড়িয়ে বলে ওরা খবর নিল নিশ্চয়ই।

এসব এমনই কথাবার্তা যে মনে করে করে বলার তখন নয়। তবুও ছেলেটু প্রভাত নামের যুবকটি আমাদের আনন্দোচ্ছ্বাস বুদ্ধি বাড়িয়েছিল সেটা জানাতে গেলে এই সব অনুষঙ্গ বলতেই হয়। কারণ মূল ঘটনাটায় যোগদান আগে এগুলো ছিল পূর্বাভাস। আর এসব না বললে সে আমার মনে ঠিক কতটা জায়গা পাচ্ছে তা বোঝানো যাবে না। সেই লোকটা, যাকি প্রভাত প্রথম চরিত্র হবে সেটা নিয়েই তো আমার সংশয়।

অবশ্য আমরা পাড়িতে। তারপরেই প্রভাত অনুনয় করল ওর নিজকর্ম দেখার জন্য। ওর লাজুক চাহনি, ঠোঁটের কাঁপন, থাকেথাকে কপালে হাতের চকু বোলানো — এসব দেখতে দেখতেই হঠাৎ সিদ্ধান্ত আমাদের। নিশ্চয়। এই ছেলেটা যদি আনন্দ পায়, তৃপ্তি পায় নিজের হাতে গড়া কাজ দেখিয়ে, তাহলে আমাদের কী উচিত নয় তাকে এক টুকরো সুখ দেওয়া? তাছাড়াও ঐ 'গড়িয়ে' শব্দটাও আমাদের মধ্যে কেমন যেন ক্রিয়া করল। কেমন যেন আহ্বানকারী মনে হল। এটা হয়। গড়িয়ে অর্থাৎ অর্থের দিক থেকে আমাদের চেয়ে অনেক নিম্নে। আমাদের সমান সমান তো নয়! ওরা আমাদের কাছে যা পাওয়ার হাতজোড় করে এসে দাঁড়ালে কেমন যেন মনের মধ্যে আত্মতৃপ্তির ভাবনা আসে। তাকে কল্পনা করতে বেশ লাগে।

প্রভাত গড়িয়ে। তার স্ত্রীকন্যার থেকে উঠিয়ে সে আমাদের অবস্থান এটা সে বুঝেছে। আমরাও তাকে কল্পনা করার সোজ সাপটাতে পারছি না।

কিন্তু কতদূর? কতদূর তোমার জানা? ও গাড়ির জানালার কাছে ঝুঁকা দৃশ্যাবলীর দিকে আঙুল তুলে বলল — এই তো কাছেই। ঢিল ছুঁড়লে যাইল।

অবশ্য আমরা যাকি তো যাকিই। পাকা রাস্তা ছেড়ে লাল কাঁকুরে রাস্তা। খানাখন্দে বর্ষার জল। গাড়ি লাফাচ্ছে। ড্রাইভার ধমকের দিচ্ছে — এমন জানলে আসতাম না। পুরোনো টায়ার। এখানে গাড়ি ঢুকালে কী হবে?

তখনও আমরা প্রভাতের 'কেনুইন' নিধি। কোনো 'মেগেটিক' ছিন্ন করার ধারেকাছে নেই। ড্রাইভারকে তোষামোদ করছি। প্রভাত মুখ ঘুরিয়ে কখন চোখে চশমাকে অন্তরঙ্গতা দেখাচ্ছি। তোলো ছাড় নেই। ফিরে আর না। এটুকু যদি না করতে পারি তাহলে কীসের প্রেমনীতিক দেখতে আসা?

যন্ত্রিক হিসাব অনুযায়ী পনেরো কিলোমিটার দিয়ে গাড়ি থামল। প্রভাত গাড়ি থেকে নেমেই — 'একটু দাঁড়ান' বলে কোথায় উধাও হয়ে গেল।

গ্রামটা ঠিক এমন থেকেই শুরু হয়ে গেছে। ঠিক এরকম — নির্জন একটা গ্রাম। ঘর আছে, মানুষের দেখা নেই। পথিক তাকাচ্ছে না। আলস্য ঘুরে বসন্ত হাওয়া বয়। প্রভাতকে দেখছি না। সন্ধ্যা কেটে যাচ্ছে। সন্ধ্যা আসছে। হঠাৎ পেছন থেকে কে ডাকল — এই যে দিদিরা। তারপরেই মোক্ষ ধরাচ্ছে যা দেখি, যে কথা লাগছে করি তারই এক টুকরো ফাটতে শুরু করল। রাজনীতি দিয়ে নিলাম।

কিন্তু তাহলে হবে না। একটা গলদে রয়ে হয়ে। পরিচয়-লগ্নালাপের ঠোঁটের কোণে সেই হাসিটা দেখব। যেন অজানাদীপ দোলা কোনো দেবতার সঙ্গম যাচেন।

এবার স্থানের এখন ভাবছি। গাড়িটা চক করতে দিয়ে। তখন যেন ধারণা উপলব্ধি পূর্বপরিচয় না। তবু প্রভাত নামের একটি ছেলের অনুরোধে তার গ্রামে গিয়েছি। আমরা এদিকে ওদিকে দেখছি। খড়ের ছাউনি দেওয়া মাটির ঘর। একটা খুকুর হাতে পড়তে শোনা। দোকানঘরে একটা বেঞ্চিতে বসি। একা হাত ঘাম। ও হাতে, অন্যদের সামনে একটা কোনো ঘর কাঁপ করা।

আমাদের ঘিরে লোক জমছে। বাচ্চারা দেখছে গাড়িটা। একজন জিজ্ঞেসই করে বসল —আপনি কার্তুপ বাড়ি যাবেন বাড়ি? কে ডাক্তিবাবু? আমরা চোখাচোখি করলাম। নিশ্চয় এ গ্রামের কোনো লোকী বাড়ি। কথাবার্তা চলল? বাড়ি ফেরত ফেরার ডাকিত।

মালা বলল — দেখ তো ছেলেটা! আশ্চর্য তো!

ডাক্তিবাবু খুব ইচ্ছা ছিল না হলার। একবার ঘুরে আসছি জানিয়েও ঠিক। এবারে বলল — ঘুরে কারে একটা ডাকলা আসবার, আমরা ছেলের সঙ্গে আসবা ছিল ঠিক হয়নি।

এক মুহূর্ত মাইকের চালিয়ে এতে দাঁড়ালো আস্ — ভাবে। বলল — আপনাদের ডাকছে।

বললাম — কে? কোথায়?

— ঐ ডাক্তিবাবু বাড়ি।

— ওখানে কেন?

প্রভাত বলল — আপনাদের নিয়ে যেতে।

ডাক্তিবাবু বলল — ওই ছেলেটাকে ডেকে আনো তো ভাই। আমাদের চেনা আছে। কীসব দেখাবে-টেখাবে বলেছিল তাড়াতাড়ি দেখিয়ে দিক।

খুকুর এবারে উৎসাহী হয়ে বলল — ওখানেই তো সব আছে। ডাক্তিবাবুর চোখানেই সব আছে।

একজন বলল — যান, যান।

ওখানেই করে হচ্ছে।

আমরা বন্ধুরা পৌঁছনোমাত্র এক ভদ্রলোক হাতেজোড় করে এগিয়ে এসে বললেন — আসুন, আসুন। প্রসাদ এঁরা নিশ্চয়ে।

একটা ছোকরা ঘর। সামনে বাঁশের বাঁখারি দিয়ে ঘেরা দালানে। বাইরে মুখ দোল করে খোলাচ্ছে। ছোট্ট একটা চৌকি। তার ওপরে খেরোর খাতা।

আমরা বুঝতে পারছি, সাহেবের চিঠিটে জোড়া প্রণামি আদায়ের জন্য। ওখানে বসতে হবে।

ভদ্রলোক বললেন — আপনাদের মধ্যে সাধেশিক কে?

আমরা চুপ।

আমার এই পরিচয়টা কোথাও দেওয়ার প্রয়োজন হয় না, সেখানে দিই না। কিন্তু এরা জানল কী করে?

আলা বলল — সাংবাদিক দিয়ে কী হবে!

ভদ্রলোক বাঁকা অহংকার নিয়ে বললেন — আমি একসময় স্কুলের হেডমাস্টার। আমার কিছু বলার আছে, তাঁর কাছে।

অনিমা হেসেই ফেলে — আমরা তো প্রসাদের হাতের কাজ দেখতে এসেছি। কী আশ্চর্য!

— সেই প্রসঙ্গেই আমার কিছু বক্তব্য আছে। আসুন, ঠিক আছে আগে আপনাদের শিল্পকর্ম দেখুন।

আমরা এদিক-ওদিক তাকালাম। দেয়ালের শিল্প নিয়ে মাঁড় করলো কেন কিছু বোঝ। তাতে পাখিদের ছাড়া, নকশাদার বস্তুর অনুকরণে ছবি। কাছে গিয়ে দেখলাম আঁকা নয়। কড়ি ডালপালা আর বাঁশপাতার সরু সরু কেটে আঠা দিয়ে জুড়ে তৈরি ছবি। বেশ ভালো কাজ। এরকমই অনেক ছোট। ছোট্ট, বড় — মেঝেতে বাঁশি কঞ্চি ডালপালা, বাঁশপাতা ছড়িয়ে মনিকবাবু শিল্পকর্মের কাছে নিয়ে বললেন — এবার বাইরে চলুন। একটা পুজো-পুজো হবে। তিনদিনের জন্য শেষ করতে হবে। তাহলে ছোট্ট কঞ্চি। আর এই দেখুন, এই যে এইটা নিয়েছিল আমেরিকার বস্তুসংস্কৃতি সংগ্রহশালা।

টেবিল-ফ্রিজে একটা সেট আগে কী যেন সামনে আসলেন। কোনো উৎসাহ পাচ্ছি না। ঘরের কোনো কোণে কোনো হস্তশিল্পের নমুনা নেই।

এগুলোই কি সেখানে ছেলেটির এই সরল মনে ছোপেটি? পুজো-পুজো চেহারার নমুনা তো কলকাতায় দুর্গাপুজোয় বিক্রি হতে দেখা যায়। আলা বলল — আমাই ছেলে, তুমি যে বললে...

মনিকবাবু কেশ জোর গলায় বললেন — আপনাদের উচ্ছ্বলবাবু যখন পাঠিয়েছেন তখন তবু এসব দেখে হবে না। তিনি বলে দিয়েছেন আমাদের সমস্যার কথা আপনাদের বলতে। অনিমা বলে — আমরা কী করব?

— আপনারা কাগজে লিখবেন।

ভয়ানক অস্বস্তিকর হচ্ছে। উচ্ছ্বলবাবু কোনো চাকরি করেন? মনে হয় না। তাঁর সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের আলাপ। এমনকে কারণ করে তিনি পাঠাবেন — এ হতে পারে না। কিন্তু আমার দুই বন্ধু যে জোরজবরদস্তি আমার দিকে। তাদের — উচ্ছ্বলবাবু মোটেই আমাদের বলেননি এখানে আসতে। মনিকবাবু চশমার ফ্রেমে ফ্রেম রেখে বললেন — তাহলে কোনো সে কথাই বলল। কি রে?

যে ছেলেটিকে আমরা ফেরত দিয়ে এসেছি, সে বলল — হ্যাঁ স্যার।

এই দুটি ঘটনাকে আমাদের মনে আনতে হবে। সেক্ষেত্রে প্রধান চরিত্র কে হবে? কার ওপর ভিত্তি করে গল্প এগোবে? একজনের প্রসাদ। সে চক্ষুলজ্জাবশত পরিচিতজনকে সামনে পড়া করে নিজেকে আড়াল করে এক কৃত্রিমবৌদ্ধিক চাল চেলে শরতের তিন মহিলাকে এনে কেলল নিজের গ্রামে, তাকে নিয়েই গল্প অগ্রসর হলে পারে। একটু আধটু টেনশন তৈরী করতে হবে। ঐ হেডমাস্টারকে দিয়ে কিছু কথা বলাতে হবে যাতে তিনজনের হাত ছিঁড় হয়ে যায়।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, প্রসাদের ওখানে এনে ফেলা ছাড়া আর কোনোভাবেই এগোল না। কিন্তু ঘটনা, কিছু সংলাপ একবার এর মুখে। কিন্তু প্রসাদ এর ভূমিকাটি বেমালুম ছেড়ে দিয়ে মাস্টারের শিল্পের দিকে গিয়ে দাঁড়াল। অর্থাৎ এর গতিবিধি শেষ। এমন জায়গায় কী করে প্রসাদকে নিয়ে গল্প এগোবে? ঐ হেডমাস্টারটি ভাবলে প্রধান চরিত্র হোক। যেমন কাজই ভদ্রলোক পরপর সাজালেন।

বললেন — এগোনোর আগে পরিচয়ের ভাবে তখন থেকে আমরা কীভাবে লড়াই করি। গ্রামের শিল্পকলাকে বাঁচিয়ে রাখা কি আপনাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না?

আমরা নির্বাক।

বুদ্ধিদীপ্ত, বাঁচুড়া মুখে যে আলগুটুকু অবশিষ্ট ছিল তাও উধাও।

ভদ্রলোককে আনায়াসে বেশ কড়া জবাব দেওয়া যায়। বলা যায় — আমরা বেড়াতে এসেছি, আপনার গ্রামের শিল্পকলাকে উদ্ধারের ভারটা আমাদের নয়।

প্রসাদকে বাঁচানো দরকার নিজে, অপমান করে, বিপ্রান্ত করে গাড়িটা ভাড়া করে চলে যাওয়া যায়।

ভদ্রলোক বললেন — আসুন। একবার দেখে যান।

— কী?

— আসুনই না।

ভদ্রলোক এগোলেন। আমরাও। অনিমা আস্তে বলল — আমরা গাড়িতে গিয়ে বসি।

আলা বলল — বলে লাভ। পারবি না। মনিকবাবু ছোট্ট ধমকালে।

ব্যবসায়ীক সিদ্ধান্তের — বুঝলেন না, এ হচ্ছে ভোগেশনির সাংবাদিক সম্মেলন। মহিলা সাংবাদিকরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছেন। কেউ কেউ ঘুমিয়ে পড়েছেন। কেউ কেউ ঘুমিয়ে পড়ার ভান করছেন। কেউ কেউ ঘুমিয়ে পড়ার ভান করে ঘুমিয়ে পড়েছেন। তবে কারোরই চোখে ঘুম নেই। কারণ এই ঘরে এই যে ছবিটা তোলা হচ্ছে, এটা পৃথিবীর সব মানুষ দেখবে।

বলতে ভুলে গেছি — ভোগেশনি সাংবাদিকদের আপ্যায়নের ভার পড়েছে সুন্দরী মেয়েদের ওপর। এদের পরনে সিল্কের শাড়ি। ব্লাউজ খুব টাইট। ব্লাউজের ফাঁক দিয়ে পেটের খানিকটা দেখা যাচ্ছে। এদের কাজ হচ্ছে সাংবাদিকদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে ড্রিঙ্ক সার্ভ করা। এরা ড্রিঙ্ক সার্ভ করছে। সাংবাদিকরা ড্রিঙ্ক করছেন। ড্রিঙ্ক করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ছেন।

ঘুমিয়ে পড়ার ভান করছেন।

ঘুমিয়ে পড়ার ভান করছেন কেন? কারণ ঘুমিয়ে পড়ার ভান করলে সুন্দরী মেয়েরা তাঁদের ঘুমন্ত মুখে লিপস্টিক মাখিয়ে দেবে। ঘুমন্ত মুখে লিপস্টিক মাখিয়ে দেবার পর ঘুম ভাঙলে তাঁরা দেখবেন তাঁদের ঠোঁট লাল হয়ে আছে। তাঁরা ভাববেন, রাতে ঘুমের ঘোরে তাঁরা নিজেরাই ঠোঁটে লিপস্টিক লাগিয়েছেন। এই ভাবনা তাঁদের মনে আনন্দ দেবে

ভালো বলাটাই ছিল ইংরেজি অনার্স। তবুও বুঝলেন না। এটাই শক্তি। অনিমার হাত শক্তিশালী। দুঃখ জানিয়ে। অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে বাবার চেষ্টা করে দেখি — আগের আসর, তখন অনেকটা সুস্থ ওঁরা।

মল্লিকবাবু নাস্তোড়। না, দশ মিনিটের জন্য হলেও যেতেই হবে ওঁর কুটিরে। দুঃখ করছ কেন? ভোলানাথের প্রতিজ্ঞা।

এত ক্লান্ত শরীরে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু খাওয়ার এমন একটা সীমা থাকে। খেয়েও। চাটাও কেমন যেন বসে। বাসন্তীলা। ই.দংওয়ালি। এসব কেন নামে ডোকরা মালা? মল্লিকবাবুকে ফেরত চাই করছে। একা বসি ভোর করে পাঠিয়ে দিয়ে বুঝি। যদি আমাদের ফিরতে দীর ভোর হয়? যদি অনিমা ওই ফাঁকে ভোলা ভাস্কিলাদাকে শোনায়? তাহলেই এই মল্লিকবাবুই শীতল ছাড়বি পাতটি মাথে ঠোকের বিদ্যুৎ চাহিত আর ফেরেন প্রাক্তনদীদের মতো।

আবার অনিমার অন্তর্ধান। গল্পের উত্তেজক খোরাক। না, গল্প কে লিখবে। আমরাই তো তখন লিখছ।

মল্লিকবাবুর ইচ্ছাপূরণ করতে গোলাম ছাদে বাড়ি। ওঠিয়ে তখন ডিনারে। ড্রাইভার ও তার সহকারী আগেই জানিয়ে দিয়েছে এখানে দাঁড়ানোর জন্য টাকা বেশি নিতে হবে।

গল্প নায়ীচরিত্র না থাকলে ঠিক জমে না। যে কারণে এই মানিক অধিকারী আর প্রভাতদেব নিয়ে গল্প ঠিক দাঁড়াত না। তৈরি করতেই হতো নায়ীচরিত্র। সে কেমন হত কে জানে! একদে কোনো মহিলাও কেমন দেখলাম। আমরা যদি কোনো মহিলা-সমিতি বা নিবেদনপক্ষে এই মহিলা পঞ্চায়েত-প্রধানের কাছে আসতাম তবে হয়তো অন্য গল্প হত। কিন্তু তখনও পর্যন্ত আমরা সাথে পরা ছাড়া। গল্প কোথায়? অনেক পরে পাঠিয়ে আমাদের আসলেই তো ভাবনায় আসার গল্পে এই মেয়েটি আসবে। প্রভাত থাকবে। মল্লিকবাবু থাকবে আর থাকবে জোৎস্না। হ্যাঁ, এই কথা আসবেই। তখন চরিত্রও হয়ে যাবে। জোৎস্নার আচরণটি এখানে উল্লেখিত চার মহিলা থেকে বিভিন্ন করে আনবে। এখন অনেক পরে জোৎস্নাকে সামনে খাঁড় করাতে পারছি, এর ছবি আসছে ভাল লাগছে, একে ঘিরে গল্পটা এগোবে ভেবে পুলকিত হচ্ছি। কিন্তু তখন?

মল্লিকবাবু বললেন — আমার আর একটা নিবেদন আছে। আমরা আর নিয়ে তিন মহিলা হয়েছে কাজে যাবে। — আমে যখন এই প্রথম সাংবাদিকের পায়ের ধুলো পড়ল তখন আর একটা ডিনার দেওয়াই। স-ডি-ও। উচ্চস্বরে কাকে ডাকলেন?

পরিচয়ই সত্যবতী। ছাপা শাড়ি, উজ্জ্বল ছাপা ব্লাউজ। চোখে চুল বাঁধা। আমার হাতে দিয়ে। কপালে খয়েরি সেরেমোনির টিপ। তাকাল মল্লিকবাবুর দিকে।

— ওর নাম পরিচয় বিশ্বাস। নাইনটি নাইনে বি.এ. পাস করেছে। বাপ ভাল চালায়। দুঃখেছেন কত কষ্ট করে পড়াশুনা করেছে। এ গ্রামের একমাত্র বি. এ. পাস মেয়ে। অথচ কোনো চাকরি পাচ্ছে না। টাইপিং শিখছে এখন। পরিচয় আমাদের গ্রামের গর্ব। কিন্তু কী লাভ হল বি. এ. পাস করে? খুব হতাশ হয়ে পড়ছে, বুঝলেন না? পরিচয়, দুই ছেলে সমস্যার কথা বল।

পরিচয় চুপ। আমরা উৎসুক হয়েছি। তবুও কিছু জিজ্ঞাসা করতেই হয়।

— এখানে কতজন আছে?

মল্লিকবাবুই উত্তর দেওয়া পরিচয় নিলেন — না, না কতজন! ছেলেমেয়ে দেখানো প্রাইমারি স্কুল। হাজার ছেলেমেয়ে, কতজন সবাই আসছে ওই বিকুলপুর থেকে। আপনারা তাদেরকে পাবেন না। ওদের জন্য একটু নিচুন ব্যবস্থা। নিজেদের গ্রামের মেয়েরা এত কষ্ট করে পড়াশুনা করছে, তাদের জন্য কি উচিত নয় ওদের দেখা?

— এটাও লিখতে হবে? অনিমার ভাবে জোর।

মল্লিকবাবু ছোকরার জন্য আগের কথা ভাবেই মেনে না বললেন — পরিচয়, একটু বসা, বলাবলি আর জোৎস্নাকে ডাক তো।

এরার আমরা বিস্মিত।

— দেখুন, এরাকে সবার সঙ্গে পরিচয় করা কি খুব জরুরি? আমরা এসেছিলাম যে কাজে

— আর তোমা। আপনাদের আর বেশি সময় নেব না। বুঝছেন না, এ গ্রামে কখনো সাংবাদিক আসেনি তো। এসেছেন যখন ছোটাই-এর মানুষগুলোকে ভালভাবে দেখে যান। সাংবাদিকদের তো সেটাই কাজ।

— উফ্! জলা ফোলে যাচ্ছে যাবে। খুলি আকল। অনিমা উঠে দাঁড়িয়েছে। মেয়ে ভিনটে এল। পাশাপাশি দাঁড়াল। মল্লিকবাবু একদে উঠে দাঁড়ালেন — ও হরা। খুব ভাল হাতের কাজ জানে। উজ্জ্বলবাবুর একানে যে গানের কাজ দেখেছেন ওই তখন বানায়। বাহা, বাহা। একটা ছেড়ি মেয়ে টেবিলে এসে কাপড়ের বলে টেবিলে রেখেই আবার ছুটে পালাল।

মল্লিকবাবু নিজেই বলে থেকে বের করলেন কাপড়ের ওপরে গান লিখে নেওয়া লক্ষ্মী, মহুল, বসন্তকেশ গান। সব শেষে বীরসেন। আমরা হাতে নিয়ে নিয়ে দেখলাম। মেয়েটির চোখ চক চকচকে। আমি গভীর নিশ্বাস গোপন করলাম।

মল্লিকবাবু বললেন — জলুন, এত সুন্দর সব কাজ ঐতিহ্যের প্রায় পড়ে রয়েছে। কে দেখছে? আপনারা এলেন তা-ও তো দেখে গেলেন। কাগজে যদি একটু লিখে দেন।

ওদের অবাক চোখ দিয়ে অনিমা বলল — লিখতে তো বটেই, সংবর্ধনাও জানাবে।

ভদ্রলোক যেমন ধরতাই খেলেন। একটু চুপ।

আবার শুরু করলেন — কলকাতা আমাদের গ্রামের একমাত্র যোগাযোগের মেয়ে। শিবপুরে একটা নার্সিং হোমে কাজ করে। স্বামী ইঞ্জিনিয়ার। বাবা — কলকাতায় আমাদের নার্সিং হোমের এক বিশিষ্ট ব্যক্তি।

— তো কী? বলল শুভ্র।

— বাবা-মায়ের বড়ো আদরের মেয়ে। অবশ্য কেউই এখানে থাকি না।

অনিলবাবু থামলেন — জ্যোৎস্না খুব ভাল গান করে। কাজের জন্যে শেখেনি। এই প্রত্যন্ত গ্রামে পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছে। জ্যোৎস্না একটা গান শোনাবে?

জ্যোৎস্না পাথরের চোখে জানলার দিকে তাকিয়ে বলল — না।

অনিলবাবু যেমন ছিটিয়ে গেলেন — না মানে? সাংবাদিকরা এসেছেন ...

— ওরা কী আমার গান শুনতে এসেছেন?

— না আসুন। গ্রামের অতিথি ওরা। তাকে না হয় শেষবেলাই একটা ঘুরিয়ে দান।

এবারে আমাদের দিকে ফিরে — জানেন কলকাতা চলিয়ে গান জ্যোৎস্না।

আমরা চমকাল ওঠি। বিস্মিত হচ্ছি। মেয়েটা কে? যে অনিল অধিকারীকে অনায়াসে ফেলতে পারে? তবুও আমরা কেন চুপ্পি পাচ্ছি। যে মেয়ে গ্রামের আত্মজের ডেথসার্টিফিকেটের মুখের ওপরে কথা বলতে পারে সে মেয়ে এখানে তাঁর চোখে চোখ ফেলে বলল — গানের গান এখানে ভাল লাগবে না। তাছাড়া এখানে জোর করে গান শোনাতে আমার ভাল লাগে না।

এবারে আমাদের কিছু বলতেই হয়। হাই শেলব অত্যন্ত সহজভাবে বলল — ভাল লাগবে না জোর পাইবে না। নাকি আমরা সময়মতো এই?

এবারে জ্যোৎস্না হাসল। মনে হল ওর হাসিটি বড় ব্যক্তিত্বপূর্ণ, মার্জিত। অনিলবাবুর মুখের ওপর থেকে ছায়া সরে গেল। বললেন — ডায়াবেটিসহাউজ

— থাক... জ্যোৎস্নার ডায়েটিশা মেশানো সান্ত্বিক্ত খাবারে। জানলার ধারে সরে গিয়ে শিউলি আর সজনের ঝাঁকড়া আর পরেরের উজ্জ্বল আকাশকে প্রেক্ষাপট করে দাঁড়াল। সময় নিল। আলতো দৃষ্টি। গেয়ে উঠল — তোমার কাছে এ বর মাগি /মরণ হতে যেন জাগি/ পায়ের তলে। বলে শেষে আমার বলল — তোমার নতুন করে পাব বলে /হারাই ক্ষণে ক্ষণে।

মিনিট কুড়ি পরে আমরা গাড়িতে। অনিলবাবু, গ্রামবাসীরা কীসব বলে গেলেন। আমরা মন দিয়ে কিছুই শুনলাম না। জ্যোৎস্না আমাদের বিবশ করে দিয়েছে। এই প্রতিভাকুসুম জানাই কি বৃথাই ঝরে যাবে চোখ সামনে? আমি মনিক অধিকারীকে ক্ষমা করে দিলাম।

আরও একটু বলার আছে। এটুকু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গল্পে থাকবে হয়তো। আজ উহ্যি। তবে এই ঘটনাটি লিখলে অনিলবাবু অবশ্য ছাড়বে। জ্যোৎস্নার আকাশে পাড়ে কাবে। গল্পটা এক মোক্ষমে খুনেও যেতে পারে। আবার এমনও হতে পারে অনিলবাবু একেবারে কৃতজ্ঞী ভিলেন হলেন। ভেবেচিন্তেই শেষের পরে পরিশিষ্টটা প্রায়ে। তবে ভিলেন-টিলেন হলে গিন্নি বা বাচ্চার কল্যাণে ভিলেনরা অকাট হয়ে যাবে যা তো! তা কেন? এসব তো বানিয়ে লিখছি না। ঠিক আছে। গল্পের শেষে না হয় লিখে দেব — সত্য ঘটনার কাল্পনিক রূপায়ণ দেখা।

তবে আগে শেষটুকু বলে নেওয়া দরকার। গাড়ি মাটির রাস্তায় ঝাঁকুনি খেতে খেতে ছুটছে। আমরা তিনজন জ্যোৎস্নাময়। তার নির্বাচিত দুটি রবীন্দ্রসঙ্গীত — মাথের কাছে আকাশ, যখন সব মিলিয়ে জ্যোৎস্না আমাদের শ্রোতৃবর্গ। কম্পমান আলোকসজ্জার কেন্দ্র বিন্দুতে থাকল ঝিলিমি মেয়েটি।

ঘুটিয়ারি ৮.৫ কিমি। গাড়ির গতি বাড়ছে। সামনে রাস্তা ঘুরে অনেকক্ষণ ঘুরছে আবার। হঠাৎ ধরা সাইডের সবকিছুই ঝাঁপিয়ে এগিয়ে গাড়ি। এই হয়ে ঘুরে গাড়ি নীচু করবার ইঙ্গিত করছে এক লাফে জানলা তুলে দিল আমরা একসঙ্গে আতঙ্কিত ভাবে। বিশাল শব্দ করে গাড়ি থামল। ওরা বাম্পার ওপরেই সাইডের নীচু করিয়ে রাস্তা ছুটি এল। ড্রাইভার জানলার মুখ। ওরা কীসব বলছে। আলা আমার হাত ছেড়ে দিয়েছে।

সময়ের থেকে ঘুম বড়ো উঠে ওরা অনিমাই। বলল — ওরা কী বলতে চাইছে যে। বললাম — না, জ্যোৎস্না কথা নয়। কিছু ঠিক না। ড্রাইভার গাড়ি বন্ধ করছে কেন?

আমরা দিশেহারা অবস্থায়। কী বলছে ওরা? আর কথা বলছে?

অনিমা বলল — ড্রাইভারের কথা কিছুই বুঝতে পারছি না ভিম, আমাদের যেতে দাও বাই।

বাম্পার ঘুরবার জন্যে পাহাড়ের আমরা বড় রাস্তায় উঠে যা দেখলাম ওদের। তোমরা যদি কিছু বলতেই চাও তো শেষে শেষে এসো। ওরা কী ভাবছিলাম করে বাকি হল।

আমরা অনায়াসেই বড় রাস্তায় উঠে যাওয়ার জন্যে গাড়ি ঘুরিয়ে ঢালে নামতে পারতাম। দিদি উঠতে পারতাম ওপরে। সেটা করলে গল্পের মূল উপাদানটাই পেতাম না। সেটা এখন বুঝছি। কিন্তু তখন

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

বাঁচতে চাই

শ্রীঅমিতকুমার সিংহ

আমি কেন বুঝতে পারছি — আমার মনের ভালোবাসাই আমার শরীরে ছোঁয়ার রাস্তা খুঁজে নেয়। এ কথা আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি বলেই, কয়েকটি দুর্নিমিত্ত ঘটেছিল, তাদের সেরেস্তাদারই নির্ধারিত করে নিয়েছেন। এই কারণগুলি এবার ব্যাখ্যা করা যাক। — প্রায় হঠাৎ করেই আমার গ্রামে বেড়ানো যাওয়ার পুরোনো অভিসের ওপরদার ভালো পড়ে গেছে। মাইল পাঁচেক আমার সাইকেল অভিমন্যু কার্ড পক্ষ মাসপেনেমান আজ ওভারটেক ঘোষণা করেছে। এই অবস্থায় আমি যখন ব্রেকের অন্তরায় দেখছি, ঠিক সেই অবস্থায় আমার অফিসের বড় স্যার আমাদের ছেলেমেয়েদের হাত করে আমার ভাগ করে দেবার বাড়ি আমার নিয়েছে। এই অবস্থায় আমি যখন জানতে পেরে কলকি — তখনই আমার একবার ইচ্ছে আমার পেলাম। খামের কাগজে পুরো মাহাত্ম্যের বিজ্ঞাপন দেখে, আমি একটি বেসরকারি ভর্ণ নিনিয়োগকারির সংস্থার অতিরিক্ত লাভের ইঙ্গিত, মোটা টাকা জমা রেখে ছিলাম, আরও মোটা টাকা ফেরত পাব এই আশায়। আমার স্ত্রীর অনলঙ্কের টাকা যখন ফেরৎ দেবার সময় হয়ে গেল তখন অনলাম, কম্পানি লোকাল অফিস তুলে দিয়ে পাততাড়ি গুটিয়ে ফেলে পড়েছে। আমার স্ত্রীর অনলঙ্কের মাচিওরিটির পর সেই অফিসে গিয়ে দেখি সেখানে তালা ঝুলছে — অফিসের সেরেস্তাদার দেখাচ্ছা। এরপরে একদিন বন্ধিল পাটি পাঁচে কিকলিং করে আমার টাকা জমা নিয়েছিল, অনলাকে সাবধে ঝাড়ুম জানিয়েছিল। আজ ঠিক পাঁচ বছর বাদে তারা খেলাটা ফোলাচ্ছে। এর উত্তর আজও পাইনি আমি।

আমার অবস্থাটা উপলব্ধি করুন একবার। আমাদের পর আমার, অনলাদের আমাদের আমাদের কেন কেউ নেই আমার। এই অবস্থাতে আমার মন ভাল থাকতে পারে? আর যদি মনই ভাল না রইল তাহলে শরীর ভাল থাকবে কেমন করে বলুন! ওঁরা তো শত্রুপক্ষের মতন ভাই।

দুর্ঘটনা যখন একদম কাছে সে যে লাইন দিয়ে পড়পড় করে এসে পড়ে। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি আমার বৃদ্ধের এক-নয়নের মণি ছেলেমেয়ে প্রায়ুয়াল পরীক্ষার মেধা ছেড়ে বসে আছে। মাসের ছাড়িক বিজ্ঞান আলাদাই টিউশি আমার ছেলেমেয়ে দুটিরা একটা বছর টিকিয়ে দেবে বলে। কোন ক্লাসেরেস, কোন সিরিয়াল কটির সময় হবে — এ সবের নক্কর-পঁচে। সিনিয়রদের টাইটেল মিউজিক-গুলো এখন নিশির ডাকের মতন কানে টেনে নেয়। আমার আত্মজ-আত্মজারা টিকি বিশাল হয়ে উঠেছে এর মধ্যেই।

সোমবুদে আরও কথা শোনাব। আমার একমাত্র স্ত্রীটিও কেন অসুস্থ হয়ে পড়েছে। দুশ্চিন্তা আর দুর্ভাবনার আমাদেরিস-আলসার প্রভৃতি অসুখগুলি কেন সাপেট ধরেছে তাকে। আমার জন্য চিন্তাটাই ওকে বেশি কাবু করে ফেলছে। শেখাপড়ায় ছেলেমেয়েদের সার্বিক ধার্থাত্রী তো ওর দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নয়। আমার জন্য চিন্তার অন্যতম কারণ, আমার লক্ষ্মীছাড়া জীবনযাত্রা আর অনিয়মিত খাওয়া-দাওয়া। ফাঁকির মুখে কেমন করতে করতে আমি নাকি কেবল আর পাঁচ মাসাপাই হয়ে পড়ি না — সেইসব মুহূর্তে আমি আর ঠিকাদার হয়ে পড়ি। আমার আত্মাভাবিক আহার-আচারে যমালোক-জিনিসগুলি হয়ে যায়। আমি তখন অনিয়মানব হয়ে উঠি। বৌ — পেঁচানো তখন আমার কাছে আঠি বলার খেলা। তখন আমি নাকি যে কোনো অজুহাতে তুলে গণ্ডার মতন চলাফেরা কিংবা হয়ে উঠি। পারিবারিক অনুষ্ঠানের একটি আমার ঠুঁটো উপায়। সেই কারণেই আমার স্ত্রী সবসময় ভয়ে থাকে, এত ভালবেসে ফেলেও কেন ভাল থাকতে পারি না আমি।

এবার বুঝুন আমার অসুস্থ অবস্থাটা। মনে-প্রাণে আমি নিঃস্বেশ। মাঝখান এই বুদ্ধবন্ধু থেকে আমাকে উদ্ধার করতে পারে — এমন ভগবান আপনারা। আমি ক্রমশ আমার গুহাঁতে ঢুকিয়ে যাচ্ছি তখন। হাত পুড়িয়ে নাস্তানাবুদ আমার অন্তরাত্মাটা আমাদের বেলুড়-এসেছিল হৈহৈ হয়নি, আমার হোমমন্ত্রী মা তার মনস্তাপনী পুঁজির কলাপাতে আমি এখন এই দুর্ঘটনে সম্পূর্ণ দুর্ভাগিয়ে আমার ধরাধরানি নেই, নেই কোনো ঠিকাদার-টাকাদেরিটি। এখন আমার ছোটোমিতে হয়ে যেতে কোনোরই বাধা নেই। শুধু ছাড়া বাকী লোকজনের খাওয়া-দাওয়া আর ঘুমিয়ে উপরের পরীক্ষার ব্যবস্থাদায়। অর্থিক সব অর্থ তখন জলের মতন খরচ হয়ে যাচ্ছে। আমার অনিয়মিত জীবনযাত্রা আমাকে আরও শত্রু করে ফেলেছে। সে সব কেয়ার করে কে? আমি এখন মুক্ত পুরুষ। এ জীবনের আনন্দই আলাদা। হায়ে হ্যাঁ। ভগবান আমাকে একটা দেয় থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছে। অভিজ্ঞতার প্রতি আমার অতিরিক্ত আগ্রহ একেবারেই নেই। আমি কথা বলতে কি-ই আমিটাকে একেবারে টিলাটোই করতেই পারি না। আমার এই উপলব্ধির কথা আমার স্ত্রীও জানে বলে একদিক দিয়ে সে বেশ নিশ্চিন্ত। আমি মোটেই মুখুরুর নই — বরঞ্চ উল্টোটাই সত্যিকার। সেই কারণেই মেয়েরা আমাকে দেখে, মুখ আকাশ করে মুচকি হাসে। আমি মনে মনে বিরক্ত হই। ধীরে ধীরে বিকল হয়ে উঠি মহিলা জাতটার উপরেই। এই থেকেই আমার মহিলা-বিদ্বেষের জন্ম। মহিলা সম্পর্কে আমার

প্রকল্প নিরুপদ্রব লাভ করে, অন্যেরাও লভ্যের নাম নিয়েছিল — সেটাই স্বাভাবিক।

কথা যে কথা হচ্ছিল, আমি যখন বাসস্থিত ও শারীরিকভাবে নির্বাচিত-নিষ্পন্নিত অভিজ্ঞতার, তখনই প্রথম একদিন আমার হেডমাস্টার স্থির ভাবে মোহনলালের উদ্দেশ হল। পাঁচকড়ি হাল কথাবার্তা শুনে, আমার মনে হল সে আমাদের মুক্তির পথ দেখাবেই উদ্দেশ হয়েছে। স্থির ভাবে মোহনলাল সম্বিলিত আমাকে যা নিবেদন করল তার সারমর্ম — বৃথাবাবুই তো পাবেন মানু, মূর্তিপুর পলিসের দারোগাকে ভয় করেছে, তাই এই দুর্ঘটনার সম্মুখে চুপি ভেঙে দেবেন। তিনি প্রোমশ ছাড়ি কথা বলেছেন বলেই এবং আমার খেলায় প্রীতিবশের মতন হোমাকে অবস্থা হয়েছে। অতএব এই সময়ে তার সহায়টি সাধন না করলে কোনোভাবেই তোমার নিস্তার নেই এই দুর্ঘটনা। অতএব অবিলম্বে একজন প্রকৃত জ্ঞানীগুণী জ্যোতিষীশাস্ত্র বর্ণীয়ান ভক্তির অন্বেষণ। যে ব্যক্তি এই দুরবস্থা থেকে তোমাকে উদ্ধারের উপায় করে দিতে পারবে। সে ইতিমধ্যে এক প্রকৃত গুণী ব্যক্তির সন্ধানও নাকি ওর সন্ধানে আছে। অতএব কালবিলম্ব না করে, তড়িঘড়ি জ্যোতিষ গণীশে যাবার দিনক্ষণও ঠিক করে ফেলল মোহনলাল ভোরবেলার মধ্যেই।

অতএব চলে পালানি খেলাধুলিয়া। ওরো আগে। নিজের জীবনের পরিত্রাণের জন্য উপযুক্ত জীবনযাত্রী গ্রহের-ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করো। যথাসিমে যথাসময়ের, কিন্তু আগেই গিয়ে পৌঁছলাম জীবনযাত্রী ডাক্তারের পরামর্শগ্রহণের জন্য, তার — ঢকঢকে চেম্বারে। চেম্বারে, এই ডেকরেটিভ চেম্বার, আলো আলো ঝক্ ঝক্ ডাক্তারের চেম্বারেও হার মানায়। চেম্বারের সম্পর্কে সকল সংশয় ঘুচেঘুচে যায়, এমনকাজে এ কি অবেলাবুদ্ধি, অপেক্ষা করতে করতেই। এখানকার পরিবেশটাই যেমন সুশান্ত-স্নিগ্ধ-মনোমুগ্ধকর। পৌঁছিল লোকের পরিচালনার অনেক শিল্পী হাতের স্পর্শে নির্মিত, চেম্বারের সুনিপুণ অভ্যন্তরিসজ্জার প্রত্যেকটি সর্বাঙ্গ সুন্দর। মনোমুগ্ধকর এই অপেক্ষা-ঘরের দুটি বড় খোলায় অনেক বুজন ঘনকায় আয়া-ডাগ্রা নিয়ে- বুজনে চোখ বুলিয়ে দুঁচারে বর্ণনীয় মানুষ জিনিসপত্র দেখতে পাওয়ায়। প্রথমত শিল্পী সুবীর সাহার আঁকা তোমার ছবিটির উপযুক্তভাবে ফাইটিং ফিট করা। তেমনি আর একটির তেওয়ারি ফুড অভিযাত্রা সেনগুপ্তের আঁকা ছবি। এই সব বিখ্যাত বিখ্যাত শিল্পীদের ছবি অনবদ্যভাবে অভিজিত বিভিন্ন দেওয়ালে। আছে নানা মূর্তির সমেত। তার একটি এ্যান্টোরিয়ামে দেখবার বিভিন্ন রঙিন মাছের অনবদ্য যোগাযোগ। আর তার জলে কলুষ কলাই। যেমনতর সুন্দর ঘর দেখবামাত্রে, সেই রকম তাই সঙ্গে মানা আছে ছবিতে প্রেমপুরুষের পরীর আয়না। প্রসঙ্গক্রমে বলতেই হয়, অপেক্ষাঘরটির লাইটিং ব্যবস্থাও অনবদ্য। সব মিলিয়ে একটা সুন্দর পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, শুধু আমাদেরই কেন, যে কোনো লোককেই মুহূর্তে মোহিত করে ফেলবে। এই অনবদ্যসুন্দরী অপেক্ষাগৃহের পাশেই দুটি বড় বড় চেম্বার। একটিতে বসেন জ্যোতিষসম্রাট, ভারতবিখ্যাত জ্যোতিষী শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ গোস্বামী। হরেন্দ্রনাথের নামের তলায় বড় হরফে জ্যোতিষসম্রাট লেখা সত্ত্বেও চোখে পড়ল অনেক নামী অলঙ্কৃত পদবিতে তিনি ভূষিত। ভারতের প্রাক্তনপতি, প্রধানমন্ত্রী সমেত বড় বড় রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে তাঁর অলঙ্কারসমেত নানা ছবি টাঙানো রয়েছে। এই ভাগ্যবান বন্ধু-ভাগ্যবান অনেক নামী- দামি অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা আছে, আছে অনেক খেলোয়াড়ের ছবি। জায়গায় জায়গায় অলঙ্কারে ছবি যে লাগে যায়নি —এ কথা অনিবার্য ঠাওরে এরা নিয়েছেন তখনই ইনস্টলিংয়ে ডেকরেটরের তত্ত্বাবধানে দুশ পরিচালক। তবেই লক্ষ্মীর মাথায় ঝরনার লাল আছে, ইরেলেরই রঙিন নাগর নিবন্ধনের নকুল আছে। আমাদের হাতে হাতে দেওয়া আছে ফ্রমিক সংখ্যা লেখা ছোট-ছোট প্লাস্টিকের টোকেন। শিগগিরে প্রমিক সংখ্যা অনুযায়ী কল এলে, ফলশ্রুতি অপেক্ষমান ঘরেরক্ষকের হাতে জমা দিয়ে ঢুকে যেতে হবে ভেতরে। ভেতরে, অপেক্ষাগৃহ সবই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। ঘরের চার দেয়ালের চার দিকে আছে ফুটবলার টিভি-ক্যামেরা বসানো এবং — যাঁরা আমাদের পর্যবেক্ষণ করবেন তাঁরা সবাই উপায় আলিঙ্গন করে নিয়েছেন বড়-সর্বিউ টিভি-র মাধ্যমে।

এইসব দেখে আমি যেমন হতাশাচ্ছন্ন খেয়ে গেলাম, তেমনি মনে বল-ভরসাও পেলাম। মনে হল, তাও তাহলে আমি ঠিক জায়গাতেই এসে পড়েছি। একটা আমার প্রত্যেক প্রতিকার হবে। আমি আমার আগের মতন সুস্থ-স্বাভাবিক জীবন ফিরে পাব। এই সবই যখন মনের পরীক্ষে খেলা করছে, ঠিক সেই সময় হঠাৎ একটি বিশ্রীরকম ঘটনায় আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। পাশের চেম্বারটা এর বুক থেকে আমার চোখেই পড়েনি তখনও। সেখানে সেবলার কুপারহাম গেরিলিস বসেছিল। ওদের বড় বড় বাবের হরফে লেখা ত্রিনয়নে মূর্তিগঠনের ওপরেই লিখ হয়ে অপেক্ষমানীর ভুক্তি আমার দৃষ্টি ঘরে আসছে। ভাক্তি-ভক্ত

ও আত্মবিশ্বাসে প্রতিযোগী মনুষ্যত্বের বিশ্ব-আসর থেকে চরমবাবির বৃষ্টি দিতে সক্ষম হিসি। এ যেন এক-মহারাজ হিসুল হাতে, রক্তবর্ণ বিশাল অশ্বে নয়নে, এক্ষেত্রাৎ আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে। গৌরবর্ণ, জটাধারী সাধুবাবার গলায় রুদ্রাক্ষমালা আর কপালে লাল চন্দনের ত্রিপুণ্ড্র টিপ আঁকা। একনজরে এঁকে দীপকদের কাপালিকই বলা চলে। হাত বহুদর্শী ভঙ্গিসহ চক্ষু বর্ণন করলে গায়ের রক্ত হিম হয়ে যায়। সেই বিশালদেহী কাপালিক এসে আমার হাতটা সজোরে চেপে ধরল, হাসলো ভয়ঙ্কর কিছু আমাকে বলল—হাত খাটো হোক সব দুরবস্থা দূর হয়ে যেন, ছোকে খুলির পথ দেখিয়ে দেন, ছোর সকল শোক-তাপ মোচন করে দেন, ছোর সকল দুঃখ থেকে ছোকে মুক্ত করে হয়ে ছোকে হাতের ছাপি। ছাবধানতা আমি তখন কেন কিছুতেই খেয়ে ফেলি। তার সঙ্গে তার চেহারার প্রসাদ গুণের কথা বলায় আমি, কারণ সকাল হাতে আমার দুর্বল হাতটা ধরা ছিল তখনও। আমার আমার ছাতে ছোনলালও আমাকে অনুসরণ করতে বাধ্য হল। ব্যবস্থি আমাকে প্রায় পাঁজাকোলা করে ধরে এনে বসিয়ে দিল আটিসনাটো একটি চেয়ারে, আমি প্রায় আটিকে গেলাম সেই চেয়ারের ফাঁকে। তারপর স্থির দৃষ্টিতে আমার নিজে চেয়ে রইল, ছোকরা আমাকে সম্মোহন করবার চেষ্টা করতে লাগল। আমারা আমি একটি শিত-বিড়ালের মতন কালকাল করে তাকিয়ে রইলাম।

এমন সময় লক্ষ করা করলাম পাশের কামরায়। ছোনী-বাবু সেদিকে তাকেপ পর্যন্ত করলেন না। আমাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে সন্ধানে নিরীক্ষণ করে চলেছেন। আমার চাউনি তখনও আমারার শিশুর মতন। মনটাতে একটু শক্ত করার চেষ্টা করছি। এমন সময়ে অকস্মাৎ বাইরে আওয়াজ হল, পরক্ষণ বুঝি একটা ছোরে পড়ল। সত্যিই সত্যসত্যি ছোরে পড়ল। তারা ধাংকারপূর্বের টিপর দিয়ে ধড়মুড় করে ঢুকে পড়ল সশস্ত্রপুলিশ হাবেন্দ্রনাথ গোস্বামী এবংকে ধরা। তারপরে ঐ সশস্ত্রপুলিই সে ও তারা মিলে ধাঁপিয়ে পড়ল ধুর গোবিন্দ মহারাজ ওরফে গলায় উপর। একজন ধরার সঙ্গেসঙ্গে প্রচণ্ড মারপিট আরম্ভ হয়ে গেল। গলার প্রতিরোধের ক্ষমতা ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসতে লাগল। সে একা পারবে কী করে একসঙ্গে তিনটি লোকে। ক্রমে ক্রমে সে ছিবিয় টিল-দুর্বল হয়ে পড়তে লাগল, তার হুঙ্কার ধ্বনিতে উচ্চারিত কাইজন নীরব হয়ে লাগল ক্রমে ক্রমে।

ঠিক এই সময়ের আমি আমার হাতের হাত ধরে এগেনারে দিইনি। সাধু অমর জ্যোতিষীর মুখোস-চেহারা থেকে বেরিয়েই একটা ফাঁকা ট্যাক্সি ধরে একেবারে হাওয়া। বাড়িতে এসে ঘাঁস ছেড়ে বাঁচলাম আমরা দুজনে। মনে মনে বললাম বড় জোর বেঁচে গেছি বাবা, নইলে পরে খুনের সাজা দিতে গ্রীতরে ভয় আমার জোটে।

না শেষ পর্যন্ত খুন হবনি গলা, হয়তো তার কারণ বলবল নিয়ে শেষ পর্যন্ত খুন করেনি তারকে। এই খবরটা জানতে পারলাম দৈনিক প্রভাতী সংবাদপত্রে, পরের দিন। সেখানে সবিস্তারে ছাপা হয়েছে এই সংবাদ। আমরা পড়ে হুবহু-বলা সম্পর্কে অনেক কথা জানতে পারলাম। তারা নাকি আগে থুকুন বন্ধু ছিল এবং দুজন-জনের গোপনের হাত-লাল ছিল পারস্পর। সেজন্য আমার জানি হয়ে কড়া ধরি আসায় ধনের কন্ট্রাক্টি হয়ে পাটে উঠেছিল। তারা পরে দুই বন্ধুতে মিলে ক্ষমতাদখলপূর্ব করে ধনের পেশাটা পরিবর্তনের কল্প ভেবেছিল এবং সেই মতন নিজেদের তৈরিও করতে পেরেছিল। তবে সমি জোতিষে কিছুটা ছিল এবং সেইজন্যই ছুকুন জ্যোতিষীর কাছে আসা-যাওয়া ছিল, নিজের ভেবিষ্যৎ বুঝীনেবার উদ্দেশ্যেই। ধন্য ভোরে নিজেছিল এই লাইনটাই। ওকে ভেবেছিল বিদেশ বইপত্র পড়াবে এবং আমি তার সিদেই সে বেশ জানতে হবে উঠেছিল এই বিষয়ে। আর গরু ব্রাহ্মণের ছেলে বলে মন্ত্রতন্ত্রটা তার পারিবারিক অনুকূলেই জানা। সেও এই ধাপ্পাটা আরও বাড়িয়ে ধাপ্পাবাজিতে মাতিয়ে নিয়েছিল। বিজ্ঞাপনীর জটায় উইগ নেটা পরে নিয়ে তৈরী করে নিয়েছিল, আর ভেশভূষার নেক আনুষঙ্গিও পাশেই নিয়েছিল।

যুক্তনেই বেশ জানই চলছিল, সমস্যা দেখা দেছিল অন্য ধাপারে। ছোনলোলার অবদান সম্পর্কিত ধারণা দেখা দিয়েছিল পরবা। পরার সঙ্গিনীর গোছে বেড়ে, অন্তত ব্যবসায়ে আশা। এদিকে হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ক্রমবৃদ্ধি পাচ্ছিল। তারা উচ্চতর ভিসে বাজার থেকে টাকা ধার করে ইনভেস্ট করেছিল এই ব্যবসায়ে। এবং সে টাকা শোধ দেওয়া নেওয়া যুক্তের কথা, নিজেকেই চালিয়ে নিয়ে যেতে পারছিল না ছোনলালে। অত্যন্ত বন্ধুর খচ্ছের আশা ভাপাও, সব ব্যাপারেই অতিরিক্ত অবে। বেশ কিছুদিন ধরেই এটা চলিয়ে যাচ্ছিল পরা। হবা সব ছোনেনুকে সহ্য করে যাচ্ছিল। কিন্তু হবার সহ্যের সীমা অতিক্রম করে ছোকেই ছেড়ে গেল পরার দিকে।

ভারসাম্য বেঁধে গেল দুজনের মধ্যে। পরা পারবে কেন? হবা যে প্রস্তুত হয়েই ছিল আগে থেকে। ঘরের ছোকরা তার ভাগ-ভাগুরা লুকিয়ে ছেখেছিল সে আগে থেকেই। সুযোগ বুঝেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল প্রবল প্রহারে। হবার পাশটে

পরা উৎসাহ। আমার ভ্রূক্ষেপই নেই দেখে বাবলি হো হো করে হেসে উঠল। বাবলি হো হো করে হাসলে বুঝতে হবে, ঠিকুজিকুষ্ঠি ভুল হয়ে গেল নাকি! আমাকে আর কাছের মানুষ বলে মনে করতে পারলি। আমাদের পুরুলের বিয়েতেও ওকে ডাকা হয় না। শুধু আমাদের এডুকেশনাল ট্যুরটা যাবে বলে আমাকে ডাকা হয়েছিল। আমি ওর কথা আদৌ ভাবছি না বলেই। নিজের বিবেক-দংশনের জন্যই আমাকে ও অতগুলো টাকাটা দিয়ে দিতে চেয়েছিল।

পরিশেষে দু-একটি সুখবর শোনাই আপনাদের, তাহলে উপন্যাস অনেক আপনাদের ভাল লাগবে। ঐ ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিটা আমাকে একেবারে ঠেস মেরে দিল। ছেলেরাইটা ঝেড়ে আমাদের ভাড়া সংসার আবার জোড়া লেগে গেল। ঘটনাচক্রে আমার অফিসটা আবার খুলে গেছে আর এখন বেশ গড়গড়িয়ে চলছেও অফিসটা। আমি আবার কাজে যোগদান করেছি। কলেজ লাগুনা সব মিটিয়ে নেওয়া হয়েছে। কাজে জয়েন করে আমার শরীরটাও সুস্থ-স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। অনটা ঠিক হওয়াতে, টেনশন দূর হয়ে গেছে, আমার ভূভজালগুলিও স্বাভাবিকভাবেই ঠিক হয়ে গেল। জীবন- হৃদ্দের হাজারো সুখ আবার আমি ফিরে পেলাম। ছেলে-মেয়ে-দুটি আমার বাড়িতে ফিরে এল। ঠিকি ছেলেটা ওদের এখন পেছে। অবশ্য আমি ভাবছি এবার ওদের যা দিনের পর দিন ওদের বুঝিয়েছি যে এ বয়সেও ফেল করলে ওদের আর ভাল নামী স্কুল থেকে একেবারে দূর করে দেবে। কারণ ওদের ভুলের নিয়ম, পরপর যারা দুবছর ফেল করবে তাদের আর ঐ স্কুলে রাখা হয় না। আমার ভাগ্যটাই বেশ ভাল বলতে হবে, ওরা ঠিকি দিয়ে ফেলে দিয়েছে। ওরা এখন বাচ্চাদিবস, স্বাধীনতাদিবস পালন করেই হয়ে ওই ওরা আর নাওয়া-খাওয়া ভুলে উঠেপড়ে লেগে গেছে ভালভাবে লেখাপড়া করতে।

আরও ভালভাবে বলা হল — আমি মেয়েকর্মীর মনস্তত্ত্ব পরীক্ষার টাকাটা উদ্ধার করতে পেরেছি। এখন অবশ্য আমি কুরুক্ষেত্র আবার ভালভাবে দুই বন্ধুর ভাগ্যে। সহকারি অফিসের ছাই-ফাই অফিসার বিভাস চক্রবর্তী। আমার দুর্দশাতে অবশ্যই লাভ নিয়ে আলোচনা আমি যেটে পারিনি একদিন, এখন সময় দেখি ও। একদিনের একটি ফরমাল পার্টি সবার আগে পেছনে দুর্ব বাড়িয়ে চলেছে। ফিরে তাকিয়ে দেখি আমাদের বিমল পার্টিতে বসে। অবাক বিস্ময়ে ছাড়ে ভ্রূক্ষ ওঠে — বাবু কী ব্যাপার বে! সে ইঙ্গিতে আমাকে পার্টিতে তার পাশের সিটে বসতে বলল। তার নির্দেশে ভাগ্যবশ আমি তাই করলাম। সোজা সে আমাদের নিয়ে গেল একটা বড় রেস্টুরেন্টে। সেখানে খাবার টেবিলে বসিয়ে একেবারে ছাল ছাল খাবার অর্ডার দিল। এই ফাঁকে আমার এই দুরবস্থার কথা জানতে চাইল। আমার কিশোর বয়সের প্রাণের বন্ধুকে সব কথাই আমি খোলাখুলি বললাম। সব কথা শোনার পর সে আমাকে কিছু অনুপম পরামর্শ দিল যা আজও আমার কাজে লাগছে এবং আমাকে সেটিও করে রেখেছে। কেওয়াটিস টাকাটার ব্যাপারে আমাকে কোনোরকম চিন্তা করতে বারণ করল। এটা উদ্ধার করে দেবেই। কথা প্রসঙ্গে ও জানাল আমাদের আরও এক বন্ধু দীপঙ্কর মুখার্জি বিদিরপুরে থাকে, বিরাট ব্যবসা করছে এবং এই কারণেই সারা দিল্লি শহরে এর বিরাট প্রতিপত্তি। দীপঙ্করের সঙ্গে বিমলের নিয়মিত যোগাযোগ আছে। আর আমার পাওনা ধনের অধিকারী কেন্দ্রসরকারি অর্থ বিনিয়োগকারি সংস্থাটির কেন্দ্রীয় কার্যালয় দিল্লিতে। আমার বিষয়ে ডিপার্টমেন্টটি অর্থাৎ ওরা ও প্রায় ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্তে এসে পড়িয়ে দিল শুধুমাত্রই নিয়ম রক্ষা করে পরিশেষে ঐ টাকা বন্ধুকে উদ্ধার করে, কুরিয়ারের মাধ্যমে ড্রাফট করে পাঠিয়ে দিল আমার কাছে আমি ঐ ড্রাফটটা জোড়াসাঁকো ব্যাঙ্ক থেকে ভাঙিয়ে নিয়ে টাকাটা ঘরে নিয়ে এলাম।

এই সব ভালোকথা আর সুখের খবরে আমার প্রাণ আমার ফিরিয়ে দেওয়া জোড়াতালি ভুলগুলো ক্রমশ ভালোভাবে ধরতে শুরু করে দিল। আমরা ইতিমধ্যে জোড়াসাঁকো ছেড়ে ক্রমশ দূরে আসানসোলে চাকরি ফিরে গেলাম। এই সুযোগ পরিবর্তনে পরিবার অর্থ খুঁজে পেতে লাগলাম। ছেলে মেয়েরা বলতে আমাদের মধ্যে আবার যেন সুখ সোনালিমাখা আশা ভাষা নিয়ে কথা গান হয়ে উঠল নতুন। ঘুম ভাঙা উঠল পরম আদরে, একাদশের পুতুল খেলা ছেলে-মেয়েরাও হয়ে উঠল সুখেরই ঠিকানা এখন আর আলাদা করে কারুর মনে হচ্ছে না। ভেবে অনুভূতি এবার ভিন্ন হয়ে একবার কি কি সংসারের মধ্যে কেন হলে জিজ্ঞাসা করব ভেবেছি পরিশেষে। শান্তি মানুষের মনের শান্ত ভোজন করে ফেলে। আর্থিক শান্তিই মনে পুনরুদ্ধারে বাধ্যতার বাড়ায় বয়ে আনে। আর শান্তিময় মন যদি আপনার সঙ্গে থাকে তো অবশ্য অসুখ-বিসুখের প্রশ্নই। প্রশান্তির ফল, অযাচিত বিপদ-আপদ থেকেও অনুপম মুক্ত হয়ে পারে। একটুকুন শান্তির আশায় আমরা সারাটা জীবন ছুটেই চলেছি। খুব খুব বড়ো, জন্মজন্ম ধরে। অকপটে কি আমরা জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়ে গেলাম?

নিদ্রাকর্ষণ বটিকা

হীরেন চট্টোপাধ্যায়

দরকার ছিল না, বললেন — নিজের মেয়েকে নিয়েই কি কম দেখছি! তাদের আরো ঠেলে নিচে চলে যাও, চলতলো টান দিন কাজে বাঁধ — তা না ওই এক এসটাইম হয়েছে, চুলে হোম দিলে নাকি চুল ঝাটিয়েটে হয়ে যায়! শিবরাত্রির এখন ওই আশাওয়ের শরীরটা আর ঠিক তেমনটা হচ্ছে, চুলে মাথানো হচ্ছে—আর মুখে বাসন ধোয়ার মধ্যে একবার কী যেন চুক চেকে বলে আছে। কিছু বলতে গেলে ঠেলে মারতে আসবে।

—বলো না, বলো না, শুধু ভেবে যাও— ওই যে বলে না ক্রোধ ধারণের ক্ষমা আর ধন ধারণের কলা। আমাদের হয়েছে এখন সেই অবস্থা। তা কী ব্যাপার হল আজ?

—আর বলবেন না, আজ্ঞাটোলা সকালে তো এসেছিলাম, যেমন আসে —

— নিখিলের কথা বলছ তো? ওই তো কী সব কুচো-কাচা আজ নিয়ে এসেছিল ট্রামে ভর্তি করে।

— মৌরলাগুলো খুব ছিল না, দাম তো আছে, বলে মুখো টাকা কিলো!

— রাখো তো! মোটে দেখতে পারি না কুচো মাছ — তেতো বিষ আর কাঁটা আর। কী সুখে যে মানুষ ওই মাছ খায়!

—মৌরলায় কিছু বেশ টেস্ট আছে, দিদি, বেশ খারো করে পোড়া তেলে ঝালসে —

— সেই কথাই তো বলছি। আজ খাওয়া না টিকা খাওয়া। কী ছাইপাঁশ দু-একখানা খেয়ে আজ নিয়ে —

—হাঁ, মানে সে আজ তো ছিলই, আর একার আবার বুনোর কাল বললেন, বাজারটা একবার ঘুরেই আসি — ছেলেরা তো আপনার দেওরকে, মোখাও কিছু নেই একটা ধুমসো ইলিশ এনে হাজির।

—গোটা!

— হ্যাঁ, ভালো করে এনেছে একজনের মতো।

—হাঁই বলো। কথা সেই যাদা সেই মুখ করে একটা গোটা ইলিশ কিনে ফেলবে।

—ওই রকমই তো মানুষ আপনার দেওর। নইলে বলুন তো, সকালে ঘাম দিয়ে অফেসকানি জ্বর ছেড়ে হল, এই দরকার ছিল তোমার মাছের একার জল এনে ফেলবার। ওই এতো ফোলার সেই মাছ খাওয়াবে, খেওকে, রাঁধবেকে

—সে এতোদিন পর হয়েছে এসেছে, তোক তোক কি আর এমন ইলিশে-পালসা হজম করতে যায়

—না না দিদি, এতদিন পরে বাড়ি - আজ খেতো রাজার একটা। আজ দেখল কি একেবারে ছিপছিপে ছোকরাটি হয়ে বসে পড়ছে। সেই দেখে দাঁড়া থেকে কিলোটি, ফোলাগাটে কাল একটু ঘাসল কি আজ, সঙ্গে সঙ্গে একখানা ফোলালো হয়ে গেল হাতে। ওই হাতে হখন বসে বসে আবুলতো দিদি কী অবস্থা! কিলোটি একটা জায়গা থেকে বেড়িয়ে —

কথা বলতে বলতেই অনুরূপাদী মুখের ভাব পালটে যাচ্ছিল, বললেন — হাত যে, ও আর আজে আলির গায় আজ কী লাভ। আজ নিয়ে তোমাদের বাড়িতে যে মাছের ঢুকে সে তো বকবে ওনারেই পাই তোক। তোমার মত একা তো আর নয়, দুজনে, তিনি সকালে একেবারে। সেই সঙ্গে তুমি তো আছোই, আজ যেন কাল ফোলো বাড়িয়ে ফেলা হয় না।

—বলুন তো দিদি। আজ তো আপনারাও কম, তাই বলে দেখলেই একেবারে পাগল হয়ে যেতে হবে?

—সেই কথাই তো বলছি। আজ কি আজেরও কিছু জ্ঞান কিলি বাকি তোমাদের চেয়ে? কি যে কিছু, জল না... উত্তর দে! তবে হাঁ আজ নিয়ে তোমাকে মতো হাঁকাহাঁকি আজলা করি না।

— সেই জন্য যে কথা — কিছু দু-দিনের মতো কিনলে আজকে নিজে হাতকাটাকি করে টানে, তা আজ্ঞে কি তোমি এই আজ কাটতে দিতাম?

— তা আজ কি! সবে লাল-লালে পাট চুকিয়ে প্রোসেসটা নিজেকে কিনা আসছি, ঠিক সেই সময় এই উৎপাত বলে কিনা, ইচ্ছে হল কিলিমটি তেকে

— ইচ্ছে তোকে নিয়ে কপালে এই দুঃখ করে! মেয়েমানুষ বলে কি আমার মানুষ নই, তাঁ! তখন-তখন যা খুশি আমনি ইচ্ছে হলেই হল। কাঁটা আছে, কাঁটা আছে মাথায়!

— তাকে যে ছেড়ে দিল, কী ভাবে ধরে সবাবার কায়দা বলে কথা, আজ নিয়ে আজ

—হলে আজ কী, আজ না হোক দুটো বলে যাবো। আজকে আজ ওনার কী

— না দিদি, সে তখন বাড়ি যা, আজকে হবে। সবে সবে মেয়েকে-বাজে পড়ি তোক তোক্তা, জোর কাজে ধরে ইন্টারভিউন নিয়ে নিয়ে যাওয়া

—ইন্টারভিউন! কীসিতে ওই এইটুকু মেয়েটাকে তাকে?

—কী তোকে কী হবে যায় কিছু বলা যায় না। উনি বললেন একটা ইন্টারভিউন নিয়ে যদি কিশলয়ে এক্সপার্ট যায়

— রাখো! লম্বা চুলে দেখিয়ে দেখিয়ে হাসালেন অনুরূপাদী। নিখিলকে নিয়ে ঠাট্টা করে বললেন — শোনো, কিছু কথা শোনো, ওরকম টুক করতে যদি ইন্টারভিউন নিয়ে হয় তাহলে তো ইন্টারভিউনের খুঁত ধরিয়ে ডাক্তারবাবুকে ঘরে বসে থাকতে হয় আজই না হয় আরো পাস হয়েছি, বৌদিদের তোকে কী না করেছি! কাটাছে, ভাগছে, বক্ত পড়ছে — আরো কোথায় কোথায় তোকে কি আর —

— না না আজিও তো কম সময়, মানে, উনি বলছিলেন, বলেই আর অপেক্ষা না করে

— হ্যাঁ, সেই কথাই তো বলছি, আরো দেখলে কি আর আমাদের চলে?

এই তো, আসই তো — তাই নাকি, বিন্দু, পল্লব ঠোঁটের ফিকে হাসিটুকুর মধ্যে ঘনঘটাটুকু ঢেকে রেখে। বিন্দু তো ঠোঁটকাটী বলে প্রসিদ্ধ। — একটুকি ভ্রূকুঞ্চনমাত্রায় ঘটলো, আইব্রিস পড়ে, রাগছে বলো, তা বিন্দুই তো ভালবাসে না, দেখলো, অন্ধকারটাই কি আরও ঘন হয়ে পড়ে গেল?

— না দিদি, একেবারে চলবেনা তোমার না, কি হয়েছে আপনি? শাড়ি থেকে পেটটা একটু উঁচা, মানে তিন-চার মাস হবে হয়ে গেছে, তা সেই জন্যেই ডাক্তারবাবু এতদিনকে দুটি ওষুধ

— ওসব আমার চোখের ওষুধে ভাল হবে না, ঠাণ্ডা জল দিয়ে ধোবে। পেটের! ওটো আমার মিষ্টি মেয়ে — ডাক্তার আর আমি কটি দিন বাদেই তো আমার নন্দ বাগচী বার! এতদিনের বন্ধু তোমার এক অবস্থা।

— ডাক্তার?

— ডাক্তার আমার কী। ওরা ওসবই ভাল বোঝেসুঝে, ওষুধ-টষুধ। নিশি আমি আছি। আমরা তাই বিভিন্নরকি মানুষ, মরা মানুষ-পুড়ু ওসব কি আর আমাদের চলে? তোমার এই সাহেব ডাক্তারটাই দেখে রাখে নিল, নইলে এসব ছোটখাটো ব্যাপার

— তা অবশ্য ঠিক, তবে এইসব ছোটখাটো ব্যাপার থেকেই কিন্তু অনেক সময়

— সেই কথাই তো বলছি! ওসব নিয়ে যারা অকারণে কারবার আমার ওই ছোট বউটার মতো পাটের নিশিরা! আমাদের যদি কিনারাদিয়ে যদি যাবে যাবে ভাবছে হয় পেটটা পুটু করলে কি পুটু করলে —

এসব কথা শুনলে অবশ্যই ভেতরে খুশি আর আসার কথা নয়, কিন্তু মুক্তাবিদীর অন্তরাত্মার আসছে এসে তাড়াতাড়ি নিজেকে তিনি উত্তেজিত হতে দেবেন না, বললেন — বুঝলাম তো সব দিদি, কথা কি আর নিজের জানো? ওদের জন্যে। একটা দিন পরে দিলে তো অন্যদের চোখে অন্ধকার। আপনার ছেলের কথা কী বলছেন, আমার নবনক্ষত্রটিও তো আমার কম নয়, তবে তাতে যে পড়বো, তোর এতে রাগের দুঃখ হয় না আমার।

অন্তরঙ্গ ঝড় একবারে ঘুরিয়ে বৃষ্টি-বিন্দুতে হয়ে গেল অনুভবটি এবং বিন্দুদুখীর মধ্যে। মুক্তাবিদীর ছোট মেয়েটি যে ইতিমধ্যেই একটিতে তত্ত্ব করেছে, মুক্তাবিদী ভেবেছিলেন বাড়ের সাধারণ পরাজয়ী হিসেবেদিদি অনুভবটা তা আসে না। কিন্তু দেখা গেল বিন্দুদুখীর মতো মুহূর্তের ব্যথা-আঘাতের কথাগুলো সে ধরে তাঁর আর অন্তরে নেই। মুখে এক টিলতে ফাঁকা হাসির রেখা নদীর ঢেউয়ের মতো একটুখানি চলনের ঠোঁটেই মিলিয়ে দিয়েছিল, বললেন — মুশকিল কি জানো ভাই, বেশির ভাগ ছেলেদেরই আজকাল এসব নিয়ে বাপ-মাকে আমার বিশেষ সুযোগ দেয় না।

বুঝলেন মুক্তাবিদী। কিন্তু এও টের পেয়ে গেছেন যে উনি ভেবেছিলেন ছোট ছেলে, মানে বাড়ি-বউ নিয়ে এতক্ষণ ধরে অনেক কথার বিশ্লেষণে ভূষিত করেছেন, তারও কীর্তিকাহিনী মোটামুটি পাড়ার অনেকের কাছেই অবিদিত নয়। অনুভবটা অবশ্য প্রথম দিকটা দেখিয়েছিলেন তখন এবং শেষ পর্যন্ত ছেলের অন্য জায়গায় বিয়ে দিতে সমর্থও হয়েছিলেন। তবে তার কারণ তিনি শুধু একা নন, তখনও পুরও যে দিনের পর দিন আসাটে-কুড়াটে জল খেয়ে রাতারাতি মায়ের মুখুর হয়ে গিয়েছিল আর প্রথম আবার শ্বশুরের অধিষ্ঠ নৈবেদ্য।

ছেলে-বউ বাড়ী গাড়ি দিলি রোক, এ সংসারের ভাড়-কাড়ন যে আর বাপেরই টাকায়, এটা পাড়ার সবাইই জানে। তবে এই মুহূর্তে সে প্রসঙ্গ তুলে মধুর আলাপের গতি নিয়তে মুক্তাবিদী প্রস্তুত নন, আসার এতেবারে ছেলে মেয়ের পাটি ও তাঁকে বলে হয় যে, বলবেন — সে যদি বলেন দিদি এ-পাড়ায় একটু আধটু মেয়েরা তো আসতেই থাকে, বোনের মেয়ে বলে একটা কথা আছে না? আমার যোগাযোগে ভোলা কলকাতা ফিরে গিয়ে সবাইকে বলছে, এমন ও তো কেউ আসে।

সেখানে সেখানে ভোলাবৃত্তি হয় একটু, সেটাও বরীয়সী বুঝবেন, বলবেন — সে অবশ্য দেখতে বড়ো দেখতে পারি। কীলভয় কী পাতলা-টাতলা কাজ-টাজও করে।

— এই দেখুন দিদি, আপনাকে আবার নতুন করে বলতে হবে কেন? মুক্তাবিদী আড়চোখে দেখতে পাচ্ছিলেন বিন্দুদুখী পাতলা বাটি সাজাতে টেনে নিচ্ছে বক্তৃতাবিষয়ে কাঁচে নেই, ঠোঁটে মুখুটি দিয়ে পল্লব সাজা হয়। মুক্তাবিদীর জানাই যে একটা মোটা মুখুটি ধারে, বিন্দু ঠোঁটি দিয়ে কেটে নেয়। ঠোঁটি বিন্দুদুখীর হাতে তিরেছিল, মুক্তাবিদী বললেন — আমাদের অতো অধারিত যাওয়া তেমন, মানে কি এ ফ্লাটে পুরোনো, আমলা তি আর অন্যদের চিন্ন চাইতে পারি, নাকি চাইলেই সেটা পাওয়া যাবে?

— সেজন্য সেখানে সম্বন্ধ অন্য উচিত নয়, নিজের জন্যে সাজা পান একটা মুখে পুরে বললেন অনুভবটা— বাইরে পাওয়ার তো আমার মধ্যে তেতি অবাই আছে, আর আমাদের জিনিও তো দেখতে শুনতে খারাপ কিছু নয়

— তার কথা বলছো দিদি?

— ওই আমাদের ছোটির মানে গো - পলা আমার বিন্দু, সেটা ছোটবউকে না শোনাবার জন্যে না আগে পান তাদার জন্যে, আসে তোরা গেল না, বললেন, কী অবস্থা! চক মেলানো বাড়ি — তুমি তো

দেখেছে! কলকাতা শহরে আরো বড়ো বাড়ি করবার আমারও আছে ও-জমিতে। বিরাট প্ল্যান, বাড়ি ডেলিভারি। তবে না লক্ষ্মী এসেবারে উঁচুতে পড়বেন। অমন ছেলের বে-এ ফেল বলে পাঁচ-সাতশো ছেলের বাপ তো একেবারে ঘর্মাক্ত হয়ে পড়বে।

এটা একটা টোপ, বুঝতে পারলেন। নইলে যে ছেলেটিকে নামে দু-মিনিট আগে চোখেও দেখেননি না একজন অদ্রিজনীর পেটের ভাত চলকে হয়ে না, তার জন্যে নিজের ভিতের জন্যে সময় তাঁর উথলে উঠবে না। ছেলেটিকে আসলে একবার দেখতে চেয়েছেন বুঝতে পারি। এ বাড়িতে কী একটা উপলক্ষে এসেছিল। গায়ের রঙে বড়ো একেবারে পাঁচমিশি মিলেমিশে, আর গায়ের এ-রঙে তো আকাশের কার লজ্জা পায়। সে যাই হোক, তার জন্যে কিছু আসে যায় না হিরণ্ময়ী তাঁকে আগে অনেক দেখেছেন, কিন্তু তাঁর চরিত্রিত্রের যে সব কথা বলেছিল সুভাষিণী, তাতে তো মনে তখনই বুক কেঁপে ওঠে। মনে হয় কলকাতা দুর হয়ে যাক, আর নিরিবিলিতে যেখানেতে ছাড়া নাকি তাঁর চলেই না — এখেবারে পুরোনো আমলের জমিদারি মেজাজ। তা, সেই চরিত্রিত্রের একটু নমুনা যে সুভাষিণীও পাননি এমন নয়। কখন যেন তাঁকে মিনুকে একবার দেখে ফেলেছে কে জানে, অদ্রিজনীর কাছে তোমের যে খোঁজ-খবর করেছে সে কথা তিনি শুনেছেন এই বিধুমুখীর কাছেই। এই সুযোগে সুভাষিণীকে একবার বাজিয়ে দেখা আর কী।

— কী গো, তোমাদের একবার পাঠাবে নাকি? সুভাষিণীকে চুপ করে থাকতে দেখে অদ্রিজনী বলেই ফেললেন কথাটা।

বিধুমুখী সাজা পান এগিয়ে দিয়েছে, সেটা হাতে নিয়ে সুভাষিণী বললেন — কী দরকার দিদি, যাকুন ঘরে টাদের পানে চেয়ে বসে থাকুন। আমরা তো বলতে গেলে ভিক্ষে করতে এসেছি। আপনিই তো বললেন, সম্বন্ধ সমানে-সমানে হওয়াই ভালো।

— সে তো একশো বার, তবে আপনার তোমার ছেলের যদি একটা বিহিত হয়ে যায় — অদ্রিজনী এক বাটা মেজাজ মুখে ফেললেন — প্রস্তাবটাতে নির্ভর, বলা তো যায় না আর কোথায় সম্বন্ধ ঠিক হয়ে যায়।

— সে তো বটেই, দেখি ওঁকে একবার বলে, পানটা মুখে পুরে নিলেন সুভাষিণী, — উনিও একটা সম্বন্ধের কথা বলছিলেন - ছেলের বাপ ওঁর সঙ্গেই কাজ করে। অবশ্য-টবশ্য অবশ্য ছেলের ভাল নয় ছেলেও, কিন্তু পড়াশুনোতে খুব ভালো, অনেক ওপরে পাশ ...

— রাখো তো ওসব পাশ-টাশ ঝাঁঝিয়ে উঠলেন অদ্রিজনী — ভাল একটা চাকরি করবে, দু-পয়সা উপরি থাকবে, রোজগার করবে দু-হাতে — তাকে না পুরুষমানুষ। ওসব পাশ দিয়ে কি তুমি ধুয়ে জল খাবে নাকি? আসলে দুটিতেই পাশ করেছে, বড় তো একেবারে বিলেতফেরত - এরপর পাশ এক পাশ দিয়েই যাচ্ছে ...

পানের দিক থেকে জলে একটু খেয়ে ছিলেন অদ্রিজনী, ফলে তিনবারের বার পাশ কথা বড় ছেলের কীর্তি জাহির করার চেষ্টায় একটু ভারা পড়ল। শিক্ষালি সরিয়ে রেখে বললেন — অবশ্য এতদিনে বেখো, বেখাকে ছিল সেখানেই পড়ে আছে, গোঁড়া খেয়ে। এখেবারে পাথরকুচো কপাল। বড়-বৌমা চেষ্টাচরি না করলে ওর চলবার!

এবার অবশ্যম্ভাবি ছোট ছেলের কথা উঠবে। সে বরাবরই বুদ্ধিমান ছেলে। বি.এ ক্লাসে ভর্তি হয়েই বুঝে নিয়েছিল এসব ডিগ্রিসিগ তার জন্যে নয়। বড়লোক বাপের নিজের ব্যবসাতে ঢুকিয়ে না নিলে তার কাস্টমারি এসে মিলে কী-না হাঁটতে হবে। সকালসন্ধ্যে আসাটাই ছুটি পড়ে অফিসের হিসেব নিয়ে তিনি যে কী বাজকর্ম করেন তিনিই জানেন।

কথা শুরু হয়ে গিয়েছিল এর অর্থাৎ, অদ্রিজনী বলছিলেন — ছোটটি তবুও বড়ো মুখচোরা গোছের ও, কলেজ জানাই আসায় সব সিকে ছেঁড়ে। ওর ওপর বাবসার ভার দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত। এ ছোট আমার কটা পাশ দিয়েছে, তুমিই বলো।

— ছেলে অবশ্য ভিন্ন, হয়ে তিনি — কথাগুলো শেষ করেছেন কিনা সুভাষিণী বললেন — বাটাছেলের পেটে বিদ্যে না থাকলে অমনায় আমার মতে মেয়ে মানুষ বলেই মনে হয় না।

— আরে সেই কথাই তো বলছি অদ্রিজনী কথার একেবারে ওর না দিয়ে বললেন, পুরুষমানুষ হবে পুরুষমানুষের মতো। নিজের ছেলেকে আমরা বুঝবো, বুঝবো কিনবে, যেমন উপায় করবে তেমনি খাবে ওরবে — ও বিদ্যেবুদ্ধি দিয়ে কি ধুয়ে জল খাবে নাকি ছেলে?

— তা হলে আপনি অনুগ্রহ করে জীবন কাটালে, বলুন দিদি, সেটাও কি ঠিক সুখের?

—মানে! তুমি কি আমাকে ছোটলোক বলছ। এতোক্ষণে কথাটা যেন মাথায় ঢুকল অদ্রিজনীর — হা ঈশ্বরের অনুগ্রহ, জামাই মেয়ে, এ আর বেশি কথা কী। জামাই তার ছেলের মতো নয়? তুমি যে তোমার মিনুকে বিয়ে দিয়ে করে নাতনি — জামাইটি যদি তোমার পাত্তা না দেয়, তোমার ভালো লাগবে?

— পাত্তা কেন দেবে না, আমি কি আর পর? মিনু সর্বক্ষণ যদি সেবি সেবি করে, জামাইয়ের মোহময় আমার ...

—একদম বাজে কথা বলবে না, মতো বড়ো মুখ নয় তোমা বড়ো কথা! তুমি বলছ আমার ছোট পর সময় সেবি

দেখি করে? ওষুধের কথায় কেবল আপনার জন্যে আর মেয়েকে বিয়ে করেছে।

—এই দেখুন দিদি, আমি আপনার কল্যাণে কোথায়! মুখখানা শান দিয়ে মিটমিট হাসলেন সুভাষিণী, একবার ফের একটু চোখের পাতা ভারি হয়ে আসছিল, বললেন — সত্যিকথাগুলো আপনার মুখ থেকেই বেরিয়ে এসেছে।

—না। কথাগুলো মোটেই সত্যি নয়। বাঁচিয়েছো সম্ভ্রম করে দিয়ে দিয়েছি আমি, কোনো উঁচু বেড়ালো মেয়েকে ধরে নিয়ে আসিনি।

—রাগ করছেন কেন দিদি, কে উঁচুতে আর কে উঁচুতে না সে তো দেখলেই বোঝা যায়। মুখভঙ্গিমা দেখেও কিছুই বুঝা না, পানের দিকটা নিলে মেলে বললেন — এই যাওয়া তো ছোট হচ্ছিলেন নিজের মুখে কই দুর্ঘটনার আপনার। সে বিশেষটা, পানের দিদি, পাড়াগেঁয়েদানি

— বেশ করব বলার, আমার বোঝাকে আমি যা খুশি বলব। তাতে পাড়ার লোকের কী?

—না দিদি, এই কথাই কথায় বলছিলুম আর কি, নইলে আজকালকার দিনে কে আর অত পরের ভাবছে বলুন।

— খুব খবর রাখছে। নইলে আর এতো সব কুটনিগিরি লোকে করে কী করে!

— এটা আপনার রাগের কথা দিদি, নইলে কুটনিগিরি যে করছে সেটা আপনি কিন্তু নিজেই —

— আলো! বেশি কথা বলো না! তোমার মতো দেখি, কোথায় বিপদে দুজন সম্ভাষণ দেবে, তা না আষোল-তাষোল কথা তুলে মেজাজটা বিগড়ে দিচ্ছে! ছি ছি ছি, কী নীচ ভাবের মেয়ে গো!

—এই দেখুন, আমার ভালোর কথা কেন দিদি! আমার আর তো ভাবনাটাবনা ডাক্তার ছিলেন, সে কথা আপনিও জানেন। গরিবের চিকিৎসা করতেন বিনে পয়সায়, সেই জন্যেই আপনাকে ওষুধিয়ে দিতে পারেননি। আপনার তো দিদি তিন কূলে ওই কে এক কাশ্মীরাইতলে জায়গা ছাড়া আর কেউ নাই —

— হ্যাঁ — প্রায় এক মাইল লম্বা একটা টান দিয়ে অমৃতময়ী বললেন — এই কাশ্মীরাইতলাই আমি ডাক্তারদের ঠাকুরবাড়ি। কালকুটুমের দিয়ে এখনও খোঁজ করে দেখতে পায়, ঘটনার কাশ্মীরাইতলার বলতে লোকে এখনও আমায় — বলে সাধারণ বন্ধুরাই ছিলেন তিনি।

— টাকা-পয়সাও তো দিয়েছে সেই সঙ্গে প্রচুর তো শুনতে পাই!

— তবে বটে তো! তোমার বাবার মতো বিনে পয়সায় চিকিৎসে করে বেড়াতে? গরিবদের জন্যে দানছত্তর খুলতে? কী আর্তটা হল তাতে, শুনি? যদি তোমাদের কী হতো তাতে? তিনি তো আর সাধিনি ছিলেন না, যে-যা তাতে সন্তোষী হয়ে ছিলেন। তা সত্যকথাটা তাতে ভেঙে না যায় সেটাও তো চাই —

— ভেঙে তো যায়নি দিদি — বাধা দিয়ে বললেন সুভাষিণী, এই বলতে পারেন আমরা আকাশে উড়ছি না, মাটির ওপরই দাঁড়িয়ে আছি। কিন্তু তাই বলে যদি বলেন আমরা উঁচুর কাউকে করেননি

— ঠিক আছে বাবা, করেছেন। তোমার কাছে কথা হেরেই আমার অন্যায় হয়েছে। এই নাক-কান মুলছি আমি।

— ছি ছি, ওকি করছেন! মুখের হাসি গোপন করে বললেন সুভাষিণী, বয়স আপনি বড়োই, ছেলে পেছেন দেখছি। আর আমি ছোট দিদি —

উত্তর না দিয়ে মুখটা ঘুরিয়ে নিলেন অমৃতময়ী।

সুভাষিণীর মনে বিধুমুখীর উঠে পড়েছিল, নিজের বক্তব্যটা বন্ধ করে দিয়ে আসরে যাবে। একবারমাত্র এসে দেখা দেবে বিধুমুখীর মুখেও হাসিটা হাসিয়ে হাসলেন, বললেন — খুব ঘটিয়েছেন তা তোও। এক মুখের ওপর কথাটা তো অনেকেরই শোনা। সকালে তোমাকে ঘরে এনেছিলাম।

— ওই কথাই তো এই সন্ধ্যে সন্ধ্যের দিন খুলে সুভাষিণী বলছেন, কে যে তোমায় ঠেঁটিয়ে নাম আনেছেন কে জানে। অমন তো না, মুখ দিয়ে সব সময় বিষবাষ্প বেরুচ্ছে।

সন্ধ্যা বন্ধ হয়ে, এপাশে বসল এসে বিধুমুখী, অবশ্যই মুখে হাসিটা হাসির প্রলেপটা মুছে, অমৃতময়ী তখনও খুব গম্ভীর ভাবে বসে আছেন। বিধুমুখী ঘরে ঢুকতে বললেন — এসলি কথাগুলো একবার শুনলি বিধু!

—বিষবাষ্প! তুমি বলে তাই সন্ধ্যে কথা বৌদি।

—ঠেঁটিয়ে বিষ ঝাড়ব এলাম এসে। ভেবে রেখে ছোট আছে আমি যেন জানি না? মেয়ে পক্ষ যেসবার জন্যে। ওসব দিদি-টিদি সব বাজে কথা।

— যা বলেছ। নাও, এবার একটু ওষুধ পড়ো দিকি, পেটের ব্যথা। যা গরম করে যে গেল তাতাটা।

—যা বলেছিস।

পরের দিন বেলা একটা বেজে গেছে। খেয়েদেয়ে নিয়ে বিছানায় না গড়িয়ে বসে আছেন অমৃতময়ী। খুব ভাবছে না, উঁচুমুখ ভাবছেন আর তাকাচ্ছেন মাঝে-মাঝে দরজার দিকে। পাশের ঘরে বিধুমুখী। সে একবার অমৃতময়ীর দিকে তাকাচ্ছে, একবার দরজার দিকে। হঠাৎ তার চোখ চক চক করে উঠল। সোজাসুজি বসে উঠল, এই এসেছে গো

পাখির ঘর-সংসার

ডাঃ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী

॥ এক ॥

না, পাখি মোটেই ছাড়বার পাত্র নয়। তেমন বলতে গেলে ওর নামও নেই। তবে বলতে গেলে ওর নাম অনেক। ই মেসোমশাই যেমন বুধাই, ঠাকুমা দু আর মোড়লদের মেয়েরা ডেকে থাকে।

বলে — তেমন নই, আমি কি ডি ডি। শরৎচন্দ্রনাথ প্রেস ডিগার। পোস্টকার্ড থেকে লাল চুলি।

বাহাদুরী ভারী কাঁদুনে। বলে — কলেজপাড়া থেকে লাল চুলি আমি বিয়ের কার্ড পুরোহিত গিয়েছি, তাদেরকে পাখাওয়ালা হাত্তা হই গেছে। যদি পুলিশ দেয়

— পুলিশ! হাসে পাখি — পুলিশ কেন কাগজের বাড়ির নাই তাহার পরে লাল হয়ে হাতির হাট না বাহাদুরী, সাঁতুরিয়াপুরে আসবার আগেই কলেজটা সিটি জানে।

ওখানটা ঠিকই বলেছে পাখি। ওদের হাসপাতালে প্রথম বুঝতে পারা ওটা লাল ঘরে ছাত্রদের অত্যন্ত হাতাগুলো চিনতে হয়। লাল থেকে হাড্ডি তৈরী করে নিচ্ছি করে — হাতুড়ের সর্দাই ফেলে। শরীরবিদ্যা না বলতে পারলে ফেল।

জোগাড়িয়ার মতো বড় কলেজটায় আনাটমি ডিমেনস্ট্রেটর হলেন ফেউ ডোমের জামাই, পাখি। মেয়ে পছন্দই দেখেছিল।

আর বাহাদুরী?

ওরও বাহাদুরীর তথা পরে

॥ দুই ॥

মোরকুয়েরের এদিকটায় বাতাসে কেমন ঘুমো গন্ধের মেশামেশি। ঘুব সকাল উঠু উঠু জলো ঘাস, ঘোড়ার কম আর শাল- পোলের ছড়াছড়ি। মিজলি, ওমলান।

পাশের পালে জলের ঢেরে দুর্গন্ধি বেশি। বাসরাত্তা অনেক দূরে। পথটা মোড়ে পথে পোড়ে ওকল ওকলে ঘটিখাটি, কিন্তু একটু বৃষ্টি হয়েছে কী বাস। জলে-কাদায় মেশামেশি।

এগিয়ে চলে বাহাদুরী। একটা গাছটার পাশে এসে থমকে দাঁড়ায়। ধবধবে ছোপছোপ গায়, ঠিকিরি পক্ষে কাঁপে। আর গাছটির কাঁকে কাঁকে ছোপছোপ ঠিকিমিকি। হাত্তা হাতে দুটো ছোট ছিপ পাশে পুলোয়।

বাহাদুরী চল চল ওঠে — ঠিকিরে আহলাদে খুশি জাগে, আর ছোপা-ছোপা ছোপরা ভাইপো মতো, ঠোঁটের ওপর জমা/৪ আসার পেরথম ঠেকের পাতে যে।

পাখি হেসে খুন খায় — আহাহা-

এবং কাওয়ালি বাইজির আহ্বানী। জমজমাট আসর যেন!

আহ্বানী অবশ্য যায় না।

টিলাটিলে বুকের স্বল্পস্বল্প ঢেউগুলি ছেড়ে যায় শশীর দিকে। শশীর আবছায়ায় ডুবে শশী, কাল জাগা। হাতে এটি কাঁচের চুড়ি। জোয়ার যেন পরীর মেয়ে উঁপড়ে পড়ে। জানাজানির শাসন মানে না।

পাখির বুদ্ধি উঁচাল-পাতাল, কেমন এক ঘুনো বুদ্ধিয়ে বাহ্যানীর দিকে ঠেলে থাকে।

বুকে কাপড় টানে বাহ্যানী। দাঁড়িয়ে থাকে। পাখি বুদ্ধি আসছে — হঠাৎ রুখসি জেগে যে বাহ্যানী। চল চল লাগটা পড়িয়ে এখিনে। যাসে ছড়াই লি। হাজি মালাই।

ঘরা বুদ্ধি মাহ্যানীর। বন্ধ নিলটার পাশে এসে বসে পড়ে। কয় কী যেন ভাবে।

আজ কড়িগাছা পাঁচটি ইচ্ছা লাইরে পাখি। লাশ ছুঁচি জল নাই।

— কেন যে?

— জলরা আজকাল কেমন হয়ে। কুয়াতি পড়ি না। তুব জলো হয় পাই। তলরপানায় খুটি খুটি খাদি।

— তুমী কেমন পাখি বাজিমে আহ্যানী। মানুষের মেরুকির মতন বাজিমে-ওজিমে। চোখে কাজল দিমে। পান টান কি করিমে। ই সব ভালো নয় যে।

হঠাৎ মুখ ঝাড়া হয় আহ্যানীর।

— আমায় যে ঘরের সঙ্গে জাগে পাখি। সোয়ামির ইচ্ছে হয়।

পাখির কাঁকড়া চুল আলগে এলোমেলো। চশমাটা খুলে দীর্ঘশ্বাস। মো মো করে হাসে।

— সোয়ামি, কয়? ই পৃথিবীর ঘরে মানুষ নাই যে আহ্যানী — জল আছে, খুলো আছে। ঘর হয় না, ভেলা সবার জমি নয়।

— কেন?

— আমার ঘর আছে। জনম আছে, বিশ্বুক তুব নাই। মো মাছি গাছে চলি আসব খাই, গাছে আসি সাজে। মাঝির ছাইরাদের গলা ধরি শিহিত করে।

বলতে বলতে থমকে এল — ঘরের কি হয়ানক্কানি, কুয়াতে ডুবে জন্মায়। ই জমি ঘরেতে ঠিহিনো — ই জলটুই ঘর নাই, ভালোমোন নাইরে, টিকা আছে। জীবেরা আকলি কয় হয়।

একটু থামে পাখি — ঘর বলতে আমার লাল-কাটা ঘর, মাটির বেলাতে ঘরা লিয়ে আসেযাত।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাখি।

আহ্যানী চুপ করে থাকে। ওরাও জল মেয়ে। অন্ধকার ডুবে ঢাকায় মেলা। জোছনা গলে গলে যায়ে। খাল, জল, ঝিক সব একাকার। ডুবের গায়ে বকুল ঢুলিটিল করে পড়ে।

॥ তিন ॥

শ্মশানের কালো ধোঁয়া শুক খেয়ে খেয়ে উঁপরে ওঠে। লাশপোড়া গন্ধ ছড়ায়। গাঙ্গার জলে ওয়েলের ঢেউ — অন্ধকারের বুড়ো চাঁদের ছেলেরা খুশি।

শ্মশানের সিঁড়ির ধাপে বসে থাকে আহ্যানী। পাশে পাখি।

পাখি ভোর ছিল ছিল করে — রাস্তার রাস্তায় ঘর ওয়া করি ঘুরতিল খাঁচাই লিয়ায়। ই অন্ধারটি ঢায়া কত জায় ওয়ে — যেত ভোম। মাতলা লিল, বাঁচি গেলি। লাশ আসে, আগুন যেত-ছিনে ধোঁয়ের পারা লাখি থাকিস। ইশানঘরা কাথাটা, বালিশটা মেলে, আহ্যানীর লিকে দিস। ডুবার লাহ্যা পাস। খেটি ঢালি যায়। কিছুক ডুবে মানুষের ইচ্ছা বলিস কেন যে? ঘর চাস। খেটি আজা চাস। ডুব ছাড় আহ্যানী!

আহ্যানী যৌন করে — ঘর চাই, ডুব কী? ডুব বুক পেয়ার কেন ঘরানরলরা!

— ঘর! ঘরের মধ্য? ভেলে খেতেমি কেয়ার্জা — ঘরের ঘরু পায়, ঘরি করে। কে লিয়ে হোকে। আপোনে নিজের নাই

আহ্যানীর দুঃখ বাড়ে। থুপিয়ে কেঁদে ওঠে। — তুকে ছাড়া আমারে পারিস তো পাখি। তোর কয়ে কষ্ট পাই।

পাখির মুখে নিষ্ঠুর হাসি, প্রতিশোধস্পৃহা।

— ঘর ছাড়ি যে পারানি। ঘর টুই যে জানিস। কথায় মধু ঝরি পড়ে। মেয়েছিলার ছিলসি ওয়া। আমেরে আসার চঙে ছল। মনের মতন মেয়েছিলা, জীবনটারে আটকি ঘরে। মেলা কথা — ছাড়া ছাড় না। মেলা দেখা আছে।

প্রবল ঝাঁজে আহ্যানীর। ছাড় ছেড়ে যেয়। লাশ ঘাটে আর করি তুই আর মানুষ নাই যে পাখি। পেরেত হই যেছিস। পেরেত। গয়নাগা পেরেম নাই, ভালবাসা নাই, পোস্টিটার ঘর, মড়া-ঘরে ফেরে ঘর মনোহ, ওয়াত-খু।

একলা খুখু ফেলল আহ্যানী — ছোড় ছোনলা লছবি কি আর আর ধরি বসু ঘরে! কেন করে বেশ : তুর শশা-নদীয়া সব শাশান হই গেছে। বাপটি মরি গেল ছকে এই টুকুনও জমি নাই, যেন কুটী তুর শাশানের। প্রাণীও নাই। কুকুর, বিড়ালেরও অভাব। খুঃ খুঃ মিছা লাগে।

॥ চার ॥

আনাটাকি ছিলেকালন গ্রামের ইন্দ্রাণী শ্রীধর চট্টোজে। ট্যাক্সিড্রাইভিংটো চাকরি — সকাল বুলুটা ছাড়ে, আফার পর গাড় করে মড়া-কাটা ঘর — ডিসেকশন হল। কিন্তু ছুটি নেই চট্টোজের। সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করেন, মড়ার ডিসেক, পোস্টমর্টম করের তদারকি, ছেলেমেয়ে ডিউটি সব সমাধানে। চট্টোজে ছাড়া সব আসল।

শেষ বুলুতে লালমাটি নিউরিন,চেলনার। ছোকরের কথা ছেড়ে রাগ আছে। গজ গজ করেন — মাতালেরালনের ছেলেরা জার খাওয়ার। বুব বুব করে আঁড়িয়ে

দেয়। লাল ঘরে ঢুকে চলল, রাত্রি হৈহৈ হয়, সভা উঠে যায় — সব যেন দুঃস্বপ্ন।

লাল ঘরে পড়ে থাকল ঘরের মধ্যে দেয়ালে শ্রীধরবাবুর। চোখদুটোয় ঘৃণা ফুটেছে দৃষ্টি। ভক্তকুলের ধুলো ঝেড়েছেন। দোতলায় সাদি সন্ধি বন্ধকে — চারদিকে রৌদ্রিক নিস্তব্ধতা।

লাল ঘরে না — ঘরের ঘরের মধ্যে ঘরে ঘরে আগুনে আছি, বন্দিনীকি না, সেই পেয়ে যায় বেড়েছে, আগুন উঠছে চাঙ্গা। ঘোরের ছায়ে — ঘরের পেছনে। সব ঘর, সিনেমিলিয়ে ঘর।

এমন সময় পাখি আসে। পরনে নতুন জামাকাপড়। মুখে মুচকির সিল। দোতলায় উঠে আসে। পাশেই প্রফেসরের ঘর।

ঢেকে লাল শ্রীধরবাবু। ঘিয়ে আগুন পড়ে।

— যজ্ঞাতৌল সময় হল — এতক্ষণে সময় হল! সন্ধ্যে থেকে ডিউটি, পাত্তা নেই জন্য ছাত্র — পালা পালা!

একটু থামেন — ঘরের দোষ নাম নেই, ঢাকি সর্বানের মেয়েটিকে ঘরে দেয় হায়রানজাদা। বাকি ঘোর বুজে, চা শক্ত ভাঙি না, সব জানাই জানে জানে। ঢাকতে ঘোর নিয়ের ছাল তুলে দেয়।

ভয় পেয়ে পাখি পালাবার পথ খোঁজে। দোতলার সিঁড়ির মুখে লাভ নিয়ে পথ আটকান শ্রীধরবাবু। বলেন — রাত দেখ, বাইরাজ্ঞেকের রাগ দেখ। চলে গেলেই হল। মরুক বুড়ো চাটুজ্জেটা না খেয়ে মরুক — এই তোরা চাস। গাধা, চা কে খাওয়াবে আমায়? কল কে খাবার আনবে? কাউটিন থেকে নিয়ে আয় — সবাই মিলে খাই।

জানাব, ঘরে পাঠশা ছুড়ে দেন চাটুজ্জে। ঢেউ খেলানো কঞ্চাগাছা চুল। মুখের রেখায় ভাঙচুর, পড়িপাকালে

চেহারা — কৌটিলাল্য ঘোর।

পাখি সময়ের না মধ্যেই এক্সেলেন হলঘর থেকে উঠে আসে ঢাকি সর্বান — ঘোর ঘোর। তিন লাফে সিঁড়ি ডিঙোয়।

সর্বান ঢাউনাউ করে কাঁদে, লাল লাল ফুলো ফুলো ঘোর। দোলে গলা - গাঁয় ঢক ঢক। শ্রীধরবাবুর পায়ে আছড়ে খায়, ঘরজামাই পাখির বিরুদ্ধে নালিশ করে।

— ও শালা, মেয়েটি খেয়ে দিল সন্ধ্যায়। পাখিদিকে পালন করে না। অন্য মেয়েছিলা নিয়ে ইচ্ছে-ও-সিনিও ঘুরে। কুটি ঘরে ঘরকে মন নাই।

ঢাকির কথায় ফস্ করে জ্বলে ওঠেন শ্রীধরবাবু — ওরে আমার কে রে! পাখির জন্যে দুঃখে নিরিয়েছে কোরান — অন্তত যে দুষ্ট মন্ত্রি জন ভন করে। লাল ঘরে ঢাকটি মেয়ে আমি জানান দিই না। সব দেখতে পাই।

ঘোলা চোখে একবেলার দিকে তাকিয়ে থাকে সর্বান। শক্তিত মেয়ে। সাত সাত পাখিকে ঢেরিয়ে। লাইন দিয়ে ঘরে যাবে সব ভেজবাটি। বিরল মত্তার শরীর। পাশেই নীচের ঠাণ্ডা ঘরে লাশের পাশাপাশি। একটা পচা-বাসি গন্ধ ঘুরি হয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

ধকে খেয়ে সর্বানের ঘিনঘিন পালা — ঘিন্নত, ও পালা চাটুজ্জের ঘোর ঘাওন, গলায় বাজ — হারামজাদাটা আমার কথা বলে। মুখের উপর কথা। ঘেটো করা হয়েছিল! কাজ যে ডাকে সর্বান। লজ্জা করে না! মা-বাপ মরা ঢঙি ছেলেদিকে দেখে দেখিয়ে ঘর জামাই করেছিল। মাইনের পয়সা হাতে তুলে দেয় না বলে শত্রু!

চা নেই ঘোর ঘোর ঢালির মুখে।

বলেন — ঢেলে ঢেলে খেয় না। টাকা পেলে তো মদের গর্তে ঢেলে দিস। দু-দিনেই ফতুর। ঘর না ঘুরতেই বাস। এর কাছে হাত পাতিস, ওর কাছে চাস। কলতে কলতে মেজাজ চড়ল চাটুজ্জের — পালা, পাখি কি ঘোর মায়ের ভাকর? বৌকে মারিস, এ সময় তো কৃষ্টির নাম ওকলো আসাব ঢাকে।

চুল কাছে দাঁড়িয়ে সর্বান। ঘর কী যেন ভাবে। শ্রীধরবাবুর মুখটা এগে আসে পাখা — ঘোর ঘাঁড়িতে কাটি ঘুরিয়ে ঘর ঘোরানোর ঘরে না যে সর্বান — ঘোরী ঘরাতে হয়। ঘোরাতে ঘরে ঘোরাতে হয়। যা, ঘরা, পালা ঘরে ঘোর। নতুন ঘরে এল ঘরে ঘরজামাইয়েরই ঘর।

॥ পাঁচ ॥

চা নিয়ে ওপরে ওঠে পাখি একেবারে সর্বানের মুখোমুখি।

ঘোর ঘোরের ঘোর ঘুচে সাদা হয়ে ঘরা ঘোরে। নিশ্বাসে ঢিল ঢিল। ঘরঘর ঘুন চাপে।

পাখির হাত ঘুচে ঘোরে ধরে ঘুরিয়ে ওঠে — ঘরে নিয়ে ঘিন সাদা, ঘর ঘোথায় ঘরিস?

পাখি হাত ছাড়িয়ে লাফ দিয়ে ঘোরে ঘরে আসে — সারারাত সর্বান।

শ্রীধরবাবু চমকে ওঠেন — ঘরের ঘরগড়া ঘরা-ঘরে কেন? চাকরে ঘরে ঘরে ঘের হারামজাদাদের।

এমারজেন্সি থেকে নতুন লাশ আসে। একবেলার ঘেয়াররা লাশ ঘেরিয়ে ঘেঁটানো ঘরি করে। ঘরঘর করে ঘোরে ঘেরে। ঘেরঘরিয়ে ঘরা। ঘরঘরিয়েন্সী। লরির তলায় ঘেয়ে। ঘোরেরা চালটা ঘরীর। ঘী করা মানুষ ঘুরিয়ে ঘেরন যেন ঘরগীরী আইনের। ঘরি ঘরঘরায়।

চাটুজ্জের মুখে ঘুরিং ঘুরি — ও সর্বান, চাকা ঘর ঘোরা নতুন লাশের ঘনা আয়রা ঘরা। চা: ঘুমিয়ে ঘরার ঘে ঘরা ঠিক করে রাখ। ডাক্তার রাত এসে কাটাছেঁড়া করবে। হারপর ঘরঘর ঘরে ঘুরে দিয়ে, ঘলতে ঘলতে নীচের দিকে হারান শ্রীধরবাবু। গজগজ করেন — শালার আছিয়া। জানোয়ার আছি। ঘরা পেয়ে ছুটে এসেছে! শকুনের চেয়ে ঘরাঘ!

ডাক্তারের বাড়ীর বড় বড় পাক খেয়ে লাশের উপর রোদ্দুর — মাথা দেয়া যেই। মরা মানে যেন মানুষ নয়, বড় জোর ঘুমাচ্ছে ভাব।

লাশে হাত ছুঁয়ে চমকে উঠেছেন। দাঁতের ফিতে দিয়ে মেপে নিলেন — লাশটা চলবে নিয়ে যেতে কে মনে। আলোর বাল্ব পাশে দাঁড়িয়ে পেছনে পেছনে। নিশ্চিন্তে ঘুমুতে দেয় না।

॥ ছয় ॥

ঘুম থেকে উঠে শ্রীধরবাবু পাখিকে আগে পাঠ করেন — ভোর বেলা মাথে হাতে ঠাণ্ডা দিলে দিনোটা খারাপ হতে পারে। এ ব্যাপারে প্রাচীন পাওয়া কি দেখো? মেয়েও ভেবে ভোরের জন্যই — হাই পেয়ে যেতি।

ঘড়ির দিকে তাকান — আরেও দেরিতে এসি। এটা কি ভালো?

পাখি কেমন যেন সাদুর পায় — আরে দেরি হই গেল। আলোর পড়ার নতুন জামা কাপড়। কেমন বড়-বড় দেখাইছে লয়!

এইকথে খেয়াল হল যেন শ্রীধরবাবুর। পাখির পরনে নতুন জামা-কাপড়-জুতো।

বললেন — এ কিস রে পাখি?

পাখির মুখে কৃতার্থের হাসি। হাই হাই করে বলে — টেরোনে কাটা দাম। বাবা দিছে খবর নিলাম, মার্কে পৌঁছাই দিলাম। কী সোন্দর জামা মাহেবে — কালো পুতুল! পাখি জামাকাপড়, পাখির বাবা দিছে মেজে দিলাম।

শ্রীধরবাবু মাথে সুড়ুৎ করে চুমুক দেন। পাখি কথার কথার ভাবে — ইখানে না আসি হাই তোমা? বাপরেই ভো আমার ভয় — বাইরে জানা ভালো লাগে না। ই সংসারে আপনি জনা ছাড়কে করে।

কথাটা কথাটা বলে আসি মোক্ষম ঘোর উদাস হয়ে যায়। বড় জানালা দিয়ে পাইয়ের আকাশের দিকে তাকায়। ওখানে মেঘ-মেঘমুরের লুকোচুরি।

কথাগুলির কথা মনে পড়ে। ঠিক তাই, তারই হয়ে ডাক্তারনী। চটুলেক্ষ সরলা ভাল মানুষ। মনটি বড়। পাখিকে দেখতে ওর নিজের ছোটবেন ভাবে। শ্রীধরবাবুর বাড়িতেও কাজ করে বাড়তনী — ভাই-ফরমাশ খাটে। এই লাল-ঘরের বাইরের বারান্দায় বসে থাকতে ওর ইচ্ছে করে। পাখিকে চোখে-চোখে রাখতে চায়। মেয়েদের সবকিছুই বলতে যেমন দু-তিনটি দিতে। পাখি না হয়ে আরেকজন আসতো এর। শ্রীধরবাবু নিশ্চয়ই তাড়িয়ে দেওয়ালো। সে সব কথা ভেবে লাভি হবে।

— কী বললি, এখানে আসতে মনটা তোর ছটফট করে যে পাখি? বলতে বলতে উঠলে দৃষ্টি শ্রীধরবাবুর।

নিজের কথা মনে পড়ে। কিসে ছল? দিশুড়ুম — পাকিস্তান, মায়া-মমতা, মাটি-ভাটি। সবাই সবাই নুয়ে গেল। একদা নিজের হতে বলতে লাল-ঘর। অথচ বলতে গেলে ওরা আর এরা। ট্রান্জিস্টালিস্টিক চেহারাই - আসলে লাল-ঘরের কেবানি। লালের হিসেব, স্পেশিমেন, হাড়গোড়, রোগের বক্তান্ত — সব নখদর্পণে। রোগ্যা কী ভাবে চোখ বুজে বলে দেন। কবে ঢুকেছেন মনে নেই। লালের গন্ধে গন্ধে ঘুম থেকে ওঠে বসতে থাকে।

একটা পচা ঢাঁদরে গন্ধ ভাবাবে লাফ খেয়ে উঠতে ওঠে। পাখির আসনে থেকে সঙ্গে লাফ দিয়ে ছেলিটিও পাশে দাঁড়ান। একদৃষ্টিতে দিকে তাকিয়ে ঠোঁটিয়ে ওঠেন।

— ওরাক ঘরের লাশগুলো বড় করে সাজা সর্বার। কথা শুনে না, হলে কষ্ট দিস না। আহা রে ছেলেদের কী বয়সখানা নেই? কচি বাচ্চা লাশটা ওর ভাই হইতে পারে? ঘুমন্ত মানুষটিকে বুক থেকে নীচে নামা - শব্দবলি পাচার হয়ে ওটিয়াকে ছেপে গেছে। হাত চলে সর্বার। আসি আসছি।

ফিরে আসেন ঘোড়ালায় শ্রীধরবাবু।

পাখির সামনে দাঁড়িয়ে বলেন — কুনা খেলে তপ করিতে হয় যে ছেলে। গরমেন্টের খাজিলে-খাজিলে — কৃতজ্ঞতা নেই। কাজের বেলায় দিয়ি দেখবাস, লাজের বেলায় সবাই আছিস। লাশ টানার সময় সকলের কাছে হাত, খাওয়া আসি। ঘুণ অক্ষর জানাকাপড়ের বেলায় লুটোপুটি। পাখা নাড়িয়ে ঘুমিস।

পাখির মাথা সাফে— আসি নই বাবু, সবার, নিতুয়ে, রবিবারেই ইকর হবে।

— সব বাটাবেটি কেন আসে, মানুষ মোল্লা আনা ইয়ে। অভাব চুলোয় ওড়া নাই। যারা পাটি ভিজে নেয় — এ পুঁজি জমি না। অন্যকোথেকে লাশ পচিয়ে নেক রবিস। হাজি বানাস — কে না জানুক তোদের জিন্দের মোলা কি কয়? পয়সার জন্য সবাই লাশ পড়ে। অন্যের হাজিগুলো ছাড়া ছাড়া করে তিনি হারোমজাদারা। আসি সকলা মাটিতে, তিনি এরা দলটায়। তবুও মাটিতেও ধরতে পারি কৈ?

একটানা বলে শ্রীধরবাবু কোচান ঠেক, পকেট থেকে সিগ্রেট বার করেন — পাসনা। ফস করে ধরান — প্রেশারটা পরেটে রেখে টিন দেন। ধোঁয়া ছাড়েন।

পাখি চুকলি কাটে — হরিদা মোর এক সপ্তাহ বা হাসাটি। লালের জামাকাপড় নতুন একটা ঢাকায় পেতেছে হাটে বিকে দেয় আসিবেন শুদ্ধ বলা। আমার উকল লাই।

পাখিকে শ্রীধরবাবু ভালো লাগে। কাজ ছাড়াই যেন ফড় ফড় করে ওঠে, সাই-সাই করে চলে। সকলে আগে লাল নিয়ে কাজ করে। দু-এক লাইন পড়তেও পারে। ডাক্তার হাতের কাজ এক হাতে সামাল দেয়। বলেন — তুই কাজের ছেলে পাখি, ভালো করে কাজ কর। একদিন বেড় ডোম হয়ে যাবি।

পাখি চুপ করে থাকে।

শ্রীধরবাবুর ভোজন যেন মায়ে হয় — শাকালের মতো কম-বাসাড়ে খুশিয়। ঘরের মানুষকে কষ্ট দিস। ভোর কী মনোরমা নেই। সাঁঝা সাঁঝা লাগ হয়ে যেতি পাখিরে: অন্য মেয়েছেলের দিকে নজর দিস না — কী আছে মানুষের শরীরে। মাংস, চামড়া, হাড়, ও-মুত কফাল ফুঃ ফুঃ। এর জন্য যত কামড়া-কামড়ি।

মেয়েছেলের ওখানে পাখি বুঝি লক্ষ্য করে। চোখ নামায়। কথাটা ঠিকই বলেছেন শ্রীনবকান্তু। বাহাদুরী করে নিশ্চই বলে, 'দুই কী যে! আমার পরীলতার দিকে তাকিয়ে দেখবার সময় নেই — দুই পুরুষ দেখছে পরি, ই কথাটা মনে মনে জানি।

শ্রীনবকান্তু বলে ওঠেন — যা যা দুই সর্দারের সঙ্গে যায় আয়। আমি পোস্টমিটেম করা খুলে বসি। ভের পরি নিয়ে আসব।

লোহারদের বড় বড় আগুন আলোআঁধারিতে ঘরে রাক্ষসের মতোন। লাইন বিছানো সিমেন্টের, ইতোমিটিকস অব্ আলোয়ার। কেপস্টাইশ - আয়ারস্টিবিক - বর্ডার্স - মাহেশলাল্। লম্বা লম্বা পা ফেলে ভরাল মুখ পেরিয়ে সেই নতুন কম্পাউন্ডার কাছে পৌঁছে যায় শ্রীনবকান্তু। আসলেই লম্বা — পোস্টমিটেম ঘর।

ওদিকে হাতে চায়ের কাপ নিয়ে বসে পাখি। বৃষ্টি টিপটিপ। মনে মনে গুনগুন করে — ওরে আমার পোষমন প্রেমেরো কাণ্ডারী রে —

॥ সাত ॥

এক ভয়ানক ধবধবে শ্বেতপাথরের টেবিলের উপর কড় আলো জ্বলে। বাহাদুর জোরে। নতুন লাশটার মুখে আলোআঁধারির খেলা। বাহাদুরের হাজির চৌহদ্দে ঢোকে। ভাঙা ঘাসা হকে খাই খাই।

ছলি সর্দারের লাল চোখে খুশির আলো, ছোট্ট নিশেধ করে এসে — 'আস্তে'।

ঘাসে-ঘাসে ভরে মাখা ঝোমাই। এপ্রনটাকে খাড়ি খোলে, শরীর নামায়। চুল থেকে বাঁধে। পুঁটলি করে।

পাখি ঢোকে আসে। কথাটা জানো ছোটে। ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ছবার ছোড়ে — খবরদার সর্দার।

ছেত্র ছোমের চোখ জ্বলে — খবরদার বেজ্ঞ দেখ শালার, ছেন পিরিনসিপাল, ককুন ছোঁড়ে।

ছাপে পরি পরি করে পাখি— ই পাখি, ছেলাটিক সব আমি নিব, তুমি পিরিনারই

ছিরে ছেত্র।

ছলি সর্দার ট্রাউজার ধরে টান মারে, ছোড়ি ঝাটে — শালা বাইরে দুনিয়া কারে পাত্তা নাই, ইসব নিয়ম ছেলায় ছেলার্স।

পাখি বুক টিপিয়ে সাহসে ঐঁচায়, সর্দারকে ধাক্কা মারে। লালের ট্রাউজার ধরতি ধেয়ে পড়ে ছেত্র সর্দার। উঠে দাঁড়ায়, হাতে বড় পুঁটলি। নিজের কপালে দিয়ারঙ্গনা — চুল, শাড়ি, সাড়ি।

কাজলার ছলি ছাসে — ছে ছে দুই জানোটাই লেত্তে পাখ মুখত ছেলাড়িক।

— শিখাই ছো, জানা ছি ছোর সাহেবা?

খাকে ভরে ওঠে সর্দার — শিখবে কি বাচ্চা। মরব নাই! আমি বহুপর পাল খাইছি। চল চুলি পাখি ছিছিন।

পাখি আলো ভরে ভাঙা খোলে। টানের ছোটি ছোরাম ছিকে যায়। ঠোলা বুক দেখে ছেন চমকে ওঠে! মড় বড় ছাস ভাজলে ছোখ আটকে যায়।

সর্দারের চোখে ছেলার হাসি —কি ছে! কা দেখী ছেন মুখ? আমির ছোখন ছেখে চমকে ছেলি?

পাখির মুখে ছোমে কথা ছেই। মন ঠিকানা-পাখনা। ছোখ টিলমটিলা। দৃষ্টি ছেই — আলো ছেই, পৃথিবী চলা ছেন থমকায়। ছোনা আয়ার আর্টমেন।

॥ আট ॥

চুপ করে দাঁড়িয়ে পাখি। সামনেই অ্যাবসিজেক্টের মড়া।

সর্দার খোঁয়ায় — শালা আগি জ্বলল ছেখি মজলি। বুকের বয়রাত ছেখি চুলালি? আমিটার দিকে তাকিয়ে কী ছেখছিস হারামি। যা, যা — ছে, ছে, ছেলাটিক দিয়ে ছেত্র বাচ্চাদিগকে পরাই ছে। ছোমন জানা।

পাখির গলায় বজ্জর, বাপের ডাক— হঠাৎ কী ছেন হয়ে যায়: লাফ দিয়ে পড়তেই দুটী ছেলে ধরে পাখি যায়। আমিয়ে ছোয়ায়। বুকের উপর ছড়ি ছেড়ে বসে।

— খুব জোরে ফেলবে লাগা ফুড়ায়ে যাচ্ছা, জান নিয়ে ছেল। লাচারীকে এনে দিয়েছিস কি জিনিস ছিনি নিস।

পড় পড় আগুন ঠাসায়, উপর ঐঁচায়। বাহাদুরী ধরা সাহেবী, লাল চশমার গ্লাস ঘুরিয়ে নিশ্চই মুখোশ ছেন ছোখে ছেপে ছেলে আসে ছেখানে একজন ধরে পাখি ওঠে, ঝিক ঝাঁকে উপর ঢাকনা ছেখানের আয়োজন ধরায়। ছোন চাপুনে ভাগ খাস আয়োজ, নাকি পরানে ধরে মুখে। ছোই ছোমেক্সন-এর ব্যবস্থাটি — ঠাণ্ডায় আয়োজ খুশি আগে মনে। ছোনাক আইকা নয়ে

আয়োজ আয়োজ ঘোরাতে ঘোরাতে ঠাণ্ডে। ছোমেক্সনে আগী মুখ, ঠাণ্ড মনে ঐঁচায়ে ছেছো। মুখের অভিব্যক্তি নিতে ভাবনায় — আগের মুখে আয়তে পড়ে। খানি খানি মুখুর মাখে মুখে ছোখ আইনালের ছোয়ুলি — পাখির শরীরের ছোখ খুলে ছেন ভয় ধরে, ছোখের ভাজা ভাসে — ভয়ানক ধরাতে এদি ঐঁচায়ে আমি ছোনি পাখনা। ছই এদি এ ছিনিয়ে! ধরা কথা বলে বাহাদুরী: চুপ ছেন ছে বাহাদুরী।

একটা ধরো ছাতরা লাম নিয়ে আগে ধরে টুকে পড়ে। পাখি আগিয়ে পড়ে ছটফটায়। বুক ধরা আগুনাপে বাহাদুরী ঐঁচে— আমি লাল এই বাহাদুরী আয়ুষ। দুই আয়ুষের ধরতে এদি লাল এই এদি ছিনিয়ে! ছোয়াচ্ছে পাখি — ভয়ানক আয়ে ধরুন আয়ুষ ধরা, দুই ধরে ছিনে ঢুকি ছেলি। বাহাদুরী ...ছেখে ধাক্কান ছৈ? সাক ছৈ? পাখ ছৈ? ও আমার এ ছ্র - খী - গ - ছে

ঠিক ছেই ধময় পোস্টমিটেম ধরে আকাশ ছেখে চমকে ওঠে ঈশান চাটুজ্জে। ধরাচা-আনাদি কর পড় ধরতে ধরাতে চিৎকার কারেন — ডাক্তারবাবু ছোখায় গেলি? ও পাখি — ও ধখায়, এ ছে আগমনের ছেখ! বৃষ্টি এল বৃষ্টি!.....

উট

অভিজ্ঞান সেন

পুতুল এই সুযোগ ছাড়তে রাজি নয়। ঠোঁটের দুপাশ বেয়ে লালা গড়িয়ে পড়ছে। ছোটমামা এবার ঠাট্টা ছেড়ে কার্টুনটার এ পাশ থেকে দেখা না গেলেও ও পাশে ছোটমামার ডান হাতটা পকেট থেকে স্যুইচার বের করে ওটাকে টিপে ধরেছে। নিজের চোখকে বিশ্বাস হচ্ছে না। টেলিফোন অপারেটর মাইক ফেলেই ছোট খালাকে ওকে ডাকে। একি ঠিক ফাঁসি দেওয়া বলে? ছোটমামার পড়িয়ে দিলেও মাথা থেকে আতঙ্কটা যায় না। ঘুমোতে যাবার একটু বিরাম নেওয়ার ফুরসতও যে নেই। আজকাল টিভিতে বাবার ফুটবলকে নিয়ে যে-কোনোদিন কার্টুন বানিয়ে ফেলবে। তখন টিভির একমাত্র পত্রিকাতেও বাবার ছবি ছাপা হবে। ছবি একে ফাঁসি দেয় নাকি।

আগে-আগেটাকে কথা কাটাকাটি করে এবং পুতুল অবশেষে ওপ্রান্তের সঙ্গে আলোচনার ভারটাকে তুলে নেয়। ছোটবেলায় তো ওপ্রান্তি খুব দুষ্টুমোলা ছিল। এখন কেমন দুষ্টুমি পর দুষ্টুমি সরিয়ে রাখছে। আগেভাগে ভাইয়ের কথাগুলো কায়-কায়। বলিয়ে নেয়। ভালো কী-ই বা করবে। কার্টুনিং স্টুডিয়ো থেকে ফেরার সময় বের করে আসাই তো মুশকিল। তারপরে যদি এরাপ্লেনে দেরি হয় ... আহ! কাউকেই দোষ দেওয়া যাচ্ছে না। সবাইকে, সবার কাজকেই ঠিক মনে হচ্ছে। খুব ভাল লাগছে। ওর মুখে আবারও হাসিরা রেখা ফুটে উঠল।

— টোকেন নাম্বার ফাইভ, ফাইভ প্লিজ

ওর চিন্তার জালটা ছিঁড়ে গেল। উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে দেখল কাকের চেনা মুখগুলো কেমন বদলে যাচ্ছে। খেলোয়াড়, অফিস, অফিসের বস সুখ। নরম আলোটাও হারাচ্ছে।

— কোথায় ছিলেন? ডেকে ডেকে গলা ব্যথা হয়ে গেল।

কাউন্টারে ওপাশে ওপ্রান্তির মুখটা পালটে গড়পড়তা রুক্ষ কর্মচারীর মতো হয়ে গেছে। আগেনা, সম্পূর্ণ অপরিচিত এক মহিলা। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও হাত বাড়াল।

এলসিডি যে হুড় সেটা টের পেয়েছিল ক্লাস এইটে। রুম সাফাই রোকনে, আলকাবারি বাজার আলাদা দিয়ে। সাফার ছোট ছেলে কর্পটাই নিল অনেক দেরি করে। তারপর জিনিসগুলো ফেরাতে কোনো ঝামেলাই নেই। দু-এক বার ভিন ভিন করে তাগাদা দিতে দিতে দেরি ধরতে পেরে গেল বড়টার কাছে

— ও কি বলে আছে মাইক?

বলে যে নেই সেটা দেখা যাচ্ছে। পরে আরা আসছে তাদের কর্মগুলো নিয়ে বক্সের মতো আলাদা ওজন আছে প্যাকেট, বোতল ছেড়েছুড়ে রাখে তারে দিচ্ছে। অন্য কুশল জিনিসরা, ঝাড়ু, খেলা, রান্নাঘরটি এমন তো আছেই। বাজারের থলি নিয়ে মওলানাকেই হাঁপাচ্ছে দেখে

পরিচয় করে দাওয়ারও দিল। কিন্তু ওরা কিনিসগুলো নিচ্ছে না কেন? ওহ! তাড়াতাড়ি ইওয়ার জন্য তোলো হাত নেই। হাসপাতাল থাকির জামার নেতে দিয়ে চলে এসেছে। বাল না নিলে অবশ্য তোলার উপায় নেই। মেয়ে তোলমুখ, ছেলে কিশোর। হাসপাতাল ছেড়ে মেয়ে জার্মানি থেকে পুজোর ছুটিতে বাপের বাড়ি এসেছিল। শিশুটিও প্রচুর জামাকাপড় নিয়ে গেছে। সত্যি, বাল না দিলে ...

যার সাজার দুই ছেলেই এখন শিয়রে বসে হাসাহাসি করছে। গলা বাল ওদলো হয়ে গেছে। আওয়াজ বাচ্ছে না। উঁহু, শিয়া না গোলে তো — প্রচণ্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে... দুই ভাইয়ের পলা করে শিয়রকে আরি কলা দেখাতে দেখতে সব ভেজন ফেল কলতে শিয়েছিল সেদিন। তোলা খুব অসুস্থ, তার স্বাস্থ্যের পরিস্থিতি বলে আগেরার অবনীয় হয়ে যাচ্ছিল। ভাল লাগছিল। সেই প্রথম, পরে অনেকবার এরকম হয়েছে।

এই তো সেদিন; কেমোথেরাপির লাইনে ঘটিখানেক দাঁড়াতে হবে জেনেও বাড়ি হাড়েছিল। মিনিট পনেরো পরেই তোলা এসে পড়বে আর আমরা কেমোথেরাপির পরি হয়ে গেল। ও কেমোথেরাপি জানি, তবে জানাশুনো সম্পর্কে ওঠেনি। সুযোগ যখন এসেছে তখন ঘুরিয়ে দেখে নেওয়াই ভাল।

এক কোণায় ঢেলে বিক্রি হচ্ছে ক্রয়াঞ্চের মালা, অষ্টধাতুর আংটি, শিল্পীর পোর্টফোলিও, রাড়িবুটি, পাথর ঢেলে বাঁধানো বজরাবেলি, ধান-দীবা, বাবা বিশ্বনাথের ছবি, খেলনা, ঘুটো গহনা, সিনেমা স্টারের পোস্টার, পাথরের শিবলিঙ্গ আরও কত কিছু। ওপাশের খুপরি দোকানটির মুখে আলমারি নিজের চায়ের কেতলিতে জলিকে চুমুক দিচ্ছে আর সামনের বন্ধ ট্রানজিস্টরের খানলি ভিজনের কাজের আরাম বুলিয়ে দোকানে ঢোকাতে চেষ্টা করছে। কেরোসিন ডোমের দোকান এখন বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন ঢেলার একটা সেইড়ি। মুখে পাওয়া যাচ্ছে। ঠিকুজি-কুষ্ঠী, পূর্বপুরুষের নামধাম লেখা জামার আগে পুজো বসে ইতাদি বলিয়ে নিলে ওরাই পুজোর জন্য যা যা লাগে তা একটা পাতেটে লিখে নিচ্ছে। কিন্তু সেওলো নিয়ে লাইনের অনুসন্ধান আছে কোথায়? আমরা কোনো গেট দিয়ে ঢুকে পুজো দিয়ে হয় বেরিয়ে। বড় জানীয় ওপাশাও হয়েছে দেখছি। গেটের সামনে জটলা করছে। কিন্তু ওদের জন্যে অপেক্ষা কেন? অপেক্ষা তাহলে কালীতে এসে এইসব করছে! জরুরি-পিরিতে বলাতে হচ্ছে। অবশ্য তোলও দেখবার আর নয়। নিজেরাও যা পারেছে। অপেক্ষার আবাটাও খুব কমে এসে গেল। ওর খুব ইচ্ছে করল পাড়ার কালীবেলার অপেক্ষাকে আগের মতো টেনিয়ে আনে। কিন্তু আমাদের টেক্কা পড়ার সেটা হল না।

— কাইব ছেড়ে দোক ঢুকে ভেল নিয়ে যাচ্ছে, আপনেরা বাড়ী ছেলেরা কিন্তু বলেন।

অনিল শাড়িয়ে ছেটিখাটো, নিরক্ষ, আদিবাসী এক মহিলা। তোমরা বাড়িতে কাজ করে মনে হয়। তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সে দেখল লক্ষ্মীদিদিকে। তাদের বাড়িতে ঠিকে কাজ করত। ও তখন নিচু ক্লাসে পড়ে। লক্ষ্মীদিদির ছেলে বতন ওকে একদিন মারধোর খুব পালিয়েছিল। কিন্তু এতদিন পরে লক্ষ্মীদি এখানে, এই লাইনে! 'কেমন আছ, ভাল তো?' জিজ্ঞেস করতে গিয়ে ও থমকে গেল। লক্ষ্মীদিদির বয়স বাড়েনি। ভালমন্দও কি হয়? তা হলে এখন মেখা হলে বলে ভুলে যেত। কিন্তু পাড়া ছাড়ার আগে যে ওলেছিল লক্ষ্মীদি নয়ি —

—এখন আর মেওয়া বয়ে না। ওষুধ আনুন।

আলমারুর পাতা পালটে দিয়ে ভেলের মোবাইলে ডিটিমিটে বাইছিল। লিখনে ফোকে আর হাতের মোবাইল, আলু ঝালানো অক্ষয়। এদিকে সব কাজের মেজাজটি আজার কথা ভেজনটি হয়ে গেছে। সেইসব মুখও নেই, পরিবেশও নেই। ইয়ে মাহের শমরটা ভাল বাচিল না।

খুব ছোটবেলায় ও নাকি হারিয়ে গিয়েছিল। মনে থাকার কথা নয়। মায়ের মুখে শুনেছে। ওরা তখন হাওড়ায় থাকত। বাবা-মা ওদের দুই ভাইকে নিয়ে উত্তরায়ণ বেড়াতে গিয়েছিল। বাবার বন্ধু সুনীলকাকু তখন জলপাইগুড়িতে ওদিকে জোয়ার তেল পিটিয়ে। সেই জায়গাটাই বাবারা। তখন মোবাইল ফোনের চল হোয়নি। জলপাইগুড়িতে সেদিনের জন্যই যা খোয়াদুরি। সুনীলকাকুর কাছেই বাবা মেলাটির কথা প্রথম শোনে।

হলদিবাড়ির ওদিকে একটা মেলা হয়। কল্পুর পাহেবের মেলা। বড় মেলা। তবে মেয়াদটা প্রায়। মুখুবুড়ারা থেকে লোক আসে। এরকমের বাঁচায় ২৩ডার হাতপাসেশ থেকেও প্রচুর আসে। বিশাল জাঁকজমকের মধ্যে কল্পুর পাহেবের মাজার। সেখানে মনের ওপরে নাকি নিশ্চিত ইচ্ছাপূরণ। সেই মেলায় কেরোসিনের জন্য রাজগঞ্জ থেকে ট্রাক আসে। বস্তাবন্দি-টিনবন্দি তেল থাকেই। ওরা এসব আনে বেচে বাড়ি ফিরবে। বিক্রেতেল নিয়ে ফিরে যেতে। সেখানেই ও ফিরের হাতল না থাকায় হাতবদল হয়ে যায়। মুখের ঘোরে এক ভক্ত সম্পত্তির হাত ধরে আসল মেলায় চলে গিয়েছিল। কল্পুর পোশাকের এটাই ঘটনা যে, সেই মনুষ্যমূর্তির টিক পায়নি। সকালে প্রতিবেশীরা ঠিক টে ছুটে গিয়ে ওরা বাড়ি ফিরে পড়ে। এর মধ্যে সুনীলকাকু তার সবরকম প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে ফেলেছে। আক্ষরিক প্রয়োগের মধ্যেই ছিল।

করছে বেলাবেলি ঘরের ছেলে ঘরে। অন্ধ দম্পতির ছেলেটি পাড়াবুড়োর মাসির স্নেহাঞ্চল ছেড়ে বেলা থেকে সেই রাতে ফিরেছিল। সেও সকালেই তা-নাবার কাছে ফেরত আসে। এ সবই সে ওনার মুখে শুনছে। যা ছেলে ছেলেই বিড়বিড় করে

— সত্যি সত্যি ছেলে পালটাপালটি হয়ে গেছে মনে হয়।

অথবা

— অন্যের ছেলেকে পুষলেই মোহটুহ জন্মে যায়। এমন দেখেশুনে, ভীতসীন, মিথ্যেটি হত না।

এ সব শুনে ও জল দিয়ে ঘুরি পাঁচিল। সেই মোক্ষটা আর তার বউ ওকে — জয়নুল, জয় বলে ডাকছিল, আদর করছিল। কী নয় খেতে দিয়েছিল। ও খায়নি। দুর চোখে শুধু জল দুর গেয়েছিল। মাকে এসেছিল জন্য ভাতের দুধের গন্ধ। ছেলেটিকে বিছানায় নরম শোওয়ে মতো ঘুমিয়ে রাত পার করে দিয়েছিল। জয় দেখেছিল জোৎস্না-ধোয়া একটা বিশাল প্রান্তরে। মাঝে একটা মস্তিক টাইলের বাড়ি। আশপাশে হোগলা-ছিটানো কিছু টিনু, অস্থায়ী ঝাড়িনি। আর দূরে ছড়ান ছড়ো শীতিয়ে কাদার কাটিয়ে কয়েকটি প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী। যুদ্ধের জন্য তৈরী হচ্ছে।

কিংবা এর কোনো কিছুই হয়তো ঘটে নেই। অন্যদের মুখে শুনে শুনে কল্পনা করেছে। তারপর সেই কল্পনাকে সত্যি বলে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। কারণ তখন ওর কথাই বা বলার! নাকি, সত্যিই মনে আছে ঐ একটা রাতের আশ্চর্য ঘটনা! তাহলে তো বলতে হয় ও স্মৃতিধর। কিন্তু তা তো নয়। তবে কি সেই রাতের আগে পর্যন্ত পুত্রা জীবনটা সে ঐ পরিবারেই কাটিয়েছে? তাই কি এক আলোবাসে ওর মনে সব পেঁছে আছে? ও কি তবে ও নয়? অন্য কেউ? আপাদা আত্মা? ঘোলা হয়ে থাকে। ও আর ভেবে থাকতে পারে না।

আজকাল খুব ঘ্রাণ শেওয়ার পক্ষে ওর খুব ভালো। আগে ওই খুব আসতে। মেরিতে ঘুম ভাঙার আগেকার খুব মিশ হয়েছে। তারপরই মাসিমার হাতবদল। যে তে ঘরগুলে থাকে সময়ে কথা শোনানোর অধিকার সে নিজেই এটিও যাচ্ছে। তবে ভালোয় থাকতে হলে আর কিছু গায়ে মাখলে চলে না।

ঘুঁটে ঘাঁক অপরাহ্ণ। কালো জিরে কোকড়ানো চুল আসছে। মানে, নিজের নিজেকে ও শিখিয়ে পড়াচ্ছে। তাহলে সকালের টিউশনিওলো মনে মনে বাদ দিয়ে দিল। অর্থাৎ ঘরে ফেল কিছুটা সময় এসে গেল, ওরে কাজের মতো। ট্রামের জানলাকে পাশ দিয়ে দিয়ে ওর মনে এল — ট্রাম উঠে যাবে। শুধু বৃক্ষরাই নয়ি এতে ঘড়ে। ঘুঁটে, ঘুড়েপুকিদের অথো বেড়ালের কী দরকার! ঘুরবে ছেলে ছোকরারা। যেমন ও। অথিতার জন্য। হয়তো অথিতা তখন ঘড়িঘাটা থেকে শিয়ালদহ যাবে উঠবে আর ও তখন অথিতার জন্য বিজন স্ট্রিট ধরে হাঁটবে। না অথিতা তখন সাহেব বাগের থেকে কুলুপ ঘরে আসো ছড়াতে ছড়াতে ঘাজারার দিকে যাচ্ছে তখন ও সেইজন্য মাঝপথ থেকে পড়িয়া যাচ্ছে। অথিতাকে নিয়েই। আচ্ছা, অথিতা কি ওকে চিনত? দু-একবার চোখাচোখি মেসে কথা বলেছিল, মাঝি আলা কারও সিথে হাসিয়ে? কে জানে।

মাহকরে তখন দেখেছিল অথিতার কাঁধে হাত রেখে হাঁটছে তখন নিজু সেই ছেলেটা হক না। সব ভালো সিয়ে মনে হল না যে সাহকেরই অথিতার হয়েছে এই ছোকরার মতো ঘাড়ে, না মাড় নয় আমে, নাক ছাও নয়, চোখ, ছাঁ চোখার হাত ছাড়ার। আরে সাহক-ফাহক নয়, ওটা তো ওর দাদা, মাহকের পেটের ভাই, লিটেলসিটে। যে ক্ষমতা ও বিপ্লবহোম অয়েছে সে ক্ষমতাই ছেলেটা ভালু ঘরে ফেছে। ঘুঁটের না ঘটনিক্ষয়। তবু সে যাবেই ওদের ওখে প্রাণে নিজেদের নতুন মহোলেশ ট্রাম ভাল লেগে গেছে। চলছে, চলুকে — তবু ছুটে দেওয়া হবে।

ছোকটা লোগে এসেছিল। মাহকরা ঘাঁচুনিতে খুব চেটাপটি খাসটা একজন নিজের জায়গায় যাবার চেষ্টা? কৃষ্ণনগর এসে গেল? এত তাড়াতাড়ি? সোক্ষজনের ঘুঁটোক্তিতে ওখাখাড়ী কাছে আসছে। বাইরে ঘুরা অন্ধকার। ছুঁচোগোলের ধকনীর উদ্বেগেও। দূরে যে আলো আওয়াজটা শোনা যাচ্ছে, তাতে যেন মিশেছে মিশে আছে। কেমটা কী? রাতের মধ্যে কৃষ্ণনগর না পৌঁছতে পারলে কালকাতাতো যুবেই না কলকাতা ফেরে যাবে।

— একটু আগে একটা বাসে যাত্রাপাটি হয়েছে। তাই সব লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে। ডাকাতেরা লুটপাট করে যা। এখন গ্রামের লোকেরা ফেরিয়ে এসে ডাকাতদের সঙ্গে নিয়েছে। এবার ডাকার ডাকাতদেরও কয়েকজন লাঠি আশেপাশে কোপলস্বলে যা পাবা নিয়েছে। খোঁজ চলছে। ধরতে পারলে ...

চোখ টিপে একটা অশ্লীল মুদ্রা করল পাশের সিটে বসে থাকা ভিখারিকাকু। একটু ডকম হয়ে গেল। সেই মাস্টারি ভঙ্গিতে বুঝিয়ে বলা, সেই প্রকৃত মুদ্রা, আর চোখ টেপাটুপিও। এতদিন পর দেখা, খুব ভাল লাগছে। আচ্ছা, আগে তো দেখা হয়নি তখন ভিখারিকাকু উঠে এসে ওর পাশে বসেছে। আর ভিখারিকাকুই বা ওকে ডাকেনি কেন? মহকরো ঘুমোচ্ছে দেখে নাকা হয়েছিল? থাক, এসব ভাবিয়ে লাভ কিছু হবে। তার আগে একটু ভাইনাম করে নিলে ভাল হয়।

— ও মশাই কোথায় চললেন!

— আজকাল এই ভালোবাস মানে বাড়ছে না।

— কী হল? ছোট্ট কিশোর পড়ছেন যেন?

অনাদা সাদাতে ঠিক আছে। ভাই বলে বিদ্যাসাগরকে, তুমি আমাদের আপনি-আজ্ঞে করছ কেন? বিদ্যার ভার বিরতি দিলিয়ে ঘাসের সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে নামতে ও ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল তার ছোটে ভাবার সিঁড়ির পাশে একটা মাঝিমাল্লা গোছ হয়ে আছে। অচেনা মুখে জানের পুঁজি যথেষ্ট।

জলবিয়োগের জন্য বাজা ছেড়ে গোবরে একটু বেশিই ভিজতে হল এল। অবশ্য তা না হলে কোণে কোণে এত সুন্দর কোনগুলির ঝাঁক তো দেখা যেত না। কাছেপিঠে পুকুর আছে নিশ্চয়ই। একটা ঠাণ্ডা জোলো হাওয়া বেরেছে। ঝিঁঝির ডাক, চকচকে পাতা আর গাছের ডালে নাড়েচড়ে বেড়ানো কীটপতঙ্গের ব্যস্ততায় সন্ধেবেলা আচ্ছন্ন। শহরে এসব জোটে না। আজ কেন ঝিঁঝি? অন্যদিন, ঝাকি দল দেখে? ও আকাশের দিকে চেয়ে চোখ ছোট করে কালপুরুষকে খুঁজল। ওইটা তো। পেল না। তবে সব মিলিয়ে ঘুড়িয়েরেক পরিস্থিতি। হাত কখন ছড়বে কে জানে। কিন্তু ওই গাছটার নিচে দাঁড়াল কেমন হয়?

আচমকা টেনানেটিটা মাথের উপর এসে পড়ল। সঙ্গে আলোর ঝলকানি। ও ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল

— এই তো, ওই তো!

কারা যেন হন্যের খোঁজে বেরিয়েছে। কিছু না বুঝে ও জোর পায়ে আরও গভীরে ঢুকে যাচ্ছিল। কিন্তু গলাটা যে আরও জোরে ওর দিকেই আসছে। হৃৎস্পন্দন আস্তে আস্তে উঠানে পড়ে যাচ্ছে।

— ওহ গড, পালাচ্ছে!

ও হাঁপাচ্ছে। ও দৌড়োচ্ছে। জোনাকির জানে না। ভয়ে মাথার বুদ্ধি কমে আসছে। ওদের হাতে কাঁশ, রড, ইট। এই কাছে এসে পড়েছে যে ওদের কথাগুলো স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। কিছু কথা কানে আসার ও আস্তে আস্তে থেমে গেল। ঘাড় ঘুরিয়ে মস্তো আকাশ হরকোলাপুল ধনটার দিকে। একটা মুখও আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না। আলো-আঁধারিতে সবাই সবাই আপনা মুখ। চোখাল শক্ত, চুপ আর কালচার আগুনে চোখগুলো জ্বলছে। তাই কি? নাকি ওগুলো জোনাকি? পুরোটাই মনের ভুল।

— উজবেক, আমাদের ছেড়ে যেখাক যাচ্ছিস?

— বাবলু, তুমি কাল এসে না! তোমার জন্য একদম কালপোয়া জমা আছে। আজ আমার মাথে ছিলো, তোমার পেটি খুব খুশি হবে।

— অন্যু, সকালবিকাল ঠেলে পাঠাও। কালাচাদের যাতে কিছু হোকে ভাই ও ভাই পালালে চলবে না

— রাত্তির হলো বাবে বিপদ্ধন বুঝি মাথে আর বাড়ির বা আমে এই ভয়ে তোমরা পেছে যাও, ভাবিনি

— জোনাকা, ভাইটাই-আজ্ঞা ঠিকই বলো, এখন কোথাই আমাদের হাতে পড়িলেন ভিষ্টি।

— আই সরিজ্ঞ। আমার অন্যায় থেকে থাকে মেহেরবানী ছো তোই করেনি। আর ছোট ছো ইঁচিবরো।

— পালালবি হাত। এদিকে দেখ!

মলটা এখন ওকে ঘেরে করে একটা বড় বৃত্ত তৈরি করেছে। ঘেরে আসছে। আস্তে আস্তে ঘুরছে। ধারালো কিছু ঝকঝক ... না! নিজের না তো? আশ্চর্য, ভয় সবাই ওকে ঘেরে। অন্ধকার আরও ঘনো হোক। ভালাই তো। সবসময় হয়, ও কাউকে চিনতে পারছে না। এমনটা তো হওয়ার নয়। এই যে সব চেনা মানুষজন, আত্মীয়বন্ধু-স্বজন কথা ছোকে আসছে তার মধ্যে নিজেকে খোঁজার চেষ্টা না করে? এতে আশ্চর্যজনক খুব ভাল লাগছে আমার খোটের মধ্যে কেমন সুড়সুড় করছে। মেজাজেই ছোক কাছেরজনকে চিনতেই হবে।

অন্ধকার চেষ্টা সত্ত্বেও কোনো মুখগুলিই ও চিনতে পারল না।

আস্তে আস্তে ওর চোখের সামনে থেকে উঠান একটা ধু ধু কালো প্রান্তর, জোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে। নাকে এল অন্যরকম ধুপের গন্ধ। ধুয়ে দিগ্বিদিকে দেখা যাচ্ছে কিন্তু প্রতিপক্ষগুলি তখনো ঘনিষ্ঠে নিশ্চিহ্নের জাবর কাটছে।

— মানুষের কৃপায় বেঁচে হচ্ছে আমাদের।

গল্প

ঘরে ফেরা

অরূপ সরকার

রিজিওনাল ম্যানেজার মিস্টার শ্রীনিবাসনের কাছে চিঠির ডিকটেশন নিতে নিতে হঠাৎই মনোরমার মনে হল, অনেকদিন অফিসকে চিঠি লেখা হয়নি। প্রতিদিন অফিসে গাদা গাদা চিঠির ডিকটেশন দেওয়া আর টাইপ করার চাপে ব্যক্তিগত চিঠিপত্র লেখার অভ্যাসটাই কবে যেন মরে গেছে। অথচ একটা সময় চিঠি লেখা ছিল ওঁর অন্যতম নেশা। পড়াশুনো, অনেকেই বলেন, ওঁর লেখা চিঠি নাকি পত্র-সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে। বন্ধু-বান্ধবী, আত্মীয়-স্বজনকে লেখা দীর্ঘ চিঠিগুলোতে মনোরমা উজাড় করে দিত তাঁর হৃদয়ের ঐশ্বর্য, ভাষা ও শব্দের নিপুণ কারুকাজ। দূরের ঘনিষ্ঠজনেরা অপেক্ষা করে থাকত ওঁর চিঠির জন্য।

সেদিন আর্টী এসে সরাসরি অভিযোগ জানাল — গাদাগাদি দুই কিন্তু আজকে আপ একটাও চিঠি দিল না। আগে প্রতি সপ্তাহে একটা অন্তত চিঠি পেতাম বৌদি। একই অভিযোগ জানায় রমাপ্রসাদের সেক্রেটারী, কমলাদেবীর মেয়ে অনুরাধা। মনোরমা ওদের বলতে পারে না — শুধু বৌদিদের জন্য, অভিনিবেশের চিঠি লেখা হয়ে না পরিনি। বহুকে বহুদিন আগেও সপ্তাহে তিন-চারটে চিঠি লিখত মনোরমা অভিনিবেশকে। অভিনিবেশ অভিনবই অভিনব অনুযোগ জানাত। ইদানিং অভিনব কেন অভিযোগ বা অনুযোগ জানানোই ভুলে গেছে এসব নিয়ে। মাসের-মাসোর কবে ও এখন চাঁবশ বছর।

অথচ কলকাতার আগে এই চিঠির মাধ্যমেই বন্ধুদের পরিচয়। মনোরমা তখন হায়ার সেকেন্ডারি পড়ছে আর অভিনব মাধ্যমিক। তখন মনোরমার নেশা ছিল পেন-ফ্রেন্ডশিপ। কোনো একটা পত্রিকায় পত্রমিতালি কলামে আরো অনেকের সঙ্গে অভিনবের নামটা প্রকাশিত হয়েছিল ঠিকানা সহ। বেছে বেছে ওদের মধ্যে থেকে অভিনবকেই বন্ধুত্বের আহ্বান জানিয়ে চিঠি লিখেছিল মনোরমা। খুব ভয়ে ভয়েই লিখেছিল। ওরকম নিরানিব চিঠির আদান-প্রদান, ক্রমশ ঘনিষ্ঠতা। আরো ঘনিষ্ঠতা।

মনোরমা যখনতখন চিঠির উত্তর না দিলে অভিনব ফোনে ফোনে জেরবার করে দিত যতক্ষণ সে সময়। ফোনে কেন অযথা চিঠি লিখতে যাবে মনোরমা? চিঠি হবে ভাবের আদান-প্রদান, ভাষার ঐশ্বর্য। ফোনে কি তা সম্ভব? অভিনব বলত, ফোনে কথা বলা যায় বলেই তো চিঠি লেখা। মনোরমা বলত, চিঠি লেখা হয় বলেই একদিন অভিনবের অভিযোগ আর অভিমান জানাত। ধীরে ধীরে অভিনব ভরে তুলতে থাকে।

ইদানিং সেই অভিনবই কেমন যেন চুপ হয়ে গেছে। ফোনও বাড়িতেই ওকে আর যেন তেমন স্পর্শ করে না। অথচ মনোরমা নিজেও কম বদলায়নি। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যার যেমন বেড়েছে,

হেমনই পাল্লা দিয়ে কমেছে পুরোনো অভ্যাসগুলো। প্রাইভেসি ফর্মের ডাকহাঁক। তাই থেকে অবিরত চেষ্টা চালাতে হয় ম্যানেজমেন্টের ভত বুকে থাকার। হিসেব রাখতে হয় ডমোশন বা ইনক্রিমেন্টের। প্রথম যৌবনের সেই এলোমেলো দিনরাপনের ছিন্ন মুহূর্তগুলো ভবে, কোথায়, কিভাবে যেন চুরি হয়ে গেছে — মনোময় তা নিজেই জানে না। হরিপদ কেরানির ছকে বাঁধা জীবনে সে আষ্টেপৃষ্ঠে বন্দী হয়ে গেছে।

ওর এই বাস্ত দিনরাপন নিয়ে কম অনুযোগ তো ওকে শুনতে হয় না। সেদিন তো স্বাতী বলেই ফেলল —কালাজাই তুই কিন্তু বড়দিনে প্রতি তোর শাশ্বিত ঠিকমতো পালন করছিস না। মনোময় ওর এই ছোট বোনটাকে প্রায় সন্তানের মতো ভালোবাসে। ছোটবেলা থেকে ওকে নিয়েই কেটেছে ওর প্রতিটা মুহূর্ত। স্বাতীর যখন বিয়ে হয় সামাদের সঙ্গে, তখন স্বাতীর বয়স বছর-কুড়ি। ভালোবেসে সামাদকে বিয়ে করেছিল স্বাতী। সামাদ পোর্ট ট্রাস্টে চাকরি করে। তারাতলায় সাজানো-গোছানো ছোট্ট কোয়ার্টার। ধর্ম নিয়ে কোনোদিনই কোনও দুঃখমার্গ ছিল না মনোময়ের। ঈশ্বর সম্পর্কেও ওর কোনো বিশেষ অনুভূতি নেই। তাই স্বাতীর বিয়েতে কোনোই আপত্তি ছিল না মনোময়ের। শুধু স্বাতী এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার দিন ছোট্ট শিশুর মতো ডুকরে কেঁদেছিল মনোময়। প্রায় আসখানেক খেতে বসে না-খেয়ে বা অর্ধেক খেয়ে উঠে গেছে। সেই ছোটবেলা থেকে একসঙ্গে খেতে বসা, খুনসুটি, হাসি-ঠাট্টার কথা মনে পড়লেই মনোময়ের চোখ ছল ছল করে উঠত। খেতে পারত না।

অনিতি কিন্তু স্বাতীর মতো অভিযোগ জানায় না। নিজের চাহিদার কথাও নয়। একান্তে স্বজনের দেখা হয় কদাচিৎ। তখনও ব্যক্তিগত কথাবার্তার থেকে বেশি হয় সাংসারিক কথাবার্তা, বৈষয়িক আলোচনা। মনোময় বলে তার নেক্সট প্রমোশনের কথা। বঞ্জনা-বুবাই-এর পড়াশোনার কথা বলে। প্রমোশনটা হয়ে গেলেই একটা ফ্ল্যাট কেনার ইচ্ছের কথা বলে মনোময়। অনিতি বলে একটা মেডিক্লেম পলিসি করার কথা। দশ বছর আগের জলয়ের সুখ সুখ অনুভূতি, ভালোলাগা-ভালোবাসা, আকাঙ্ক্ষেতিতে পাশাপাশি বসে হাতে হাত রেখে নাটক দেখার অসহ্য সুখের স্মৃতি ফিকে হয়ে যায়। মনে হয়ে আসা শীতের বিকেলের আলোর মতো ওদের কথাবার্তায় ছেয়ে যায় ঝিম ঝিম শীতার্তা। প্রাপ্তের উচ্ছ্বাস জারিত হয় না সম্পর্কের লিহিত উপলব্ধি সমূহ। এই সমস্ত বৈষয়িক আকাঙ্ক্ষা সমূহে যেখানে জলয়ের আবেগ-অনুভূতিই ভল পায় না, সেখানে একজন অন্যজনকে চিঠি লেখার অবকাশ কোথায়?

তবু মনোময় বহুবার ভেবেছে অনিতিকে চিঠি লেখার কথা। মুখে যে কথা বলাবলি হয় না, সে কথাগুলোই চিঠিতে বলতে চেয়েছে সে। পাতায় পাতায় 'ফিলিংসে' লেখা একটা পুরোনো রাইটিং পাড খুঁজে খুঁজে বের করেছে সে। দশ বছর আগে এই পাডের পাতাতেই অনিতিকে অসংখ্য চিঠি লেখেছে মনোময়। অনিতি অবশ্য কোনোদিনই এতটা রোমান্টিক ছিলো বেহিসেবি ছিল না। সাধারণত ও চিঠি লিখত খাতার পাতায়, এমনকী পুরোনো ডায়েরির পাতাতেও। তাতে অবশ্য অনিতির ভেতরকার আবেগের তীব্রতাকে খুঁজে পেতে কোনো অসুবিধা হয়নি মনোময়ের। ওদের যুজনের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে প্রচুর অমিল খুঁজে পাওয়া গেলেও, ভেতরে ভেতরে ওয়েভ লেংথে কোথায় যেন গভীর যোগসূত্র আছে। সে যোগসূত্র জাগতিক সমস্যা-সংকটে ছিন্ন হওয়ার নয়।

সেদিনটা ছিল অনিতির জন্মদিন। সকাল থেকে মনোময় একবারও বুঝতে দেয়নি যে ওর মনে আছে আজকের দিনটার কথা। অনিতির ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় ভুলে থাকার চেষ্টা করেছে এই দিনটাকে। অন্যান্য দিনের মতো ঘুম থেকে উঠে অনিতি ব্যস্ত থেকেছে রান্নাঘরে আর মনোময় অফিস যাওয়ার প্রস্তুতিতে।

নির্দিষ্ট সময়ের ঘন্টাখানেক আগে অফিসে পৌঁছে মনোময় ব্যাগ থেকে বের করল সেই রাইটিং প্যাডটা। তারপর তার পাতায় দশ বছর আগের মতো গোটা গোটা হরফে লিখল — প্রিয়তমা অনিতি, দীর্ঘ দশ বছর পরবাসে থেকে আজ, সদা ফিরলাম নিজভূমে। উদ্দেশ্য এই — বাকিটা জীবন কাটাবোটি, পাশাপাশি থাকা। ফিরলাম এমনই একদিনে যে দিনটায় আজ থেকে ছাব্বিশ বছর আগে তুমি ——

ঘন্টাখানেকের মধ্যে চিঠিটা লেখা শেষ করে মনোময় ডেসপাচের অনিল কুণ্ডুকে গিয়ে বলল — কুরিয়ারের লোক এলে এই চিঠিটা দিয়ে বলবেন যেন আজই ডেলিভেরেশনে পৌঁছয়। যত চার্জ লাগুক। আর এই নিন্টা আমি পার্সোনালি পে করব।

সন্ধ্যাবেলা অন্যদিনের থেকে মনোময় অনেক আগেই বাড়ি ফিরল। ফেরার পথে নিউমার্কেট থেকে এক সেট চুড়িদার, আমিনিয়া থেকে তিন পাকেট মটন বিরিয়ানি আর হলদিরামের দোকান থেকে মেতিচুড় কিনে নিল। অনিতি মেতিচুড় খেতে খুব ভালোবাসে।

বেল বাজাতে দরজা খুলল অনিতিই। আজ খুব পরিপাটি করে সেজেছে। মুখে দশ বছর আগেকার সেই দুষ্টুমিভরা হাসি। ঘরে ঢুকেই অনিতিকে জড়িয়ে ধরে ওর ঠোঁটে গাঢ় চুম্বন এঁকে দিয়ে মনোময় বলল —হ্যাপি বার্থ ডে সিটি, আজ অলসো মেনি মেনি হ্যাপি রিটার্নস অফ দা ডে।

◇◇◇◇◇

রাতে বিছানায় অনিতিই বেশি সক্রিয় হল। ঘন হয়ে এল মনোময়ের কাছে। ওর রোমশ বুকে মুখ ডুবিয়ে অনিতি অস্ফুটে বলল — রোজ রোজ তুমি এরকম চিঠি লিখতে পার না?

মনোময় কঠিন মুঠো হাত দিয়ে অনিতিকে জড়িয়ে ধরল। তারপর ওর কানের কাছে মুখ এনে গাঢ় স্বরে বলল — পারি।

উত্তরণ

অমিতা চক্রবর্তী

সত্যি সত্যি আমাদের ক্লিনটাল ক্রমেন মেঘ চড় চড় করে ওপরদুখী হল। শর্মি তখন কাজের বাজারের গাউন পরে, পায়ে পাতলা বাদামের হাই হিল গুটিয়ে জানালার দেখে টুকে, ভোরের আলো কাঁচ দুলিয়ে, বাস — ইউ মেক মিলস মি হ্যাপি এ সানডে - যা আসার তখন চারিদিকে এক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। আশ্চর্য, কারোর আসবাবে কেউ কিন্তু ভোলোবাসার মানুষ বা শিশু যেন না। কিন্তু গান শেষ হবার পর হাততালির ঢেউ ওঠে, আর টেবো ওঠে কেন্টুরেন্টের মধ্যেই। শর্মি অন্যান্যদের মতো আপাতত একটু হেলিয়ে বাহবাদারলোকে এনকনেজ করে ভোজনের স্রোতে ভাসে চলে যায়। ঘুরেও দেখে না ঐ সব টেবো। কেন্টুরেন্টের বয়-বেয়ারা থেকে শুরু করে কেন্টুরেন্ট ম্যানেজার পর্যন্ত সবাই খুব খুশি। আজের উপার্জন বাড়ার জন্য।

শর্মির সকালটাকোর এক রকম, আর রাত্রিবেলার অন্যরকম। সন্ধ্যেবেলা দেখা শর্মির সাথে রাত্রির শর্মির কোনো মিল নেই। বর্ষীয়ান ডিরেক্টরিতে আমরা নিজে ক্যাফেটেরিয়াতে ব্রেকফাস্ট খেতে যেতাম। আমেরিকা দেখবার একটা ভোলার ট্রেনিংয়ে শর্মি এসে বসে আছে। চুলগুলো উস্কোখুস্কো। চোখ ভোলা। ব্রেকফাস্ট খাচ্ছে। কিংবা অপেক্ষা করছে ব্রেকফাস্ট খাবার। আমরা মেয়েরা সাধারণত একটা টেবিলে বসে নিজেদের মধ্যে গল্প করতাম আর খেতাম। মোনোদিনই আমরা শর্মির টেবিলে গিয়ে বসিনি। কিংবা শর্মির আমাদের টেবিলে আসেনি। এমনকী মোনোদিনও শর্মির টেবিলে গিয়ে বসতে না। কিন্তু প্রায় সবাই ভোর জায়গা দিয়ে বিদায় শর্মিকে। অবশ্য শর্মিও বর্ণময়ী ছিলিস। যিনি ক্যাটির থেকে সুইটন কলী যে খুটি চলন বেরিয়ে আসার অনায়াসভাবে, বেড়ি নিয়ে আসতে পারি নাজাই, খাবারের পুরুষ সেই চলনে মনে রাখবার পারলে নিজেকে ধন্য মনে করবে। আমরা মহিলারা শর্মিকে একটু এড়িয়ে চলতাম। নিজের অনেক লজিক দেখার জন্য আবহাওয়া শর্মি আমাদের মতো মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আসেনি। আলিম সম্পর্কে আমরা যারা মনে করতাম বাঙালি মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে হয়েও কাজ করছি ফোটেলে, তারা নাকি কী একটা ডিফেরেন্সিয়েশন করেছি — এই ভেবেই নিজেরাই নিজেদের পিঠ চাপড়াতাম। আসল তখনও তাদি ফোটেল ইন্ডাস্ট্রিতে পাঞ্জাবি মেয়েরা রমিনেন্ট করে যাচ্ছে। সেই আমাদের কাছেও শর্মি ছিল অন্য গ্রহের মানুষ। যাকে কৌতূহলে ভরে খুব থেকে দেখা যায়। তার ওপর আমেরিকান সঙ্গে আমাদের ডিপার্টমেন্টের ইন্সপার্ক, চার্লিরিন্দিনা। যিনি বরাই নিয়েছেন আমাদের এই কটি অল্পবয়স্ক মেয়েদের দেখাশোনার পবিত্র কর্তব্য একান্তরভাবে তাঁর। চার্লিরিন্দিনা প্রায়ই বলেন — দেখো তারা, বন্ধা, নন্দিতা তোমরা এসেছ মধ্যবিত্ত ঘর থেকে, মধ্যবিত্ত ভালো আর এশিক্ষা নিয়ে। হোটেল বড় বিচিত্র জায়গা। চারিদিকে ঘরে ঘরে সাজানো আছে পর-বিলাসের জিনিস। ইচ্ছা করলেই যাকে তাকে এমন জায়গায় নেমে বেচে পার যে সেখান থেকে উঠে আসার কোনো রাস্তা থাকবে না। তার থেকে নিজেকে সাবধানে রেখে এর ভাল জিনিসটা নাও। সেই চার্লিরিন্দিনার কথা অনুযায়ী — নিজের ডিপার্টমেন্টের বাইরে কাজ ছাড়া আর কারও সাথে কথা বলবে না। কারও-কারোর ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলার কোনো প্রয়োজনই নেই।

সেদিন কাউন্টারে আমার ডিউটি। ভুলিয়ার আসে আমাকে দিয়েছে চিঠি শর্মির জন্য। চিঠিগুলো বাছতে-বাছতে একটা বিদেশী এয়ারগ্রাম আমার হাতে এল। ঠিকানার জায়গায় লেখা শ্রীকরী শর্মি সেনগুপ্তা। আর নেমপ্লেটের জায়গায় শ্রীকরী এলিজাবেথ সেনগুপ্তা। লেখা অবাক হলাম। চার্লির ক্রিস্টোফ ইতিহাস বেশি ১০১ বছরে চার্লিয়া কুলদীপ। হায় আল্লা, শর্মি এখন খ্রীষ্টান। চিঠিটা ডি-হোলে রেখে দিলাম। নিজের অজান্তেই অপেক্ষা করতে লাগলাম শর্মির ফেরার।

ঘন্টাখানেক বাদে শর্মি ফিরল। চার্লির জন্য হাত বাড়াল কাউন্টারে। আমি চার্লি আর চিঠিটা একসাথে ওর হাতে তুলে দিলাম। লেখা অক্ষরগুলোর ওপর চোখ বুলাল। চিঠি পড়ছে, আর মুখে হাসির খেলা চলেছে। কলী মহিলাদের এই এক রিসুজাক্তাক্টিক। চোখ বুটি সজাগ জিজ্ঞাসা করলাম —কি কোনো খারাপ খবর?

শর্মি আমার ঠোঁটে নিজ নিজ চেহারার জন্য মুছল। মুখে মৃদু হাসি নিয়ে পরিষ্কার বাংলায় বলল —না উনি বিয়ে করছি। আর একবারই। আমি কাজ নিয়ে থাকি। শর্মির আর সেই। কোনোদিন হয়তো এমনিই হবে। কোনোর নিয়ে না দেখেই।

আমি অবাক হয়ে গেলাম — নিজে বুঝি তো বিবাহিত। সেদিন যে আমাকে সিঁদুর দেখলাম!

শর্মি বেশ রহস্যময় ভঙ্গিতে হাসল — ওটা আমার একটা মেকআপ ছিল। জীবন খুবই জটিল। এখানে প্রায় প্রতি দুসপ্তাহে মেকআপ পাল্টাতে হয় বেঁচে থাকার জন্য। মৃদু নিজে নিজে শর্মি উঠে গেল সিঁড়ি দিয়ে।

শর্মির জন্য ক্লিনটাল ক্রমেন মেঘ বাড়ছে প্রায় প্রতিদিনই। লোকেদের চা টাঙানো টেবিল বুক করার। ডরোথের কাছেও টেবিল বুক করার জন্য ওয়েটারদের হাতে গোপনে নোট গুঁজে দেওয়া। কাজে হলেও যদি শর্মির চোখ পড়ে ঐ টেবিলে। কিংবা ভালো সুপ্রভাত থাকলে হয়তো গান গাইতে গাইতে শর্মি

ট্রেনে করে দেশে এসে বসলেও বসতে পারে। শর্মিষ্ঠার তপস্যুক্ত ভদ্রলোক সম্বন্ধে কৌতূহলের অন্ত নেই। হোটেল কর্তৃপক্ষ বেশ খুশি। শর্মিষ্ঠার খুশি-খুশি মুখের জন্য গোটা হোটেলটাই হাসছে।

শর্মিষ্ঠার তপস্যুক্ত ভদ্রলোকের মতো মানুষও খুব প্রতিদিন পাচ্ছে ইদানীং। একজন বন্ধুর নীলগিরি-পাহাড়ের জমিটুকি। বাড়াবাড়ি - ভদ্রলোক। খরচ করে। টাকা ওড়ায় বুঝেশুনে নিয়ে। আর একজন মাঝেমাঝে ধরে তাদের ব্যবসা আছে কলকাতায়।

এই দুই তপস্যুক্তের মধ্যেই প্রতিযোগিতা কে কত, আরো কত বেশি দামের উপহার পাঠাবে শর্মিষ্ঠাকে, তার জন্য জালের বিছান। সর্বাধুনিক জায়গাটি সাইজ টিপে নিয়ে তো আন্দোলনি-লক্ষণ দিয়েই নেমন্তন্ন পাঠাচ্ছে। সকাল থেকে শর্মিষ্ঠা জন্য ফোন বিসিয়ে করে, মেসেজ রাখতে রাখতে আসবে ফাইভস্টারে ক্লান্ত হয়ে যেয়ার। সাথে রিমিক্স করতে হবে আসবে ঠিক, ফুল, অর্কিড। অ্যাসেসমেন্ট এই সব বিষয়ে বেশ জড়ো ছিল। তারা পুরো ব্যাপারটাই দেখত শর্মিষ্ঠা জনপ্রিয়তার যাবে হোটেলের ব্যবসায়িক সাফল্যের নিরিখে।

সেদিন সকালে রিসেপ্টিভে এসে ওনি কলা প্রান্তে ক্লিপ্টোস মনস্থিটি হয়ে গেছে পাঞ্জাবি-লক্ষণ আর মাঝেমাঝে-লক্ষণের মধ্যে। আজ ত্রিশূলধার আর ওরা পর্যন্ত। ধন্যবাদবিহীনে শর্মিষ্ঠা কাছেও হাত এসে পড়ছিল। বাঁচিয়েছে, গার্ড করে পেছনের দরজা দিয়ে ঘরে ঢোকে দিয়েছে রেসটুরেন্ট কর্মিন — গৌতম। আমাদের নিজেদের মধ্যে কিস-কাস। এই গৌতমটা কে? মাত্র দু-মাস হয়েছে গৌতম এখানে জয়েন করেছে রেসটুরেন্ট কর্মিন হিসাবে।

শর্মিষ্ঠা অসুস্থ। ফ্লু-র মতন হয়েছে। অ্যাসেসমেন্ট তার আসবে যেতে দেন পাশা করে এক-এক সময় শর্মিষ্ঠা কষ্টে হাই। ওর দেখভাল করি। শর্মিষ্ঠা অসুস্থ অ্যাসেসমেন্ট যেন নেবে না। শর্মিষ্ঠা হচ্ছে আমাদের এই সুন্দর হোটেলের ইন্ডিয়ানের দিদি। সেবার জিম যেওয়া হাঁস।

সেদিন সকালে বেলার সাড়ে ন'টা নাগাদ শর্মিষ্ঠার ঘরের দিকে এগোলাম। আজ আমার পালা, শর্মিষ্ঠার শরীর-খারাপের খোঁজ খবর নেওয়ার। ফিসফাস বাজনা শোনা যাচ্ছে ঘরের দিকে এগোতে এগোতে ওনলাম বন্ধ ঘরের মধ্যে থেকে গানের আওয়াজ। অতুলপ্রসাদের গান। 'এলো যোর গানের তরী ভাসিয়ে ছিলাম নয়ন জলে — সহসা কে এলে গো এ তরী বাইবে বলে।' ঘরজাটা বেজানোই ছিল। অল্প ঠেলা দিতেই খুলে গেল। শর্মিষ্ঠা দুহাতে মাথার তলায় দিয়ে শুয়ে আছে। চোখটা একটু চকচকে। আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে বসল। বলল — আমি তোমাদের সবাইকে খুব অসুবিধায় ফেলেছি না?

কী বলব তাকে তাড়াতাড়ি শর্মিষ্ঠার গলা — আমার ফ্লু না হলে তোমাদের সবার সামনে দাঁড়াতে হত না। আচ্ছা, তোমরা সবাই আমাকে একটু দিতে চল কেন? আমি তো তোমাদের মতোই একটা মেয়ে। একটু লজ্জা পেলাম। বেডসাইড টেবলের দিকে তাকিয়ে বললাম — অতুলপ্রসাদের গান। তুমি বাংলা গান জান - মানে বুঝতে পার - লছমন বল?

শর্মিষ্ঠা হেসে ফেলল। সরল হাসি। বলল — শুধু বুঝতেই পারি না, আমি গাইতেও পারি। অতুলপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথের গান অনেক আমার মায়ের কাছে শিখেছি। বলেই শরীর নিয়ে গলা মেলাল মেয়েরের সঙ্গে। কেমন যেন একটা গলার গন্ধ পেলাম। কলকাতা — প্রেমের নদীটি মেলতলা, আর শর্মিষ্ঠা। গাওয়ার পর আর কথা বলা ত্রিশিন্দুদের মতো। শর্মিষ্ঠা বলল — বুঝতে পারছেন? আমার আমা কলকাতার মিউজিকাল মানুষ। আমার আমার মা ত্রিশিন। আমার শর্মিষ্ঠা হয়ার আংলো ইন্ডিয়ান। বলেই ঝিল ঝিল করে হেসে উঠল। বলল — একটা গল্প শুনবে? গল্পটা কিন্তু খুব পুরোনো। আমার মায়ের জন্ম এখানে এই কলকাতাতেই। লেখাপড়া শেষ করার পর মা নার্স হিসাবে জয়েন করেন মিলিটারি হসপিটালে। ইন্ডিয়াতে আমার গ্রান্ড-মা মারা গিয়েছেন অল্প আমার গ্রান্ড-পা পাড়ি দিয়েছেন সুদূর লন্ডনে, অনেক অনেকগুলো বছর হাসপাতালে কাটিয়ে। মারার সময় গ্রান্ড-পা অনেক করে আমার মাকে সাথে নিতে চেয়েছিলেন; মা কিন্তু রাজি হননি। প্রথম কারণ জন্মের পর থেকে মা একলাবেয়ে জন্যও লন্ডনে যাননি। তাছাড়া সেই জায়গাটার ওপর মায়ের কোনো আকর্ষণ ছিল না। মা নিজেকে ভারতীয় নাগরিক ভাবে ভালবাসে ও বিশ্বাস করত। ডিউটি করার মা হসপিটালে প্রেমে পড়ে গেছেন এক টল ডার্ক হ্যান্ডসাম মিলিটারি ডাক্তারের সঙ্গে। ডি: একেবারে সেই রূপকথার গল্পের মতো নয়?

অবস্থার নক হতে মুখের গলায় শর্মিষ্ঠা বলল — কাম ইন। বেডসাইড আমাদের রেসটুরেন্টের কর্মিন গৌতম ঢুকছে দরজা দিয়ে। সাথে অনেকগুলো ফুল, ফল, মিষ্টি ম্যাগাজিন, শর্মিষ্ঠাকে উদ্দেশ্য করে বেশ কর্তৃত্বপরায়ণ গলায় বলল — আমার তুমি ঐ সব কার্ড আর ফুল দিচ্ছ। ইচ্ছা হয় সবকিছু পাশের ডাস্টার নিলিয়ে দিই। আমাকে দেখতে পেয়ে গলাটা একটু নামাল। শর্মিষ্ঠা হেসে ফেলেছে। আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল — দেখো কেমন জেলাস লাভার-গৌতম। আমার যাক থেকে যদি আমাকে ভালবেসে ফুল পাঠায়, কার্ড পাঠায় আমি কী করতে পারি। নীচে নেমে এসো। ব্যাপারটা নিজেদের মধ্যে খেয়ার করার জন্য।

আমরা মেয়েরা সবাই হাসছি। শর্মিষ্ঠার মতো একটা মেয়ে গৌতমকে প্রেমিক

বলছে। আরও নতুন খবর কানে আসছে। ঔষধের ব্যাগ যে একটা টেবিলের ওপর থাকে, সেই সব টেবিলের ড্রয়ারগুলোর ওপর শার্লির বাড়িওলার চোখ। প্রায় সময় গান করতে করতে সেই সব টেবিলে গিয়ে ঝুঁকে। কারো কাগজ ভাঁজ সুস্পষ্ট হলেই তার টেবিলে গিয়ে একটা সফট ড্রিংকের বোতল। না শার্লি ধরা খায় না। হলেই প্রায় পরিষ্কারভাবেই বলে পৌঁছবের টিপসের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য। কিংবা অনুরোধ করে এক ক্রেট বিয়ার কিংবা ফার্স্ট ড্রিংকের বিলটা করতে। শার্লির দাবিকৃত পাওনা ভারীমনস্ক হলে পেলেও অনায়াসে এই সব বলাবাহুল্য দেখায় পৌঁছবের প্রতি।

নতুন বছর এসে গেছে। হোটেলের প্রস্তুতি নতুন বছর উদ্‌যাপনের। শার্লির সঙ্গে এখন আমার একটা প্রায় বন্ধুত্বের সম্পর্ক হয়ে গেছে। সেদিন শার্লি আমাকে ডেকেছিল ওর নতুন ড্রেসটা দেখানোর জন্য। স্কার্ট ও পরনে এরইমধ্যে ফিটফাট। ওর ঘরে এসেছি। শার্লির ঘরে প্রায় সব সময় বিদেশী ম্যাগাজিন, বিস্কুট, ফুট-জুস এসব কিছু মজুত থাকে। আর আমাদের কিছু না কিছু খেতেই হয় শার্লিকে নিরস্ত করার জন্য। শার্লি ইতো বড় এক দিল কেক আমার হাতে দিল। না, বলেও শুনবে না। জিজ্ঞাসা করার অবকাশ না দিয়ে বলল— কয়কাল যাবার জন্মদিন ছিল। সাবাসি, এই কেকটা আর একটা পাঠায় সেটা দিয়েছে। আমি বললাম — কিন্তু তোমার জন্মদিন তারিখ আমি জানতে আসে না। তুমি তো আমাকে কার্ড তে কাউটা দেখালে। তোমার আগের পারাবে। দিল দিল করে উজ্জীবিত হাসিমুখে শুনিয়ে পড়ল শার্লি। বলল — কি করব বলোতো আমার বাড়িওয়ালারা প্রায় প্রত্যেকেই চায় আমার জন্মদিন যেন প্রত্যেক দিনই হয়। ওরা ভাবে একটা উপলক্ষ। আমাকে উপহার দেবার জন্য। আমিই বা কেন তোমাদের হতাশ করি? কেউ যদি আমার জন্য টাকা খরচ করতে চায় করুক না। একটু থেমে উদাস কণ্ঠে বলে — আজকে আমার টাকার অভাব নেই। আমি গরীবদেই আনেকে দিয়ে থলা হবে। কিন্তু পরিস্থিতির বন্ধুরা আমি জানি। জন্ম তারা আমার ছোটবেলা একটা রূপকথার মতো ছিল। এলেকজান্দ্রিয়ায় একটা ছোট্ট বাড়ি কাদের সঙ্গের। আমার মা-বাবা দুর্ভিক্ষীয় ছোট্ট মা-বাবার ছিলেন। মা একটু খরচীল, বেশ ডিসিপ্লিনের। নিজের হাসপিটাল আর বাড়ি ছাড়া আর কিছু জানতেন না। যা যে কার পরিশ্রম করতে পারত তাবাই যায় না। নাইট ডিউটি দিয়ে ফিরে আমাকে আর বাবাকে শক্তিশালি করে ব্রেকফাস্ট দিয়ে বাজারে যেত, যাবার করার জন্য। সেই সময় বাবা আমাকে তার ইউনিট ওপর বসিয়ে পিয়ানো বাজিয়ে গান শোনাত। যা ফিরে যাবা করে আমাকে আর বাবাকে খাইয়ে হয়তো একটু বিশ্রাম নিয়ে হসপিটাল যাবার জন্য তৈরী হত। সেই সময়গুলো বাবা কেমন যেন খরচীল হয়ে থাকত। বাবাসাহেবের মুক্তিযুদ্ধে বাবা তার একটা হাত হারিয়েছিলেন। গরমেন্টের থেকে কয় অনেক প্রলোভনও আর ভাইক পেয়েছিলেন, কিন্তু খুইয়েছিলেন প্রবৃত্তিটা। মা, যেন্ত্র অনায়াসে বাবাকে চুলিয়ে রাখতে। কিন্তু আমার জন্মদিন হারিখুশি বাবা আমাকে ছেড়ে কেমন বিচ্ছিন্নিয়ে হয়ে যাচ্ছিল। সেই বয়সেও পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম। অর্থিক অসচ্ছলতা, মায়ের একার আয়ে আমার ডিভিংগ, আমার পড়া, গান, নাচ-খেলা, সবকিছু চালানো আর সহজ হচ্ছিল না। মায়ের হসপিটালের ওভারটাইমের ঘন ঘন বাড়ছিল বাবার ক্লিক করাও বাড়ছিল। মায়ের চোখের ক্লেদে আমি পড়তে শুরু করলাম। হয়ত কয়ে যেন মায়ের বয়স অনেক বেড়ে গেল। সাথে কালির পদক। খেলার দিকে বাবা দিনের বেলাতেও ঘুমিয়ে থাকতে ভয় করতাম। মায়ের চোখের ওয়াই ঝলক না। তার হয়ে থাকত ভাগ সর্বক্ষণ। মা এত-ক্লেশির কাজে হাত দিয়ে নিজের বাবা-মায়ের কাছে ফিরে যেতে বলত। বাবা বলত যে শান্তি খেকে আমি বেরিয়ে এসেছি, সেখানে ফোরাত আর শান্তির ভাগো হয়নি, সেখানে আমিও যাব না। আমি তখন ক্রুদ্ধের ট্রেন্ড দেখে। সে বছরই আমি এম.বি.বি.এস পরীক্ষা দেব। বাবা, মায়ের সবার ছোটে ঘরাতে এক-আধটা ফোনালাপে আনন্দেরও ধার পাইনি। প্রথমের প্রায় সবসময় টাকা-পয়সার আলাপে। বাবার ইচ্ছে আমার পারিবারিক ব্যাপারে পান গাওয়ার। কিন্তু আমি বুঝি ঐ সময়ে ঠাকুরে কাছে সবকিছু অনুযায়ের আকারে। তাকেই বলাকে লুকিয়ে যাবের অভিজ্ঞানের। আমার পারিবারিক ব্যাপারে চলত।

পুজোর সময় বৃন্দাবনে একটা ব্যাপারে গান করতে গিয়েছি। সিনে একে গুলি বাবা আধকাশে পড়ে গেছে। ওকে ইন্ডিয়ান ফোরাকের করেছে। আমি হসপিটালেই ভর্তি করা হয়েছে যাতে একে আমি হিসাবের সময়ত বেশি দুশিন্তা থাকে। আমার মায়ের চোখের সেদিনও ঝলক। এইভাবে কাল প্রায় মাস আটেক হিসাব। কথা বলতে পারছেন না। আমাকে দেখে চোখ দুটো কেবল জলে ভরে উঠত। এই সময় মা একদিন আমাকে নর্থ ক্যারোলাইনার একটা ঠিকানা দিয়ে বলল — ফোন থাকার কথা, একা আমাকে এলাকেশন করেনি। কিন্তু ফোন কাজ এই অবস্থায় কথা ওদের জানানো দরকার।

জানো তখন, আমি দিশেহারা। নর্থ ক্যারোলাইনার সেই বিশাল বেডিওয়ালা বাড়িতে। সেখানে অনেক লোকজন অবস্থান। আমি কে, কেন এসেছি, কী দরকার, জানে জানে এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে প্রায় বিরক্তি পনেরো-কুড়ি

দীপান্বিতা এক মোলায়েম ভয়ংকরের কাছে পড়ে বুঝেছিলাম উনি আমার প্রথম দাদা। উনি খুব আশাপ্রদভাবে কথা বলছিলেন আমার সাথে। সাথে মোড়ী চাউমি। বুজলাম আমার হাতকে চেনার চেষ্টা নেই। তার পেছনেও। উনি সম্পত্তির ছাপ চাই। সেদিন খুব অপমানিত হয়ে ফিরে এসেছিলাম। যা আমার মুখের অবস্থা দেখে কী বুঝেছিলেন জানি না। কোনো কথাই আর বলেননি।

বাবা মারা যাবার পর মা আরও বেশি দায়িত্বশীল হয়ে গেল। সংসারের কী যে জানে কে জানে। মাঝে-মধ্যেই কাপড়ই হয়ে আসত ইনসিটিটিউশন ট্রিটমেন্টের। আমি ঠিক করলাম আর কলেজে ভর্তি হব না। তার বদলে গানের ওপর জোর দিলাম। পার্টটাইমের একটা ব্রেকফাস্ট শোতেও গান করতাম। যা বাবাও বলল না আমার সম্মতিও দিল না। তবে মনেমনে মা বলতেই থাকত — শর্মি ইউ আর মাস্ট ফাইন্ড এ বেটার বয়। ওরা খুব ভাল হয়। খুব বিশ্বাসী হয়। আর ভালবাসতেও জানে।

আমার প্রফেশনাল লাইফ শুরু হল। ব্রাজাদেশের একটা হোটেলে কনসার্টের চান্সটা। ভাল মাইনে। আমাকে নিয়ে যাবার ইচ্ছা। কিন্তু মা রাজি হলেন না। মায়ের বলাবাহুল্য ওপর সেই আপত্তি একেবারেই শেষ হয়ে গেছে। বাবা চলে যাবার সাথে সাথে। মা কিনে গেলেন লিজাকে। প্রাক্তন-শ্বশুর করছে। আর তারপর থেকেই আমি একা-একা এখান-সেখান করে বেড়াচ্ছি। মা আমেরিকায় চিঠি লেখেন। আর প্রত্যেক চিঠিতেই এক কথা। আই থিঙ্ক ইউ শুড মিট হ্যান্ডসাম উইথ ইজি পা-পা। হি শুড বি এ গুড। বাঙালি ছেলেরা খুব বিশ্বাসী হয়, আর ভালবাসতেও জানে। সো ইউ মাস্ট ফাইন্ড আউট এ বেঙ্গলি বয় এন্ড গেট ম্যারেড। আই উইশ মি তেড়ি হ্যাপি সন্ ইউ।

নতুন ক্লেসটি গায়ে চড়িয়ে আয়নায় আমাকে নিজে দাঁড়ালাম। ভালো লাগা-খারাপের মাঝে শ্রীমা মেশিনে জিজ্ঞাসা করল — কেমন লাগছে? বললাম — অপূর্ব। যেন যেমন ঝিল ঝিল করে। বলল — ছোটবেলায় একটা দুঃখ দিই। আমি আর মৌটুস নিয়ে একদিন ঝিল-ঝালুকারিয়ে। বন্ধুদের একটা মাইক্রো শিমলা ছোটবেলে ডিনারের চাকরি পেয়েছি। অবশ্য সমস্ত কৃতিত্বটাই মৌটুসের। ও-ই আমাকে না জানিয়ে আমার ব্যায়োডাটা, ছবি, গানের ক্যাসেট ওদের কাছে পাঠিয়েছিল। আমার অবশ্য চলমান ছাড়ার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু মৌটুস চায় আমরা একসাথে গিয়ে থাকি। আমি মৌটুসকে বলে দিয়েছি। আমি সেই চলমানই চাকরি করব, এতদিন না যা হয়েছি। চাকরির একেবারে মন দিয়ে রপ্ত-লস্যার করব। মরিয়া বলছি ওরা। আমার একসময় ইচ্ছা করে না আরএলো সোনালী ব্রোকের সামনে গান গাইতে। আমি তো জানি ঐ সব চোখগুলো নিবদ্ধ করে আমাকে দেখে-আমাকে সম্পদ করা না। একটু অন্যমনস্ক হয়ে বলল — তবে এই কাজ আর বেশিদিন করা করতে হবে না। বিয়ে হয়ে গেলে মৌটুস আর আমাকে হোটেলের সিঙ্গার করে রাখবে না। তুমি দেখবে তো, মৌটুস কী রকম পজেসিভ। কি ওরা ঠিক বলিনি? তুমি তো খুজেপুজি বাঙালি মেয়ে। তুমি ঠিক বুঝতে পারবে, জানবে, বাঙালির সেন্টিমেন্ট। নীল চোখের মণিতে ভয়-আশঙ্কা মিলিয়ে শর্মি তাকাল আমার দিকে উত্তরের আশেপাশে।

শর্মির ঐ প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে ছিল না। তবে বিশ্বাসের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম যেন শর্মির ভোরবেলার সেই অনি-অনুমিত মেয়েটির প্রার্থনা ভগবান শোনেন। যদিও মৌটুস সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে প্রায় সবসময়ই রিসার্ভেশন ছিল। একটা হাফার-সেকেন্ডারি পাশ গ্রামের ছেলে ওয়েটারের কাজ করে। তবেই গ্রামে বাড়ি মৌটুসের বৌ-ছেলেমেয়ে আছে। আমি বলিনি জানি না। তবে ইন্ডিয়া শর্মির দৌলতে. মৌটুসের বেশ নামটি হয়। সেক্সিওয়াল জিনস্, বডি ফ্রাইড-হেয়ার সাট, বডি বডি. তার মিলিয়ে হয়ত মেয়েদের বেশ বড়লোক-বড়লোক বলেই মনে হয়। রাস্তা হঠাৎ বেশ দুঃখের সঙ্গেই আমাকে বলল — শর্মির এই আচরণগুলোকে, ও দেখতে এত সুন্দরী জানলে এই ওয়েটারের কাজ করা ছেলেটাকে বিয়ে করছে কেন? মনে মনে ভাবলাম, শর্মির সাথে অনেকে হাত কাটাতে চাইবে। অনেকে একে ঈর্ষণীয়া করে নিজেকে ধন্য মনে করবে। কিন্তু বিয়ের আগে দুঃসাহসিক কাজ করার মেয়েকে সত্যিই ভয় হয়।

শর্মি - মৌটুস চলে গেল আমাদের হোটেল ছেড়ে। যাওয়ার আগে আমাদের প্রায় প্রত্যেক মেয়েকেই একটা করে দামি গিফট দিল। আমারও সবচেয়ে দিলে একটা সুন্দর লাল কেনারসি দিলাম। কলকাতায় বিয়ের জন্য। বিদায় নেওয়ার সময় আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল শর্মি। কানের কাছে ফিসফিসিয়ে বলল — ডীপলি ভয় করছে ওরা। আমি কিন্তু ভুল করছি না তো। আমাকে মৌটুস ঠিক এইরকম ভাবে ভালবাসবে তো? বিয়ে করবে তো? চিরকুল বাঙালির কথা। আর প্রেমিক আর বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবে জিনা।

ওয়াশার কিছুদিনের মধ্যেই চিঠি আর সাথে ছবি এল। সুটেড মৌটুসের পাশে লাল বেনারসির সাথে লাল্যুক হাসি নিয়ে শর্মি। ছবি দেখেই বুঝতে পারছিলাম ও কেমন খুশিতে ঝলমল করছে। আমরা মেয়েরা বেশ খানিক নিশ্বাস ফেলাম। মাঝে-মধ্যেই চিঠি পাঠাত নিজের ওরে পুজো আর নিউ ইয়রের সময়। তার একই কথা। ওরা ভাল আছে। ছেলের দিকে শর্মির অনেক নাম এক

বন্ধুদের। গৌরব ঠাট্টা করছে শার্লির সিলেমার থে-ব্যাক সিঙ্গার করার। আর শার্লির ইচ্ছা যা হওয়ার। ওরা জুহুতে একটা ফ্ল্যাট নিয়েছে। একটা আন্তরিক ছোঁয়াও বুঝ করেছে। মেয়ে খাসে খুব শিগগিরই। আমরা ভেবে রাখি না — ওর ফ্ল্যাটে আমার জায়গার অভাব নেই। মা ও নিজে কষ্টাক্টে আছে, তাহলেই ইচ্ছা থাকলেও কলকাতায় আসা এখন হবে না। তবে, আমরা গেলে খুব মজা হবে। অন্য শার্লির খুব ভাল লাগবে।

আস্তে আস্তে কখন যে শার্লির সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হল খেয়াল নেই। নিজেকে ব্যস্ত রেখেছিলাম নানারকম ডকুমেন্টারি ডিরেক্টরি, আর্টিফিসেট আর ট্রেনিং-এর জন্য। ক্যারিয়ারের উন্নতির পথ মসৃণ করার জন্য। নিজেকে যোগ্যতর করার জন্য আরও বড় পরিধির বাঁধন কষার প্রয়ে।

দেখতে দেখতে অনেকগুলো বছর কেটে গেছে। এখন আমি এই ফাইভ স্টার হোটেলের যুগ্ম-মহাধ্যক্ষের ম্যানেজারের দায়িত্বে। সেদিন সকাল থেকেই বেশ ব্যস্ত ছিলাম। একটা ফিরোজনাথি ফ্রেলিগেটদের লাঞ্চ ছিল শহরের অন্যতম ধনী-মহারথীদের সঙ্গে। লাঞ্চ শেষ হবার পর বসলাম ম্যাডিসিয়ার সিলেকশানের ইন্টারভিউতে। আজ দশ-বারোটা অ্যাপ্লিকেশন এসেছে তার মধ্যে একটা বেশ ইমপ্রেসিভ। মি. মণ্ডল — তার বেশ-ব্যবসায়ের, চেন্নাইয়ের হোটেলে ম্যাডিসিয়ার হিসাবে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে। ভালোলাগে মি. মণ্ডলকে। আমার সামনে আজীবের একটা পরিচিত মুখ। অনেক মেদি হয়ে গেছে। লাল গালের দাগ এরা দাঁত বার করে হাসছে আমার দিকে তাকিয়ে। বাঁ.L. গৌতম। আমাদের সেই ফেস্টুনেন্ট গভর্নরের মতন শার্লির জন্মী আমার সামনে বসে। বলছে — ও মাত্রাম আপনি এখন মহানেজারের পোস্টে। কী ভাল যে লাগছে। মেয়েমানুষের ইচ্ছে করলে কত কিছুই যে করতে পারে। যাক, আমি এখন নিশ্চিন্ত। ফেস্টুনেন্টের বায়ো-ডিটাতে ফাইনাল আপনি আমাকেই দেখেন। তাছাড়া আমার অভিজ্ঞতাও আছে।

বেশ কিছুক্ষণ আলাপচারিতা গৌরবের ওপরওলো ওপরে। মেয়েরা, বেশভূষা, কথা বলা সব কিছুই এখন একেবারে মার্কিনমুল্লুক পালাপালের মতো হয়েছে। মনের মধ্যে প্রশ্নও কৌতূহল। জিজ্ঞাসা করলাম — শার্লি কোথায়, কেমন আছে ওর? আমার কথা শুনে আমার খানিক ক্ষণ কথা শোনার মতো হাসি। বলল — গোড়া থেকে বলি। শার্লি আমাকে বিয়ে করে বম্বে গেল। ভাল রোজগারও করছিল। শার্লির নাম হয়েছিল। ওর গান শোনার জন্য এলাকার ইস্ট থেকেও লোকজন আসত। হোটেল ম্যানেজমেন্ট কর্তৃপক্ষের মেয়াদ বাড়াতে চাইল। মাইনেও অনেক বাড়িয়ে দিল। তারপর দেখলাম মেয়েদের টিপস্-বিগড়ি হো আছেই। শার্লির জিদ্ব একটাই কথা কবে আমি ওকে বিয়ে করছি। বিয়ে করার কথাই হো আর বিয়ে করা হয় না। এদিকে দেখে আমার মনে-হয়, বৌ-বাচ্চা সবাই আছে। আমে দু-পাঁচদিন হোক্সগাস করার বলেই না আমি শার্লির সঙ্গে বম্বে গিয়েছিলাম। আর তা ছাড়া আপনিই কলুন ভাতারে, ঐ চক্কর নাম-কাম করা মেয়েদের কি বিয়ে করা যায়। আমার তো একটা সম্মান আছে। আমরা ব্রাহ্মণ বিয়ে পৈতৃক ঘরের ভদ্রসন্তান। মাঝখান থেকে একটা ফুলফুটি আওন জ্বলতে লাগল। কলকাতা— তবে যে ছবিতে দেখলাম শার্লির কোমরটি সিঁদুর-পরা বৌ-ছবি। গৌরব বলল — আপনার কাছে মিথ্যা কথা বলব না। ওর গুলি পরাই আপনি আমার ওপরওয়ালা হলেন। কথায় বলে ওপরওয়ালা আর ভগবানের চরণে ভক্তের অন্তরে রেই। তবে মনোরম, এও বলছি, আপনি ইনফরমেশন না। আপনার ফেস্টুনেন্টের জন্য জীবনসঙ্গী এবং ফ্যামিলি-পার্টনার এলে বেশ কে কেমনের প্রাপ্তিনার ফেস্টুনেন্টের সেল কেমন ওপরমুখী হয়। তখন এই গৌরবকে ছাড়বেনই না। হাঃ হাঃ হাঃ..... কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বললাম — তাহলে ঐ ছবিটা মিথ্যা? গৌরব একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলল — না, মানে ঐ আর কি। তখন শার্লি একেবারে ছোট্ট বলল আর গানই করবে না, তখন ঐ পাড়ার কাছে মন্দিরে নিয়ে গিয়ে সিঁদুর পরিয়ে বিয়ের শার্লি জীবন খুশি আর আমারও কাজ তখনকার মতো উদ্ধার হো। শার্লি তখন হোটেলে থাইতে ওক করে। আর এদিকেও আমি একটু একটু করে ঝুঁকিয়ে নিচ্ছিলাম। প্রমোশন বাড়িতে হোচ্ছিল। বিয়ে থাকেও ধর্মনিতে ডিসলাম। বেকায় ছোটভাইটাকে সেটেলমেন্ট করে একটা ঘুষির চাকরি করে দিয়েছি। ছেলেমেয়েরা স্কুলে পড়ছিল। বেশ হাসিই চলছিল জীবনের আরাম। কিন্তু শার্লি বিগড়ে বসল। এবার তার আপত্তি একটা সন্তানের। তার বাকি প্রতি রাতে কতকগুলো ফোটো তোখের সামনে ভাইতে ইচ্ছা হয় না। আমাকে স্পষ্টই বলত — আমার যা টাকাপয়সা আছে সেটা নিয়ে আমাদের চলে যাবে। তোমাকেও আজ করতে হবে না। চলো আমরা কলকাতায় চলে যাই। একটা ছোট দুই-কামরার ফ্ল্যাট কিনে নেব। তুমি নিয়ে ঘর-সংসার করবে। বিশ্বাস করো গৌরব, আমার আর এই জীবন ভাল লাগে না।

কলকাতার আসি বটে নিজের সর্বনাশ করি। তার ওপরে আমার প্রমের বৌটি

না লজ্জায় ও ইচ্ছাতে এই সব জায়গায় শর্মিকে দেখেই দেবে। তাহলেই শর্মিকে বোঝাতে চাইবেন আহত কিছুদিন আমাদের কোছে থাকা দরকার। ওর নিজেদের গায়ের মেয়েটা। ঘরে ঢাকবার পর আমরা ওপরতলায় যাব। ছাদটা ভিজব, ঘর-গেরস্থার কথা। শর্মি আমা মেয়ের মতো আমার কথা শুনল। কিন্তু চিলড় এল ওপর দিক থেকে। সেদিন শর্মির চাইবাসি ছাড়ে ছিল। আমাকে বাজার তবে আসতে বলল। আজ বাড়ি ও নিজের হাতে রান্না করে খাওয়াবে আমাকে। আমরা যেখানে থাকি তার একটু দূরে বাজার করতে গেলাম। আমারও ইলিশ মাছ খাওয়ার ইচ্ছা হয়েছে। বাড়ি ফিরে দেখলাম শর্মি চুল আঁচে নিজেদের ওপর বসে আছে। সামনে কতকগুলো খোলা ফিরি। কলতলাটা ভর্তা। ফিরিগুলো আমার পুরনো, আমাকে লেখা। আর ছবিগুলো আমার স্ত্রী গ্রহণ করলা আর বাচ্চাদের। বুকসহ সবকিছু যা দুরন্তপনার হয়ে গেছে। শর্মি সমস্ত কিছুই ধরে নিয়েছে। আমি খুব সাধারণী মানুষ। কী করে যে এত বড় ভুলটি হয়ে গেল। সাধারণত আমার সুটকেসের এককোণায় নিজের দিকে এগুলো থাকত। আর প্রায় সব সময়ই সুটকেসটা চাবি দেওয়া থাকত। চাবিটা থাকত আমার মনি ব্যাগে। ওদ্যে শর্মি বাজারের টাকা দেওয়ায় ফলে আমি ব্যাগটাই কেবল নিয়েছিলাম বালিশের তলায়। ওহ্ শর্মি — যাই হোক ভুলি না হবার তাহলে হয়েই গেছে। চেষ্টা করলাম শর্মিকে বোঝানোর, শর্মি কিন্তু আর একটাও কথা বলেনি তারপর। কোনো রকম রাগ অভিমান কিংবা দুঃখ দেখাবনি। নিঃশব্দে নিজের কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস সুটকেসে নিয়ে বেরিয়ে গেছিল বাড়ির থেকে। শর্মিও ঐ রকম চেহারা আমি কোনোদিনই দেখিনি। আমার আমার কেমন যেন সাহস হচ্ছিল না শর্মির হাতে রান্না করা খাবার।

মাথার ভেতরের ঘুলঘুলিটা তখন একটা ঘুরপাক হয়ে গেছে। কোনোরকমে নিজেকে সামলে গাড়ির চাবি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। হাজরা মোড়ে শর্মি। আমি যে ওকে এত ভালবাসি তা ওকে বোঝাতে পারব না। ওর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা এখন ঠিক কী? ওকে ছাড়া আমি কী করে থাকব? ওকে ছাড়া আমার জীবনটা কী? ওকে ছাড়া আমার জীবনটা কী? ওকে ছাড়া আমার জীবনটা কী

শিউলি-ভোরের চিতা

গৌতম ভট্টাচার্য

যে-ঘুম ভাঙাই লেখে এল ভগবানে পৌঁছনো ভাল একটা মেল ট্রেন ঝমঝমিয়ে চলে গেল। ঠিক তখনই অমিত স্পষ্ট দেখে ফোন পড়ছেই ডাক্তারের কম্পাউন্ডার কম্পিউটার প্রেসক্রিপশন থেকে মুখ তুলে তাদের খোকার বাবাকে মুখ টিপে হাসল। অমিত মনে মনে বলল — এমন তো হবার কথা ছিল না সান্ত্বনায়: আদর-আবদার থেকে পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে এসে পেঁছে ভাঙাবার কথা। ঘুরেফিরে আইটার মধ্যেকার দিন উপোস থাকার কথা। বাবা যখন অমরেশ অসাধারণবাবুদের ভাসে নিয়ে উঠল, কড়ায় করেছিলে — অমিত না কিলিস অমরা তোর ছেলেমেয়ে বুঝিয়ে ভাজা অমরা।

সন্ধিতির কলেজের অফিসে সান্ত্বনায়ের ছেলে এসিয়ে যেতেই অমিত মধ্যরাতের মাথা তার জন্মদাত্রী দুকে পড়ল আচমকা। এবং হোসপিটাল বেডে পৌঁছতে একান্ত বাল্যকালের একটা মাতৃবার্তা ছবি হয়ে গেল। জন্মদাত্রীর পা-দুটো জড়িয়ে ধরে উঁবুতে উঁবুতে বাপ বলছে — মানুষের ছেলে হয়েও মাকে চিনতে পেরেছিস। বেশি রোজগারের জন্যে শেষপর্যন্ত সান্ত্বনায়ের ঠোঁকে কাজ করেনুম। ঘর মাতাল-চামারের আশা। তবুও..... কোনওদিন তো তোকে উঁপোসে রাখিনি..... জিনে তোর সুখ হয় কেন দুই জানোয়ার ছেড়ে যাস: বাবা দুটোর কথা ভাবি একবার..... জন্মদাত্রী গলা দিয়ে একরাশ আর্তনাদ ঠেলে উঁপরে অমরেশ্বরীই মাটিতে ফেলে ভাসিয়ে দিল।

জ্ঞানহারা জ্ঞান হবার পর ছেলেবেলার মায়ের কথা মনে পড়তেই প্রমিত ঘরে হয় হাসপাতালের অধিশাসনে সে যেন ঠাঁড়-পুতুলের শক্তি পরে বসে আছে। আত্মজ্ঞান সেই লজ্জাটাও আর তাকে ছোবল মারে না। তারা বলছে, বিশেষ করে অমরা চলে যাবার পর থেকেই, পেটের ভাষা আর ভাইটার রিফ্লাক্স সঙ্গে মিলে গেছে একটা ভয়। তাদেরই পাড়াতে সন্ধেবেলাতেও জনসাধারণ খোলা রাখতে পারে না। জন্মের সঙ্গে ইঞ্জের পরা বয়সে অমরেশ্বরী শক্তিয়েছিল। সেই অমরাকে ওরে বলেছিল একটা দিন। অমরেশ্বরী বলার অনিচ্ছা উপেক্ষা ফেলে 'না' করে দিয়েছে। ছেলে-বেলা চলছে। তাদের বাড়ি কাল-ভাতানি যাবে। একটু ভাত হলেই ছেলে-মেয়েদের মুখের চারপাশে কারা সব চলাফেরা করে। এদের বিকারিক মুখ, ফিসফিসানি ইঙ্গিত-দুর্বোধ্য খোঁয়াড় ভাষা জন্ম ভাষ পিছনের ঘরে: বাপ-জাঠার বড়লী মানুষ এদের ফোন্দা কাছে চাইলি মেখানেও প্রমিত ফোন্দা মনে হয় — এই মোগাহও মুখ-চলোর পলেকরা ঘরে ভাঙানা ফাঁকির মুখ হয়ে

যাবে। জীবনের সঙ্গে অনি একবারই সেলাই শিখি দেখতে গিয়েছিল।

ভোরে ঘোলা মফস্বলে ঘুম ভেঙে গেছে তুলির। টিনটিনি আলোয় ঘরের অন্ধকারটা আরও বড় শরীর পেয়ে যায়। উঁচু উঁচু আলোর পাখির ঘুমন্ত ওড়া দুপাশে দিকে হাতিয়ে অনি ঘিনঘিনে গরম ওয়ে—হাতিটা মাঝে, ওরে দুই বড় হাঁটু। এক-একদিন ভোরবাতে ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোনের আবছায়া বলায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ওপরে আকাশ, আকাশে তারা। যেদিনই গাছের আবছা চোখ হয়ে গেছে, কাকাতুয়ের গায়ের লড়িয়েওয়া ছোট পাইয়া থেকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছে। ঠিক তখনই ঘরে ঘোমটা মায়ের ঘুম ভাঙিয়ে এসে হাজির হয়েছে।

তুলির কলকাতায়ের দিন থেকে লক্ষ্মণ মিটি শোনা যায়। শেষ খেয়াটা তুলিপুর থেকে ছাড়ে এরা। এদিকে লাটিন শেয়ালদেরী জনতাদের ঘাটের ঘোলাল আর ধলকাল। ডেলি-পাসেঞ্জারদের ঘাইতেল রাখার লোকান। রাত্রির মেশিনের টিনটিনি শব্দ। একটা ঝাঁক। ঘরলের টানা রাস্তা ধরে গেছে ঘোলা-বটিগুলো। তলার পোকায়দের ঘরের ঘাসের ঝুড়ে ঘলায়। সব ঘরের পর একটা গলা একলা টিটিরিটি চিটিয়ে দিল। মুখ না ফিরিয়েও দেখতে পায় অনি, কাগে ঘুঁসতে ঘুঁসতে জীবনের মুখখানা পাঁচলায় মাখামাখি হয়ে গেল।

অথচ এই ঘোর মেলিনও আমাদের চলা আসে, মেকাপ, গন্ধের আজন মাখিনিয়ে জীবনকে দেখলেই অবলা খালা খালা পরে অনির ঘারি ইচ্ছে হত, আশপাশের মেয়েদের ডেকে শোনায় — জানো মেয়েরা এই জীবন পাড়ুই আমাকে, শুধু আমাকেই ঘোর ঠাঁদের মেয়ছুলি দেখায়। — জানো দু-একটা কলমবুকের ওলক। জীবন নিজেই সাজাই মেয়েছে — আমের সঙ্গে আপনে নাহি, আমা যে সে ফিলেল না। পায় নাটি ৬-সাতলো টাকা রোজ। আর আর একদিনই আসছে। ভুল রিহার্সালে। ঘুরে ঘিলা বাবে না ঘুরে মেকাপটি বলবে না। আমাকে দেখলেই ঝলিয়ে ঘরে। কেন যে আমার হিরোইন আমি, মোশন আর্টিস্ট আমে। তা না আমাকে: যত সব জীবনবাবু দেখুন না মেকাপ ঠিক হয়েছে কিনা — জীবনদা প্রম্পটারের ছবিটায় আছে মোবহর, গলায় আওয়াজ মেয়োয় না। এ সিনটায় আমলদা কেল কলমে আপনি একটু ঘরিয়ে দেখেন। —জীবনদা লাস্ট লিনে হিরো জনাকে বুকে টেনে নিয়ে কিস খাবে। পাশে ক্লাপ পাওয়ার কিনি। এই জন্যগুলো একটু ঘরে দেখিয়ে দিন না — জীবনদা চলুন না, মন্তুস্থানের ঘেশটা ঘেকে আসি। আপনি সঙ্গে থাকলে বুকে বল পাই। আমেই অনুনয় মুখুল। সবাই মিলে মিনমিনি ভজনও করে আসা যাবে অনি তনয়ে তনয়ে ৬-সাতলোর এক সকল হিরোনের মধ্যে ঘরোপাধার রাজকুমারী হয়ে যেত। জীবন অন্য দেশের রাজকুমার হয়ে উঁচায় ঘোড়া ছোটাত, কী হিরো হত। ঘোলা ঘোড় ঘরে টানা। পেছনে রাজকুমারী .....

এক হিরোনে আইটাও নাড়ি নেই। ঘোজকার ঘতো জীবন পাওয়ার এসে বলেছে। নিজেই কথা পাড়ল — সাহনের হিজনেই কলকাতায় নিউ হয়েছেন জানেন অনাদি। সাইড হিরোর ঘোল। এখন হাজার সাহেক করে নেবে। প্রোপার্টির আরক পরোপারি বলেছে এসাপেশাল মিলও নেবে। মানে টেলিনকুমার যা খায় আর কি। আপনের হিজাপনেও টেলিনকুমার মিল মধুনিমায় পাশেই আমারও নাম ছাপা হবে। কেলিয়ারিতে মেলে আলাদা ঘর। ঘরিয়ে নই করার পরই ঘোমারে ঘরে তুলব। ঘোমার বাপ-মাইও আমাদের সঙ্গেই থাকবে। একটা ফরজের ঘোক ঘেপে যেত। একবার খাটপটনি করতে দেব না ঘোমায়। তুমি রানীর মতো থাকবে। একটাই কাজ ঘোমার — শুধু আমাকে ভালবাসবে। বাসবে ঘো?

এক থালা ঘোরেন্ত আন্ড। জীবনের আলবাসা। আজানের আন-ঘেরোনি অনির ঘোখের সামনে সুখের জলপাল নাচিয়ে যাচ্ছিল তখন।

অকারণে ঘড়ঘড়িয়ে উঠেছে: এ কী! এ ঘে! এতক্ষণ যে মুখটি ভয় ঘেখাচ্ছিল আমে, এ যে মাই-নাম-ওলো অন্য কেউ। ঘেই প্রথম ঘেটুকু আপন লালসায় অনিকে ঘেরে ঘেলেছে। অনির বারা ঘেয়ে ভালবাসে শরীরটা এবার ছিড়ে। অনিকে প্রায় টেনে বসে ঘেয়েছে। ঘেদিন অনি জীবনের ঘে নিয়েকে ছড়িয়ে ঘরে ঢুকে দিল দিয়ে চিৎ খেয়েছিল, জানে না। ঘর ঘেকের ঘেলমন একটা দুঃস্বপ্নবালা ৬-৩ ঘরে ঘেয়ে উঠেছিল। ঘেদিনের পর ঘেকে ওয়ার ঘোষে দুপুরি চাকাওয়ালা মরে ঘেল।

অনেকগুলো জীবন ঘেয়ে পরে ঘেল। একটু বা চালালেই ডি.ডি.সি. ধানেলের ওলর লিমেন্টের চাকার। চাকাগুলো ঘেকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই অনি টের পায় তার ঘোটর নড়িভূতি ওলো সাপ হয়ে গেছে। চাকাগুলো বিষু সময় ধরে থাকার পর অনির শরীরে ধানিক পরে ফিরে আসে। পুনরায় তার বৃষ্টি মনলের ঘেক-মই হাতে। কখন ঘেন বরফ ঘেমেছে। চিবুকিতে ঘোৎখা আর কয়েকটা খড়কুটো উঁড়ে ঘেল। এই মুহূর্তে অনির ঘেন প্রাণে না মরে হয়, তার নিস্পৃহতায় এই মাঝারী চরাচরের বুকে অনুপম কুয়াশার মতো অভিমান ঘেমে আসছে। ফিসফিস করে বলে ওঠে অনি— বাবাটা আমার ঘোলে নিয়ে ঘেছিলেন একদিন এরকই সব সাঁঝবিকালে ঘলে ভাসত। আকাশের তারা, আইশালা, লক্ষ্মীপেচা ঘেনার। বরফ-এলের মধ্যেই নাকি ঙপাশন নিয়ে থাকেন। সেই ঘোবনেরই অনি কখনও ঘোখ খুলে ঘেখি না, আলমারে পড়ি না। তা ঘোমারই বলো ঘেটে অহোরাত্রি নিয়ে নিয়ে কি ভালবাসা যায়! ঘোকাহরা ভাই আমার, ৩-টা পালানোর পর এই আমটুকুন বয়সে ঘেকে বিড়ি ছাড়া কাটকে জানে না। মাঝে মাঝে বড় পুকুরের ধারে নাপড়েলের আমুলটার আলা জড়িয়ে বসে থাকে। আকাশে-আকাশে

বুলেন চুমুক দিয়ে পাকলাহা খুঁজে বেড়ায়। সেই ফোকলামি দুটো কটি কী ধুনি নিয়ে যা যা বোলে কাইজ্যাবাদাম খাটে। ওইটুকু ছেলে, যা ভাবে দিই তারে কুকুরবাচ্চারও সেই ভাবে না, তবু জিজ্ঞেস করে — মিঠি খোকা ভাবে তো তুমি?

এখন দিকে আবরাশখে শরীরে অনির ভেজা দৃষ্টি। সেটা নামালেই এই চরাচর খিঁচে-খুঁচে সেই ফোকলা সামনে এসে দাঁড়ায়ে।

ঝিল-পা থেকে আসা গো-বলি বাই মহেশ্বর নায়সী ফোকটা। বিকেলের দিকে শিমুল ফোকানে বসে ফুক-ফুক করে সিগারেট টানে। কাঙ্কনমালাকে বাড়িকে দেখলে ডেকে দোড়ো মিষ্টি খাওয়ায়। পৌঁছাকি কিনে দেয়। আদর করে। বারকয়েক সে অনিরও কাপড়া ফোকে পরাতে অনির তা দিনদিন অন্তে উঠেছে। কথা এলে ফোক ফটিকে ছেলে পাড়েছিল —তখন এক হাজারের পুরস্কার। মুখরপাড়া বাজারের খু-উ-ব ভালবাসে অনি তারাইকে আজ কাজে বিকেলিল এ ফোকটা ভাকবলে একদম বাবি না।

তা আজ অনি সকালে বেরিয়েছিল। নাশতে খাড়িয়ে। এরাকিন ওরা ছেকে পাঠায়। আত্মীয়-কুটুমের দল এসে হৈসেলে ফোনাড়োর কাজে। আয়ও এয়োসেটা। বিনিময়ে মেলিনটার মতো দু-বেলার ডাব-ডাবকারিটা জুটে যায়। পর জাতে ভাইটাকে একটা পাটিকটি দিয়ে নিজে উঁপোসে ছিল। আজ তা জুটবে — ভাইপোনে তারপেটি আমার ফেকে, এই ছিল মনোবাসনা। তা খুশুরে বাড়ি ফিরে এসেছে। তারই কিসান শেষ হুপুরে। ওর যে ফোখনুটো দেখলে অনির ফেকরটা ভাকিপাক করে ওঠে, সে ফোখে তখন একরাশ ভাকড়াস। সঙ্গে-সঙ্গেই একটা ঘটনা নিয়ে কাজে টানার পর ফোপোড়ো কটি মুখটাম দিয়ে ভাসে করে নজর করাতেই তার হাটি হাটি কাঁপা। ফোক মাজে যেমন ফোখের পাতা মুড়িয়ে না আসা পর্যন্ত মিনির কাছে একটি আসলে করে যায় — তেমনই টুকুস টুকুস সব বলে ফেল। ওনতে ওনতে অনির ধরফর করে আসছিল ক্রমশই।

তারপরে যে ভাইফের ধুলধুসে পাটিটা একটানে ছিঁড়ে-খুঁড়ে ফেলেছে। ধাপ্পড়িলটাও। লোকটার বেওয়া পরনে জাকে আল মাছের ফোল খেয়ে ভাইফের পেটিয়া ইটেকুর। খুশালে নীল শিরাগুলো স্পষ্ট। কটি আসল, পিঠে, পেছনের নরম পাছায় লোকটার বাঁড়খেঁ আবরণে বন্য হিংস্রগুলো দেখতে দেখতে অনি শাবর ঘরে গিয়েছিল। মার খাওয়ার পর নিমকাল ভার আসে অভিমানে হা-ক্লান্ত ভাইটা তখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিল! অনির বুকটা হাত ফোল-কাটা উঠেছিল। বিকেল ঘনাতে তখনই সে প্রথম জানল, ফোরের মুর্খর পাল মাখতে মাখতেই ওঠে।

এখন মুক মাছের মতো কাল শরীর নিয়ে একে একে ওরা সামনে এসে দাঁড়ায়। বিনাশ বাসনার মতো টান ফোরে ফেরে আসে সন্ধেবাতের আকাশ, ঈষৎ কুয়াশামাখা ধানের ফেত, কলা টাব। যে টানে জিব্বেশ আজ অন্তবাসকে খোঁজায় চেষ্টা করে অনি। ফোটিলেলের আসার সাথে একবাশ তনিবাস্ত নিয়ে মাসের লোভানের সামনে সব কাটি এক পাঁতা দেখেছিল। ছাল ছাড়ানো সামান্য কলাচে হড়বড়ে শরীরটা তখনও ফোমহ্ন থিরথির কাঁপছিল। এই মুহূর্তে অনির ফোখের সামনে সেই মুণ্ডহীন মুলমুলে জন্তুগুলো এসে হাজির হয়। অনি চিৎমিচিয়ে ওঠে — আমার পাল নিও না। আমে দোষ। নিজা দোষ। আমার আয়ত আমে। কাউকে টানব না। বিশ্বাস করো।

তারপরের সঙ্কে কথা শেষ হতেই বিজয়বাবু এসে সামনে পাঁড়ায়। এ ভল্লাটে জুড়ে তারপ খটিয়েদের মানুষ। খান-পাটিকারুরা সব হাতের মুঠোয়। মস্ত আড়তদার। হাই ফোরে পোস্টিল পাশও আছে। পাশে বাবা। সঙ্কে হলেই ট্রাক-লরির ড্রাইভার খালাসিদের মেলা বসে যায়। মদ-মেয়েছেলের আসরও চলে অবশ্যবিধে। ওটা নাকি বিজয়বাবুর ফাউ আলো। এলাকার মানুষ জানত না। জীবনে আগে বিজয়বাবুর আড়তে কাজ করত। এরপর অনিকে বাবার নিয়ে নিয়ে ভালমন্দ খাইয়েও ছিল। বিজয়বাবুর আত্মীয়ের নিয়ে নিয়েছিল সেদিনই। ফোকটার ফোখদুখ দেখেই অনির হিসু খুকরে আর বাকি থাকেনি। তারপর থেকে ও-বাড়ে পাঁড়ালেই এই-হাত আখনে বিজয়বাবু ওকর করেছে অনির। অনি নাকি গেলেই ভাল একটা চাকরি দিবেন। মেয়ে ফোজপাহের স্কুল বাস। আরেকটা যে কী, অনি ভালআখেই বুঝে গেছে।

তা সেই অপরূপ বিজয়বাবু এখন হিংহিং ওকর টানতে আখনে অনি জিয়িয়ে ওঠে—এই বিজয়বাবু অমন টানা-হাঁচড়া করো না। ফোমার আজটা আমার চাই-ই চাই। আপটা হাজার পাটিতে সাথে পর আমি অন্তদিন যে ফোমার ওপ ফোয়েছি। ভাইটা আমার সোহাগ ভার জয় মাছের ফোল খেয়ে বড় আপনাকে ফোমার ফাকে এরপর আর অনি কাউকেই ভয় পায় না। ফোমার কুটি ভাইফোঁটাগুলোই বলো, কী কুদিন বাবারকের মনুষগুলো — ওটাইতেই নে বাকি মুফোসেই মুঠো ভাঁটি টাকা। এনি আটকে ঠকাবার না। সবাই বলে ফেনী-মেনী ফোখমুখ আমার। এত আফোসেটা উঁপোসেও ফেখ কী চাকুমান-টিকুমান শরীর। মানে আমার বড়ই নরম ফে। ফোমার জ্যান্ত কাকের ভরোবাবে আমার একটা খটি কাজে লাগ গো।

অনি ভলেছে অক্ষরে পর হাতের একটা খুশলিয়ে বসে বিজয়বাবু আসটাল খায়। অনি উঠে পাঁড়ায়। বিজয়বাবু ভালি বাজ মানুষ। ভাইফোঁটে ওইসব একটু আপাই মাজ ভাপাতে-ভাজা পড়ে। ওকলাল। জিনের ফোপাতেই ফোখে জা ছমছম ভাবে। নাজ বিকেলে ফো বাটাই। আজ কিন্তু অনির একেবারেই ভয় ভাসাল না। বিজয়বাবুকে কী কী বলবে, ভাবাভাবি পটি-পটি সাজিয়ে নিতে নিতে ওর আপাতের দিকে গোঁটে চলল।

[ভাসান্তর ১১ পৃষ্ঠা অবিভাজ্য]

মুখোমুখি

মনবেন্দ্র পাল

আসছে না।

ওর হাতে পেন্সিল ধরিয়ে দিলেন ঈশ্বরীয়। তারপর বললেন — চেষ্টা করো, নিশ্চয় পারবে তুমি।

— না, আমি একটুও চেষ্টা করব না। আমি কিছুই বলতে চাই না। আমি শুধু দেখব।

ঈশ্বরীয় হাসলেন। ঠিক আছে। পারিয়ে ওঠো।

একটু একটু করে ঝুঁকে পড়ল মেয়েটা কাগজের ওপরে।

— একটু ঝুঁকে এসো। ঈশ্বরীয় হাত ধরে টেনে আনলেন।

— আমার মায়ের সঙ্গে কেন যাচ্ছ তাও কিন্তু বলতে হবে।

— বাবা পেন্সিল নিয়ে যা খুশি করবে।

— তাহলে? আবার ঈশ্বরীয় চোখাচোখি হলেন মেয়েটার।

মেয়েটা একটু ভাবল। তারপর ঈশ্বরীয়র দিকে তাকিয়ে বলল — তুমি।

— আমি? পুলিশের পোশাক দেখেছ?

— হ্যাঁ, পুলিশ মানেই তো আমার সঙ্গে দেখা করতে যায়। তোমার বাবা ও পুলিশে কাজ করে। শুধু ওকে নিয়ে মুশকিল হচ্ছে যে ও বাড়ি থাকে। তাই আজ আমি নিজেই এসেছি ওকে নিতে।

পুলিশ তো পরীক্ষার হলে ঢুকলেন। কিছুক্ষণ। তারপর বিক্রমের কাছে এগিয়ে এলেন — দেখো ওপর এখনই যদি টান তা হলে ওকে নিয়ে নিয়ে যেতে আমাদের কষ্ট হবে।

ঈশ্বরীয় দুষ্টুমিতে আত্মহারা হয়ে বললেন — জরিমানা ওকে নিয়ে যাব?

একটু ভেবে ভদ্রলোক বললেন — কিন্তু ওকে রাখবে কোথায়? আমি তো শহর ছাড়ি জরিমানারই একটা হবে, তাই ভেবেছিলাম।

— তা হলে অন্য যা হোক ব্যবস্থা করো। একজন ভদ্রলোক আছেন। তাঁর নিয়ে যেতে বলেছেন, ওকে আমি চাই না।

— কিন্তু তুমি একলা থাকতে পারবে?

— আমার ভালো লাগবে, ভাবতে হবে না।

****

আজ একদিন মধ্যরাতকে ফোন পেয়ে শুটকেসগুলি হয়েছিল করে এসেছি বেরিয়ে গেলেন।

আজ তুমি অনেক উজ্জ্বল।

— ঐ মাঝে বাদি, কে এসেছে?

ঈশ্বরীয় দেখলেন একটু দূরে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে পুলিশ মা।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন ঈশ্বরীয়।

— তুমি?

— কি ব্যাপার? মোটে ওতো ঘরে ওকে তো একলা এলা ছেড়ে দিতে পারি না। তাই

পুলিশ বললে — এসি, ফিরে (অসমাপ্ত

— ইস, চলো।

তারপর স্ত্রীকে বললেন — তুমিও চলো।

— না। তোমরা যাও। আমি বাড়িতে দাঁড়াচ্ছি।

কিন্তু পুলিশ শুনল না। জোর করে তাকে টেনে আনল।

ওরা এসে মেয়ে বসল পাশাপাশি। মেয়েটা ভাবছে ঈশ্বরীয় কিছুও পুলিশ মা ওদের সঙ্গে বলছেন না। বসলেন সামনের সিটে।

মেয়েটা প্রায়ক্ষণ স্ত্রীর দিকে এগিয়ে দিয়ে ঈশ্বরীয় বললেন — কী খাবে বলো?

— যা তোমরা খাবে

ঈশ্বরীয় তখনই বয়কে ডেকে যেটুকু দিলেন বিক্রমের নির্দেশ মতোই। আজ যেন খাঁচা পাখি একটা আনন্দে।

তিনি ভেবে বললেন তো তুমি ওকে তোমার কাছে রাখতে চাও?

— হ্যাঁ, চাই।

— কিন্তু ওর বাবা-মা?

— ওরা ওকে চায় না।

— কেন?

— ওরা ওকে ভালোবাসে না।

— কেন?

— ওরা ওকে ভালোবাসে না।

— কেন?

— ওরা ওকে ভালোবাসে

স্বর্ণ-তোরঙ্গ

কুণালকিশোর ঘোষ

আকাশ যে কালো করিয়া আসিয়াছিল তাহা নহে। হঠাৎ ঝড় উঠিল। আমলকী গাছের পাপড়ে সুধারানী চমকিয়া যায়।

— হায় গো মা। ই কি! আমি যে বড়ি দে এয়েছিনু! বড়ির ঝিকুরে লক্ষপক্ষ করিয়া তখের লাইতে আসিয়ে আসিতে বাঁশির আওয়াজ কানে আসিল। সুস্পষ্ট, এমন কথা হলফ করিয়া বলিতে পারে না। নবজাতক শিশুর ক্ষুধার্ত কেহ যদি ক্ষুধাহীন চাপড় মারিয়া বন্ধ করিতে চায় — এমন এক শব্দ হচ্ছিতে ছিল। খাঁ খাঁ... খিঁ__ খিঁ__ খিঁ খিঁ লক্ষ__ লক্ষলাল। সুধারানীর নাড়ী ছেঁড়া ধন। একনাগাড় সন্তানের বাঁশির সুর কানে লইয়া সুধারানী তখনও শাড়ি তুলিতে ভুলিল। বৃষ্টি আসিয়া পড়িয়াছে।

হঠাৎ আসিয়া যাওয়া ঝড়-বৃষ্টি, মায়ের ঘর-গাছের ফলন, তোলা কিছুই লক্ষকে তাহার বাঁশরী হইতে মুখ ঘুরাইতে দিল না। একনাগাড়ে একঘেয়ে। তখনি বাঁশি কেন সুরে বাজে না?

ঘরের চালে বৃষ্টি পড়িলে শব্দ ওঠে না। মাটির ঘরের সবজার জলনালা হইতে অবিরল ধারণের মিঠা নলের গায়ে পড়িলে একনাগাড়ের নবজাতক বাঁশরীর কেমন স্তব্ধ হইল। বৃষ্টি পড়িতেছে। মা বড়ি সামলাইতে ব্যস্ত। এ-দৃশ্য দেখিতে দেখিতে লক্ষলাল এক অন্যে বালক বয়সে হাজির হয়। মিষ্টি! আমলাছ-তলা! তার পরেই তো সেই উথালি-পাথালি পুকুর। একদমে — এ পুকুর পার। এক লহমায় লক্ষলাল অনেক পুরোনো ছবি দেখিয়া যায় —মা, বাবা, সাপ। সাপে কাটা বাবা। নিধন না। সাপের আক্রোশের দিন লক্ষলাল প্রথম বৃষ্টি পরিয়াছিল। এক জোড়া কেমরা বৃষ্টি আনা হইলে, সুধারানী কলোলপড়ে শাড়ি ছড়িয়া কোরা বৃষ্টি তুলিয়া নিয়াছিল। লক্ষ সেই সময়ই হাফ-পেন্টুলুনের পটি উঁচাইয়া দেয়।

শাড়িমাটি ছড়িয়া সুধারানী আওয়ার কাছে আসিয়া দেখিল, বড়ি কটি উঠিয়া গিয়াছে। লক্ষ দেখিল মায়ের অঙ্গে সেই ছাপের নিচের কোরা বৃষ্টি। ঝড় থামিল।

সুধারানীর দু-চোখেই পড় শিশুটি। ছেলের কষ্ট ধারার সেই চোখজোড়া শিশুটি বুঝিয়া গেলে মনে মনে শিড়শিড় করিল, আবার, ২৫শ কিশোর। আহাঃ কেরী ঠাকুর যেন বাঁশি চে পাতো বাজেছেন। নিজের ছিজা কালের কথা যেমালুম ভুলিয়া গিয়া লক্ষের উথোপো বলিল — তোর জন্যি তেলের পানা বানালুম যে ... বিকেল বিকেল খেইছিস। কী মিষ্টি মানুষ।

লক্ষ জবাব দেয় না। মিষ্টি মিষ্টি হাসে।

বৃষ্টি পড়িতেছে। ছাতাহাতে লক্ষ এক আকাশ আকাশ দেখিয়া দুইটি মেয়ে একসঙ্গে আঁধিয়া ফেলে — বিউটি বক দুইটি বলিয়া। সন্ধ্যা নামিতে অনেক কিছু বিলম্ব আছে। কী আশ্চর্য! দুইটি মেয়েই লক্ষ পুরো নম্বর লাভ করিল। আয়নাকে অভিনন্দন জানানো বৃষ্টি, আয়নাকেই বক হয়। সন্ধ্যা হইতেও আছে নাই। ঠিক এই সময়ে লক্ষণ যা ফেরী পায়। বিদ্যুৎদি ভাবনে পাঠিয়েছে। ঘরে মা-এর শাড়ি নাই।

সুধারানী এ ফোন, যা ফোন হাতড়াইয়া তাহাকে লক্ষাল, ঘরে পুরা টাকাও ফোনে আছে। খুসরা পয়সায়। লক্ষ এই বড় হইয়া গিয়াছে। বাস খোয়ালো এক কুড়ি দুই। এত টাকার কাজে কি চলে!

বৃষ্টি থামে। লক্ষ থামে। ঘুমরা পয়সার টাকা লইয়া ইলিশিনের দিকে গেলে সুধারানী বৃদ্ধি করা ওকনের পাশের ভাঁড়ে আলির ইঁড়িতে চাল বসাইয়া দিল। সন্ধ্যাসের আলু বাঁচিয়া গিয়াছিল। তাহা আলে ভাজিয়া দিলেই হইবে। কৈবর্তপাড়ির মেয়েছেলের হোঁ-আছে দেখলে হয় বাই ঘটে, আজ দুপুরে তাহারা বাড়ি মাছের ঝোল পাঠাইয়া দিয়াছে। বৃটি পেটের পক্ষে যথেষ্ট। মা-ছেলেতে খাইবে।

লক্ষাল। সুধারানী। অনাহারে ছাকে মোনরা নাকি নিয়মপালন। জাতীয় আচার-আচরণে তো দেখা যায় ছোনরা অনেক কঠোর উপবাস। বিধবাকে মাছ খাইতে নিষেধ করিয়াছে। আচার মুখে স্বাদ ফিরিয়া পাও। ছোনে পাড়ার সকল পরিবারকে দেখ, ছোনে-ভরাল-লক্ষাল সকল পরিবারের বিধবা আন্টি-দিদি-মাসিরা উপবাসের মুখে আদা খাইয়া ছোনে সুখের মুখে মাছ-কাল, আছ-ছোনে আছ!

ছাত ঝাড়াইয়া থালি আছের থালি ছোনে বসাইয়া দিল। তরকারি পাতার আঁচের গন্ধের সহিত মিশে মাছির মাছের গন্ধ মিশিয়া মিয়া ছোনে এক পুরাতন গন্ধ তুলিয়া আনিতেছিল।

ঠিক এমনি সেই ছোট আলোর মিকেল-মিকেল। আমি মহে হতো পোরাতো নতুন দিয়ে কথা যায়। বী আছে দিদি এসে সব ছোনে গাছে নিয়ে! কী আছ যো মা! মিনি ছোছে ছড়ানোর মতুলের বাজার ঘর বানাতে। বাজারঘরে নাকি বিজলী বাতি জ্বলবে, ছোনটিক পাখা ঘুরছে! কী অসুখরে কথা! আ মিষ্টি ঘর বানাছে, আর আমে ছোনে ঘরে। এ পাড়ের মিস্ত্রিটি চিনিনে। এমন সময় হৈ-হৈ করে ছুটে আসায় এসে কেঁড়াল। আছকরা এই এতখানিটা এক আলছোনে মন্ত্র। মিকে মাকা, মিজে গা। হেঁপাতে হেঁপাতে বলে, এত হাঙ্গাম ছোনরেই আমাকে আনো করে দিলুম। বুঝলি। এখন ছোনটিক মিস্ত্রিগিরি আছ। আ বড়মানু কলাছেন — আমে কুটুম খাবে। দু-ছোন আল আনাছেন। মাছ দুলে ছে ঢুলে আসছিছি, বাবু বলে দিলা, ও পৌরা নতুন যে করোছিল চলাতে পাই। নে, এই আলটা নিয়ে যা। আমে পৌছে দিবি।

এক কথা দুইয়ে দুইয়ে কতবার যে বললে আর সঙ্গে হয় হয় হবে। নাতির পাল ফোন কেঁপে কেঁপে ওঠে। নিজে হাতে মাছ ছোটো, পাঁচে বটা কথা কী যে ছলছে ছোনটা ... আমার সময়, ছাত বলি, আর নয়। এবার আসা যাও। পৌরা করে থাকে, দুই আমার ছে-কথা মাল ছো হয়েছে কী, ইঁদুর ছাতে কি না ছল? চেয়ারখান আছ খেয়ে পালিয়ে না! কী পেটিয়ে! পেটি বড় কথা। পেটি বড় কথা ... বলতে বলতে এই এয়া আছ-মাছ গন্ধবাহিনীকে নিল। আহাঃ ছো! কী অনুভবই ছিল ... ছন্তে আমার পাছে আঁচ ছাগাতে নিলনি।

লোহার কড়া হইতে চড় চড় আওয়াজ উঠিলে সুধারানীর ঘোরঘুর ভাঙিয়া গেল। হায় ছে যা! মুখে পড়েছিলুম নাকি! মা-ছোটার রান্না শেষ হয়। অন্ধকার জাঁকাইয়া বসে। আকাশের ছোনে ছারা! আঁধার গাঁয়ের দু-একটি ছোনবাতির আলো, ইঁদিকে হাল আলো আছকারকে ঘোলা করিতে পারে না! আজ অনেক বছর পর আবী আসিয়া সুধারানীকে এমন বিকল করিয়া দিয়াছে। আজকরা মনে হয় — এতে নক্ষর যে মিয়ে ঘরে টুকটুকে একটা বৌ ছে আসি। হাত ধন হয়। সুধারানীর জিভুনি আসে। এক ছোনে হেরিকেনের আলোয় কমানো আলোটা বাইরের আঁধারকে ছেন আরও ঘন করিয়া তুলিতে আছাড়া করে। বিদ্যুৎদি আওয়ায় সুধারানী এই আলো-আঁধারি বাওয়ানে বসিয়া আমীর আছে কথা বলে। কত কথা!

আমী বিদেশ বিভূঁ যে আঁধিয়া গিয়াছে এমন নয়। আমির এই বাসায় বাড়ি, বিয়ের ছো বাড়ি আর বিভূঁ আছের আমিন। চাল, ডিল। ঘরবাড়ি এখনও শর্ষে ছো ছিনিতে হয় না। ঠিকমত ছেয়িলে বিভূঁ পাওয়া আসে — তুমি রাজ্য চালা। বিদায় আমীর উছেশ্যে কথাগুলি বলিতে বলিতে ঘুমঘাওয়া সুধারানী লক্ষের গায়ে এক হাত, এক ভাত তুলিয়া ছেয়। তাহাতে উপর আছের বড় বড় টুকরো ছেলিয়া লক্ষাল বড় আদুরের সহিত খোয়াতে ছিলিতে থাকে। নাড়িছেঁড়া বলতে এই আদুরের সহিত খাইতে ছেখিয়া সুধারানীর বুক উলছাইয়া পড়ে।

ছাতাহুলো ঘরের পুরনপ্রদান হইল সোনের আটি। তাহা অবশ্য বাঁধা ছিলেন। সুধারানী মাকে মাকে আমী অবাক মানে! ছেখাপড়া শিখিয়া ছোন ইটি-ছোনা ছিনিবে? আমার এক টি ছেলেনা! ছেমন কায়াটি গায়ন, বল মিটি! দশটি নয় - পাঁচটি নয়, সাবেকন আমার এক ঠিকাদারের থানি ছেলিতে যাইবে ছোন দুঃখে? পৌরি মিস্ত্রী কি বিভূ বাধিয়া যায় নাই! অবাক মানে সুধারানীর ছোনাল পড়িল, ইহাই করিয়া আমীর নাম ধরিয়া ছেলিয়াছে। এতখানি ছোনটা ছিলিয়া, এতখানি ছিনে বাহির আসিল।

লক্ষাল হইতে তখন অনেক বাকি। গাছের আলোর পাখিরাও চক্ষু বন্ধ করিয়া

মোহমুদ্গরে পরিণত হয়েছে। সুধারানীর ঘুম ছুটিয়া গেল — আজ নন্দের বিয়ে। সেই যে মনে পড়িয়াছিল — তারে একটা টুকটুকে বৌ আনিব সেই দিন হইতে এক-একে বলিয়া এ গাঁয়ে ও গাঁয়ে কত চালচলনটি ঠাহর করিয়াছে বটে!

নবীন ঘোষের বাড়িটি চাহি। তারে বিনা, কাজকারবার নিয়া। তবু পরি ওটিকয় ঘুম সম্মানও আছে। উপরি, ইটি কলিজা। সুখদাই, সুলক্ষণা। বাঁজাঘোষের পড়শিরা ঘরেই বন্ধুক — টানা, সুধারানী বেখিয়াছে — মেয়ে আসার লক্ষীসোনা। বন্ধ সুলক্ষণ সে! সুধারানী জানে না, স্বামীর মৃত্যুর পর হইতেই তাহার দৃষ্টি কেমন যেন ঘুরিয়া আসিয়াছে। অবচেতন মনের কোনো নিগূঢ় দুঃখ কি তাহার দীর্ঘ দৃষ্টিশক্তি হরণ করিয়া লয়? অবচেতন মন যে কোন বস্তু তাহা তো সুধারানীর জানা নাই। যাহা হউক, সেই আঁধারঘেরা অন্তরালে সুধারানী খুব স্পষ্ট করিয়া কিন্তু ছবি দেখিতে দেখিতে শয্যা ত্যাগ করিল। নবীন ঘোষের কলিজা জলাটি ভারী সাদুক। নবান্নের উঠানের কোণায় তাই পাকা কলাগাছ, তোরা গাছগাছন। নতুন কলির গন্ধ এখনও রহিয়াছে। ঘরের চাল টিনের হইয়াছে। আজ সন্ধ্যায় নন্দের সহিত একপাল মানুষের যন্ত্রণা শুধু নয়, এ গাঁয়ের প্রায় পঁচিশজন, বরযাত্রী সাজিয়া নিমন্ত্রণ খাইতে যাইবে। আরও আছে। স্বর্গীয় গৌরচন্দ্রের যেন কোনো প্রকার অযত্নআদর না হয়, সেই চিন্তা করিয়া নবীন ঘোষে একান্ত গোপনে সুধারানীর হাতে পাঁচ হাজার টাকা গুঁজিয়া দিয়াছে। — বৌ আসার খরচ। জামাকাপড় ঘড়ি, ঘোড়াদৌড়, আংটি, সাইকেল তো নিয়মের মধ্যেই পড়ে। কিন্তু মিঞা কলার ঘুরণ —

কথা ঘোরের সুধারানী বলিয়াছিল, বাবা আমি কি এত বুঝি! তাহার কথা থামাইয়া দিয়া নবীন ঘোষে জ্ঞান ঘোষণার তাহার সারমর্ম এইরূপ — আমার ঘরে টাকার বাক্স পড়ে। এই দেখি একশো বুশো তিনশো। ঘুম থেকে উঠেই দেখলুম, এক হাজার, দু-হাজার, তিন সব এই জড়িয়ে গেছে। বন-মর্ষে-জলু, আরও কত আছে! তাই মেয়ের হাতের বালা, বাউটি। বাহুর শাসা। গলায় তিন ভরি হার। নাকের নাকফুল। ঝলমলে। তুলসোনের ঘুংনি। সব পরা সোনা দিয়ে গড়িয়ে রেখেছি।

একবারে এত গহনার কথা সুধারানী জন্মেও শোনে নাই। তাহার চক্ষু দুটি স্থগিত হইয়াছিল বটে, তবে তাহা নত থাকার মেথা যায় নাই। কেবলই সোনা সোনা শুনিয়ে শুনিয়ে তাহার কান দুটি ঝালাপালা হয়ে গেল। তাহা না হইলে নবীন ঘোষের শেষ কথা কটি — আমার টেঁপি মেয়ের চোখ টিকে যেন সোনা ছাড়া দেখে — কি তাহার জানে আসিবে না!

ঊনবিংশতি

বসন্ত বাতাস বহিয়া যায়। রাশি রাশি বকুলফুল এতদিন অযত্নে অবহিত বৃক্ষতলেই ওকাইয়া যাইত। মালতী আসিবার পর তারা বকুলের বড় ঝুড়িয়া নিয়াছে। নবলব্ধ জীবনসঙ্গিনীর কুশিষ্ট আদরে নবলাল এখন প্রায় প্রতিদিনই মুঠায় ভরিয়া ফুল কুড়াইয়া আনে। মালতী যে তারা গাঁথিবে! ফুলের মালা। ফুলের বোতাম এ দুটি তরুণ-তরুণীর জীবন যেন এক অজানা আনন্দে ভাসিয়া ভাসিয়া যায়। — আহা! কী আনন্দ! স্বামীর বুকের ভিতর মুখ গুঁজিয়া ফুল-গন্ধ লইতে লইতে মালতী এমনই বলে হয়। উঁচুতলের ঘর দুইটির কেবলই ওঠন আর ঘোমা হইবার শব্দ শিহরাইয়া বাহিরে আসিয়া পড়ে।

ঘরে যেন মা লক্ষ্মী আসন পেতেছেন — কথে কথে এ কথাটি সুধারানীর বুকের ভিতর ঘুরপাক খায়। ঘুরপাক খাইলেই সে না যেন! বধূ আসিবার পর দিনের ভিতরেই অন্দরমহলের চালচলি হইয়াছে। নাকাল্লে ঘরের হস্তে এতগুলি টাকা দিয়া অন্ন হলে — আর বিড়িবিড়ি এসব লাগবে উঠার কোথে যোগাড় করিতে হাত দেবে। সুধারানীর আর চক্ষু ফাটিয়া সবকিছু করিয়া অন্ন করিয়া শান্ত। অনশ্যান্ত। পুরোন ঘাস বাড়িনো সাজাবে উঠার কোথে যাকুব ঘর! তিনের প্রোপ্তক নবীন ঘোষের লিস্টি মেলানো ফলিস্তার। মধুমহাদে পোলিস ভিতর অনাগত নব-অন্নকাল! সুখ যেন সকল দিক হইতে ছাপাপাশ বৃষ্টির মতো ঝরিয়া পড়িতেছে। এত সুখ কি সয়া হইবে? সুধারানী যে ক্ষীণজীবী ঘোষ মুখের মতোটুকু তবু দুঃখ হইতে দেখিয়াছে। তাহা তাহাকে, তাহা শরীর লইয়া যখন তাহাকে সংসার ঘোষে ঘর হইতে শুরু করিয়াছিল তখনকার দিনের কথা মনে পড়িয়া গেল। কী আশ্চর্য! হাত হাত পুরুষকে কেমন অবলেলায় দুই হাত দূর একটি কালরোগই ঠিকানা ভুলিয়া দিল!

ইলিনি সুধারানীর চক্ষু দুইটিই কি তবু ঝাপসা দিয়াছে? অর্থাৎ যে কেমন ধারা আবোল-তাবোল ভাবিতে পারে তারা না হইলে সেদিন একথা ভাবিল কেন? সেদিন এ গাঁয়ের মধু তারার নবগ্রামকে কী এক যাদুর বিয়েবেলাকে কথা জিজ্ঞাসা করিতেই মন্ত্র উঁকি মেরিয়া দিয়া মধুকে কেন মুহূর্ত কথা শুনাইয়া দিল। মধু একেবারে ভড়কে কী যেন বলিতে দিয়া বলিতে পারিল না — তোমার টাকার মধুর এই ফিসফিসানি সুধারানীর কানে কিন্তু আসিয়াছিল। সুধারানী অবাক হয়। কিন্তু বুঝিতে পারে না। — যাদুকালের সঙ্গে নন্দের কী সম্পর্ক! দিনান্তর আসিল তারে এসেই তো ঘোষের ঘরে সেঁদোবে। নন্দের আসল টাকা তোমার? টাকা তো আমার হাতে তুলে দেয় —

ঘেসিয়া যাওয়া পুরের উঁকোনো

হইল ও চলে। বাপ আসায় বলি মুখটি কী! আহার কথায় মনোরমা নিজেকে আড়ালটায়া লয়। কোনো কথা কয়ে না। শুধু সেই মিঠি মিঠি হাসি হাসে। মৃত্যুরানীর ভয় কিন্তু মানে না। কেন জানি মনে হয়, নন্দ কেন মন্টুকে আড়াইতে পারিলে বাঁচে।

মিঠি হাসির পুত্র - জবা পেটের বন্ধুরা - পলাশের মন্টু ও তিনটি ছবি একসঙ্গে দুলিয়া দিয়া কেন যে মৃত্যুরানীর বুক হইতে একটি দীর্ঘনিশ্বাস বাহির করিয়া চলিয়া যায়া সে জানে না।

******

হেই কেন শেষ হইতে চায়েনা। খাল-বিল-পুকুর সব ভর-ভরন্ত। আলটীন অবস্থাও তাই। এতগুলি ভলতে সেটি লইয়া তাহার টানাটানি বাধ হইয়া পড়িয়াছে। মন্টুর মেয়েরা সন্দুক আলিয়াছিলেন। যাই এর পরিবারই হাসপাতালের কথা বলিয়া পাঠাইলেন। কারণ তাঁহারাই প্রথম প্রমন বলিয়া জানা। আলটীন সকল আজ মৃত্যুরানী এখন নিজ হাতে তুলিয়া লইয়াছে। উপায়ও পরিস্কারে তাহার একটি নাই। এই ভলতের বর্ণার দিনে মনের মতো করিয়া কিছু কি করিবার জো আছে। মনে পড়িয়াছিল, আগের প্রমন-আলটীন জন্মে প্রতিদিন দু-বার নতুন শুদ্ধ রাঁধিতে। উহার ঝাল ঝালিয়া খাওয়া মুখে ভাল কিছিয়া আসিতে পারে। কিন্তু এমন অসুখ! নন্দর আলিসের হাত ভাঙ্গ করিয়াছে ...

ছোকরাদের জিম্মুক্তদের জন্য মন কিরা আসার পর হইতে অনেক কিছু ভাবিতে শুরু করিয়াছে। এখন যেন তাহার অনেক বন্ধু। মহাকরণের অনেক বাবু পড়িয়াছেন। জাতের অর্থাৎ যে যা আতঙ্কবাদীরা আসল ঠিকানা। সেই যেমন অর্থে চক্ষু পুড়াইয়া মহান্ত আলিপন-দ্বারে নামাইতে নামাইতে মৃত্যুরানী নিজে মনে বিড়বিড়াইতেই থাকে — ই কী হাতের মা গো! আজ বাপ কাল বৌমা জামাই হাসপাতালে যাবে। সবগুলি একদা পুড়ুর হয়ে যাবনে ...

বিড়বিড়ানো শুরু করিয়া পুত্রের আলিপন-দ্বারে পৌঁছাইয়া যায়ে। নিচে। কলের খোলায় সব সাজানোই আছে।

কী আশ্চর্য! নিচিতে হলিয়ে দিই নন্দ, ফন-জামাকাপড় কিছুই, সাথে নাই দাওয়ার এককোণে পৌঁছ হইয়া বসিয়া ঘুমো আত্মজনের নখ খুটিতেছে। মৃত্যুরানীর মাথে কী ধরণ আবেগ খেলা লাগিল। ঘোলা গলায় জিজ্ঞাসা করে, — কি হল? আলিপ ফিরিনে? ফোনো উত্তর নাই। নন্দ খোঁচা বাড়িয়া যায়। অবাক হয়া মৃত্যুরানী দাওয়ার এক প্রান্তে ছাড়া, সন্দেহের ঘুরো ফেলাইয়া কিঞ্চিৎ ফোর গলায় বলে — কি হল! বলবি তো। ছাড়া, ঘুরো, নিচে সব সাজিয়ে গোছুর যে?

নন্দ আজ খাড় মাজে নাই। সেই না-মাজা দাঁত ফেলাইয়া মিঠি মিঠি হাসিল। মিঠি হাসিতে আজ আগের মন ভিজিবে না। সেদিনের মন্টুর সেই ফিসফিসানি শুনিবার পর হইতেই হঠাৎ অকারণে কেন যে মৃত্যুরানীর বুক হইতে দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া আসে তাহা সে জানে না। এখন সাঁতারপাড়ে ছিপ্পা সকালে মুখটানিতে কার হইতে কী ওষিধা আজ জানা হয়া যাবিনে হইল, সে নিজেও তাহা জানে না। ছেলের পাশে কথা চক্ষু মেলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল — বুমমা বন্ধ। ফটি আলিপ না আজ পরিবেশে আসিবে কি মোর মুখ দেখে পরমা পেবে। এমন ছেলের মুখে আজন। হাতাস ঠিকের একটি মাত্র খড়িল। আহের দুখের ফোপানি আর বক্ষের লক্ষ মিরিয়ামিং নন্দরায়নের জন্মানার বোঝাইয়া তিল। এ সেই বিষে রাখাইতে পার, বেসরকারি মোশন চৌর্য শর্বের পরিচালন হয়েছে। বা মনো ফোপ বয়া ঘাঁয়ের্ড়ি কড় করিয়া বাহির করিয়া একেবারে মুখের সমান ধরিল — ফোপ পরিবর্তনের নারীকের মুখে খুড়ি। ফোঁস মিস্ত্রিরির ফোপা সে পরিবর্তনে চাকরি করতে যাবে? ফোপ ঠিক এই সময়ে ঘিরাঁয়ে বাহুটি পরিয়া মৃত্যুরানীর একেবারে 'খ' বলটীয়া তিল। 'খ' মানে মৃত্যুরানী দেখিল মুখনো মন্দ ভালার নন্দ এবে রাস্তেনিক ঢঙে ফেলাইয়া ফেল।

বাহুপাড়ের আর সকলের কাছে নাই, তবু ফোপের মালাটী এবং অনেক ঘাঁয়েরাদের মেন মন্টুই বাহুপাড় ঘটিয়ের বল হইতে ছিটকাইয়া দাওয়ায় পড়িয়া ঘাঁয়ালি-খাঁয়ালি করিতে লাগিল। অন্তরালে স্বরে একটিই কান্না — গমনা ! আমার গমনা ! আমার পেটের সন্তানের কথা যে কি ভুলিয়া গিয়াছে!

নবীন ফোপের মিস্ত্রি মেলানো ফোপরে এখন একটিও অলঙ্কার নাই।

খুনির কাটা হাত

অসীম চৌধুরী

সাড়ে ছয়টা থেকে। রাস্তা পিচ্ছিল, আলো নেই। বাস পাঁচ মাইল স্পিডে চালিয়ে মেজর সিং বাস থামিয়ে বলল — হাজার বিয়াল্লিশ ফুটের চাঁই পড়েছে। সকাল হলে অবস্থা বুঝে বাস চালাবে। তখন একটা বাস ডোয়ের উত্তরকাশী ছেড়ে গঙ্গোত্রী দিয়ে সাড়ে আগে ফিরে আসবে।

চতুর্দিকে কালো পাহাড়। আকাশে ঘন মেঘ। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। কোথাও হাজারই গভীর অন্ধকার।

মেজর সিং এর ফরমায়েস শুনে সবচেয়ে মুখরাই সবচেয়ে বেশি ভয় পেয়ে গেলেন। মাত্র তিন চারটে গরম জামা আর ওভার ব্রাউজার কোটে। মহিলা বলে বাঁচোয়া টুপি পরেননি। মাথাসমেত লেপটিয়ে লেপটিয়ে গলা-কান-মাথা ঢেকেছেন। ভীতে ভীতে করে বললেন — তাহলে? ... হোটেল-টোটেল নেই বাস্তা?

মেজর সিং বললেন — একটা ধর্মশালা আছে ... এখান থেকে এক মাইল পথ নিচে নেমে যেতে হবে।

শেষ পর্যন্ত ঠিক হল মেজর সিং বাসটা ব্রাস্তার একপাশে রাখবে। বাসেই বসে বসে সঙ্গে যা কিছু আছে তাই খেয়ে থাকতে হবে।

একটু পরেই আকাশের মেঘ উড়ে গেল। উঠল কৃষ্ণপক্ষের ... চতুর্দিকে চাঁদের সেন্সেশি ঘুম ঘুম আলো ছড়িয়ে পড়ল। কে বলবে জলোচ্ছ্বাস আগে মনে হয়েছিল প্রলয় হবে ... ডঃ রহমান মন মন চা খান। সঙ্গে দুটো ফ্লাস্ক ভর্তি চা এনেছিলেন। দুটোই শূন্য।

ডঃ রহমান বললেন — চল হে বাস্তা সাহেবের কাছে গিয়ে কোথাও চা-টা পাওয়া যায় কিনা দেখি। চা না খেলে মন আটকে মরে যাব।

আপাদমস্তক মোটা কম্বল গায়ে জড়িয়ে সিটে পা তুলে সকলে বসে আছে। তাদের কারও বাস ছেড়ে বরফ-গলা ঠাণ্ডা হাওয়াতে বেরোতে মন নেই।

সাগ্নিক মুখার্জি চোখের মোটা কাঁচের চশমাটা সোয়েটারে মুছতে মুছতে বললেন — কে জানে কার মুখ দেখে সকালে বেরিয়েছিলাম

— কার আবার, আমার! কস্তুরী কপিরিটী শালটায় ঘোমটা টেনে দি দি দি করে হেসে বলল।

— মরণ! সকালেই রামনাম জপ করছে, আর তুই!

— মরতে কে চায় সাগ্নিদি। মরব বললেই মরা যায়? এই হাজার ফিটের খাদের কোলে গান গাইতে গাইতে ভাগীরথী বয়ে চলেছে সেখানে মরণ যে তুয় মম শ্যাম সমান বলে কাঁপ দিতে পারবেন? ... আমি কিন্তু পারি।

— ন্যাকামো করিস না। বসে বসে ভগবানের নাম কর যাতে ডোয়ের সূর্য দেখতে পাই।

—পাবেন না। কারণ সকালে আমার মুখ দেখে বেরিয়েছেন।

ডঃ রহমান হাসতে হাসতে বললেন — চলো হে মেজর সিং ... কোথায় চা পাব তার সন্ধান দাও।

— মরণ! চা --না আরও কিছু। পাশের ছেলেটিকে ফিস ফিস করে চোখ টিপে বললেন — বিলেতী বড়ার কোটের পকেটে ছোট পিপে।

কস্তুরী হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বলল — আমারও মরণ চা খেতে ইচ্ছে করছে আমি যাব ড্রাইভার সাহেবের?

— আরে চলো চলো। তুমি থাকলে জমবে ভাল।

— আই কস্তুরী কমরদার আগনে। রাত-বিরেতে আর চা খেতে যেতে হবে না। চুপ করে বস।

—আই সাবলাদি। এজন চাঁদের আলো মরি যদি সেও ভালো ...

— মরণ!

মেজর সিং বলল — ভাগবার সাহেবের এখান থেকে এক মাইল দূরে কম্বুতর সিং-এর বাড়ি। ওর বাসস্ট্যান্ডে হোটেল আর থাকার ব্যবস্থা আছে। বাসস্ট্যান্ড অনেক দূর পড়বে। কম্বুতর সিং লোক ভাল। ওর বাড়িতে সব ব্যবস্থা আছে।

ঢালু পথ। কম্বুতর সিং এর বাড়িতে পৌঁছতে পনেরো মিনিট লাগল।

মেজর সিং হাঁকডাকে করে কম্বুতর সিং কে ডেকে বলল — ভাল করে চা বানাও।

কম্বুতর সিং শুধু নিজে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নয় বাড়িটাও ঝকঝকে তকতকে সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছে। বাড়িতে থাকে ও আর ওর স্ত্রী। আমিয়ে নন কমিশনড অফিসার ছিল। অর্থের অভাব নেই, তবু বসে বসে খেয়ে ঘুমিয়ে অসুস্থ না হয়ে ছোট হোটেল খুলেছে। দেখাশুনো করে ওর ভাইপো। ও সকালে যায় ... একটার আগে ফিরে আসে। মেজর সিং ওর বন্ধু তাই বাড়িতে ডেকে তাড়াতাড়ি চা বানাবার অর্ডার দিল।

কস্তুরী জানতেই পারেনি পাহাড়ে আর অজপাড়াগাঁয়ে মাঝে এত সুন্দর একটা ছিমছাম বাড়ি থাকতে পারে। বাড়ির মালিক আর তার স্ত্রী আরও সুন্দর।

কম্বুতর সিং দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যে আমাদের জন্য চা বানিয়ে টেবিলে রাখার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল আকাশ ভাঙা বৃষ্টি। তারই সঙ্গে প্রচণ্ড ঝড় আর ঘন ঘন বজ্রপাত। এত প্রচণ্ড ঝড় যেন সমস্ত গাছপালা উপড়ে নিয়ে যাবে ... ভাসিয়ে নিয়ে যাবে প্রবল জলোচ্ছ্বাসে ... দেখতে দেখতে কম্বুতর সিংয়ের বাড়ির চারপাশ পূর্ণ হয়ে গেল জলে। অবস্থা দেখে আমি আর কস্তুরী চিন্তিত হয়ে পড়লাম। ডঃ রহমানের কোনও তাপ-উত্তাপ নেই। চা খেতে খেতে বললেন — মনে হচ্ছে সারারাত এই ঝড়-বৃষ্টির দাপট চলবে। আশার সময় যে কাঠের কালভার্টটা পার হয়ে এসেছি সেটা বোধহয় এই প্রলয় নাচনে মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে।

কস্তুরী বলল — তাহলে কী হবে?

ডঃ রহমান বললেন — আমরা তো ভালই আছি ... বাসে যারা আছে ভালো

হলেও অবস্থা। মনে হয় বাইরে অন্ধকারের বাড়িয়ে অতিথি হয়ে থাকতে হবে।

বন্ধুটির মিঃ বলল — ডাক্তারের আসবে, মনে হয় ঝড়-বৃষ্টি না থামলে যেতে পারবেন না। সাহেবের অবস্থা বেশ ভালো নয়। আজ রাতটা আমাদের সেবা-যত্ন করুন।

বন্ধুটির স্ত্রী ঘরে এসে বলল — খাবার যা আছে তাই খেতে হবে। মিঃ সাহেব বলেন আপনাই আমি ডিনার টেবিলে বসিয়ে দিয়েছি। আর রান্নাটি বানাতে বেশি সময় লাগবে না।

ডঃ রহমান পকেট থেকে পাঁচটা একশো টাকার নোট বার করে বললেন —নিন।

বন্ধুটির মিঃ হাহাহোহো করে বলল — ডাক্তারের সাথের মাফ করবেন... আপনারা আমার মেহমান। মেহমানের বাড়ি মেহমান খাবে ..... টাকা আমি নেব না। পাওনা-পাওনার কথা কেবলওকরে রাত্রটা কাটিয়ে দিন, সকালে দেখা যাবে।

বন্ধুটির চিন্তা আমরা দুখার্জিতে নিয়ে। সাজানো ডালের সিটে পা তুলে বসে উঠটি সব কথা ভেবে যাবে। রহমান সাহেব ওকে নিয়ে উঠে করেই একটু বাড়াবাড়ি করেন। সে সব দেখে, কথা তনে আমরা দুখার্জি খুব বেকায়দায় পড়ল— সাধারণ মহিলা মেয়ে পুরুষমানুষের আসল বয়স। সুযোগ পেলেই কোপ বুঝে কোপ মারবে।

বন্ধুটির মিঃ বিয়াট ভাইটিং টেবিলে বড় বড় চারটে আমাদের বসিয়ে আগে রুটি-লাঞ্চি-ডাল খেতে দিল। বন্ধুটির বুক টিপ টিপ করছে, মুখে ভয়ের ছাপ। ঝড়-বৃষ্টির তাণ্ডব বেড়েই চলেছে। একদিকে অনেকদিন বাদে মানের মতো খাওয়া, অন্যদিকে সাজানো দুখার্জি। দুর্যোগের রাতে প্রথম ছেড়ে দুজন পুরুষের সঙ্গে তার কাটানোর ব্যাপারটা স্বাভাবিক হলেও বন্ধুমানুষো চলবে তাতে সন্দেহ নেই।

খেতে খেতে ডঃ রহমান বললেন — আজকের রাতটা সত্যই অন্ধকারময়। ইঁদারা এমন একটা রাত বহুই আসে।

— আমি জানিনা বন্ধুটির ভূতের ভয় আছে কি না। তাহলে বলি মি. ডঃ রহমান একটা ভূতের গল্প বলুন।

কথাটি ওনে বন্ধুটি আঁতকে উঠল — না না না ডক্টর রহমান ভূতের গল্প নয়। ত্রিপুরাতে থাকতেন না ত্রয়ম্বর রাতেরাতে মাতলা নদী পার হয়ে আগরতলা গিয়ে বাস শিকারের গল্প।

ওখাটা ওনে ডক্টর রহমান হো হো করে হেসে দিয়াসেটি ধরাতে ধরাতে বললেন — এই রাতা রাতা জঙ্গলটিতে বাঘে ডিনারে ভূতে আর দেশী-বি আছিয়ে রুটি ছাড়া অন্য কিছু যেমন ডাল বাস না তেমনি ভূতের গল্প ছাড়া অন্য গল্পও হলে না একটা সত্যিকারের ভূতের গল্প বলি শোনো। সেটি পালেপটি সত্যি। একটুও বানিয়ে বলছি না।

ডক্টর রহমান আরামকেদারা দিয়াসেটিটা অ্যাশট্রেতে রেখে বললেন — অনেক রকম সুপারন্যাচারাল আছে যাকে আমাদের মতো অভ্যস্ত আজকালের শক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু সমস্যা হো আমরা জেনেবুঝে তাদের শক্তিবিন্দু করি না; ওরাই আমাদের ভয় পাওয়ায় নানাভাবে জ্বালাতন-অকাতরে। কেমন করে, সে প্রশ্নের জবাব আমি দিতে পারব না। যে ভৌতিক বা ভূতের গল্প বলছি তাতে আমি স্বয়ং জেনেবুঝে শক্তি দিয়ে ফেলি।

বন্ধুটির অনুরোধ ডক্টর রহমান মোটেই আমল দিলেন না। বললেন — শোনেই না তালো লাগবে। বন্ধুটি খাওয়া বন্ধ করে রহমান সাহেবের কাছে ঘেঁষে বসল। বলল — ভূত আমি মানি না। একদিই জানতে চাই।

ডক্টর রহমান শুরু করলেন — আমি তখন মেডিকেল কলেজে পড়ি। ফোর্থ ইয়ার শেষ হয়ে ফিফথ ইয়ারে পড়ি। ফোর্থ ইয়ারে পড়ার মতো অবস্থা ছিল না। বলতে গেলে অনেক ছাত্র-ছাত্রী মধ্যে ফোরেসের কাছ থেকে বেওয়ারিশ ছেলে বলিত ফোর্থ ইয়ারে টাকা পয়সা নিয়ে রেখে। ফোরেসা আমে-টাসে ছাড়িয়ে পরিস্থিতি-টরিস্থিতি ঘরে নেয়। সবই গোপনে। আমার এক বন্ধু একে ফোরেস আছে জানিতা। তার নাম তত্ত্বজন, দারুণ ছেলে।

সর্বদিন থেকেই A_1। একদিন আমাকে বলল — ফোর্থ ইয়ার ফিলজি। একটা খুলির ফোর্থ ইয়ার। অন্তঃত একশোটা খুন করার পর ওর ফাঁসি হয়েছে। বডি কেউ ক্লেম করেনি, তাই ফোরেস কলেজকর্তৃপক্ষ ওকে দিয়েছে। নাম নটিকেস। আমাদের শনিবার রাতে কলেজস্থানে চল। চমকে কলেজ খুঁড়ে বডিটা তুলে আনল ফোর্থ ইয়ারের সব পরিষ্কার-টরিষ্কার করে রেখে। শ'দুই টাকা লাগবে। ফোরেস সঙ্গে কথা হয়েছে।

টাকার অঙ্কটা তখন আমার কাছে খুব বেশি হলেও ওটাকার আর আমি রাজি হয়ে গেলাম। নির্দিষ্ট দিন- নির্দিষ্ট সময়ে আমরা কলেজস্থানে গেলাম। ঘুটঘুটে অন্ধকার ... একজোড়া ভূতের কিছু দেখা যায় না। আমরা ফোর ইয়ারের আগের অপেক্ষায় একটা নিরাপদ জায়গা হাতিকোদাল পাশাপাশি অনেকটা জায়গা খুঁড়িয়েছিল। আমাদের দেখে ফোর্থ ইয়ারের বিয়ে ভূল জায়গা বলে বলল — সাবধান! পা-টিপে টিপে চলুন। অনেক কষ্টে ফোর্থিলাইকে রক্ষি করিয়েছি। তারপর টাকাগুলো আমাদের কাছ থেকে নিয়ে কলেজস্থানের প্রায় শেষ সীমানায় এসে বলল — লোকেরা কবর নিয়ে চলে যায়। তাদের অনেকেই আর আসে না। তাই মাটি খুঁড়ে কঙ্কাল-ফোরেরা কঙ্কাল নিয়ে যায়। কেউ মাথা ঘামায় না।

জানলা দেখতে একটা কবরের কাছে একটা লোক উঁচু হয়ে বসে রয়েছে। পাশে রয়েছে কোদাল, গাঁইতি। লোকটাকে বেশ ভয় পেয়ে গেলাম। মেয়েটা জানলো, কেন্দী মদ খেয়ে টলছে। লোকটাকে এগুলো তোল টাকা দেবার পর সে বলল — তিন মাস আগে হ্যারিংবোনকে পুঁতে দেওয়া হয়েছে। মনে হয় পোকামাকড়ে এর মাংস-টাংস খেয়ে ফেলেছে। সেজন্য, যাই না সেজন্য যেমন অবস্থায় আছে তেমনি হাতে ধরেছে ছাড়ে তোমাদের কে ছেড়ে হবে। শীতের রাতে মদ কে খেতে কোনও অসুবিধে হবে না।

ডাগুলা বলল — মদ ব্যবস্থা করা আছে।

লোকটা তারপর কোদাল-গাঁইতি নিয়ে বলতে গেলে নিমেষেই দু-দুটি মাটি খুঁড়ে যায়। থেকে কোদাল-গাঁইতি ছুঁড়ে ফেলে বলল — তাহলে যাই কই?

আমরা কবরের পাশে উঁচু হয়ে দাঁড়াতেই নাকে গরু ভাবে আসে পচার গন্ধ লাগল। জানলা হ্যারিংবোনের আপাদমস্তক দেখলাম একগাদা পোকামাকড়ের মধ্যে। তখুনই একটা কনুই থেকে কাটা হাতের টুকরো। মেয়ে মেরির গাঁইটা আঙুল। আঙুলে একগাদা গয়নার ঝলা। নখগুলোও আছে। একটা শক্তসমর্থ পুরুষের হাত।

লোকটা বলল — আমাদের আগে কেউ এসে খুলির মণিটা নিয়েছে। কিন্তু তাজা হাতটা কার? ডাগুলা ভোল বলল — কোই আছে নেই। তুমি অন্য একটা মাল আও। টাকাটা পেয়ে যেও।

ঠিক সেই সময় মনে হল জমিন কেন আসছে। পদশব্দের সঙ্গে নানারকম গলার স্বর, গোঙানি ভাসে। কবরস্থানের লোকটা সেই হাতের টুকরোটা নিয়ে ডাগুলা ভোলকে বলল — এসেছিল যখন এই পোস্তাটা নিয়ে যা। নাহিলে খুলির মণি। আমি এই হাতে ওদেরই একজনকে মনুষ খুন করেছে।

হাতা ভর্তি নানারকম আসবাবপত্র নিয়ে লোকজন এল। তিন মাস আগে যেসব লোকজন একটা হাতের টুকরো কিন্তু তখনও বলল — ওরই হাত। দেখ না উঁচুতে লেখা রয়েছে নাম্বিয়। ওরা ওর নাম্বোয়ের ছেলে। উঁচু জানতো। আমি হাতটা তুলে নিয়ে হ্যারিংবোনের ঘর আলোতে দেখলাম উঁচুতে লেখা নাম্বিয়। ডাগুলাকে বললাম — ঠিক আছে ডাগুলা তুমি এটা পরিষ্কার-টরিষ্কার করে আমাকে দিও যাই হোক আরও কিছু পরে ডাগুলা ভোল একটা কবরের কাছাকাছি যেতে হাতটা আমার দিয়ে কেমন যেন ভয়ে ভয়ে তাকাল। দেখলাম সাদা মুখে আতঙ্কের ছাপ। বলল — এটা তুমি নিজেই পুড়িয়ে ফেলো। খুব ভয় হচ্ছে।

জঙ্গল থেকে জ্বালা হবার পর ডাগুলা ভোল নানারকম ভীতিকর লতা-পাতা মরা গাছের সঙ্গে থেকে এসেছে। রাতে টিনটি গাছ ভূত মরীচ সঙ্গে ওরে থাকে ডাগুলো ভয় পাবার কথা নয়। পচা-গলা মৃতদেহ হাত বন্ধ। তাহলে নাম্বিয়ের হাতটা হাতে নিয়ে অন্তরিক্ষে নরকে আমার দিকে চেয়ে থাকার কারণ বুঝলাম না। হাজার খুঁত..... কিছু প্রশ্ন করার আগেই ও ভেতরটা থেকে পালিয়ে গেল। ওকে ঘরের সঙ্গে ঘাসে দেখা হল না। তখনই টেলিগ্রাম পেয়ে লাহোরে চলে গেছে।

সন্ধেবেলা ভেতরটা নিয়ে হাড়গুলো আলোতারে পরিষ্কার করে একুশ মণিয়ে টেবিলের ওপর রেখে নিয়ে পার্ক স্ট্রিটে আমার এক রিলেটিভের বাড়িতে গেলাম। সেখান থেকে ফেরার আগে জানতাম না আমার জন্য কি বিপদ ওঁৎ পেতে আছে। টু টেন ইট মি ট্রুথ আজকাল সিঁড়ি দিয়ে তিনতলায় উঠতে হয়। মনে হল কে যেন পাখা দিয়ে ভর ভর করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আমার থেকে নিচে চলে গেল। আলো থাকলেও মানুষ ছাড়া কেউ নেই। ভাবলাম ভুল দেখলাম। ফ্ল্যাটে ঢুকে দেখি ঘরে

টিংপ আলো জ্বালিনি... সেই আলোয় অন্ধকারে স্পষ্ট দেখলাম একটা মানুষের মুখ... হাত দুটো বেরিয়ে এসেছে ...কিংবা মুখ থেকে বেরিয়ে লম্বা হচ্ছে... লম্বালম্বা — হাত দুটোর আঙুলগুলো বাঁকা... তীক্ষ্ণ ছুঁচোর মতন নখ... কিন্তু মানুষের মুখে নয়। কিন্তু আমার ঘরে ও এসেছে কেন?

আমি সন্তর্পণে জানলা বন্ধ করে দিয়ে ঘরে ফিরে এলাম। ঘরের আলো জ্বালাতে সাহস হল না। ধীরে ধীরে সেই মানুষ-অন্ধকার ঘরের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললাম — কে, কে তুমি? ছায়াটা অদৃশ্য হয়ে গেল। ঘরের মধ্যে ভ্যাপসা গন্ধ। শুধু মধ্যে মধ্যে ভেসে আসছে পচা মড়ার গন্ধ। ডাক্তার হিসেবে বহুবার শব ব্যবচ্ছেদ করেছি। পচা-মড়ার গন্ধ পরিচিত। কারণ এক আছে। কে জানে এমন কেন দেখলাম। দু-এক মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকার পর আলো জ্বালালাম। ঘর শূন্য।...টেবিলের ওপর সেই বইটা ঢাকনার হাড়টা দেখলাম মেঝেতে পড়ে রয়েছে। মেঝেতে কেন পড়ে রয়েছে বুঝতে পারলাম না। ছোকরা বেয়ারা ইঁদুরে টিনটানি ওষুধে খেয়ে-এসেছিলাম হাই মেরে গিয়ে থাকবার অবস্থায় ছিল না। চটপট ট্রেস পাজামা একটা লুঙ্গি পরে নেওয়ার খাটে শুয়ে পড়লাম। ঘুম কি আসে ছাই। চোখ বন্ধ করেও দেখতে পাচ্ছি সেই বীভৎস ছায়াটা আর শুনতে পাচ্ছি ঘুংঘুর। সারারাত একটার পর একটা সিগারেট টেনে খাটের ওপর বসে কাটিয়ে দিলাম। ভোর হতে খোলা ছাদে এসে দাঁড়ালাম। সারারাত জেগে বসে থাকার জন্য খুব ঘুম আসছিল। কিন্তু ঘুমোতে চলে গেলে। সকালে প্রথম চা দিতে এসেছিল। তাকে বলে দিলে আজ কাউকে ঢুকতে দেবে না। আমি যেন ঘুমোচ্ছি। ঘুমিয়ে নিয়ে চানটান সেরে খেয়ে দু-তিন পেয়ালা চা-টা পানি চেলে চেলে খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ওস্তাদের কাছে যাব বলে ভাবছি... এমনি ভাবে চলছে সাত-আটটি দিন। আমার ভাইপো খুব ভোরে যায় নানা ব্যায়াম করে। মানুষের আর্তনাদ, ফালতিনা চিৎকার... ঘুম ভেঙে দেখতে পাই লম্বা এক কালো ছায়া... তার হাত নেই। তারই সঙ্গে ভয়-পাওয়া উৎকট গন্ধ... মিলিয়ে যাবার আগে ছায়াটা বিড় বিড় করে কিছু বলে। আমার শরীরটা হাত ফেলে পড়ে থাকে। পড়ার টেবিলেও খানিক ডিসটার্বেন্স। হাতের ঘামে বইয়ের পাতা ভিজে যায়। তারপরই দেয়ালে এসে যে যেন দাঁড়ায়। আমি আগে তার উচ্চারণ শুনেছি। এমন সময় লাহোর থেকে ওস্তাদজীর একটা চিঠি পেলাম। ওস্তাদজী লিখেছেন — তুই তো ডোন্ট টোন্ট বিশ্বাস করিসনা। আমিও করতাম না। এখন কিন্তু বিশ্বাস করি। আমি তোকে আমাদের বাড়ির সামনে একটা বিরাট বৃক্ষরাজ গাছের তলায় ঘুরতে পড়ে বলে দেখতে পাই একটা তালগাছের মতো লম্বা ছায়া সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ছায়াটার হাত নেই। তারপরে সবসময় মনে হয় কে যেন আমার পিছু পিছু চলছে... তুই কি তাওলা ভেদের সেই অন্ধকারে ফেলেছিলি? আমি বলি তুই ওটা কোথা থেকে এনেছিলি সেখানে রেখে আয়... ওস্তাদজীর চিঠিটা পড়ার পর মনে হল ও যা লিখেছে সেটা জানাই ভাল। পরের দিন সকাল-সকাল আরো-পুরুষে আওলা ভেদের আস্তানায় গেলাম। সঙ্গে একটা তালগাছের মতো সেই গাছের ডালটা নিলাম। অনেক ডাকাডাকির পর ছাওলা ভেদের ছেলে এসে বলল — বাবা নেই। গতকালকে বেরোবার সময় টিপ দিয়ে গেছে। ছাওলা ভেদের বাড়ি থেকে অনেকদূরে গোলাম। হাতে সেই ডালটা। অনেক খোঁজাখুঁজির পর ভেদিনীকে পেলাম না। খবর নিয়ে জানলাম সেই অন্ধকার ভেদিনীরও খুন হয়েছে। খুন কোথায় হয়েছে জানি। পরে টিপে দেখেছে।

ওস্তাদী বলল — তোমার?

ভাইয়ে গম্ভীরভাবে ঘাড়টা নিচু করে ফেললাম। বললেন — ঘরে যে সৃষ্টি হয়ে রয়েছে।

তারপর অন্যমনস্ক দিকে বললেন — দিং সাহেব মনে হচ্ছে এবার ঘুমোতে পারব। কথাটা বলে ওস্তাদজী পিঠে হাত রেখে বললেন — যেখানে সেই পুতুলটার কবর দেওয়া হয়েছিল তারই পাশে গাছে হয়েছে খুনটা। সব বৃত্তান্ত জানবার পর আমি সেই জায়গাটায় গেলাম। কোথায় কোন অবস্থায় আমলা গাছটা নিয়ে গেলাম ঠিক তেমনই ভাবে খোঁড়া অবস্থায় আছে। দু-তিন আগে খুব বৃষ্টি হয়েছিল। বৃষ্টির জলে গর্তটার অনেকটা ভরাট। আমি শাবেলটা সেই জলে ফেলে দিতেই ওটা খুব খুব শব্দ করতে করতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ভাইয়ে বয়ঃজ্ঞান একটা সিগারেট ধরালেন। খুব ধোঁয়া ছেড়ে দু একটা টান দিয়ে বললেন — এক কণ্ঠি নিয়ো না... তারপর আর কোনও উপদ্রব হয়নি।

ঝিন্টির সঙ্গে আড়ি

অজন্তা সিনহা

— তোর নাম কিরে?

— ঝিন্টি।

— হে হে হে। ঝিন্টি। ঝিন্টি আবার একটা নাম হল?

— এই কমলি। চুপ! এরকম বলে?

কমলি হাসতেই থাকে। ঝিন্টি জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে দেখে কমলিকে। তাতে মুখে কোনও একটা অভিব্যক্তি হচ্ছে। শান্তা রান্নাঘরের দিকে যায়। হন্য হয়ে ঝিন্টিকে পাওয়া গেছে। তার অফিসের নিচেই রয়েছে বাসীর চায়ের দোকান। বাসীই ফোন থেকে এনে দিয়েছে ঝিন্টিকে।

তার আগের মেয়েটির বিয়ে ঠিক হয়ে যাওয়ায় সে দেশে চলে যায়। তারপর দিন সাতেক কোনো লোক নেই। পাগল-পাগল অবস্থা শান্তার। তার আর রূপনের অফিস যাওয়া এক ঘন্টা আগে পরে। কমলির স্কুল শেষ হয় এগারোটায়। তার আগের মেয়েটি একটু বড় ছিল। কমলিকে আনা নেওয়া দুই-ই করত। ঝিন্টি তবুও পেরে পারে না। কমলিকে স্কুল থেকে আনার জন্য ব্যবস্থা করতে হবে। বাসী বলেছে ঝিন্টির বয়স কম হলেও সে বেশ কাজের। দেখা যাক। দুপুরটায় কমলিকে একা থাকতে হবে না, আপাতত এটুকুই শান্তি।

তাকরাকে খেতে দিয়ে কমলির ঘরে যায় শান্তা। সে নিজে অফিসে যাবে আর খেকেই। ঝিন্টিকে কাজকর্ম বুঝিয়ে দিতে আজকের দিনটা যাবে। কমলির পুরোনো জামা খোঁজা দুয়েক খুঁজে বের করে শান্তা। নতুন জামা একেবারে পুজোতেই দেবে। আপাতত এই দুটোতেই চলবে। এ দুটোতেই ঝিন্টি বেশ কায়দেও পারবে। এক-পাশে কমলির ছোট খাট। বাকি জায়গায় ছড়ানো খেলনা, বইপত্রগুলো এক ধারে সরিয়ে অনেকটা জায়গা বের হয়। সেখানেই ঝিন্টির জন্যে শোওয়ার ব্যবস্থা করে শান্তা। মশারি একটা কিনতে হবে। তোশক আছে, একটা পুরোনো — কমলির ঠাকুমার।

ঘরটা পরিষ্কার করতে করতেই এদিক ওদিকে শান্তা। ইতিমধ্যে রূপন বেরিয়ে গেছে অফিসে। ঝিন্টিকে বারবার পাঠিয়েছিল স্নানের জন্য। অনেকক্ষণ হয়েছে, কোনো সাড়াশব্দ নেই। সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না কমলিরও। ঘরের জানলাগুলো খুলে, পর্দাটা তুলে দেয় শান্তা। ওরটার তোশক একটা গুটোনো হয়ে আছে। একটু সোজা করা দরকার।

— মুন্নে ঐ যে বাক্সটা। দেখতে পাচ্ছিস তো? ওই বাক্সটা দিয়ে আমি খুলে যাই।

— আর আপনি?

— দূর ছোকরা! আজ তো আমার ছুটি। পরীক্ষা হয়ে গেছে না। — ঝিন্টি, তুই স্কুলে যাস না?

— না। আগে যেতাম। এখন আর যাই না..... বলতে বলতে উদাস হয়ে যায় ঝিন্টির চোখ।

— কি মক্কা রে তোর! আমার না, একদিন আগেও না খুলে যেতে।

— আমার.... তালগোল কথাটা বলতে নিয়েও থেমে যায় ঝিন্টি। শান্তাকে

সেখে নিজের অজান্তেই চলিয়ে যায় সে। বাংলাটাও ভালোই, ইনি খুব বাঙালি। আর এ বাড়িতে এঁর কথাতেই জল চলে। এতে ওদিকে এখন তাদের বাড়ি থেকেও চলছে কিচিমি। তবে পরিস্থিতি অনেক সময়ই মোড় ঘোরবার আগেই মনুষ্যেতর প্রাণীর বাড়ি গড়িয়ে দেয়। কিচির ক্ষেত্রেও তেমনটাই ঘটছে।

— কিরে কিচি? ভাল করে খেলি না যে?

শান্তার কথার জবাবে আধা বাটি কিচি।

— রুমনি, তার চুরিও তাহলে করে নাও।

— এখনই? এত তাড়াতাড়ি? আজ তো হোমার ছুটি।

— তাড়াতাড়ি আবার কী? কখন বাজে? আর আমার ছুটি? এতক্ষণ কাজ জানিস? কিচিকে সঙ্গ দেবিয়ে দিয়ে যাবে। একলার ব্যাজারেও ছেড়ে যাবে। দুই সময় বন্ধ করিস না। ফ্রন্ট ডোর বাল্কনির টাকগুলো কমে যাব। ব্যাজারাম যাবে প্রাণী কাজেরটা আসবে না।

— এখন? এখন পড়বই না আমি। ও-মা, এখন ইচ্ছে করছে না তা। ছি-ছি!

— খুব কথা শিখেছিস না? আবার ছিক বলে! হেসে ফেলে শান্তা। তার মেয়েটা কিচিকে পেয়ে বেশ খুশি হয়েছে, এটা বোঝা যাচ্ছে।

আটটা বেজেছে কি বাজেনি, কমপ্লেক্স জুড়ে যেন নিয়মমতো। তখন কেরোসিন এখনও। শান্তা শোবারঘরে যাবার জানলাগুলো ভাল করে খুলে দেয়। পড়িয়ার যে অঞ্চলে তাদের ফ্ল্যাটটা, সেখানে এখনও জনবসতি অত ঘন হয়নি। তাই গরমটা খুব বেশি লাগে না। তবে বন্ধ ঘরা। অন্ধকার পেলে বাঁকে বাঁকে ঘরে ঢুকে আসে। এখন এই মুহূর্তে বেশ ক্লান্তি লাগছিল শান্তার। আজ সারাটা দিন খুব পরিশ্রম হয়েছে। কিচিকে কাজকর্ম বোঝাতে হয়েছে। রান্নাটা পারলে না; তবে অনেকটা অজ্ঞ ওদিয়েই দিতে হলে মনে হয়। মেয়েটির বেশ বুদ্ধি আছে। লেখাপড়া-পরিচ্ছন্নতা। রুমনি অবশ্য মোটে থাকে কিচির সঙ্গে। আজকের দিনটাই ভালো। কাল থেকে স্কুল — হোমটাস্ক — আঁকার ক্লাস, সময় কোথায়? তার সময়দাবী করা একটাও নেই এ বাড়িতে। সেইজন্যই কিচিকে পেয়ে মেতে উঠেছে রুমনি। সকাল থেকে বাঁক পেলেই সে কিচিকে ডেকে নিজের ঘরে বসে। আর এটাসেটা নিয়ে বকবকানি চলছেই।

ঘুম ভাঙে টেলিফোনের শব্দে। বেশ বিরক্ত হয়েই বিছানা থেকে ওঠে শান্তা। রবিবারটাই তো মা একটু বেলা পর্যন্ত ঘুমোবার সুযোগ দেয়। বাকি কদিন উঠতে হয় অনেক সকালে। রুমনির স্কুল থাকে, তাদের দুজনের অফিস। ইতিমধ্যে তপনই করেছে ফোনটা। কখন বেজে যাচ্ছে। ওরই তো কেউ হবে মনে হয়। চোখেমুখে জল দিয়ে রান্নাঘরের দিকে যায় শান্তা।

অন্যদিন সকালের চা-এর লাইনে থাকে তপন। রবিবার সকাল শান্তাই দাঁতে-মুখে চা ঢালায়। কাজকর্মেরও একটা গতি থাকে। চা বসিয়ে টেলিফোন ধরে শান্তা। তপন এখনও ফোনেই রয়েছে। তার সঙ্গে এত কথা বলছে কে জানে? চা-টা শেষই আপাতত রাখে শান্তা। কিচি এখনও রুমনির ফোনে সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। শান্তা প্রথমে ওদের ঘরে যায়। ও হরি! ফোনে তো এখনও বিছানা ছেড়েই ওঠেনি। কিচির বিছানাটা রবার্টাটি ঘরের একপাশে গোটানো। রুমনির ওঠার ব্যাপারে কিচি যেমনই তাদের সজাগকে ঘরিয়ে যায়। কিচির কথা জানতে চাওয়াতেই বাবার ঘরের শোওয়া ফোনটিতে আসে শান্তা। আর এসেই মুগ্ধ হয়ে যায়। কয়েকটা ছোকছোকে ছাড়া সে-ই শব্দ অনেক ফোনের একসঙ্গে শোনা যাচ্ছিল এখানে। তাদের টিকটাকে জল দেওয়া হয় না, সময়ের অভাবেই। তাই ফোনগুলো প্রায় কবে ছাড়া ছিল, এই ভেবে মনে মনে হাসল শান্তা। তে ছাড়া গুলো ফোনের সঙ্গে সঙ্গে রুমনিও উঠে আসে চোখ মুছতে মুছতে।

ঘরোয়াপুরুষালী তপনের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে — 'মাতৃ' শব্দটা। সে ভাবে এ কৃতিত্ব শান্তারই। সেই মনোই বলে — সকাল থেকেই তো চৌত্রি ফোন হয় হোমার। তোর মধ্যে শান্তাটাকে কখন ফোন বাও বলছো?

— শালা বামেছ কুত্তি! এ কী আমার কাজ নাকি? এ সব নিশ্চয়ই কিচির কাজ হয়েছে। ফোন তখন এখানে আসেনি। তাই বোঝাই ওদিকে রুমনি মাঝখানে কিচি ফোনে। বলতে বলতেই লজ্জা-লজ্জা মুখ করে কিচি এসে দাঁড়ায়। শান্তা তো তপনকে কিছু বলতে হয় না। রুমনিই বলে ওঠে — কিচি, তোর মাকে তো কী সুন্দর ফোনে বেখেছিস? তুই কত বড় হয়ে তোকে ফোন দিস বল, নিয়েছিল, সত্যিকে?

রুমনির মুখে শান্তা শুনে ওঠে একসঙ্গে হেসে ওঠে তিনজনই। রাজকন্যার তপন তখন শুনে রুমনিকে আলো জ্বালা যায়ার একই সঙ্গে আলাদা ভাষা — তাদের নিজের নিজের।

বছরে একটু অন্তর-অন্তর যাবে আজ তপন। ছেড়ে প্রতিদিন থেকে লোকজন এসেছে। একটা নতুন তোকেই তক করছে তারা, তার কাজ বুঝতে বিচার ও পড়িয়া বেরিক্ষিক। নতুন বেশ কয়েকজন ইন্ডিনিয়ারও জয়েন করেছে তাদের কোম্পানিতে এই প্রোজেক্টের জন্যই। ছেলেগুলো বেশ ইয়ং, তবে তাদের ওপর একজন অভিজ্ঞ লোক না থাকলে চলে না। কোম্পানি এই দায়িত্বটা তপনকেই দিয়ে রাখে। এটা একদিক

থেকে তার কেরিয়ারের শুরুতে যেমন একটা ভাল দিত। কোন সময়ও দিতে হবে অফিসে আসার বেশি। আজকালকার ছাইটাও খেতে হবে। ৬-৩ হবে অফিসের ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টে ডাকবে হবেই এইরকম ভাবছিল তখন। ইতিমধ্যে কাজের ফোরম্যান কিংবা ফ্লোরসুপার দিয়ে দিয়েছে। চড়িয়ে বেরোচ্ছে ছাদন আর পাওয়ার টিলিন। কিংবি ভালোভাবে প্রথমে সকালবেলা যে কত সুবিধা হয়েছে।

চাকরে পাবি এইরকমই পাওয়ার হাব না পাওয়া। অফিসে ঢোকার সময় এত ঝঞ্ঝাট ভুল লাগেনা ভুলটি ঠিক হয়ে যেন অফিস থেকে হয়ে যায়। অফিস ঠিক হয়ে যেন ....

— কিংবি, কিংবি এদিকে আয় তো একবার।

কিংবি খুব অনিচ্ছার সঙ্গে মোজা তার পড়ি ঠিক জায়গা নেয়।

— কাকু ডাকছে তোকে।

— না, ঘুমোচ্ছে পাচ্ছে।

বলতে বলতেই আওয়াজ শোনা যায়। আমি, যাই, আমার আজ দেরি হয়ে। তোমরা খেয়ে নিও।

পাওয়ার নিজনবরো সাবধানে যেন। প্রতি হয় হলে অফিস থেকে একটা যেন তোমরা।

এ অফিসে যেন কয়েকদিন হল কিংবি। ছোট ভাইয়ের জন্য মনে মনে কত খারাপ লাগে ছাড়া, ভালই আছে সে। সারাদিনে তার যতটুকু কাজ, তার নিজস্ব সীমা। এ অফিসে অন্যরাও তার সঙ্গে মেলামেশা করে। তবে অন্তরিকতা হয় না।

অফিসে ঢুকে ঢং করে একটা বাজে। একটু পরেই রুনমি ফোন আসবে ফুল থেকে। আলাদাভাবে হাতে কোনো কাজ নেই। কিংবি বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়। এখান থেকে আকাশটা অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। মনের জন্য মনে পড়ে কিংবির। ছোট ভাইটা এখন কী করছে কে জানে। তার নতুন মা একেবারে দোষ না ভাইটাকে। এমা-একাই বাচ্চাদের বলে থাকে, মারলে ঘাঁটে, নাক দিয়ে জল পড়েই যায়। তবু অন্যের মা কিংবিকে ছেড়ে না। তার নতুন মা কেমন সারাদিন বিরক্ত হয়ে থাকে। ভাইয়ের কথা ভাবতে ভাবতে চোখে জল এসে যায় কিংবির। আঙুলে কিংবি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কাটে, একবার আকাশ দেখে, একবার নিজের শরিরের হাত-পা। কিছু তবু বাচ্চা তাকে ছেড়ে ছেড় বাচ্চাটা। বাচ্চাও কত তাল বাবহার করে। তার ভাইয়ের ঠিকমতো পাওয়া হয় কিনা কে জানে।

অফিসে হাতে ঘড়িতেই চলে রুনমি। আলোকজন পরে সে শব্দ কানে যায় কিংবির। সে ছুটি যায় বন্ধুরা খুলতে। ততক্ষণে কলিংবেল ছেড়ে দুমদুম করে দরজা পিটতে শুরু করেছে রুনমি। দরজা খুলে কিংবি একটু সরে দাঁড়ায়। রুনমি ছোকরি কারের মধ্যে ঘরে ঢোকে, প্রচণ্ড বিশেষ ছটফট করে, জামা-জুতোগুলি কোনোরকমে খুলে, বাথরুমে এদিক-ওদিক ছুঁড়ে ফেলে। আজ তো অনেক বাচ্চা খুলতে দেরি হয়েছে ...

— কি রে কিংবি! ঘুমিয়ে পড়েছিলি? এত দেরি হল বাচ্চা খুলতে? পাঁড়া যা আসুক, বসে দেব আজ। অবশ্য বলে কি কিছু পেয়েছে।

— আজে বোলোনা, প্রিজ। এ শব্দটা সম্প্রতি রুনমির মুখে বার বার শুনে গিয়েছে কিংবি। এখন ইচ্ছে করেই বলে। তার মুখে শব্দটা ভালোই হেসে ওঠে রুনমি। এখনও ওকে ভালবাসে জানাই ...

বাথরুমটা হয়ও যাই। তো তো করে হেসে ওঠে রুনমি। কেন কেউ কাতুকুতু দিয়েছে তাকে। কিংবি শব্দটা ঠিকমতো উচ্চারণ করতে পারে না, তবে রুনমিকে নকলটা ঠিকঠাক করে। তাতেই তারো হাসি পেয়ে যায় তার। কিংবিও মজা পায় রুনমির হাসি দেখে। তার মন থেকে একটু আগের বিষন্নতা উবে যায় পাকদের দেখের মতো। সে অপেক্ষা করে, রুনমি আর ঘুমোনো যায় শুরু করবে, তার জন্য।

আজ পরিবার। কর্মদিন ভুল ছুটি। শরীরে ক্লান্ত-ক্লান্ত। রুনমিকে ফোনে পুরো অফিস। দু-একটা ব্যাপারে তার সেবার সাথে করে নিলে হয়। আর দিন পনেরো বাকী। রুনমির পেটটা দুদিকে অবশ্য এর মধ্যেই বেশ বড় হয়ে গেছে। অফিস থেকে ফেরার পথে একদিন মিউমার্কেটে গিয়েছিল, বাথরুমে ঢোকে শব্দ-ঢোকো রঙ ছাড়া কিনে কেবল একটা বিরাট ঝোলা হয়েছে, নতুন জামার সেটে না ফ্যাসানই নয়, তাকেই বাচ্চা কিনবে। আর গেলে যা হয়, জামার কিছু সংস্কারের কিনিস, এটা-সেটা, সবশ্ব রুনমির আরো দুটো — একটা ড্রিম লাগানো বুধ-সেট — মেটারিয়ালটা এত নরম, চোখই লাগছে হয়ে গেছিল। আরেকটা কিনে-এর সেট ইউরোপিয়ান স্টাইলের, পাজামা-কামিজ, শাড়ির সঙ্গে, এটাও বেশ আলাদাভাবে দেখতে। ড্রেস দুটো আপাতত আলমারিতে তোলা হয়েছে, রুনমি দেখেনি এখনও, দেখলেই পরে ফেলতে চাইবে।

খুরোর কেনাকাটির ব্যাপারে উৎসাহটা কমলা পাওয়াকেই নিতে হয়। ছেলে এতে বাইরে যাচ্ছে, তার এসব ব্যাপারে আগ্রহটাও বেশ কম। কিংবি দেখের দিকে তোড় থাকে, এখন একটু ঈক্ষা পেলেও পাওয়া তেতে পারে।

টিভি থেকে নাকতে নাকতে একটার বাথরুমে ঢোকে যায় পাওয়ার। বাথরুমটা কদিন ধরে খারাপ হয়ে রয়েছে। ওপরকে বলে বলে আনাতে পারেনি। অন্ধকার বাথরুমে ঘুরে ছোট আশা উঁকিঝুঁকি মারছে। কেনাকাটা করতে গিয়ে কেন বেরি করে ফেলেছে পাওয়া। ওপরকে অবশ্য অফিসে কেন করে জানিয়েছিলেছিল। সেইজন্যেই

অন্যদিনের থেকে আজ একটু আগেই ঘুমোবার কথা। বিটি বিছে উঠে কলিং বেলটুকুও বাজাতে হয় না, ভেতরে পড়ার ঘুমে বেরিয়ে আসে, পিছন পিছন বিটি।

— মা, এত বেশি কথনে কেন? আমার কি খিদে পেয়েছে! বিটিকে কখন খেতে বলিনি, চলবেই না।

— আচ্ছা, বাবা আচ্ছা। আসছে না আসছেই বিটির নামে নালিশ! কি যে বিটি, পাউরুটি না মুড়ি-টুড়ি কিছু ছিল না?

— আছে তো। কিন্তু কখনি তো খেলে কিছু খাবে না। আজ ঢাইনিজ খাব।

— হাঁ, তা। বলেছি তো। আমার আজ খুব ঢাওমিন খেতে ইচ্ছে করছিল। টিফিনে ছিল আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে ঢাওমিন খেল, নিল না একটুও।

— এ মা! তুই এত হ্যাংলা হয়েছিস জানতাম না তো! আর বিটি কি ঢাওমিন বানাতে পারে? আচ্ছা চল, আমিই না হয় তোকে ঢাওমিন বানিয়ে দিচ্ছি এখন। বাবা আসেনি?

— এসেছে তো। টিভি-তে খবর দেখছে।

বাবের খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকতে চুকতে রাতে একটারও বেশি। তখন কখনি ঘরে টিভি দেখছে। পাশে কাজলদা শুয়ে, মনে করে শোওয়ার ঘরে যায়। আজকের সারাদিন ধকলে চুল বাঁধতে বাঁধতে হঠাৎ তার বিটির কথাটা মনে পড়ে। পুজোর জামাটা হাতে পেয়ে কি খুশিই না হয়েছে মেয়েটা। এদিকে কখনির জামাও পেয়েছে। উঁহুঁ, কালো-র বাজনা কম্বিনেশনের ওপরের জামাটা এত পছন্দ হবে মনেই পারা, মেয়ের যা পছন্দ নয়। আয়নায় আপনাকেই শনী করিয়ে ঘরে ঢোকে কখনি, মুখ গোঁজ করে। সঙ্গে তখন।

পাশুর কিঞ্চিৎ চোখের ইশারায় তখন যা বলে, তার সরলার্থ হল বিটির মনের ওইরকম সূক্ষ্ম একটা জানা যা কেন কখনির জানার আগেই জানা। যা এখন বিটিটাকে তেমি ভালবাসে। সে আজ কিছু হেই বিটির সঙ্গে এক ঘরে ঘুমোবে না। আর কারও কথা বলবে না। সে শুধু কাজল সঙ্গে জমা বলবে, সারার সঙ্গেই ঘুমোবে। মনোমত সিদ্ধান্তে পাশুর কাছে পেশ করে তো তো করে হেসে ওঠে তখন — এবার ঘোমো।

— ঠিক আছে, বাবার কাছেই ঘুমোনি তো! রাত বারো বাজে অফিসের ড্রাইভ বাইরে চলে যাবে, তখন কী করবি?

— যাবে বাবা!

— হ্যাঁ মা, অমনি তো কালই একদিনের জন্য চলে যাচ্ছি।

— কাল-ই চলে যাচ্ছ? অকাল হয়ে যায় কখনির মুখ।

— তুমি বরং মার কাছে জামাটা অবশ্যই নাও, আর বিটির সঙ্গেও।

অগত্যা মাথা নাড়ে কখনি। দুটি দুটি পাশে পাশুর কাছে যায় — আমাকে ওইরকম একটা জামা কেনে দাও ওইরকম জিন্স-জিন্স কেওয়া!

— আচ্ছা বাবা, আচ্ছা। কেওয়া যাবে —খন। এখন যাও তো শুয়ে পড় গিয়ে। রাত অনেক হয়েছে তুমি কি সত্যিই কাল যাচ্ছ? নাকি কখনিকে ভোলানোর জন্য বললে। কাল তো রবিবার। বিকেল পাওয়ারের লাইটটা জ্বালিয়ে বড় আলোটা নেভাতে পাশু। তখন তাড়াতাড়ি বিছানায়। আর তখনের বলিপে মাথা রাখা মাত্রেই নাকডাকা শুরু — তার মধ্যেই সে বলে — হ্যাঁ, কালই যেতে হবে। রাতের যেমনকার সকালে লাইটে পৌঁছতে পৌঁছতে দশটা বেজে যাবে। আজকাল লোকজনকে নিয়ে আর আসে, জান তো!

তখন বেজে সপ্তরথালেক হয়েছে। পিঠেই প্রচণ্ড ঘাম হয়ে পড়েছে গুখনে। তবু নিয়মিতো তেল কবে কখনকখন নেয়। পাশুর-টাকার এ পর্যন্তে বরাবর পাশুই করে। একদা বিটিও অনুকরণতো কাজের লোকান থেকে এটা-ওটা এনে দেয়। পাশুর অধিক আজ বৃষ্টি। অনিন্দ্য বাবে কখনিটা মাসে খেতে চাইছে। পাশুরের মনে হয় মেয়েমানুষি ফরমান একটা কাপড় পরে নিয়েছে পাশু। বিটি তা বানাচ্ছে প্রায়ণে। আজকাল থেকে টিনা তেল করতে গিয়ে হয়ত কী ভাল কথা তেলাতে কখনির পুজোর জামাটা গায়ে ঠিক দেখিয়ে তেমার পাশু। আহা, জামাটা তো নেই। নিশ্চয়ই মেয়েরা তোকে ও আছে। কাজল থেকে এসে নেবে নিশ্চয়ই হবে। কালকাতিতে সে আর ওপর হাত! আর তো নেই যার নেই না। ওপর এখন নেই। কাজলে আসতেই কাজলে আসা পাশু। যাজন নিজের নিজেতেই কথা ওধু একটা অনাবশ্যক ভাবে বিশেষ রাখে। জামাটা গেল কোথায়? খুঁজে নিজেই ঝাওয়া-দাওয়ার পর যে একটু বিশ্রামের অবকাশ মেলে। আজ তো আছেনিও মেয়ে পাশুর। কাজল থেকে কিনে সমস্ত পাশুরছি, তবে ইংরাজি খুতে তোলা। তাদেরও রাত্রা। আলোটা নুইয়ে রাত্রা করতে হল। কখনি পাশুর তেকে ছাড়া খেতে পারে না। বিটি অবশ্য তাদের রাত্রাই খায়। রাত্রা করতে করতেই আলোচনার আলমারিটা খোলে পাশু একর একর খোঁজে। জামাটা চোখে পড়ে না। তেল টিনের পড়ে যায় পাশু। একটা অভাবিতের টানা সমের জামা বড় কথা নয়। আলমারিতে হাত দিল কে? চাবিটা তখনো সামনেই পড়ে থাকে। তবু — তেল বলতে তো তারা তিনজন।

ওরে ওরে ইটকট করে পাশু। কি মনে হয়, উঠে যায় কখনিদের ঘরে। ঘুমোচ্ছে তেকে। এ কী একটা অবাকাণ্ড ঘটাল মেয়ে। ঘরময় খুলে পাশুরের চুকিয়ে তেকে বিটি তেমন ঘুমোচ্ছে ওরে। তেমন এক পায়-পড়া মুখে তাকিয়ে থাকে সে। পাশুর তেমন সন্দেহ হয়। সে ফিরে যায় নিজের বিছানায়। তবে কি বিটি?

বিকেলে কখনি আর বিটি তেলাতে যায় ইন্টেলিনিকের পার্কে। সারাদিন পাশু

বন্ধি থাকলে একটু ঘরেই থাকে। আজ শান্তু ইস্কে একেই ঘরে ঢোকে না। মিনিমি ক্রিকেটটা একবার দেখা দরকার। যা ভেবেছে ঠিক তাই — মিনিমি বাথরুমে ঢুকেছে জানাটা। তবে শত্রু থেকে মাত্র একটি ছেলে ওকে পাওয়ার। মেয়েটা এত 'ভালোবেসে' এত ছন্দ, এত ভালোবাসা। তারপরও তুমি? তুমি শব্দটা ভাবতেই হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায় শান্তুর। আরো কী কী পরিবেশন্তে কে জানে? অসহায়ের মতো খুঁজতে — নিজে আবার ওর ওর কথা কম ভাবিনের শান্তু। না বলি কম নিই? আছে। তবে কবিতা? আজ লেখেনি, আজ লেখবে? আর নয়। আজই সিদ্ধান্ত নেয়

নিজে আসে কমলিনি ডাকে মিনিমি। কমলিনি অপেক্ষাতেই বসেই ছিল। মিনিমির মুখ দেখেই বুঝলো। বুশশাল। ঘরের ভাকে হাত লাগাবে সে। শান্তুও গম্ভীরই হয়ে থাকে। কমলিনি আজকে ফোনে কিনে ক্রিস্টো না হওয়াই ভাল।

রাতের খাওয়া শেষ করে ঘরে আসে শান্তু। মিনিমি বাকল-ফোকল বজ্রাচ্ছে। কমলি টিভিতে কী একটা দেখছে। কী ভেবে কমলিনি ডাকে শান্তু

— কমলি, একবার এদিকে আয়।

— কেন মা?

— আয় না।

শান্তুর কাছে এসে দাঁড়ায় কমলি

— বলো, কী?

— তুই আজ আমার কাছে ঘুমোবি?

— না - না - না, ... তুমি গল্প করতে পারো না। মিনিমি কত গল্প বলে।

এক লহমার জন্য কুলটা কুঁচকে যায় শান্তুর। মিনিমি কেন ভালই হাত করেছে মেয়ে কমলিনিকে। সে এতদিন খেয়েদেই মানুষ করলো মেয়েটাকে।

— আয় না। প্লি - জ। ভয় নেই, একা একা ভয় পাবে না তখনও?

আর মুখে প্রিজ বলেই কাছে টানে কমলি। সে দোঁহাই মিনিমিকে কী বলবে মায়। তারপর এসে ওকে পাড়ে মায়ের পাশে।

— কি বলেছে মিনি, মিনিমি তুমি করেছে? এ ঘরেই শুয়ে না।

— তাহলে কি আমি নিজে জন্য বলি? ঘরে আর জন্য বাড়িতে শান্তু নেই। তুমি ওকে নিয়ে এসে জন্য কোথাও নিয়ে যাও। নয়তো বাড়ি পাঠিয়ে দাও।

— এরকম বলতে না মিনি। পুজোয় আগে কোথায় যাবে নতুন করে? আর বাড়িতে? গেলে আবার সেই নরকের ঘরে পড়বে মেয়েটা।

— এসবের আমি কী জানি? আমি আর ওকে চাকর না। বাবাকে বা করবার তা তুমি করবে।

বলে গট গট করে মিনিমি ঢুকে যায় শান্তু। হার মানাটা সহজ পারেই থাকে।

— বলো, কোথায় আজ যাবে? আজ পাবে না, বাড়ি যাবে না জায়গায়ে যাবে আমে হয় কি?

আজ সকালেই মিনিমিকে নিয়ে বেরোবে বলেই। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কী ভাবা মিনিমি। শান্তু শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কমলি এখন ঘুমো, এই যা বাঁচোয়া। আর আর অফিস যাবে না শান্তু। অসার একটা নতুন কাজের লোক খুঁজতে হবে। এ এক ঝামেলা। মাসে মাসে মাসে ছেড়েই দেবে চাকরি-বাকরি। তারপরই অবশ্য বাস্তববুদ্ধি জাগতে হয় তার। আজকের দিনে সহজেই চাকরি ছাড়ে কেউ?

ভাবতে ভাবতেই ঘরের আজকর্ম শুরু শান্তু। একেবারে রান করেই একা বসাবে। সবুজ এসবেরো আজে, একেই কমলি ছেলে আসবে।

ফুল থেকে ফিরেছে একঘণ্টা হয়ে গেছে। আজকাল শান্তু ছাড়া দুজের কথা ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি কমলি। আসবার কেঁদেই চলেছে। তার এক কথা

— মিনিমি কেন চলে গেল মা? আমাকে যে ঘরে গল্প বলবে, তা? ওমা!

কমলিকে কিছুতেই বোঝাতে পারে না শান্তু। একটা সময় বিরক্ত হয়ে নিজেই আজে চলে যায়। শান্তু বাড়ি, ভালো-খোপড়ও ঘুরে ঘুরে। মিনিমি ঠেই একদিন ঠী যে কষ্ট আমার।

বেলা আড়াইটের সময় ঘরে ফিরে দেখে কমলিনি ঘরে আসে শান্তু। ঘুমন্তে-মুকড়ে নিজের বিছানায় ওয়ে আছে কমলি। চোখের কোণে জলের ওকনো দাগ। ঘুমিয়ে পড়েছে কাঁদতে কাঁদতে। আহার মুকটা ঈষৎ ওকে থাকে শান্তুর। প্রথমে ভুলো, তারপর জামা-কাপড় ছাড়িয়ে দেয় কমলিকে। তারপর একসময় কমলির গায়ে হাত আসে হার। ওকে ওঠে শান্তু। ঘরে পুরে আছে কমলির গা। বুদ্ধিস্তব্ধ খাবার হয়ে যায় শান্তু। তখন কলিংবেলের বাইরে। সে একা, এই অবস্থায় কেন ঘরে বাড়ির ডাক্তারকে খবর দেবে কিনা ভাবে শান্তু। ডাক্তারকে অবশ্য সহজে আসে পাওয়া যাবে না। মেয়েটা কিন্তু খায়নি। এখন এর বেলায় আর কী দেবে? একটু ব্রান্ডি ঢালা নিয়ে আসি করে কমলিকে খাওয়ায় শান্তু। মাথা ধুয়ে দেয় খানিক। ফোনো শান্তু ঘরেন। ঘুম ভাঙবেই থাকে। নাকে ফুল ঘন্টা। একটাই নাম — মিনি - মিনি - আর মিনি। কাল পাওলো দেখা যায় আরো দুটো কথা কেন চলে গেলি মিনি? তোর সঙ্গে আড়ি।

ছটফট করে শান্তু। তার কেমন অপরাধী লাগে নিজেকে — একটু কি বেশি বাড়াবাড়ি করা ফেলেছে সে?

ডাক্তারবাবু আসেন শান্তে ছ-টা নাগাদ। ভাল করে পরীক্ষা করেন। ওষুধ-পত্রও দেন। যাবার সময় কেন গম্ভীর থাকে তাঁর মুখ।

— ঘুমনি খুব ভাল মেয়েমানুষ, শান্তু। ওকে এখানে নেই বলছি। কোনো অসুবিধে হলে, আমাকে খবর দিতে দেরি কোরো না কিন্তু। আশাকরি যে ওষুধ

বিজ্ঞান, তাতে ঝুঁকে পড়ে মাথা। হাতে বিশেষ খেয়াল দাদা সওয়ার। ঝুঁকে ঝুঁকে আরও গভীরে আসতে পারে।

— কী থেকে হল ঘাটে? ডায়াবেটিস? চাওা মেয়ো? ডলা দিছু নয়তো? এই ফাংগোপিয়া না টাইফয়েড?

— এ না, সেসব নয়। মনে হয় হার্টের ছোটো-খাটো কিছু। পেটে বা মনে আমার কথা থেকে ডাক্তার তুমি ছেলো না আশা করি ঠিক হয়ে যাবে। নরমাল হলেই সবার ভিত।

— ডাক্তারকে কি বলছ তোমরা?

— ডাক্তারের সিনটা বলছো। কাল এ বাড়িতে ডাক্তারবাবু নিয়ে গেছে ওরা। বুদ্ধিমান আশঙ্কায় পাগল হয়ে যাচ্ছে পাচ্ছা। ক্রমশি ঘুমোচ্ছে। কী ভেবে ক্রমশির ঘরে যায়। সেন এখানে এখনও রয়েছে রিপ্টির চিহ্ন। রিপ্টি গাড়ি থেকে হলে যাওয়াই যে ক্রমশির জ্বরের কারণ তা বুঝতে দেরি হয় না পাচ্ছার।

ঘরে এসে এটা-ওটা দেখে। জানলা খুলে দেয়। পুজোর আর দিন সাতেক বাকি। এই সময় মেয়েটা অসুখে পড়ল। রিপ্টির রিয়ানটা একপাশে গোটানো অবস্থায়। ক্রমশির মাথে রিপ্টিকল বসে পাচ্ছা। মনের আনন্দেই আজ রিপ্টিশপর গোছগাছ করতে চলে সে। তাড়াহুড়ো করে অন্যমনস্কতায়। ক্রমশির বিছানার চাদরটা বেশ নোংরা হয়েছে, চাদরটা পাল্টে দেওয়াতে হবে। আগে আনতেই হবেটা তোলে। সঙ্গে সঙ্গে বালিশটাও নিয়ে পড়ে।

— এ কী! বালিশের তলায় এটা কী! রিপ্টির আংটিটা এখানে! এইভাবে!

অনেক ঘাটে ক্রমশির জ্ঞান ফিরেছে। হাসপাতালে নিতে হয়নি, এই যা রক্ষা। ডাক্তারবাবু দু-বেলা এসেছেন। তখন সাইট থেকে সাত দিনের বিশেষ ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে এসেছে। পাচ্ছা অফিস বাওয়ার তো প্রশ্নই নেই।

ক্রমশির ঘরে ঘরে ওষুধগুলিকে নিয়ে এলায় পাচ্ছা। পাচ্ছাদের আসার দেখেই নির্জীব হয়ে পড়েছে। রিপ্টি চলে যাবার পর ছেলেটা আর জল দেয় না এতোদিনে। তখন বসে আছে ক্রমশির পাশে। ক্রমশি মায়ের কাঁধে মাথা রেখে বসে আছে। জ্বর কমলেও মায়ের দুর্বল সে। তখন প্রায় কথাই বলছে না।

পাচ্ছা দু-চামচ ওষুধ নিয়ে ক্রমশির মুখে যায়। সেই সময়ই তখন তার ওষুধ খেল উত্তেজিত... পাচ্ছার বা তার ব্যবহারবিরুদ্ধ।

— তোমার মতো বুদ্ধিমতী মেয়ে এত বড় ভুল কি করে করলে, পাচ্ছা। একটা আংটির জন্য? তোমার মেয়ের চেয়ে বড় হল ওটা?

মাথা নিচু করে পাচ্ছা। অপরাধবোধে সে নিজেও তো ভুগছে। তবু তো তখন এখনও ঘটা জানে না। ঘটনা অবশ্য সেও জানে না। ডাক্তারের কথা অনুযায়ী কয়েকটি দিন সেটি করতে হবে তাকে। ক্রমশি অনেকটা সুস্থ হোক।

পুজোর অনিল তখন আর পাচ্ছার মধ্যে তোড়াই উৎসুক দেখেছে ক্রমশি। তার শরীর এখন প্রায় সুস্থ। স্কুল ছুটি। বিজয়া নিতে তাই দোলো অনুমতি নেই। পাচ্ছারও অফিস ছুটি এখন। তখন অবশ্য পরশুই অফিস সাইটে চলে যাবে। সেখানে ব্যাকলগের কেস জমি হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই।

দুপুরে খেয়েদেয়ে ক্রমশি শুয়ে ছিল বাবা-মার মাঝখানে। জ্বর হওয়ার পর থেকে তাকে একা ঘরে শোয়ার আদেশ পাচ্ছা। শুয়ে শুয়ে আপাত পড়ছিল তখন। কথাটা পাচ্ছাই তোলে— ক্রমশি। রিপ্টির কথা মনে পড়ে তোর?

— পড়ে তো। কিন্তু ওর সঙ্গে আড়ি করে দিয়েছি আমি।

— কেন তো?

— ও ঠকেন হয়ে গেছে।

— ঠাঁয়ে ক্রমশি, রিপ্টির পুজোর আসাটা খেলার ছেলে বাদিনের ভালো?

— আমার বন্ধু-বেশি ওলেক্টিলাম তো।

— বন্ধু-বেশি?

— হ্যাঁ। রিপ্টি আসল চাইছিল না বলছিল তুমি জানলে সবাই আমি ঝগড়া...

— কি জানলে ক্রমশি?

এই আসল আসাটা আসি রিপ্টির নিজের মুখে রিপ্টির আসাটা আসি তুমি তো নিশ্চয়ই রিপ্টির মতো একটা ছেলে আমার নিলে না...

— হা কপাল! এ আসি কি ভালোলে? কপাল চাপড়ে মাটিতে বসে পড়ে পাচ্ছা

চৌদ্দ থেকে ফেরে একটা নিশ্বাস বের হয়ে আসে পাচ্ছা। ক্রমশি ছোটো ঘড়ি।-এর মতো লাগছে যে পুজোর বন্ধ ঘরে প্রথম জ্বরে পাগল করে দিচ্ছে যে বাবা-মাকে।

— আমার ভুল না রিপ্টির আসি।

— এই তো এতে খেলার নিজাওয়ালা আসি, তাড়াতাড়ি চলো - ভালো পড়ালে দেব - পাচ্ছার মুখে একটু শুনে ফেলে ফেলে তখন। ছেলে ফেলে নিজাওয়ালার।

— দেখছো তো দিদি, আমার অবস্থা। এ বাজারে বেশি ঘনঘনটি গেলে ব্রিকশ টাকাটে আমাকে রাস্তায়। আমাকে না। রিপ্টিদের আসি আমেন তো? মেয়ে ফেলে আমো কী সব বলে সে। ক্রমশি মেসব কথায় ভালো নিয়ে যায়। তখন আর পাচ্ছা কেমন এক শান্তি আর তৃপ্তি নিয়ে বিকেলায় বসে থাকে, চারদিকের প্রকৃতির মতো।

গণতন্ত্র কোথায়

অনন্তিকৃষ্ণ নন্দী

গণতন্ত্র তুমি কোথায়
এই পৃথিবীতে কি ?
গভীর রাতে সন্তর্পণে —
সন্তর্পিত দেহে হেমন্তের হিমাবরণী
ভেদ করে তুমি উপস্থিত
হতাই অন্ধকারলিপ্ত এ নিঃসঙ্গ।

কিন্তু অন্ধকারাচ্ছন্নী মানুষের
গভীর তলায় লিপ্ত গণতন্ত্র।
গণতন্ত্রের মুখোশধারীরা
অন্ধকারে করেছে হেমন্তের
বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির ধারালো
অস্ত্রের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত
রক্তাক্ত গণতন্ত্র তুমি।

হেমন্তের এ বিশাল নৈঃশব্দটুকু ছেয়ে আছে
শুধু শব্দ এবং।
আজকে এই একটিন
হেমন্তের পড়িল পরিচয় শেষে
তাই এবং চাই গণতন্ত্রের মুক্তি।

মুখোশধারী গণতন্ত্র
খাঁচার ভেতরে আর্তনাদ করে ওঠে
শোনা যায় তাহাকার ধ্বনি।
অনন্তকাল গণতন্ত্রের প্রতিক্ষায়
দিনিক দিয়েছে
মুখোশধারী অন্ধকারাচ্ছন্নীর মন।
সন্ত্রাসে লাগি আজ
হৈমন্তল আকাশবাতাস বুকে

গণতন্ত্রের জন্মক আর্তনাদে
পৃথিবীর বুকে আবার নেমে আসে
কলঙ্কের প্রতিবাদের ঝড়
প্রলয়ে হয়ে না
গণতন্ত্র অন্ধকারলিপ্ত —
হেমন্ত-নিশ্চয়ের প্রভাতে থেকে।

কলকাতা পত্রিকা ৫ দীপাবলী_ নভেম্বর সংখ্যা ২০০১

প্রাণিনী

নিকাশ বিশ্বাস

আমি

প্রলয় আচার্য

Sample

কাহিনীচিত্র

অরুণাভ ভট্টাচার্য

সেই এভিনোলনের ঘরে চলচ্ছবি টুইটাং থেকে কিছুটা কি নিয়ে যায় আলোর বন্ধু আলোটাপ্পি ? নাকি নাইট্রেলসম এই প্রবলিত পদ্য আমৃত্যু মনুষ্য প্রাণপ্রবাহে ভিন্ন আলম্ব খোলো মনে মনস্তাপেরা ? এইসব চিনুমাসিল কোনো কাজে লাগবে কি লাগাবে না ভোবে আলোর কেন ঘুম নেই রাত ? মনোভেদিন আলোর দীর্ঘশ্বাস যেন চিনুমাসি প্রাণকে কামনা করেছিল — তার আমি হাকে তুলে নিয়ে ছাদীন হয়েও হয়ে পড়িনি আর তার জন্য কী অভিমান, কী কেলেঙ্কারি হয়ে উঠল আমার এই অভিমানের কারণ, এই রাগের ফারাকল ? তুলে পাহাড়ের উপিয়ার খোলাবুলি আর এই হয়ে আলো সন্ধ্যায় কতদিন পরে মনে পড়ল তোমার জন্য মনে পড়ল তখন এটাও হো এই অবলিত পদ্য আমার তোমার উঠানে যে তোমার মন হল না কোনোদিন, তুমি প্রতিমা হয়েছিলে বলে এক ভাস্কর্যচিত্রেই একটি নারীর আলোর ঘরো থেকে অন্ধ চিত্রকার।

আশা প্রার্থী

উদয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

বৃষ্টির বদলে মাথা নত করে শিশির
ঝরে পড়ছিল —
এলিয়ে রূপসীরা বাড়িতে।

তারার পৃথিবীর মধ্যে
নিশ্চুপ এক যোগাযোগ অহরহ চলছে —
সমস্ত মানুষের সমস্বরে আশা।

মহাকাশে নিরব কিছু ঘুম
ঘুরে বেড়াচ্ছে —
নিস্পন্দ প্রাণি থেকে ঈশ্বরে।

আকাশে তাকাও —
দেখবে নক্ষত্রেরা মুখিয়ে মুখিয়ে আছে
পাবার প্রতিযোগিতায় মেতে
পৃথিবীর বুকে আছড়ে পড়তে
আমরাও সেই প্রত্যাশায়
বসে আছি খোলা মনে।

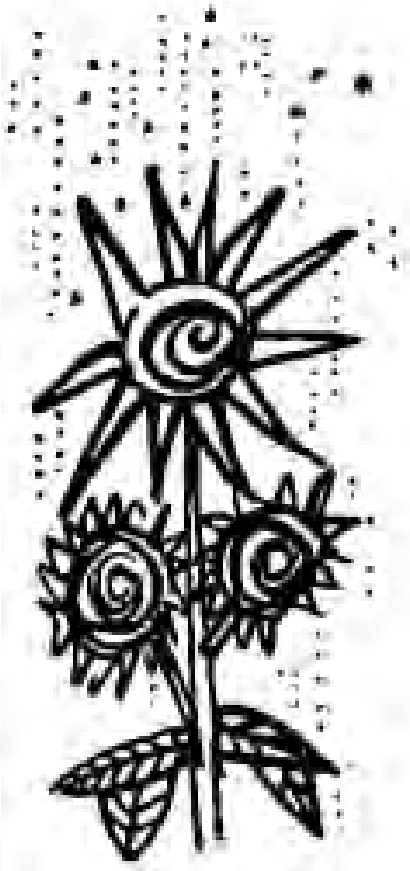

মজার গান

মালাশ্রী মিত্র

চাঁদবুড়ি

প্রোজ্জ্বল মুখার্জী

উত্তমকুমার আর কতদিন

তপন রায়

এসেছিলেন, যার সঙ্গে অপরাধী থাকে এর জনপ্রিয় করে তুলেছিল। কিন্তু প্রশ্ন হল, এরপরে আর কতদিন? উত্তমকুমার আর কতদিন নিজের আসনে অটল থাকবেন— নতুন ছেলে কি আর আসবে না? গ্রাম ছিপায় বছর উনি একে রেখেছেন সেরা নায়কের আসনটি। এমনটি হবে কেন, এমন বাড়িকরী অভিনেতা তো ভারতীয় চিত্রজগতে এর আগে ঘটেনি। সুতরাং বাইশ বছর পরেও ওঁর জনপ্রিয়তার কারণ নিয়ে প্রশ্ন তো উঠতেই পারে।

উত্তমকুমার যখন গিয়েছিলেন ১৯৮০ সালের ২৪ জুলাই। তারপর ঐ দীর্ঘ বাইশ বছরে বাংলা ছবিতে কেন

কয়েকজন নায়ককে কাজ করতে দেখা গেছে। তালিকায় চোখ রাখা যাক— চিরঞ্জিত, তাপস পাল, প্রসেনজিৎ, অভিষেক চট্টোপাধ্যায়, ফিরদৌস, অরিন্দম গঙ্গোপাধ্যায়, অর্জুন চক্রবর্তী, অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, ভানুকর বন্দ্যোপাধ্যায়, জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, লোকেশ ঘোষ, কুণাল দত্ত, পীযূষ গঙ্গোপাধ্যায়, সব্যসাচী চক্রবর্তী, সঞ্জীব দাশগুপ্ত, শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়, শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, টোটা রায়চৌধুরী, বীরু সেনগুপ্ত ও আরো দু-একজন। এছাড়াও মাঝে-মধ্যে বলিউড থেকেও দু-চারজন নায়ক ধার করে নিয়ে আসা হয়েছে। বলাই বাহুল্য, তাদের কেউই আর দ্বিতীয়বার কলকাতায় আসেননি। প্রথম ছবিতেই তাদের দেখার সুখ দর্শকেরা ভালোই বুঝেছিল, তাই আর দ্বিতীয়বার দেখতে চাননি।

কিন্তু বাকিরা? প্রথম পাঁচজনকে নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। কেননা বাকিদের প্রায় সকলেরই নায়ক হিসাবে ছবির সংখ্যা একটা বা দুটো এবং সে দুটোও ফ্লপ। আর ছবিই যখন ব্যর্থ, তখন নায়ক হিসাবে শিল্পীও ফ্লপ। এমনটিই হয়ে থাকে চিত্রজগতে। ব্যতিক্রম সর্বত্রই থাকে—ঐ তালিকাতেও আছে। তবে একথা নিশ্চয়ই বলা যায়, বাকিরা সকলেই পরীক্ষিত, তাই নায়ক ছেড়ে, সহ-অভিনেতা হিসাবেই দর্শকদের কাছে বেশি গ্রহণীয়।

চিরঞ্জিত বাকিদের মধ্যে প্রধান। পঞ্চাশ-ছোঁয়া এ নায়কটি সব ধরনের ছবিতে যোগাহারা সাহে কাজ করেছেন। পরিচালক হিসাবে যোগাহার পরিচয় দিতে পেরেছেন। সফল ও অসফল ছবির সংখ্যা অনেক। কিন্তু বয়সটা বিপদ ঘটাল। সম্প্রতি চিরঞ্জিত ঘোষণা করেছেন, ফিরতরে না হোক সাময়িকভাবে আপাতত অভিনয় জীবন থেকে দূরে সরে থাকবেন। যতদূর জানা যায় ঐ সিদ্ধান্তে উনি অটল। কাজেই আলোচনা থেকে অনায়াসে চিরঞ্জিতকে সরিয়ে রাখা যায়।

তাপস পালও প্রায় ঐ একই অবস্থার শিকার। রোমান্টিক নায়ক হিসাবে আজ আর তাঁকে তেমন মানায় না। তাছাড়া স্থূল বপু একসময় যথেষ্ট সমালোচনার কারণ হয়েছিল। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিধায়ক হিসাবে নির্বাচিত হয়ে তাপস পালের অভিনেতা-জীবন অবশ্যই কিছিৎ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। কয়েকটি সিরিয়াল বা ছবিতে যে উনি কাজ করছেন না তা নয়, তবে তা নিয়ে কেউই তেমন আশান্বিত হতে পারছেন না। মোটামুটিভাবে বলা যায়, সেরা নায়ক পৌঁড়ে তাপস পাল অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছেন।

অভিষেক চট্টোপাধ্যায় নায়ক হিসাবে 'সুজনসখী' ছবিটি করে আলোড়ন তুলেছিলেন। অভূপর্ণা সেনগুপ্ত ছিলেন নায়িকা। ছবিটি ছিট করার পর অভিষেক সই করলেন অনেকগুলো ছবিতে। অচিরেই বোঝা গেল, অভিষেকের প্রথম জনপ্রিয়তা ছিল নেহাতই ফ্লুক। অচিরেই অভিষেক হয়ে পড়লেন সহ-নায়ক। এখন ঐ জাতীয় চরিত্রে অভিষেক অন্যান্যদের চেয়ে এগিয়ে আছেন। পুরো নায়ক হিসাবে ওঁর নেই একটিও ছবি। তেমন আশ্চর্য কোন ঘটনা বা দুর্ঘটনা না ঘটলে এর থেকে বেরিয়ে আসা খুবই মুশকিল।

ফিরদৌস মূলত বাংলা দেশের শিল্পী। এই প্রথম ওপার বাংলার একজন নায়ক এ পারের দর্শকদের মনে কিছুটা দাগ কাটতে পেরেছেন। এখন পর্যন্ত ফিরদৌস-এর মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির সংখ্যা তিন। ছবিগুলি তেমন জনপ্রিয় না হলেও ফিরদৌসকে দর্শক-সাধারণ সানন্দেই গ্রহণ করেছেন। এখন ওঁর দরকার কয়েকটি হিট ছবি। কয়েকজন পরিচালক চেষ্টা করছেন ফিরদৌস-অর্পিতা জুটিটাকে প্রতিষ্ঠা দিতে। দেখা যাক, তাঁদের চেষ্টা সফল হয় কিনা? তবে সবই সময়সাপেক্ষ ব্যাপার, কাজেই ঐ শিল্পী সম্পর্কে সঠিক কোনো মন্তব্য করা যাচ্ছে না।

প্রসেনজিৎকেই বলা যায় যথার্থসম্পূর্ণ নায়ক। বেশ কিছুদিন ধরে সেরা নায়কের শিরোপাটি প্রসেনজিৎ মাথায় করে আছেন। সম্প্রতি কয়েকটি ছবি মুক্তির ছিট হওয়াতে প্রসেনজিৎ-এর সাফল্যের বেড়েছে কয়েকগুণ। ওঁর হাতে অনেক ছবি। এসব মিলিয়ে ও এখন চাপাতের আসনে। আর এসব দেখেই সম্প্রতি একটি দৈনিক উত্তমকুমারের জনপ্রিয়তা ও ব্যবসায়ী দৃষ্টিকোণ নিয়ে কিছু প্রশ্ন তুলেছেন। তাদের জন্য অনুযায়ী উত্তমকুমারকে ছাপিয়ে গেছেন প্রসেনজিৎ। এই আবিষ্কারে প্রসেনজিৎ লজ্জা পেয়েছেন কিনা জানা নেই, তবে একথা তো সবাই জানেন, মিথ্যা তিন প্রকার — মিথ্যা, ডাহা মিথ্যা আর পরিসংখ্যান। এই তৃতীয় অস্ত্রটাই এক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে উত্তমকুমারকে ছোট করার জন্য।

একটু তাথ্যের দিকে চোখ রাখি আসুন— উত্তমকুমার তাঁর চুয়াল্লিশ বছর অভিনয়-জীবনে কাজ করেছেন মোট ২০২-টি বাংলা ছবিতে। ঐ তালিকায় চোখ বোলালেই বেশ বোঝা যাবে তার মধ্যে কটি ছবি সুপার হিট, কটি হিট, কটি ফ্লপ।

প্রসেনজিৎ নায়ক চরিত্রে অভিনয় করছেন কুড়ি বছর। ঐ সময়ে ওঁর মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির সংখ্যা ২০০৩ সাল পর্যন্ত ১৪২টি। তালিকায় চোখ রাখুন তাহলেই বুঝতে পারবেন কটি সুপার হিট, কটি হিট, কটিই বা ফ্লপ। সত্যি কথা চিরকালই অপ্রিয়। সেই অপ্রিয় সত্য না বলিয়ে, পাঠকের হাতে নির্বাচনের ভার ছেড়ে দেওয়া ভাল। শুধুমাত্র তথ্যের জোরে উত্তমকুমার হওয়া যায় না। তথ্যের বর্তমানের এই তথ্যসর্বস্ব যুগে সবই সম্ভব!

এই মুহূর্তে বাংলা ছবিতে নায়িকার তেমন অভাব নেই। নতুন-পুরোনো মুখে জমজমাট। সেই জায়গায় নায়কদের

"..... কলাকৌশলগত উৎকর্ষতায় ভরা এই বর্তমানেও সাদা-কালোয় তৈরী, দুর্বল কলাকৌশল অনেক বেশি গ্রহণীয় হয়ে যায়। এখানেই উত্তমকুমার এগিয়ে গেছেন। ..... নায়কটি জানতেন, বাস্তবের মাটিতে পা রেখে হাঁটতে। অঙ্কের মতো অন্যভাষার ছবিকে অনুকরণ করতেন না।"

অন্তরে বড় খুঁটিনাটি। ভাগ্যেও জোটে লাগে, বলার মতো নায়কের সংখ্যা মাত্র একজন— প্রসেনজিৎ। এরা ঐ শিল্পীর পক্ষেই বা প্রতি ছবিতে অভিনয় করা সম্ভব? তাছাড়া বয় বাবহারের ফল তো সবারই জানা।

আসলে বাংলা ছবি এখন চলছে দিকশূন্য হয়ে। নেই কোনো যোগ্য নায়ক, যে টলিউড নায়ক জায়গাটিকে গর্ব দেখাতে পারে। বাংলা ছবির মূল অবলম্বন ছিল তার স্বকীয়তা। আজ সে হারিয়েছে তার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাটিকে। তার ফলাই ফলছে। কিছু অর্থলিপ্সিক ব্যবসায়ী এখন বাংলা ছবির ভাগ্যবিধাতা। মজার ব্যাপার হল তাদের অধিকাংশেই জানে না বাংলা ছবিকে। বাংলাকে তো নয়ই। প্রযোজকই শুধু নন, পরিচালকদের অবস্থাও তথৈবচ। আগেকার দিনে পরিচালকেরা ছবির জন্যতে আসতেন কাজ নিয়ে, আর এখন বেশির ভাগই আসেন কাজ না নিয়ে। এসবের জন্যই এখনকার ভালো ছবিতে দীনতার ছাপ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে। উত্তমের ও নতুনের দর্শক সমাজ তাই বাংলা ছবি থেকে হাতের সবকটি হাতিয়ার করে নিয়েছেন। তারা আজ আর প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে ছবি দেখতে চান না। বরং তারা দেখতে চান না দেখতে ভালোবাসেন পুরোনো দিনের বাংলা ছবি। যার অবলম্বন আজো অম্লান, যা আজো তাদের মন ছুঁয়ে যায়। রঙ-বেরঙের আর কলাকৌশলগত উৎকর্ষতায় ভরা এই বর্তমানেও সাদা-কালোয় তৈরী, দুর্বল কলাকৌশল অনেক বেশি গ্রহণীয় হয়ে যায়। এখানেই উত্তমকুমার এগিয়ে গেছেন। বাংলা ছবির কর্ণধারের সেরা নায়কটি জানতেন, বাস্তবের মাটিতে পা রেখে হাঁটতে। অঙ্কের মতো অন্যভাষার ছবিকে অনুকরণ করতেন না। স্বকীয়তা বিসর্জনের কথা উত্তমকুমার স্বপ্নেও ভাবতেন না। তাই আজও তাঁর জনপ্রিয়তায় টান ধরেনি এতটুকু। মৃত্যুর বাইশ বছর পরেও উনি বিরাজমান সবার মনে।

কোনো সন্দেহ নেই, এভাবেই চলবে আগামী আরো কিছুদিন। যেদিন আশেপাশে তেমন কাউকে দেখা যাবে না যে মহানায়কের ঐ বিরাটত্বকে লাগাম ধরবার ক্ষমতা রাখেন। সুতরাং আমরা অনেকদিন যে উত্তমকুমারকে 'উত্তম' হয়ে থাকতেই হবে তাতে আর সন্দেহ কি?

ব্রাজিলের সিনেমা

নির্মল ধর

লাতিন আমেরিকার সিনেমা বলতে প্রথমেই মেক্সিকো ও আর্জেন্টিনাই চোখের সামনে ভেসে ওঠে। খানিকটা সত্যজিৎ রায়ের দৌলতে পথের ইতালি, ভিত্তোরিয়া দে সিকা এবং আরও কয়েক জনের নাম আমাদের জানা। এমন সিনেমা তৈরীর চেষ্টায় মেক্সিকো-আর্জেন্টিনার কিউবার আন্তর্জাতিক ও রাজনৈতিক স্বীকৃতি ছিল এবং এখনও রয়েছে।

আমরা ভুলি ব্রাজিল কুইবা বিশেষ লেখকদলের মতো রাজনৈতিকভাবে একটু দুর্বল, কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে অনেক বেশিদূর বিশ্বায়নের ফলে সেদেশে অর্থনীতি প্রায় সেঞ্চুরিয়ন, বেভারলি হিলস, সিঙ্গাপুর দুর্গন্ধ ব্রাজিলে অনুপস্থিত। পৃথিবীব্যাপী ট্রাফিক বড় একটা সুনাম ব্রাজিলের কাছে পৌঁছয় না।

এমন সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশে সিনেমা তৈরীর পরিকাঠামো স্বাভাবিক কারণেই যন্ত্র এবং শক্ত নয়। হলিউডের ছবি ফাওপাওলো ও রিও ডি জেনিয়েরোর শতকরা আশিভাগ সময় দখল করে আছে। তবুও এখানেই গ্লোবার রোপার মতো মানুষ সিনে ব্যাঙ্কো আন্দোলনের প্রবক্তা হয়ে ব্রাজিলের সিনেমাকে নিজস্ব বক্তব্য ও ভঙ্গির জোরালো পায়ে দাঁড় করানোর চেষ্টা করেন সেই ষাট শতকের প্রথা-বাধা ভাঙবেই।

ধীরে ধীরে সাংস্কৃতিক বাস্তবের পাশাপাশি প্রকরণ, গল্পবয়ন যেমন ইটালি নিয়েছে ব্রাজিলের সিনেমার, তেমনি স্বদেশের সাহিত্য, লোককথা, ইতিহাসও জায়গা করে নিচ্ছে। এ কারণে বহুদিন উৎসবে গিয়ে তাই প্রথম দিনই ব্রাজিলের সিনেমার খোঁজখবর করেছি কারা এসেছেন - আসছেন জানতে চেয়েছি। তিন বছর আগে বার্লিনেই তরুণ ওয়াল্টার সালেস কেটার অফ ব্রাজিল সোনার ভালুক জিতেছিল গল্পের স্বাভাবিকতা, পরিবেশনার সরলতা ও কাহিনীর গভীর মানবিক অন্বেষণে।

এবার বার্লিনে প্রায় একডজন ব্রাজিলের ছবি ছিল। নির্দিষ্টভাবেই জানাতে সবগুলো দেখা সম্ভব হবে না। কিন্তু যাহাই করে যে পাঁচ/ছয়টি ছবি দেখেছি তার প্রতিক্রিয়া এখনও মিলিয়ে যায়নি। এই দুবছরে দুটি ছবির কথা দুর্গার ভাবে মনে পড়ছে। আঁদ্রে ক্লোথেলের পোসথুমাস মেয়োরাক্সের এবং টোনি ভেক্কারির সান্টিয়াগুস্ক ত্রিলোগি দেখেছিলাম পানোরামা বিভাগে। আর সিলভিও আকেদ্রা বা ব্যালিনস্ক্ স্যেয়েরই দেখা গেল মার্কেটিং বিভাগে।

তিনটি ছবিই কাঠামোগতভাবে তিন হাতের। প্রথমে সান্টিয়াগুস্ক ত্রিলোগি-র কথাই বলা যাক। দু দু প্রান্তরের মাঝে নির্জন একটা জায়গা। একসময় ওখানে একটি সোনার খনি ছিল। এখন পরিত্যক্ত সেখানে একটি ছেড়েদে চলেনা এক বৃদ্ধা। ছেড়ে পড়া কুপড়ির পাশ দিয়ে চলে গেছে একটি রাস্তা। হাই ওয়ে ধরে দিনে দু/তিনটি লরি ধুলো-ধোঁয়া ওড়ে। সারা দিনে দু/তিনটি লরি ধুলো-ধোঁয়া ওড়ে। তারপর সেখান থেকে এসে যেন কোথায় চলে যায়। চরিত্রটির সেখানে থাকার কথা নয়। কোনদিন একা বসে থাকে সেখানে শকিতে। হঠাৎই সেখানে এক লরাতে হাজির এক গাল-চুলোইন অপরিচিত তরুণ। সঙ্গে একটা লরিবাহক গাড়ি। অনেক চরিত্রের কাছে অজানা তার সে থাকে এবং স্বাভাবিক ভাবেই দুটি নিঃসঙ্গ মন কাছাকাছি আসে, আসে শরীরও। কিন্তু তাড়াতাড়ি স্পষ্ট হয়ে যায় দুটি শারীরিকভাবে মিলিত মানুষের মন সম্পূর্ণ বিপরীত কোণে বাঁজিয়ে। মেয়েটি অপরাধবৃত্তিতে একরোখা জেদি, হয়তো বা একটু কলহুটেও, কিন্তু তার আপাত

কলকাতার আড়ালে যেমন রয়েছে একটি ছেড়া-খিন্নভিন্ন ছুলস্থ, তেমনি এই নির্মাণ পরিবেশে ও নিরাপত্তার কারণেই তার মনের এমে গিয়েছে একধরনের বাস্তিক বাসিন্দা ভাবনাটিও একান্তিক এবং ভিন্নভূমিকায়ে নির্মাণ। পরিচালকের কথায় এই ছবি আমাদের এক বিপ্লবাত্মক চিত্র দেখতে পাবে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ যখন নির্মাণ পরিবেশের ইতিহাসে যা অক্ষর করছে এটা 'ক্লিশে' মনে হবে — কিন্তু মানুষের জীবনের গতীরতম সত্যটাই হল একে অন্যের জন্য বাঁচা, একা কেউ বাঁচতে পারে না। শেষ দৃশ্যে দেখা যায় আলোকচিত্র কুশলীটি মৃত শটি। সমাজের প্রান্তে নিয়ে চলেছে একটি লরি চলে গেল ঘরের ভেতর ওরা ঢুকল। একটু আগেই কোথায় ঝগড়া হয়ে গেছে এক প্রস্থ এসে সাউন্ডট্রাকে দেখা যায়

এবং দুটি মানুষ পুরো ব্রাজিল বেশটাকেই যেন প্রতীক। কঠিন বাস্তব আজকের পথিম ব্রাজিলিয়ানদের জীবন ও মৃত্যুর এক খাদের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। অস্তিত্বরক্ষার জন্যই এখন ওদেশে সারাক্ষণ চলছে ভাতের এক লড়াই। টেনি ছেত্রি সেই লড়াই-এর এক কঠিন কঠোর-কঠিন ছবি তুলে এনেছেন লাটিন্যুত নিয়েছে। মেয়েটি কথা বলে উঠল। আবার প্রথম-যন্ত্রণার কাতর হলেও একই স্বরভঙ্গিতে তার চিৎকার, ছবি শেষ হয় মুক্তনার সমবোধের মধ্যেই।

প্রথমে মেয়েটির খিলখিল হাসি এবং পরক্ষণেই তার চিৎকার। জীবন চলমান।

সার্বিও ভেজোর্সের অনবদ্য নাম্বি ছবিতেও আজকের প্রাবীণ ব্রাজিলকে পাওয়া যায় কোনো প্রতীকী খেলার ছলাই। এখানেও আছে ভীষ্ম ঘৃণা, বিদ্বেষ ও রাগ আছে — এবং চরিত্রগুলোর প্রতিক্রিয়ার মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে যায় সামাজিক বাস্তবতা। সিনেমা বাকের যা ব্যাখ্যাসিক শোরেটি শুধু এক নির্বাচিত কবির আত্মকথা নয়, সেই সঙ্গে

বাস্তবের সঙ্গে সারাক্ষণের সংঘাত — এসবও এসে গেছে ছবিতে। পরিচালকের এই উপস্থাপন ভঙ্গিতেও রয়েছে কবিতার রসাভাস। শোনা যায় ব্রাজিলীয় সাহিত্যে যোয়াও এখনও অস্তিত্ব। যদিও পর্তুগীজ ভাষায় এখনও তাঁকে সেরা কবি মনে করেন অনেকে। যোয়াও-এর বীকৃতি-অবীকৃতির এই দ্বন্দ্বটাই ছবির কেন্দ্রবিন্দু। সিনেমাও বলেছেন কে যোয়াও নয়, যোয়াও কী? — এটাই আমার ছবির বিষয়। অনেকটা কালো মানুষরাও যোয়াওকে তেমন গুরুত্ব করতে না।

"কটি ছবি দেখার অভিজ্ঞতা থেকেই বলা যায়,
গ্রামিন আর্থিক অস্বচ্ছলতার মধ্যে দাঁড়িয়েও
শিল্পভাবনায়, সামাজিক সচেতনতায়
দেউলিয়া হয়ে যায়নি।
বিশ্বব্যাঙ্কের ঋণ
গ্রাফিককে পুষ্টু করলেও
শিল্পসৃষ্টিতে করেছে গতিময় ও ক্রিয়াশীল।
কে না জানে
দারিদ্র্যের মাটিতেই
বোনা হয় শিল্পের বীজ।"

অশ্বত্থামা

সুরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

দুরন্তে অশ্বত্থামাকে নেপথ্যে রাখার মতো এক অভিনব প্রয়াস। তবু তা মহাকাব্যিকে। আলোর খেলনার থিয়েটারকে ছেড়ে মাওয়া দুরন্তের মঞ্চলাইন শিবির থেকে আবার একবার যুদ্ধ করার পড়েছি। এখানে অশ্বত্থামা হলেন যে তিন নাটাব্যক্তির তপ্ত মাথা মনোজ মিত্র ও বিমল চক্রবর্তী অশ্বত্থামাকে নিয়ে নাটক তৈরি করেছিলেন সত্যসাঁইই দুইটি পুরুষ হলেন যেমন একটিমাত্র তিনি মঞ্চসজ্জায় থিয়েটারে তুলতে হয়েছেন ইতিহাসপুরাণের থিয়েটারকে আলাদাভাবে বইয়ে নেবার জন্য রঙ্গনা থিয়েটারের নিজস্বতার পুরনো দুঃখগুলোকে ছেড়ে পর্যন্ত এই তিন পুরুষকে নেপথ্যেতে আনলো। পুরোনো সবকিছু ঝেড়েই ফেলে উঠতে চেয়েছি। চার পাশের নিছক দৃশ্যকল্প, আলোকসজ্জা মঞ্চ, পোশাকপরিচ্ছদ নিশ্চয়ই বিভিন্ন, সাধারণভাবে পাশে সমস্যাকে ছেড়ে দেওয়াকে বা। ছোটোখাটো, শৌখিন ফেলে-ছেড়ে, আড়ম্বরহীন একেবারেই উঠতে নাটক হবে তিনটি। পুরো থেকে প্রতি বৃহস্পতি, শনি ও রবিবার তিন তিনটি ও সাড়ে ছটায় অভিনীত হবে নাটক।

রঙ্গনা-ই গণেশবাবুর আসরে, মঞ্চে, নতুন-পুরোনো পরিচ্ছন্ন এখনও। বহু-ও চাপাতে শক্তিটাই এই তো সেদিন। এই রঙ্গনাকে ছেড়ে বাণীকারের কথায় গণেশবাবুর জৌলুস ছেড়েছিল। অথচ এখন সংস্কৃতি সম্মেলনের আয়োজনে নিরীহ মঞ্চে, যার তারকায় খচিত নির্বাসিতদের শিয়ারদৌড়া নাটকের মহলা থেকে অভিনয় রজনী পর্যন্ত সেই গণেশবাবুর কথায়তে ও নাটিয়েপনে মুগ্ধ হয়েছিলেন রঙ্গনাবুর সময়েই কলেছিলেন গণেশবাবুর মতো মানুষ এখন বিরল।

রঙ্গনায় গণেশবাবুর নাটকটির আগে হত নাথিনিয়ার-এর 'শেষ আক্রমণ', তিন পয়সার পালা', 'আলোমানুষ'। উত্তমকুমার মুটিয়া মেন ঘুমি চুমি যা দেখে গেছেন এই রঙ্গনা থেকেই। আবার সেই সমস্যাসমাধান থিয়েটার হবে প্রত্যাশায়। কিন্তু এবার নাটক হচ্ছে সুস্থ সাধারণ মানুষদের শান্তালোকদের নাটক দেখার মন বিচার ও বিবেচনা করে। যেখানে চোখের জলে পবিত্র হবার অনুভবের অবকাশ থাকবে হাসির ইরজাবুরিতে চমকে ওঠার সঙ্গে। সে চোখের জল, হাসির পর সাধারণ দর্শক কতটা দেবে তা প্রতিবেদকের জানা নেই। প্রতিবেদকের যৌবনের বিমল চক্রবর্তী নিজেলিত মনোজ মিত্রের লেখা নাটকে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে তাঁরও অভিনয় করার কথা। তবে আবার পরিচালকদের নাটাদেবী মানুষের কাছে নিখাদ নাটকের গরুর করে নেবে রঙ্গনা। কারণ এই থিয়েটারে প্রসেনজিৎ, হাসপ পাল নেই। শিল্পীকে ঘড়ি চোখে দেখার আগের তৈরী হওয়া বিভের লক্ষণের হাত থেকে থিয়েটার মুক্ত। পুরোনো থিয়েটারে যে সাজঘরের এখনীতে সবজোড় ঠাঁরাও কি আগামের নাঃ রঙ্গনা নেই। তাই তো বিশাল বিজ্ঞাপনে আগের মেকে দেখার মতো কোনো কাঙ্কারিয়া নেই। সিলুয়েট মঞ্চের এর পাশের বা দেখার উপায় নেই। তাহলে এই থিয়েটারে যে ভাল-ভালোবাসাই প্রধান সেসব কিছুই নেই। আছে শুধু ভালো থিয়েটার। ভালো মঞ্চ সজ্জা — ভালো নাটক — ভালো সংলাপ, ভালো পরিচালনা এবং ভালো অভিনয়। তাই তো অশ্বত্থামার কথাই মনে হচ্ছে। মেলায় দ্বিতেছে কার চেয়ে কম তিনি। অথচ পরিস্থিতি কঠিনতর।

কথদিন আগে বিমল চক্রবর্তী মানুষকে করেছেন যে পুজোতে, জীর্ণ বলে যে আলমারি ফেলে দিয়েছি তার মধ্যে কত

বড়মেয়ার ছিল, সেওলোর কথা আমাদের মনেই আসেনি। তাই নাটাগুরু নাট্যাচার্য শিশির ভাদুড়ী যখন হাসি বিশ্বাস ও তুলসী চক্রবর্তীর পরবর্তে শালন করার দায়িত্ব দেন, আমাদের মনে বিভাসবাবু তার প্রথম উপলব্ধি হয়েছিলেন। তিনি মনে করেন ওঁদের যদি আর একটু বেশি করে লক্ষ করতেন তাহলে চরিত্রাভিনয়ে আরো অনেক দু-একজন বাদে এমন নীরস খেলো-অর্থের অবস্থাটা তৈরি হত না। বিভাসবাবু। ঐঁর মনের শিল্পী ঐঁকেনপুষ্টি উপলক্ষে এবার ঐঁর খেলাঘর থিয়েটারের হাত ধরেছে। 'মাটী' সংগ্রহের কিসসা' নিয়ে বিভাস থিয়েটারের সব শিল্পীদের সঙ্গে বিভাসবাবু বন্ধু ধরনে এসেছিলেন। এবার একটু ফিরে।

মনে পড়ে খেলাঘর থিয়েটারের বিশেষত সকলের অভিনয় করবার জন্য গাঙ্গেয়বাবুর আগে বহু অভিনেতা অভিনয় গাঙ্গেয়াপাধ্যায়ের নাম নিয়ে এসেছিলেন, কেবল এইটুকু বলা যায়, টাইটেল নিয়ে করলেও কুশিলবে অন্ধকারাচ্ছন্ন ছেটোটোকে ইতিহাসে ইতি দিয়েই চলে এবং এখনে বিভাস চক্রবর্তীর ক্ষমতা হচ্ছে তিনি আরও বেশ কিছু অন্ধকারাচ্ছন্ন তৈরি করে দিতে পারেন।

এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ থিয়েটারে কি প্রথমে গ্রামোফোন নয়, শিশুদের একটি অভিনয়ের অনুষ্ঠান দেখতে গিয়ে

এইসময়ের অনেক থেকেই ঐঁর সাধা এই থিয়েটারের প্রতি মমত্ব।

মনে পড়ে, উত্তমকুমারের জনপ্রিয়তা যখন বাঙালির অমমা, তখন সবিতাব্রত দত্তর 'অ্যান্টনি কবিয়াল' দেখতে মানুষ বেশি ছুটেছে মহানায়কের 'অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি' না দেখে। তৃপ্তি মিত্রই তো 'দেবু'কে ঔঁরিয়ে নিয়েছিলেন। পাশাপাশি হয়ে ৩১শে ডিসেম্বর রাত-ভোর — 'নাট্যাঙ্গনকক্ষ'। যার বেশখোও কাজটা হয়নি। পরবর্তীকালে 'সিরাজদ্দৌলা' হিসেবে যাঁরা আমাকে বিমোহিত করেছিলেন গুরুদেববাবু ঔঁদের মধ্যে অন্যতম। বৃদ্ধ সবটাই, যদি নিষ্ঠা প্রেম থাকে, ভালোবাসা থাকে তবে আবার একটা পথে আসতে হবে, বুঝলেই। সেখানেই মিলে গেল খেলাঘর ও সমাজবাদল থিয়েটারের পথ। তবে এই নতুন মিলনের ধারা প্রতিষ্ঠিত হবে না অবশ্যই, বলা শক্ত। না? এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে শম্ভু মিত্রের একটি মন্তব্যের কথা, তিনি বলেছিলেন এই পেশাদার থিয়েটারের অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রী সহজ স্বচ্ছন্দগতিতে মুখে। সত্যজিৎবাবুর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত কোনো পরিচয় ছিল না। চিত্রাভিনেতা শঙ্কু মুখোপাধ্যায়ের গল্ফ ক্লিনের ফ্লাটে আমি গিয়েছিলাম ঔঁর কিছু লেখা দেখতে বলার পেয়ে সেখানে সত্যজিৎবাবু ও তেলপড়ুয়ে এসেছিলেন।

ঈশ্বর সাক্ষী তাঁহাদের নেপথ্য আছে। কথা প্রসঙ্গে একদিনের — পত্রপাঠে আমন্ত্রণ জানিয়ে এলাম। সেইদিন থেকে গল্পের শুরু হয়ে গেল। সহধর্মিণী বললেন — পত্রপাঠ খুলিয়ে খুলিয়ে পেশাদার থিয়েটারের খোঁজ নিচ্ছিলেন। বড় বড় নায়কের সাথে আসে একবার এসে অন্তত ত্রিশ হাজার টাকা দেওয়া হয় শুনে বললেন, কেন? তাহলে আমি কী? আমি তো পৌরাণিক থিয়েটারের অধ্যায়ন এবং বিষ্ণুটি ইন্টারভালে ভোলেন ঘুরকে বেড়ে আসে তখন নিও। চরমভাবে কন্টাক্টে থাকতে হবে। তাকে যাতে ভালো বেতন দিও এবং হয় পেশাদার নিজালয় দিও তাহলে তো কাজ তৈরি করা যায় আসলে টাকা শুধু তেমন অনেক কম পড়ে। সঠিক এভাবে পেশাদার থিয়েটারের ভোলে প্রযোজক ঠিকই ভাবেননি। অত যে দক্ষতা প্রযোজক তাও সেদিনও ছিলেন পত্রে নিশ্চয়তা মনে আশ্বাসভরে করলেন, তাঁরও সে সব ভাবনা ছিল না। সিনেমার ভালোবাসে দিতে ঢালিয়ে বাজার প্রবণতা ছিল, তা তাঁর নিজের এবং থিয়েটারের বড় অভি করে দেয়। অন্য প্রযোজকদের ক্ষেত্রে তো বলাই বাহুল্য। যে প্রযোজনা ব্যবসায়ের প্রতিটি সর্বনাশের পথে নিয়ে যাচ্ছে। এই প্রযোজকরা আসলে শিল্পকে ধরিয়ে বাণিজ্য করতে এসেছে না অন্য কিছু, অন্য আছে না। চাই নিজের অন্তরাত্মা। থিয়েটারের শিল্পী সিনেমা করে, সিরিয়াল করে কিন্তু থিয়েটার বার দিতে বা এমন অভিনেতা-অভিনেত্রীকে দিতে কোনো সময়ের ধনী প্রযোজক খালতে পাবেন। কর্পকে আকর্ষণ করার জন্য বিজ্ঞাপন দিন সেই অভিনেতা-অভিনেত্রীর নামে। কারণ যে কেউ নয়, আমি সে অভিনেতা কোনো — এর শিল্পে বিজ্ঞাপনই তো অভিনেতা। যাঁরা হয়তো অভিনেতাকে অবতার পেশাদার হয়েছে কিন্তু শিল্পীশত্রুতার থেকে অভিনয়ের কারণের জন্য অনুরূপ করে দিন করে নিজের এই একদম ভয়ে ভয়ে ভাবনা হচ্ছে — তাই না? তাই বিজ্ঞাপন তো আছেই। তাছাড়া মঞ্চাভিনয় নিজস্ব শিল্পী না হলে সেই অভিনয়ের সুযোগ নিয়ে মঞ্চে উঠে আসতে পারে না। আর অনুরূপ দেশগত খুব বেশিক্ষণ। তাই সবাসাচী চক্রবর্তী, রেবেকাল ভট্টাচার্যের চেয়ে অনেক বেশি পর্দায় কলশিল্পী অভিনেতা। হয়তো আকাশচুম্বি, সিরিয়াস অভিনয় তেমন কলি টানতে পারেন না। যেমন পারেন মেজাজ। আমরা কারণে কুমার পৌরাণিক বলে এক তরুণ নায়ক বাঁপাচ্ছে। তিনি একাধারে অভিনেতা শিল্পী। আমার লেখা "অনন্ত আকাশ" নাটকের রূপকুমারের নির্দেশনায় পৌরাণিকের ভাবে পড়ি। তা সেই পৌরাণিক পর অভিনয়ে চরিত্রায় সবচেয়ে বেশি ব্যবসা দিয়েছেন। খাঁ খাঁ সব ডিস্ট্রিবিউশনের ডিস্ট্রিবিউশন। তবু এই ডিংপুরের আকৃষ্ট হবে না। আমি সিনেমার পাশে থাকবে। পেশাদার থিয়েটারে বলিকারও সেই সেবার দুঃখ ছিল। আগামে এখন থিয়েটারের টিকা চালাব এই আকর্ষণ সঙ্গে জড়িয়ে থাকে অভিও কিছু ইচ্ছে। যে আকর্ষণে সেন আমি সঙ্গে সম্পর্কে আরও অন্য অনেক কিছু। শিল্পীরা বাঁচায় — অভিনয় বাঁচায়, এমন নাটিকা সম্পন্ন মুক্তিদাস সন্ন্যাল, অশোক মুখোপাধ্যায়ের পাওয়া যায় না। তবে কলম অভিনেতা কালজয়িরা যতদিন ছিলেন এ ব্যবসায়, তিনি ভোলে আকর্ষণ নিজনেও ছোটোনদি এবং দুর্গাদিং থিয়েটারের আমদানি করেননি।

মুখোশ-মুখোশনে নষ্ট করা নিজের কুরুক্ষেত্রে থিয়েটারকে অনুকরণ পৌরাণিক পক্ষের চরীক করতে হয়। আর সেখানে প্রকৃত থিয়েটারপ্রেমী প্রতিভাশালী অভিনেতার অন্বেষণ হতে হয়। জানাই রয়েছে যুদ্ধে যেতে হবে, তবু যুদ্ধে যেতে হয়। পরাজয়ের বিশ্বু বিশ্বু জল পড়া করতে হয়। তাই আমরা পরাজয় ছেড়ে যেন পৌরাণিক তাদের থিয়েটার পক্ষ অভিনয়শিল্পীকে পাঁচাকেন বলে। সিরিয়াল-এ পর্দা দেখে শো যা অনেক আকর্ষণে অনুরূপ সময় ছেড়ে দিতে হবে। এতে প্রযোজক-পরিচালকরা যে খুব অসুবিধা পান এমনটা তো নয়, পৌরাণিক ভোলেনও। তবু থিয়েটার।

পেশাদার শিল্পীদের অন্যে যাঁরা ছিরো হয়ে এসে অনেক কাটিয়ে থিয়েটারকে চাইয়ে চলে গেছেন তাঁদের বিরুদ্ধে জোলে দেবারোপ করা যায় না কিছুই, কারণ তাঁদের অন্য টাকা নিয়েছেন যাঁরা, দায় তাঁদের। তবে তাঁরাও যেন ভাবেন, রঙ্গমঞ্চ নিয়ে ছা-ধরোপ না করেন। জাঁড়ি জাঁড়ি টাকা দুঃখে থিয়েটারের প্রতি প্রেম, তার অনেকের কারণে নিজে আলোচনা না করাই ভালো। বিশ্বং সেবাশ্রমের সন্ধ্যাকালে থিয়েটারের মানুষ। বিজয় চক্রবর্তী তাঁর মৃত্যুশয্যে সিরিয়াল পরিচালনার ভালো টাকা অফারও করে এই ব্যবসায় থিয়েটারের কাজ করতে বলেছিলেন। এখন থেকে প্রযোজক তিনি কিছুই পাবেন না। মনোজ মিত্র চলচ্চিত্রের চলচ্চিত্র অভিনেতা। এই ব্যবসায় পেশাদার থিয়েটারের একসময় তিনি পেশাদার নাট্যনির্দেশক এবং অভিনেতা হিসেবে কোথ দিয়েছিলেন, নাটককারও। সে নাটক ছিল বশপতি তিনি যথের ধন পেয়েছেন। এখন সিরিয়ালের সৃষ্টিতে আমিয়ে অর্থিক কর্মে বীকার অতো অবসর-পেশা এর পর অবসর-পেশা করতে আসছেন। রেবেকাল ভট্টাচার্যও সিনেমা করেছেন, সিরিয়াল তো অনেক করেছেন। তিনিও ঠাঁশিয়ে পড়াচ্ছেন। অসুস্থ কল ছিল যাঁদের, তাঁরা পুরো পাগল ঘুরে নিয়ে এখন ঘুর থেকে সমাদৃতি কলতে প্রস্তুত। তবু যে অনেক মিত্র, বিভাস চক্রবর্তীই বল, একদল ছেলেমেয়ে কাজটাকে লাভ হিসেবে দেখছে, এটাই আশ্বাসের।

"রাজ্যে এ-পর্যন্ত ৭২৫ জন এডস রোগীকে চিহ্নিত করেছে রাজ্য সরকার। ১৯৯২ সালের পর থেকে রাজ্যে নতুন করে এডস রোগীর সংখ্যা বছরে ২০০ ছাড়িয়ে যাচ্ছে। সরকারের হিসাব, যৌন সম্পর্কের মাধ্যমেই বেশীর ভাগ রোগী এডসে আক্রান্ত হয়েছেন। ৬২০ জন রোগীর ক্ষেত্রে এই ঘটনা ঘটেছে

এডস্ সম্পর্কে সচেতনতা

Aids awareness

এলিত্রা সিনহা

আজ আমরা নতুন সহস্রাব্দে পা দিয়েছি। আমাদের আহ্বান করা হয়েছে, অর্থাৎ সমস্ত মানবজাতির আহ্বান করা হয়েছে যে আমরা আজ বিজ্ঞানের সহায়তায় উন্নত এক জাতি। আমাদের চারপাশে চেয়ে দেখি আমরা বিভিন্ন ধ্বংস ও হত্যাকর্মকে সফলভাবে অতিক্রম করেছি। বিভিন্ন ব্যাধিকে চিহ্নিত করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছি। কিন্তু হঠাৎ আমরা যেন এক ভীতির সামনে একটি মাত্র ভাইরাসের কাছে। HIV এবং AIDS এর কারণে হল এই HIV। আজ পর্যন্ত পাওয়া যে কোন সংক্রমণ এই ভাইরাসের আক্রমণে প্রতিরোধক্ষমতা কোনও ঔষধ যেন খেয়েই নেই, এমনকী এই রোগ-প্রতিরোধক টিকারও আবিষ্কার হয়নি। তাই এই রোগ থেকে বাঁচার একমাত্র একটি উপায় আছে। সেটি হল — সমাজ সচেতনতা অর্থাৎ যে উপায়গুলির মাধ্যমে এই রোগ মানবদেহে বাসা বাঁধতে পারে সেগুলি থেকে নিজেদের ইচ্ছাকে দমন এবং তা করতে গেলে সর্বপ্রথমে আমাদের জানতে হবে —

ক) এটা কে এই রোগ কীভাবে ছড়ায়,

খ) কী উপায়ে এর থেকে বাঁচা যায়,

গ) এই রোগের লক্ষণগুলো কী কী,

ঘ) AIDS হয়েছে এমন সন্দেহ হলে কী করা দরকার।

A=Acquired (অর্জিত)

I=Immunus (প্রতিরোধ)

D=Deficiency (শক্তিহীনতা)

S=Syndrom (লক্ষণসমূহ)

A=Accidental Assistant

I=Infective Information

D=Drug Decision Making

S= Sex / Supporting

(উপরোক্ত বিষয়গুলির মাধ্যমে AIDS এর জন্ম এবং এর থেকে রক্ষা পেতে সাধারণের সাহায্যের কথা জানানো হল।।

এবার AIDS AWARENESS সম্বন্ধে কিছু জরুরী প্রয়োজনীয় তথ্য জানানো হচ্ছে —

১) HIV (Human Immunus Deficiency Virus) কীভাবে ছড়ায়?

উত্তর ক) উন্মুক্ত যৌনক্রীয়াকলাপের মাধ্যমে।

খ) অপরিশোধিত রক্ত ও সিরিঞ্জ ব্যবহারের ফলে।

গ) সন্তানের জন্ম গ্রহণ করার সময়ে

ঘ) আক্রান্ত মায়ের দুধ খাওয়ার মাধ্যমে।

২) কী কী উপায়ে HIV ছড়ায় না?

উত্তর কী কী কারণে AIDS হয় না তাদের সম্বন্ধে নীচে বলা হল —

উত্তর ক) সাধারণ মেলামেশা, হাত ধরা, কোলাকুলি করা, আলিঙ্গন করা, চুম্বন করা, ঘনিষ্ঠ ভাবে কথা বলা বা একই পাত্রে খাওয়া, একই বাথরুম, টয়লেট ব্যবহার করা, একসঙ্গে কাজ করা, একসঙ্গে খেলা ইত্যাদি বা সাধারণ ব্যবহার করা।

খ) মশা বা অন্য কোন পোকামাকড় দ্বারা।

অথবা একজন AIDS রোগীর সঙ্গে যদি আর একজনের সম্পূর্ণ শারীরিক সম্পর্ক ঘটে তবেই শরীরে HIV প্রবেশ করে এবং AIDS হয়।

3) AIDS রোগের বিভিন্ন চিহ্ন ও লক্ষণ —

উত্তর ক) কাশ, কুঁচকি বা গলার গ্রন্থি ফুলে ওঠে (এই লক্ষণগুলি সর্বপ্রথম দেখা যায়।)

খ) বেশ কয়েক সপ্তাহ যাবৎ সাইনাসের সমস্যা, সর্দি-কাশি, জ্বর, মাথাযন্ত্রণা, ডায়রিয়া।

গ) তেমন কোনো কারণ ছাড়াই ওজন হ্রাস।

ঘ) সারা শরীরে যন্ত্রণাদায়ক চুলকানি।

ঙ) মুখে ঘা।

চ) অতিরিক্ত ঘাম, বিশেষত রাত্রিবেলা।

4) AIDS হয়েছে সন্দেহ হলে কী করা উচিত?

উত্তর AIDS (Acquried Immunus Deficiency Syndrom) হয়েছে সন্দেহ হলে প্রথমে একটি টেস্ট করাতে হয় — Elisa Test। শরীরে HIV প্রবেশ করলে শরীরে একটি অ্যান্টিবডি ও বিষ্ণু কোষের সৃষ্টি হয়। Elisa Test-এর মাধ্যমে শরীরে সৃষ্ট অ্যান্টিবডি প্রত্যক্ষ করা পড়ে এবং তা পরীক্ষার মাধ্যমে বোঝা যায় যে শরীরে HIV আছে। এর খরচ 400টাকা।

এছাড়াও একটি Test আছে— Weston Blot Test যার মাধ্যমে শরীরে HIV আছে কিনা সরাসরি ধরা পড়ে। এর খরচ 4,000 – 5000 টাকা। এই Test কিনা পরপর তিনটি জায়গায় করা হয় —

1. STM (মেডিকেল কলেজ)
2. AIIPHH (সেন্ট্রাল লাইব্রেরি রোড)
3. NICED (বেলেঘাটা)

5) আত্মীয় - বন্ধু, প্রতিবেশীদের AIDS হয়েছে জানতে পারলে কী করা উচিত?

উত্তর তাদেরকে Elisa Test অথবা Weston Blot Test -এর জন্য নিয়ে যাওয়া উচিত। তাদের সঙ্গে যথাসম্ভব ভাল ও সুষ্ঠু ব্যবহার করা উচিত। তাদের মনে এই বিশ্বাস জাগিয়ে তোলা

উচিত যে তারা একা নয়, তাদের পাশে আমরা সবাই আছি।

[illegible]

পশ্চিমবঙ্গের ৭৫৫ স্কুল প্রথম শ্রেণী

স্টাফ রিপোর্টার। [illegible] ৭৫৫টি স্কুল প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত করেছে পর্ষদ। [illegible] ৬ হাজার ৯০ টাকা। তাছাড়া বেসরকারি স্কুলগুলির আর্থিক সংকটের কথা বিবেচনা করে [illegible] ৫ হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়া হবে। [illegible] ৭৫৫টি স্কুলের মধ্যে [illegible] ৫৫৫টি স্কুল [illegible] ২০০টি স্কুল [illegible] ১০০টি স্কুল [illegible] ৫০টি স্কুল [illegible] ২৫টি স্কুল [illegible] ১০টি স্কুল [illegible] ৫টি স্কুল [illegible] ২টি স্কুল [illegible] ১টি স্কুল [illegible]

[illegible]

[illegible]

Bat টি হাত Gun
আর বলটি হল বুলেট
ভারতের গৌরব
সৌরভ গাঙ্গুলি Ganguly
প্রত্যেক ম্যাচে Record তার
একটি হলো Man of the Match
তিনি Batting করলে থাকেন তিনি Catch
দল যখন হয়ে যায় Bat এবং বল
Dona Didi Stage মাতান
তুফানই আসে ॥

ছবি : শেখর চক্রবর্তী

সৌরভের আত্মতৃপ্তির হাসি ভারতীয় দলে দীপ দাশগুপ্ত

অবশেষে ছাপ্পান্ন অধিনায়ক সৌরভের মুখে শেষ তৃপ্তির হাসিটি ফুটে উঠল। ভাগ্যদেবী সৌরভের প্রতিটিক্ষে উজ্জ্বল নেই ঘটে, তার প্রতিটিক্ষে টেনশনের শিরদাঁড়া অবশ হয়ে উঠেছে কেবলমাত্র দুটি কারণে। প্রথমত সৌরভের সংগ্রামী ব্যক্তিত্বকে নির্দিধায় স্বীকৃতি দান। এই শিশুটি তার ছাড়পত্র পেয়ে ভারতীয় ক্রিকেটদলের বাঁধের খাঁয় জল ঢেলে দিল। সপ্তমে করল ১৩৫ বুলওয়েমে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ৪৩ বলেছেন। ব্রডহাফের পাকে দীর্ঘেন্দ্র সহবাগ তার অভিষেক ম্যাচে পঞ্চাশের গণ্ডি করলেন। অভিষেক ম্যাচে পঞ্চাশ করতে তিনি ভারতীয় হিসাবে একাদশতম। পাঁচ বছর আগে লর্ডসে সৌরভের পরে এই প্রথম কেন ভারতীয় অভিষেক ম্যাচে সেঞ্চুরি করলেন। প্রসঙ্গত ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেটে অভিষেক হয়ে খেলা এই ঝানোয় ছেলে বাঙালি ছিলেন। পর পাঁচ বছরে সৌরভের পর তিনিই প্রথম বাঙালি, যাঁর ভারতীয় ক্রিকেটে টেস্ট অভিষেক হল। তবে মিলিয়েই যাবে কল, তাই সৌরভের মুখে তৃপ্তির হাসি। প্রথম কলকাতার নাকি সৌরভের প্রতীক। একদা শক্ত কলকাতা বিদায়, ভারতীয় দল, শেষ পর্যন্ত দিয়ে, ফলপ্রার্থী মনের খবর কি কাটিয়ে উঠতে পারবে ?

কলকাতার অন্যতম প্রবীণ ব্যক্তি হরিদাস পালের সম্পূর্ণ সুস্থ দেহে একশত বছর পূর্তি উপলক্ষে কলকাতা পৌর সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত পুরশ্রীর সম্প্রদ্ধ প্রণাম।

পরম বৈষ্ণব ও একনিষ্ঠ দেশসেবক শ্রীযুক্ত হরিদাস পাল, অনিবার্য রাজনৈতিক কারণে, বাংলাদেশ বিভক্ত হলে একান্ত অনিচ্ছায় দেশত্যাগে বাধ্য হন। অবশ্য পরবর্তীকালে তিনি আপ্রাণ চেষ্টায় সমাজে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি নিজে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ও বহু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আছেন। সুনাগরিক হিসাবে মানবকল্যাণকর কর্মধারার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রেখেছেন। যাদবপুর এলাকার প্রত্যেকেই তাঁকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করেন তাঁর সুযোগ্য পুত্র রবীন্দ্রকুমার পালও হরিদাস বাবুর ঐতিহ্য যোগ্যতার সঙ্গে বহন করেছেন। ২৫শে নভেম্বর ২০০১ (রবিবার) মধুসূদন মঞ্চে তাঁকে সম্বর্ধিত করা হয়। শ্রী যুক্ত হরিদাস পাল দীর্ঘকাল সুস্থদেহে আমাদের মধ্যে বেঁচে থাকুন — পুরশ্রীর পক্ষ থেকে এই কামনাই করি।

ঐতিহ্যের বন্ধন
কলকাতার স্পন্দন

কলিকাতা পৌরসংস্থা

কারুশিল্প, প্রযুক্তিবিদ্যা কৃষ্টি
এই তিন কলকাতার সৃষ্টি

কালী মন্দির
পারেশনাথ মন্দির
মহাবোধি সোসাইটি
নাখোদা মসজিদ
আর্মেনিয়ান গির্জা
ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল
রাজা রামমোহন রায়
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
যামিনী রায়ের ছবি
নোবেল জয়ী অমর্ত্য সেন
দ্বিতীয় হুগলী সেতু

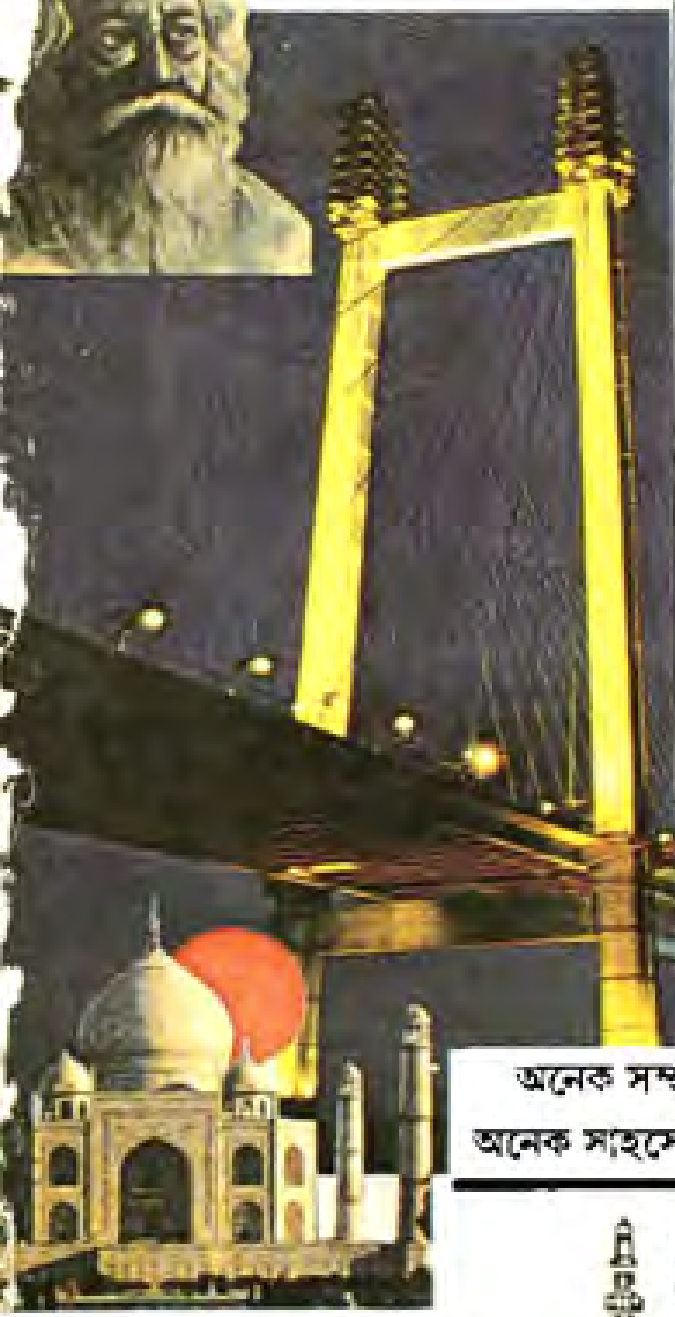

অনেক সম্প্রদায় অনেক সংস্কৃতি
অনেক সাহসে গড়ে উঠেছে এই শহর

কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

RNI : WBBEN/2001/4446

Tech/WB/RNP-127/200

কালের ব্যবধানে অতীতের স্বাক্ষর কলকাতার শিল্প সংস্কৃতি

কলিকাতা পৌরসংস্থা

ঐতিহ্য রক্ষায় সচেষ্ট